

মুখতামারুল মা'আনী

আরবি
বাংলা



অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর কাসেমী

শিক্ষাসচিব, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা
চেরাগআলী, টঙ্গী, গাজীপুর

সম্পাদনায়

হযরত মাওলানা আহমদ মায়মুন

মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

পরিবেশক



ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক

মাওলানা মোঃ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

বর্ণবিন্যাস

আল-মাহমুদ কম্পিউটার হোম
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

হাদিয়া : ৩০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা- ১১০০

সম্পাদকের কথা



মুখতাসারুল মা'আনীর পরিচয় মাদরাসার কোনো ছাত্র শিক্ষকের নিকট অজানা নয়। কালে কালে গ্রন্থখানিকে সহজবোধ্য করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে অনেক। আরবি ভাষায় এ উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উর্দু ভাষায়ও গ্রন্থখানির মর্মোদ্ধার ছাত্রদের নাগালের মধ্যে এনে দেওয়ার জন্য চেষ্টা-কোশেচ হয়েছে নানাভাবে।

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার কাজ থেকে অনেকাংশে দূরে পড়ে থাকা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায়ও এর কিছুটা আংশিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজ হয়েছে ইতঃপূর্বে। কিন্তু বাংলা ভাষায় গ্রন্থখানির একটি পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক বিশ্লেষণধর্মী ভাষ্যগ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনেকে তীব্রভাবে অনুভব করে আসছিলেন, যাতে এর বিষয়বস্তু নিজ মাতৃভাষায় অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ কষ্টসাধ্য কাজটি আঞ্জাম দিতে অদম্য মনোবল নিয়ে এগিয়ে এনেছেন আমার আত্মজ-প্রতীম ছাত্র ও টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসার বর্তমান শিক্ষা সচিব মাওলানা আবু বকর। তিনি গ্রন্থখানির মর্মোদ্ধার ও বিষয়বস্তুকে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং আমার বিবেচনায় অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। পরবর্তী সংস্করণে তিনি একে আরো বেশি সুন্দর ও পরিমার্জিত করার প্রতি প্রয়াসী হবেন বলে আমি আশা রাখি।

আল্লাহ তা'আলা ভাষ্যকার ও সম্পাদকের শ্রমটুকু কবুল করুন এবং এর দ্বারা ছাত্রবৃন্দকে উপকৃত করুন। এতে অযাচিত ও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে তা ক্ষমা করে দিন। আমীন।

আহমদ মায়মুন

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা- ১২১৭

লেখকের কথা

আল-হামদুলিল্লাহ! রাব্বুল আলামীনের অপার করুণায় কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা কারিকুলামের অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কিতাব মুখতাসারুল মা'আনীর ভাষ্যগ্রন্থ (শরাহ) লেখার কঠিন এক কাজ করার প্রয়াস পেয়েছি। ইলমে বালাগাত বিষয়ে রচিত আল্লামা তাফতাহানী (র.)-এর এ কিতাবটি বিভিন্ন কারণে দুর্বোধ্য। এর মর্মোদ্ধার করতে মেধাবী ছাত্রদেরও গলদগর্ম হতে হয়। অধিকন্তু এটি বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়াহ-এর সিলেবাসভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। কিতাবটি দুর্বোধ্য হওয়ায় এর বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। তা ছাড়া বহু কওমী মাদ্রাসায় এখন বাংলা মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নীতিগতভাবে বাংলা ভাষ্যগ্রন্থ রচনার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদগণের সাথে পরামর্শ করত মুখতাসারুল মা'আনীর বাংলায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ সংকলনের কাজ হাতে নিয়েছিলাম বছর তিনেক আগে। পূর্ণ একবছর সময়ে তা **أحوال المسند** পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। এতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ক. কিতাবের ইবারতের জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে সহজ-সরল ভাষায়।

খ. বিশেষ বিবেচনায় গ্রন্থটির ইবারতের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে।

গ. প্রথমে ইবারতের অনুবাদ, তারপর বিশ্লেষণ ও সবশেষে পুরো বিষয়ের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ. ইবারতে ব্যবহৃত **تشبيه** **استعارة** **كناية** ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঙ. ইবারতের মাঝে **سؤال مقدر** (লুক্কায়িত আপত্তি) গুলো তুলে তার যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এটি কোনো শরাহ-এর অনুবাদ নয়; বরং বিভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থের সহায়তায় রচিত একটি মৌলিক ভাষ্যগ্রন্থ। কাজটি শুরু করেছিলাম উস্তাদগণের অনুপ্রেরণা, বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহ ও ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে। তা ছাড়া বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার লেখার জগতের পথপ্রদর্শক মান্যবর উস্তাদ প্রথিতযশা লেখক হযরত মাওলানা আহমদ মায়মুন (দা. বা.) মুদ্রণের পূর্বে এটি সম্পাদনা করবেন। আল-হামদু লিল্লাহ তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ভাষ্যগ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে, তারপরেও যদি কোনো বিচ্যুতি থেকে থাকে তাহলে সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের কাছে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

ভাষ্যগ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান যার তিনি হচ্ছেন ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী মাওলানা মোস্তফা সাহেব। ইসলামিয়া কুতুবখানার সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য বন্ধুবর মাওলানা আবুল কালাম মাসুমের অবদান কিছুতেই ভোলা যাবে না। যিনি প্রকাশনার প্রতিটি স্তরে এতে আন্তরিকতা পূর্ণ শ্রম দিয়েছেন। বিশেষভাবে (দু' বছর আগে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া) এর দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমার ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ মুখতার হুসাইন ও আরো কয়েকজন পাণ্ডুলিপি তৈরিতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া যারা আমার গড়ে উঠার পিছনে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন এবং আমার এ প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের অবদান এই মুহূর্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। পরিশেষে মহান মাওলার দরবারে বিনীতভাবে কায়মনোবাক্যে এই দোয়া করছি হে আল্লাহ! আপনি অধমের এ শ্রমটুকু দয়া করে কবুল করুন এবং যাদের উদ্দেশ্য করে এটি লেখা হয়েছে একে তাদের পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়ার উপযুক্ত করে দিন। আল্লাহ্মা আমীন।

আরজঞ্জার

মুহাম্মদ আবু বকর

টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা

টঙ্গী, গাজীপুর

তাং ১২ - ১১ - ২০০৫ ইং

ভূমিকা

ইলমুল বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) মূলত তিনটি ইলমের (জ্ঞানের) সমষ্টি। ইলমুল বালাগাতের যে কোনো কিতাবে এই তিনটি ইলমের আলোচনা পর্যায়ক্রমে এসেছে। ইলম তিনটি হচ্ছে— ১. ইলমুল মা'আনী, ২. ইলমুল বায়ান ও ৩. ইলমুল বাদী'।

নিম্নে এ তিনটি জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. **مَعْنَى** শব্দটি **مَعْنَى**-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে— উদ্দেশ্য, মর্ম ও তাৎপর্য।

পরিভাষায় : ইলমুল মা'আনী বলা হয় ঐ জ্ঞানকে, যার সাহায্যে আরবি বাক্যের ঐসব অবস্থা জানা যায়, যার দ্বারা বাক্যটি **مُقْتَضَى حَالٍ** (স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) মোতাবেক হয়।

আল্লামা সাক্বাকীর মতে, বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের রচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধানকে **مَعْنَى** বলা হয়, যার দ্বারা সেসব বৈশিষ্ট্য জেনে নিজ কথাকে 'মুকতায়াকে হাল'-এর অনুযায়ী ব্যবহার করা যায়।

ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয় : বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাপণ্ডিতদের মুকতায়াকে হাল অনুযায়ী রচিত বাক্যসমূহই ইলমুল মা'আনীর আলোচ্য বিষয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বাক্যকে মুকতায়াকে হাল মোতাবেক গঠন করার ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি মুক্ত রাখা।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : ইলমুল মা'আনীর উৎপত্তি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, সর্বপ্রথম জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়াহ বারমাকী (ইস্তেকাল : ১৮৭ হিজরি) এ বিষয়ে কিছু মূলনীতি তৈরি করেন। তবে তার এ মূলনীতিগুলো কোনো লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। তারপর আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব ইম্পাহানী (ইস্তেকাল : ২৫৫ হিজরি) যার উপনাম ছিল আবু ওসমান এবং জাহিয নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি এ বিষয়টি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করেছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন। এ জন্য তাকে কেউ কেউ ইলমুল মা'আনীর জনক বলে থাকেন।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "الْبَيَانُ وَالتَّبَيُّنُ" এ বিষয়ে একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। তারপর শুরু হয় শায়খ আবু বকর আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (ইস্তেকাল : ৪৭১/৪৭৪ হিজরি)-এর যুগ। এ বিষয়ে তাঁর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ "دَلَالَةُ الْأَعْجَازِ" এক অসামান্য কীর্তি। এ কিতাবে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সব আলোচনাকে একত্রিত ও সন্নিবেশিত করেছেন। তারপর শুরু হয় আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ সাক্বাকী (র.) (ইস্তেকাল : ৬২৬ হিজরি)-এর সময়কাল। তিনি ছিলেন একাধারে নাহ্, সরফ, ফিকহ, মানতিক ও বালাগাতের ইমাম। এক কথায় ইলমের সব শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে। তিনি তাঁর অনন্য গ্রন্থ **مِفْتَاحُ الْعِلْمِ** তিন খণ্ডে সমাপ্ত করেন। এর তৃতীয় খণ্ডে তিনি ইলমুল বালাগাতের তিনটি ইলম যথা ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী' সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

২. **بَيَانٌ** শব্দের অর্থ— স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া। মনের ভাব প্রকাশের জন্য যে সুস্পষ্ট ও সাবলীল কথাবার্তা ব্যক্ত করা হয়, তাকেও **بَيَانٌ** বলা হয়।

পরিভাষায় : **بَيَانٌ** ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে একটি বিষয়কে একাধিকভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এর একেকটি পদ্ধতি অন্যটির তুলনায় উদ্দিষ্ট অর্থ আদায় করার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হয়। এ পদ্ধতিগুলো হলো **تَشْبِيهٌ**, **مَجَازٌ** ইত্যাদি।

আলোচ্য বিষয় : শব্দমালা এবং শব্দমালা দ্বারা গঠিত বাক্যাবলি, যেখানে মনের অভিযুক্তির স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার বিচার করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : একটি বিষয়কে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করার যোগ্যতা অর্জন করা এ ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : এ ইলমের জনকদের মধ্যে সীবওয়াইহ, খলীল ইবনে আহমদ, আবু উবাইদাহ মা'মার ইবনে মুসান্না (র.) (ইস্তেকাল : ২০৯ হি.) প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। মা'মার ইবনে মুসান্না (র.) এ বিষয়ে "مَجَازُ الْقُرْآنِ" নামে একটি সমৃদ্ধ কিতাব লিখেন, এতে তিনি কুরআনের সকল বর্ণনা পদ্ধতি এবং রচনাইশলীকে একত্রিত করার চেষ্টা করেন। আবু আলী মুহাম্মদ ইবনে হাসান হাতেমী (র.) (ইস্তেকাল : ৩৮৮ হি.)-এর থেকে এ শাস্ত্রের ২য় যুগ শুরু হয়। তিনি

"سِرُّ الصَّنَاعَةِ وَإِسْرَارُ الْبَلَاغَةِ" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এ কিতাবের মাধ্যমে তিনি ইলমুল বয়ানের যথেষ্ট খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁর যুগের আরেকজন পণ্ডিত শামসুল মা'আনী কাবুস ইবনে দশমগীর (ইন্তেকাল : ৪০৩ হি.) كَمَالُ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেন।

তাঁদের পর আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে তাহির শরীফ রযী মূসাযী (ইন্তেকাল : ৪০৬ হিজরি) উল্লিখিত বিষয়ে দু'টি কিতাব লিখেন। এর একটি হলো تَلْخِصُ الْبَيَانِ عَنْ مَجَازَاتِ الْقُرْآنِ, অপরটি হলো مَجَازَاتُ التَّبْوِيَةِ কিতাবদ্বয়ে কুরআন ও হাদীস-এর অভিনব ইস্তিআরা (রূপক অর্থজ্ঞাপক) ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং রাসূল ﷺ-এর অধিক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এরপর আবু মুনসুর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ছা'আলিবী (ইন্তেকাল : ৪২৯ হি.) سِرُّ الْبَلَاغَةِ وَسِرُّ الْبَرَاغَةِ নামে এ বিষয়ে একটি উত্তম কিতাব লিখেন। এরপর শায়খ আবু বকর আব্দুল কাহির ইবনে আব্দুর রহমান জুরজানী (ইন্তেকাল : ৪৭৪ হিজরি) কর্তৃক রচিত سِرُّ الْبَلَاغَةِ এবং আল্লামা জারুল্লাহ যমখশারী রচিত আসাসুল বালাগাহ্ (أَسَاسُ الْبَلَاغَةِ) এ বিষয়ে লিখিত প্রসিদ্ধতম কিতাব।

بَدِيعُ الشَّيْءِ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো- কোনো জিনিসকে উপমা বা নজিরবিহীন সৃষ্টি করা। সূত্রাং بَدِيعُ অর্থ হলো- অভিনব, নব উদ্ভাবিত, স্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছুকেই নজিরবিহীন সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁকে الْبَدِيعُ বলা হয়। যেমন, কুরআনের আয়াত- بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ আসমানসমূহ এবং জমিনের স্রষ্টা বা উদ্ভাবনকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা।

পরিভাষায় : بَدِيعُ ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে বাক্যালঙ্কারের এমন সব নিয়ম-কানুন জানা যায়, যার প্রয়োগ বাক্যের ফাসাহাত ও বালাগাতের অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানোত্তীর্ণ হওয়ার পর হয়।

আলোচ্য বিষয় : বাক্যালঙ্কারের এসব নিয়মনীতি সমৃদ্ধ ইবারতই এ বিষয়ের আলোচ্য বিষয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : বিশুদ্ধ ও সাহিত্য মানোত্তীর্ণ বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য মাধুর্য সৃষ্টি করা।

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : আমীরুল মু'মিনীন আবুল আব্বাস আল-মুরতায়ী বিল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মু'তায় (ইন্তেকাল : ২৯৬ হিজরি) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেন। তাঁর কিতাবের নাম الْبَدِيعُ এটি কিছুকাল পূর্বে জার্মানে প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানের এ শাখাটি তাঁর মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় এবং তিনিই এ জ্ঞানের নাম "الْبَدِيعُ" নির্বাচন করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর কিতাবের শুরুতে লিখেন مَا جَمَعَ قَبْلِي نُسُورُ الْبَدِيعِ أَحَدٌ 'আমার পূর্বে بَدِيعُ বিষয়ে কেউ কলম ধরেনি।'

তিনি তাঁর কিতাবে ইলমে বদী'-এর সতেরোটি নিয়ম লিখে যান। তারপর কুদামা ইবনে জা'ফর (ইন্তেকাল : ৩৩৭ হিজরি) আরো তেরোটি নিয়ম বৃদ্ধি করেন। যার ফলে মোট ত্রিশটি নিয়ম হয়। তাঁর লিখিত কিতাবের নাম نَفْدُ الشِّعْرِ। এতে তিনি قِيَّاسُ - حَذُّ - وَصْفُ - رَسْمُ -এর আলোচনা করেন। তাঁর আরেকটি কিতাবের নাম হলো نَفْدُ الشِّعْرِ। এ কিতাবে তিনি تَشْبِيهِ - تَمْثِيلُ - تَرْصِيعُ - وَزْنُ قَائِمِهِ - أَسْبَابُ جَوْدَةِ الشِّعْرِ - حَذُّ الشِّعْرِ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। তাঁর রচিত আরেকটি কিতাব রয়েছে, যার নাম جَوَاهِرُ الْأَلْفَاظِ।

পরবর্তীকালে আবু হিলাল হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল আসকারী-এর মধ্যে আরো সাতটি নিয়ম যোগ করেন। এতে صَنَاعَتُ-এর সংখ্যা দাঁড়ায় সাঁইত্রিশটি। তাঁর রচিত কিতাবের নাম "الصَّنَاعَتَيْنِ" কিতাবটি আলোচ্য বিষয়ের বিবেচনায় অদ্বিতীয়। তারপরে কাজি আবু বকর বাকিল্লানী (ইন্তেকাল : ৪০৩ হিজরি) "عَجَازُ الْقُرْآنِ" নামে একটি কিতাব রচনা করেন। কিতাবটিতে তিনি ইলমে বাদী' সম্পর্কে তাঁর পূর্বসূরীদের মতামত পর্যালোচনা করে দলিলের সাহায্যে বিভিন্ন মতকে অগ্রাধিকার দেন। তারপর আবু আলী হাসান ইবনে রাশীক কায়রাওয়ানী আয্দী (ইন্তেকাল : ৪৬৩ হিজরি) এবং শরফুদ্দীন আহমদ ইবনে ইউসুফ তীফাশী (ইন্তেকাল : ৬৫১ হিজরি) ইলমে বদী'-এর صَنَاعَتُ-এর আরো নিয়ম বৃদ্ধি করে তা সত্তরে উন্নীত করেন। এ ছাড়া ইবনে রাশীকের কিতাব "الْعُمْدَةُ فِي مَعَايِينِ الشِّعْرِ وَأَدَابِهِ" ইবনে মুনকিয়-এর কিতাব الْبَدِيعُ فِي التَّفْرِيعِ এবং শায়খ হামাবীর কিতাব خَزَانَةُ الْأَدَبِ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তালখীসুল মিফতাহ্-এর লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : মুহাম্মদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি আবুল মাআলী, জালালুদ্দীন ও কাযিল কুযাত বা প্রধান বিচারপতি। তাঁর পিতার নাম- আব্দুর রহমান, উপনাম আবু মুহাম্মদ। তিনি কাযবীনে ৬৬৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ইবনে হাজার আসকালানীর মত। অন্য মতে তাঁর জন্ম হলো ৬৬০ হিজরিতে। আল্লামা কাযবীনী হিজরি সপ্তম শতকের একজন বিখ্যাত (শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী) আলিম ছিলেন। খুবই অল্প বয়সে ইলমে ফিকহ্-এ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর রোমান সাম্রাজ্যের কোনো এক এলাকাতে বিচারক পদে নিয়োগ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। কিছুকাল পর তিনি জ্ঞানের শহর বলে খ্যাত দামেশ্কে আসেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষত আরবি সাহিত্য, মূলনীতিশাস্ত্র, ইলমে মা'আনী ও বায়ানে পারদর্শী হয়ে উঠেন। তিনি তখন সে যুগের বড় বড় আলিমদের থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি দামেশ্কের জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্ব লাভ করেন। কিছুকাল পরে সুলতান নাসির তাঁকে সিরিয়ায় বিচারক নিযুক্ত করেন এবং সুলতান তাঁর যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে দেন। এর কিছুকাল পরে মিসরে আল্লামা ইবনে জামাআর স্থানে বিচারকের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি কবিতাও লিখতেন। তাঁর কিতাবে তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্তেকাল : এ জগদ্বিখ্যাত আলিম ১৫ই জুমাদাল উলা ৭৩৯ হিজরিতে ইহলোক পরিত্যাগ করে মহান রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

তাঁর রচনাবলি : তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলি হচ্ছে, তালখীসুল মিফতাহ্, আল-ঈযাহ্ ও আস-সূরুল মারজানী মিন শে'রিল আরজানী। এগুলোর মধ্যে তালখীস হলো আল্লামা সাক্বাকীর মিফতাহুল উলুমের ৩য় খণ্ডের সার-সংক্ষেপ, কিন্তু কিতাবটি লিখার পর দেখা গেল যে, অপ্রত্যাশিতভাবে কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি এর ব্যাখ্যাস্বরূপ একটি গ্রন্থ লিখেন, যার নাম হলো ঈযাহ্।

মুখতাসারুল মা'আনী গ্রন্থকারের জীবনালেখ্য

জন্ম ও বংশ পরিচয় :

নাম : মাসউদ, উপাধি : সা'দ উদ্দীন। পিতার নাম ওমর, উপাধি : কাযী ফখরুদ্দীন। দাদার নাম : আব্দুল্লাহ এবং উপাধি : বুরহান উদ্দীন। তিনি ৭২২ হিজরির সফর মাসে তাফতায়ান নামক জনপদে জন্মগ্রহণ করেন।

তাফতায়ান খুরাসানের অন্তর্গত একটি শহর। তবে নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান رَاسُ الْمُرْتَضَى কিতাবে তাঁকে نسًا (নাসা)-এর অধিবাসী বলে মন্তব্য করেন। কথিত আছে যে, শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি খুব দুর্বল মেধাধিকারী ছিলেন। তাঁর উস্তাদ আযদুদ্দীন-এর দরসের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল মেধার ছাত্র। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম ও কিতাব অধ্যয়নে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না। স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ-এর বরকত লাভ করে তিনি আশ্চর্য ধীশক্তির অধিকারী হন। আসুন তাঁর বর্ণনায় শোনা যাক- তিনি বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক অপরিচিত লোক আমাকে বলছেন, সা'দ চলো সামান্য ঘুরে আসি। আমি বললাম, আমাকে তো ঘুরে বেড়ানোর জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও কিতাব বুঝি না, আমি যদি ঘুরে বেড়াই, তবে আমার কি দশা হবে। একথা শুনে তিনি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আসলেন। এভাবে দু' তিনবার আসা-যাওয়ার পর তিনি বললেন, রাসূল ﷺ তোমাকে ডাকছেন। আমি হতভম্ব হয়ে খালি পায়ে তাঁর পেছনে চলতে চলতে শহরের বাইরে বৃক্ষ-লতা ঘেরা একস্থানে এসে উপনীত হলাম। সেখানে দেখলাম রাসূল ﷺ তাঁর কিছু সাহাবীদের নিয়ে অবস্থান করছেন। আমাকে দেখে তিনি মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে বললেন, “তোমাকে কতবার ডাকলাম; অথচ তুমি আসলে না।” আমি বললাম, হুযূর! আমি তো অবগত ছিলাম না যে, আপনি ডাকছেন। আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

এরপর আমি আমার মেধার দুর্বলতার কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তুমি মুখ খোলো। আমি আমার মুখ খুললে তিনি তাঁর মুখের বরকতময় লালা আমার মুখগহ্বরে ফেললেন এবং দোয়া করে বিদায় দিলেন। জাহ্রত হওয়ার পর তিনি আযদুদ্দীন-এর মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং পাঠদান শুরু হওয়ার পর তিনি উস্তাদকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তাঁর প্রশ্ন শুনে সহপাঠীরা এগুলো অবাস্তর ও অনর্থক মনে করল; কিন্তু তাঁর উস্তাদ ঠিকই সেগুলো বুঝতে পারলেন এবং বললেন يَا سَعْدُ إِنَّكَ الْيَوْمَ غَيْرُكَ فِيمَا مَضَى অর্থাৎ হে সা'দ! আজ তুমি তো সেই (চির চেনা) পূর্বের সা'দ নও।

বিদ্যার্জন : তিনি বিভিন্ন আলিম ও পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তন্মধ্যে আযদুদ্দীন ও কুতুবুদ্দীন রায়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা সমাপনের পর যুবা বয়সেই তাঁকে তৎকালীন বড় বড় বিদ্বানদের কাতারে গণ্য করা হতো। আল্লামা কাফাবী বলেন, তাঁর মতো বড় মাপের আলিম কেউ দেখতে পায়নি। লেখা-পড়া শেষ হওয়া মাত্রই তিনি অধ্যাপনার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্ররা হলো আব্দুল ওয়াসি' ইবনে খায়ির, শায়খ শামসুদ্দীন ইবনে আহমদ হুফরী, আবুল হাসান বুরহান উদ্দীন প্রমুখ।

তাঁর রচনাবলি : আল্লামা তাফতাহানী (র.) বহুস্থ প্রণেতা, এখানে তাঁর কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো—

১. **شَرْحُ تَفْسِيرِ زَيْجَانِي** এটি তাঁর রচিত প্রথম কিতাব, যা তিনি মাত্র ষোল বছর বয়সে লিখেছেন।

২. **مُطَوَّلُ تَلْخِيصِ الْفِتَاحِ**—এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (রচনাকাল : ৭৪৮ হিজরি)।

৩. **مُطَوَّلُ مَخْتَصَرِ الْمَعَانِي** এটি **مُطَوَّلُ**—এর সার সংক্ষেপ (রচনাকাল : ৭৫৬ হিজরি)।

৪. **سَفِيْدِيَّةٌ** এটি **ثَنَسِيْبِيَّةٌ**—এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (রচনাকাল : ৭৫৭ হিজরি)।

৫. **تَلْوِيْعٌ** এটি তুর্কিস্তানে অবস্থানকালে লিখেন।

৬. **مَقَاصِدٌ** এটি আকিদার কিতাব।

৭. **مَقَاصِدٌ** এটি **مَقَاصِدٌ**—এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

৮. **شَرْحُ عَقَائِدِ نَسْفِي** এটিও ইলমে কালামের উপর একটি কালজয়ী গ্রন্থ।

বড় বড় মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লামা তাফতাহানী : সাযিদ্ আহমদ তাহতাবী (র.) বলেন, তিনিই ছিলেন শীর্ষস্থানীয় হানাফী আলিম। আল্লামা কাফাবীর মতে, তিনি ছিলেন সে যুগের এক বিশ্বয়কর প্রতিভা, তাঁর উপমা বড় বড় জ্ঞানীদের মাঝেও খুঁজে পাওয়া দুষ্ট। তাঁর যোগ্যতা ও জ্ঞানের গভীরতা এ থেকে অনুমিত হয় যে, মীর সাযিদ্ শরীফ জুরজানীর মতো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীগণও তাঁর কিতাবাদি ও যোগ্যতা দ্বারা উপকৃত হতেন। শাহ্ সুজা-এর দরবারে তিনি বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এরপর তিনি তৈমুর লং-এর দরবারে **صَدْرُ الصُّدُورِ** নির্বাচিত হন। সম্রাট তৈমুর তাঁর খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি যখন তালখীস-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ **مُطَوَّلُ** লিখে সম্রাটের দরবারে পেশ করলেন, তখন সম্রাট এটি খুবই পছন্দ করলেন এবং বহুদিন ধরে সেটিকে হিরাত দুর্গের ফটকে (সদর দরজা) সম্মানের প্রতীক রূপে রাখা হয়।

মীর সাযিদ্ শরীফ এবং আল্লামা তাফতাহানীর তর্কযুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া শীর্ষক একটি পর্যালোচনা : এ বিষয়টি স্বীকৃত সত্য যে, আল্লামা তাফতাহানী এবং মীর সাযিদ্ শরীফ (র.) উভয়েই সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রতুল্য ছিলেন। তাঁদের পরে ইলমে হাদীস ছাড়া অন্যান্য ইলম যথা— সাহিত্য, তর্ক, কালাম, নাহ্ শাস্ত্রে তাঁদের মতো অভিজ্ঞ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলিম অতিক্রান্ত হয়নি। তাঁরা ছিলেন মুহাক্কিক বা বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ আলিমকূলের মোহর। এদের মধ্যে তর্কশাস্ত্র, ইলমে কালাম, সাহিত্য ও ইলমে ফিকহ্—এর মধ্যে আল্লামা তাফতাহানী এক কদম অগ্রগামী ছিলেন। মীর সাযিদ্ শরীফ দীর্ঘকাল পর্যন্ত আল্লামা তাফতাহানীর অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণা ও রচনাতে তাফতাহানীর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তৈমুর লং-এর দরবারে সভাসদ হন তখন তাদের মাঝে জ্ঞান বিষয়ক বিতর্কের কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এসব বিতর্ক মাঝে মাঝে তাদের মনোমালিন্যের কারণ হতো। এমনকি একটি বিতর্কে নু'মান মু'তাযেলী বিচারকরূপে তাফতাহানীর বিপক্ষে ফয়সালা করেন। যার ফলে তিনি খুবই মর্মান্বিত হন। কেননা, তাফতাহানী সকলের কাছেই খ্যাতিমান ব্যক্তিরূপে মর্যাদা পেয়ে আসছিলেন, আর জুরজানী ছিল ছাত্রতুল্য। এছাড়া তৈমুর লং-এর দরবারে মীর সাযিদ্ শরীফ তাফতাহানীর হাত ধরেই এসেছিলেন। ইত্যাদি বহুবিধ কারণে তাঁর মর্ম বেদনা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যান। চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তিনি আর পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেননি।

অবশেষে ৭৯২ হিজরির ২২-শে মহররম রোজ সোমবার সমরকান্দে ইন্তেকাল করেন। সেখানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কারো মতে তাঁর ইন্তেকাল সন ৭৯১ হিজরি আবার কারো মতে ৭৯৭ হিজরি। তবে প্রথমোক্ত মতই বিশ্বস্ত।

মাযহাব : মীর সাযিদ্ শরীফ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এটা নিশ্চিত আল্লামা তাফতাহানী সম্পর্কে দু'টি মত পাওয়া যায়। এক. হানাফী মাযহাবের অনুসারী, দুই. শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। উভয় মতের সমর্থনে দলিল রয়েছে, তবে তাঁর হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার পক্ষে মতামত বেশি জোরালো।

শেষকথা : আল্লামা তাফতাহানী (র.) ছিলেন তাঁর যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইলমের প্রতিটি শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ ও অতুলনীয়। তিনি তাঁর জ্ঞানকে উত্তরসূরিদের মাঝে রেখে যাওয়ার জন্য বহু কিতাব রচনা করেন। তাঁর কিতাব ও ইলমের মাধ্যমে তিনি আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর কীর্তির জন্য উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا مَنْ شَرَحَ صُدُورَنَا لِتَلْخِصِ الْبَيَانِ فِي إِبْضَاحِ الْمَعَانِي وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا
بِلَوَامِجِ التَّبْيَانِ مِنْ مَّطَالِجِ الْمَثَانِي -

অনুবাদ : আমরা আপনার প্রশংসা করছি, হে মহান সত্তা! যিনি মর্মকে সুস্পষ্ট করার সাথে সাথে মনের ভাবকে সংক্ষেপে প্রকাশের জন্য আমাদের বক্ষকে উন্মোচিত (অর্থাৎ আমাদের আত্মাকে প্রস্তুত) করেছেন। আর আমাদের অন্তঃকরণকে এমন সুস্পষ্ট ও প্রমাণসমৃদ্ধ বয়ান দ্বারা আলোকিত করেছেন, যা কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এটি **حَمْدٌ** থেকে উদ্ভূত, **مضارع معروف**-এর **جمع متكلم**-এর সীগাহ। **قَوْلُهُ نَحْمَدُ** শব্দের অর্থ হলো **بِاللِّسَانِ لِلْجَمِيلِ** অর্থাৎ কারো সুন্দর গুণাবলির প্রশংসা মুখের ভাষা দ্বারা করা। **يا** শব্দটি **حرف ندا**।

شَرَحَ (বাব فتح) অর্থ- খোলা, উন্মোচন, উন্মুক্ত করা ইত্যাদি। তবে এখানে প্রস্তুত বা তৈরি করা অর্থে ব্যবহার হতে পারে। **صُدُورٌ** শব্দটি **صَدَرَ**-এর বহুবচন, অর্থ- বুক বা বক্ষ। তবে এখানে রূপক অর্থে বুক দ্বারা বুকের অভ্যন্তরীণ কলব, তারপর কলব দ্বারা রুহ বা আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। **تَلْخِصُ** শব্দের অর্থ- সংক্ষেপকরণ। পরিভাষায় **الْخَالِي** **هُوَ الْكَلَامُ الْفَصِيحُ الْمُتَعَرِّبُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ** (অতিরিক্ত ও অনর্থক কথা থেকে মুক্ত বাক্য)-কে তালখীস বলা হয়।

الْبَيَان : শব্দের অর্থ- প্রকাশ করা, বর্ণনা করা। পরিভাষায় **الْبَيَانُ** মনের ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষ যে সাবলীল কথা বলে, তাকে **بيان** বলা হয়। **إِبْضَاحِ** শব্দের অর্থ- সুস্পষ্ট করা, প্রকাশ করা। **نور** শব্দটি **نَوَّرَ** (বাব تفعيل)-এর একটি **فعل**, অর্থ- আলোকিত করা, আলো দান করা। **لَوَامِجِ** শব্দটি **لَوَمٌ**-এর বহুবচন। অর্থ- আলো দানকারী যেমন : চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। **تَبْيَان** শব্দের অর্থ- প্রমাণসমৃদ্ধ বয়ান। **لَوَامِجِ التَّبْيَانِ**-এর মধ্যে **إِصْافَةُ الْمُشَبَّهِ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ** হয়েছে, অর্থাৎ এমন বয়ান যা নক্ষত্রের মতো পথহারাকে পথ দেখায়।

مَطَالِجِ : শব্দটি **مَطْلَعٌ**-এর বহুবচন। অর্থ- তারকারাজি উদয়ের স্থান। এখানে কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য-যেগুলোকে তারকারাজির উদয়ের স্থানের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কেননা, যেমন উদয়স্থান থেকে তারকারাজি উদিত হয় তেমনি আয়াতসমূহ থেকে অর্থ ও মর্ম প্রকাশ পায়।

الْمَثَانِي : শব্দটি **مَثْنِي**-এর বহুবচন। অর্থ- দুই দুই অথবা যা বারবার পাঠ করা হয়। এখানে কুরআন উদ্দেশ্য।

نَحْمَدُكَ এই ইবারতের দ্বারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রশংসা উদ্দেশ্য। তবে তো এখানে **حَمْدٌ** শব্দের পরিবর্তে **شُكْرٌ** শব্দটি ব্যবহার করা যেত। কেননা, **شُكْرٌ** নিয়ামতের পরিবর্তেই ব্যবহার হয়। কিন্তু লেখক কেন **حَمْدٌ**-কে ব্যবহার করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, তিনি তিনটি কারণে এখানে এরূপ করেছেন।

১. পবিত্র কুরআনুল কারীমের অনুসরণ করার জন্যে। কারণ কুরআন **الْحَمْدُ** দ্বারা শুরু হয়েছে,

২. হাদীসের উপর আমল করার জন্যে। কেননা, হাদীসে আছে যে, **كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يَبْدَأْ بِإِنِّهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ** অর্থাৎ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ **اللَّهُ** বা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয় না তা অপূর্ণাঙ্গ,

৩. প্রশংসা করার জন্যে **شُكْرٌ** শব্দের চেয়ে **حَمْدٌ** শব্দটি বেশি কার্যকর। কেননা, **شُكْرٌ** তো মুখ দ্বারা হতে পারে আবার মুখ ছাড়াও হতে পারে। যেমন অন্তর দ্বারা এবং আচার-আচরণ দ্বারা। **شُكْرٌ**-এর এ দু' প্রকার প্রকাশ্য নয় এবং এতে

প্রকাশ থাকে যে, মুসান্নিফ (র.) তাঁর খুতবায় **بَلَاغَةُ - فَصَاحَةُ** শব্দদ্বয় দ্বারা কিতাবের পরিভাষাগত শব্দের প্রতি, **الْبَيَانُ** দ্বারা কিতাবের বিষয়ের প্রতি এবং **تَلْخِيصُ - اِبْتِصَاحُ** দ্বারা কিতাবের বিষয়ের প্রতি এবং **اَلْاَعْجَازِ**, **تَبْيَانُ**, **اَلْاَعْجَازِ** এসব শব্দ দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বড় বড় কিতাবের নামের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِ دَلَائِلُ إِعْجَازِهِ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ -

অনুবাদ : আর আমরা দরুদ ও সালাম পেশ করছি আপনার নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, যাঁকে বালাগাতের সূক্ষ্ম-বিষয়াদি সমৃদ্ধ মু'জিয়া দ্বারা শক্তিশালী ও প্রমাণিত করা হয়েছে।

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ نُصَلِّي : **مَضَارِعُ**-এর **يَبَابُ تَفْعِيلٍ** : **قَوْلُهُ نُصَلِّي** -দোয়া। রাসূল ﷺ-এর হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- **إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيَجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطَرًا** -উক্ত হাদীসের শেষাংশে **فَلْيَصِلْ** শব্দটি দোয়া করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে কুরআনে **وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ** (এ আয়াতটিও) দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীতে **صَلَاةٌ** শব্দটি **مَجَازٍ مَّرْسَلٍ** হিসাবে নামাজ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা, নামাজের মধ্যেও দোয়া আছে। কোনো কোনো অভিধানবেত্তার মতে **صَلَاةٌ** শব্দটি বিভিন্ন দিকে নিসবত করা হলে তার অর্থ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে-

১. **صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ** -**صَلَاةٌ** শব্দটি আল্লাহর দিকে নিসবত করা হলে এর অর্থ হবে- রহমত। যেমন-
২. যদি এর নিসবত ফেরেশতার প্রতি হয় তবে এর অর্থ হবে- **اسْتِغْفَارٌ** বা ক্ষমা প্রার্থনা করা, দোয়া করা।
৩. আর যদি তা মুমিনের প্রতি নিসবত করা হয়, তাহলে অর্থ হবে- রহমত অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৪. আর যদি পশু-পাখির প্রতি নিসবত হয়, তবে এর অর্থ হবে- তাসবীহ পাঠ করা।

قَوْلُهُ نَبِيٍّ : **نَبِيٍّ** শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো **أَنْبِيَاءُ** অর্থ- নবী বা আল্লাহর বার্তাবাহক, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। **نَبِيٍّ** শব্দটির **كَلِمَةُ** **نَبِيٍّ** তে হামযা ছিল, একে **يَا** দ্বারা পরিবর্তন করে **يَا**-কে **يَا**-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। **نَبِيٍّ** শব্দটির মূল হলো **نَبَأٌ** এর অর্থ- উঁচু হওয়া ও সংবাদ দেওয়া। নবীগণ সংবাদ দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন, এ জন্যে তাঁদেরকে **نَبِيٍّ** বলা হয়।

مُحَمَّدٌ : অর্থ- অধিক প্রশংসিত, এটি রাসূল ﷺ-এর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত নাম।

الْمُؤَيَّدِ : এটি **تَأْيِيدٌ** অর্থ- সাহায্য করা, শক্তিশালী করা। **الْمُؤَيَّدِ** : এটি **مَفْعُولٌ** (এর **بَابُ تَفْعِيلٍ**) : **مُحَمَّدٌ**-এর মধ্যে এটি **صِفَتٌ** হয়েছিল।

دَلَائِلُ শব্দটি **ذَلِيلٌ**-এর বহুবচন, যেমন **وَصِيدٌ**-এর বহুবচন **وَصَائِدٌ** তবে **فَعِيلٌ**-এর বহুবচন **فَعَائِلٌ**-এর ওজনে হওয়া **خِلَافٌ قِيَاسٍ** (নিয়ম বহির্ভূত)।

কেউ কেউ বলেন, এটা **دَلَالَةٌ**-এর বহুবচন।

إِعْجَازٌ : শব্দের অর্থ হলো- অন্যকে অক্ষম করে দেওয়া। এখানে **مُعْجِزَةٌ** শব্দটি **إِعْجَازٌ**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **مُعْجِزَةٌ** বা অলৌকিক ঘটনা হলো মানুষের সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির উর্ধ্বে কিছু, যা মানুষকে তার মোকাবিলা করতে অক্ষম সাব্যস্ত করে। **مُعْجِزَةٌ** নবীর সত্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং ইবারত অর্থের দিক থেকে এমন **دَلَائِلُ صِدْقِهِ** অর্থাৎ তাঁর সত্যতার প্রমাণ দ্বারা তাকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

قَوْلُهُ بِأَسْرَارِ الْبَلَاغَةِ : এখানে **أَسْرَارٌ** শব্দটি **سِرٌّ**-এর বহুবচন, অর্থ- গুপ্ত রহস্য বা ভেদ। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐসব বিষয়, যাকে **حَالٌ** চায়। **أَسْرَارٌ** বলার কারণ, যেহেতু জ্ঞানী লোক ছাড়া অন্য কেউ এগুলো সম্পর্কে অবগত নয়, তাই এগুলোকে **أَسْرَارٌ** বলা হয়েছে।

بَلَاغَةٌ : এর অর্থ- **مُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ** : **بَلَاغَةٌ** -এর অর্থ- বাক্য সাবলীল হওয়ার সাথে সাথে **مُقْتَضَى حَالٍ**-এর অনুযায়ী হওয়া।

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُحْرِزِينَ قَصَبَاتِ السَّبْقِ فِي مِضْمَارِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَرَاعَةِ وَبَعْدُ
فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ الْغَنِيِّ مَسْعُودُ بْنُ عُمَرَ الْمَدْعُوُّ بِسَعْدِ التَّفْتَازَانِي
هَدَاهُ اللَّهُ سَوَاءَ الطَّرِيقِ -

অনুবাদ : এবং (দরুদ ও সালাম) তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের প্রতি, যারা সাবলীন বাচন ও শ্রেষ্ঠত্বের ময়দানে বিজয়ী হয়েছেন। হামদ ও সালাতের পর, অমুখাপেক্ষী মহান আল্লাহর প্রতি অধম ও মুখাপেক্ষী বান্দা অর্থাৎ মাসউদ ইবনে ওমর ওরফে সা'দ তাফতায়ানী আল্লাহ তাঁকে সরলপথ প্রদর্শন করুন-

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ الْمُحْرِزِينَ : এটি অল এবং اصْحَاب থেকে صفت হয়েছে, مُحْرِزِينَ শব্দটি مُحْرِز-এর বহুবচন, অর্থ হলো- অধিকর্তা বা অধিকারী।
قَوْلُهُ قَصَبَاتِ السَّبْقِ : শব্দটি قَصَبَة-এর বহুবচন, قَصَبَة বলা হয় ঐ ছোট তীরকে যা প্রতিযোগিতার ময়দানের শেষপ্রান্তে পুঁতে রাখা হয়। এ জন্য যে, অশ্বারোহীদের মধ্যে যে বিজয়ী হবে সেই সে তীরটি নেবে।

سَبْقٍ অর্থ- বিজয়ী হওয়া। সুতরাং قَصَبَاتِ السَّبْقِ-এর অর্থ ঐ তীর যা বিজয়ী হওয়ার উপর চিহ্ন বহন করে।
مِضْمَارٍ অর্থ- প্রতিযোগিতার মাঠ। যেহেতু تَضْمِير করা ঘোড়া সে ময়দানে দৌড়ানো হতো, তাই একে مِضْمَار বলা হয়। تَضْمِير অর্থ হলো, প্রতিযোগিতার জন্যে কোনো একটি ঘোড়া নির্বাচন করে এটিকে প্রথমে খাইয়ে মোটাতাজা করা, তারপর সেটাকে বন্ধ ঘরে রেখে চর্বি কমিয়ে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করা।

خُلُوصُ الْكَلَامِ مِنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ - অর্থ- প্রকাশিত হওয়া, স্পষ্ট হওয়া। পরিভাষায় فَصَاحَتْ বলা হয়-
وَصُغْفُ تَالِيْفٍ وَتَنَافُرُ كَلِمَاتٍ অর্থাৎ কোনো একটি বাক্য وَصُغْفُ تَالِيْفٍ থেকে মুক্ত হওয়া- কালামটি ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে।

الْبَرَاعَةُ : শব্দের অর্থ হলো উচ্চ মর্যাদা লাভ করা, সমসাময়িক লোকদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা।
بَعْدُ : শব্দটি এখানে مِنْهُ-এর উপর مَبْنِي, এর مَضَى إِلَيْهِ শাব্দিকভাবে উহা হলেও মনে মনে আছে। অর্থাৎ بَعْدُ الْغِنَى وَالصَّلَاةُ-এর অর্থ-
تَكْلِم-এর অর্থ- এখানে مُسَانِنِيف-এর صِيغَه ব্যবহার করেছেন; অথচ তিনি খুতবা শুরু করেছিলেন تَكْلِم-এর অর্থ-
قَوْلُهُ-এর মধ্যে الْغَائِبِ إِلَى الْغَائِبِ হলো। এখানে এ الْغَائِبِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো
গিব-এর মাধ্যমে আবদিয়াত বা দাসত্বের পরাকাষ্ঠা রাক্বুল আলামীনের সামনে পেশ করা।

الْفَقِيرُ : শব্দটি فَعِيل-এর ওজনে مشبه এবং مِبَالِغَه-এর জন্যে আসে। فَقَرٍ অর্থ হলো- মুখাপেক্ষিতা।
سُتَرَاং فَقِيرٍ অর্থ হবে সব সময় ও চরম মুখাপেক্ষী, মূলত মানুষ মাত্রই সকলে আল্লাহর প্রতি সর্বদা চরম মুখাপেক্ষী। যেমন,
আল্লাহর বাণী- اللَّهُ إِلَيْنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ - অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী।

قَوْلُهُ إِلَى اللَّهِ الْغَنِيِّ : এ ইবারতের মধ্যে الْغَنِيِّ শব্দটি আল্লাহর صَفَت (সিফত)। অর্থ হলো- অমুখাপেক্ষী।
মহান আল্লাহ যাবতীয় প্রয়োজনের উর্ধ্বে। তাই তাঁর কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই।

عَطْفُ بَيَانٍ : মুসান্নিফ (র.)-এর নাম, এটি الْعَبْدُ الْفَقِيرُ থেকে بدل অথবা بَيَان হয়েছে।
الْمَدْعُوُّ بِسَعْدِ التَّفْتَازَانِي : তিনি সা'দ উদ্দীন তাফতায়ানী নামে খ্যাত ও পরিচিত ছিলেন।

تَفْتَازَانٍ : বর্তমানে ইরানের খুরাসানের অন্তর্গত একটি জনপদের নাম। (তাঁর জন্ম : ৭১২ হি. ইন্তেকাল : ৭৯১ হি.)
هَدَايَةٍ : قَوْلُهُ هَدَاهُ اللَّهُ سَوَاءَ الطَّرِيقِ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- রাস্তা দেখানো, هَدَايَةٍ শব্দটির সাধারণত দু'টি

مَفْعُول হয়ে থাকে, এর মধ্যে দ্বিতীয় মفعুল-এর প্রতি هَدَايَةٍ শব্দটি কখনো حرف جر-এর সাহায্যে متعدي হয়, কখনো
إِنْصَالٍ إِلَى الْمَطْلُوبِ-এর প্রতি متعدي হয়। দ্বিতীয় প্রকারের هَدَايَةٍ-এর অর্থ হলো
كَأَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ : আর প্রথম অর্থাৎ حرف جر-এর সাহায্যে হলে তার অর্থ হবে
تَطَرُّقُ إِلَى الْمَوْصُولِ : অর্থাৎ বাক্যটি অর্থগতভাবে
এরূপ হবে- هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى الطَّرِيقِ السَّيْرِ الْمُسْتَقِيمِ

৫. مجردة বলা হয় ঐ-استعارة-কে, যার মধ্যে-مُشبه-এর কোনো সংশ্লিষ্ট জিনিসকে উল্লেখ করা হয়। যেমন-فَإِذَا قُلُّ اللّٰهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ এ আয়াতে لباس হলো مُشبه আর مُشبه হলো ক্ষুধা ও ভয়ের সময় মানুষের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, আর اذاقه হলো-مُشبه-এর مناسب।

৬. مطلقه বলা হয় এই-استعارة-কে, যার মধ্যে مشبه به ও مشبه-এর মধ্যে কোনোটার সংশ্লিষ্ট বিষয়কে উল্লেখ করা হয় না। যেমন-يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ

৭. اصلية বলা হয় এই-استعارة-কে, যার মধ্যে مستعار বা مشبه টা اسم হয় এবং مشتق হয় না। যেমন-ضلال-এর জন্য ظلام এবং هدى-এর জন্য نور ব্যবহার করা হয়; ظلام এবং نور উভয়টিই ইসমে জামেদ।

৮. تبعية বলা হয় এই-استعارة-কে, যার মধ্যে مشبه বা মুশাব্বাহ বিহী فعل অথবা حرف কিংবা اسم مشتق হয়ে থাকে। উপরোক্ত আলোচনার পর আমাদের উদ্দিষ্ট ইবারত التَّحْقِيقُ حَلَاوةِ-এর استعارة টি এখন আলোচনা করা হচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এতে দু' ধরনের ইসতি'আরা হতে পারে-

১. إِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ إِلَى سُوْتَرَاءِ-এখানে مشبه আর تحقيق হলো حلاوة-এর تحقيق। সূত্রাং এখানে إِضَافَةُ الْمُشَبَّهِ হয়েছে। আর اذاه যেহেতু مشبه তথা حلاوة-এর مناسب এ জন্যে এটি استعارة مرشحة হয়েছে।

২. تحقيق হলো مشبه আর تحقيق হচ্ছে কোনো সুমিষ্ট জিনিস, যেমন মধু ইত্যাদি। উহ্য مشبه به। অতএব استعارة بالكناية হলো।

আর حلاوة-কে-تحقيق-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা استعارة تخيلية হলো। আর مشبه به-এর مناسب বা সংশ্লিষ্ট জিনিস হলো اذاه এ হিসেবে এটি استعارة مرشحة।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, حلاوة শব্দটি তার হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি এটি لذة-এর অর্থেও হতে পারে। তখন مشبه به হবে لذة যা উহ্য আছে, এ মতে এটি استعارة بالكناية হলো।

প্রকাশ থাকে যে, اذاه حلاوة التحقيق এবং هَذَا اللَّهُ سَوَاءُ الطَّرِيقِ, বাক্যদ্বয় মুসান্নিফ (র.)-এর قول অর্থাৎ (فَيَقُولُ) এবং তার مقوله অর্থাৎ (فَيَقُولُ) এর মাঝে জুমলায়ে মু'তারিযা বা জুমলায়ে দু'আইয়্যাহ।

فَيَقُولُ (فَيَقُولُ) দ্বারা অতীত বুঝা যাওয়া সত্ত্বেও (فَيَقُولُ) বাক্যটি মুসান্নিফ (র.) এনেছেন পূর্ববর্তী বাক্য (فَيَقُولُ) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে। তা ছাড়া مطول লিখার সময়কাল যে নিকট অতীত নয় সে কথাও (فَيَقُولُ) দ্বারা বুঝা যায়।

تَلْخِصُ الْمِفْتَاحُ এটি একটি কিতাবের নাম, এটি আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান কাযবীনী কর্তৃক প্রণীত। এটি আল্লামা সাক্বাকীর الْعُلُومُ الْمُفْتَاخُ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের সার-সংক্ষেপ এবং مختصر المعاني-এর মতন।

تَلْخِصُ الْمِفْتَاحُ হলো مرجع-এর "এ" অর্থ-অমুখাপেক্ষী করা "এ" অর্থ-অগ্নিত্তে : قَوْلُهُ وَأَغْنَيْتَهُ بِالْأَضْبَاحِ عَنْ الْمِضْبَاحِ : এখানে مرجعও তালখীসুল মিসফতাহ। শব্দের অর্থ-ভোর বেলায় প্রবেশ করা বা সকাল হওয়া; কিন্তু استعارة হিসেবে মুসান্নিফ (র.)-এর কিতাব مُطَوَّلُ উদ্দেশ্য। الْمِضْبَاحُ শব্দের অর্থ-প্রদীপ বা বাতি, এখানে استعارة হিসেবে তালখীসুল মিসফতাহের অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থকে বুঝানো যায়।

এ। مطول হলো مرجع-এর "এ" অর্থ-আমানত রাখা, : قَوْلُهُ وَأَوْدَعْتَهُ غَرَائِبَ نَكْتٍ سَحَحَتْ بِهِ الْإِنْتَظَارُ : এখানে استعارة হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত তিনি তাঁর কিতাবকে বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে উপমা দিয়েছেন। যেহেতু এখানে مشبه উল্লেখ নেই; বরং مشبه উল্লেখ আছে, তাই এটি استعارة بالكناية। আর نكتة-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخيلية হয়েছে। উল্লেখ্য যে, اودع শব্দ দ্বারা তার প্রদত্ত نكتة-গুলো যে খুবই মূল্যবান এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মূল্যবান জিনিসই তো আমানত রাখা হয়। তা ছাড়া আমানত (اودع) দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, বিষয়গুলো তার সৃষ্টি। কেননা, মানুষ তার মালিকানাধীন জিনিসই আমানত রাখে।

এটি : قَوْلُهُ غَرَائِبَ نَكْتٍ : এটি مرکب اضافی। এতে مشبه-কে-مشبه-এর প্রতি اضافত করা হয়েছে। বাক্যটি মূলত এরূপ : قَوْلُهُ وَأَوْدَعْتَهُ نَكْتًا غَرَائِبًا : এখানে النكت শব্দটি নক্তে-এর বহুবচন। نكت শব্দের অর্থ হলো-কাঠি বা লাঠি দ্বারা জমিনে কিছু তাল্লাশ করা বা অঙ্কন করা। যেহেতু এরূপ করার দ্বারা সে স্থানটিতে একটি নতুন রঙ বের হয়, যা পূর্বের রঙের ব্যতিক্রম। অতএব, কোনো বাক্যের স্বাভাবিক বা সাধারণ অর্থের চেয়ে ভিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ হলে, তাকে نكتে বলা হবে। অথবা نكتে দ্বারা গবেষণাপ্রসূত কোনো অর্থ উদ্দেশ্য। মানুষ চিন্তা করার সময় যেহেতু মাটিতে কাঠি দ্বারা আঁকাআঁকি করে, তাই চিন্তাপ্রসূত অর্থকে نكتে বলা হয়। উভয় সুরতে مجاز مرسل হয়েছে। غرائب শব্দটি غريبة-এর বহুবচন, অর্থ হলো-বিরল বা দুর্লভ জিনিস।

قَوْلُهُ سَبَّكَهَا يَدُ الْاَفْكَارِ : এখানে سَبَّكَ শব্দটি বাবে ضرب ও نصر হতে, শব্দের অর্থ হলো- স্বর্ণ বা রূপা জাতীয় খনিজ পদার্থ গালিয়ে ফর্মায় ঢালাই করা। سَبَّكَ الْاَفْكَارِ অর্থ হলো কথাকে উত্তমরূপে পরিমার্জিত করল। এখানে টেলে দেওয়া বা বের করে দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। يَدُ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো اَيْدِي অর্থ- হাত। اَلْاَفْكَارُ শব্দটি فِكْرُ-এর বহুবচন। অর্থ- চিন্তা-ফিকির। يَدُ الْاَفْكَارِ-এর মধ্যে اَلْمُشَبَّهِ بِهِ-এর মধ্যে اَلْمُشَبَّهِ بِهِ হয়েছে। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনাকে উপমা দেওয়া হয়েছে হাতের সাথে। তখন سَبَّكَهَا যেহেতু مشبه-এর مناسب জিনিস, তাই مناسبة হবে। আবার এ বাক্যটিতে অন্যভাবেও استعارة হতে পারে। এর বর্ণনা এরূপ যে, فِكْرُ বা চিন্তাকে উপমা দেওয়া হয়েছে স্বর্ণকারের সাথে। যেহেতু مشبه به উহ্য তাই এটি استعارة بالكناية আর يَدُ বা হাতকে اَلْاَفْكَارُ استعارة-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা تَخْيِيلِيَّة استعارة হয়েছে। আর سَبَّكَ হলো مشبه به-এর مناسب তাই এটি استعارة مضاف اليه-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলবাক্যটি হলো اَفْكَارِيَّيْهَا اَفْكَارِيَّيْهَا-এর পরিবর্তে আনা হয়েছে।

ثُمَّ رَأَيْتُ الْكَثِيرَ مِنَ الْفَضْلَاءِ وَالْجَمَّ الْغَفِيرَ مِنَ الْأَذْكِيَاءِ يَسْأَلُونَنِي صَرْفَ الْهِمَّةِ نَحْوَ اخْتِصَارِهِ وَالْإِقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ مَعَانِيهِ وَكَشَفِ اسْتَارِهِ لَمَّا شَاهَدُوا مِنْ أَنَّ الْمُحَصِّلِينَ قَدْ تَقَاصَرَتْ هِمَمُهُمْ عَنْ اسْتِطْلَاعِ طَوَالِعِ أَنْوَارِهِ وَتَقَاعَدَتْ عَزَائِمُهُمْ عَنْ اسْتِكْشَافِ خَبَيَّاتِ أَسْرَارِهِ .

অনুবাদ : তারপর জ্ঞানী সমাজের একটি বড় অংশ ও মেধাবীদের অনেককেই আমি দেখতে পেলাম যে, তারা আমার কাছে এই (ব্যাখ্যাগ্রন্থ **مُطَوَّل**) সংক্ষিপ্ত করার এবং (তালখীসুল মিফতাহ)-এর মর্ম উদ্ঘাটন ও জটিল স্থানগুলোর সমাধান করার জন্য মানসিক প্রত্নুতি (ও কার্যকর পদক্ষেপ) নেওয়ার জন্য আবেদন করছে। কেননা, তারা ছাত্র ও জ্ঞান অন্বেষীদের উক্ত **مُطَوَّل** কিতাবের জ্যোতির্ময় বিষয়গুলো অনুধাবন ও আয়ত্ত করতে অক্ষম হতে দেখেছিলেন এবং উক্ত কিতাবের রহস্যময় ভেদগুলোর মর্ম উদ্ঘাটনে তাদের (ছাত্রদের) দৃঢ়প্রত্যয়ও ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

ব্যখ্যা বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ : এ বাক্যে **ثُمَّ** (حرف عطف) দ্বারা **قَدْ شَرَحْتُ**-এর উপর **عطف** করা হয়েছে। অর্থাৎ **مُطَوَّل** লেখার বেশ কিছুদিন পর আমি দেখলাম।

قَوْلُهُ الْفَضْلَاءِ : শব্দটি **فَضِيل**-এর বহুবচন। **فَضِيل** বা **فَاضِل** শব্দের অর্থ ঐ ব্যক্তি, যিনি বিদ্যা অথবা বুদ্ধি কিংবা সততার গুণে গুণান্বিত। এখানে উদ্দেশ্য জ্ঞানীজন।

قَوْلُهُ الْجَمَّ الْغَفِيرَ : **الْجَم** শব্দটি **لَجُوم** থেকে নির্গত, অর্থ- বেশি বা আধিক্য। **الْغَفِير**-এর বহুবচন। **الْغَفَر** শব্দটি **الْغَفِير** থেকে নির্গত। অর্থ- ঢেকে দেওয়া।

এখানে **الْجَمَّ الْغَفِير** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বিশাল দল, যা আধিক্যের কারণে ভূমিকে ঢেকে দেয়।

قَوْلُهُ الْأَذْكِيَاءِ : **الْأَذْكِي**-এর বহুবচন। অর্থ-পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দ্রুত বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি।

قَوْلُهُ صَرْفَ الْهِمَّةِ نَحْوَ اخْتِصَارِهِ : **صَرْف** শব্দটি এখানে **مَصْدَر** রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- ফিরানো, রূপান্তর বা দিগান্তর করানো। **الْهِمَّة** শব্দের আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা ও প্রত্যয়, এর প্রচলিত অর্থ হচ্ছে মনের একটি অবস্থা, যার পরে কোনো কিছু অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়। এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যে **استعارة مكيمة** হয়েছে। **هَمَّة**-কে উপমা দেওয়া হয়েছে এমন বাধ্য উটনীর সাথে, যার বাগডোর তার মালিকের হাতে রয়েছে। মালিক তাকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাতে পারে। আর **صَرْف**-কে **هَمَّة**-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা **استعارة تخبيلية** হয়েছে।

نَحْو-এর অর্থ হলো- দিক, প্রকার, সদৃশ ও ইচ্ছা ইত্যাদি। এখানে দিক-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اخْتِصَار শব্দটি **خَصَرَ** (কোমর) থেকে নির্গত, এর ব্যবহার এরূপ (**فُلَانٌ اخْتَصَرَ**) অমুক তার কোমরে হাত রাখল।

اخْتِصَارَ الْكَلَامِ অর্থ- সে তার কথাকে সংক্ষিপ্ত করল এবং অনর্থক কথা পরিত্যাগ করল। এখানে কথা সংক্ষিপ্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **نَحْو** **اخْتِصَارِهِ** এতে **استعارة بالكناية** ও **استعارة تخبيلية** হয়েছে। প্রথমত **اخْتِصَار**-কে একটি স্থানের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু **به** **مشبه** উহা, তাই এটি **استعارة بالكناية** এরপর **نَحْو**-কে **اخْتِصَار**-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা **تخبيلية** হয়েছে।

قَوْلُهُ الْإِقْتِصَارَ عَلَى بَيَانِ مَعَانِيهِ : এখানে **إِقْتِصَار**-এর অর্থ হলো- কোনো মৌলিক বিষয়কে কাটছাট ও অতিরিক্ত বিষয় বাদ দিয়ে পেশ করা। **إِقْتِصَار** শব্দটির **عطف** হয়তো **اخْتِصَار**-এর উপর হয়েছে অথবা এটি **بِشَأْنِهِ**-এর **منقول** উভয় অবস্থায় **إِقْتِصَار** শব্দটি **إِقْتِصَار**-এর **تفسير** বা ব্যাখ্যা হবে। অর্থাৎ **مُطَوَّل**-এর সব বিষয়বস্তু অল্প কথায় প্রকাশ করবেন, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং তালখীসুল মিফতাহ-এর মর্ম উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এ দাবি সীমাবদ্ধ থাকবে।

এ-এর বোলায় সেসব
কথা প্রযোজ্য, যা تَقَاعَدَتْ-এর বোলায় হয়েছে। تَقَاعَدَتْ-এর অর্থ- বসে যাওয়া ও স্থবির হওয়া।
إِصْفَاءُ-এর অর্থ- খোলা, উন্মুক্ত করা ও প্রকাশ করা বা উন্মুক্ত করতে চাওয়া। خَبِيَّاتِ أَسْرَارِهِ : এ বাক্যে أَسْرَارِهِ-এর অর্থ- গোপন বা লুক্কায়িত বিষয়। خَبِيَّاتِ : শব্দটি خَبِيَّةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- গোপন বা লুক্কায়িত বিষয়। أَسْرَارُ শব্দটি
إِلَى الْمَوْصُورِ-এর অর্থ- ভেদ ও রহস্য বা গোপন করে রাখা বস্তু। خَبِيَّاتِ أَسْرَارِهِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَطْوُولُ কিতাবের সূক্ষ্ম
ও জটিল বিষয়গুলো। এখানে এ বিষয়গুলোকে خَبِيَّاتِ أَسْرَارِ-এর সাথে তাক্ষরী বা উপমা দেওয়া হয়েছে এবং شبه
উল্লেখ আছে, তার شبه উহ্য। অতএব, এখানে مصراحة হবে।

: أَغْنَى : শব্দটি -এর অর্থ- সম্প্রসারিত করা, লম্বা করা। (بَابُ نَصْرِ) مَدَّ يَمُدُّ مَدًّا : قَوْلُهُ وَمَدُّوا أَعْنَاقَ الْمَسْخِ
 অর্থঃ কোনো-هُوَ تَبْدِيلُ صُورَةٍ بِصُورَةٍ أَذْنَى مِنَ الْأَوَّلَى : الْمَسْخُ : শব্দের অর্থ- ঘাড়, শ্রীবা। : أَغْنَى-এর বহুবচন, অর্থ-
 জিনিসের পূর্বের আকৃতি পরিবর্তন করে মন্দ আকৃতি দান করা। উক্ত বাক্যে استعارة مصرحة হয়েছে। তা এরূপ যে,
 প্রথমত কিতাবের বিষয়বস্তু ছিনিয়ে নেওয়ায় مَسْخ-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, এরপর-مَشَبَه-কে উহ্য রেখে مَشَبَه
 -কে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, লেখক রচনাচোরদের সংক্ষিপ্তকরণকে مَسْخ বলে ব্যক্ত করেছেন। এতে এ

نَضَبَ : শব্দটি ضرب ও نصر থেকে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো- শুকিয়ে যাওয়া, শুষে যাওয়া ও ফুরিয়ে যাওয়া।
وَأَنَّ هَذَا الْفَيْنَ : এটি مستحقن الطبايع -এর উপর عطف হয়েছে, এ বাক্যটি দ্বারা এই বিষয়ের তথ্য বালাগাতের আলোচনা নিঃশেষ হওয়া বুঝানো হয়েছে। এই فُن ফুরিয়ে যাওয়াকে نَضَوْبُ অর্থাৎ পানি শুকিয়ে যাওয়ার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এখানে مشبه به উল্লেখ আছে, আর مشبه হলো উহ্য। অতএব, এটি استعارة مصرحة হয়েছে। مَاءٌ : (مشبه)
مرشحة -এর উপমা দেওয়া হয়েছে। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, এই فن-এর মূল্যবান মাসআলাগুলোকে পানির সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, অতএব استعارة مصرحة হয়েছে। نَضَبَ : (مشبه)
مرشحة -এর উপমা দেওয়া হয়েছে।

এক কথায় ইলমে বালাগাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং ধারকগণ নিঃশেষ হয়েছেন, সেই সাথে এর বিদ্যাপীঠগুলোও নিঃশেষ হতে চলেছে।

وَأَمَّا الْآخِذُ وَالْإِنْتِهَابُ فَاَمْرٌ يَرْتَحُ بِهِ اللَّبِيبُ فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ
وَكَيْفَ يُنْهَرُ عَنِ الْأَنْهَارِ السَّائِلُونَ وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ثُمَّ مَا زَادَتْهُمْ
مُدَافَعَتِي إِلَّا شَغَفًا وَغَرَامًا وَظَمًا فِي هَوَاجِرِ الطَّلَبِ وَأَوَامًا فَانْتَصَبْتُ لِشَرْحِ الْكِتَابِ
عَلَى وَفْقِ مُقْتَرِحِهِمْ ثَانِيًا وَلِعِنَانِ الْعِنَايَةِ نَحْوِ اخْتِصَارِ الْأَوَّلِ ثَانِيًا مَعَ جُمُودِ الْقَرْنِخَةِ بِصَرِّ
الْبَلَبَاتِ وَخُمُودِ الْفِطْنَةِ بِصَرِّ التَّكْبَاتِ وَتَرَامِي الْبُلْدَانِ بَيِّ وَالْأَقْطَارِ وَنُبُو الْأَوْطَانِ
عَنِّي وَالْأَوْطَارِ حَتَّى طَفِيفَتْ أَجُوبُ كُلِّ أَغْبَرَ قَاتِمِ الْأَرْجَاءِ وَأُحِرَّرَ كُلُّ سَطْرٍ مِنْهُ فِي شَطْرِ مَنْ
الْغَبْرَاءِ شِعْرٌ فَيَوْمًا بِحَزْوَى وَيَوْمًا بِالْعُقَيْقِ * وَيَالْعُذِيبِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِالْخَلِيفَاءِ -

অনুবাদ : আর (রচনাচোরদের) চুরি এবং লুটপাটের বিষয়টি তো এমন যে, এর দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ লাভ করেন। কেননা, সম্মানিত ব্যক্তিদের পান-পাত্রের মধ্যে জমিনেরও অংশ রয়েছে। তা ছাড়া নদ-নদী থেকে কি করে পানিপ্ৰার্থীদের বাধা দেওয়া যায়? (অর্থাৎ বাধা দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়) আর এ ধরনের সফলতা লাভ করার জন্য কর্মোদ্যোগীদের কাজ করে যাওয়া উচিত। এরপর আমার পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান তাদের আগ্রহ, প্রচণ্ড তৃষ্ণা এবং দ্বি-প্রহরের উত্তপ্ত পিপাসাকেই বাড়িয়ে তুলল। অতঃপর পুনরায় আমার ইচ্ছার বাগডোরকে প্রথম ব্যাখ্যাগ্রন্থটি (مَطْوَرٌ) সংক্ষিপ্ত করার প্রতি ঘুরিয়ে নিয়ে তাদের চাহিদা মোতাবেক কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার জন্য প্রস্তুতি নিলাম, অথচ তখন বিপদাপদের কারণে আমার চেতনাবোধ স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং দুঃখ-কষ্টের ঝড়ো হাওয়ায় মেধা নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন শহর ও দূরদূরান্ত এলাকাতে অবস্থান এবং আমার স্বদেশ ও প্রয়োজনাদি থেকে বহুদূরে থাকার কারণে (ও মেধা ক্ষয়িত হচ্ছিল) অবশেষে (অবস্থা এমন হলো যে,) পৃথিবীর ধূলিময় বিশাল এলাকাগুলো অতিক্রম করতে লাগলাম এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থের একেকটি লাইন জমিনের একেক অংশে লিখতে লাগলাম (কবিতা) একদিন হাযওয়াতে, একদিন ওকাইক, আর একদিন ওয়াইব ও আরেকদিন খুলাইসাতে (এভাবে বিভিন্ন স্থানে কিতাব লিখতে লাগলাম)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

.... قَوْلُهُ أَمَّا الْآخِذُ وَالْإِنْتِهَابُ فَاَمْرٌ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) তাঁর কাছে কিতাব লেখার আবেদনকারীদের আবেদনের উত্তর দিচ্ছেন এই বলে যে, আপনারা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার আবেদন যে দুটি কারণে জানিয়েছেন তার মধ্যে একটি হলো রচনাচোরদের চুরি করার ভয়ে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এ কারণটি আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এদের চুরি তো আমার খুশির কারণ। এ ধরনের চুরিতে জ্ঞানীলোক খুশি হয় একথা ভেবে যে, তার লেখা থেকে অন্যেরা সাহায্য গ্রহণ করছে। لُبَابُ : শব্দটি لَابِيبٌ থেকে নির্গত। অর্থ- খুশি হওয়া। اللَّبِيبُ : শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো لُبَابُ ।

قَوْلُهُ فَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ : এটি জৈনিক কবির কবিতার খণ্ডাংশ। পুরো কবিতাটি এরূপ-

شَرِبْنَا شَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبٍ * كَذَلِكَ شَرَابُ الطَّيِّبِينَ طَيِّبٌ
شَرِبْنَا وَاهْرَقْنَا عَلَى الْأَرْضِ جُرْعَةً * وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ

অর্থাৎ * আমরা উত্তম পানীয় উত্তম ব্যক্তির কাছে পান করেছি, আর উত্তম ব্যক্তিদের পানীয় এরূপ উৎকৃষ্টই হয়ে থাকে।

* আমরা পান করলাম আর এক ঢোক মাটিতে ঢেলে দিলাম। কেননা, সম্মানিত ব্যক্তিদের পানপাত্র থেকে জমিনের একটি অংশ পাওনা আছে।

শেষের পঙক্তিটিতে তাশবীহ বা উপমার ব্যবহার হয়েছে। যেমন-**الْكَرَامُ** (সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ)-এর সাথে নিজেকে উপমা দিয়েছেন। **كَأَنَّ**-কে **مُطَوَّلٌ**-এর সাথে এবং **مُنْتَجِلِينَ**-কে **أَرْضُ**-এর সাথে উপমা দিয়েছেন। এতে **مُشَبَّه**-কে উল্লেখ করে **مُشَبَّه**-কে উহা রাখা হয়েছে **مُصْرَحَة** হিসেবে।

مَا يُنْهَرُ كَيْفَ يُنْهَرُ : **كَيْفَ** এখানে **استفهام** হয়েছে। **كَيْفَ** দ্বারা **كَيْفَ يُنْهَرُ** উদ্দেশ্য, অর্থ- বাধা/ধমক দেওয়া যায় না। **نَهَرَ** (باب فتح) অর্থ- প্রার্থী বা ভিক্ষুককে ধমকানো/বাধা দেওয়া। **الْأَنْهَارُ** : শব্দটি **نَهَرَ**-এর বহুবচন। অর্থ- নদ-নদী **السَّائِلُونَ** শব্দটি **سَأَلَ**-এর বহুবচন। অর্থ- প্রার্থী, ভিক্ষুক। পুরো বাক্যের অর্থ হলো- কি করে আমি এই প্রার্থীদের (রচনাচোরদেরকে) বাধা দিবো নদীসমূহ অর্থাৎ **مُطَوَّلٌ** থেকে। বাক্যটির দু'টি স্থানে **مُصْرَحَة** হয়েছে। **مُطَوَّلٌ**-কে **أَنْهَارٌ**-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। **أَنْهَارٌ**-কে **مُشَبَّه** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর রচনাচোরদের **سَائِلُونَ**-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, (**مُشَبَّه** به) **سَائِلُونَ**-কে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, **مُطَوَّلٌ** একটি কিতাবকে অনেক নদীর সাথে উপমা দেওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, **مُطَوَّلٌ**-এর মধ্যে জ্ঞানের অনেক শাখা-প্রশাখার সমাবেশ ঘটেছে। তাই একটি কিতাবই যেন অনেক কিতাবের সমষ্টি, আর অনেকগুলো কিতাব উপকার লাভের দিক থেকে অনেক নদ-নদীর সমতুল্য।

قَوْلُهُ وَلِيُنْثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ : এটি পবিত্র কুরআনুল মাজীদে একটি আয়াতের অংশ বিশেষ। আয়াতে **لِيُنْثِلَ** দ্বারা চূড়ান্ত সফলতা তথা জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমল করার কথা বলা হয়েছে। এখানে **لِيُنْثِلَ** দ্বারা **الْأَنْتِهَابِ** উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রচনাচোরদের কথা নকল ও লুটপাটের দ্বারা দুনিয়াতে মর্যাদা ও খ্যাতি এবং আখিরাতে ছুওয়ার লাভের জন্য মুসান্নিফের মতো লোকদের কাজ করে যাওয়া উচিত। কাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

تَرَاحَى ثُمَّ : **قَوْلُهُ ثُمَّ مَا زَادَتْهُمْ مُدَافَعَتِي إِلَّا شَغَفًا وَغَرَامًا وَظَمًا فِي هَوَاجِرِ الطَّلِبِ وَأَوَامًا** বুঝায়। অর্থাৎ **مُعْطُونَ** থেকে **مُعْطُونَ** অনেক বিলম্ব সংঘটিত হয়েছে একথা বুঝায়। এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার অনাগ্রহের পরে তাদের আগ্রহ বেড়েছে একথা বুঝানো হয়েছে। **مُدَافَعَةٌ** এটি **مُفَاعَلَة**-এর মাসদার। এর দ্বারা তাদের বারবার নিবেদন করা এবং মুসান্নিফ (র.)-এর বারবার প্রত্যাখ্যান করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। **شَغَفٌ** অর্থ- আসক্তি, মোহ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ অর্থ **شَغَانٌ** থেকে উদ্ভূত। **بَلَا** হয় অন্তরস্থ চামড়া বা পর্দাকে। **الْغَرَامُ** অর্থ- অনুরাগ, মোহ, কামনা।

ظَمًا অর্থ- পিপাসা। এখানে **مُشَبَّه** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর **مُشَبَّه** হলো অতি আগ্রহ।

إِضَافَةٌ **هَوَاجِرِ الطَّلِبِ**-এর মধ্যে **هَوَاجِرُ** শব্দটি **هَاجِرَةٌ**-এর বহুবচন। **هَاجِرَةٌ** প্রচণ্ড গরমকালের দ্বিপ্রহরকে বলা হয়। **هَوَاجِرُ** বা আবদারের মধ্যে **رَغْبَةٌ** **فِي الطَّلِبِ الشَّبِيهِ بِالْهَوَاجِرِ**-এর মূলবাক্যটি এরূপ- **الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبِّهِ** আগ্রহ এত বেশি যে, আবদার তাদের মনের মধ্যে পুষে রাখাটা দ্বিপ্রহরের সময়ের মতোই কষ্টকর। **أَوَامٌ** : শব্দের অর্থ- তৃষ্ণার তীব্রতা। এটি **ظَمًا** বা তৃষ্ণার জন্য আবশ্যিক। এখানে **أَوَامٌ** দ্বারা এর **مَلَزُومٌ** উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আকর্ষণ ও আগ্রহ।

قَوْلُهُ فَانْتَصَبْتُ لِشَرْحِ الْكِتَابِ عَلَى وَفْقِ مُفْتَرِحِهِمْ ثَانِيًا :

انْتَصَبْتُ : অর্থ- দাঁড়ানো, এখানে প্রস্তুতি গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

شَرْحًا বা **إِنْتِصَابًا** : **مُصَوِّف** এর **صِفَت** সে **مُصَوِّف** টি হলো **مُصَوِّف** টি হলো **قَوْلُهُ عَلَى وَفْقِ مُفْتَرِحِهِمْ** আর **الْإِفْتِرَاحُ** অর্থ- কোনো জিনিস কারো কাছে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া চাওয়া। **ثَانِيًا** : অর্থ- দ্বিতীয়বার। এটি **تَرْكِيب**-এর মধ্যে **مُصَدَّر**-এর দ্বিতীয় **صِفَت**, সেই **مُصَوِّف** টি হলো **إِنْتِصَابًا** বা **شَرْحًا** তবে এটি **ظَرْف** হওয়ারও সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ **ثَان** **فِي زَمَان** ।

হিসেবে استعارة بالكناية -কে আঙনের সাথে خُمُودُ الْفِطْنَةِ (এক) استعارة হয়েছে। এর মধ্যে দুটি استعارة হয়েছে। আর (দুই) خُمُودُ -কে فِطْنَةٌ (বা) مُشَبَّه -এর জন্য সাবিত করা হয়েছে استعارة تخيلية হিসাবে। আর (দুই) فِطْنَةٌ -এর জন্য সাবিত করা হয়েছে استعارة تخيلية হিসাবে। আর (দুই) خُمُودُ -কে فِطْنَةٌ (বা) مُشَبَّه -এর জন্য সাবিত করা হয়েছে استعارة تخيلية হিসাবে। আর (দুই) فِطْنَةٌ -এর জন্য সাবিত করা হয়েছে استعارة تخيلية হিসাবে।

مُشَبَّه-কে উহ্য রাখা হয়েছে এবং مُشَبَّه-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা استعارة تخبيلية হয়েছে। আর التَّبْدَانُ-এর পূর্বে একটি مضاف উহ্য আছে। অর্থাৎ أَهْلُ التَّبْدَانِ উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন শহরে স্থানান্তর হলে রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন হয়, তাই أَقْطَارُ শব্দটিকে التَّبْدَانُ-এর পর জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ثُمَّ لَمَّا وَفَّقْتُ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَأْيِيدِهِ لِإِتِّمَامٍ وَقَوَّضْتُ عَنْهُ خِيَامَهُ بِالْإِخْتِيَامِ
بَعْدَمَا كَشَفْتُ عَنْ وَجْهِهِ خَرَائِدِهِ اللَّثَامَ وَوَضَعْتُ كُنُوزَ الْفَرَائِدِ عَلَى طَرْفِ الثُّمَامِ فَجَاءَ
بِحَمْدِ اللَّهِ كَمَا يَرُوقُ التَّوَاطُّرُ وَيَجْلُو صَدَأُ الْأَذْهَانِ وَيُرْهِفُ الْبَصَائِرَ وَيُضِيئُ الْبَابَ
أَرْبَابَ الْبَيَانِ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ وَالْهُدَايَةُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ
حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

অনুবাদ : অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার জন্য তৌফিকপ্রাপ্ত হলাম এবং তার মনোরোমা চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে দেওয়ার পর এবং মহামূল্যবান মনিমুক্তার খনি ঘাসের ডগায় রেখে দেওয়ার পর এ ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিপূর্ণতার তাঁবু কেটে দিলাম। তখন আল্লাহ তা'আলার অপার মেহেরবানীতে এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি এমন রূপ লাভ করল যে, তা চক্ষুসমূহকে শীতল করে দেয়, মেধার মরীচিকা দূর করে দেয়। আর জ্ঞানকে শানিত করে। এটি বয়ানশাস্ত্রবিদদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে আলোকিত করে, তৌফিক (ভালো কাজ করার যোগ্যতা) ও হিদায়েত (সঠিক পথ প্রদর্শন) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেই (লাভ করার আশা) গুরুত্রে এবং শেষে। একমাত্র তাঁর উপরই যাবতীয় ভরসা। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধাতা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে ظرف-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে شرط-এর অর্থ রয়েছে। وَفَّقْتُ (বাব তفعیل) وَفَّقْتُ থেকে নির্গত। تَوَفَّقْتُ শব্দের অর্থ হলো- ভালো কাজের জন্য উপায়, উপকরণ অনুকূল করে দেওয়া। عَوْنُ : অর্থ- সাহায্য করা, تَأْيِيدُ অর্থ- সাহায্য করা। إِتِّمَامٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এই মুখতাসারুল মা'আনীকে সম্পূর্ণ করা। এ বাক্য দ্বারা বুঝা গেল যে, কিতাব লেখার পর এ ভূমিকাটি লেখা হয়েছে।

تَقْوِيضُ-থেকে নির্গত। অর্থ- কোনো নির্মাণ বা অবকাঠামো ধ্বংস না করে ভেঙ্গে ফেলা। এখানে استعارة تبيعية হিসেবে দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْهُ-এর مرجع-এর কিতাবের দিকে। خِيَامٌ : শব্দটি خَيْمَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ- তাঁবু। إِخْتِيَامٌ বা পরিপূর্ণ করা। বাক্যটিতে দু' ধরনের استعارة হয়েছে। প্রথমত কিতাবটিকে পূর্ণ করার পূর্বে মূল্যবান জিনিস (যেমন- নববধূ যা তাঁবুর ভেতরে রয়েছে)-এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অতএব এটি استعارة بالكناية। এরপর استعارة بالكنية উহা রয়েছে, অতএব এটি استعارة بالكناية। এরপর استعارة تخييلية দ্বারা সাব্যস্ত করার দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এরূপ, যখন আমি এ কিতাবটি শেষ করতে সক্ষম হলাম এবং এটিকে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকার পর সবার সামনে প্রকাশ করলাম, যেমন সাধারণ লেখকের বেলায় ঘটে থাকে।

لِثَامٍ : خَرَائِدُ-এর বহুবচন। অর্থঃ সুন্দরী রমণী, لَثَامٌ : শব্দটি خَرَائِدُ-এর মতো। এর অর্থ- নেকাব যা মূলত চেহারায় দেওয়া হয়। মুসান্নিফ (র.) এ বাক্যে কিতাবের মাসআলাসমূহকে সুন্দরী রমণীর সাথে উপমা দিয়েছেন। مشبهه বাক্যে উল্লেখ্য আছে, অতএব এটি استعارة مصرحة হয়েছে। এরপর مشبه به-এর দুই مناسب যথা وَجْهٌ এবং لَثَامٌ-কে مرشحه হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিতাবের মাসআলাসমূহ থেকে দুর্বোধ্যতার আবরণ তুলে দিয়েছেন।

بُام এক ধরনের ঘাস। এটি দেড়শত সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ هُوَ حَسْبِي وَنَعْمَ الْوَكِيلُ : তিনি আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই উত্তম কর্মবিধাতা ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا وَالشُّكْرُ فِعْلٌ يَنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لِكُونِهِ مُنْعِمًا سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْجَنَانِ أَوْ بِالْأَرْكَانِ فَمَوْرِدُ الْحَمْدِ لَا يَكُونُ إِلَّا اللِّسَانُ وَمَتَّعَلَّقُهُ يَكُونُ النِّعْمَةُ وَغَيْرُهَا وَمَتَّعَلَّقُ الشُّكْرِ لَا يَكُونُ إِلَّا النِّعْمَةُ وَمَوْرِدُهُ يَكُونُ اللِّسَانُ وَغَيْرُهُ فَالْحَمْدُ أَعَمُّ مِنَ الشُّكْرِ بِاعْتِبَارِ الْمُتَعَلِّقِ وَآخِصُّ بِاعْتِبَارِ الْمَوْرِدِ وَالشُّكْرُ بِالْعَكْسِ.

অনুবাদ : পরম দয়াময়-মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা (আল্লাহ তা'আলা জন্য।) হামদ বলা হয় সম্মান প্রদানের উদ্দেশ্যে কারো জন্য মুখে প্রশংসা করা। চাই (সে প্রশংসা) অনুগ্রহ (পাওয়ার)-এর সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা অনুগ্রহ ছাড়াই হোক। শূকর (কৃতজ্ঞতা) বলা হয়, এমন কোনো কাজকে যা দ্বারা অনুগ্রহকারীর প্রতি তার দানের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা জানানো হয়। চাই সে প্রশংসা মুখে করা হোক অথবা অন্তরের (কৃতজ্ঞতার) দ্বারা হোক কিংবা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হোক। সুতরাং হামদ-এর প্রকাশস্থল শুধুমাত্র মুখ এবং হামদ-এর সম্পর্ক অনুগ্রহ হতে পারে আবার অনুগ্রহ ছাড়াও হতে পারে। আর শূকর-এর সম্পর্ক শুধুমাত্র অনুগ্রহের সাথে। আর শূকর-এর প্রকাশস্থল মুখ এবং মুখ ছাড়াও হতে পারে। সুতরাং হামদ শব্দটি শূকর থেকে অধিক ব্যাপক) مُتَّعَلِّقُ-এর বিবেচনায় এবং آخِصُّ প্রকাশের স্থলের হিসেবে। আর শূকর শব্দটি এর উল্টো অর্থাৎ শূকর প্রকাশের স্থান হিসেবে হামদ থেকে আঁম আর مُتَّعَلِّقُ হিসেবে শূকর খাস।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

ع : قَوْلُهُ الْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا মুসান্নিফ (র.) হামদ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। হামদ শব্দের অর্থ- প্রশংসা করা। পরিভাষায় হামদ বলা হয় মুখে কারো গুণকীর্তন করা সম্মান দানের উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা বুঝা গেল ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছলে কারো প্রশংসাসূচক শব্দ বললে সেটা হামদ হয় না। সুতরাং বিদ্রূপাত্মক প্রশংসা হামদ-এর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেল।

খ : قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِالنِّعْمَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا : এ অংশ দ্বারা শূকর শব্দটি হামদ থেকে পৃথক হয়ে গেল, কারণ শূকর (বা কৃতজ্ঞতা) নিয়ামতের বিনিময়ে হয়। এখানে জেনে রাখা দরকার যে, হামদ-এর সাথে পাঁচটি জিনিসের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ১. হামিদ বা প্রশংসাকারী, ২. مَحْمُود বা যার প্রশংসা করা হয়, ৩. مَحْمُود عَلَيْهِ যে বিষয়টির কারণে প্রশংসা করা হয়, ৪. مَحْمُود بِهِ বা যে বিষয় দ্বারা প্রশংসা করা হয়, ৫. صِغَةُ বা যে শব্দ হামদ-এর বিষয়বস্তুর উপর দালালাত করে। যেমন কেউ বলল زَيْدٌ عَالِمٌ এখানে যে ব্যক্তি এ কথাটি বলেছে সে হলো হামিদ আর زَيْدٌ হলো مَحْمُود। এ কথাটি زَيْدٌ-এর জ্ঞান-গরিমার কারণে বলা হয়েছে। তাই তার জ্ঞান-গরিমা হবে مَحْمُود عَلَيْهِ। আর زَيْدٌ عَالِمٌ এ বাক্যটির مِنْهُمْ হলো পরিভাষায় كَلِّی বলা হয় এমন বিষয়বস্তুকে যা সত্তাগতভাবে অনেকের বেলায় প্রযোজ্য অথবা এর বিষয়বস্তুর কল্পনা করা হলে এর মধ্যে অনেক أَفْرَادٌ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন حَيَوَانٌ-এর অনেকগুলো أَفْرَادٌ রয়েছে, যাদের উপর حَيَوَان শব্দটি প্রযোজ্য হয়। এরপর আমরা দু'টি كَلِّی-এর মাঝে কি ধরনের নিসবত হতে পারে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। দু'টি كَلِّی-এর মাঝে চার ধরনের নিসবত পাওয়া যায়।

১. نَسَبَتْ تَسَاوًى অর্থাৎ দু'টি كَلِّی পরস্পর এমন যে, প্রত্যেক كَلِّی-কে অপর كَلِّی-এর প্রত্যেক أَفْرَادٌ-এর উপর প্রয়োগ করা যায়। যেমন- نَاطِقٌ وَ إِنْسَانٌ

২. مطلق عام نسبت অর্থাৎ দুই কলী পরস্পর এমন যে, একটি অপরটির প্রত্যেক افراد-এর মাঝে পাওয়া যায়; কিন্তু অপরটি প্রথমটির প্রত্যেক افراد-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রথমটি হলো عام (ব্যাপক) আর অপরটি হলো خاص। যেমন-حَيَوَانُ ও حَيَوَانُ-এর মধ্যে সমস্ত إِنْسَانُ-এর মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু সমস্ত إِنْسَانُ-এর মধ্যে حَيَوَانُ পাওয়া যায় না।

৩. عام خاص من وجه অর্থাৎ দুই কলী পরস্পর এমন যে, কোনোটি অপরটির সব افراد-এর উপর প্রয়োগ হয় না; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি পাওয়া যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরটি পাওয়া যায় না। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরটি পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথমটি পাওয়া যায় না। যেমন إِنْسَانُ ও أَبْيَضُ উভয়টি সাদা মানুষের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। কালো মানুষের মধ্যে إِنْسَانُ পাওয়া যায়; কিন্তু সাদা পাওয়া গেল না। সাদা বকের ক্ষেত্রে أَبْيَضُ পাওয়া যায়; কিন্তু মানুষ পাওয়া যায় না।

৪. نسبت تباين অর্থাৎ দু'টি কলী পরস্পর বিপরীত ধর্মী একটি অপরটির افراد-এর উপর প্রয়োগ হয় না। যেমন-حجر (পাথর), شجر (গাছ)।

এ ভূমিকার পর এখন حَمْدُ ও شُكْرُ (দু'টি কলী)-এর পরস্পর نسبت নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তিনটি বিষয় যথা-مَوْزُ (প্রকাশের উৎস) مُتَعَلِّقُ (সম্পর্ক) ও مَفْهُومُ (অর্থ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে حَمْدُ এবং شُكْرُ-এর মাঝে তিন ধরনের নিসবত বা সম্পর্ক পাওয়া যায়। প্রথমত مَوْزُ বা প্রকাশের উৎস হিসেবে উভয়ের মাঝে عام خاص مطلق-এর নিসবত; حَمْدُ হিসেবে مَوْزُ হলো عام। কেননা, شُكْرُ প্রকাশের উৎস তিনটি যথা মুখ, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আর حَمْدُ হলো عام خاص। কেননা, এর প্রকাশের উৎস শুধু মুখ। দ্বিতীয়ত مُتَعَلِّقُ বা সম্পর্ক হিসেবেও উভয়ের মাঝে عام خاص مطلق-এর নিসবত। তবে حَمْدُ হিসেবে مُتَعَلِّقُ হলো عام। কেননা, حَمْدُ অনুগ্রহের বিনিময়ে হয়, আবার অনুগ্রহ না পেয়েও হতে পারে; কিন্তু شُكْرُ শুধুমাত্র অনুগ্রহ পাওয়ার পরই হয়ে থাকে। তৃতীয় مَفْهُومُ হিসেবে عام خاص من وجه-এর নিসবত। সূত্রাং যদি কোনো ব্যক্তি অনুগ্রহ পেয়ে মুখে প্রশংসা করে, তাহলে এটি حَمْدُ ও شُكْرُ উভয়ই হলো। আর যদি অনুগ্রহ না পেয়ে মুখে প্রশংসা করে, তাহলে শুধুমাত্র حَمْدُ হলো শُكْرُ হলো না। আর যদি অনুগ্রহ পেয়ে অন্তর অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রশংসা করে, তাহলে এটি شُكْرُ হলো, কিন্তু حَمْدُ হলো না। উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) এ প্রকারটির কথা তাঁর কিতাবে আলোচনা করেননি।

لَقَدْ هُوَ اسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ وَالْعُدُولِ إِلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ وَتَقْدِيمِ الْحَمْدِ بِإِعْتِبَارِ أَنَّهُ أَهَمُّ نَظَرًا إِلَى كَوْنِ الْمَقَامِ مَقَامَ الْحَمْدِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَافِ فِي تَقْدِيمِ الْفِعْلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ عَلَى مَا سَيَجِيءُ وَإِنْ كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمُّ نَظَرًا إِلَى ذَاتِهِ -

অনুবাদ : আল্লাহর তা'আলার জন্য, আল্লাহ এমন সত্তার নাম, যার অস্তিত্ব অত্যাৱশ্যকীয়, যিনি যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত। জمله اسمیه-কে গ্রহণ করা হয়েছে (অর্থঃ বিরামহীন ও অব্যাহতভাবে প্রশংসা)-এর অর্থ দানের জন্য। আর حَمْد শব্দটিকে (এর উপর) مقدم করা হয়েছে এ জন্য যে, এ مَقَام (স্থান, কাল ও পাত্র) হিসেবে এখানে حَمْد টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন كَشَاف কিতাবের লেখক মহান আল্লাহর বাণী أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ-এর মধ্যে فَعْل টি (এর নামের উপর) مقدم করার ক্ষেত্রে একই মত পোষণ করেছেন, (অর্থঃ স্থান, কাল ও পাত্র অনুসারে فَعْل টিকে আগে আনাই অধিক যুক্তিযুক্ত।) যদিও আল্লাহ তা'আলার নাম তাঁর সত্তা হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

اللَّهُ শব্দের আলোচনা। মুসান্নিফ (র.) এ ইবারত দ্বারা اللَّهُ শব্দের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটি اسم আর اسم শব্দটি হরফ ও ফে'লের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। আবার এটি উপাধি, উপনাম ও গুণবাচক নাম বা صفة-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রথমোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। উপাধি, উপনাম ও গুণবাচক নামের বিপরীতে ব্যবহার হয়েছে বলা যায়। তবে গুণবাচক নাম বা صفة-এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে বলাই শ্রেয়। এটি اسم আর علم বা নামের মধ্যে যেহেতু অন্য কেউ কোনো শরিক থাকতে পারে না তাই এটি জরী হবে, কলী হবে না। অর্থ- যার অস্তিত্ব আবশ্যকীয়। اَلْمُسْتَجِيعُ لِجَمِيعِ الْمَحَامِدِ : অর্থ- যিনি সমস্ত প্রশংসা ও গুণের অধিকারী।

الْحَمْدُ - প্রশ্নটি হলো- একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। (র.) মুসান্নিফ দ্বারা ইবারতের দ্বারা : قَوْلُهُ وَالْعُدُولُ إِلَى الْجُمْلَةِ : এ ইবারতের দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো- الْحَمْدُ-এর বাক্যটি এখানে جمله اسمیه কিন্তু মূলে এটি جمله فعلیه ছিল। কেননা, এটি حَمْدًا ছিল। حَمْدًا শব্দটি হয়তো বা উহা فعل-এর مفعول به অথবা উহা فعل-এর مفعول مطلق। এরপর-عَمْدًا-এর-نصب-কে ফেলে দিয়ে তাতে رفع দিয়ে এটিকে جملیه اسمیه-এ পরিণত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন এমন করা হলো?

এর জবাব : إِيَّاهُ... إِلَى الْعُدُولِ দ্বারা দেওয়া হচ্ছে। জবাবের সারকথা হলো- মূল কিতাব তথা তালখীসুল মিস্যতাহ-এর লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহর প্রশংসাকে সব সময় ও অব্যাহতভাবে করা, আর এই উদ্দেশ্য جملیه দ্বারা সাধিত হয়। কেননা, جملیه কোনো কাজকে স্থায়ী ও সব সময়ের জন্য বুঝায়, আর فعلیه নির্দিষ্ট কালের মধ্যে একটি কাজ সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়।

قَوْلُهُ تَقْدِيمِ الْحَمْدِ بِإِعْتِبَارِ الْخ : এ ইবারতটিকেও আরো একটি প্রশ্নের উত্তর বলা যায়। প্রশ্নটি হলো- যুক্তি বা আকলের দাবি হলো যে, اللَّهُ ও الْحَمْد শব্দটির মধ্য থেকে اللَّهُ-কে আগে আনা অর্থঃ এভাবে বলা যে, اللَّهُ الْحَمْد, কেননা, اللَّهُ শব্দটি একটি সত্তাকে বুঝায়, আর حَمْد সেই সত্তার একটি গুণ। আর উল্লেখ্য যে, সবসময় সত্তা গুণাবলির উপর مقدم হয়, তাই বাক্য বিন্যাসের মধ্যে সত্তা আগে, আর গুণাবলি তারপর হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তা করা হলো না কেন? এর উত্তর : تقديم الْحَمْد দ্বারা দেওয়া হচ্ছে। উত্তরের সারকথা হলো, اللَّهُ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নাম হওয়ার কারণে যদিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু কিতাব সংকলনের প্রারম্ভে তাঁর حَمْد বা প্রশংসা করা জরুরি। সুতরাং স্থান, কাল ও

পাত্র হিসেবে **حَمْد** টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মোটকথা, **اَللّٰهُ** শব্দটি সর্বস্থানেই আল্লাহর নাম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। আর **حَمْد** শব্দটি বিশেষ কারণে এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, এখানে **حَمْد** -কে আগে আনা, তাই **حَمْد** -কে আগে আনা হয়েছে। যদি কোনো স্থানে দু'টি জিনিস দুই পৃথক কারণে গুরুত্ববহ হয়, তখন **حَمْد** -এর আশ্রয় নেওয়া হয়। আর **حَمْد** যাকে দাবি করে সেটিকে আগে এনে সমস্যার সমাধান করা হয়। যেমনটি **كُشَان** (তাকসীরগ্রন্থ)-এর লেখক আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (র.) **اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي الْخ** -এর মধ্যে **اَقْرَأْ** ফে'লটিকে **رَبِّكَ** -এর আগে আনার সম্পর্কে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এখানে **اَقْرَأْ** ফে'লটি আল্লাহ তা'আলার নামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এটি **اَقْرَأْ** -এর স্থান। অর্থাৎ এখানে **اَقْرَأْ** শব্দটি বলাই উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলার নাম মূল উদ্দেশ্য নয়।

মোটকথা, যেমনটি এখানে বিশেষ কারণে **اَقْرَأْ** শব্দটিকে **رَبِّكَ** -এর আগে আনা হয়েছে, তেমনি মূল কিতাবের লেখক আল্লামা আবুল মা'আলী জালালুদ্দীন একটি বিশেষ গুরুত্বের কারণে **حَمْد** শব্দটি **اَللّٰهُ** -এর আগে এনেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় যে কথাগুলো এসেছে এর সারসংক্ষেপ হচ্ছে—

ক. **حَمْد** বলা হয় সম্মান দানের উদ্দেশ্যে কারো মুখে প্রশংসা করা। এটা নিয়ামত ভোগ করেও হতে পারে, আবার নিয়ামত ভোগ না করেও হতে পারে।

খ. **شُكْر** বলা হয় সম্মান দানের উদ্দেশ্যে নিয়ামতদাতার প্রশংসা কথা/কাজ/অন্তর দ্বারা আদায় করা।

গ. প্রকাশস্থল হিসেবে হামদ খাস আর শুকর আম (ব্যাপক)। পক্ষান্তরে **مُتَعَلِّق** হিসেবে শুকর খাস এবং হামদ আম।

ঘ. **اَللّٰهُ** শব্দটি এমন সত্তার নাম, যিনি ওয়াজিবুল উজুদ (যাঁর অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং না থাকা অসম্ভব) এবং যিনি যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী, এটি তাঁর নামবাচক শব্দ গুণবাচক শব্দ নয়।

ঙ. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** বাক্যটিকে **جَمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ** রূপে ব্যবহার করা হয়েছে স্থায়িত্ব ও সর্বদা বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ প্রশংসা বিরামহীন ও অব্যাহতভাবে করার জন্য।

চ. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** এ বাক্যে **حَمْد** -কে **اَللّٰهُ** শব্দের উপর **مَقْدَم** করা হয়েছে **حَمْد** -এর দাবি অনুযায়ী।

عَلَى مَا أَنْعَمَ أَيْ عَلَى إِنْعَامِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمِ بِهِ إِيَّاهُمَا لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنِ
الْإِحَاطَةِ بِهِ وَلِئَلَّا يَتَوَهَّمِ اخْتِصَاصُهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ وَعَلَّمَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ
رِعَايَةَ لِبَرَاةِ الْإِسْتِهْلَالِ وَتَنْبِيْهَا عَلَى فَضِيلَةِ نِعْمَةِ الْبَيَانِ مِنَ الْبَيَانِ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ
مَا لَمْ نَعْلَمْ قَدِّمَ رِعَايَةَ لِلْسَّجَعِ وَالْبَيَانُ هُوَ الْمَنْطِقُ الْفَصِيحُ الْمُعْرَبُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ -

অনুবাদ : (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার) তিনি যে নিয়ামত দিয়েছেন তার জন্য। অর্থাৎ তাঁর নিয়ামত দানের জন্য। মুসান্নিফ (র.) مُنْعِمٌ بِهِ (নিয়ামতসমূহের বর্ণনা)-এর উল্লেখ করেননি এ কথা জানানোর জন্য যে, সেগুলোকে আয়ত্ত ও গণনা করতে ভাষা অক্ষম এবং (কতক উল্লেখ করলে) যেন এ ধারণা না জাগে যে, নিয়ামত কিছু জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। এটি হলো خاص-কে-عام-এর উপর عطف করা (এমনটি করা হয়েছে) بَرَاةِ الْإِسْتِهْلَالِ-এর প্রতি লক্ষ্য করে এবং 'বয়ান'-এর নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য مِنَ الْبَيَانِ। এটি মূলত মূল লেখকের (ইবারাতাংশ) مَا لَمْ نَعْلَمْ-এর বয়ান বা ব্যাখ্যা। (مِنْ الْبَيَانِ) এটিকে مَا لَمْ نَعْلَمْ-এর আগে আনা হয়েছে অনুপ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করে। الْبَيَانُ বলা হয় ঐ সাবলীল বক্তব্যকে, যা মনের ভাব প্রকাশ করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখান থেকে মূল কিতাবের লেখক مَحْمُودٌ عَلَيْهِ বা যে কারণে প্রশংসা করা হয়েছে, সেটি উল্লেখ করেছেন। এখানে দু'টি مَحْمُودٌ عَلَيْهِ-এর উল্লেখ করেছেন। (ক) তাঁর নিয়ামত দান। (খ) তিনি আমাদের অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত করেছেন বা শিখিয়েছেন। مَحْمُودٌ عَلَيْهِ-এর সাথে اَلْحَمْدُ-এর সাথে متعلق হয়নি; বরং এর সাথে متعلق উহ্য আছে। সেই উহ্য (كَانَ) -এর সাথে متعلق হয়ে এটি দ্বিতীয় খবর হবে। এ অবস্থায় এ বাক্যটি ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহর সত্তা যেমন حَمْدُ-এর উপযুক্ত, তেমনি তাঁর صفات বা গুণাবলিও حَمْدُ-এর উপযুক্ত। অথবা এটি উহ্য خبر-এর সাথে متعلق আর لَهُ হলো اَلْحَمْدُ-এর সাথে متعلق হয়ে নতুন বাক্য।

مَا : এর ব্যাখ্যা মুসান্নিফ (র.) عَلَى إِنْعَامِهِ-এর দ্বারা করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে مَحْمُودٌ عَلَيْهِ-এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে, مَوْصُوفُهُ বা مَوْصُولُهُ হয়নি। এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, তালখীসুল মিফতাহ -এর মুসান্নিফ (র.) اَلْحَمْدُ-এর অর্থ নিয়ামতসমূহের উপলক্ষ করেননি কেন? এর উত্তর হলো, আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য ও অগণিত। তিনি কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন 'তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতের গণনা করতে চাও তবে তা গণে শেষ করতে পারবে না।' (সূরা ইবরাহীম) সুতরাং আপনি যদি যাবতীয় নিয়ামত উল্লেখ করতে চান, তাহলে তো তা সম্ভব নয়। কেননা, তাঁর নিয়ামত অসংখ্য ও অগণিত, কোনো লেখনী তা লিখে শেষ করতে পারবে না। আর যদি কিছু নিয়ামত উল্লেখ করা হয়, তাহলে তার مُنْعِمٌ بِهِ কিছু নিয়ামতের সাথে খাস হয়ে গেল। যার ফলে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের জন্যই আল্লাহ তা'আলা حَمْدُ-এর উপযুক্ত, অন্য নিয়ামতের জন্য প্রশংসার উপযুক্ত নয়। অথচ এ ধারণাটি সঠিক নয়। অতএব, بِهِ উল্লেখ না করাই যুক্তিযুক্ত।

مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ : এ ইবারতের মূলকথা হলো, علم, শব্দটি معطوف, এর معطوف عَلَيْهِ হলো اَلْحَمْدُ, আর اَلْحَمْدُ-এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সব নিয়ামতের কথা সার্বিকভাবে বলা হয়েছে। আর عَلَّمَ-এর মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ামত (যা নিয়ামতসমূহের একটি) তথা বয়ান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব, معطوف عَلَيْهِ হলো عام আর معطوف হলো خاص।

قَوْلُهُ رِعَايَةً لِّبَرَاةِ الْإِسْتِهْلَالِ وَتَنْبِيْهِهَا الْخ : উহ্য একটি فعل-এর উহ্য ইবারাতটি হলো
عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ-এর অর্থ হলো, علم-কে-انعم-এর উপর عطف করার কারণ হলো দু'টি-

১. بَرَاةٌ-এর প্রতি লক্ষ্য করে।

بَرَاةٌ-এর সংজ্ঞা : কিতাবের শুরুতে লিখা হয়েছে সেখানে দেখুন। এখানে অর্থাৎ ভূমিকাতে بَيَان শব্দটির
দ্বারা بَرَاةٌ-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ২. দ্বিতীয় কারণ হলো بَيَان-এর নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। কেননা, মানুষ ও অন্যান্য
প্রাণীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলোর একটি হলো মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু অন্য প্রাণী তা পারে
না। অতএব, বাক্যটির অর্থ এরূপ হলো-بَرَاةٌ-এর সংজ্ঞা দেওয়া এবং বয়ানের নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার জন্য خاص-কে
عام-এর উপর عطف করা হয়েছে। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, مِنَ الْبَيَانِ-এর مِّن শব্দটি بَيَانِيَّةٌ যা মূলত مَّا لَمْ-এর
نَعْلَم-এর বয়ান বা ব্যাখ্যা।

مَّا لَمْ-এর বয়ান যদি مِنَ الْبَيَانِ-এর বয়ান হয়, তবে এটি তো نَعْلَم-এর পরে আসার কথা; কিন্তু বাস্তবে আগে আনা হলো কেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, مِنَ الْبَيَانِ-এর টিকে سجع অর্থাৎ অনুপ্রাসের জন্য مَّا لَمْ-এর আগে আনা হয়েছে।
سجع অর্থ- অনুপ্রাস। অর্থাৎ দু'টি বাক্যের শেষ একই রকম হওয়া। আগের বাক্যে نَعْلَم-এর শেষাক্ষর মীম (م) مِنَ-এর
শেষাক্ষরও মীম হবে। এতে অনুপ্রাস পাওয়া গেল। আর যদি مَّا لَمْ-এর আগে আনা হলে এ বাক্য : نَعْلَم-এর শেষাক্ষরও মীম হবে। এতে অনুপ্রাস
পাওয়া গেল। আর যদি مَّا لَمْ-এর আগে আনা হলে এ বাক্য : نَعْلَم-এর শেষাক্ষরও মীম হবে। এতে অনুপ্রাস পাওয়া গেল। আর যদি
مَّا لَمْ-এর আগে আনা হলে এ বাক্য : نَعْلَم-এর শেষাক্ষরও মীম হবে। এতে অনুপ্রাস পাওয়া গেল। আর যদি مَّا لَمْ-এর আগে আনা হলে এ বাক্য :
نَعْلَم-এর শেষাক্ষরও মীম হবে। এতে অনুপ্রাস পাওয়া গেল। আর যদি مَّا لَمْ-এর আগে আনা হলে এ বাক্য : نَعْلَم-এর শেষাক্ষরও মীম হবে।

قَوْلُهُ وَالْبَيَانُ هُوَ الْمَنْطِقُ الْفَصِيحُ الْمَغْرُوبُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ : বয়ান অর্থ- সাবলীল বক্তব্য যা মনের ভাব
প্রকাশ করে। সুতরাং মনের ভাব প্রকাশকারী যে কোনো সাবলীল বক্তব্যই হলো বয়ান।

সার সংক্ষেপ :

ক. আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য ও অগণিত, তাই নির্দিষ্ট নিয়ামত উল্লেখ করা হয়নি।

খ. عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ-এর উপর نَعْلَم-এর আত্ম-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে।

গ. নিয়ামতে বয়ানের শ্রেষ্ঠত্ব ও بَرَاةٌ-এর উদ্দেশ্যে বয়ান শিখানোর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ نَّقَطٍ بِالصَّوَابِ وَأَفْضَلُ مَن أُوتِيَ الْحِكْمَةَ هِيَ عِلْمُ الشَّرَائِعِ وَكُلِّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ وَتَرَكَ فَاعِلُ الْإِيتَاءِ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَصْلَحُ إِلَّا لِلَّهِ وَقَضَى الْخِطَابَ أَيْ الْخِطَابَ الْمَفْصُولَ الْبَيِّنَ الَّذِي يَتَبَيَّنُهُ مَن يُخَاطَبُ بِهِ وَلَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ أَوْ الْخِطَابَ الْفَاصِلَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَعَلَى إِلِهِ أَصْلَهُ أَهْلٌ بِدَلِيلٍ أَهْيَلٍ -

অনুবাদ : দরুদ ও সালাম আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি ছিলেন সেই সব লোকদের শ্রেষ্ঠ যাঁরা সত্য ও সঠিক কথা বলেছেন এবং সে সব লোকদের মাঝে সর্বোত্তম যাঁদের হিকমত দান করা হয়েছে। হিকমত হচ্ছে শরিয়তের জ্ঞান এবং ঐ কথা যা হক বা সত্যের অনুকূল বা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ইِتَاء-এর ফاعল বা কর্তাকে (এখানে) উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, এ কাজ (حِكْمَةً) আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো দ্বারা সম্পাদন সম্ভব নয়। এবং (যাদের) সুস্পষ্ট বক্তব্য (দান করা হয়েছে) অর্থাৎ এমন সুস্পষ্ট কথা, যা সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে এবং তার কাছে কথাটি অস্পষ্ট অনুভূত হয় না অথবা এমন বক্তব্য যা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। এবং (দরুদ ও সালাম) তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের প্রতি। 'أَل' শব্দটির মূল হলো أَهْلٌ ; এর প্রমাণ এই যে, এর تَصْغِير হলো أَهْيَلٌ (কেননা-এর দ্বারা শব্দের মূলরূপ প্রতিভাত হয়।)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

شَلَاة শব্দের আলোচনা কিতাবের শুরুতে খুতবার মধ্যে করা হয়েছে, তাই এখানে পুনঃ উল্লেখ করা হলো না। سَيِّدٌ অর্থ- নেতা, সরদার, প্রধান কর্তা ইত্যাদি। এর বহুবচন سَيَّادٌ, سَادَةٌ, سَيَّانِدٌ ব্যবহার হয়। خَيْرٌ শব্দটি أَخَيْرٌ, أَفْضَلُ, أَكْبَرُ-এর কোমল রূপ। এর রূপেই এর ব্যবহার প্রচলিত।

ضَدُّ : শব্দটির অর্থ হলো الصَّوَابُ। থেকে নির্গত, অর্থ- কথা বলা। نَقَطٌ (বাব ضرب) : قَوْلُهُ نَقَطٌ بِالصَّوَابِ : ভুলের বিপরীত যে কোনো সঠিক বা সত্য বিষয়। এখানে মূল কিতাবের লেখক রাসুলে কারীম ﷺ-এর হাজারো প্রশংসনীয় গুণাবলির মধ্য থেকে نَقَطٌ بِالصَّوَابِ বা সত্য বলার গুণটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বয়ানের নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। এ ছাড়া বাক্যটি দ্বারা কুরআনের আয়াত وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ وَيُوحِي -এর প্রতি তَلْمِيح করা হয়েছে। তَلْمِيح হলো বালাগাতের একটি পরিভাষা। তَلْمِيح বলা হয় কথার মাঝে কোনো প্রসিদ্ধ ঘটনা, কবিতা, কিংবা কুরআনের বা হাদীসের বিশেষ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা।

حِكْمَةٌ শব্দের ব্যাখ্যা মুসান্নিফ (র.) বলেন, حِكْمَةٌ বলা হয় শরিয়ত ও আহকাম তথা বিধি-বিধানের জ্ঞানকে এবং ঐ কথাকে, যা সত্য এবং বাস্তবের অনুযায়ী হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, হিকমতের প্রথম ব্যাখ্যাটি خاص আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি عام বা ব্যাপক। সে হিসাবে قَوْلُهُ نَقَطٌ بِالصَّوَابِ বা সত্য বলার গুণটি দ্বারা الْخَاصَّ عَلَى الْغَايَةِ করা হলো। দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উদাহরণ যেমন- এক দু'য়ের অর্ধেক এটি বাস্তবসম্মত কথা কিন্তু শরিয়ত নয়।

قَوْلُهُ تَرَكَ فَاعِلُ الْإِيتَاءِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো- مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ : এ বাক্যটিতে أُوتِيَ ফে'লটি مجهول হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর فاعল-কে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে প্রশ্ন হলো, فاعল-এর إِيْتَاء, ফে'লটি مجهول ব্যবহার করে فاعল-কে উল্লেখ কেন করা হলো না? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, إِيْتَاء, ফে'লটি সুনির্দিষ্ট এবং একজন মাত্র, আর তিনি হচ্ছেন মহান রাসুল 'আলামীন। কেননা, হিকমত বা শরিয়ত দান আল্লাহ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না। সুতরাং যেহেতু إِيْتَاء-এর فاعল লেখক ও পাঠক সবার মনে নির্দিষ্ট, তাই এটিকে উল্লেখ করা হয়নি।

قَوْلُهُ وَفَضَلَ الْخِطَابِ : এটি عطف হবে। অর্থাৎ যাদের হিকমত এবং الْخِطَابِ দেওয়া হয়েছে তিনি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। فَضَلَ الْخِطَابِ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি একটি مصدر متعدی। অতএব, এটি اسم مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তখন ইবারত হবে- الْخِطَابُ الْمَفْضُولُ অথবা এটি اسم فاعل-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তখন ইবারত হবে- الْخِطَابُ الْفَاعِلُ। প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে- এমন কথা যা সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে- সত্য ও মিথ্যার মাঝে প্রভেদকারী। উভয় অবস্থায় فَضَلَ-এর সম্পর্ক الْخِطَابِ-এর সাথে الْمَرْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ হিসেবে। তবে فَضَلَ শব্দটিকে مصدر-এর অর্থে বাকি রাখাও সম্ভব। তখন فَضَلَ-এর اضافত-টি হবে جَزْدُ قَطِيفَةٍ-এর মতো مبالغه হিসাবে। অর্থাৎ এর আমল হবে رَجُلٌ عَدْلٌ-যেমন- فَضَلَ الْخِطَابِ

خِطَابٌ : শব্দের অর্থ- সম্বোধন করা বা সম্বোধনের বাক্য। حِكْمَةٌ وَفَضَلَ الْخِطَابِ শব্দদ্বয় দ্বারা মূল লেখক কুরআনের আয়াত فَضَلَ الْخِطَابِ وَحِكْمَتُهُ-এর প্রতি তালিম করেছেন। الْبَيِّنُ الْأَبْيَنُ : অর্থ- স্পষ্ট ও প্রকাশমান পাওয়া, এটি تَبَيَّنَ-এর অর্থ- স্পষ্ট ও প্রকাশমান পাওয়া, এটি تَبَيَّنَ-এর অর্থ- স্পষ্ট ও প্রকাশমান পাওয়া, এটি تَبَيَّنَ-এর অর্থ- স্পষ্ট ও প্রকাশমান পাওয়া। এমনিভাবে لَا يَلْتَمِسُ শব্দটিও بَيِّن-এর ব্যাখ্যা, التَّبَيُّسُ শব্দের অর্থ- অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত। সূত্রাং لَا يَلْتَمِسُ-এর অর্থ হলো সহজবোধ্য ও সন্দেহযুক্ত।

সার-সংক্ষেপ :

ক. صَلَوة শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। এখানে দরুদ ও দোয়া-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. حِكْمَةٌ শব্দের অর্থ- শরিয়তসম্মত এবং সত্য ও বাস্তবভিত্তিক কথা।

গ. الْخِطَابُ الْفَاعِلُ ২. الْخِطَابُ الْمَفْضُولُ ১.-যথা- فَضَلَ الْخِطَابِ দু' অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

قَوْلُهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْلُهُ أَهْلٌ بِدَلِيلٍ أَهْلٍ : প্রথমত এ কথাটি জানা দরকার যে, آل শব্দের اضافত যমীরের দিকে করা যায় কিনা? এ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, এর اضافত প্রকাশ্য ইসমের দিকে যেমন বৈধ, তেমনি ضمির বা সর্বনামের দিকেও বৈধ। এর দলিল হলো আব্দুল মুত্তালিব-এর একটি পঙ্ক্তি :

أَنْصَرُّ عَلَىٰ آلِ الصَّلِيبِ * وَعَابِدِيهِ الْيَوْمَ الْكُلَّ

أَهْلٌ : বলে মুসান্নিফ (র.) দাবি করছেন যে, آل শব্দের মূল হলো أَهْلٌ, এর-কে হামযা দ্বারা প্রথমে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, تَعْلِيلٌ বা শব্দরূপ পরিবর্তন করা হয় সহজকরণের জন্য, অথচ-কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করলে তা শব্দটি আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেল। উত্তর হলো- এখানে الف দ্বারা পরিবর্তন করাই উদ্দেশ্য (যা পরবর্তীতে হয়েছে।) কিন্তু প্রাথমিকভাবে তা সম্ভব না হওয়াতে-হামযা-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

فُعَيْلٌ : تَصَغِيرُ : বলে মুসান্নিফ (র.) তাঁর দাবির স্বপক্ষে দলিল দিচ্ছেন। দলিলের সারকথা হলো, أَهْلٌ-এর-কে হামযা দ্বারা প্রথমে পরিবর্তন করা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, تَعْلِيلٌ বা শব্দরূপ পরিবর্তন করা হয় সহজকরণের জন্য, অথচ-কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করলে তা শব্দটি আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গেল। উত্তর হলো- এখানে الف দ্বারা পরিবর্তন করাই উদ্দেশ্য (যা পরবর্তীতে হয়েছে।) কিন্তু প্রাথমিকভাবে তা সম্ভব না হওয়াতে-হামযা-এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

خُصَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْرَافِ وَأُولَى الْخَطَرِ الْأَظْهَارِ جَمْعُ طَاهِرٍ كَصَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ
وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ جَمْعُ خَيْرٍ بِالتَّشْدِيدِ أَمَّا بَعْدُ هُوَ مِنَ الظُّرُوفِ الزَّمَانِيَّةِ الْمُبْنِيَّةِ
الْمُنْقَطِعَةِ عَنِ الْإِضَافَةِ۔

অনুবাদ : এর ব্যবহার সম্মানিত এবং অভিজাত ব্যক্তির বেলায় বিশেষভাবে হয়ে থাকে (অর্থ পূত-পবিত্র) শব্দটি **طَاهِرٍ**-এর বহুবচন। যেমন-**أَصْحَابٍ** শব্দটি **صَاحِبٍ**-এর বহুবচন। এবং (দরুদ ও সালাম) তার সৎ ও মহৎ সাহাবীদের প্রতি। **خَيْرٍ** (তাশদীদযুক্ত)-এর বহুবচন। আশ্বা বা 'দ **بَعْدُ** শব্দটি এরূপ **ظرف** মান-এর অন্তর্ভুক্ত, যা মাবনী এবং মুযাফ ইলাইহ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ব্যখ্যা বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ خُصَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْأَشْرَافِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, **أَلٍ** শব্দটি যদিও অর্থগতভাবে ব্যাপক তবু এর ব্যবহার সম্মানিত ও অভিজাত লোকদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। আর **أَهْلٍ** সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। **أَلٍ** ও **أَهْلٍ**-এর মাঝে এটি ছাড়া আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-**أَلٍ** শব্দটির ব্যবহার শুধুমাত্র জ্ঞানসম্পন্নদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, কিন্তু **أَهْلٍ** শব্দটি জ্ঞানহীনের প্রতিও হয়ে থাকে। যেমন-**أَهْلُ الْإِسْلَامِ** ও **أَهْلُ بَنْغَلَادِيَش** ইত্যাদি। এমনিভাবে **أَلٍ** শব্দটি শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আর **أَهْلٍ**-এর ব্যবহার পুরুষ ও মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। **أَلٍ**-এর **صفت** হিসেবে **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَطْهَارُ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা কুরআনের একটি আয়াত **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَطْهَارُ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রতি **تَلْمِيح** করা হয়েছে।

وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ : **صَحَابَةٍ** শব্দটি মূলত মাসদার। এটি বিশেষভাবে রাসূল ﷺ-এর সহচরদের পবিত্র জামাআতকে বুঝায়। **أَخْيَارٍ** শব্দটি **خَيْرٍ** (তাশদীদযুক্ত)-এর বহুবচন। আবার **خَيْرٍ** (তাশদীদযুক্ত)-এর বহুবচন ও **أَخْيَارٍ**-ই ব্যবহৃত হয়। তবে দু'টির অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। **خَيْرٍ** (তাশদীদযুক্ত) যে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। আর **خَيْرٍ** (তাশদীদযুক্ত) সততা ও মহত্বের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। **خَيْرُ الْقُرُونِ** শব্দটি দ্বারা মূল কিতাবের লেখক কুরআনের আয়াত **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ** এবং হাদীসে রাসূল ﷺ-এর প্রতি **تَلْمِيح** করেছেন।

قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ هُوَ مِنَ الظُّرُوفِ .. : তার পরবর্তী কথাকে তাকিদের সাথে পূর্ববর্তী কথা থেকে পৃথক করার জন্য আসে। তাকিদের বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণ থেকে বুঝতে পারি যে, কেউ যখন বলে **زَيْدٌ قَانِمٌ** তখন এর মধ্যে তাকিদ থাকে না; কিন্তু যখন সে বলে **أَمَّا زَيْدٌ قَانِمٌ** তখন এতে তাকিদ থাকে। কেননা, **أَمَّا**-এর পুরো বাক্য হলো **مِنْهُمَا يَكُنْ مِنْ** অর্থ- যখনই কোনো জিনিস অস্তিত্বশীল হবে তখন যাকে দাঁড়ানো অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে হাজারো জিনিসের অস্তিত্ব যেমন সত্য, তেমনি যাদের দাঁড়ানোও সত্য। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, **بَعْدُ** এখানে মাবনী। কেননা, **بَعْدُ** এখানে **مضاف إليه** থেকে শাব্দিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং **مضاف إليه** লেখক এবং পাঠকের মনে রয়েছে এবং অর্থগতভাবেও বিদ্যমান। আমরা জানি **بَعْدُ**, **قَبْلُ** ও **حِينَ** ইত্যাদি শব্দের **مضاف إليه** যদি শাব্দিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মনে থাকে, তবে এগুলো মাবনী (অপরিবর্তনশীল) হয়।

أَيَّ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَمَلِ فِيهِ "أَمَّا" لِنَبَاتِهَا عَنِ الْفِعْلِ وَالْأَصْلُ مِنْهُمَا
يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ وَ"مَنْهَا" هُنَا مُبْتَدَأٌ وَالْأَسْمِيَّةُ لَزِمَةُ لِلْمُبْتَدَأِ
وَيَكُنْ شَرْطٌ وَالْفَاءُ لَزِمَةُ لَهُ غَالِبًا فَحِينَ تَضَمَّنَتْ "أَمَّا" مَعْنَى الْإِبْتِدَاءِ وَالشَّرْطِ
لَزِمَتْهَا الْفَاءُ وَلِصُوقِ الْأِسْمِ إِقَامَةَ اللَّازِمِ مَقَامَ الْمَلْزُومِ وَإِبْقَاءَ لِأَثَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ -

অনুবাদ : অর্থাৎ (মুযাফ ইলাইহসহ এরূপ) (হামদ ও সালাতের পর) এতে আমেল হলো
মَنْهَا যেকোনো, এখানে অম্মা শব্দটি فعل-এর স্থলাভিষিক্ত। মূল বাক্যটি হলো এরূপ বَعْدَ الْحَمْدِ
شرط ফে'লটি যেকোনো (এ বাক্যটির মধ্যে) مَنْهَا হলো মুবতাদা। আর মুবতাদার জন্য ইসম হওয়া জরুরি
এর-শর্ত (এ-এর জবাবের (جَزَاءُ) মধ্যে সাধারণত فاء আনতে হয়। সুতরাং যখন অম্মা শব্দটি ইবতেন্দা এবং শর্ত
আম্মা لَصُوقِ الْأِسْمِ (অর্থাৎ اسم আনা) জরুরি হয়েছে। আর (أَثَرُ) যে কোনো একভাবে বাকি রাখা।
এরপর اسم আনা) হলো লামেযমকে তার মালযুমের স্থানে রাখা এবং এর (أَثَرُ) যে কোনো একভাবে বাকি রাখা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

عَامِلُ-এর আলোচনা শুরু করেছেন, প্রথমে তিনি বলেন যে, এর عامل হলো
হলো অম্মা তবে সরাসরি নয়। এখানে عامل হয়েছে فعل-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে। এখন প্রশ্ন হলো কোথায় সেই
مَنْهَا যেকোনো শَيْءٍ بَعْدَ الْحَمْدِ অসলে অম্মা আসলে অম্মা যার স্থলাভিষিক্ত অম্মা হয়েছে? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেছেন যে, অম্মা আসলে
وَالصَّلَاةِ ছিল অর্থাৎ এখানে বাক্যটি এরূপই হওয়া দরকার ছিল। অতএব, অম্মা হরফটি যেকোনো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে
তাকে عامل বলা হয়েছে। এরপর মুসান্নিফ مَنْهَا যেকোনো বাক্যের তারকীবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমত
এ বাক্যে মুবতাদা হয়েছে। মুবতাদা হওয়ার জন্য اسم হওয়া জরুরি। কেননা, হরফ এবং ফে'ল মুবতাদা হতে পারে
না। অম্মা যেকোনো (فعل تام) এর অর্থে (অর্থাৎ এটি) অম্মা যেকোনো (فعل تام) এর অর্থ ফায়েল, যা অম্মা-এর দিকে ফিরেছে।
হলো অম্মা-এর بیان। সুতরাং যেকোনো শَيْءٍ হলো শর্ত আর আমরা জানি শর্ত-এর জবাব-এর মধ্যে সাধারণত
فاء আসে। এ উহ্য ইবারতের ব্যাখ্যার পর এখানে দু'টি আপত্তি হচ্ছে তা হলো, উহ্য ইবারতের مَنْهَا (মুবতাদা) এবং
অম্মা (শর্ত) উভয়টি স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে অম্মা সুতরাং অম্মা-এর মধ্যে, ابتداء এবং শর্ত উভয়ের অর্থ বিদ্যমান। অর্থাৎ অম্মা
শব্দটি এখানে মুবতাদা এবং শর্ত উভয়ই। তাই মুবতাদা হওয়ার কারণে এর ইসম হওয়া এবং শর্ত হওয়ার কারণে এর
জওয়াব-এর উপর, فاء আসা দরকার। অথচ অম্মা এখানে ইসমও হয়নি এবং এর জবাবের মধ্যে, فاء আসেনি?

এর উত্তরে মুসান্নিফ যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো এই যে, উভয় আপত্তিই সঠিক, অর্থাৎ مَنْهَا (মুবতাদা)-এর জন্য
যেমন ইসম হওয়া জরুরি তেমনি এর স্থলাভিষিক্ত অম্মা-এর জন্যও ইসম হওয়া জরুরি ছিল। কিন্তু অম্মা তো নিশ্চিতভাবে
হরফ। তাই এখানে অম্মা لَصُوقِ الْأِسْمِ অর্থাৎ অম্মা-এর সাথে বَعْدُ যে মিলে এসেছে, সেই মিলে আসাটাকেই আমরা অম্মা-এর
ইসমের পরিবর্তে ধরে নেব। অর্থাৎ এভাবে বَعْدُ-এর মিলে আসার কারণে অম্মা-এর মধ্যে যেন এসে গেল। সুতরাং
এখন অম্মা-এর মুবতাদা হতে কোনো বাধা নেই। আমরা এখানে অম্মা لَصُوقِ الْأِسْمِ-কে ইসমের স্থলাভিষিক্ত করলাম
تَذَكُّرُكَ (অর্থাৎ কোনো বস্তুর সবটা না পেলে তার সবটা ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং যতটুকু পাওয়া যায়
ততটুকু কুড়িয়ে নেওয়া উচিত) বাকি রইল, অম্মা-এর বিষয়টি। অর্থাৎ অম্মা যেহেতু যেকোনো স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে শর্ত
হলো তাই এর জবাব-এর মধ্যে, فاء আসা দরকার, কিন্তু এমন করতে গেলে অম্মা-এর এবং অম্মা-এর জবাবে (এ-এর উপর) অম্মা দেওয়া
হয়ে যাচ্ছে। অথচ শর্তের অক্ষর এবং অম্মা-এর শুরুতে, فاء না এনে; বরং অম্মা-এর মধ্যখানে (এ-এর উপর) অম্মা দেওয়া
হয়েছে। উল্লেখ্য যে, لازم ও ملزوم-এর যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা হলো এরূপ-মুতাদা হলো ملزوم-এর জন্য لازم হলো
فاء না لازم হলো, এর জন্য ملزوم, এর জন্য لازم হলো।

فَلَمَّا هُوَ ظَرَفٌ بِمَعْنَى إِذْ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الشَّرْطِ يَلْبِهِ فِعْلُ مَا ضِ لَفْظٌ
وَمَعْنَى كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ هُوَ الْمَعْنَى وَالْبَيَانُ وَعِلْمُ تَوَابِعِهَا هُوَ الْبَدِيعُ مِنْ أَجْلِ
الْعُلُومِ قَدْرًا وَادْقَهَا سِرًّا إِذْ بِهِ أَى يَعْلَمُ الْبَلَاغَةَ وَتَوَابِعِهَا لَا بَغْيَ مِنْ الْعُلُومِ كَاللُّغَةِ
وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ يُعْرَفُ دَقَائِقُ الْعَرَبِيَّةِ وَأَسْرَارُهَا فَيَكُونُ مِنْ أَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا وَيُكْشَفُ
عَنْ وَجْهِهِ الْإِعْجَازُ فِى نَظْمِ الْقُرْآنِ اسْتَارُهَا أَى بِهِ يُعْرَفُ أَنَّ الْقُرْآنَ مُعْجَزٌ لِكُونِهِ فِى
أَعْلَى مَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ لِاسْتِمَالِهِ عَلَى الدَّقَائِقِ وَالْأَسْرَارِ الْخَارِجَةِ عَنْ طَوْقِ الْبَشَرِ وَهَذَا
وَسِيلَةٌ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفَوْزِ بِجَمِيعِ السَّعَادَاتِ
فَيَكُونُ مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ لِكُونِ مَعْلُومِهِ وَغَايَتِهِ مِنْ أَجْلِ الْمَعْلُومَاتِ وَالْغَايَاتِ وَتَشْبِيهِ
وَجْهِهِ الْإِعْجَازِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُحْتَجَّةِ تَحْتَ الْأَسْتَارِ اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ -

অনুবাদ : অতঃপর যখন لَمَّا শব্দটি যরফ, যা إِذ-এর অর্থে شرط-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। এরপর ইবারতে ফে'লে মাযী ব্যবহৃত হয় অথবা ফে'লে মাযীর অর্থ উহ্য থাকে। ইলমে বালাগাত (অর্থাৎ) ইলমে মা'আনী ও বয়ান এবং এর অনুগামী ইলম (অর্থাৎ) ইলমে বদী' মর্যাদার দিক থেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং রহস্যভেদের বিচারে সবচেয়ে সূক্ষ্ম। কেননা, এর দ্বারা অর্থাৎ ইলমে বালাগাত এবং তার অনুগামী ইলমের দ্বারা - অন্য ইলম যথা অভিধান শাস্ত্র, নাহব, সরফ ইত্যাদি দ্বারা নয়। জানা যায় আরবি ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং রহস্যসমূহ। সুতরাং এটি তো রহস্য-এর দিক থেকে সবচেয়ে সূক্ষ্ম হবেই। এবং এ ইলম দ্বারা মু'জিয়ার চেহারা থেকে পর্দা উন্মোচন করা যায়। যা (মু'জিয়া) ছিল কুরআনের ইবারতের মধ্যে। অর্থাৎ এর দ্বারা বুঝা যায়, কুরআন-মানুষের অক্ষমতা প্রমাণ করে, কেননা, এটি (কুরআন) বালাগাতের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। কারণ, মানবীয় মেধার অতীত সূক্ষ্মতা ও রহস্যভেদ কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। এটি মহানবী ﷺ-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য অসিলা বা মাধ্যম। আর মহানবী ﷺ-এর সত্যতা প্রমাণ সমস্ত সৌভাগ্য লাভের সোপান। সুতরাং এটি তো সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হবেই। তা ছাড়া এর বিষয়সমূহ ও উদ্দেশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। : قَوْلُهُ وَجْهِهِ الْإِعْجَازِ (বা ই'জাযের বিভিন্ন পদ্ধতি)-কে পর্দার নিচে আচ্ছাদিত কোনো বস্তুর সাথে উপমা দেওয়াটা اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ هُوَ ظَرَفٌ بِمَعْنَى إِذْ : এখানে মুসান্নিফ (র.) সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি ظرف زمان (কাল অর্থবোধক বিশেষ্য) যা অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হয়, তেমনি لَمَّا ও অতীতকালের জন্য ব্যবহৃত হবে। তাই এরপরে ফে'লে মাযী আসবে। তবে إِذ-এর ব্যতিক্রম, কারণ এটি ভবিষ্যৎকালের জন্য হয়। (চাই এরপরে ফে'লে মাযী হোক বা মুযারে-ই হোক।) এ কথা জেনে রাখা দরকার যে, لَمَّا তখনই কালের অর্থ দেবে যখন এরপর এমন দু'টি বাক্য হবে যার দ্বারা প্রথমটি شرط এবং দ্বিতীয়টি جزء। হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অন্যথা এটি অতীতকালের অর্থ প্রদান করবে না। তখন সেটি (نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ) অথবা সেটি (حرف استثناء) لا-এর অর্থ দেবে। যেমন- (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) (প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একজন রক্ষক নিয়োজিত)।

قَوْلُهُ يَسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الشَّرْطِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যবহারের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন যে, (قَوْلُهُ يَسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الشَّرْطِ-এর অর্থে হয় তেমনি لَمَّاও শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়) অর্থাৎ لَمَّا-এর পর شرط এবং جزء-এর দু'টি বাক্য থাকে। প্রথম বাক্যটি ফে'লে মাযী (অতীতকালের ক্রিয়া) আসবে। তবে ফে'লে মাযী বাক্যের মধ্যে উল্লেখ থাকতে পারে, আবার উহ্যও থাকতে পারে। এটি শব্দগতভাবে মাযী (অতীত) হতে পারে। যেমন, ইবারতের মধ্যে لَمَّا দাখিল হয়েছে كَانِ-এর উপর। আবার অর্থগতভাবেও মাযী হতে পারে। অর্থাৎ শব্দগতভাবে যদিও মাযী নয়, কিন্তু لَمَّا-এর দ্বারা (অর্থগত) মাযী বানানো হয়েছে। যেমন- اَكْرَمْتَكَ (যখন যায়েদ দাঁড়াল না তখন আমি তোমার সম্মান করলাম) এ বাক্যে لَمَّا অর্থগত মাযী হয়েছে। মূল কিতাবের লেখক عِلْمُ الْبَلَاغَةِ ও تَوَابِعُهَا শব্দদ্বয়কে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যায় ইলমুল মা'আনী ও বয়ান (এ দু'টি ইলম)-কে লিখেছেন। আর تَوَابِعُهَا-এর ব্যাখ্যায় ইলমে বদী'-এর কথা লিখেছেন। এরপর মূল কিতাবের লেখক এ ইলম সম্পর্কে দু'টি বিশেষণ লিখেছেন। একটি হলো مِنْ أَجْلِ الْعُلُومِ قَدْرًا এ বাক্যের মধ্যে مِنْ শব্দটি-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مِنْ শব্দটি تَفْضِيلِ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই আমরা 'অন্যতম' দ্বারা তরজমা করেছি। উল্লেখ্য যে, ইলমে তাওহীদ ও ইলমে হাদীস ইলমে বালাগাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই ইলমে বালাগাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় না। দ্বিতীয়টি হলো- أَدَقُّ الْعُلُومِ سِرًّا এ বাক্যের মধ্যে أَدَقُّ শব্দটি تَفْضِيلِ-এর অর্থ আর سِرًّا শব্দটি-এর মতো তিমিজ হয়েছে। বাক্যটির অর্থ হলো- সূক্ষ্মতার বিচারে ইলমে বালাগাত অদ্বিতীয়। বাস্তবেও তাই। এরপর মুসান্নিফ (র.) উক্ত দু'টি বিশেষণের পক্ষে দলিল দিচ্ছেন, দলিলের সারকথা হলো, প্রথম বিশেষণের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের মধ্যে বালাগাতের সূক্ষ্ম নিয়ম-কানূনের সমাবেশ ঘটেছে। যেগুলোর ব্যবহার বড় বড় সাহিত্যিকের লেখায়ও পাওয়া অসম্ভব। তাই বালাগাতের এ সব নিয়ম-কানুন প্রমাণ করে যে, কুরআন মু'জিয়া এবং মানুষ তার মোকাবিলা করতে অক্ষম। আর মানুষের অক্ষমতা দ্বারা আল্লাহর কালাম হওয়া নিশ্চিত হয়। সুতরাং রাসূল ﷺ যিনি এ কালাম প্রচার করেছেন তিনিও সত্য। আর যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর সত্যতা স্বীকার করল বা তাঁর সব কথা মেনে নিল, সে উভয় জাহানের সফলতা লাভ করল। যেহেতু ইলমে বালাগাতের মাধ্যমেই এ সব অর্জিত হলো সেহেতু ইলমে বালাগাতই উত্তম ইলম হবে বৈকি। তা ছাড়া যে কোনো ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান ও এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাধ্যমে। আর ইলমে বালাগাতের معلوم বা এর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান হলো- إِعْجَازُ قُرْآنٍ (যা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জিত জ্ঞান) আর উদ্দেশ্য হলো রাসূল ﷺ-কে সত্য মেনে নেওয়া বা উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করা (যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)। অতএব, معلوم ও غاية-এর দিক থেকেও এটিই সর্বোত্তম জ্ঞান হবে।

يُكْشَفُ عَنْ وَجْهِهِ الْإِعْجَازِ اسْتَارَهَا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.)-এর বাক্যের মধ্যে যে ইসতি'আরাগুলো হয়েছে তার আলোচনা শুরু করেছেন।

وَجْهٌ শব্দটি وَجْهٌ-এর বহুবচন। وَجْهٌ শব্দের দুটি অর্থ (এক) চেহারা। এ অর্থে وَجْهٌ প্রচলিত ও বেশি ব্যবহৃত। (দুই) পদ্ধতি বা তরিকা। এ অর্থে وَجْهٌ অপ্রসিদ্ধ ও কম ব্যবহৃত। এখানে দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে প্রথমে ইসতি'আরা বর্ণনা হচ্ছে, وَجْهٌ إِعْجَازٍ-এর অর্থ ইজাযের পদ্ধতি বা প্রকারসমূহ। ইসতি'আরা সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, وَجْهٌ إِعْجَازٍ (মুশাব্বাহ)-কে উপমা দেওয়া হয়েছে পর্দার নিচে আচ্ছাদিত গোপন বস্তু (মুশাব্বাহ বিহী)-এর সাথে। যেহেতু মুশাব্বাহ বিহী এখানে উহ্য এবং মুশাব্বাহ উল্লিখিত তাই এটি ইসতি'আরায় মাকনিয়া বা কিনায়া হবে। এরপর اسْتَارَ (মুশাব্বাহ বিহীর লায়ম)-কে মুশাব্বাহ (وَجْهٌ إِعْجَازٍ)-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা এটি تَخْيِيلِيَّةٌ হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. ইলমুল বালাগাত দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমুল মা'আনী ও ইলমুল বয়ান। عِلْمُ تَوَابِعُهَا বা বালাগাতের অনুগামী ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ইলমুল বদী'।

খ. বালাগাত দ্বারা আরবি ভাষার সূক্ষ্ম ও চমকপ্রদ কলা-কৌশল সম্পর্কে অবগতি লাভ হয় এবং বিশেষভাবে কুরআনের ই'জাজ প্রমাণিত হয় ও রাসূলের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং বালাগাত শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম।

وَإِثْبَاتُ الْأَسْتَارِ لَهَا تَخْيِيلِيَّةٌ وَذِكْرُ الْوُجُوهِ إِيْهَامٌ أَوْ تَشْبِيهِهُ الْإِعْجَازُ بِالْصُّورِ الْحَسَنَةِ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ وَإِثْبَاتُ الْوُجُوهِ لَهُ تَخْيِيلِيَّةٌ وَذِكْرُ الْأَسْتَارِ تَرْشِيحٌ وَنَظْمُ الْقُرْآنِ تَالِيْفٌ كَلِمَاتِهِ مُتَرْتَبَةٌ الْمَعَانِي مُتَنَاسِقَةٌ الدَّلَالَاتُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ لَا تَوَالِيَهَا فِي النُّطْقِ وَضُمُّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ كَيْفَ مَا اتَّفَقَ -

অনুবাদ : আর **إِعْجَاز**-এর জন্য **أَسْتَار** বা পর্দাকে সাব্যস্ত করার দ্বারা **استعارة تخيلية** হয়েছে। (এ অবস্থায়) **وُجُوْهُ** শব্দটির **إِيْهَام** হলো। অথবা **إِعْجَاز**-কে সুন্দর মনোরম চেহারার সাথে উপমা দেওয়াটা **استعاره تخيلية**। আর **وُجُوْهُ** শব্দটিকে **(إِعْجَاز)**-এর জন্য সাবিত করার দ্বারা এটি **استعاره تخيلية** হলো। এরপর **أَسْتَار** বা পর্দার উল্লেখ করার দ্বারা এটি **مرشحة** হলো। **نَظْمُ الْقُرْآن**-এর অর্থ হলো, কুরআনের বাক্যগুলো এমনভাবে লিপিবদ্ধ, যার অর্থ সুবিন্যস্ত এবং যার ইঙ্গিত যুক্তিসঙ্গত। **نَظْمُ الْقُرْآن**-এর অর্থ এই নয় যে, মনের ভাব আদায়ে কয়েকটি বাক্যের মিলন এবং ঘটনাক্রমে একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

تَوْرِيَّةٌ এর পরিভাষা এর অপর নাম **إِيْهَامٌ**। এটি ইলমে বদী' এর প্রচলিত।

إِيْهَام-এর সংজ্ঞা : কোনো শব্দের দু'টি অর্থ থাকা যার একটি নিকটবর্তী ও বেশি প্রচলিত; আর অপরটি দূরবর্তী এবং অপ্রচলিত। এ দু'টি অর্থ থেকে শব্দটি বলে যদি প্রচলিত অর্থ বাদ দিয়ে অপ্রচলিত অর্থটিকে গ্রহণ করা হয়, তখন এটিকে **إِيْهَام** বা **تَوْرِيَّة** বলা হয়। উল্লিখিত বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, **وُجُوْهُ** শব্দটিকে এখানে **إِيْهَام** হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সে হিসেবেই ইসতি'আরা বর্ণনা করা হলো। আর যদি **وُجُوْهُ**-এর প্রচলিত অর্থ নেওয়া হয়, তবে ইসতি'আরা কিরূপ হবে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো। **أَوْ تَشْبِيْهُهُ الْإِعْجَاز** বলে মুসান্নিফ সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। প্রথমত ইবারতের **إِعْجَاز** শব্দটিকে সুশ্রী চেহারার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে **إِعْجَاز** হলো মুশাক্বাহ এবং মুশাক্বাহ বিহী **صُورَةٌ حَسَنَةٌ** বা সুন্দর চেহারা। মুশাক্বাহ বিহী উহ্য এবং মুশাক্বাহ উল্লিখিত। অতএব, এটি ইসতি'আরায়ে মাকনিয়াহ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুশাক্বাহ ও মুশাক্বাহ বিহীর মধ্যে **وجه تشبيه** বা সম্পর্ক হলো সুন্দর চেহারার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। তেমনি মু'জিয়ার প্রতিও মানুষ আকৃষ্ট হয়। এরপর **وُجُوْهُ** (যা মুশাক্বাহ বিহীর লায়েম)-কে মুশাক্বাহ-এর জন্য সাব্যস্ত করার দ্বারা ইসতি'আরায়ে তাখঈলিয়াহ হয়েছে। আর **أَسْتَار** (যা মুশাক্বাহ বিহীর মুনাসিব)-কে উল্লেখ করার দ্বারা এটি **استعارة مرشحة** হয়েছে।

এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) **نَظْمُ الْقُرْآن**-এর ব্যাখ্যা শুরু করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, **نَظْم** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- মনিযুক্তাকে সুতায় গাঁথা। কুরআনের শব্দাবলিকে একত্রিত করার বিষয়টিকে সুতার মালার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে **استعارة مصرحة** অর্থাৎ উপমার পর মুশাক্বাহ বিহীকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুশাক্বাহ উহ্য। অথবা কুরআন মুশাক্বাহ, এর মুশাক্বা বিহী হলো মুক্তার মালা। এ হিসেবে এটি ইসতি'আরায়ে মাকনিয়াহ। এরপর **نَظْم**-কে সাবিত করার দ্বারা তাখঈলিয়াহ হয়েছে। **نَظْمُ الْقُرْآن**-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, এর অর্থ হলো- কুরআনের শব্দাবলিকে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা যার অর্থসমূহ সুবিন্যস্ত এবং এর ভাব বা ইঙ্গিতের মধ্যে যুক্তির গ্রাহ্যতা রয়েছে। এর ভাব কোনো ক্রমেই যুক্তির দিক থেকে অসামঞ্জস্য নয়; বরং তা **مقتضى حال** অনুসারে হয়েছে। তাকীদের স্থানে তাকীদ এবং তাকীদ না হওয়ার স্থানে না হওয়া ইত্যাদি। মুসান্নিফ (র.) বলেন, পবিত্র কুরআনে একের পর এক বাক্য লিপিবদ্ধ করা এবং **مقتضى حال** অনুসরণ ছাড়া যেভাবে ইচ্ছা বাক্য সংযুক্ত করা হয়নি।

وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ أَبُو يَعْقُوبَ
يُوسُفُ السَّكَّاكِيُّ تَعَمَّدَهُ اللَّهُ بِغُفْرَانِهِ أَعْظَمَ مَا صُنِّفَ فِيهِ أَى فِى عِلْمِ الْبَلَاغَةِ
وَتَوَابِعِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ بَيَّانٌ لِمَا صُنِّفَ نَفْعًا تَمَيِّزٌ مِنْ أَعْظَمَ لِكُونِهِ أَى
الْقِسْمِ الثَّالِثِ أَحْسَنَهَا أَى أَحْسَنَ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ تَرْتِيبًا هُوَ وَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِى
مَرْتَبَتِهِ وَ لِكُونِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا هُوَ تَهْذِيبُ الْكَلَامِ وَأَكْثَرَهَا أَى أَكْثَرَ الْكُتُبِ لِلْأَصُولِ
هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ جَمْعًا لِأَنَّ مَعْمُولَ الْمَصْدَرِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ
جَوَازُ ذَلِكَ فِى الظُّرُوفِ لِأَنَّهَا مِمَّا تَكْفِيهِ رَاحَةٌ مِنَ الْفِعْلِ -

অনুবাদ : আর মিস্তাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড, যা সঙ্কলন করেছেন মহাজ্ঞানী আবু ইয়াকুব ইউসুফ সাক্বাকী (র.) আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমার (চাদর) দ্বারা আবৃত করে দিন। যা এ বিষয়ে অর্থাৎ ইলমে বালাগাত ও এর অনুগামী শাস্ত্রের লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাবাদির মধ্যে উপকৃত হওয়ার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। مِنْ (সর্বশ্রেষ্ঠ) কারণ (অর্থাৎ ওয় খণ্ড) الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ এটি صُنِّفَ -এর বয়ান। نَفْعًا এটি أَعْظَمَ -এর তামস্ব। (সর্বশ্রেষ্ঠ) কারণ (অর্থাৎ ওয় খণ্ড) সেগুলোর অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কিতাবাদির মধ্যে বিন্যাসের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর। ترتيب বলা হয় প্রত্যেকটি জিনিসকে তার স্বস্থানে রাখা। এবং (এটি) সেগুলোর মধ্যে অনর্থক কথা মুক্ত হওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ। تَحْرِيرٌ বলা হয় কথাকে ক্রেটি ও অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত রাখা। এবং (শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি কারণ হলো) সেটি অন্যান্য কিতাবের চেয়ে বেশি মূলনীতি সমৃদ্ধ। لِلْأَصُولِ এটি (حرف جر ومجرور) মুতাআল্লিক সংযুক্ত হবে উহ্য ফে'লের সাথে। (উহ্য ফে'লের) তাফসীর হচ্ছে তার শব্দ جَمْعًا। কেননা, মাসদারের মা'মূল (অর্থাৎ মাসদার যার উপর আমল করেছে) তার অর্থাৎ মাসদারের আগে আসতে পারে না। তবে সঠিক কথা হচ্ছে ظرف -এর ক্ষেত্রে এটি (মাসদারের মা'মূল আগে আসা) সম্ভব বা বৈধ। কেননা, এর (ظرف) জন্য তো ফে'লের ঘ্রাণ (অর্থাৎ সামান্য সংযোগ) যথেষ্ট।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

وَكَانَ الْقِسْمُ : বাক্যটি الْبَلَاغَةِ বাক্যের উপর عطف হয়েছে। وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ বলে মূল কিতাবের লেখক তার কিতাব লেখার দ্বিতীয় কারণটি উল্লেখ করেছেন। (প্রথম কারণটি পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, এ ইলম মর্যাদার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্মতার বিচারে সবার আগে। তাই এ বিষয়ে কিতাব লেখা উচিত।) দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলো- ইমাম আবু ইয়াকুব ইউসুফ সাক্বাকীর লেখা কিতাব মিস্তাহুল উলূমের ইলমে বালাগাত সম্পর্কে তাঁর লেখা তৃতীয় খণ্ড একটি বড় মাপের কিতাব। এটি এ বিষয়ে লেখা প্রসিদ্ধ কিতাবাদির মধ্যে উপকারিতার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। এর কারণ তাঁর মতে তিনটি- ১. সবচেয়ে সুবিন্যস্ত, ২. অনর্থক ও অযথা বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও ৩. এতে অন্যান্য কিতাবের তুলনায় নিয়ম-কানুন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এত কিছু পরও কিতাবটিতে حشو تَعْقِيدٌ ও تَطْوِيلٌ স্থানে স্থানে রয়ে যাওয়াতে আমার এমন কিতাব লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, কিতাবটি এসবের থেকে মুক্ত হবে। মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতের বিভিন্ন স্থানে নাহ বা ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- مَا صُنِّفَ অর্থ- যা লেখা হয়েছে, এ কথাটি অস্পষ্ট, এর বয়ান হলো الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ অর্থাৎ লিখিত

প্রসিদ্ধ কিতাবাদি থেকে। نَفْعًا এটি تَمِيْز এর মিম্ব হ'লো أَحْسَنَهَا এমনভাবে تَمِيْز এর মিম্ব হ'লো تَرْتِيْبًا। تَرْتِيْبًا এর মধ্যে تَمِيْز হ'লো تَحْرِيرًا এবং أَكْثَرَهَا এর মধ্যে تَمِيْز হ'লো أَتَمَهَا এর মধ্যে تَمِيْز হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) تَحْرِير ও تَرْتِيْب এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন - التَّرْتِيْبُ هُوَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ এর অর্থ- প্রত্যেকটি জিনিসকে তার স্থানে রাখা অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে রাখা।

قَوْلُهُ تَحْرِيرًا هُوَ تَهْدِيْبُ الْكَلَامِ إِلَى تَخْلِيصِهِ مِنَ الرِّوَايَةِ : অর্থ- কথাকে অনর্থক ও অতিরঞ্জিত থেকে বাঁচানো। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, حَرْفُ جَرٍّ ও حَرْفُ مَجْرُور মিলে উহ্য جَنْعًا এর সাথে متعلق হ'লো। ইবারতের মধ্যে যে جَنْعًا আছে এর সাথে متعلق হ'বে না। সুতরাং উহ্য ইবারত এমন হ'বে لِلْأَصُولِ (جَنْعًا) أَكْثَرَهَا (جَنْعًا) এ অবস্থায় প্রথম উহ্য جَنْعًا এর তাফসীর হ'বে দ্বিতীয় উল্লিখিত جَنْعًا তবে প্রশ্ন হ'লো উল্লিখিত جَنْعًا এর সাথে متعلق না করে উহ্য جَنْعًا এর সাথে متعلق কেন করা হ'লো? উত্তর হ'লো, যদি উল্লিখিত جَنْعًا এর সাথে متعلق করা হতো, তাহলে মাসদার (جَنْعًا) এর معمول (যার উপর মাসদার আমল করেছে) অর্থাৎ لِلْأَصُولِ -কে মাসদারের পূর্বে আনতে হয়। অথচ এমনটি করা যায় না। এটি হ'লো সমস্ত নাহবীদের অভিমত। এ অনুযায়ী মুসান্নিফ (র.) তারকীব করেছেন, তবে এরপর তিনি বলেছেন, সঠিক মত হ'লো- যদি ظروف মাসদারের معمول হয়, তাহলে তাকে মাসদার-আমিলের পূর্বে আনা যায়। সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর মতে لِلْأَصُولِ টি جَنْعًا এর আগে এসেছে। আর এর আমিল جَنْعًا যা এর পরে এসেছে। এটি আল্লামা রযীর মাযহাব। এর উদাহরণ কুরআনেও পাওয়া যায়। যেমন- فَلَمَّا بَلَغَ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ... এমনিভাবে... السَّعْيِ أَمْحَا مَعَهُ-এর আমিল السَّعْيِ যা مَعَهُ-এর পরে এসেছে। এমনিভাবে... رَأْفَةٌ أَمْحَا-এর আমিল رَأْفَةٌ যা بِهِمَا-এর পরে এসেছে। ظرف-এর ক্ষেত্রে এরূপ বৈধ হওয়ার কারণ হ'লো ظرف-এর মধ্যে এমন ব্যাপকতা রয়েছে যা অন্য কিছু মধ্য নেই। কেননা, এমন কোনো সৃষ্টি নেই যা স্থান-কাল ছাড়া সামান্য সময় অতিবাহিত করতে পারে; বরং এমন চিন্তা করাও অসম্ভব। এ ব্যাপকতার কারণেই ظرف সব স্থানেই আসতে পারে। আমেলের আগেও পরেও। আমেল ফে'ল, শিবহে ফে'ল, মাসদার যাই হোক না কেন? এ কথাটিকে মুসান্নিফ (র.) এভাবে বলেছেন- ظرف-এর মধ্যে আমল করার জন্য ফে'লের ঘাণই যথেষ্ট। অর্থাৎ যার মধ্যে ফে'লের সাথে সামান্যতম সংশ্লিষ্টতা আছে, সেটাই ظرف-এর উপর আমল করতে পারে। চাই ظرف আগে আসুক বা পরে আসুক। সুতরাং মাসদার যেহেতু ফে'লের তিন অংশ (মাসদার, জমানা ও ফায়েলের দিকে নিসবত)-এর একটি অংশ, এ কারণে মাসদারের ফে'লের সাথে সামান্য সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, মাসদার ظرف-এর উপর আমল করবে, চাই ظرف আগে আসুক বা পরে আসুক।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা ইয়াকুব ইউসুফ সাক্বাকী (র.) রচিত মিসফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ড বিন্যাস ও নিয়মাবলি বেশি হওয়ার বিবেচনায় ইলমুল বালাগাতের বড়, প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত কিতাব।

وَلَكِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ غَيْرَ مَصُونٍ أَيْ غَيْرَ مَحْفُوظٍ عَنِ الْحَشْوِ وَهُوَ الزَّائِدُ
الْمُسْتَعْنَى عَنْهُ وَالتَّطْوِيلُ وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ بِلَا فَايْدَةٍ وَسَتَعْرِفُ الْفَرْقَ
بَيْنَهُمَا فِي بَحْثِ الْأَطْنَابِ وَالتَّعْقِيدِ وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ مُغْلَقًا لَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ بِسُهُولَةٍ
قَابِلًا خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ أَيْ كَانَ قَابِلًا لِلِاخْتِصَارِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّطْوِيلِ مُفْتَقِرًا أَيْ
مُحْتَاجًا إِلَى الْإِيضَاحِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْقِيدِ وَالْيَ التَّجْرِيدِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَشْوِ -

অনুবাদ : কিন্তু (মিফতাহুল উলূমের) তৃতীয় খণ্ড হাশ্ব তথা অতিরিক্ত কথা থেকে অরক্ষিত ছিল। হাশ্ব
বলা হয় এমন অতিরিক্ত কথাকে, যার প্রতি মূল ইবারত অমুখাপেক্ষী। এবং তَطْوِيل থেকে (অরক্ষিত ছিল)।
তَطْوِيل বলা হয় এমন অউপকারী ও অতিরিক্ত কথাকে যা মূল উদ্দেশ্যের বাইরে। আর এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য
তুমি اَطْنَاب-এর অধ্যায়ে জানতে পারবে। এবং تَعْقِيد থেকে (অরক্ষিত ছিল) বলা হয় বাক্য দুবোধ্য
হওয়া, যার অর্থ সহজে উদ্ধার হয় না বা প্রকাশ হয় না। এর তৃতীয় খণ্ড উপযুক্ত ছিল। (قَابِلًا শব্দটি) খবরের
পর দ্বিতীয় খবর। অর্থাৎ বাক্যটি একরূপ হবে قَابِلًا لِلِاخْتِصَارِ। অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ড উপযুক্ত ছিল সংক্ষেপনের।
কেননা, এতে تَطْوِيل রয়েছে। এবং (মুখাপেক্ষী ছিল) তাজরীদ বা মুক্তকরণের প্রতি। কেননা, এতে হাশ্ব রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ لَكِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ : এ বাক্যে لَكِنْ শব্দটি اسْتِدْرَاك-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়
পূর্ববর্তী কথার দ্বারা যে ধারণা সৃষ্টি হয় لَكِنْ দ্বারা সে ধারণাকে খণ্ডন করা। যেমন- এখানে মিফতাহুল উলূমের ৩য় খণ্ড
সম্পর্কে যেসব প্রশংসা করা হয়েছে।

এ দ্বারা কারো এ ধারণা হতে পারে যে, তয় খণ্ড সম্ভবত তَطْوِيل এবং হাশ্ব এবং তَعْقِيد মুক্ত হবে। এ ধারণাকে দূর
করার জন্য لَكِنْ-কে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ৩য় খণ্ড এগুলো থেকে মুক্ত ছিল না। অতএব, হাশ্ব-এর
উপস্থিতির কারণে تجرید (অর্থাৎ হাশ্ব মুক্তকরণ)-এর প্রয়োজন ছিল। তَعْقِيد-এর কারণে إِيضَاح (অর্থাৎ দুবোধ্যতা
মুক্তকরণ)-এর প্রয়োজন ছিল এবং تَطْوِيل-এর কারণে إِيضَاح তথা সংক্ষেপনের প্রয়োজন ছিল। মুসান্নিফ (র.), হাশ্ব,
হাশ্ব ও তَعْقِيد-এর প্রতিটির সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

হাশ্ব-এর সংজ্ঞা : اَلْحَشْوُ هُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَعْنَى عَنْهُ ; এটি মুসান্নিফের সংজ্ঞা; তবে এর পরিপূর্ণ সংজ্ঞাটি একরূপ-

هُوَ اللَّفْظُ الزَّائِدُ فِي الْكَلَامِ الْمُسْتَعْنَى فِي آدَاءِ الْمُرَادِ سَوَاءً كَانَ لِفَايْدَةٍ أَمْ لَا كَانَ مُتَعَيِّنًا أَمْ لَا

অর্থাৎ হাশ্ব বলা হয়- বাক্যের ঐ অতিরিক্ত কথাকে, যার প্রতি বাক্যটি মুখাপেক্ষী নয়। চাই সেই অতিরিক্ত কথা
উপকারী হোক বা না হোক এবং সেটি নির্দিষ্ট হোক বা না হোক।

هُوَ اللَّفْظُ الزَّائِدُ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ بِلَا فَايْدَةٍ : তَطْوِيل-এর সংজ্ঞা :

অর্থাৎ তَطْوِيل বলা হয়, বাক্যের ঐ অতিরিক্ত কথাকে যা আসল উদ্দেশ্যের বাইরে এবং যার দ্বারা কোনো উপকারও হয়
না। মুসান্নিফ (র.) এ দু'টির সংজ্ঞা লেখার পর বলেছেন যে, এ দু'টির পার্থক্য اَطْنَاب-এর অধ্যায়ে আলোচনা করবেন।
উল্লেখ্য যে, সংজ্ঞা বর্ণনা দ্বারাই দু'টির মাধ্যকার পার্থক্য অনেকটা ফুটে উঠেছে। তা হচ্ছে (এক) এ দু'টির একটি হলো عام
বা ব্যাপক, অপরটি হলো خاص। (দুই) তَطْوِيل-এর মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। আর হাশ্ব-এর মধ্যে উপকারিতা
থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। সুতরাং যে অতিরিক্ত কথার فائده নেই এটিকে হাশ্ব ও তَطْوِيل উভয়টি বলা
যাবে, আর যে অতিরিক্ত কথার উপকারিতা আছে তাকে হাশ্ব বলা হয়; তَطْوِيل বলা যাবে না।

খ. এ কারণে মূল লেখক মিফতাহ-এর তালখীস (সার-সংক্ষেপ) লেখার তাকিদ অনুভব করে নিয়মাবলি, উদাহরণ ও শাহেদ সম্বলিত 'তালখীসুল মিফতাহ' কিতাব লিখেন।

أَلْقَتْ جَوَابٌ لِّمَا مُخْتَصَرًا يَتَضَمَّنُ مَا فِيهِ أَى فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنَ الْقَوَاعِدِ جَمْعُ قَاعِدَةٍ وَهِيَ حُكْمٌ كَلِّىٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ لِيَتَعَرَّفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ كَقَوْلِنَا كُلُّ حُكْمٍ مَعَ مُنَكَّرٍ يَجِبُ تَوْكِيدُهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يَخْتِاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَهِيَ الْجُزْئِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ لِإِبْضَاحِ الْقَوَاعِدِ وَالشُّوَاهِدِ وَهِيَ الْجُزْئِيَّاتُ الْمَذْكُورَةُ لِإِثْبَاتِ الْقَوَاعِدِ فَهِيَ أَخْصُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَلَمْ أَلِ مِنَ الْأَلُوِّ وَهُوَ التَّقْصِيرُ جُهْدًا أَى اجْتِهَادًا وَقَدْ أُسْتَعْمِلَ الْأَلُوُّ هُنَا مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولَيْنِ وَحُذِفَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ وَالْمَعْنَى لَمْ أَمْنَعَكَ جُهْدًا فِى تَحْقِيقِهِ أَى الْمُخْتَصَرِ يَعْنِى فِى تَحْقِيقِ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الْأَبْحَاثِ وَتَهْذِيبِهِ أَى تَنْقِيحِهِ -

অনুবাদ : আমি সংকলন করলাম لَمَّا تِلْكَ-এর জবাব-সংক্ষিপ্ত কিতাব যা শামিল করবে ঐ সব বিষয়কে যা তাতে (অর্থাৎ মিফতাহুল উলূমের) তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে রয়েছে তথা বিভিন্ন নিয়মাবলি। قَوَاعِدُ শব্দটি قاعدة-এর বহুবচন। قاعدة বলা হয়- প্রত্যেক এমন كَلِمَةٍ যা তার প্রত্যেকটি جُزْئِ-এর উপর প্রযোজ্য হয়, যাতে جُزْئِ গুলোর বিধান كَلِمَةٍ থেকে জানা যায়। যেমন- আমরা বলে থাকি كُلُّ حُكْمٍ مَعَ مُنْكَرٍ يَجِبُ (অর্থাৎ যেসব খবরকে অস্বীকার করার অবকাশ থাকে সেসব খবরকে-এর সাথে বলা ওয়াজিব।) এবং (আমার সংক্ষিপ্ত কিতাবটিতে) শামিল থাকবে প্রয়োজনীয় উদাহরণসমূহ। امثلة বলা হয় এমন সব جُزْئِ-কে যেগুলোকে উল্লেখ করা হয় কায়দাসমূহকে স্পষ্ট করার জন্য। এবং (প্রয়োজনীয়) শাওয়াহেদ বা প্রমাণভিত্তিক উদাহরণসমূহ। شَوَاهِدُ বলা হয় এমন সব جُزْئِ-কে, যেগুলোকে উল্লেখ করা হয় নিয়মাবলিকে প্রমাণিত করার জন্য। এটি মিছাল থেকে কম ব্যাপক। আর আমি পরিশ্রমের ব্যাপারে কোনো অবহেলা করিনি। أَلْ এটি (মাসদার) থেকে নির্গত। اَجْتَهَدًا অর্থ-পরিশ্রম। এখানে اَلَاوُ শব্দটিকে দু' মাকউলের দিকে মুতায়াদ্দী রূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রথম মাকউলটিকে উহা রাখা হয়েছে। তখন অর্থ (হবে রূপ) আমি তোমার থেকে পরিশ্রমকে বাধা দেইনি। এর তাহকীক করার ব্যাপারে, অর্থাৎ মুখতাসারের তাহকীকের ব্যাপারে। লেখকের উদ্দেশ্য (মুখতাসার)-এর মধ্যে যে সকল বিষয় এসেছে তার তাহকীক-এর ব্যাপারে এবং এর তাহযীব তথা সম্পাদনার ব্যাপারে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَلْفَتْ جَوَابٌ لِّمَا : এ ইবারতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلْفَتْ থেকে শুরু করে সামনের ইবারত। এটি মূল কিতাবের লেখকের ভূমিকার لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ الْخ (থেকে শুরু করে اَلْفَتْ-এর পূর্ব পর্যন্ত) বাক্যের জবাব। অর্থাৎ لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ الْخ-এর আগ পর্যন্ত হলো شرط আর اَلْفَتْ হলো এর জবাব। شرط-এর মধ্যে কিতাব লেখার দু'টি কারণ আর جواب-এর মধ্যে কিতাব লিখা শুরু করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) দাবি করেছেন যে, তিনি এমন একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখেছেন, যার মধ্যে মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ কায়দাসমূহ রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় মিছাল ও শাওয়াহেদ সব কিছুই এতে রয়েছে।

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

قَوْلُهُ يَسْتَمِيلُ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ : উল্লেখ্য যে, লেখক এখানে প্রয়োজনীয় উদাহরণের কথা বলেছেন, এতে বুঝা যায় যে, এ কিতাবের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উদাহরণ আনা হয়নি। কারণ তাহলে তো এতেও حشو, زوائد و تطويل থেকে যাবে। এ ইবারত দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় উদাহরণ রয়েছে। امثلة শব্দটি مثال-এর বহুবচন। মুসান্নিফ (র.)-এর ভাষায় মিছাল বলা হয় এমন উদাহরণকে যার দ্বারা কায়দাটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে। মিছাল দ্বারা কায়দা প্রমাণিত হয় না।

আর شَاهِدٌ একটি شَاهِدَةٌ-এর বহুবচন। شَاهِدٌ বলা হয়- এমন উদাহরণকে, যার দ্বারা কায়দাটি প্রমাণিত হয়। প্রথমটির উদাহরণ- যে কেউ একটি কায়দা বলল 'প্রত্যেক মাফউল নসব বিশিষ্ট হয়'এরপর مَالٌ دِلٌ যেমন- رَأَيْتُ زَيْدًا এতে زَيْدٌ মাফউল হওয়ার কারণে নসব বিশিষ্ট হয়েছে। এ মিছালটি কায়দাটিকে স্পষ্ট করল বটে; তবে এ مَالٌ দ্বারা কায়দা প্রমাণিত হয়েছে এ কথা বলা যাবে না।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ- যে কেউ একটি কায়দা বলল : **نون اعرابى** -কে **لَنْ** বিলুপ্ত করে দেয়। এরপর (شاهد) উদাহরণ দিল, যেমন- কুরআনের আয়াত **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ** আলোচ্য আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি **جمع مذكر حاضر** -এর **نون** **نون اعرابى** -কে **لَنْ** এসে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এটি এমন উদাহরণ যে, যাকে **شاهد** বলা হয়। কারণ এটির দ্বারা **قاعده** শুধুমাত্র স্পষ্টই হয়নি; বরং প্রমাণিত হয়েছে।

এ-এর মাল-এবং শাহী (র.) মুসান্নিফ দ্বারা ইবারত : قَوْلُهُ فِيهِ أَخَصُّ مِنَ الْأَمْثَلَةِ করেছেন। তিনি বলেন, শাহীদ মিছাল থেকে খাস বা কম ব্যাপক অর্থাৎ উভয়ের মাঝে عام-খাস-এর নিসবত বিদ্যমান। কারণ, শাহীদ বলা হয় সেসব উদাহরণকে যা কুরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কোনো আরবি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আর মিছাল যে কোনো উদাহরণকে বলা হয়। সুতরাং শাহীদ-কে মাল বলা গেলেও যে কোনো মাল-কে শাহীদ বলা যাবে না। তা ছাড়া এভাবেও বলা যায় যে, মিছাল দ্বারা কয়েদাটি স্পষ্ট হয় আর শাহীদ দ্বারা স্পষ্ট হয় এবং প্রমাণিতও হয়। এ হিসেবে শাহীদ কলী-এর পর্যায়ে, আর মিছাল জরনী-এর পর্যায়ে। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কলী তার জরনী-এর তলনায় খাস হয়।

তবে যদি এ কথা বলা হয় যে, শাহেদ শুধুমাত্র কায়দা প্রমাণ করে, আর মিছাল শুধুমাত্র কায়দা সাবিত করে তাহলে বলতে হবে যে, উভয়ের মাঝে تَبَايُن-এর নিসবত। তখন عام خاص مطلق হবে না।

أَلْفَتْ بাকটি وَلَمْ أَلْ : قَوْلُهُ وَلَمْ أَلْ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ التَّقْصِيرُ

তবে এটি أَلْفَتْ-এর فاعل থেকে حالও হতে পারে। أَلْ ফে'লটি أُلُو ছিল। (واحد متكلم مضارع)-এর সীগাহ) أَلُو' হয়েছিল। এরপর لَمْ আসার কারণে واو পড়ে গেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, এটি أَلُو' (মাসদার) থেকে নিগত। أَلُو' অর্থ- (تَقْصِير) অলসতা করা, ঢিলেমি করা। তবে কখনো تَضْمِين-এর ভিত্তিতে منع বা নিষেধ করার অর্থে ব্যবহার হয়। أَلْ جُهْدًا অর্থ- আমি পরিশ্রমের বা চেষ্টার ক্রটি করিনি। দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হলে এর দু'টি মাফউল থাকবে। তবে তখন এখানে প্রথম মাফউলটি হযফ করা হয়েছে বলতে হবে। তখন বাক্যটির ব্যাখ্যা এ রকম হবে : لَمْ أَمْنَعَكَ جُهْدًا অর্থ- আমি তোমাকে পরিশ্রম করতে বাধা দিচ্ছি না। এখানে كَانِ خَطَابِ দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য। মূলত ইবারত এরূপ لَمْ أَمْنَعُ أَحَدًا অর্থ- আমি কাউকেই পরিশ্রম করতে বাধা দেইনি।

قَوْلُهُ فَيُتَحَقِّقُ أَيُّ الْمَخْتَصَرِ : অর্থাৎ এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার বিষয়াদি তাহকীকের ব্যাপারে বা তাহকীকের ক্ষেত্রে কোনো ক্রটি করিনি।

قَوْلُهُ وَتَهْذِيبِهِ : মুসান্নিফ (র.) تَهْذِيبِ অর্থ লিখেছেন تَنْفِيعِ এর অর্থ হলো- অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাকে বাদ দেওয়া এবং পরিবর্তন করা। একে এক কথায় সম্পাদনা করাও বলা যায়। সুতরাং পুরো বাক্যের অর্থ হলো, আমি তাহকীক (বিশ্লেষণ) এবং তাহযীব (অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে) কোনো ক্রটি করিনি; বরং যথাসাধ্য তা পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করেছি।

সার সংক্ষেপ :

ক. প্রত্যেক جُزْئِي-এর মাঝে প্রয়োগযোগ্য সামগ্রিক নিয়মকে قَاعِدَةٌ বলা হয়।

খ. যেসব উদাহরণ দ্বারা নিয়ম-কায়দা প্রমাণ করা হয় তথা কুরআন, হাদীস ও আরবি সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাব থেকে উদ্ধৃতকৈ شَاهِدٌ বলা হয়।

গ. যে কোনো উদাহরণকে مِثَالٌ বলা হয়।

ঘ. مِثَالٌ হলো عَامٌ আর شَاهِدٌ খাস।

وَرَبَّتُهُ أَيْ الْمُخْتَصَرُ تَرْتِيبًا أَقْرَبُ تَنَاوُلًا أَيْ أَخَذًا مِنْ تَرْتِيبِهِ أَيْ تَرْتِيبِ السَّكَاكِي
 أَوْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ إِضَافَةً الْمَصْدَرِ إِلَى الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ وَلَمْ أَبَالِغْ فِي إَخْتِصَارِ
 لَفْظِهِ تَقْرِيبًا مَفْعُولٌ لَهُ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنَى لَمْ أَبَالِغْ أَيْ تَرَكْتُ الْمُبَالَغَةَ فِي الْإِخْتِصَارِ
 تَقْرِيبًا لِتَعَاطِيهِ أَيْ تَنَاوُلِهِ وَطَلَبًا لِتَسْهِيلِ فَهْمِهِ عَلَى طَالِبِيهِ وَالضَّمَائِرُ لِلْمُخْتَصَرِ
 وَفِي وَصْفِ مُؤَلِّفِهِ بِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مُنَقَّحٌ سَهْلُ الْمَاخِذِ تَعْرِضٌ بِأَنَّهُ لَا تَطَوُّلَ فِيهِ وَلَا
 حَشْوَ وَلَا تَعْقِيدَ كَمَا فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَوَاعِدِ
 وَغَيْرِهَا فَوَائِدَ عَشْرَتِ أَيْ أَطْلَعْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْقَوْمِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى تِلْكَ الْفَوَائِدِ
 وَزَوَائِدَ لَمْ أَظْفَرْ أَيْ لَمْ أَفْزْ فِي كَلَامٍ أَحَدٍ بِالتَّضَرُّعِ بِهَا أَيْ بِتِلْكَ الزَّوَائِدِ وَلَا بِالْإِشَارَةِ
 إِلَيْهَا بِأَن يَكُونَ كَلَامُهُمْ عَلَى وَجْهِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا مِنْهُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْصُدُوهَا -

অনুবাদ : আর আমি এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাকে সাক্কাকী (র.) অথবা (তার কিতাবের) তৃতীয় খণ্ডের বিন্যাস থেকে অধিকতর আয়ত্তের উপযোগী করে সুবিন্যস্ত করেছি। وَرَبَّتُهُ-এর মধ্যে মাসদার হয়তো ফায়েলের দিকে অথবা মাফউলের দিকে ইয়াফত হয়েছে। এবং এর ইবারত সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে আমি অতিরঞ্জন করিনি। (আয়ত্তের) কাছাকাছি নেওয়ার জন্য। تَقْرِيبًا এটি মাফউলে লাহ্ এ ফে'লের জন্য যে ফে'লের মধ্যে لَمْ أَبَالِغْ-এর অর্থ शामिल হয়েছে। অর্থাৎ আমি অতিরঞ্জন পরিত্যাগ করেছি সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে একে আয়ত্ত করার কাছে নেওয়ার জন্য। এবং এর শিক্ষার্থীদের কাছে এটির বোধগম্যতাকে সহজ করার আশায়। সবগুলো সর্বনামের উদ্দেশ্য হলো মুখতাসার তথা এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। লেখক (কিতাবের) গুণ হিসেবে مُخْتَصَرٌ (সংক্ষিপ্ত) مُنَقَّحٌ (অনর্থক কথা বিবর্জিত) এবং سَهْلُ الْمَاخِذِ (সহজে আয়ত্তাধীন) বলেছেন, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে تَعْقِيدٌ নেই। যেমনটি রয়েছে (মিফতাহুল উলূমের) তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে। আর আমি এর সাথে তথা উল্লিখিত নিয়মাবলির ইত্যাদির সাথে বৃদ্ধি করেছি বেশকিছু উপকারী বিষয়, যেগুলো আমি জেনেছি বালাগাতের বড় পণ্ডিতদের কোনো কিতাব থেকে, আর কিছু অতিরিক্ত বিষয় যা (হাসিল করতে) সক্ষম হইনি কারো কথা থেকে প্রত্যক্ষভাবেও নয় এবং প্রচ্ছন্নভাবেও নয়। (পরোক্ষ বা ইশারা) অর্থাৎ তাদের কথা এমনও ছিল না যে, তাদের কথা থেকে হাসিল করা যায়। যদিও তারা এমনটি উদ্দেশ্য করেননি।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَرَبَّتُهُ আর আমি একে বিন্যস্ত করেছি এমনভাবে যে, তা আয়ত্ত করা খুব সহজ সাক্কাকী (র.)-এর বিন্যাসের তুলনায়। এক কথায় এটি বিন্যাসের দিক থেকে সাক্কাকী (র.)-এর তৃতীয় খণ্ডের তুলনায় সহজপাঠ্য।

قَوْلُهُ مِنْ تَرْتِيبِهِ : এর مَرْجِع-এর مَرْجِع কি? একটি মত হলো, এর مَرْجِع হলো সাক্কাকী। দ্বিতীয় মত হলো, এর مَرْجِع (মিফতাহুল উলূমের) ৩য় খণ্ড। প্রথম মতানুসারে تَرْتِيب মাসদারের اضافت তথা সম্বন্ধ হলো ফায়েলের দিকে। কারণ, মিফতাহুল উলূমের বিন্যাসকারী তিনিই। দ্বিতীয় মতানুসারে মাসদারের সম্বন্ধ হবে মাফউলের দিকে। কারণ, ৩য় খণ্ডকেই বিন্যস্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَفْعُولٌ لَهُ لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنَى لَمْ أَبَالِغْ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ طَلَبًا এবং تَقْرِيبًا-এর তারকীবের ব্যখ্যা করছেন। তিনি বলেছেন যে, এ মাসদারদ্বয় مَفْعُولٌ لَهُ হয়েছে। এদের ফে'ল হলো لَمْ أَبَالِغْ-এর অর্থের মধ্যে शामिल একটি

ফে'ল যথা **تَرَكْتُ الْمَبَالَغَةَ**। তখন এখানে একটি আপত্তি দেখা দেয় যে, **لَمْ أَبَالِغْ**-এর অর্থের মধ্যে শামিল একটি ফে'ল বলার মধ্যে কি তাৎপর্য? এর উত্তর হলো, মাফউলে লাহুর ক্ষেত্রে নিয়ম হলো- মাফউলে লাহু হ্যা-বাচক ফে'ল থেকে হয়, না বাচক ফে'ল থেকে হয় না। যেহেতু **لَمْ أَبَالِغْ** একটি না-বাচক ফে'ল, তাই এখানে **وَتَقَرَّبًا** এমন হ্যা-বাচক ফে'ল থেকে মাফউলে লাহু হবে যা **لَمْ أَبَالِغْ**-এর অর্থের মধ্যে শামিল রয়েছে। কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মাফউলে লাহু না-বাচক ফে'ল থেকে কেন হতে পারে না? এর উত্তর হলো, মাফউলে লাহুর সংজ্ঞা হলো- **مَا فَعِلَ لِأَجْلِ** **عَدَمِ فَعَلٍ**। এজন্য **فَعِلَ**-যার জন্য ফে'লটি করা হয়। আর এখানে উল্লিখিত **لَمْ أَبَالِغْ** বা **عَدَمِ مَبَالَغَةٍ** তো ফে'ল নয়; বরং **فَعِلَ**। এজন্য এর থেকে মাফউলে লাহু হবে না।

ضَمِير এ চারটি শব্দের **لَفْظِهِ**, **تَعَاظِيهِ**, **فَهْمِهِ**, **طَالِبِيهِ** : মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, **قَوْلُهُ وَالضَّمَاوِيرُ لِلْمُخْتَصِرِ** গুলো **مختصر** অর্থাৎ তালখীসুল মিফতাহ-এর দিকে ফিরেছে।

মূল কিতাব (তালখীসুল মিফতাহ)-এর লেখক তার কিতাব সম্পর্কে তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করেছেন- ১. এ কিতাবটি **مختصر** বা সংক্ষিপ্ত - এ কথাটি তার ইবারত **لَفْظِهِ فِي إختصار** থেকে পাওয়া যায়। ২. এ কিতাবটি **مُنْتَقٍ** বা অতিরিক্ত কথাযুক্ত- এটি তার ইবারত **وَلَمْ أَلْجُءًا فِي تَحْقِيقِهِ وَتَهْدِيَّتِهِ** থেকে পাওয়া যায়। ৩. তার কিতাব **سَهْلُ الْمَأْخِذِ** বা সহজে পাঠোদ্ধার করা যায়। এটি তার ইবারত **طَلَبًا لِتَسْهِيلِ فَهْمِهِ** থেকে পাওয়া যায়। লেখক তার কিতাবের এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার দ্বারা আল্লামা সাক্বাকীর প্রতি **تَعْرِضُ** (বিশেষ ইঙ্গিত) করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন যে, আমার কিতাবে **تَعْقِيدٌ** ও **حَشْرٌ** নেই। কিন্তু মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে এ তিনটি বিষয়ই বিদ্যমান।

تَلْوِيعٌ বলা হয় কোনো একটি কথা বলে কথার মধ্যে অনুল্লিখিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করাকে, এর অপর নাম **تَعْرِضُ**।

প্রকাশ থাকে যে, মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে **حَشْرٌ**, **تَطْوِيلٌ** ও **تَعْقِيدٌ** আছে। এ কথার প্রতি **تَعْرِضُ** এখানে দ্বিতীয়বারের মতো করা হলো। প্রথমে **كَانَ قَابِلًا لِلإختصار مُفْتَقِرًا إِلَى الإيضاح** বলে প্রথমবার **تَعْرِضُ** করা হয়েছিল যে, এতে উল্লিখিত তিনটি জিনিস বিদ্যমান।

مشار إليه **ذَلِكَ** ইসমে ইশারার **الْمَذْكُورِ** (র.) মুসান্নিফ (র.) **قَوْلُهُ وَأَضَفْتُ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ** দেখালেন। কেননা, যদি **الْمَذْكُورِ**-কে **مشار إليه** না বলে সরাসরি **أَمَثَلُهُ** বলে প্রকাশ করা হতো, তাহলে ইসমে ইশারা ও **مشار إليه**-এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যেত না। তখন ইসমে ইশারা একবচন ও **مشار إليه** বহুবচন হতো।

এরপর লেখক বলেন যে, তিনি মিফতাহুল উলূমের তৃতীয় খণ্ডে নেই এমন বিষয়াদিও এ কিতাবে লিপিবদ্ধ বা সংযোজন করেছেন। লেখকের বক্তব্য অনুসারে এসব বিষয় দু' ধরনের (এক) **فَوَائِدُ** (এটি **فَائِدَةٌ**-এর বহুবচন) অর্থ- উপকারী বিষয়সমূহ। **فَوَائِدُ** সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, এগুলো তিনি বালাগাতশাস্ত্রে লিখিত কিতাবাদি থেকে গ্রহণ করেছেন। (দুই) **زَوَائِدُ** (এটি **زَائِدَةٌ**-এর বহুবচন) অর্থ- অতিরিক্ত বিষয়সমূহ। এগুলো সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এগুলো গবেষণালব্ধ বিষয়, কারো থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগুলো নেননি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ বিষয়াদিকে **زَوَائِدُ** বা অতিরিক্ত বিষয় বলেছেন। এটা তিনি কেন বললেন? এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর হতে পারে। ১. প্রথম উত্তর হলো, এমনভাবে ব্যক্ত করা তার নিজের সম্পর্কে দীনতা-বিনয়ের প্রকাশ। জ্ঞানীজন নিজেকে ছোট বলে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তারা কখনো জ্ঞানের বড়াই করেন না। ২. দ্বিতীয় উত্তর হলো, এখানে **زَوَائِدُ** দ্বারা অতিরিক্ত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং **فَوَائِدُ**-এর চেয়েও বেশি কিছু বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমার গবেষণাপ্রসূত বিষয়গুলো **فَوَائِدُ** থেকেও উত্তম। যেমন কুরআনের আয়াত- **لِيَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ** (যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত এবং তার চেয়ে বেশি কিছু) এখানে **زِيَادَةٌ** বা বেশি কিছু দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার দিদার, যা জান্নাতের সকল নিয়ামতেরও উর্ধ্বে।

সার-সংক্ষেপ :

মূল লেখক বলেন, তালখীসকে সুবিন্যস্ত এবং সহজ পাঠ্য করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি, তবে সীমিতরিক্ত সংক্ষেপ করিনি। আর আমি অতিরিক্ত কিছু বিষয় সংযোজন করেছি।

মুখ্যতাসারুল মা 'আলী -৭

نِعَمٌ : قوله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ -এর আলোচনা শুরু করেছেন। نِعَمْ : নিশ্চিতভাবেই , حرف معطوف عليه কি হবে? এ নিয়ে দু'টি মত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, اسْتَسْلُ জুমলা ১. اِنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ ২. اسْتَسْلُ اللّٰه ৩. প্রথম অংশে نِعَمْ الْوَكِيلُ-এর পূর্বে তিনটি বাক্য বা জুমলা রয়েছে। সূত্রাং نِعَمْ الْوَكِيلُ যদি এর উপর معطوف হয়, তাহলে نِعَمْ الْوَكِيلُ ও حال হব। কেননা, আমরা জানি المعطوف عليه -এর যে hukm -এরও একই hukm । কিন্তু نِعَمْ الْوَكِيلُ এখানে জুমলায় ইনশাইয়াহ হওয়ার কারণে حال হতে পারে না। সূত্রাং نِعَمْ الْوَكِيلُ এখানে المعطوف عليه হতে পারে না। এরপর نِعَمْ الْوَكِيلُ ও اِنَّهُ وَلِيُّ ذٰلِكَ -এর পূর্বের বাক্যের সবব হয়েছে। সূত্রাং نِعَمْ الْوَكِيلُ কে এর উপর معطوف করা হলে نِعَمْ الْوَكِيلُ ও সবব হবে। যেহেতু نِعَمْ الْوَكِيلُ জুমলায় ইনশাইয়াহ তাই এটি সবব হতে পারে না। অতএব, نِعَمْ الْوَكِيلُ -এর উপর نِعَمْ هو حَسْبِي . আমরা পেছনে বলে এসেছি যে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। ১. نِعَمْ هو حَسْبِي -এর পুরো বাক্য নয়। প্রথম অংশ তো এখানে নেই, কারণ আমরা জানি نِعَمْ هو حَسْبِي -এর জন্য তিনটি অংশ প্রয়োজন ১. فاعِل مَدَح , ২. فاعِل مَدَح , ৩. فاعِل مَدَح . এখানে نِعَمْ হলো ফেলৈ মাদাহ, الْوَكِيل হলো তার ফায়িল মাদাহ, মাখসূস বিল মাদাহ তো নেই। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন- এখানে মাখসূস উহ আছে। মূল ইবারত এরূপ হবে- نِعَمْ الْوَكِيلُ اللّٰهُ

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী বাহ্যিকভাবে **عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمَفْرَدِ** হচ্ছে। অথচ এ ধরনের বাক্য আরবি ব্যাকরণে সঠিক নয়, তাহলে এখানে তারকীব কিভাবে সঠিক হবে? এর উত্তর হলো, যদি কোনো **مفرد**-এর মধ্যে ফে'লের অর্থ থাকে, তাহলে সে **مفرد**-কে ফে'ল-এর হুকুমে ধরা যায়। এখানে **مَحْسَبِي** মুফরাদ **مَحْسَبِي**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর **مَحْسَبِي** (যা শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে) জুমলা। সুতরাং এ অবস্থায়ও **عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ** হবে। দ্বিতীয় তারকীবের মধ্যে **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর মাখসূস বিল মাদাহ হবে **وَمِنْ ضَمِيرِ** যা **مَحْسَبِي**-এর আগে রয়েছে। মূল ইবারত হবে এক্রপ-**وَمِنْ نِعَمَ الْوَكِيلُ** (কেননা, **عطف**-এর ক্ষেত্রে **عليه**-এর আগে যে শব্দ থাকে **معطوف**-এর আগেও সেই শব্দই ধরা হয়।)

মোটকথা, **ضَمِير** হবে মাখসূস যা **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর আগে এসেছে। সাধারণত মাখসূস জুমলার পরে আসে। আল্লামা তাফতায়ানী (র.)-এর মতে পরে আসাটাই সঠিক। কিন্তু এখানে মাখসূসকে আল্লামা সাক্বাকীর মতানুযায়ী আগে আনা হয়েছে, যা তাফতায়ানীর মতের বিরোধী সিদ্ধান্ত। তাই তিনি মাখসূস বিল মাদাহ আগে আসার বিষয়টিকে আল্লামা সাক্বাকী (মিফতাহুল কিতাবের লেখক) এবং অন্যান্যদের মতো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, **زَيْدٌ نِعَمَ الرَّجُلِ**-এর মধ্যে সাক্বাকী প্রমুখের মতে **زَيْدٌ** যেমন মাখসূস (যা আগে এসেছে) তেমনি **الْوَكِيلُ**-এর মধ্যেও **هُوَ** মাখসূস। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, উভয় অবস্থায় অর্থাৎ **معطوف عليه**, অথবা শুধু **حَسْبِي** জুমলায় খবরিয়্যার উপর জুমলায় ইনশাইয়ার **عطف** হচ্ছে। কারণ **نِعَمَ الْوَكِيلُ** তো ইনশাইয়্যাহ। অথচ এটি জায়েজ নেই। কিন্তু সাযিদ্ শরীফ **مَطْرُوف**-এর পার্শ্ব টীকায় লিখেছেন যে, তাফতায়ানী বিষয়টিকে যতটা কঠিন করেছেন বিষয়টি মূলত ততটা কঠিন নয়। কারণ, **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর পূর্বে যদি **فِي شَأْنِهِ** উহা রাখা হয়, তাহলে ইবারত হবে এক্রপ-**نِعَمَ الْوَكِيلُ**। এখন এটি জুমলায় ইসমিয়াই খবরিয়্যায় পরিণত হলো। অতএব, এখন **عَطْفُ الْخَبَرِيَّةِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ** হলো।

সার-সংক্ষেপ :

ক. **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর আতফ দু'ভাবে হতে পারে। এক. মা'তূফ আলাইহি অথবা দুই. শুধুমাত্র **حَسْبِي**। প্রথম অবস্থায় **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর **عطف** হবে **جملة**-এর উপর, আর দ্বিতীয় অবস্থায় **عطف** হবে **مفرد**-এর উপর।

খ. **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর মাখসূস বিল মাদাহ **نِعَمَ الْوَكِيلُ**-এর পূর্বের **هُوَ** মাখসূস এখানে উহা আছে।

مُقَدِّمَةٌ رَّتَبَ الْمُخْتَصَرَ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ فُنُونٍ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِيهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمُقَاصِدِ فِي هَذَا الْفَنِّ أَوْ لَا الْثَّانِي الْمُقَدِّمَةُ وَالْأَوَّلُ إِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْخَطَا فِي تَأْيِيدِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فَهُوَ الْفَنُّ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ فَهُوَ الْفَنُّ الثَّانِي وَإِلَّا فَهُوَ الْفَنُّ الثَّالِثُ وَجَعَلَ الْخَاتِمَةَ خَارِجَةً عَنِ الْفَنِّ الثَّالِثِ وَهُمْ كَمَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَّا انْجَرَّ كَلَامُهُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلَى انْحِصَارِ الْمُقْصُودِ فِي الْفُنُونِ الثَّلَاثَةِ نَاسَبَ ذِكْرُهَا بِطَرِيقِ التَّعْرِيفِ الْعَهْدِيِّ بِخِلَافِ الْمُقَدِّمَةِ فَإِنَّهَا لَا مُقْتَضَى لِإِبْرَادِهَا بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فَنَكَّرَهَا وَقَالَ مُقَدِّمَةٌ وَالْخِلَافُ فِي أَنْ تَنْوِنَهَا لِلتَّعْظِيمِ أَوْ التَّقْلِيلِ مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ بَيْنَ الْمُحْصِلَيْنِ -

অনুবাদ : এটি মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা)। লেখক মুখতাসার (তালখীস)-কে একটি মুকাদ্দিমাহ ও তিনটি বিষয়ে বিন্যস্ত করেছেন। কেননা, এতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হয়তো এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে পড়ে না অথবা পড়ে। দ্বিতীয় প্রকার হলো মুকাদ্দিমাহ। প্রথম প্রকারে যদি উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে ভুলের থেকে দূরে থাকা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটা প্রথম বিষয়। আর যদি তা না হয়ে **تَعْقِيدٌ مَعْنَوِيٌّ** (ভাবগত দুর্বোধ্যতা) থেকে দূরে থাকা উদ্দেশ্য হয়, তবে এটি দ্বিতীয় বিষয়। আর যদি তাও না হয় (তাহলে) এটি তৃতীয় বিষয়। খাতেমা (পরিশিষ্ট)-কে তৃতীয় বিষয়ের বাইরে গণ্য করা একটি ভ্রান্তি, যা ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করব। আর যখন এ মুকাদ্দিমার শেষভাগে মাকসাদকে তিনটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করার কথা তিনি বলেছেন, অতএব একে নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা সমীচীন হলো। কিন্তু মুকাদ্দিমা শব্দটি এর বিপরীত। কেননা, একে নির্দিষ্টরূপে আনার জন্য এখানে কোনো দাবি নেই। এ কারণে একে **نَكْرَهُ** (অনির্দিষ্টরূপে) আনা হলো এবং বললেন **مُقَدِّمَةٌ**। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ তানবীন (তা'যীম) সম্মান প্রদর্শনের জন্য হবে নাকি সামান্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে- এ নিয়ে অবশ্য ছাত্রদের ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُقَدِّمَةٌ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর, অর্থাৎ **مُقَدِّمَةٌ**। **هَذِهِ** কিতাবের লেখক এ কিতাবে একটি **مُقَدِّمَةٌ** ও তিনটি বিষয়ের তথ্য ফনের আলোচনা করেছেন। মুসান্নিফ (র.) মুকাদ্দিমা এবং তিনটি বিষয়ের মধ্যে তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন বা দলিলে হসর বর্ণনা করেছেন, তা এভাবে- এ কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথমত দুপ্রকার। হয়তো আলোচনা মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট না হলে এটি মুকাদ্দিমা। আর যদি সংশ্লিষ্ট হয়, তবে হয় উদ্দেশ্য হবে উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে ভুল থেকে দূরে থাকা তাহলে এটি প্রথম বিষয় বা ইলমে মা'আনী। অথবা উদ্দেশ্য হবে **تَعْقِيدٌ مَعْنَوِيٌّ** থেকে দূরে থাকা, তাহলে এটি দ্বিতীয় বিষয় বা ইলমে বয়ান। আর যদি এ দু'টি উদ্দেশ্য না হয়; বরং উদ্দেশ্য হয় ইবারতের মধ্যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য বর্ণন তাহলে এটি তৃতীয় বিষয় বা ইলমে বদী'।

قَوْلُهُ جَعَلَ الْخَاتِمَةَ خَارِجَةً عَنِ الْفَرْقِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, এ কিতাবের শেষাংশে একটি خَاتِمَةٌ রয়েছে। মুসান্নিফ (র.) এ কিতাবকে তিনটি বিষয়ে এবং একটি মুকাদ্দিমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন এটা বলা হলো, অথচ তিনি خَاتِمَةَ-এর সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এর উত্তর হলো, কিতাবের শেষভাগে উল্লিখিত (خَاتِمَةٌ) পরিশিষ্টটি فَرْقٌ বা তৃতীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যেহেতু এটি তৃতীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য হবে, তাই মূল কিতাবের অংশ হিসেবে গণ্য হবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, যারা خَاتِمَةَ-কে তৃতীয় বিষয়ের অংশ মনে করে না; বরং এর বাইরে মনে করে- তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَمَّا انْجَزَ كَلَامَهُ فَيُخْرِجُ هَذَا الْخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, তালখীসুল মিফতাহ কিতাবের লেখক مُقَدِّمَةٌ শব্দটিকে نَكَرَهُ (নির্দিষ্ট), আর তিনটি বিষয়কে مَعْرِفَةٌ নির্দিষ্টরূপে কেন বর্ণনা করেছেন। তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন- الْفَرْقُ الْأَوَّلُ، الْفَرْقُ الثَّانِي، الْفَرْقُ الثَّلَاثُ এর উত্তর হলো, ইসমের আসল হলো نَكَرَهُ, তবে معرفة আনার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ যখন থাকে, তখন ইসমটি معرفة রূপে আনা হয়। যেমন কোনো একটি শব্দকে একবার বলা হলো। এরপর দ্বিতীয়বার বলার সময় সেই ইসমকে الف ولام عهد রূপে الف ولام-এর সাথে معرفة বা নির্দিষ্ট করে বলা হয়। তবে এ الف ولام দ্বারা معرفة করার জন্য অবশ্যই এর আলোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্ব হওয়া জরুরি। সুতরাং এ স্থানে যেহেতু مُقَدِّمَةٌ শব্দটির আলোচনা ইতঃপূর্বে হয়নি এবং একে معرفة করার কোনো কারণও নেই, তাই একে نَكَرَهُ রূপে আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে, الْفَرْقُ الْأَوَّلُ، الْفَرْقُ الثَّانِي، الْفَرْقُ الثَّلَاثُ বলার পূর্বে যেহেতু এ তিন فَرْقٌ বা বিষয়ের আলোচনা লেখক مُقَدِّمَةٌ-এর শেষে করেছেন, তাই এগুলোকে معرفة (নির্দিষ্টসূচক) ভাবে আগে আনা যথার্থ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ فِي أَنْ تَنْوِيْنَهَا لِلتَّعْظِيمِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) مُقَدِّمَةٌ শব্দের "ة"-এর উপর যে তানবীন রয়েছে, সেটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। কারো মতে এটি تَعْظِيمٌ বা বড়-মহৎ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এ মতের স্বপক্ষে তারা বলেন, مُقَدِّمَةٌ যেহেতু খুবই উপকারী তাই এটি تَعْظِيمٌ-এর অর্থে হবে। আর যারা মনে করেন مُقَدِّمَةٌ খুব বেশি তাৎপর্যবহু নয়, তারা তানবীনকে تَقْلِيلٌ-এর অর্থে বলেছেন। মুসান্নিফ (র.) এরপর বলেছেন যে, এটি অর্থাৎ তানবীন কোন প্রকারের তা নিয়ে আলোচনা এমন এক বিষয়, যার বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। এ জন্যে এতে ছাত্র ও আলিমগণের মূল্যবান সময় ব্যায় করা উচিত নয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. তালখীসুল মিফতাহ কিতাবে একটি ভূমিকা এবং তিনটি মূল বিষয় রয়েছে। ভূমিকাটি মূল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়।

খ. ইলমুল মা'আনীর সাহায্যে শাব্দিক ভুল-ত্রুটি থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

গ. ইলমুল বয়ানের সাহায্যে অর্থগত দুর্বোধ্যতা থেকে বিরত থাকা যায়।

ঘ. ইলমুল বদী' দ্বারা বাক্যের শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

وَالْمُقَدَّمَةُ مَأْخُذَةٌ مِنْ مُقَدَّمَةِ الْجَيْشِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْهَا مِنْ قَدَّمَ بِمَعْنَى تَقَدَّمَ
يُقَالُ مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ لِمَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّرُوعُ فِي مَسَائِلِهِ وَمُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ لِطَائِفَةٍ مِنْ
كَلَامِهِ قَدِّمَتْ أَمَامَ الْمُقْصُودِ لِإِرْتِبَاطٍ لَهُ بِهَا وَانْتِفَاعٍ بِهَا فِيهِ وَهِيَ هُنَا لِبَيَانِ مَعْنَى
الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَانْحِصَارِ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ فِي عِلْمِي الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَمَا يَلَايِمُ ذَلِكَ
وَلَا يَخْفَى وَجْهُ إِرْتِبَاطِ الْمَقَاصِدِ بِذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقَدَّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدَّمَةِ الْكِتَابِ مِمَّا خَفِيَ
عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْفَصَاحَةُ هِيَ فِي الْأَصْلِ تَنْبِيءٌ عَنِ الْإِبَانَةِ وَالظُّهُورِ يُوصَفُ بِهَا
الْمُفْرَدُ مِثْلُ كَلِمَةٍ فَصِيحَةٍ وَالْكَلَامُ مِثْلُ كَلَامٍ فَصِيحٍ وَقَصِيدَةٍ فَصِيحَةٍ -

অনুবাদ : الْمُقَدَّمَةُ শব্দটি مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ তথা 'সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল' থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি قَدَّمَ (যা تَقَدَّمَ-এর অর্থে ব্যবহৃত) থেকে নির্গত হয়েছে। ঐ সব বিষয়কে مُقَدَّمَةُ الْعِلْمِ বলা হয় যার উপর সেই জ্ঞানের বিশদ বিষয়াবলির আলোচনার সূচনা নির্ভরশীল। আর مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয় কিতাবের ঐ অংশকে, যাকে মূল উদ্দেশ্যের আগে আনা হয়। উদ্দেশ্যের সম্পর্ক এর সাথে থাকা এবং এর দ্বারা মূল মাকসাদের মাঝে উপকৃত হওয়ার কারণে। এটি এখানে ফাসাহাত ও বালাগাতের অর্থ এবং ইলমে বালাগাত দু'টি ইলম তথা ইলমে মা'আনী ও ব্যান এবং বালাগাতের অনুগামী ইলম (তথা ইলমে বদী)-এর মাঝে সীমাবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা দানের জন্য। এ সকল বিষয়ের সাথে মূল মাকসাদের সংযোগ থাকার দিকটি এখানে অস্পষ্ট নয়। আর মুকাদ্দামাতুল কিতাব ও মুকাদ্দামাতুল ইলমের মাঝে পার্থক্য এমন যে, তা অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। ফাসাহাত শব্দটি মূলত প্রকাশ হওয়া ও স্পষ্ট হওয়ার অর্থ প্রদান করে। মুফরাদ শব্দকে ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত করা হয়। যেমন (বলা হয়) كَلِمَةٌ فَصِيحَةٌ এবং কালাম (পূর্ণবাক্য ফাসাহাত দ্বারা) বিশেষিত হয়। যেমন বলা হয়- كَلَامٌ فَصِيحٌ ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ (ভূমিকা) শব্দটি مُقَدَّمَةُ (র.) বলেছেন, قَوْلُهُ وَالْمُقَدَّمَةُ مَأْخُذَةٌ مِنْ مُقَدَّمَةِ الْجَيْشِ থেকে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের প্রথমে জানতে হবে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ কাকে বলে। مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ বলা হয়, যে কোনো সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে- যে দলকে সাধারণত শত্রুবাহিনীর অবস্থান এবং তাদের খোঁজ খবর ও নিজ বাহিনীর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য পাঠানো হয়। যেমনিভাবে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ মূল বাহিনীর আগে চলে তেমনি مُقَدَّمَةُ মূল কিতাবের আগে আসে, যা কিতাব সম্পর্কে পাঠকদের আগাম ধারণা দিয়ে থাকে। উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে مُقَدَّمَةُ কে مُقَدَّمَةُ الْجَيْشِ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, مُقَدَّمَةُ শব্দটি ধাতুগতভাবে قَدَّمَ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা মোটামুটি এরূপ- مُقَدَّمَةُ শব্দটির দাল-এর নিচে যের এবং দাল-এর উপর যবর উভয়ভাবেই পড়া যায়। যদি দাল-এর নিচে যের পড়া হয়, তবে এর ফে'ল قَدَّمَ যা تَقَدَّمَ (ফে'লে লামেয)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনের আয়াত- لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (অর্থঃ মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না) এ বাক্যে تَقَدِّمُوا শব্দটি تَقَدَّمَ (এ-যবর দিয়ে)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় مُقَدَّمَةُ শব্দের অর্থ- যা অগ্রে এসেছে। তবে এটি قَدَّمَ (ফে'লে মুতা'আদী) থেকেও নির্গত হতে পারে। তখন অর্থ হবে, যা অন্যকে অগ্রগামী করে দেয়। আর যদি مُقَدَّمَةُ শব্দটিকে দাল-এর উপর যবর দিয়ে পড়া হয়, তবে এটি قَدَّمَ ফে'লে মুতা'আদী থেকে নির্গত হবে। তখন এর অর্থ হবে, যাকে আগে আনা হয়েছে। যেহেতু مُقَدَّمَةُ-কে মূল কিতাবের আগে আনা হয়, তাই একে مُقَدَّمَةُ বলা হয়। তবে মুকাদ্দিমা শব্দটি মুতাকাদ্দিমা অর্থ গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُقَدَّمَةُ দু' প্রকার : ১. مُقَدَّمَةُ الْكِتَابِ ।

مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ বলা হয়- এমন সব বিষয়কে (অর্থাৎ তিনটি বিষয় যথা- সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) যার উপর সেই জ্ঞানের মাসায়িল বুঝা নির্ভরশীল। আর مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয়-এমন সব বিষয়কে যা কিতাবের শুরুতে আনা হয় এবং এ সব বিষয়াদির সাথে কিতাবের মূল বক্তব্যের যোগসূত্র থাকে এবং এসব বিষয় জানার দ্বারা মূল মাকসাদের ক্ষেত্রে উপকারও পাওয়া যায়।

এ কিতাবের মুকাদ্দিমাতে লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তারপর ইলমে বালাগাত তথা ইলমে মা'আনী ও বয়ান এবং (বালাগাতের সংশ্লিষ্ট ইলম) ইলমে বদী'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, মুকাদ্দিমাতে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সাথে মূল মাকসাদ বা আলোচনার সম্পর্ক কারো কাছে অস্পষ্ট নেই। কেননা, মুকাদ্দিমাতে যেসব বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে সে বিষয়গুলোরই তাফসীল বা বিস্তারিত আলোচনা কিতাবে এসেছে।

قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَمُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলতে চেয়েছেন যে, কিতাবের মুকাদ্দিমা ও ইলমের মুকাদ্দিমার মাঝে পার্থক্য অনেকের কাছেই স্পষ্ট নয়। তারা উভয় মুকাদ্দিমাকে এক করে দেখেন। তিনি পেছনের লেখায় উভয়ের মাঝে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর লিখিত মুকাদ্দিমা কিতাবের মুকাদ্দিমা, ইলমের মুকাদ্দিমা নয়। যদি এটি ইলমের মুকাদ্দিমা হতো তাহলে মা'আনী, বয়ান ও বদী'-এর সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সবই থাকত; কিন্তু লেখক এ মুকাদ্দিমায় শুধুমাত্র ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখেছেন। এদের সংজ্ঞা এবং আলোচ্য বিষয় লেখক আনেনননি। অতএব, এটি মুকাদ্দিমাতুল কিতাব হবে, মুকাদ্দিমাতুল ইলম হতে পারে না। তা ছাড়া এ দু'টির মাঝে আরেক পার্থক্য হলো, মুকাদ্দিমাতুল ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মা'আনী আর মুকাদ্দিমাতুল কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الْفَنَاءُ বা শব্দের সমষ্টি।

সার-সংক্ষেপ :

ক. مُقَدِّمَةُ-এর قَدَّمَ ফে'লটি লায়েম ও মুতাআদী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। مُقَدِّمَةُ কথাটি مُقَدِّمَةُ الْجَيْشِ হতে গৃহীত। আর مُقَدِّمَةُ الْجَيْشِ বলা হয় সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলকে। এখানে কিতাবের শুরু কথাকে مُقَدِّمَةُ বলা হয়েছে। مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয় কিতাবের প্রারম্ভিক আলোচনাকে।

খ. লেখকের এই مُقَدِّمَةُ টি مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

গ. مُقَدِّمَةُ الْعِلْمِ বলা হয় সেই ইলমের সংজ্ঞা, আলোচ্য বিষয় এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে। আর مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ বলা হয় কিতাবের প্রারম্ভিক আলোচনাকে।

قَوْلُهُ الْفَصَاحَةُ هِيَ فِي الْأَصْلِ تَنْبِيْ : মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, অভিধানে ফাসাহাত শব্দটি স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার অর্থ প্রদান করে। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসান্নিফ (র.) الْفَصَاحَةُ لُغَةً الْأَبَانَةُ وَالظُّهُورُ এভাবে না বলে বরং الْفَصَاحَةُ تَنْبِيْ عَنْ বলেছেন। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, মুসান্নিফ এভাবে ফাসাহাতের অর্থ কেন বর্ণনা করলেন? এর উত্তর হলো, الْأَبَانَةُ وَالظُّهُورُ ফাসাহাতের প্রকৃত আভিধানিক অর্থ নয়; বরং ফাসাহাতের একাধিক অর্থ থেকে এ দু'টি অর্থ পাওয়া যায়। ফাসাহাত শব্দের অর্থগুলো নিম্নরূপ- ১. মুখে কথা ফোটা বা কথা বলতে পারা। ২. কোনো তরল কিছুর উপর থেকে ফেনা বা বুদবুদ সরে যাওয়া। ৩. ভোরের আলো। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ তিনটি অর্থের মধ্যে 'দালালতে ইলতিযামী' হিসাবে প্রকাশ হওয়া এবং স্পষ্ট হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। যদিও এর আভিধানিক অর্থ তা নয়। এরপর মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন- ১. ফাসাহাতে মুফরাদ, ২. ফাসাহাতে কালাম ও ৩. ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম।

ফাসাহাতে মুফরাদ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুফরাদ বা কালিমা (একক শব্দ) ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় এবং ফাসাহাত শব্দটি মুফরাদ বা কালিমার সিফাত হয়। যেমন- বলা হয়, كَلِمَةٌ فَصِيحَةٌ, وَ مُفْرَدٌ فَصِيحٌ, ফাসাহাতে কালাম : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - কালাম বা বাক্য ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় এবং ফাসাহাত শব্দটি কালামের সিফাত হয়। যেমন বলা হয়, قَصِيدَةٌ فَصِيحَةٌ وَ كَلَامٌ فَصِيحٌ।

قِيلَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ مَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ لِبَعْمِ الْمُرْكَبِ الْإِسْنَادِي وَغَيْرُهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيِّنَةً مِنَ الْقَصِيدَةِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَى إِسْنَادٍ يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِالنَّفْصَاحَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لَوْ أَطْلَقُوا عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمُرْكَبِ أَنَّهُ كَلَامٌ فَصِيحٌ وَلَمْ يَنْقُلْ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَاتَّصَفَاهُ بِالنَّفْصَاحَةِ بِجَوُزٍ أَنْ يَكُونَ بِإِعْتِبَارِ فَصَاحَةِ الْمُفْرَدَاتِ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفْرَدِ لِأَنَّهُ يُقَالُ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمُرْكَبِ وَعَلَى مَا يُقَابِلُ الْمُشْتَمِلِ وَالْمَجْمُوعِ وَعَلَى مَا يُقَابِلُ الْكَلَامِ وَمُقَابَلَتُهُ بِالْكَلَامِ هُنَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَخِيرُ أَعْنَى مَا لَيْسَ بِكَلَامٍ وَ يُوصَفُ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ أَيْضًا يُقَالُ كَاتِبٌ فَصِيحٌ وَشَاعِرٌ فَصِيحٌ وَالبَلَاغَةُ وَهِيَ تَنْبِيءٌ عَنِ الْوُصُولِ وَالْإِنْتِهَاءِ يُوصَفُ بِهَا الْأَخِيرَانِ فَقَطَّ أَيْ الْكَلَامُ وَالْمُتَكَلِّمُ دُونَ الْمُفْرَدِ إِذْ لَمْ يُسْمَعْ كَلِمَةً بَلِيغَةً -

অনুবাদ : কারও কারও মতে কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন বাক্য যা কালিমা নয়। তাহলে কালাম মুরাক্কাবে ইসনাদী এবং ইসনাদবিহীন মুরাক্কাব (উভয়কে) শামিল করে। কেননা, কখনো কবিতার একটি পঙ্ক্তিতে এমন ইসনাদ থাকে না, যার উপর চুপ থাকা যায়। এতদসত্ত্বেও এটি ‘ফাসাহাত’ দ্বারা বিশেষিত হয়। তবে এ মতের উপর আপত্তি আছে। এ (মতটি) কেবল তখনই সঠিক হতো যদি তারা (আরবরা) এ জাতীয় মুরাক্কাবকে **كَلَامٌ** বলত। অথচ তাদের থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে একে ফাসাহাতযুক্ত বলা যেতে পারে এর একক শব্দাবলির ফসীহ হওয়ার ভিত্তিতে। তা ছাড়া সঠিক কথাতো এটাই যে, এগুলো মুফরাদ-এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মুফরাদ বলা হয় যা মুরাক্কাবের বিপরীতে বা দ্বিবচন ও বহুবচনের বিপরীতে এবং কালামের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে কালামের বিপরীতে ব্যবহার করাটা প্রমাণ করে যে, এখানে শেষার্থ (কালাম নয়)-ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুফরাদ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য (এমন মুরাক্কাব) যা কালাম নয়। আর মুতাকাল্লিম ও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয়। যেমন- বলা হয় **كَاتِبٌ فَصِيحٌ** ও **شَاعِرٌ فَصِيحٌ** (অর্থাৎ একজন সাবলীল ভাষার লেখক এবং সুভাষী কবি।) বালাগাত শব্দটি **وُصُولٌ** (পৌছা) এবং **إِنْتِهَاءٌ** (সমাপ্তিতে উন্নীত হওয়া)-এর অর্থ প্রদান করে। এর দ্বারা কেবল শেষ দু’টি অর্থাৎ কালাম এবং মুতাকাল্লিম বিশেষিত হয়। মুফরাদ বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয় না। কেননা, **كَلِمَةً بَلِيغَةً** কাউকে বলতে শোনা যায়নি।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

قِيلَ الْمُرَادُ بِالْكَلَامِ : এ ইবারত দ্বারা মূল লেখকের উপর উত্থাপিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে- উত্তরটি দিয়েছেন খালখালী ও যুযানী (র.)। প্রশ্নটি হলো, কিছু বাক্যাংশ রয়েছে যা কালিমাও নয় এবং কালামও নয়। যেমন- মুরাক্কাবে নাকিস- এটি মুফরাদ নয়, কারণ মুরাক্কাব মুফরাদের বিপরীত। আবার কালামও নয়। কারণ, কালাম বলা হয় মুরাক্কাবে তামকে। এটি মুরাক্কাবে তাম নয়। অতএব, লেখক মুরাক্কাবে নাকিসের ব্যাপারে নীরব রইলেন। এঃ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুরাক্কাবে নাকিস ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হতে পারে না। অথচ বিষয়টি এমন নয়; বরং মুরাক্কাবে নাকিসও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয়। যেমন- বলা হয় **مُرْكَبٌ فَصِيحٌ**। সুতরাং বুঝা গেল যে, মূল লেখকের কথার মাঝে অপূর্ণতা রয়েছে। লেখকের এ অপূর্ণতা নিরসনে আল্লামা খালখালী ও যুযানী এগিয়ে এসেছেন। তারা মুরাক্কাবে নাকিসকে

লেখকের বর্ণিত 'কালাম'-এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তারা বলেন, এখানে কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য আম বা ব্যাপক অর্থাৎ مَا لَيْسَ بِكَلامٍ যা কালিমা নয়, তাই কালাম। কালামের এ সংজ্ঞা দ্বারা مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ কালামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, مُرَكَّبٌ নাকি না। এভাবে তারা মুরাক্কাবে নাকিসকে কালামের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু মুসান্নিফ তাদের এ উত্তরটিকে نَظَرُ فِيهِ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, আরবগণ যদি এ ধরনের (নাকিস) মুরাক্কাবে فَصِيحٌ কলাম বলত, তবে এ বক্তব্য সঠিক হতো; কিন্তু আরবগণ এ ধরনের মুরাক্কাবে فَصِيحٌ কলাম বলে না। এরপর তিনি লেখকের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব এভাবে দেন যে, 'মুরাক্কাবে নাকিস'-কে مُرَكَّبٌ فَصِيحٌ বলা হয় এর মুফরাদগুলোর হিসেবে, মুরাক্কাবের হিসেবে নয়। অর্থাৎ মুরাক্কাবে নাকিসের সবগুলো মুফরাদ ফসীহ হলে একে مُرَكَّبٌ فَصِيحٌ বলা হয়। অতএব মুরাক্কাবে নাকিসকে কালামের অন্তর্ভুক্ত করাটা সঠিক নয়।

قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ دَاخِلٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, আমরা যদি মেনেও নেই যে, مُرَكَّبٌ -কে তার গোটা সত্তা হিসেবেই فَصِيحٌ বলা হয়েছে, (মুফরাদগুলো হিসেবে নয়) তবু মূল লেখকের কথায় কোনো অপূর্ণতা নেই। কারণ, مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ তো এখানে মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু মুফরাদ ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় এবং মুরাক্কাবে নাকিসও মুফরাদ, অতএব, مُرَكَّبٌ نَاقِصٌও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হবে। এর দলিল : ১. মুফরাদকে কখনো মুরাক্কাবের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন- বলা হয় এটি মুফরাদ মুরাক্কাব নয়। ২. মুফরাদকে কখনো দ্বিবচন, বহুবচনের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন- বলা হয় এটি মুফরাদ, দ্বিবচন বা বহুবচন নয়। ৩. আবার কখনো কালামের বিপরীতে ব্যবহার করা হয়। যেমন- বলা হয় এটি মুফরাদ, কালাম নয়। এ তিন ব্যবহারের মধ্যে মূল লেখকের এখানে তৃতীয়টিই উদ্দেশ্য। কারণ তিনি এখানে মুফরাদকে কালামের বিপরীতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, وَتَوْصِفُ مَا لَيْسَ بِكَلامٍ অর্থাৎ যা কালাম নয় তাই মুফরাদ। আর আমরা জানি, مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ কালাম নয়। অতএব, مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ এখানে মুফরাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা হলো, যেহেতু মুফরাদ বলার দ্বারা 'মুরাক্কাবে নাকিস'ও বলা হয়েছে, তাই مُرَكَّبٌ নাকি -কে আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের লেখক তাই আলাদা করে উল্লেখ করেননি। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, متكلم বা ব্যক্তিকে ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত করা যায়। যেমন- কেউ বলল كَاتِبٌ فَصِيحٌ وَشَاعِرٌ فَصِيحٌ।

সার-সংক্ষেপ :

ক. فَصَاحَةٌ শব্দের অর্থ- সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ। অলংকারশাস্ত্রে ফাসাহাত শব্দ বাক্য এবং বক্তা (متكلم)-এর وصف (বিশেষণ) হয়।

খ. আব্বামা তাফতায়ানী (র.)-এর মতানুযায়ী مُرَكَّبٌ নাকি মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত, কালামের অন্তর্গত নয়। অতএব মুফরাদ যেমন ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হয় তদ্রূপ মুরাক্কাবে নাকিসও ফাসাহাত দ্বারা বিশেষিত হবে।

دُ' بلاغة শব্দটি পৌছা, সমাপ্তিতে উন্নীত হওয়া-এর অর্থ প্রদান করে। ১. বালাগাতে কালাম ও ২. বালাগাতে মুতাকাল্লিম। অর্থাৎ কালাম ও মুতাকাল্লিম বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয়। তবে মুফরাদ বা কালিমা বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয় না। কারণ, আরবি ভাষাভাষীদের থেকে কালিমা بَلِيغَةٌ বলতে শোনা যায় না। আর এটা জানা কথা যে, যদি কালিমা বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হতো, তাহলে অবশ্যই আরবরা كَلِمَةٌ بَلِيغَةٌ বলত। উল্লেখ্য যে, مُرَكَّبٌ নাকিও যেহেতু মুসান্নিফের মতে مفرد-এর অন্তর্ভুক্ত, তাই مُرَكَّبٌ নাকি-এরও মুফরাদের মতো হুকুম অর্থাৎ মুরাক্কাবে নাকিস বালাগাত দ্বারা বিভূষিত হতে পারে না। এটি তার মতে মুফরাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে মূল লেখক আলাদা করে একে উল্লেখ করেননি।

وَالْتَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْبَلَاغَةَ إِنَّمَا هِيَ بِإِعْتِبَارِ الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ فِي الْمَفْرَدِ وَهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِي بَلَاغَةِ الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَإِنَّمَا قَسَمَ كَلًّا مِّنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَوَّلًا لِتَعَذُّرِ جَمْعِ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ الْغَيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِي أَمْرِ يَعْمُهَا فِي تَعْرِيفٍ وَاحِدٍ وَهَذَا كَمَا قَسَمَ ابْنُ الْحَاجِبِ الْمُسْتَثْنَى إِلَى مُتَّصِلٍ وَمُنْقَطِعٍ ثُمَّ عَرَفَ كَلًّا مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ -

অনুবাদ : এর কারণ দর্শানো হয় যে, বালাগাত তো বাক্য **مُقْتَضَى**-এর অনুযায়ী হওয়ার দ্বারা পাওয়া যায়। অথচ এটি মুফরাদে হতে পারে না। (তাই মুফরাদ বালাগাত দ্বারা বিশেষিত হয় না) এটা ভুল। কারণ **مُقْتَضَى**-এর অনুযায়ী হওয়া কেবল বালাগাতে কালাম এবং মুতাকাল্লিম-এর মধ্যে হয়। লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের প্রকারভেদ প্রথমে উল্লেখ করেছেন। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অর্থকে একটি সংজ্ঞার মধ্যে একত্রিত করা অসম্ভব হওয়ার কারণে। এটি ইবনে হাজিব (কাফিয়া কিতাবের লেখক) যেরূপ মুস্তাহ্সনাকে মুত্তাসিল ও মুনকাতি' দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এরপর প্রত্যেকটির আলাদা সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তার মতোই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْبَلَاغَةَ إِنَّمَا هِيَ بِإِعْتِبَارِ النِّجَ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ মুফরাদ বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার জন্য কি কারণ দায়ী? এ ব্যাপারে কতিপয় ব্যক্তির মতামতকে উল্লেখ করত সে মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তারা বলেন, বালাগাত বলা হয়- **مُقْتَضَى الْحَالِ** অর্থাৎ বাক্য **مُقْتَضَى**-এর অনুযায়ী হওয়াকে। বালাগাতের এ সংজ্ঞা যেহেতু মুফরাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাই মুফরাদ বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসান্নিফ তাদের উক্ত কারণ দর্শানো সম্পর্কে বলেন, এভাবে মুফরাদ-এর অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাখ্যা দেওয়া ভুল এবং ভিত্তিহীন কথা। এর প্রমাণ হচ্ছে- আপনারা বালাগাতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা মূলত বালাগাতে কালাম ও বালাগাতে মুতাকাল্লিম-এর জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়াও বালাগাতের এমন সংজ্ঞা থাকতে পারে যা মুফরাদকে শামিল করবে। সে হিসেবে মুফরাদ বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতএব এভাবে কারণ বর্ণনা না করে, বরং এ কথা বলাই উত্তম যা আমি আগে বলে এসেছি। অর্থাৎ আরবি ভাষা-ভাষীদের থেকে **كَلِمَةٌ بَلِيغَةٌ** বলতে শোনা যায় না। যদি মুফরাদ বালাগাতের সাথে বিশেষিত হতো, তাহলে অবশ্যই **مُفْرَدٌ بَلِيغٌ**; **كَلِمَةٌ بَلِيغَةٌ** এরূপ শোনা যেত। আর এ কারণেই মুফরাদ বালাগাতের সাথে বিশেষিত হয় না।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَسَمَ كَلًّا مِّنَ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখকগণ সাধারণভাবে প্রথমে কোনো একটি বিষয়ের সংজ্ঞা বর্ণনা করেন, এরপর প্রকারভেদ বর্ণনা করেন। কিন্তু এখানে তালখীসের লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের ক্ষেত্রে তা করেননি। তার এরূপ করাটা কি ঠিক? উত্তরের সারকথা হলো এই যে, **مُعَرَّفٌ** (যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়)-এর জন্য এমন একটি সার্বিক অর্থ থাকা দরকার, যা তার অধীনের সবগুলো বিষয়ের মাঝে পাওয়া যায়। আর অধীন বিষয়গুলো এই সার্বিক অর্থের মাঝে পরস্পর অভিন্ন। কিন্তু ফাসাহাত ও বালাগাতের মধ্যে এমন একটি সার্বিক অর্থ খুঁজে পাওয়া দুস্কর, যা উভয়ের প্রত্যেক অধীন বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান। এ জন্য প্রথমে **تقسيم** করে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। এ স্থানের জন্য এটিই যথার্থ হয়েছে। যেমন- কাফিয়া কিতাবের লেখক আব্দামা ইবনে হাজিব প্রথমে মুস্তাহ্সনার প্রকার বর্ণনা করেছেন, তারপর **متصل** ও **منقطع**-এর আলাদা সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

بَلَاغَةٌ শব্দের অর্থ পৌছা ও শেষপ্রান্তে উপনীত হওয়া। পরিভাষায় **بَلَاغَةٌ** শব্দটি বাক্য ও বক্তার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় মুফরাদ (**كَلِمَةٌ**)-এর বিশেষণ হয় না।

খ. মূল লেখক ফাসাহাত ও বালাগাতের সংজ্ঞা বর্ণনা না করে প্রথমেই প্রকারভেদ করেছেন। কেননা, ফাসাহাত ও বালাগাতের এমন সংজ্ঞা দান সম্ভব নয়, যা সব প্রকারকে শামিল করে। তাই তিনি প্রকারভেদ করে প্রত্যেক প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা লিখেছেন।

فَالْفَصَاحَةُ فِي الْمَفْرَدِ قَدَّمَ الْفَصَاحَةَ عَلَى الْبَلَاغَةِ لِتَوْقُفٍ مَعْرِفَةِ الْبَلَاغَةِ عَلَى
مَعْرِفَةِ الْفَصَاحَةِ لِكُونِهَا مَأْخُذَةً فِي تَعْرِيفِهَا ثُمَّ قَدَّمَ فَصَاحَةَ الْمَفْرَدِ عَلَى فَصَاحَةِ
الْكَلَامِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِتَوْقُفِهَا عَلَيْهَا خُلُوصَ أَيْ خُلُوصَ الْمَفْرَدِ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ
وَالْغَرَابَةِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اللَّغَوِيِّ أَيْ الْمُسْتَنْبِطِ مِنْ اسْتِقْرَاءِ اللَّغَةِ وَتَفْسِيرِ
الْفَصَاحَةِ بِالْخُلُوصِ لَا يَخْلُوصُ عَنْ تَسَامُحٍ -

অনুবাদ : মুফরাদের ক্ষেত্রে ফাসাহাত (এর সংজ্ঞা) তিনি ফাসাহাতকে বালাগাতের আগে এনেছেন, বালাগাতের পরিচয় ফাসাহাতের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে। কেননা, ফাসাহাত গৃহীত হয়েছে বালাগাতের মধ্যে। তারপর তিনি ফাসাহাতে মুফরাদকে ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের আগে এনেছেন, কারণ উভয়টি (ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম) ফাসাহাতে মুফরাদের উপর নির্ভরশীল। (সংজ্ঞা) ফাসাহাতে মুফরাদ বলা হয়- তানাকুরে হুরুফ, গারাবাত এবং মুখালিফাতে কিয়াসে লুগাবী থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ সেই কিয়াস বা নিয়ম যা অভিধান গবেষণা করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফাসাহাতের সংজ্ঞা خلوص দ্বারা করা- তাসামুহ থেকে মুক্ত নয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

فَالْفَصَاحَةُ فِي الْمَفْرَدِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতের তিন প্রকারের সংজ্ঞা বর্ণনা ও বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন, তাই تفصيلة ও فاء تفسيرية এর শুরুতে এনেছেন।

قَوْلُهُ قَدَّمَ الْفَصَاحَةَ عَلَى الْبَلَاغَةِ : বলে মুসান্নিফ ফাসাহাতকে বালাগাতের আগে আনার কারণ বর্ণনা করেছেন। কারণ হচ্ছে- বালাগাতের পরিচয় ফাসাহাতের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। কেননা, বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে ফাসাহাতের কথা রয়েছে যেমন বলা হয়েছে (বালাগাতের মধ্যে) فَصَاحَتِهِ سূত্রাং যেহেতু বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে ফাসাহাত গৃহীত হয়েছে এবং فصاحة শব্দটিকে নেওয়া হয়েছে, তাই আগে ফাসাহাতকে বুঝতে হবে। এরপর মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতে মুফরাদকে ফাসাহাতে কালাম ও ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের আগে আনার কারণ একইভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো, ফাসাহাতে কালাম ও মুতাকাল্লিম বুঝা ফাসাহাতে মুফরাদ বা কালিমা বুঝার উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ خُلُوصُهُ مِنْ تَنَافُرِ الْحُرُوفِ وَالْغَرَابَةِ وَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ اللَّغَوِيِّ : প্রথমে প্রশ্ন হলো, ফাসাহাতে মুফরাদের জন্য ক্ষতিকারক তিনটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যুক্তি কি? এর উত্তর হলো, মুফরাদের মধ্যে তিনটি দিক রয়েছে- ১. مَادِهِ বা তার মূল অক্ষরসমূহ, ২. তার আকৃতি বা সীগাহ ও ৩. তার দালালত বা অর্থ বুঝানো। সূত্রাং তার مَادِهِ-এর মধ্যে দোষ-ত্রুটি দেখা দিলে তাকে تنافر বলবে। তার সীগাহ-আকৃতির মধ্যে দোষ-ত্রুটি দেখা দিলে مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ اللَّغَوِيِّ বলবে। আর এর অর্থ বুঝানোর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে, তাকে غرابة বলবে। মুফরাদ এ তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হলো এ তিনটি বিষয়ের সাথে যুক্ত না হওয়া বা عَدَمُ الْإِتِّصَانِ। এখানে কোনো শব্দের মধ্যে এ তিনটি বিষয় প্রথমে হওয়ার পর এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া মোটেও উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ الْمُسْتَنْبِطُ مِنْ اسْتِقْرَاءِ اللَّفْظِ : মুসান্নিফের এ বাক্যটি الْقِيَاسُ الْغَوِيُّ-এর ব্যাখ্যা। শব্দটি শোনা মাত্র পাঠকের মনে পারিভাষিক কiyাসের কথা আসবে। অর্থাৎ একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সাথে মিলানো এদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকার ভিত্তিতে। কিন্তু সেই কiyাস এখানে উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে সেই কiyাস উদ্দেশ্য যা অভিধানশাস্ত্রে গবেষণা দ্বারা পাওয়া যায়। অর্থাৎ কiyাসে সরফী যেমন- অভিধানের শব্দাবলি সম্পর্কে তত্ত্ব-তালাশ করে তারা এ নিয়ম নির্ধারণ করেছেন যে, হরকতযুক্ত واو অথবা ياء-এর পূর্বের অক্ষর যদি যবর বিশিষ্ট হয়, তাহলে সেই واو এবং ياء-কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন মূল লেখকের উপর আরোপিত হতে পারে, তা হলো- মুসান্নিফ (র.) সরাসরি قِيَاسَ صَرْفِي বললেই তো পারতেন, তা না করে তিনি قِيَاسَ لُغَوِي বলে উদ্দেশ্য করেছেন। এর উত্তর হলো, তিনি قِيَاسَ لُغَوِي বলে ইঙ্গিত করেছেন এই দিকে যে, قِيَاسَ صَرْفِي-এর লক্ষ্য হলো অভিধানের শব্দাবলির গবেষণা-অনুসন্ধান। যদি قِيَاسَ لُغَوِي না বলতেন, তাহলে সে দিকে ইঙ্গিত হতো না।

قَوْلُهُ وَتَفْسِيرُ الْفَصَاحَةِ بِالْخُلُوصِ لَا يَخْلُو عَنْ تَسَامُحٍ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, ফাসাহাত শব্দটি وجودی বা অস্তিত্বশীল। কিন্তু এর সংজ্ঞা خُلُوصٌ (যা عدم-কে লায়েম করে) দ্বারা করা কতটা সঠিক? কারণ তখন একটি অস্তিত্বশীল শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে অনস্তিত্বশীল শব্দ দ্বারা, যা সংজ্ঞা বর্ণনার ক্ষেত্রে দূষণীয়। অতএব, ফাসাহাতের সংজ্ঞা خُلُوصٌ দ্বারা করা সমীচীন হয়নি। আর অসমীচীন কাজ করাকে আরবিতে تسامح বলা হয়। তা ছাড়া শুধুমাত্র এ তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হলেই সেটা ফাসাহাতে মুফরাদ হয়ে যাবে না; বরং এর এমন কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে, যার দ্বারা এটি ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ তার সংজ্ঞা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, خلوص টাই ফাসাহাত। এখানে ফাসাহাতের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো-

الْفَصَاحَةُ هِيَ كَوْنُ الْكَلِمَةِ جَارِيَةً عَلَى الْقَوَانِينِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ اسْتِقْرَاءِ كَلَامِ الْعَرَبِ مُتَنَاسِبَةً الْحُرُوفِ كَثِيرَةً الْإِسْتِعْمَالِ عَلَى السِّنَةِ الْعَرَبِ الْمُتَوَقُّعِ بِعَرَبِيَّتِهِمْ

অর্থাৎ ফাসাহাতে মুফরাদ বলা হয় এমন কালিমাতে, যা সরফের নিয়মাবলির অনুসরণে গঠিত; যার অক্ষরগুলো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আরবি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত ও এর আরবি হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত।

সার-সংক্ষেপ :

كَلِمَةٌ বা فَصَاحَةٌ مُفْرَدٌ বলা হয় مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ ও غَرَابَةٌ (এ তিনটি দোষ) থেকে কোনো শব্দ মুক্ত হওয়াকে।

উক্ত শব্দটি যে পঙ্ক্তিতে রয়েছে তা উত্তমরূপে অনুধাবনের জন্য সেই পঙ্ক্তি এবং এর পূর্বের পঙ্ক্তিটি এখানে অর্থসহ উল্লেখ করা হলো—

وَقَرَعَ بَزِينَ الْمَتْنِ أَسْوَدَ فَاجِمٍ * أَيْتُ كَفَنُوا النَّخْلَةَ الْمُتَعَنِّكِلِ
غَدَائِرُهُ مُسْتَشْرِزَاتٌ إِلَى الْعُلَى * تَضِلُّ الْعُقَاصُ فِي مَثْنَى وَمُرْسَلٍ

অর্থাৎ এবং কয়লা সদৃশ কালো এবং বহু কাঁদি বিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষের থোকা সদৃশ অধিক কেশরাজি, যা পিঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। তার চুলের জুলফি উর্ধ্বগামী। তার খোঁপা বেগি ও ছাড়া চুলের মাঝে হারিয়ে যায়।

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত পঙ্ক্তির প্রতিটি শব্দের তাহকীক করেছেন। **غَدَائِرُهُ** শব্দটি **غَدِيرَةٌ**-এর বহুবচন। তিনি **غَدَائِرُهُ**-এর ব্যাখ্যায় **ذَوَائِبُهُ** শব্দটি এনেছেন। **ذَوَائِبُ** শব্দটি **ذَائِبَةٌ**-এর বহুবচন। **ذَائِبُ** অর্থ— মাথা থেকে পিঠের দিকে ছেড়ে দেওয়া চুল, যা কখনো একত্রিত করে মাথার মধ্যখানে খোঁপা করে রাখা হয়। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। **مُسْتَشْرِزَاتٌ** শব্দটি **فَرَعٌ** শব্দটি। **فَرَعٌ** অর্থ— সাধারণ চুল। **مُسْتَشْرِزَةٌ**-এর বহুবচন। এটি নির্গত হয়েছে **إِسْتَشْرَزَ** ফে'লটি থেকে। এ ফে'লটি লামেম ও মুতাআদী উভয়রূপেই ব্যবহার হতে পারে। যেমন— **رَفَعَهُ** অর্থ— সে উঁচু করল **إِسْتَشْرَزَ** অর্থাৎ উঁচু হলো। **إِلَى** শব্দটি **عَلَى**-এর বহুবচন, অর্থ— উঁচু স্থান বা দিক। এখানে আকাশের দিক উদ্দেশ্য। **تَضِلُّ** শব্দটি **ضَلَّ** থেকে নির্গত। অর্থ— হারিয়ে যায়। **عُقَاصُ** শব্দটি **عَيْن**-এর নিচে যের এবং উপরে পেশ, **عَقِيصَةٌ**-এর বহুবচন। অর্থ—ফিতা দ্বারা পেঁচানো চুল, খোঁপা। **مَثْنَى** শব্দের **مَفْتُوْلٌ** বা পেঁচানো, বেগি করা চুল। **مُرْسَلٌ** খোলা-ছাড়া চুল। **الْمَتْنِ** অর্থ— কোমর। এর বহুবচন **مُتَوْنٌ**। **فَجِمٌ** (কয়লা)-এর মতো কালো। **أَيْتُ** অর্থ— বেশি ঘন। **فَنَوَةٌ** অর্থ— খেজুরের গোছা, খেজুরের ফুলের গুচ্ছ। **مُتَعَنِّكِلٌ** অর্থ— অধিক থোকা বিশিষ্ট। **عَنَّاكِلٌ** অর্থ— থোকা। কারো মতে এখানে **غَدَائِرُ** শব্দটি সাধারণ চুলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থানুসারে **غَدَائِرُهُ**-এর মধ্যে **إِضَافَتُ بَيَانِيَّةٍ** হবে **إِضَافَتُ بَيَانِيَّةٍ**।

এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) পুরো শেষেরের সারাংশ তুলে ধরেছেন। আর তা হলো— তার চুলের একাংশ মাথার মধ্য ভাগে ফিতা দ্বারা বাঁধা। এর উপরে আবার বেগি ও খোলা চুল রয়েছে। যার ফলে খোঁপাটি আর দৃশ্যমান হচ্ছে না। এতে অনুমান করা যায়, তার চুল অনেক বেশি ছিল বিধায় খোঁপাটি গোচরিভূত হচ্ছিল না। মোদ্দাকথা, কবিতার **مُسْتَشْرِزَاتٌ** শব্দটি উচ্চারণে কঠিন হওয়ার কারণে এতে **تَنَافُرٌ** হয়েছে।

সার—সংক্ষেপ :

تَنَافُرُ الْحُرُوفِ বলা হয় শব্দের এমন অবস্থাকে, যার দ্বারা শব্দে শ্রুতিকটুতা ও উচ্চারণ জনিত কাঠিন্য সৃষ্টি হয়। যেমন— **مُسْتَشْرِزَاتٌ**

وَالضَّايِطَةُ هُنَا أَنَّ كُلَّ مَا يَعْدُهُ الذَّوْقُ الصَّحِيحُ ثَقِيلًا مُتَعَسِّرَ النُّطْقِ فَهُوَ مُتَنَافِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ قُرْبِ الْمَخَارِجِ أَوْ بَعْدِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْمَثَلِ السَّائِرِ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَنَشَأَ الثَّقَلِ فِي مُسْتَشْزَرَاتٍ هُوَ تَوَسُّطُ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمَهْمُوسَةِ الرَّخْوَةِ بَيْنَ التَّاءِ الَّتِي مِنَ الْمَهْمُوسَةِ الشَّدِيدَةِ وَالزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمَجْهُورَةِ وَلَوْ قَالَ مُسْتَشْرِفٌ لَزَالَ ذَلِكَ الثَّقَلُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ أَيْضًا مِنَ الْمَجْهُورَةِ۔

অনুবাদ : এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো- যে সকল শব্দকে সুরচিসম্পন্ন ব্যক্তি কঠিন এবং উচ্চারণে কষ্টকর মনে করে সেটাই মুতানফির। চাই সেটা কাছাকাছি মাখরাজের কারণে হোক, দূরবর্তী মাখরাজের কারণে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে হোক এটি ইবনে আছীরের অভিমত; যা তিনি (তঁার রচিত গ্রন্থ) আল মাছালুস সাযির নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কতিপয় লোক মনে করেন مُسْتَشْزَرَات শব্দের মধ্যে কাঠিন্যের উৎপত্তি হচ্ছে মাহমূসাহ ও রিখওয়া-এর অন্তর্গত অক্ষর শীন। মাহমূসায়ে শাদীদার অক্ষর ʔ এবং মাজহূরার অক্ষর ʔa-এর মাঝে আসা। তারা বলেন, তিনি যদি مُسْتَشْرِفٌ বলতেন, তাহলে এ কাঠিন্য দূর হয়ে যেত, কিন্তু এ মতেও আপত্তি আছে। কারণ, ʔa ও তো মাজহূরার অক্ষর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالضَّايِطَةُ هُنَا أَنَّ كُلَّ مَا يَعْدُهُ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ তানফর-এর সংজ্ঞা মূলনীতি আকারে বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হলো- সুরচিসম্পন্ন ব্যক্তি যে শব্দের উচ্চারণ কঠিন ও কষ্টকর মনে করেন সে শব্দটিই مُتَنَافِر বা তানাকুরযুক্ত। এতে শব্দের অক্ষরগুলো পরস্পর নিকটবর্তী মাখরাজের (হরফ উচ্চারণের স্থান) অথবা অক্ষরগুলোর দূরবর্তী মাখরাজ হওয়া কিংবা অন্য কিছু হওয়া লক্ষণীয় নয়; বরং এসবের দ্বারা তানফর হওয়া বা না হওয়া নির্ভরশীল নয়। এ মূলনীতিটি আল্লামা ইবনুল আছীর (র.) 'আল-মাছালুস সাযির' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, কেউ কেউ অর্থাৎ আল্লামা খালখালী-এর মতে مُسْتَشْزَرَات-এর মধ্যে তানফর-এর কারণ হরফের সিফাত সংক্রান্ত বৈপরীত্য।

প্রকাশ থাকে যে, সিফাত শব্দের অর্থ হরফের স্বভাব বা গুণাগুণ। হরফের সিফাত সাধারণত দু'প্রকার : ১. সিফাতে যাতিয়াহ ও ২. সিফাতে আরযিয়াহ। সিফাতে যাতিয়াহকে সিফাতে লায়িমাহও বলে। সিফাতে যাতিয়াহ বা লায়িমিয়াহ দু'প্রকার : ১. সিফাতে মুতায়াদাহ বা বিরুদ্ধবাদী সিফাত ও ২. সিফাতে গায়রে মুতায়াদাহ বা অবিরুদ্ধবাদী সিফাত। সিফাতে মুতায়াদাহ পাঁচ জোড়ায় ১০টি, প্রতিটি জোড়ায় একটি সিফাত অপরটির বিপরীত। কোনো হরফের মধ্যে এক জোড়ার একটি সিফাত পাওয়া গেলে অপরটি পাওয়া যাবে না, তবে অন্য জোড়ায় আরেকটি সিফাত পাওয়া যাওয়া সম্ভব। مُسْتَشْزَرَات এ শব্দটির শীন হরফটির আগের অক্ষর হলো ʔ, আর পরের অক্ষরটি হলো ʔa। এখানে এ তিনটি অক্ষরের সিফাত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শীন-এর মধ্যে দু'টি সিফাত রয়েছে- ১. همس (এর হরফকে মাহমূসাহ বলে) এর

উচ্চারণ নরম এবং বাতাস চালু থাকবে। (এর বিপরীত হলো جهر ; এর হরফকে মাজহুরাহ বলে) ২. رَاخُوَة-এর উচ্চারণের সময় আওয়াজ জারি থাকবে। ۱. هَمْس-এর মধ্যে দু'টি সিফাত- ১. هَمْس ২. شِدَّة ; এর হরফকে (جهر) (শাদীদাহ) বলে। এর উচ্চারণে আওয়াজ বন্ধ ও শক্ত হবে। ۳. هَمْس-এর মধ্যে ১টি সিফাত (جهر) রয়েছে। অতএব, هَمْس-এর মধ্যে মুতায়াদাহ সিফাত যথা هَمْس-এর বিপরীত جهر এবং شِدَّة-এর বিপরীত رَاخُوَة ইত্যাদি একত্রিত হয়েছে। আর একই শব্দের মধ্যে সিফাতে মুতায়াদাহ একত্রিত হলে শব্দটির উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। তাই আল্লামা খালখালী (র.) বলেন, مُتَشَفِّرَاتٌ বললে تَنَافَرٌ-এর সমস্যা থাকবে না এবং শব্দটির উচ্চারণ সহজ হয়ে যাবে।

আমাদের মুসান্নিফ আল্লামা খালখালীর উক্ত মতটিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তার এ অভিমতটিতে আপত্তি রয়েছে। مُتَشَفِّرَاتٌ-এর মধ্যে زاء যেমন মাজহুরার অক্ষর, তেমনি مُتَشَفِّرَاتٌ-এর শين-এর পরে راءও তো মাজহুরার অক্ষর, তাহলে সিফাতের বৈপরীত্যের সমস্যা তো রয়েছেই গেল। অর্থাৎ مُتَشَفِّرَاتٌ-এর মধ্যে যে সকল সিফাতে মুতায়াদাহ পাওয়া গিয়েছিল مُتَشَفِّرَاتٌ-এর মধ্যেও সেগুলো পাওয়া গেল। অতএব, এ সকল সিফাতের কারণে যদি مُتَشَفِّرَاتٌ তানাকুরযুক্ত হয়, তবে একই কারণে مُتَشَفِّرَاتٌও তানাকুরযুক্ত হওয়া দরকার। অতএব, একথাই প্রমাণিত হলো যে, আল্লামা খালখালী যা বললেন- তা تَنَافَرٌ-এর কারণ নয়; বরং তানাকুরের কারণ সেটাই যা মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন।

وَقِيلَ إِنَّ قُرْبَ الْمَخَارِجِ سَبَبٌ لِلثِّقَلِ الْمُخِلِّ بِالنَّفْصَاةِ وَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَلَمْ أَعْهَدْ ثِقْلًا قَرِيبًا مِنْ حَدِّ التَّنَافُرِ فَيُخِلُّ بِفَصَاةِ الْكَلِمَةِ لَكِنَّ الْكَلَامَ الطَّوِيلَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى كَلِمَةٍ غَيْرِ فَصِيحَةٍ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْفَصَاةِ كَمَا لَا يَخْرُجُ الْكَلَامُ الطَّوِيلَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى كَلِمَةٍ غَيْرِ عَرَبِيَّةٍ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَرَبِيًّا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فَصَاةَ الْكَلِمَاتِ مَاخُودَةٌ فِي تَغْرِيفِ فَصَاةِ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ طَوِيلٍ وَقَصِيرٍ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ فَسَّرَ الْكَلَامَ بِمَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَلَوْ سَلِمَ عَدَمُ خُرُوجِ السُّورَةِ عَنِ الْفَصَاةِ فَمُجَرَّدُ اشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِ فَصِيحٍ بَلْ عَلَى كَلِمَةٍ غَيْرِ فَصِيحَةٍ مِمَّا يَقُودُ إِلَى نِسْبَةِ الْجَهْلِ وَالْعَجْزِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا -

অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেন, মাখরাজের অক্ষর (একত্রিত) হওয়া কাঠিন্যের কারণ, যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ তা'আলার বাণী **أَلَمْ أَعْهَدْ**-এও (উচ্চারণগত) অসুবিধা রয়েছে যা তানাহুয়ের সীমানার নিকটবর্তী। ফলে এটি শাব্দিক ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর হবে; কিন্তু ফাসাহাতযুক্ত একটি শব্দের কারণে দীর্ঘ বাক্য ফাসাহাতের থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন একটি অনারবী শব্দযুক্ত দীর্ঘ আরবি বাক্য অনারবী হয়ে যায় না। এ মতের মধ্যেও আপত্তি রয়েছে। কেননা, বাক্যের ফাসাহাতের জন্য (সকল) শব্দসমূহের ফাসাহাতযুক্ত হওয়া জরুরি। এ (শর্তের) ব্যাপারে বড় ও ছোট বাক্যের কোনো পার্থক্য নেই। তা ছাড়া এ মতের প্রবক্তা **كَلَام** বা বাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। **مَا لَيْسَ بِكَلِمَةٍ** (যা কালিমা নয়, তাই কালাম বা বাক্য), বলে। আর আরবি বাক্যের সাথে একে তুলনা করা স্পষ্ট ভুল। যদিও ফাসাহাতযুক্ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও সূরা ফাসাহাত থেকে বের হয় না, এ কথা মেনে নেওয়া হয়, তবু কুরআনুল কারীমে একটি ফাসাহাতযুক্ত বাক্য, বরং একটি ফাসাহাতযুক্ত শব্দ থাকাও আল্লাহর প্রতি অজ্ঞতা বা অক্ষমতার সস্বক জুড়ে দেওয়ার নামান্তর। আল্লাহ এর থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقِيلَ إِنَّ قُرْبَ الْمَخَارِجِ : এ ইবরাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) **تنافر**-এর ব্যাপারে ইমাম যুযানীর অভিমত উল্লেখ করেছেন। তার মতে কাছাকাছি মাখরাজের অক্ষরসমূহ একটি শব্দের মধ্যে একত্রিত হলে শব্দটি তানাহুয়যুক্ত হয় এবং এর উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। আর আমরা জানি কোনো শব্দের মধ্যে **تَنَافُرُ حُرُوفٍ** পাওয়া গেলে সেটি **غَيْرِ فَصِيحٍ** হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ইমাম যুযানীর এ মতের উপর আপত্তি উঠবে, তাহলে তো কুরআনে কারীমের প্রতিটি শব্দ ফাসাহাতযুক্ত হবে না। কারণ, কুরআনের আয়াতে **أَلَمْ أَعْهَدْ** শব্দটি রয়েছে। আর এতে এমন অক্ষরসমূহের সমন্বয় ঘটেছে, যেগুলো পরস্পর কাছাকাছি মাখরাজের। যথা- **هَمْز** এবং **هَاء**-এর মাখরাজ হলো **أَقْصَى حَلَقٍ** বা কণ্ঠনালীর শুরু। আর **عَيْن**-এর মাখরাজ হলো **وَسَطُ حَلَقٍ** বা কণ্ঠনালীর মধ্যখান। অতএব **أَلَمْ أَعْهَدْ** কুরআনের যে সূরায় রয়েছে সে সূরাটিও ফাসাহাত সমৃদ্ধ হবে না; অথচ এটা অসম্ভব। ইমাম যুযানী **لَكِنَّ الْكَلَامَ** বলে তার উপর আরোপিত সেই আপত্তি খণ্ডন করে বলছেন যে, একটি লম্বা বাক্যের মধ্যে যদি কোনো একটি ফাসাহাতবিহীন শব্দ থাকে, তাহলে সেই লম্বা বাক্যটি ফাসাহাত থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন একটি বড় আরবি বাক্যের মধ্যে কোনো একটি অনারবী শব্দ ঢুকে পড়লে সেই আরবি বাক্যটি অনারবী হয়ে যায় না। যেমন কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ কিতাব। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** (আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি) কিন্তু এতে অনারবী শব্দ বহু রয়েছে। যেমন- **قِسْطًا** (পাল্লা), **سِجْلٌ** (নিবন্ধনবহি), **مِشْكَاةٌ** (বাতিদান), ইব্রাহীম ইত্যাদি শব্দ, ঠিক তেমনি ফাসাহাতবিহীন শব্দ থাকা সত্ত্বেও বাক্যটি 'কালামে ফসীহ' বলেই অভিহিত হবে এবং তা ফাসাহাতবিহীন হবে না।

ইমাম যুযানীর মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, তার এ মতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। কারণ, তার কথায় তিনি দু'টি বিষয়ের দাবি করেছেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১. একটি দীর্ঘ বাক্যের কোনো একটি ফাসাহাতবিহীন শব্দের কারণে বাক্যটি ফাসাহাত থেকে বের হয় না। ২. এ ধরনের বাক্যকে বড় আরবি বাক্যের সাথে তুলনা করেছেন। তার প্রথম দাবিটি এ জন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, **كَلَامٌ فَصِيحٌ**-এর জন্য কালামের প্রতিটি কালিমা বা শব্দ **فَصِيحٌ** হওয়া শর্ত। ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞাতে এ বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। সেখানে কালামের বড় বা ছোট হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। সংজ্ঞা মতে কোনো কালাম বা বাক্যের একটি শব্দও যদি ফাসাহাতবিহীন হয় তবুও সেটা কালামে ফসীহ হবে না। সুতরাং তার প্রথম দাবিটি অগ্রাহ্য হলো।

قَوْلُهُ إِنَّ هَذَا النَّاقِلَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইমাম যুযানীর উপর পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেছেন- তাঁর মতে ফাসাহাতে কালামের জন্য কালিমাগুলো ফাসাহাতযুক্ত হওয়ার গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি। কারণ, কালামের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন- **مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ** কালাম বলা হয়- এমন বাক্যকে, যা কালিমা বা একক শব্দ নয়। সুতরাং **نَاقِصٌ** এবং **مُرَكَّبٌ** উভয়েই কালামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আর ফাসাহাতে কালামের জন্য কালিমাগুলো ফাসাহাতযুক্ত হওয়া সকলের মতেই শর্ত। অতএব, তার মতে **مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ**-এর প্রতিটি কালিমা এবং **مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ**-এর প্রতিটি কালিমা ফাসাহাতযুক্ত হওয়া শর্ত এবং কোনো একটি ফাসাহাতবিহীন কালিমা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে **مُرَكَّبٌ** এবং **مُرَكَّبٌ** উভয়েই ফাসাহাতবিহীন হয়ে যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তাঁর মতানুসারে ফাসাহাত ছাড়া কালিমা ধারণ করার কারণে দু'স্থানে সমস্যা হচ্ছে- ১. **مُرَكَّبٌ**-এর মধ্যে, ২. **مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ**-এর মধ্যে। আর মুসান্নিফ (র.)-এর মতে **مُرَكَّبٌ** কালামের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই 'কালিমা সমূহের ফাসাহাত' শুধুমাত্র **مُرَكَّبٌ**-এর সংজ্ঞায় শর্ত, **مُرَكَّبٌ নَاقِصٌ**-এর মধ্যে শর্ত নয়। সুতরাং কালামের মধ্যে যদি কোনো শব্দ ফাসাহাতবিহীন হয়, তবে এর দ্বারা কেবল **مُرَكَّبٌ** ফাসাহাতবিহীন হবে এবং এতে সমস্যা আসবে। সারকথা হলো, কালামের মধ্যে ফাসাহাতবিহীন কালিমা অন্তর্ভুক্ত হলে ইমাম যুযানীর মতানুসারে সমস্যা বেশি হবে। অর্থাৎ **مُرَكَّبٌ** এবং **مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ** উভয়েই ফাসাহাতবিহীন বলে গণ্য হবে। আর মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যানসারে শুধুমাত্র **مُرَكَّبٌ**-এর মধ্যে সমস্যা হবে।

قَوْلُهُ وَالْقِيَّاسُ عَلَى الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ : এ বাক্য দ্বারা ইমাম যুযানীর দ্বিতীয় দাবি বা আরবি বাক্যের সাথে তুলনাকে খণ্ডন করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ তুলনাটি সঠিক নয়; বরং নিশ্চিতভাবেই ভ্রান্তি। নিম্নে এর কারণ দেওয়া হলো- ১. ফাসাহাতে কালামের জন্য কালামের সবগুলো শব্দ ফসীহ হওয়া শর্ত। কিন্তু আরবি বাক্য হওয়ার জন্য এর প্রতিটি শব্দ আরবি হওয়া শর্ত নয়; বরং অধিকাংশ শব্দ আরবি হলেই সেটি আরবি বাক্য হয়ে যাবে। ২. কুরআনে অনারবী শব্দ আছে, এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব শব্দকে হিব্রু, ল্যাটিন বা ভারতীয় বলা হয়, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে এসব শব্দের ক্ষেত্রে উভয় ভাষার একা হয়েছিল। অর্থাৎ শব্দটি আরবি এবং হিব্রু, অথবা আরবি এবং ফারসি ইত্যাদি। ৩. এ সব শব্দকে অনারবী মেনে নেওয়া হলেও **عَرَبِيًّا** দ্বারা গোটা কুরআনকে আরবি বলা হয়েছে একথা আমরা মানি না এবং আয়াতে **أَنْزَلْنَاهُ** বলে সূরা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের একটি বিশেষ অংশ আরবি বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে বলেন, কুরআনের বড় অংশ আরবি তাই আরবি বলা হয়েছে। এ কথা আমরা মানি না।

وَلَوْ سَلِمَ عَدَمُ خُرُوجِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ বলেন, যদিও বা একথা মেনে নেওয়া হয় যে, কোনো একটি শব্দ ফাসাহাতবিহীন হলে পুরো সূরা ফাসাহাতবিহীন হয়ে যায় না বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর নয়; কিন্তু তার পরেও আপনি এ দাবির কারণে বিপদমুক্ত হতে পারছেন না। কেননা, তখন এতটুকু মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, কুরআনে ফাসাহাতবিহীন শব্দ এসেছে। আর এতটুকুতেই বিরাট এক প্রশ্ন এসে যায় যে, এতটুকু ক্রটির কথা কি আল্লাহ জানতেন না? যদি বলেন না, জানতেন না। তাহলে আল্লাহর প্রতি অজ্ঞতার সন্ধান করতে হয়। আর যদি বলেন, আল্লাহ জানতেন বটে, তবে এটি কুরআন থেকে দূর করতে অক্ষম ছিলেন, তাই করেননি। এতে আল্লাহর প্রতি অপারগতা অক্ষমতার সন্ধান করতে হয়। অথচ অজ্ঞতা ও অক্ষমতার সাথে দূরতম সম্পর্ক আল্লাহর নেই। তিনি এসব থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে। তিনি সবধরনের ক্রটি-বিচ্ছাতি থেকে পবিত্র।

সার-সংক্ষেপ :

تَنَاقُرُ الْحُرُوفِ চিহ্নিত করার নিয়ম হচ্ছে সাহিত্যের সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি যে শব্দকে **مُتَنَافِرٌ** মনে করে সেটাই তানাকুরযুক্ত। এ ব্যাপারে অন্য মতগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

وَالْغَرَابَةُ كَوْنُ الْكَلِمَةِ وَخَشِيَّةٌ غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْمَعْنَى وَلَا مَانُوسَةَ الْإِسْتِعْمَالِ نَحْوُ
مُسْرَجٍ فِي قَوْلِ ابْنِ الْعَجَّاجِ شَعْرٌ وَمُقْلَةٌ وَحَاجِبٌ مُزَجَّجًا * أَيْ مُدَقَّقًا مُطَوَّلًا وَفَاجِحًا
أَيْ شَعْرًا أَسْوَدَ كَالْفَحْمِ وَمَرْسِنًا أَيْ أَنْفًا مُسْرَجًا أَيْ كَالسَّيْفِ السُّرِينِجِيِّ فِي الذِّقَّةِ
وَالْإِسْتِوَاءِ وَسُرَيْجٍ إِسْمٌ قَيْنٌ يُنْسَبُ إِلَيْهِ السُّيُوفُ أَوْ كَالسَّرَاجِ فِي الْبَرِيقِ وَاللُّمَعَانِ فَإِنْ
قُلْتَ لَمْ لَمْ يَجْعَلُوهُ إِسْمٌ مَفْعُولٌ مِنْ سَرَجَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَيْ بِهِجَهُ وَحَسَنَهُ قُلْتَ لِاحْتِمَالِ أَنْ
يَكُونَ مُسْتَحْدَثًا وَمُؤَلَّدًا مِنَ السَّرَاجِ أَوْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْغَرَابَةِ أَيْضًا -

অনুবাদ : গারাবাত বলা হয়- কোনো একটি শব্দ এমন বিরল হওয়া, যার অর্থ সুস্পষ্ট নয় এবং এর ব্যবহার অপরিচিত। যেমন ইবনুল আজ্জাজের কবিতায় مُسْرَج শব্দটি। কবিতা- আর চোখ, দীর্ঘ-চিকন ক্র এবং কয়লার মতো কালো কেশরাজি, আর এমন নাক যা তীক্ষ্ণতা এবং লম্বায় সুরাইজীর তরবারির মতো। সুরাইজ এক বিখ্যাত কামারের নাম। তার প্রস্তুতকৃত তরবারিগুলো তার নামেই পরিচিত ও প্রচলিত। অথবা (তার নাক) দীপ্তি ও উজ্জ্বলতায় প্রদীপের ন্যায়। যদি আপনি বলেন, তারা কেন এটিকে سَرَجَ اللَّهُ وَجْهَهُ-এর অর্থে (আল্লাহ তাকে জ্যোতির্ময় এবং সুন্দর করুন)-এর ইসমে মাফউল করলেন না? আমি বলি (এ মতে) এটি سراج (প্রদীপ) থেকে পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ও সৃষ্ট হতে পারে। অথবা এটি গারাবাত জাতীয় (বিরল) শব্দ (যার অর্থ স্পষ্ট নয়)।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْغَرَابَةُ كَوْنُ الْكَلِمَةِ الْخ: গারাবাত হলো দ্বিতীয় ক্রটি-যার কারণে মুফরাদ শব্দ ফাসাহাতবিহীন বলে বিবেচিত হয়। গারাবাত বলা হয়- কালিমাটি এমন হওয়া যা তার নির্দিষ্ট অর্থের উপর সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে না। অর্থাৎ সে শব্দটি শোনা মাত্র আমরা এর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই না। তা ছাড়া এটি আরবি ভাষা-ভাষীদের কাছেও পরিচিত নয়। সংজ্ঞাটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লেখক গারাবাতকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছেন- ১. বিরল শব্দ, যার অর্থ স্পষ্ট নয়, ২. ব্যবহার প্রচলিত নয়। ১ম প্রকারের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- শব্দটির অর্থ সাধারণভাবে জানা যায় না এবং এর অর্থের প্রতি সহজে ধারণা জন্মায় না; বরং এর অর্থ জানার জন্য বড় বড় অভিধানগ্রন্থ অনুসন্ধান করতে হয়। এ প্রকারের উদাহরণ লেখক দেননি। যেমন- مُتَكَئِم (একত্রিত হওয়া) (বিচ্ছিন্ন হওয়া)। দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শব্দটি আদি বা মূল আরবীয়দের কাছে অব্যবহৃত হওয়া। আর অব্যবহৃত হওয়ার কারণে এর তত্ত্ব-তালাশও অভিধান গ্রন্থগুলোতে হয় না; বরং এটি বুঝার জন্য দূরবর্তী কার্যকারণ বা দূর সম্পর্কের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হয়। প্রথম প্রকার সাধারণভাবে ইসমে জামেদ এবং মাসদারের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার সাধারণত مشتق-এর ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ مُسْرَج শব্দটি। এ শব্দটি কবি রুবা ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাসরী আবু মুহাম্মদ ইবনুল আজ্জাজ আত-তামিমী আস-সায়েদীর কবিতায় পাওয়া যায়। কবি ইবনুল আজ্জাজ ও তার পিতা আজ্জাজ 'রাজায' কবিতার রচয়িতা ছিলেন। আজ্জাজ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস সরাসরি শুনেছেন।

مُسْرَج শব্দটি যে কবিতায় রয়েছে তার বিশেষ কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

أَزْمَانُ أَبَدَتْ وَأَضْعَا مُفْلِجًا * أَعْرَبَرَا قَاطِرًا أَبْرَجًا
وَمُقْلَةٌ وَحَاجِبٌ مُزَجَّجًا * وَفَاجِحٌ وَمَرْسِنٌ مُسْرَجًا

চয়নকৃত অংশের অনুবাদ : আমার প্রিয়া আজমান তার উজ্জ্বল-শুভ্র ও প্রশস্ত দন্তরাজি খুলে (হেসেছে) এবং ডাগর চক্ষু মেলে তাকিয়েছে। সে তার দীর্ঘ-সরু ক্রয়ুগলও সুরাইজী তরাবারির মতো খাড়া এবং চিকন নাক প্রকাশ করেছে।

কবিতার শব্দার্থ : **زَمَانٌ** প্রিয়ার নাম, **أَبْدَتْ** প্রকাশ করা, **وَاضِعًا** প্রশস্ত, এখানে **سِنًا وَاضِعًا** উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রশস্ত দন্তরাজি। **فَاكَ** ফাঁকা ফাঁকা দাঁত, **أَغْرُ** শুভ্র-সাদা, **بَرْنَقٌ**-এর বহুবচন **بَرَائٌ** উজ্জ্বল, **طَرَفٌ** চোখ, **مُقَلَّةٌ** পুরো চোখ, **بَرَجٌ** প্রশস্ত-বড়, **حَاجِبٌ** ক্র, **مُزَجَّجٌ** সরু ও লম্বা, **فَاجِمٌ** কয়লা, **مَرِيئًا** নাক, **مُسَرَّجٌ** সুরাইজী তরাবারি।

কবিতায় উল্লিখিত **مُسَرَّجٌ** শব্দটি গারাবাতের উদাহরণ। এ শব্দটির ব্যবহার মূল আরবীয়দের কাছে অপরিচিত। প্রথমত এতটুকু বুঝা গেছে যে, শব্দটি **باب تفعيل**-এর **مُسَرَّجٌ**-এর ইসমে মাফউল। কিন্তু এ মুশতাকের **منه** বা ধাতু মূল কোনো অভিধান গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ শব্দটিকে ভুলও ধরা যায় না, কারণ একজন খ্যাতিমান কবির কথায় এটি পাওয়া গেছে। এ জন্য মূল খোঁজা শুরু হয়। অবশেষে এর **مَادَّة** বা মূল অক্ষরের দু'টি শব্দ পাওয়া যায়। ১. **سَرَجٌ** এক কামারের নাম। ২. **سِرَاجٌ** প্রদীপ। এরপর এ দু'দিক বিবেচনা করে **مُسَرَّجٌ** শব্দের অর্থ নেওয়া হয় তাশবীহ বা তুলনা করে। প্রথমটির দিকে লক্ষ্য করলে এর অর্থ হবে সুরাইজির তরাবারির ন্যায় সোজা ও সূক্ষ্ম তার নাক। এ ব্যাখ্যা ইবনে দুরাইদ থেকে বর্ণিত। আর **سِرَاجٌ**-এর দিকে লক্ষ্য করলে এর অর্থ হবে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময় তার নাক। এটি ইবনে সীদা-এর ব্যাখ্যা।

মোটকথা, **مُسَرَّجٌ** শব্দটির ব্যবহার উজ্জ্বলতা, মসৃণ ও সোজা-এর ক্ষেত্রে আরবদের কাছে অপরিচিত ছিল। তাই এ অর্থ প্রদানের জন্য বলতে হয়েছে যে, কবি তার প্রিয়ার নাককে **سَرَجٌ** নামক এক কামারের তরাবারির সাথে কিংবা প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন।

قَوْلُهُ فَإِن قُلْتُ لِمَ لَمْ يَجْعَلُوهُ : এখানে একজন লোকের একটি ব্যাখ্যাকে আপত্তি আকারে তুলে ধরা হয়েছে। তা হচ্ছে আপনি **مُسَرَّجٌ** শব্দটিকে **سَرَجٌ** **اللَّهُ وَجْهَهُ** থেকে ইসমে মাফউল ধরে নিন। তাহলে তো তাশবীহ বা তুলনা করার প্রয়োজন দেখা দিবে না এবং শব্দটিও গারাবাত থেকে মুক্ত হয়ে যায়। উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, **سَرَجٌ** **اللَّهُ وَجْهَهُ**-এর এ অর্থ (অর্থ-**بِهَجَةٍ وَحَسَنَةٍ**) অভিধান গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তাই সম্ভবত এটি পরবর্তীকালের লোকেরা **سِرَاجٌ** থেকে উদ্ভাবন করেছেন এবং **مُسَرَّجٌ** শব্দটিকে **سَرَجٌ**-এর ইসমে মাফউল বলে দিয়েছেন। তবে তাদের এ ব্যাখ্যা ইবনে আজ্জাজের কবিতায় প্রযোজ্য হবে না। কেননা, **سَرَجٌ**-এর এই ব্যাখ্যা ইবনে আজ্জাজের ব্যবহারের পরে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কবির ব্যবহার আগে হয়েছে। অতএব, পূর্ববর্তী ব্যবহারের উৎস পরবর্তীতে উদ্ভাবিত ব্যবহার হওয়া অসম্ভব। তাই এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা আমরা বলব, এটি গারাবাতের প্রথম প্রকারের মধ্যে শামিল, অর্থাৎ **مُسَرَّجٌ**-এর অর্থ- উজ্জ্বলতা, সোজা ও তীক্ষ্ণ রূপে প্রসিদ্ধ নয় এবং সাধারণের কাছে অজ্ঞাত। এর অর্থ জানতে হলে বড় বড় অভিধানে অনুসন্ধান করতে হবে। পূর্বে আমরা বলেছি যে, শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয়; বরং তার অর্থ জানার জন্য অভিধান তালিশ করতে হয় তা গারাবাতের প্রথম প্রকারের শামিল।

সার-সংক্ষেপ :

ক. **غَرَابَةٌ** শব্দের অর্থ অপরিচিত হওয়া এবং শব্দের ব্যবহার বিরল বা প্রচলিত না হওয়া।

খ. **غَرَابَةٌ** দু' ধরনের- ১. শব্দের অর্থ অপরিচিত হওয়া। তবে অভিধানগ্রন্থ তালিশ করে এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব।

গ. যেমন- ২. এমন শব্দ যা অভিধানে পাওয়া যায় না। যেমন- **سَرَجٌ**

وَالْمُخَالَفَةُ أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ عَلَى خِلَافٍ قَانُونٍ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ أَعْنِي
عَلَى خِلَافٍ مَا ثَبَتَ عَنِ الْوَاضِعِ نَحْوُ الْأَجَلِّ بِفِكَ الْإِدْغَامِ فِي قَوْلِهِ عَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الْعَلِيِّ الْأَجَلِّ وَالْقِيَاسُ الْأَجَلُّ فَنَحْوُ أَلْ وَمَاءٌ وَ أَبَى يَابَى وَعَوْرَ يَعْوَرُ فَصِيحٌ لِأَنَّهُ ثَبَتَ
عَنِ الْوَاضِعِ كَذَلِكَ -

অনুবাদ : মুখাফালাত বলা হয় শব্দটি অর্থবোধক একক শব্দাবলির ব্যবহারিক নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া। অর্থাৎ শব্দের واضع বা গঠনকারী থেকে যেকোন বর্ণিত তার বিপরীত হওয়া। যেমন-الْأَجَلُّ শব্দটি ইদগাম ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে কবির কবিতা-الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجَلِّ এ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা জন্য, যিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ। নিয়ম মোতাবেক শব্দটি হলো أَجَلٌ (দু' লামের মধ্যে ইদগামসহ) আর أَلْ-مَاءُ- أَبَى يَابَى এবং وَعَوْرَ يَعْوَرُ জাতীয় শব্দ বিশুদ্ধ বা ফাসাহাতযুক্ত। কেননা, এগুলো واضع বা শব্দগঠনকারী থেকে এভাবেই বর্ণিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْمُخَالَفَةُ أَنْ تَكُونَ الْخ : ফাসাহাতে মুফরাদের ক্ষেত্রে তৃতীয় ক্রটি হলো মুখালাফাতে কিয়াসে লুগাবী অর্থাৎ মুফরাদ একক শব্দাবলির ব্যবহারিক নিয়মের বিপরীত হওয়া। অর্থাৎ শব্দটি প্রথম যার থেকে বর্ণিত বা প্রথম ব্যবহারকারী থেকে যেভাবে বর্ণিত সে নিয়মে ব্যবহার না করা এবং সরফের নিয়মের ব্যতিক্রম ব্যবহার করা। যেমন- قَالَ (তা'লীলসহ) এবং مَد (ইদগামসহ) এ দু'টি শব্দ সরফের নিয়ম অনুযায়ী হয়েছে এবং واضع থেকে অনুরূপ প্রমাণিতও আছে। আবার مَاءٌ ও أَلْ শব্দ দু'টি সরফের নিয়মের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও মুখালাফাত হয়নি। কারণ এর ব্যবহার واضع থেকে এমনই প্রমাণিত। মোটকথা, مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ لُغَوِيٍّ এবং مُوَافَقَةُ قِيَاسٍ لُغَوِيٍّ-এর ক্ষেত্রে واضع-এর থেকে প্রমাণ হওয়ার বিষয়টিই আসল। مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ لُغَوِيٍّ-এর উদাহরণ الْأَجَلُّ শব্দটি। এটি আবুন নাজম ফযল ইবনে কুদামা ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আমালীর কবিতায় পাওয়া যায়। কবিতার দু'লাইনসহ বক্ষ্যমাণ অংশটি এখানে দেওয়া হলো-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْأَجَلِّ * الْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْقَدِيمِ الْأَوَّلِ
أَنْتَ مَلِكُ النَّاسِ رَبًّا قَاقِبَل * ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ الْأَفْضَلِ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সুমহান ও শ্রেষ্ঠ। তিনি একক অদ্বিতীয়, অনাদি ও চিরস্থায়ী।

আপনি সব মানুষের প্রভু, অধিকর্তা, অতএব আপনি কবুল করুন আমার দোয়া। অতঃপর দরুদ ও সালাম শ্রেষ্ঠ নবীর উপর।

এ কবিতায় أَجَلٌ শব্দটি সরফের নিয়ম বহির্ভূত এবং واضع থেকে এ শব্দের যে ব্যবহার বর্ণিত তারও বিপরীত। এ শব্দের সঠিক ব্যবহার হলো أَجَلٌ দু' লামের ইদগামসহ, যা واضع থেকে বর্ণিত আছে। তা ছাড়া সরফ বা শব্দ তত্ত্বের নিয়ম হলো, যদি এক জাতীয় দু'টি অক্ষর এক সাথে মিলিত হয় এবং এর কোনো একটি ساكن (সাকিন) হয়, তখন একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করা হয়। অতএব, أَجَلٌ শব্দটি مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ لُغَوِيٍّ হওয়ার কারণে ফাসাহাতবিহীন হয়েছে।

قَوْلُهُ فَنَحْوُ أَلْ وَمَاءٌ وَ أَبَى يَابَى وَعَوْرَ يَعْوَرُ : ইবারতের এ অংশটুকু দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এমন কতগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন যেগুলো সরফ-এর নিয়মের বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও واضع থেকে এর ব্যবহার এরূপেই থাকার কারণে

قِيلَ فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ خُلُوصُهُ مِمَّا ذُكِرَ وَمِنْ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمْعِ بِأَن يَكُونَ اللَّفْظُ
بِحَيْثُ يَمَجُّهَا السَّمْعُ وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سَمَاعِهَا نَحْوُ الْجِرْشِيِّ فِي قَوْلِ أَبِي الطَّيِّبِ شِعْرُ
مُبَارَكُ الْإِسْمِ أَغْرُ اللَّقَبِ * كَرَيْمُ الْجِرْشِيِّ أَيْ النَّفْسِ شَرِيفُ النَّسَبِ وَالْأَغْرُ مِنَ الْخَيْلِ
الْأَبْيَضُ الْجَبْهَةُ ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِكُلِّ وَاضِحٍ مَعْرُوفٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ
إِنَّمَا هِيَ مِنْ جِهَةِ الْغَرَابَةِ الْمَفْسَّرَةِ بِالْوَحْشَةِ مِثْلُ تَكَكَاتُمْ وَإِفْرَنْقَعُوا وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَقِيلَ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّمْعِ وَعَدَمَهَا يَرْجِعَانِ إِلَى طَيْبِ النَّعْمِ وَعَدَمِ الطَّيِّبِ لَا إِلَى نَفْسِ
الْلَفْظِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْقَطْعِ بِاسْتِكْرَاهِ الْجِرْشِيِّ دُونَ النَّفْسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ النَّعْمِ -

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন যে, ফাসাহাতে মুফরাদ হলো উল্লিখিত বিষয়সমূহ এবং كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ থেকে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ শব্দটি এমন হওয়া যে, কান তা শোনতে বাধা দেয়। (অর্থাৎ শ্রুতিমধুর নয় তাই অনাগ্রহ নিয়ে শোনে) এবং এটি শোনা থেকে নিজেকে সংযত রাখে। যেমন আবু তায়্যিবের কবিতায় جَرَشِي শব্দটি। কবিতা- তিনি মুবারক নামের এবং উজ্জ্বল উপাধির অধিকারী, তিনি সুন্দর মন এবং অভিজাত বংশের লোক। أَغْرُ শব্দটি ঘোড়ার ক্ষেত্রে শুভ কপালের ঘোড়াকে বলা হয়। পরবর্তীতে শব্দটিকে রূপকভাবে আপন মহিমায় উজ্জ্বল বিখ্যাত যে কোনো জিনিসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ মতের উপর আপত্তি আছে। কেননা, শ্রুতিকটু হওয়ার বিষয়টি গারাবাত তথা বিরল জাতীয় শব্দ-এর অন্তর্গত। যেমন- تَكَكَاتُمْ (তোমরা একত্রিত হয়েছ) এবং إِفْرَنْقَعُوا (তোমরা বিচ্ছিন্ন হও) এবং এ ধরনের অন্য শব্দসমূহ। কেউ বলে থাকেন শ্রুতিকটু বা তা না হওয়ার বিষয়টি তো সুরেলা কণ্ঠস্বর বা মন্দ কণ্ঠস্বর হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এটি শুধু শব্দের সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে এ মতেও আপত্তি রয়েছে। কেননা, কণ্ঠস্বরের দিকে দৃষ্টিপাত না করলেও جَرَشِي শব্দটি নিশ্চিতভাবেই শ্রুতিকটু, কিন্তু نفس শব্দটি তা নয়।

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ

كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ (শ্রুতিকটু হওয়া) : মুসান্নিফ (র.) বলেন, কারো কারো মতে قَوْلُهُ قِيلَ فَصَاحَةُ الْمُفْرَدِ الْخ ফাসাহাতে মুফরাদের জন্য দৃশ্যীয়। তারা বলেন, মুফরাদ তানাকুর, গারাবাত ও মুখালাফাতে কিয়াসে লুগাবী থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ থেকেও মুক্ত হতে হবে। মুসান্নিফ (র.) قِيلَ বলে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাদের নির্দিষ্ট কোনো নাম ব্যাখ্যাগ্রহণসমূহ পাওয়া যায় না। সম্ভবত তার সমকালীন কোনো আলিমের অভিমত।

كَرَاهَةٌ فِي السَّمْعِ-এর ব্যাক্যায় মুসান্নিফ (র.) লিখেন بِحَيْثُ يَمَجُّهَا السَّمْعُ وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سَمَاعِهَا : যেমন جَرَشِي শব্দটি কবি আবু তায়্যিব আহমদ ইবনে হুসাইন মুতানাক্বীর কবিতায় পাওয়া যায়। মুতানাক্বী তৎকালীন শাসক সাইফুদ্দাওলা ইবনে হামদানের প্রশংসায় কবিতাটি রচনা করেন।

جَرَشِي শব্দটির পঞ্জিকিসহ এখানে তিন লাইন উল্লেখ করা হলো-

أَفَى الرَّأْيِ يَشَبَّهُ أَمْ فِي السَّخَاءِ * أَمْ فِي الشَّجَاعَةِ أَمْ فِي الْآدَبِ

مُبَارَكُ الْإِسْمِ أَغْرُ اللَّقَبِ * كَرَيْمُ الْجِرْشِيِّ شَرِيفُ النَّسَبِ

إِذَا حَارَ مَالًا فَقَدْ حَارَهُ * فَتَى لَا يَسُدُّ بِمَا لَا يَهَبُ

অর্থাৎ কিসে তার তুলনা চিন্তা-চেতনা, নাকি দানশীলতায়?

বীরত্বে নাকি সাহিত্যে? (সবকিছুতেই তিনি অতুলনীয়)

তিনি মুবারক নাম ও উজ্জ্বল উপাধিতে ভাস্বর। তিনি মহৎ হৃদয় ও অভিজাত বংশের অধিকারী।

যখন সে সম্পদ সঞ্চয় করে তখন সেগুলোকে উত্তমরূপে সংরক্ষণ করে, সে এমন যুবক যে, দান না করলে প্রফুল্লিত হয় না।

কবিতার ব্যাখ্যা : তার নাম মুবারক বলার কারণ হচ্ছে, তার নাম চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)-এর নামের সাথে মিলে গেছে। তার উপাধি উজ্জ্বল বা প্রসিদ্ধ। কেননা, তার উপাধি ছিল সাইফুদ দাওলা, যা হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রা.)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা ছাড়া বাস্তবিকেই এই উপাধিতে সে তৎকালে খ্যাতি লাভ করেছিল। তার বংশ শরীফ বা অভিজাত। কারণ, সে ছিল আব্বাসী বংশের অধঃস্তন পুরুষ। **أَغْرُ اللَّقَبِ**-এর **أَغْرُ**-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, **أَغْرُ** অর্থ 'অশ্বের ক্ষেত্রে' **أَغْرُ** শব্দটি ব্যবহার হলে তার অর্থ হবে শুভ্র কপালের অশ্ব। উল্লেখ থাকে যে, **أَغْرُ** শব্দের দু'টি অর্থ পাওয়া যায়, ১. যে কোনো সাদা রঙকে **أَغْرُ** বলা হয়, ২. ঘোড়ার সাদা কপালকে **أَغْرُ** বলা হয় এ অর্থে শব্দটি প্রসিদ্ধ। অবশ্য মুসান্নিফ প্রথম অর্থটি গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি **أَغْرُ** শব্দটি **أَغْرُ** বলেছেন। তিনি বলেন, **أَغْرُ** শব্দটি উজ্জ্বল বা পরিচিত এর অর্থে **إِسْتِمَارَةٌ** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, যারা **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-কে ফাসাহাতের সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়ার শর্ত করতে চান তারাই **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-এর উদাহরণ দেন **أَلْجَرَشِيُّ** শব্দটি দ্বারা যে, এটি শ্রুতিকটু। তাই এটি ফাসাহাতবিহীন শব্দ। কিন্তু মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্য হলো **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-কে এর আলাদা শর্ত করে বাদ দেওয়ার দরকার নেই; বরং যারা আলাদা করে বাদ দিতে চান তাদের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে। কারণ, **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** তো গারাবাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, গারাবাতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে **وَحَشِي** বা বিরল হওয়া। বিরল বা অপরিচিত হলে শব্দটি শুনতে ভালো লাগে না। যেমন আমরা দেখি একটি কঠিন উচ্চারণের শব্দও পরিচিত হয়ে গেলে আর কঠিন মনে হয় না, সহজ হয়ে যায়।

আমরা ইতঃপূর্বে গারাবাত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত করেছি। যার দ্বারা **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** থেকে মুক্ত হওয়ার কথা চলে এসেছে। কারণ, **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** ও **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-এর মধ্যে **سَبَبٌ** ও **سَبَبٌ** এর সম্পর্ক। **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** হলে **سَبَبٌ** আর **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** হলে **سَبَبٌ**। অর্থাৎ গারাবাতের কারণেই **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** হয়। অতএব, **سَبَبٌ** যদি অন্তর্নিহিত হয়, তবে **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** ও অন্তর্নিহিত হবে। যেমন-**تَكَادَاتُمْ** বা এ জাতীয় শব্দ।

قَوْلُهُ وَقِيلَ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي السَّنْعِ وَعَدِمَهَا : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সেসব লোকের মতামত তুলে ধরেছেন যারা তার মতো **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-কে আলাদা করে ফাসাহাত থেকে বের করার পক্ষপাতী নন। তবে তারা **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-কে বাদ দেওয়ার কারণ কি হবে এ নিয়ে মুসান্নিফ (র.)-এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেন, **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। কারণ, **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** বা শ্রুতিকটু হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক তো কঠোর ভালো ও মন্দ হওয়ার সাথে। এ শ্রুতিকটু হওয়ার বিষয়টি মূল শব্দের সাথে সম্পর্কিত নয়।

قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْقَطْعِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত দলের মতকে খণ্ডন করে বলেছেন, আপনাদের এ মতটি সঠিক নয়। কারণ, আপনাদের কথা দ্বারা বুঝা যায় **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-এর সম্পর্ক কঠোর ভালো বা মন্দের সাথে। তাহলে কি **جَرَشِي** শব্দটি যেমন কঠোর দ্বারাই পড়া হোক না কেন তা ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর বিপরীতে **الْأَنفُسُ** শব্দটি সুরেলা বা হেড়ে গলা যেভাবেই উচ্চারণ করা হোক না কেন তা ফাসাহাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতএব, **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ**-কে বাদ দেওয়ার সঠিক কারণ সেটাই যা আমি বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ কোনো শব্দ শ্রুতিকটু হয় গারাবাতের কারণে। গারাবাত থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত আলাদা করে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

সার-সংক্ষেপ :

কারো কারো মতে **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** ও **كَرَاهَةٌ فِي السَّنْعِ** এ তিনটি দোষ ছাড়াও শ্রুতিকটু হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া ফাসাহাতের জন্য শর্ত। কিন্তু লেখক মনে করেন, শ্রুতিকটুতা তানাহুরের মাঝে নিহিত। সুতরাং শব্দ তানাহুরবিহীন হলে শ্রুতিকটুতা থেকেও মুক্ত হবে।

وَالْفَصَاحَةُ فِي الْكَلَامِ خُلُوصُهُ مِنْ ضُعْفِ التَّالِيفِ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَالتَّعْقِيدِ مَعَ فَصَاحَتِهَا هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي خُلُوصِهِ وَاخْتَرَزَ بِهِ عَنْ مِثْلِ زَيْدٍ أَجَلُّ وَشَعْرُهُ مُسْتَشْرِزٌ وَأَنفُهُ مُسْرَجٌ وَقِيلَ هُوَ حَالٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ وَلَوْ ذَكَرَهُ بِجَنبِهَا لَسَلِمَ مِنَ الْفَضْلِ بَيْنَ الْحَالِ وَذِيهَا بِالْأَجْنَاسِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ جِنْيٌ يَكُونُ قَيْدًا لِلتَّنَافُرِ لَا لِلْخُلُوصِ وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ الْغَيْرِ الْفَصِيحَةِ فَصِيحًا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَالِصٌ عَنْ تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ حَالِ كَوْنِهَا فَصِيحَةً فَافْهَمَ -

অনুবাদ : ফাসাহাতে কালাম (এর সংজ্ঞা, ফাসাহাতে কালাম বলা হয়) শব্দটি **تَنَافُرٌ**, **ضُعْفُ التَّالِيفِ** (এবং **تَعْقِيدٌ** থেকে মুক্ত হওয়া। এমতাবস্থায় যে, উক্ত কালামের সবগুলো শব্দ ফাসাহাতসমৃদ্ধ হবে। **زَيْدٌ أَجَلُّ**, (এ শব্দটি দ্বারা **مَعَ فَصَاحَتِهَا**) এর **ضَمِيرٌ**-এর **خُلُوصُهُ** টা **مَعَ فَصَاحَتِهَا** হতে হবে। **شَعْرُهُ مُسْتَشْرِزٌ** এবং **أَنفُهُ مُسْرَجٌ** জাতীয় বাক্যসমূহকে বের করা হয়েছে। (এ বাক্যগুলোর সব শব্দ ফসীহ নয়) কেউ কেউ বলেন, **مَعَ فَصَاحَتِهَا** এটি কلمات থেকে **حَال** হয়েছে। তারা বলেন, যদি লেখক এটিকে (কلمات)-এর পাশে উল্লেখ করতেন, তাহলে **حَال** এবং **ذَوُ الْحَالِ**-এর মধ্যে সম্পর্কহীন শব্দের দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি হতো না। এতে আপত্তি আছে। কেননা, তখন **مَعَ فَصَاحَتِهَا** টা **تَنَافُرٌ**-এর **قَيْد** হবে, **خُلُوصُهُ**-এর **قَيْد** হবে না। আর এতে করে তানাহুয়ুজ ফাসাহাতবিহীন কালিমাসমৃদ্ধ বাক্য ফসীহ হওয়া নিশ্চিত হতো। কেননা, এ জাতীয় বাক্যের উপর সংজ্ঞাটি প্রয়োগ হয় অর্থাৎ কালাম তানাহুরে কালিমা থেকে মুক্ত এমতাবস্থায় যে, এর কালিমাগুলো ফাসাহাতযুক্ত। অতএব, তুমি ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা কর।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْفَصَاحَةُ فِي الْكَلَامِ : ফাসাহাতে মুফরাদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ফাসাহাতে কালামের আলোচনা শুরু করেছেন। ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞা-

خُلُوصُ الْكَلَامِ مِنْ ضُعْفِ التَّالِيفِ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ وَالتَّعْقِيدِ مَعَ فَصَاحَتِهَا

অর্থাৎ ফাসাহাতে কালাম বলা হয় এমন বাক্যকে, যা **ضُعْفُ التَّالِيفِ** (ব্যাকরণগত ত্রুটি), **تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ** (উচ্চারণগত ত্রুটি) এবং **تَعْقِيدٌ** (দুর্বোধ্যতা) থেকে মুক্ত হয় এবং বাক্যের অন্তর্গত সবগুলো শব্দ ফসীহ বা বিশুদ্ধ থাকে। উল্লেখ্য থাকে যে, **ضُعْفُ التَّالِيفِ** থেকে তখনই মুক্ত হবে যখন বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে সর্বসম্মত নাহ বা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ব্যবহার হবে। আর **تَعْقِيدٌ** থেকে তখনই মুক্ত হবে যখন বাক্যটির অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকবে না। চাই সেটা শাব্দিকভাবে হোক অথবা ভিন্ন মাত্রিক হোক। আর **تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ** থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে একাধিক শব্দের মিলনে কোনো ধরনের উচ্চারণগত জড়তা বা সমস্যা সৃষ্টি না হওয়া।

قَوْلُهُ مَعَ فَصَاحَتِهَا : বাক্যের এ অংশটি **حَال** হয়েছে। এ অভিমত সকলেরই। কিন্তু এর **الْحَال** কি হবে তা নিয়ে মুসান্নিফ (র.) ও কতিপয় আলিমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। মুসান্নিফের ভাষ্য হলো **هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي خُلُوصِهِ** অর্থাৎ এটি **خُلُوصُهُ**-এর **ضَمِير** থেকে **حَال** হয়েছে। অর্থাৎ **خُلُوصُهُ**-এর "ه" যমীর হলো **الْحَال** এভাবে তারকীব করা হলে বাক্যটি অর্থগতভাবে এরূপ হবে-

الْفَصَاحَةُ فِي الْكَلَامِ إِنْفَاءٌ، ضُعْفُ التَّالِيفِ وَتَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ وَتَعْقِيدُهُ، حَالٌ كَوْنٍ نَصَاحَةٍ كَلِمَاتِهِ تَقَارَنُ ذَلِكَ الْإِنْفَاءُ.

অর্থাৎ ফাসাহাতে কালাম হলো কালামের মধ্যে **تَعْقِيدُ**، **تَنَافُرُ** **كَلِمَاتٍ** না হওয়া এবং সেই কালামের প্রত্যেকটি কালিমা ফাসাহাত সমৃদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ প্রথমে এ তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত হবে। সেই সাথে এর প্রত্যেকটি শব্দ ফাসাহাতযুক্ত হতে হবে। অতএব, যে সকল বাক্যের সবগুলো শব্দ ফাসাহাতযুক্ত না হবে, সেগুলো ফাসাহাতে কালামের আওতায় আসবে না। যেমন— **زَيْدٌ أَجَلُّ** এ বাক্যের **أَجَلُّ** শব্দটি মুখালাফাতের দোষে দুষ্ট, তাই ফাসাহাতে কালামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। **أَشْرُهُ مُسْتَشْزِرٌ** এ বাক্যে **مُسْتَشْزِرٌ** শব্দটি তানাহুরের দোষে দুষ্ট, এ কারণে এটিও ফাসাহাতে কালামের সংজ্ঞার মধ্যে আসবে না। এমনিভাবে **أَنفُهُ مُسْرَجٌ** এ বাক্যের **مُسْرَجٌ** শব্দটি গারাবাতের দোষে দুষ্ট, তাই এ বাক্যটি ও ফাসাহাতে কালামের আওতায় পড়বে না।

قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ حَالٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ : এখান থেকে **مَعَ نَصَاحَتِهَا**-এর তারকীবের ব্যাপারে একটি ভিন্নমত তুলে ধরা হয়েছে। যারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাদের মতে **مَعَ نَصَاحَتِهَا** হাল হয়েছে **كَلِمَاتٍ** থেকে। তারা এও বলেন, **كَلِمَاتٍ** (ذو الحال) এবং **مَعَ نَصَاحَتِهَا** (حال)-এর মাঝে **التعقيد** শব্দটি দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, যা উচিত নয়। তাই যদি লেখক **حَال**-কে **ذو الحال** তথা **كَلِمَاتٍ**-এর পাশে উল্লেখ করতেন এভাবে যে, **التَّعْقِيدُ وَالنَّصَاحَةُ** **مَعَ نَصَاحَتِهَا** **تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ** **مَعَ نَصَاحَتِهَا** **وَالنَّصَاحَةُ** **وَالنَّصَاحَةُ** **وَالنَّصَاحَةُ** **وَالنَّصَاحَةُ** তাহলে **حَال** এবং **ذو الحال**-এর মাঝে **اجنبی** (تعقيد) দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি হতো না।

قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ : এখানে থেকে মুসান্নিফ (র.) তার সাথে ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্যের জবাব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যদি **مَعَ نَصَاحَتِهَا**-কে **كَلِمَاتٍ** থেকে **حَال** বলা হয়, তবে লেখকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো— আমরা জানি, **حَال** তার **ذو الحال**-এর আমেলের জন্য **قيد** হয়। আরেকটি কায়দা হলো— **قيد** যুক্ত কোনো শব্দের উপর যদি **نفي** আসে, তখন সেই **نفي** আসে **قيد**-এর উপর, **قيد** বা **مقيد** যুক্ত শব্দটির উপর নয়। যেমন— **كَيْدٌ رَاكِبٌ** অর্থ— যাকে আমার নিকট আরোহী হয়ে এসেছে। এখানে **راكب** (حال) তার **ذو الحال**-এর উপর **قيد** নফী হবে। **قيد** বা **مقيد** যুক্ত শব্দটির উপর **نفي** আসে যেমন— **قيد** **راكب** তাহলে **قيد** নফী হবে। **قيد** বা **مقيد** যুক্ত শব্দটির উপর **نفي** আসে যেমন— **قيد** **راكب** তাহলে **قيد** নফী হবে না। সুতরাং যাদের মতে **مَعَ نَصَاحَتِهَا** শব্দটি **كَلِمَاتٍ** থেকে **حَال** হয়েছে, সে মতে **مَعَ نَصَاحَتِهَا** তার **ذو الحال**-এর আমেল **تَنَافُرُ**-এর জন্য **قيد** হবে। আর **خُلُوصٌ** শব্দটি যা মূলত না-বাচকের অর্থ প্রদান করে, **كَلِمَاتٍ**-এর উপর প্রবেশ করে **قيد**-কে নফী করবে, **مقيد**-কে নফী করবে না। অতএব, **مَعَ خُلُوصٍ** দ্বারা **مَعَ نَصَاحَتِهَا**-এর নফী হবে, **تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ**-এর নফী হবে না। তখন বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, যদি **تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ** থাকে এবং শব্দসমূহ ফসীহ না হয়, তবে কালামটি ফসীহ হবে। অর্থাৎ কোনো বাক্যে শব্দসমূহ তানাহুরযুক্ত এবং ফাসাহাত ছাড়া হলে তা কালামে ফসীহ। কেননা, এ কথাটির উপরই তাদের সংজ্ঞা প্রয়োগ হয় যে, কালাম বা বাক্য **كَلِمَاتٍ** থেকে ঐ অবস্থায় মুক্ত হবে যখন এর শব্দসমূহ ফসীহ বা বিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ কালিমা যদি ফসীহ হয় তাহলে তানাহুর থেকে মুক্ত হওয়া দরকার, আর যদি ফসীহ না হয় তাহলে তানাহুর থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি নয়। অতএব, কোনো কালাম বা বাক্য যদি তানাহুরে কালিমাত থেকে মুক্ত হয় এবং শব্দগুলো ফাসাহাত ছাড়া হয় তবে সে কালাম ফসীহ বা বিশুদ্ধ হবে। আর এ ব্যাখ্যা লেখকের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কেননা, তার মতে কালাম তখনই বিশুদ্ধ হবে, যখন এর শব্দসমূহ বিশুদ্ধ হবে এবং তানাহুরে কালিমাত থেকে মুক্ত হবে; অন্যথায় নয়। **فَانْهَمُ** অর্থ— ভালোভাবে বুঝে নাও। মুসান্নিফ (র.) এ জাতীয় শব্দ সে সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন, যেখানে বিষয়বস্তু জটিল হয়।

বি. দ্র. এখানে কারো দৃষ্টিতে মুসান্নিফের তারকীবের ব্যাপারে আপত্তি আসতে পারে যে, **حَال** (مَعَ نَصَاحَتِهَا) এবং **ذو الحال** (مَعَ خُلُوصٍ)-এর মধ্যে অনেক দূরত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ **حَال** ও **ذو الحال**-এর মাঝে দূরত্ব থাকে সমীচীন নয়। জবাব হলো— **حَال** এবং **ذو الحال**-এর মাঝে যদি **اجنبی** কোনো প্রতিবন্ধক আসে তাহলে সেটা দূষণীয়; কিন্তু এখানে তা হয়নি। কারণ, এখানে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব শব্দাবলি এসেছে যথা, **تَنَافُرُ الْكَلِمَاتِ**, **تَعْقِيدُ** প্রত্যেকটিই **ذو الحال**-এর আমেলের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ **خُلُوصٌ**-এর মা'মূল, অতএব প্রতিবন্ধকগুলো **اجنبی** না হওয়াতে তারকীবের মধ্যে কোনো ক্রটি রইল না।

সার-সংক্ষেপ : ফাসাহাতে কালাম বলা হয়— বাক্যের প্রতিটি শব্দ ফসীহ হওয়ার সাথে সাথে **تَعْقِيدُ** (এ তিনটি দোষ) থেকে মুক্ত হওয়া।

فَالضُّعْفُ أَنْ يَكُونَ تَالِيفُ الْكَلَامِ عَلَى خِلَافِ الْقَانُونِ النَّحْوِيِّ الْمَشْهُورِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ كَالِإِضْمَارِ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَمَعْنَى وَحُكْمًا نَحْوُ ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا وَالتَّنَافُرِ أَنْ تَكُونَ الْكَلِمَاتُ ثَقِيلَةً عَلَى اللِّسَانِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهَا فَصِيحَةً نَحْوُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ قَبْرٌ وَصَدْرُ الْبَيْتِ وَقَبْرٌ حَرْبٌ بِمَكَانٍ قَفِرٍ أَيْ خَاٍ عَنِ الْمَاءِ وَالْكَلَامِ ذَكَرَ فِي عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ أَنَّ مِنَ الْجِنِّ نَوْعًا يُقَالُ لَهُ الْهَاتِفُ فَصَاحَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ فَمَاتَ فَقَالَ ذَلِكَ الْجِنِّيُّ هَذَا الْبَيْتُ وَقَوْلُهُ شِعْرٌ كَرِيمٌ مَتَى أَمَدَحُهُ أَمَدَحُهُ وَالْوَرَى * مَعْنَى وَإِذَا مَا لُمْتَهُ لُمْتَهُ وَحَدَّثَنِي فَالْوَاوُ فِي وَالْوَرَى لِلْحَالِ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَعْنَى -

অনুবাদ : আর الضعف হলো বাক্যের তারকীব নাহ বা ব্যাকরণবিদগণের প্রসিদ্ধ নিয়মের বিপরীত হওয়া। যেমন- নাম বা বিষয়ের আগে সর্বনাম ব্যবহার করা শাস্ত্রিকভাবে, অর্থগতভাবে, ছকুমের দিক থেকে। যেমন- ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا অর্থ- যায়েদের দাস যায়েদকে প্রহার করেছে। আর তানাকুর হলো (বাক্যের অন্তর্ভুক্ত) শব্দগুলোর উচ্চারণ কঠিন হওয়া। যদিও প্রত্যেকটি শব্দ ফসীহ। যেমন কবিতা- وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ অর্থ- হারবের কবরের নিকট কোনো কবর নেই। এ পঙ্ক্তিটির প্রথম অংশ হলো قَبْرُ حَرْبٍ হারবের কবর বিরান ভূমিতে অর্থাৎ ঘাস পানিশূন্য খালি জায়গায়। মুসান্নিফ (র.) عَجَائِبِ الْمَخْلُوقَاتِ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, জিনদের মাঝে এমন সম্প্রদায় আছে যাদেরকে হাতিফ বলা হয়। সে সম্প্রদায়ের একটি লোক হারব ইবনে উমাইয়ার নিকট এক বিকট চিৎকার দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন সেই জিনটিই উপরিউক্ত পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করেছিল এবং কবির উক্তি : كَرِيمٌ مَتَى أَمَدَحُهُ أَمَدَحُهُ وَالْوَرَى * مَعْنَى وَإِذَا مَا لُمْتَهُ لُمْتَهُ وَحَدَّثَنِي : অর্থ- সে সম্মানিত, যখন আমি তাঁর প্রশংসা করি, প্রশংসা করি এমনতাবস্থায় যে, জগদ্বাসী আমার সাথে থাকে। আর আমি যখন তাঁর নিন্দা করি, তখন আমি একাই তাঁর নিন্দা করি, (আর কেউ তার নিন্দা করে না।) والورى-এর শুরুতে যে, واو আছে তা حال-এর জন্য, এটি (الورى) হলো مبتدأ আর معنى হলো এর খবর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ضُعْفُ ১- قَوْلُهُ فَالضُّعْفُ أَنْ يَكُونَ الْخ : যে সকল ক্রটি কালামকে ফাসাহাতবিহীন করে দেয় সেগুলো তিনটি- ১. ضُعْفُ التَّالِيفِ হলো প্রথম ক্রটি। ২. التَّنَافُرُ الْكَلِمَاتِ ৩. التَّعْقِيدُ এগুলোর মধ্যে ضُعْفُ التَّالِيفِ কোনো বস্তুর কালামের বা বাক্যের নাহ বা আরবি ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ নিয়মের বিপরীত হওয়া। যেমন- الْإِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ কোনো বস্তুর নাম উল্লেখ করার আগে তার সর্বনাম ব্যবহার করা। আর তা لَفْظًا (শব্দগতভাবে), مَعْنَى (অর্থগতভাবে) এবং حُكْمًا (বিধানগতভাবে) হবে। অতএব, যদি শুধু শাস্ত্রিকভাবে অথবা শুধু অর্থগতভাবে কিংবা শুধু বিধানগতভাবে সর্বনাম অগ্রে আনা হয়, তাহলে বৈধ হবে এবং তখন ضُعْفُ التَّالِيفِ হবে না। উল্লেখ্য থাকে যে, جُمُহুর-এর অর্থ- সংখ্যাগরিষ্ঠ, সর্বসম্মত নয়। কারণ, উল্লিখিত নিয়মটি সকলের মতে সর্বসম্মত মতের বিপরীত হলে তা অবশ্যই ضُعْفُ التَّالِيفِ হবে। যেমন- زَيْدٌ قَاتِلٌ زَيْدٍ এ বাক্যে قَاتِلٌ খবরকে مَسْنَدٌ إِلَيْهِ (زيد)-এর পরে আনা সকলের মতে ওয়াজিব।

تَقْدِيمَ لَفْظِي : এর অর্থ হলো- শব্দগতভাবে এবং মর্যাদাগতভাবে বিষয়টি বা নাম আগে আসে। যেমন-

صَرَبَ زَيْدًا غُلَامَهُ (খ) صَرَبَ زَيْدٌ غُلَامَهُ (ক)

تَقْدِيمَ مَعْنَوِي : এর অর্থ হলো শব্দগতভাবে বিষয় বা নাম আগে আসে না বটে; তবে অর্থের দিক থেকে সর্বনামের আগে বিষয়টি আসে। যেমন, কুরআনের আয়াত- اَعِدُّوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی এখানে هو-এর مرجع বা বিষয় হলো عدل যা পৃথকভাবে আগে আসেনি; কিন্তু اعدلوا-এর মাঝে عدل অর্থগতভাবে আগে উল্লিখিত হয়েছে।

تَقْدِيمَ حُكْمِي : এর অর্থ হলো- শাদিকভাবে مرجع বা বিষয়টি সর্বনামের পরে আসে এবং এখানে مرجع-কে আগে আনার কোনো বিধান নেই। তবে মূল নিয়ম (অর্থাৎ সর্বনামের আগে সর্বদা নাম বা বিষয় আসে) রয়েছে। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। যেমন- نَعِمَ زَيْدٌ এখানে نعم-এর মধ্যে একটি সর্বনাম আছে, যার مرجع (رجلا)-এর পূর্বে এসেছে নাহর নিয়মেই। আরেকটি উদাহরণ হলো- قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ-এর মধ্যে هو হলো ضمير-এর مرجع হলো الله (যা পরে এসেছে)। এ জাতীয় সর্বনামের নামকে হুকুম বা বিধান মতে مقدم বলা হয়ে থাকে। এ উদাহরণে সর্বনাম 'و' তার নাম زيد-এর আগে এসেছে। শাদিকভাবে (ও মর্যাদাগতভাবে), অর্থগতভাবে এবং حُكْمِي বা বিধানগতভাবে (কারণ মাফউল পরে আসা-ই নিয়ম)।

قَوْلُهُ اَلَتَنَافَرُ اَنْ تَكُوْنَ اَلْكَلِمَاتُ تَقْبِيْلَةً : তানাকুরে কালিমাত-এর অর্থ হলো- কয়েকটি শব্দ এমনভাবে পরস্পর মিলে আসা যার দ্বারা উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায় এবং উচ্চারণের মধ্যে সাবলীলতা নষ্ট হয়ে যায়।

যদিও প্রত্যেকটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে ফাসাহাতযুক্ত। যেমন- এই কবিতায় হয়েছে- قَبْرِ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ * وَلَيْسَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرِ حَرْبٍ - কবিতাটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে লেখক তার রচিত গ্রন্থ আজায়েবুল মাখলুকাত-এ লিখেছেন যে, জিন জাতির একটি শ্রেণীর নাম 'হাতিফ'। তাদের মধ্য হতে এক জিন হারব ইবনে উমাইয়ার নিকট এক বিকট চিৎকার করে, যার ফলে হারব মৃত্যুবরণ করে। এই চিৎকার দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথিত আছে যে, হারব সাপের ছদ্মবেশী একটি জিনকে পদদলিত করে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরেকটি জিন তার সামনে বিকটস্বরে চিৎকার করলে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু যে স্থানে তার মৃত্যু হয় সেখানে কোনো আবাদী বা কবরস্থান ছিল না। সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সেই জিন এক কবিতার এ পঙক্তিটি আবৃত্তি করে। কবিতার দ্বিতীয় লাইনের قَبْرِ , حَرْب , قَبْرِ ও قَبْرِ পৃথকভাবে প্রত্যেকটি ফসীহ বা বিশুদ্ধ শব্দ। কিন্তু একসাথে এভাবে একত্রিত হওয়ার কারণে কবিতার উচ্চারণ কঠিন হয়ে গেছে। যেমন - আমরা বাংলায় বলে থাকি 'পাখি পাকা পেপে খায়'।

قَوْلُهُ شَعْرُ كَرِيْمٍ مَتْنِي اَمْدَحُهُ اَمْدَحُهُ وَالْوَرٰى : এটি তানাকুরে কালিমাতের দ্বিতীয় উদাহরণ। কবিতার ভাবার্থ- সে সম্মানিত ও মহৎ ব্যক্তি। যখন আমি তার প্রশংসা করি জগদ্বাসী সকলেই আমার সাথে প্রশংসা করে। অর্থাৎ বিশ্ববাসী সকলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর যখন তার নিন্দা করি তখন আমার কোনো সাথী থাকে না। তিনি এত গুণের আধার যে, তার নিন্দায় কোনো লোক পাওয়া যায় না। এ কবিতার প্রত্যেকটি শব্দ পৃথকভাবে ফসীহ বা শুদ্ধতা সাবলীলতার মানোত্তীর্ণ। কিন্তু সবগুলো শব্দের মিলনে এটি মাধুর্যতা হারিয়েছে এবং এর উচ্চারণ কঠিন হয়ে গেছে।

-- সারসংক্ষেপ :

تَنَافَرُ বলা হয় বাক্যের প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে বিশুদ্ধ, ত্রুটিমুক্ত ও শ্রুতিমধুর হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর একত্রে উচ্চারণ কঠিন হয়েছে। যেমন- قَبْرِ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرِ * وَلَيْسَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرِ حَرْبٍ

উল্লেখ্য যে, এ কবিতার প্রতিটি শব্দ শুদ্ধ-সাবলীল তথা তানাকুরমুক্ত। কিন্তু শব্দগুলোর এভাবে একত্রিত হওয়াটা একে মূতানাকুর করে দিয়েছে।

وَإِنَّمَا مَثَلُ بِمِثَالَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَنَاهٍ فِي الثَّقِيلِ وَالثَّانِي دُونَهُ لِأَنَّ مَنْشَأَ الثَّقِيلِ فِي الْأَوَّلِ نَفْسُ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَاتِ وَفِي الثَّانِي اجْتِمَاعُ حُرُوفٍ مِنْهَا وَهُوَ فِي تَكَرُّرِ أَمْدَحِهِ دُونَ مُجَرَّدِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالْهَاءِ لِوُقُوعِهِ فِي التَّنْزِيلِ مِثْلُ فَسَبِّحْهُ فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الثَّقِيلِ مُخَلَّلٌ بِالْفَصَاحَةِ ذَكَرَ الصَّاحِبُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَنَّهُ أَنْشَدَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ بِحَضْرَةِ الْأُسْتَاذِ ابْنِ الْعَمِيدِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذَا الْبَيْتَ قَالَ لَهُ الْأُسْتَاذُ هَلْ تَعْرِفُ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الْهُجْنَةِ قَالَ نَعَمْ مُقَابَلَةُ الْمَذْحِ بِاللُّومِ وَإِنَّمَا يُقَابَلُ بِالذِّمِّ أَوْ الْهَجَاءِ فَقَالَ الْأُسْتَاذُ غَيْرَ هَذَا أُرِيدُ فَقَالَ الصَّاحِبُ لَا أَذَرِي غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ الْأُسْتَاذُ هَذَا التَّكَرُّرُ فِي أَمْدَحِهِ أَمْدَحُهُ مَعَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَاءِ وَالْهَاءِ وَهُمَا مِنْ حُرُوفِ الْحَلْقِ خَارِجٌ عَنِ حَدِّ الْإِعْتِدَالِ نَافِرٌ كُلُّ التَّنَافُرِ فَاتْنِي عَلَيْهِ الصَّاحِبُ -

অনুবাদ : তিনি (মূল লেখক) দু'টি উদাহরণ পেশ করেছেন। কারণ, প্রথম উদাহরণ চরম কঠিন, আর দ্বিতীয় উদাহরণ (প্রথমটির চেয়ে) কম কঠিন। কেননা, প্রথমটির মধ্যে কাঠিন্যের উৎস হলো কয়েকটি কালিমার মিলন, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অনেকগুলো হরফ একত্র হওয়া। আর এটি হয়েছে 'أَمْدَحُهُ' দু'বার আনার কারণে, শুধুমাত্র 'هـ' এবং 'حـ' এর মিলনের কারণে নয়। কেননা এ ধরনের ব্যবহার পবিত্র কুরআনে হয়েছে। যেমন- سَبِّحْهُ। সুতরাং একথা বলা সঠিক হবে না যে, এতটুকু কাঠিন্য ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর।

জনাব ইসমাসীল ইবনে আব্বাদ বলেন, তিনি এ কবিতাটি উস্তাদ ইবনুল 'আমীদের সামনে আবৃত্তি করেন। যখন এ পঙ্ক্তি পর্যন্ত পৌঁছলেন, উস্তাদ তাকে বললেন, তুমি কি এতে কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! এতে 'مَدَح' শব্দের বিপরীতে 'لُوم' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ 'مَدَح' এর বিপরীতে 'وَذَم' ব্যবহার হয়ে থাকে। তখন উস্তাদ বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটি নয়, তখন সাহিব ইবনে আব্বাদ বললেন, আমার তো এটি ছাড়া আর কিছু জানা নেই। উস্তাদ বললেন, 'هـ' এবং 'حـ' এর মিলন এবং সেই সাথে 'أَمْدَحُهُ' কে দু'বার ব্যবহার করা। উল্লেখ্য যে, এ দু'টি অক্ষরের মাঝারাজ কণ্ঠনালী। এসব মিলিয়ে বাক্যটির উচ্চারণ স্বাভাবিক ভারসাম্যতার বাইরে চলে গেছে। ফলে এটি সম্পূর্ণভাবে তানাহুফরযুক্ত হয়েছে। অতঃপর সাহিব ইবনে আব্বাদ (তার এ ব্যাখ্যা শুনে) তার প্রশংসা করলেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا مَثَلُ بِمِثَالَيْنِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক তানাহুফরের দু'টি উদাহরণ দিলেন কেন? তিনি ইতঃপূর্বে ضَعُفَ تَالِيْفِ এর মধ্যে তো তা করেননি? এর জবাব দিতে গিয়ে ব্যাখ্যাকার বলেছেন, তানাহুফর দু' ধরনের- ১. চূড়ান্তভাবে কঠিন, ২. সাধারণ পর্যায়ের কঠিন- যা প্রথম প্রকারের চেয়ে কম কঠিন হয়ে থাকে। তাই তানাহুফরের প্রথম প্রকারকে সুস্পষ্ট করার জন্য প্রথম উদাহরণ তথা لَيْسَ قُرْبُ قُرْبٍ قُرْبٍ قُرْبٍ টি পেশ করেছেন। এ কবিতায় قُرب و قُرب ইত্যাদি একত্রে আসার কারণে উচ্চারণ তার সাবলীলতা হারিয়েছে এবং এর

উচ্চারণ চরম কঠিন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কবিতা তথা **كَرِنَمَ مَتَى أَمْدَحُهُ وَالْوَرَى**-এর মধ্যে **أَمْدَحُهُ**-এর দু'বার ব্যবহার সেই সাথে **هـ** এবং **حـ** একত্রে দু'বার এসেছে। শুধু **هـ** এবং **حـ**-এর মিলন এমন সমস্যা সৃষ্টি করে না, যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। তবে এখানে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে দু'টি বিষয় মিলে, যথা **هـ** এবং **حـ**-এর মিলন এবং **أَمْدَحُهُ**-এর তাকরার। তবে এটি প্রথম উদাহরণের তুলনায় কম কঠিন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শুধুমাত্র **هـ** এবং **حـ**-এর মিলন যদিও সামান্য জড়তা সৃষ্টি করে তবু তা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর নয়। কেননা, কুরআনুল কারীমে এ ধরনের মিলন দেখা যায়। যেমন- **فَسَيَحْيِي** আর এ কথা সর্বসম্মত যে, পবিত্র কুরআনে কোনো ফাসাহাতবিহীন শব্দ নেই।

قَوْلُهُ ذَكَرَ الصَّاحِبُ إِسْمَاعِيلَ : এখানে মুসান্নিফ (র.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা তার দাবিকে জোরালো করে। অর্থাৎ শুধুমাত্র **هـ** এবং **حـ**-এর মিলন ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর নয়; বরং **هـ** এবং **حـ** যে শব্দে একত্রিত হয়েছে সে শব্দের তাকরার দ্বারা- ফাসাহাত নষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ-এর উস্তাদ ইবনুল 'আমীদ। আর ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ হলেন ইলমে বালাগাতের জনকদের অন্যতম। তিনি আব্দুল কাহির জুরজানির উস্তাদ। **الصاحب** ইসমাঈল ইবনে আব্বাদের উপাধি। কারণ, ইসমাঈল ছিলেন বাদশাহের দরবারের একজন বিশিষ্ট সভাসদ। তৎকালে বাদশাহের সভাসদদের **صاحب** উপাধিতে ভূষিত করা হতো। একদা ইসমাঈল তার উস্তাদ ইবনুল 'আমীদের সামনে ঐ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন, যার মধ্যে এই পঙ্ক্তিটি ছিলো- **كَرِنَمَ مَتَى أَمْدَحُهُ وَالْوَرَى مَتَى** ইসমাঈল যখন এ পঙ্ক্তিটি আবৃত্তি করলেন, তখন তার উস্তাদ তাকে বললেন, তোমার দৃষ্টিতে এতে কোনো ত্রুটি আছে? জবাবে ইসমাঈল বললেন, কবি এ পঙ্ক্তিটির মধ্যে **مدح** শব্দের বিপরীতে **لوم** শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ সাধারণভাবে **مدح**-এর বিপরীতে **ذم** বা **هجاء** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উস্তাদ তাকে বললেন, এটি ছাড়া আর কোনো ত্রুটি কি লক্ষ্য করছ? তিনি বললেন, না। তখন উস্তাদ বললেন, **هـ** ও **حـ** উভয়টির (মাখরাজ কণ্ঠনালী) মিলন এবং **أَمْدَحُهُ**-এর তাকরার (এ দু'টি বিষয়) তাকে কঠিন করে তুলেছে এবং বাক্যটির স্বাভাবিক সাবলীলতা-স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফলে বাক্যটিতে তানাহুর সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাখ্যা শোনে ইসমাঈল তার উস্তাদ ইবনুল 'আমীদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। উল্লেখ্য যে, ইবনুল 'আমীদের মতে শুধুমাত্র **هـ** ও **حـ**-এর দ্বারা ফাসাহাত নষ্ট হয়নি; বরং এ দু'টির মিলনের সাথে **أَمْدَحُهُ**-এর তাকরার তথা দু'বার ব্যবহার দ্বারা তানাহুর সৃষ্টি হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

উপরোক্ত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের তানাহুরের দু'টি উদাহরণ উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তানাহুরের মাত্রা যে কমবেশি হতে পারে তা বুঝানোর জন্য লেখক দু'টি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম কবিতাটিতে তানাহুরের পরিমাণ বেশি, আর দ্বিতীয়টিতে এর চেয়ে কম।

وَالْتَّعْقِيدُ أَيْ كَوْنُ الْكَلَامِ مُعَقَّدًا أَنْ لَا يَكُونَ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لِخَلَلٍ وَاقِعٍ
إِمَّا فِي النِّظْمِ بِسَبَبِ تَقْدِيمِ أَوْ تَاخِيرِ أَوْ حَذْفِ أَوْ إِضْمَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ صُعُوبَةَ
فَهْمِ الْمُرَادِ كَقَوْلِ الْفَرَزْدَقِ فِي مَدْحِ خَالِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ شِعْرًا وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُمْلِكًا * أَبُو أُمِّهِ حَيُّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ
أَي لَيْسَ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيُّ يُقَارِبُهُ أَيْ أَحَدٌ يَشَبِّهُهُ فِي الْفَضَائِلِ إِلَّا مُمْلِكًا أَيْ رَجُلٌ أُعْطِيَ الْمُلْكُ
يَعْنِي هِشَامًا أَبُو أُمِّهِ أَيْ أَبُو أُمِّ ذَلِكَ الْمُلْكِ أَبُوهُ أَيْ إِبْرَاهِيمَ الْمَمْدُوحَ أَيْ لَا يُمَاتِلُهُ أَحَدٌ إِلَّا
ابْنُ أُخْتِهِ وَهُوَ هِشَامٌ فَفِيهِ فَضْلٌ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ أَعْنَى أَبُو أُمِّهِ أَبُوهُ بِالْأَجْنَبِيِّ الَّذِي هُوَ
حَيٌّ وَبَيْنَ الْمَوْصُوفِ وَالصِّفَةِ أَعْنَى حَيُّ يُقَارِبُهُ بِالْأَجْنَبِيِّ الَّذِي هُوَ أَبُوهُ وَتَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى أَعْنَى
مُمْلِكًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعْنَى حَيٌّ وَفَضْلٌ كَثِيرٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَهُوَ حَيٌّ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ وَهُوَ
مِثْلُهُ فَقَوْلُهُ مِثْلُهُ إِنْ سُمَّ مَا وَفَى النَّاسِ خَبْرُهُ وَمُمْلِكًا مَنْصُوبٌ لِتَقْدِيمِهِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ -

অনুবাদ : تعقيد অর্থ বাক্য দুর্বোধ্য হওয়া বা কাঙ্ক্ষিত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট না হওয়া। বাক্য বিন্যাসের বেলায় ত্রুটি তথা শব্দটি তার স্থান থেকে অগ্র-পশ্চাতে হওয়া, উহ্য হওয়া, সর্বনাম ব্যবহার করা ইত্যাদি কারণে, যা অর্থ বোঝানোর ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে। যেমন ফারায়দাকের কবিতা যা তিনি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের মামা ইবরাহীম ইবনে হিশাম ইবনে ইসমাইল আল-মাখযুমীর প্রশংসায় রচনা করেছেন। কবিতা- এমন কোনো ব্যক্তি আর জীবিত নেই, যে সৎগুণাবলিতে তার সমকক্ষ হবে, তবে তার ভাগ্নে (বাদশাহ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক) ব্যতীত। অর্থাৎ তার মতো কোনো জীবিত ব্যক্তি (এ যুগের লোকদের মধ্যে নেই) অর্থাৎ সৎগুণাবলিতে তার উপমা হওয়ার মতো। তবে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। مُمْلِكٌ অর্থ যাকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে। তিনি এখানে হিশামকে বুঝিয়েছেন। তার মায়ের পিতা তথা সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত বাদশাহর মায়ের পিতা তার অর্থাৎ আলোচিত ইবরাহীমের পিতা, অর্থাৎ তার বোনের ছেলে ছাড়া কেউ তার সমকক্ষ নেই। সে হলো হিশাম। এ পঙ্ক্তির মধ্যে মুবতাদা তথা أَبُو أُمِّهِ এবং খবর তথা أَبُوهُ-এর মাঝে اجنبى (এ দুয়ের সাথে সম্পর্কহীন শব্দ) তথা حَيٌّ দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। মাওসূফ তথা حَيٌّ এবং সিফাত তথা يُقَارِبُ-এর মধ্যে اجنبى তথা أَبُوهُ দ্বারা দূরত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর মুসতাহনা তথা مُمْلِكًا (শব্দটি)-কে মুসতাহনা মিনহু তথা حَي-এর আগে আনা হয়েছে। আর بدل তথা حَيٌّ এবং مبدل منه তথা مِثْلُهُ-এর মধ্যে রয়েছে বিরাট দূরত্ব। مِثْلُهُ হলো ما-এর ইসম। مِثْلُهُ فِي النَّاسِ এর খবর। مُمْلِكًا-কে যবর দেওয়া হয়েছে মুসতাহনা মিনহুর আগে আসার কারণে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالتَّعْقِيدُ أَيْ كَوْنُ الْكَلَامِ الخ : ফাসাহাতে কালামের জন্য ক্ষতিকর তৃতীয় দৃষ্ণীয় বিষয়টি হলো تعقيد আর বলা হয় বাক্যের মধ্যে এমন জটিলতা পাওয়া যওয়া যার দ্বারা বাক্যে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে হয়ে যায়। বাক্যের মধ্যে এ রকম জটিলতা দু'ধরনের হতে পারে- ১. ইবারত বা বাক্যের গঠন প্রণালীতে জটিলতা থাকবে। যেমন কোনো একটি শব্দকে তার স্থান থেকে আগে নিয়ে আসা অথবা পরে আনা। ২. অথবা কোনো একটি শব্দ উহ্য রাখা কিংবা নামের স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করা ইত্যাদি। এ ধরনের জটিলতাকে تَعْقِيدٌ لَفْظِي বলা হয়। মুসান্নিফ (র.) এর উদাহরণ হিসেবে বিখ্যাত কবি ফারায়দাকের একটি কবিতার অংশ পেশ করেন।

কবি ফারায়দাকের পরিচয় :

নাম : হাম্মাম ইবনে গালিব ইবনে সা'সা'আ আত-তামীমি (৬৪১-৭৩৩)। তিনি উমাইয়া যুগের বিখ্যাত কবি ছিলেন। তার চেহারা বসন্তে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তার পিতা গালিব গোত্রীয় নেতা ছিল। তার উপনাম হলো আবুল আখতাল। তার ছেলের নাম আখতাল, সে হিসেবে তার ডাকনাম হয়েছিল আবুল আখতাল। তার ছেলেও কবি ছিলেন। তার দাদা সা'সা'আ সাহাবী ছিলেন। তার মায়ের নাম লায়লা বিনতে হাবিস। যিনি আকরা ইবনে হাবিসের বোন। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট তাবেরী। তিনি হযরত আলী, আবু হুরায়রা, ইবনে ওমর, হুসাইন ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার যুগের কবি জারীরের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তারা পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য কবিতা রচনা করতেন। তাই তারা مدح ও هجاء-তে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

কবিতাটি তিনি হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান-এর মামা ইবরাহীম ইবনে ইসমাইলের প্রশংসায় রচনা করেন। ইবরাহীম ছিলেন তার ভাগ্নে হিশামের পক্ষ থেকে মদীনার গভর্নর। কবিতা **وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُلْكًا * أَبُو** ভাবার্থ- জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইবরাহীমের মতো সৎগুণের অধিকারী কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে একজন বাদশাহ তার মতো উত্তম হবেন যার মায়ের পিতা এবং তার পিতা একই ব্যক্তি অর্থাৎ তার ভাগ্নে হিশাম তার মতো হতে পারে। এছাড়া আর কেউ সৎ গুণাবলিতে তার সমকক্ষ হবে না।

يُقَارِيهِ অর্থ **الْفَضَائِلُ** অর্থাৎ সৎগুণাবলিতে তার সমকক্ষ। **مُلْكًا** (اسم مفعول) অর্থ যাকে ক্ষমতা এবং রাজত্ব দান করা হয়েছে।

উক্ত কবিতার মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো- ১. **أَبُو** হলো মুবতাদা, তার খবর হলো **أَجْنَبِي**। **أَبُو** এ মুবতাদা ও খবরের মাঝে **حَيٌّ** শব্দটি এসেছে, যা উভয়ের সাথে সম্পর্কহীন বা **أَجْنَبِي**।

২. **يُقَارِيهِ** তার সিফাত। এ মাওসূফ সিফাতের মাঝে **أَبُو** শব্দটি বিচ্ছিন্নকারী হিসেবে এসেছে এবং **أَبُو**-এর সাথে সিফাত ও মাওসূফের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. **مُسْتَنَى** হলো **حَيٌّ** আর **مُسْتَنَى** হলো **مُلْكًا**। এখানে **مُسْتَنَى**-কে **مُسْتَنَى**-এর আগে আনা হয়েছে।

৪. **مِثْلُهُ** হলো **مَبْدَلٌ** আর **بَدَلٌ** হলো **حَيٌّ**। এখানে এ দুটির মাঝে ব্যাপক দূরত্ব বিদ্যমান।

কবিতাটির সঠিক বিন্যাস এরূপ- **لَيْسَ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيٌّ يُقَارِيهِ إِلَّا هِشَامُ أَبُو أُمِّهِ أَبُوهُ**

মুসান্নিফ (র.) তারকীব করতে গিয়ে বলেন, **مِثْلُهُ** হলো **مَا**-এর **اسم** আর **النَّاسِ** হলো খবর, আর **مُلْكًا** হলো **رَفْع** হবে। **مُسْتَنَى** এখানে এটি **مُسْتَنَى**-এর আগে হওয়ার কারণে যবর বিশিষ্ট হবে, পরে আসলে **رَفْع** হবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. **تَعْقِيدٌ** অর্থ বাক্য দুর্বোধ্য হওয়া। **تَعْقِيدٌ** দু'ভাবে পাওয়া যায়- ১. **لَفْظِي** ভাবে, যাকে **تَعْقِيدٌ لَفْظِي** বলা হয়।

২. অর্থগতভাবে যাকে **تَعْقِيدٌ مَعْنَوِي** বলা হয়। যে কোনো বাক্য **فَصِيح** হওয়ার জন্য উভয়বিধ **تَعْقِيد** থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যিক।

খ. **تَعْقِيدٌ لَفْظِي** বলা হয় বাক্যের শব্দাবলির মাঝে বিন্যাসগত ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলার কারণে বাক্যের অর্থ দুর্বোধ্য ও

কঠিন হয়ে যাওয়া। বিন্যাসগত ত্রুটি- যেমন কোনো শব্দ তার স্থান থেকে আগে চলে আসা। যে দুটি শব্দ একত্রে থাকার কথা তা বিচ্ছিন্নভাবে আসা। **تَعْقِيدٌ لَفْظِي**-এর উদাহরণ: **وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلَّا مُلْكًا * أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِيهِ**

কবিতাটির সঠিক বিন্যাস এরূপ- **لَيْسَ مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيٌّ يُقَارِيهِ إِلَّا هِشَامُ أَبُو أُمِّهِ أَبُوهُ**

قِيلَ ذَكَرُ ضَعْفِ التَّالِيفِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِحَوَازِ أَنْ
يَحْصَلَ التَّعْقِيدُ بِاجْتِمَاعِ عِدَّةِ أُمُورٍ مُوجِبَةٍ لِمُصَوَّبَةٍ فَهِيَ الْمُرَادُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا
جَارِيًا عَلَى قَانُونِ النَّحْوِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَاحَاجَةٌ فِي بَيَانِ التَّعْقِيدِ فِي
النَّبِيِّ إِلَى ذِكْرِ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ
بِاتِّفَاقِ النُّحَاةِ إِذْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يُوجِبُ زِيَادَةَ التَّعْقِيدِ وَهُوَ مِمَّا يَقْبَلُ الشَّدَّةَ وَالضُّعْفَ -

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন যে, **تَعْقِيدُ لَفْظِي**-এর আলোচনার প্রয়োজন রাখেনি। কিন্তু এ মতে আপত্তি আছে। কেননা, কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়ে **تَعْقِيد** পাওয়া যাওয়া সম্ভব, যা কাক্ষিত অর্থ বুঝাতে জটিলতা সৃষ্টি করে; যদিও এর প্রতিটি বিষয় নাহ বা ব্যাকরণের নিয়ম মারফিক ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ঐ কথার অসারতা প্রমাণিত হয়, যা বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত পঙ্ক্তিটিতে **تَعْقِيد** বর্ণনার জন্য **تَعْقِيد**-কে **مُسْتَثْنَى مِنْهُ**-এর আগে আনার বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই; বরং এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা, এ তো সব নাহবিশারদদের একমত্যে বৈধ। (তাদের কথটি অসার হওয়ার) কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি (অর্থাৎ **مُسْتَثْنَى مِنْهُ**-কে **مُسْتَثْنَى**-এর আগে আনা) **تَعْقِيد** (দুর্বোধ্যতা)-এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আর **تَعْقِيد** বা দুর্বোধ্যতার মধ্যে কমবেশি হতে পারে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আল্লামা খালখালীর একটি মন্তব্য পেশ করছেন। খালখালী বলেন, **تَعْقِيدُ لَفْظِي** তো **ضَعْفُ التَّالِيفِ** থেকে উদ্ভূত। অতএব, বাক্য যখন **ضَعْفُ تَالِيفٍ** থেকে মুক্ত হবে তখন **تَعْقِيد** থেকেও মুক্ত হবে। সুতরাং **ضَعْفُ التَّالِيفِ** থেকে মুক্ত করার শর্তারোপ করার পর আলাদা করে **تَعْقِيد** থেকে মুক্ত করার শর্ত করা নিরর্থক কাজ। তাই তিনি বলেন, **ضَعْفُ التَّالِيفِ**-এর আলোচনা **تَعْقِيد**-এর আলোচনা প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে দিয়েছে।

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, **فِيهِ نَظَرٌ** অর্থাৎ আপনার দাবি সঠিক নয়। কেননা, **ضَعْفُ التَّالِيفِ** বলা হয় কালামের শব্দাবলির গঠন ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত হওয়া। কিন্তু আমরা কখনো দেখতে পাই যে, কালামের অন্তর্গত সব শব্দাবলি ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তারপরেও কয়েকটি বিষয় এমনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যার দ্বারা ব্যাক্যটির মর্মার্থ কঠিন হয়ে **تَعْقِيدُ لَفْظِي**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতএব **ضَعْفُ التَّالِيفِ** ছাড়াও **تَعْقِيدُ لَفْظِي** পাওয়া যাওয়া সম্ভব। এমনভাবে কখনো দেখা যায় যে, **ضَعْفُ التَّالِيفِ** হয়েছে; কিন্তু **تَعْقِيد** হয়নি। তাই **تَعْقِيد**-এর আলোচনা পৃথকভাবে করাই বাঞ্ছনীয়।

এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের উল্লিখিত জবাব দ্বারা এ ব্যাপারে উত্থাপিত একটি আপত্তির নিরসন হয়ে যায়।

আপত্তিটি হলো- উল্লিখিত শ্লোকে **تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ**-কে অনেকে **تَعْقِيد**-এর মধ্যে शामिल করে থাকেন। অথচ **تَعْقِيدُ لَفْظِي**-এর মধ্যে शामिल করা ঠিক নয়। কারণ, **مُسْتَثْنَى مِنْهُ**-কে **مُسْتَثْنَى**-এর আগে আনা নাহবিদদের মতে সঠিক এবং এ ধরনের **تَقْدِيم** গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এটি ব্যাকরণগতভাবে সঠিক, তাই একে **تَعْقِيد**-এর মধ্যে शामिल করা মোটেও ঠিক নয়।

উত্তর : আমরা বলি, এই প্রশ্ন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য যারা **صُغِفَ التَّالِيفِ**-এর মধ্যে **تَعْقِيدَ لَفْظِي**-কে शामिल করেন এবং তারা মনে করে থাকেন যে, বৈকরণিক ক্রটি হলে **تعقيد** হয়, অন্যথায় নয়। আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্য ব্যবহৃত হওয়ার পরও এতে **تعقيد** পাওয়া যেতে পারে। অতএব, এখানেও **تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ** যদিও বৈধ, কিন্তু মুবতাদা ও খবরের মাঝে এবং মাওসূফ ও সিফাতের মাঝে প্রতিবন্ধক **تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ** সৃষ্টি হয়েছে **تعقيد** এর মাঝে দূরত্ব হওয়ার কারণে যে **تَعْقِيدَ** সৃষ্টি হয়েছে **تَقْدِيمُ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ**-এর মাঝে **مُبَدَلٍ مِنْهُ** ও **بَدَل** দ্বারা তার মাঝে আরো বেশি দুর্বোধ্যতা যোগ হয়েছে। অতএব, এটিকে **تعقيد**-এর অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

আর এ কথাও সকলের জানা যে, বাক্যের মধ্যে **تعقيد** বা দুর্বোধ্যতার মাত্রা কমও হতে পারে, বেশিও হতে পারে। অর্থাৎ কোনো বাক্য কম দুর্বোধ্য, আর কোনো বাক্য বেশি দুর্বোধ্য হতে পারে।

সারা-সংক্ষেপ :

আল্লামা খালখালীর মতে **تَعْقِيدَ لَفْظِي** টা **صُغِفَ التَّالِيفِ**-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই পৃথকভাবে **تَعْقِيدَ لَفْظِي** আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাহানীর মতে এ মতটি সঠিক নয়। কেননা, ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী গঠিত বাক্যের মধ্যেও **تَعْقِيدَ لَفْظِي** পাওয়া যাওয়া সম্ভব, আর **صُغِفَ التَّالِيفِ** অর্থ হচ্ছে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়া।

وَأَمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ عَظْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إِمَّا فِي النِّظْمِ أَيْ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ لِخَلَلٍ وَقَعَ فِي إِنْتِقَالِ الذَّهْنِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ الْمَفْهُومِ بِحَسَبِ اللَّفْظِ إِلَى الثَّانِي الْمَقْصُودِ وَ ذَلِكَ بِسَبَبِ إِيْرَادِ اللَّوْازِمِ الْبَعِيدَةِ الْمُفْتَقِرَةِ إِلَى الْوَسَائِطِ الْكَثِيرَةِ مَعَ خَفَاءِ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَقْصُودِ كَقَوْلِ الْأَخَرِ وَهُوَ عَبَّاسُ بْنُ الْأَخْنَفِ وَلَمْ يَقُلْ كَقَوْلِهِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَهُ عَوْدَ الضَّمِيرِ إِلَى الْفَرَزْدَقِ شِعْرٌ سَأَطْلُبُ بَعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقَرُّبُوا * وَتَسْكُبُ بِالرَّفْعِ هُوَ الصَّحِيحُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا جَعَلَ سَكَبَ الدُّمُوعِ كِنَايَةً عَمَّا يَلْزَمُ فِرَاقَ الْأَحِبَّةِ مِنَ الْكَأَبَةِ وَالْحُزَنِ وَأَصَابَ لِكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ كِنَايَةً عَمَّا يُوجِبُهُ دَوَامُ التَّلَاقِ مِنَ الْفَرَجِ وَالسُّرُورِ فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنَ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوعِ حَالٌ إِرَادَةُ الْبُكَاءِ وَهِيَ حَالَةُ الْحُزَنِ عَلَى مُفَارَقَةِ الْأَحِبَّةِ لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السُّرُورِ الْحَاصِلِ بِالْمُلَاقَاةِ وَمَعْنَى الْبَيْتِ إِنِّي الْيَوْمَ أَطِيبُ نَفْسًا بِالْبُعْدِ وَالْفِرَاقِ وَأُوْطِنُهَا عَلَى مُقَاسَاةِ الْأَحْزَانِ وَالْأَشْوَاقِ وَاتَّجَرَعُ غُصَصَهَا وَاتَّحَمَلُ لَاجِلَهَا حُزْنًَا يُفِيضُ الدُّمُوعَ مِنْ عَيْنَيَّ لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ إِلَى وَصْلِ يَدُومٍ وَمَسَرَّةٍ لَاتَزُولُ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ وَمَعَ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا وَلِكُلِّ بِدَايَةٍ نِهَآيَةٌ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ وَلِلْقَوْمِ هَهُنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ أَوْرَدْنَاهُ فِي الشَّرْحِ -

অনুবাদ : অথবা ক্রটি থাকবে (শব্দ থেকে মর্ম পর্যন্ত) পৌছার ক্ষেত্রে । শব্দটি লেখকের ইবারত وَأَمَّا فِي النِّظْمِ -এর উপর আতফ হয়েছে । অর্থাৎ কালামটি উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে সুস্পষ্ট হবে না অভিধান থেকে প্রাপ্ত (শব্দের) প্রথম অর্থ (তথা শব্দের প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ) থেকে কাজীকৃত অর্থে পৌছার ক্ষেত্রে ক্রটির কারণে । আর এমনটা হয় সুদূরবর্তী لَوَازِم -কে ব্যবহার করার ফলে, যে لَوَازِم অনেক মাধ্যম বা ভাষার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে । সেই সাথে কাজীকৃত অর্থের প্রতি ইঙ্গিতবহ দলিলসমূহও প্রচ্ছন্ন থাকে । যেমন অপর একজনের কবিতা- তিনি হচ্ছেন আব্বাস ইবনে আহনাফ । লেখক 'যেমন তার কবিতা' এ কথাটি বলেননি, যাতে সর্বনাম দ্বারা ফারায়দাক উদ্দেশ্য বলে এমন ধারণা না হয় ।

কবিতা : আমি তোমাদের থেকে আব্বাসস্থলের দূরত্ব কামনা করছি, যাতে তোমরা কাছে আসতে পার । تَسْكُبُ (পেশ সহকারে) আর আমার দু'চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে যাতে সেগুলো শুকিয়ে যায় । অশ্রুবর্ষণ দ্বারা তিনি কিনায়া বা ইঙ্গিত করেছেন বন্ধুদের বিচ্ছেদের মাধ্যমে যা লাযেম হয় অর্থাৎ দুঃখ-দুর্দশার প্রতি এবং তাঁর (এ কিনায়া) সঠিক হয়েছে । তবে তিনি ভুল করেছেন- চোখ শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা কিনায়া করতে গিয়ে এমন বিষয়ের প্রতি যা আবশ্যকীয় হয় সব সময়ের দেখা সাক্ষাতের দ্বারা অর্থাৎ আনন্দ ও প্রফুল্লতার প্রতি । কেননা, চোখ শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা কাঁদার ইচ্ছা করা অবস্থায় চোখের অশ্রুমালা বর্ষণে কৃপণতার প্রতি মানুষের ধারণা হয়, সেটি অর্থাৎ চোখ শুকিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্ধুদের বিরহের কারণে দুঃখের অবস্থা । সেদিকে ধারণা যায় না, যা তিনি ইচ্ছা করেছেন । অর্থাৎ আনন্দ ও প্রফুল্লতা, যা বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা লাভ হয় । পুরো পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা হলো- আজ আমি আমার মনকে বিচ্ছেদ ও বিরহে প্রফুল্ল রাখছি এবং তাকে এ দুঃখ-যাতনা ভোগে অভ্যস্ত করে

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ كَقَوْلِ الْآخَرِ وَهُوَ عَبَّاسُ بْنُ الْأَخْنَفِ : আব্বাস ইবনে আ'হনাফ বনী হানীফা গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি বাদশাহ হাক্কনুর রশীদের দরবারের কবি ছিলেন। মুসান্নিফ বলেন, লেখক كَقَوْلِ বলেননি। কারণ, এমনটি বললে শ্রোতা-পাঠকের মনে হতো যে, এ শে'রটিও পূর্বের শে'রটির মতো ফারায়দাকেরই রচিত। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে আব্বাস ইবনে আহনাফের রচিত।

উল্লিখিত কবিতার প্রথম শব্দ سَاطَلُ-এর سین হলো তাকিদের জন্য, ভবিষ্যৎ বুঝানোর জন্য নয়। যেমন-سَنَكُبُ-কুরআনের আয়াতের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে। تَسْكُبُ-এর উপর পেশ হবে। কারণ, এটি سَاطَلُ-এর উপর عطف হবে, لَتَقْرُوا-এর উপর عطف হবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ কবিতায় লেখক দু'টি কিনায়া করেছেন। প্রথমত অশ্রুমালা প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা তিনি দুঃখ-যাতনার প্রতি কিনায়া করেছেন। তিনি চোখের অশ্রুমালা প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা কিনায়া করেছেন ঐ বিষয়ের প্রতি যা বন্ধুদের বিচ্ছেদের জন্য আবশ্যিক অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট। দুঃখ-কষ্ট যেমন বিচ্ছেদের জন্য আবশ্যিক, তেমনি অশ্রু প্রবাহিত হওয়ার জন্যও আবশ্যিক। তাই মুসান্নিফ যদি عَمَّا يَلْزَمُ مِنَ الْكُتَابَةِ وَالْحُزَنِ বলতেন, তাহলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতো। কথাটিকে তিনি ঘুরিয়ে বলেছেন। যা হোক তার এ কিনায়া সঠিক হয়েছে। তার দ্বিতীয় কিনায়া হলো جُمُودَ عَيْنٍ বা অশ্রু শুকিয়ে যাওয়া দ্বারা তিনি আনন্দ এবং সুখাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সে আনন্দ বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা হাসিল হয়। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের এ ব্যাখ্যাটি সঠিক হয়নি। কারণ, جُمُودَ عَيْنٍ বা অশ্রু শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত সাধারণত হয় দুঃখের সময় কান্নার ইচ্ছা সত্ত্বেও কান্না না আসার প্রতি। লেখকের উদ্দেশ্য আনন্দ-প্রফুল্লতা, যা হাসিল হয় সবসময় দেখা-সাক্ষাতের দ্বারা। এর প্রতি جُمُودَ عَيْنٍ-এর কোনো ইঙ্গিত নেই। আর এ কারণেই এতে تعقيد বা দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, ملزوم অর্থাৎ جُمُودَ عَيْنٍ এবং لازم আনন্দ-খুশি-এর মাঝে বহু ভায়া ও মাধ্যম রয়েছে। সেই সাথে উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি নির্দেশকারী দলিলও এখানে অস্পষ্ট।

مَعْنَى الْبَيْتِ : কবিতার পঙ্ক্তি দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হলো- আমি এখন তোমাদের থেকে দূরে চলে গিয়ে স্বীয় মনকে বিচ্ছেদ-বিরহের জন্য প্রস্তুত করবো। আর আমার মনকে দুঃখ-বেদনা এবং প্রেমের জ্বালা সহ্য করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করবো। তীব্র আসক্তির তিক্ততাকে টোক গিলে খাবো অর্থাৎ যাতনা সহ্য করবো তাদের ভালোবাসার কারণে এমন দুঃখ সহ্য করবো যা আমার চোখের অশ্রুমালা প্রবাহিত করে। এত কিছু করবো আমি স্থায়ী মিলন এবং অনন্ত সুখের আশায়। অবশেষে আমার সে সুখ আমার হাতের নাগালে আসবে। কারণ দুঃখের পর সুখ, ব্যথার পর আরাম আসবেই, এটাই তো শাস্বত নিয়ম। বলা হয়ে থাকে- ধৈর্যই সফলতার চাবিকাঠি, দুঃখের পর সুখ আসে এবং যে কোনো গুরুত্ব শেষ আছে। সূতরাং যখন আমার সুখ আনন্দ আসবে, তখন চোখের পানি শুকিয়ে যাবে। তখন আর চোখের অশ্রু ঝরবে না।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লেখকের ملزوم (جُمُودَ عَيْنٍ) এবং لازم (আনন্দ)-এর মাঝে কতগুলো মাধ্যম বা ভায়া এবং তার এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত কতটা অস্পষ্ট। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শায়খ আবদুল কাহের জুরজানী 'দালায়েলুল ই'জায' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাটিই করেছেন। তিনি বলেন, এ কবিতার ব্যাখ্যায় অনেকের ভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা রয়েছে, যা তিনি মুতাওয়ালের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এখানে সে ধরনের কিছু কথা আলোচনা করা হলো।

কেউ কেউ বলেন, (কবিতার অর্থ হলো) অতীত থেকে এই পর্যন্ত বন্ধুদের নৈকট্য ও সান্নিধ্য চেয়ে আসছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। তাই আমি এখন থেকে দুঃখ ও বিরহ কামনা করবো, যাতে আমার ভাগ্যে নৈকট্য লাভ হয়। কেননা, যুগ ও কালের এবং সাথীদের অভ্যাস এমনি যে, তাদের কাছে যা চাওয়া হয় তার বিপরীত জিনিস তারা দেয়। তাই কবি তাদের কাছে তার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু চাচ্ছেন, যাতে কাক্ষিত জিনিস হাসিল হয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. تَعْقِيدَ مَعْنَوِي বলা হয় বাক্যের অর্থ উদ্ধারে জটিলতা সৃষ্টি হওয়া। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে অপ্রচলিত مجاز (রূপকার্থ) ও অপ্রচলিত কিনায়া (ইঙ্গিতার্থ) ব্যবহার করা এবং মূল অর্থ ও রূপক অর্থের মাঝে এমন দূরত্ব থাকা যে, মূল অর্থ পর্যন্ত পৌছা সহজে সম্ভব হয় না। এর উদাহরণরূপে লেখক আব্বাস ইবনে আহনাফের কবিতা পেশ করেছেন-

سَاطَلُ بَعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لَتَقْرُوا * وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لَتَجْمَدَا

এখানে جُمُودَ عَيْنٍ-এর প্রচলিত ইঙ্গিতার্থ (কাঁদার চোখা করা সত্ত্বেও চোখে পানি না আসা) গ্রহণ না করে অপ্রচলিত ইঙ্গিতার্থ (দুঃখের অবসান ও সুখ লাভ করা) গ্রহণ করার কারণে تعقيد সৃষ্টি হয়েছে। আর এ কারণেই কবিতাটি غير نصيب হয়ে গেছে।

تُسْعِدُ : শব্দটি إِسْعَادُ (باب افعال) থেকে নির্গত। অর্থ- সাহায্য করা। غَمْرَةٌ অর্থ- ডুবে যাওয়া, তবে এখানে বিপদ-
 আপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। سُبُوْح শব্দটি উহা মাওসুফের সিফাত, এর মাওসুফ হলো فَرَس আর سُبُوْح ব্যবহৃত হয়েছে
 سَبَاحَةٌ وَسَبْعًا (باب فتح) শব্দটি। فَعُول-এর ওজনে- এটি পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। سُبُوْح শব্দটি
 থেকে নির্গত। অর্থ- সাঁতার কাটা। সূতরাং سُبُوْح অর্থ- দ্রুত সাঁতার। উত্তম ঘোড়ার ক্ষেত্রে শব্দটি مجاز হিসেবে ব্যবহৃত
 হয়। কবি এখানে سُبُوْح শব্দটিকে দ্রুতগামী বুঝানোর জন্য اسْتِعَارَةً مُصْرَحَةً হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

কেউ কেউ মনে করেন, ফাসাহাতে কালামের জন্য উপরোক্ত দোষসমূহ থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে كَثْرَةُ التَّكْرَارِ (অধিক পুনরাবৃত্তি) ও تَتَابُعُ الإِضَافَاتِ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত। كثرة التكرار-এর উদাহরণ হলো মুতানাব্বীর একটি শের-
تُسَعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ * سَبَّوحٌ لَهَا مِنْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ

وَتَتَابِعُ الْإِضَافَاتِ مِثْلُ قَوْلِهِ شَعَرَ حَمَامَةً جَرَعَى حَوْمَةَ الْجَنْدَلِ إِسْجَعِي * فَانْتِ بِمَرَأَى مِنْ سَعَادَ وَ مَسْمَعٍ، فَفِيهِ إِضَافَةٌ حَمَامَةٍ إِلَى جَرَعَى وَ جَرَعَى إِلَى حَوْمَةٍ وَ حَوْمَةٍ إِلَى الْجَنْدَلِ وَالْجَرَعَاءُ تَانِيثُ الْأَجْرَعِ قَصْرُهَا لِلضَّرُورَةِ وَهِيَ أَرْضٌ ذَاتُ رَمَلٍ لَا تُنْبِتُ شَيْئًا وَالْحَوْمَةُ مُعْظَمُ الشَّيْءِ وَالْجَنْدَلُ أَرْضٌ ذَاتُ حِجَارَةٍ وَالسَّجْعُ هَيْدِيرُ الْحَمَامِ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُهُ فَانْتِ بِمَرَأَى أَيْ بِحَيْثُ تَرَكَ سَعَادُ وَتَسْمَعُ صَوْتَكَ يُقَالُ فَلَانٌ بِمَرَأَى مِنِّي وَ مَسْمَعٍ أَيْ بِحَيْثُ أَرَاهُ وَاسْمَعُ قَوْلَهُ كَذَا فِي الصَّحَاحِ فَظَهَرَ فِسَادُ مَا قَبِلَ إِنَّ مَعْنَاهُ أَنْتِ بِمَوْضِعٍ تَرَيْنَ مِنْهُ سَعَادَ وَتَسْمَعِينَ كَلَانَهَا وَفِسَادُ ذَلِكَ مِمَّا يَشْهَدُ بِهِ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ -

অনুবাদ : এবং একের পর এক ইয়াফত হওয়া। যেমন কবির কবিতার চরণ : (যার অর্থ) হে বিশাল প্রস্তরাকীর্ণ বালুময় স্থানের কবুতর! তুমি গান করো। কেননা, তুমি সু'আদের দেখার এবং শোনার স্থানে অবস্থান করছ। এতে حَمَامَةُ শব্দটিকে جَرَعَى-এর দিকে ইয়াফত করা হয়েছে। جَرَعَى শব্দটিকে حَوْمَةَ-এর দিকে ইয়াফত করা হয়েছে এবং حَوْمَةَ শব্দটিকে الْجَنْدَل-এর দিকে ইয়াফত করা হয়েছে। আর الْجَرَعَى শব্দটি جَرَعُ-এর মুনত্ব। একে الف مقصورة দ্বারা লেখা হয়েছে ছন্দের প্রয়োজনে। আর এর অর্থ হলো বালুময় ভূমি, যা কোনো কিছু উৎপন্ন করে না। حَوْمَةَ বলা হয়, কোনো জিনিসের বড় অংশকে। جَنْدَل বলা হয় পাথুরে ভূমিকে। سَجْع অর্থ- কবুতর ইত্যাদির সুরেলা ডাক বা গান। কবির বাক্য فَانْتِ بِمَرَأَى অর্থ- তুমি এমন স্থানে আছ যে, সু'আদ তোমাকে দেখছে এবং তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, فَلَانٌ بِمَرَأَى مِنِّي وَ مَسْمَعٍ অর্থাৎ সে এমন স্থানে আছে যে, আমি তাকে দেখছি এবং তার কথা শুনতে পাচ্ছি। صَحَاح নামক অভিধানগ্রন্থে এরূপই লেখা রয়েছে। অতএব, এ ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা কথিত আছে তার ভ্রান্তি প্রমাণিত হলো। সেই ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, তুমি এমন স্থানে রয়েছ যে, তুমি সু'আদকে দেখছ এবং তার কথা শুনতে পাছ। এর ভ্রান্তির ব্যাপারে যুক্তি ও বর্ণনা উভয়ের সমর্থন পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ-এর إضافة শব্দটি إضافات শব্দের অর্থ একের পর এক বা ধারাবাহিক ভাবে। إضافة শব্দটি إضافة-এর বহুবচন। আরবিতে বহুবচনের জন্য কমপক্ষে তিন সংখ্যা লাগে। এখানে বহুবচন দ্বারা একের অধিক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ একের পর এক ইয়াফত ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। মুসান্নিফ إضافة-এর উদাহরণ প্রসঙ্গে আব্দুস সামাদ ইবনে মানসূর ইবনে হাসান ইবনে বাবুকের একটি শের পেশ করেছেন।

حَمَامَةُ جَرَعَى حَوْمَةَ الْجَنْدَلِ إِسْجَعِي * فَانْتِ بِمَرَأَى مِنْ سَعَادَ وَ مَسْمَعٍ

حَمَامَةُ হলো مَضَاف এর। এখানে উহা আছে। অতএব, حَمَامَةُ-এর মধ্যে نصب হবে। حَمَامَةُ অর্থ- মাদী কবুতর। جَرَعَى শব্দটি أَجْرَع-এর মুনত্ব। এর শেষে همزة যুক্ত الف مدودة ছিল; কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে ত লুপ্ত করে الف مقصورة দ্বারা লেখা হয়েছে। جَرَعَى অর্থ- বালুময় সমতল ভূমি তথা মরুভূমি যেখানে কোনো ফসল

حَمَامَةٌ جَرَعَتْ حَوْمَةَ الْجَنْدَلِ إِسْجَعِي * فَأَنْتَ بِمَرَأَى مِنْ سُعَادَ وَمَسْمَعِ

كُفْرَةُ التَّكْرَارِ "হা" সর্বনামের মধ্যে : قَوْلُهُ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا আয়াতগুলো দৃষ্টে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, كُفْرَةُ التَّكْرَارِ এবং تَتَابَعٌ إِضَافَت সাধারণভাবে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকারক নয়। যদি ক্ষতিকারক হতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহার কিছুতেই হতো না। অতএব, যারা এ থেকে কালামকে মুক্ত করার শর্ত করেন, তাদের মতামত সঠিক নয়।

وَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَ وَهِيَ كَيْفِيَّةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ وَالْكَفِيَّةُ عَرْضٌ لَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهُ عَلَى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ وَلَا يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ وَاللَّا قِسْمَةٌ فِي مَحَلِّهِ اقْتِضَاءً أَوَّلِيًّا فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ الْأَعْرَاضُ النَّسَبِيَّةُ مِثْلُ الْإِضَافَةِ وَالْفِعْلِ وَالْإِنْفِعَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَبِقَوْلِنَا لَا يَقْتَضِي الْقِسْمَةَ الْكَمِّيَّاتُ وَبِقَوْلِنَا اللَّا قِسْمَةَ النُّقْطَةُ وَالْوَحْدَةُ وَقَوْلِنَا أَوَّلِيًّا لِيَدْخُلَ فِيهِ مِثْلُ الْعِلْمِ بِالْمَعْلُومَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْقِسْمَةِ أَوْ اللَّا قِسْمَةَ فَقَوْلُهُ مَلَكَ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ عَنِ الْمَقْصُودِ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ لَا يُسَمَّى فَصِيحًا فِي الْإِضْطِلَاحِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رَاسِخًا فِيهِ وَقَوْلُهُ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّغْيِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ دُونَ أَنْ يَقُولَ يُعَبِّرُ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ يُسَمَّى فَصِيحًا إِذَا وَجَدَ فِيهِ تِلْكَ الْمَلَكَ سَوَاءً وَجَدَ التَّغْيِيرَ أَوْ لَمْ يَجِدْ وَقَوْلُهُ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ لِيَعْمَ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ أَمَّا الْمُرَكَّبُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُفْرَدُ فَكَمَا تَقُولُ عِنْدَ التَّعْدَادِ دَارٌ غُلَامٌ جَارِيَةٌ ثَوْبٌ بِسَاطٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ -

অনুবাদ : ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম- এমন একটি যোগ্যতা, **مَلَكَ** হলো অন্তরে বদ্ধমূল একটি **كَفِيَّة** বা অবস্থা, **كَفِيَّة** হলো একটি 'আরয যা অনুধাবন করা অন্য কিছু অনুধাবন করার উপর নির্ভরশীল নয় এবং এটি প্রথম দাবি হিসেবে স্ব-স্থানে বিভক্তি এবং অবিভক্তিকে চায় না। প্রথম **قَيْد** (**لَا يَتَوَقَّفُ تَعَقُّلُهُ**) দ্বারা বের হয়ে গেছে **إِنْفِعَال** (প্রতিক্রিয়া) ও **فِعْل** (ক্রিয়া) এবং **إِضَافَةٌ** (সম্বন্ধ) যেমন- **أَعْرَاضُ نَسَبِيَّة** তারপর আমাদের বাক্য **لَا قِسْمَةَ** দ্বারা নুকতা (**بِالنُّقْطَةِ**) এবং **وَحْدَةً** (একক, অণু) বের হয়ে গেছে। আমাদের শব্দ **أَوَّلِيًّا** বলা হয়েছে যেন তাতে **بِالْمَعْلُومَاتِ** (বিন্দু) যা বিভক্তি অথবা অবিভক্তি চায়, অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মূল লেখকের শব্দ **مَلَكَ** ইঙ্গিত করছে যে, যদি কেউ তার কাক্ষিত অর্থ শুদ্ধ-সাবলীল শব্দ দ্বারা আদায় করে তবু তাকে পরিভাষায় ফসীহ বলবে না, যে পর্যন্ত না তা তার মধ্যে বদ্ধমূল বা সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়। তার বাক্য- **يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّغْيِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ** (সে সক্ষম হবে কাক্ষিত অর্থ আদায়ে) এ কথা বলা হয়নি যে, কাক্ষিত অর্থ আদায় করবে। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিকে ফসীহ বলা হবে, যার মধ্যে সেই যোগ্যতা আছে। চাই তার মধ্যে অর্থ ব্যক্তকরণ পাওয়া যাক বা না পাওয়া যাক। তার উক্তি **بِلَفْظٍ فَصِيحٍ** (শুদ্ধ-সাবলীল কথায়) বলা হয়েছে, যাতে মুফরাদ এবং মুরাক্কাব উভয়কে शामिल করে। মুরাক্কাবের বিষয়টি তো স্পষ্ট। আর মুফরাদ বা একক শব্দও তুমি গণনা করার সময় বলে থাক বাড়ি, ক্রীতদাস, দাসী, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

উল্লিখিত বাক্যে মূল লেখক ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মুসান্নিফ (র.) তার সেই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করেছেন। মূল লেখকের সংজ্ঞা-

وَالْفَصَاحَةُ فِي الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّغْيِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِلَفْظٍ فَصِيحٍ

৫. **أَيْنَ** এ 'আরযকে বলা হয়, যা স্থান বা জায়গার মধ্যে কোনো বস্তুর বিদ্যমান হওয়াকে বুঝায়। যেমন- যায়েদ হ'র অবস্থান করে।

৬. **وَضَعَ** এ 'আরযকে বলা হয়, যা একটি অবস্থা। এটি কোনো বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় তার কতক অংশ অন্যান্য অংশের প্রতি সম্পর্কিত হওয়ার ভিত্তিতে। যেমন হেলান দিয়ে বসা বা চিৎ হয়ে শোয়া, অথবা অন্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে।

৭. **وَمَلَكَ** এ 'আরযকে বলা হয় যা কোনো বস্তুকে পূর্ণ রূপে পরিব্যাণ্ড করা হিসেবে তার উপর বিরাজ করে এবং বস্তুর স্থানান্তরের দ্বারা সেটিও স্থানান্তরিত হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তির জামা অথবা পাগড়ি পরিধান করা। এখানে জামাটি তাকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং ব্যক্তির স্থানান্তরের দ্বারা সেটিও স্থানান্তরিত হয়।

৮. **فَعَلَ** এ 'আরযকে বলা হয় যে, কোনো বস্তু অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা যতক্ষণ তা প্রভাব বিস্তার করে রাখে। যেমন, তাপ সৃষ্টিকারী কোনো বস্তু অন্যকে উত্তপ্ত করে যতক্ষণ উত্তপ্ত করার মধ্যে থাকে। যেমন- আগুন পানি উত্তপ্ত করে যতক্ষণ জ্বলে।

৯. **إِنْفَعَلَ** কোনো বস্তুর অন্য থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা, বা অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া। যেমন- পানি আগুন দ্বারা উত্তপ্ত হয় যতক্ষণ তা উত্তপ্ত থাকে।

১০. **كَيْفَ** সম্পর্কে মুসান্নিফ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার প্রতি নজর দেওয়া যাক-

الْكَيْفِيَّةُ عَرْضٌ لَا يَتَرَوَّفُ تَعَقُّلَهُ عَلَى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ وَلَا يَفْتَضِي الْقِسْمَةَ وَاللَّا قِسْمَةً فِي مَحَلِّهِ اِفْتِضَاءً أَوَّلِيًّا -

অর্থাৎ **كَيْفَ** এমন 'আরযকে বলা হয়, যার অনুধাবন অন্য কিছুই অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল নয় এবং এটি তার স্থানে প্রথম দাবি বা সত্তাগতভাবে বিভক্তি এবং অবিভক্তিকে চায় না।

মুসান্নিফের উক্ত সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে একটি **جنس** ও চারটি **فصل** আছে। তিনি **فصل-কে** **قيد** বা সীমাবদ্ধকারী বলেছেন। উল্লেখ্য যে, **عرض** থেকে সংজ্ঞা শুরু হয়েছে। আর **الكيفية** হচ্ছে **معرف** বা যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

فصل ৩: **جنس** হলো **عرض**। এটি সমস্ত 'আরযকে شامل করে।

১ম **ফসল** : **لَا يَتَرَوَّفُ تَعَقُّلَهُ عَلَى تَعَقُّلِ الْغَيْرِ** - তার এ বাক্যটি দ্বারা সংজ্ঞা থেকে **نَسْبِيَّة** সাতটি বের হয়ে গেল। অর্থাৎ **مَتْنِي**, **وَضَعَ**, **مَلَكَ**, **فَعَلَ**, **إِنْفَعَلَ**, **أَيْنَ**, **إِضَافَةٌ**।

২য় **ফসল** : **لَا يَفْتَضِي الْقِسْمَةَ** - এ 'আরযটি দ্বারা **কিফ**-এর সংজ্ঞা থেকে **كم** (যা এতক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল) বের হয়ে গেল। কেননা, **كم** স্বয়ং বিভক্তিকে গ্রহণ করে।

৩য় **ফসল** : **وَاللَّا قِسْمَةً** এ অংশটি দ্বারা সংজ্ঞা থেকে **نقطة** এবং **وحدة** বের হয়ে গেল। কেননা, এ দু'টি অবিভক্তিকে গ্রহণ করে।

৪র্থ **ফসল** : **اِفْتِضَاءً أَوَّلِيًّا** - এ অংশটি সংজ্ঞা থেকে কোনো কিছুকে বের করার জন্য সংজ্ঞার সাথে যুক্ত হয়নি; বরং এর সংযুক্তি **بِالْمَعْلُومَاتِ** **كيفية**-এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

لَا يَفْتَضِي অর্থ হলো **لذاته** বা সত্তাগতভাবে এবং অন্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত না করে। অর্থাৎ **لَا يَفْتَضِي** **وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهِ فَقَدْ يَفْتَضِي الْقِسْمَةَ** এটি সত্তাগতভাবে বিভক্তি বা অবিভক্তি চায় না। **الْقِسْمَةَ** এটি সত্তাগতভাবে বিভক্তি বা অবিভক্তি চায় না। অর্থাৎ আর তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে এটি কখনো বিভক্তিকে গ্রহণ করে, আবার কখনো অবিভক্তিকে গ্রহণ করে।

أَيْنَ বুঝার পর আমরা দেখতে পাই যে, **أَيْنَ** এমন একটি 'আরয যার অনুধাবন অন্য কিছুই অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল নয় এবং এটি বিভক্তি এবং অবিভক্তি কোনোটিতে সত্তাগতভাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু তার **معلومات**-এর প্রতি লক্ষ্য করে কখনো বিভক্তিকে গ্রহণ করে, আবার কখনো অবিভক্তিকে গ্রহণ করে। যেমন- কোনো **علم** বা জ্ঞান একক কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হলে সে **علم** বা জ্ঞান বিভক্তি গ্রহণ করবে না। কিন্তু এটি সত্তা হিসেবে নয়; বরং সংশ্লিষ্ট বস্তুর সাহায্যে। পক্ষান্তরে **علم** টি যদি দু'বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে বিভক্তিকে গ্রহণ করবে। মোটকথা, **اِفْتِضَاءً أَوَّلِيًّا**-এর দ্বারা **بِالْمَعْلُومَاتِ** **كيفية**-এর সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সত্তা যার মাধ্যমে كَيْفِيَّة অস্তিত্বশীল হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো 'আরয' তার অস্তিত্বের জন্য যে কোনো সত্তার উপর নির্ভরশীল। 'আরযের নিজস্ব বা পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই।

فَقَوْلُهُ مَلَكَ إِشْعَارٍ يَأْتُهُ كَوَعْبَر : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলতে চেয়েছেন যে, লেখক ফাসাহাতে মুতাকাল্লিমের সংজ্ঞায় مَلَكَ বা যোগ্যতা শব্দটি এনেছেন صَفَة শব্দটি আনেননি। এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত হয় যে, যদি কেউ তার কাক্ষিত কথা শুদ্ধ-সাবলীল শব্দাবলির সাহায্যে উপস্থাপন করে তাহলেই সে مُتَكَلِّمٌ فَصِيح বা বিশুদ্ধ বক্তা হয়ে যাবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে শুদ্ধ-সাবলীল কথা বলার যোগ্যতা অর্জন হবে এবং তার মধ্যে বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সারকথা হলো, যোগ্যতাই ফসীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য। যোগ্যতা ছাড়া কয়েকটি শুদ্ধ-সাবলীল কথা বললে সে ফসীহ হবে না।

وَقَوْلُهُ يَتَقَدَّرُ بِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, يَتَقَدَّرُ শব্দটি ব্যবহার করেছেন يَعْبُر শব্দটি ব্যবহার করেননি। এর দ্বারা লেখক এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে শুদ্ধ-সাবলীল কথায় মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা থাকে, তাহলে সে ফসীহ হবে। ফসীহ হওয়ার জন্য প্রকাশ করা জরুরি নয়, চাই সে প্রকাশ করুক বা না করুক। তিনি যদি يَعْبُر শব্দটি ব্যবহার করতেন তাহলে যোগ্যতা আছে এমন ব্যক্তিকে চুপ থাকা অবস্থায় ফসীহ বলা যেত না। কারণ, তখন তো ফসীহ হওয়ার জন্য প্রকাশ জরুরি হতো।

وَقَوْلُهُ يَلْفِظُ فَصِيح : এ কথার সাহায্যে মুসান্নিফ (র.) লেখকের لَفِظ শব্দটি ব্যবহার করার উপকারিতা এবং كَلَام শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন না— এর কারণ বর্ণনা করছেন।

তিনি বলছেন, লেখক كَلَام শব্দটি ব্যবহার না করে لَفِظ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এ জন্য যে, كَلَام ব্যবহার করলে কারো কারো মনে এ ধারণা জন্মাতো যে, ফসীহ হতে হলে مُتَكَلِّم বা বক্তাকে তার মনের ভাব অবশ্যই শুদ্ধ-সাবলীল বাক্য দ্বারা প্রকাশ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। অথচ এটি অসম্ভব। কেননা, বক্তার কখনো তার মনের ভাব বা উদ্দেশ্য একক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। যেমন— কোনো ব্যক্তি তার হিসাব সম্পূর্ণ করার জন্য হিসাব রক্ষকের কাছে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্যাদির গণনা করতে গিয়ে এভাবে বলবে, বাড়ি, কাপড়, দাস-দাসী, বিছানা-পত্র ইত্যাদি।

لَفِظ শব্দটি একক ও যুক্ত শব্দ এবং বাক্য সব কিছুকেই शामिल করে। অতএব, لَفِظ—এর ব্যবহার করার কারণে কারো মনে এ ধরনের অমূলক ধারণা জন্মাবে না যে, مفردات বিশুদ্ধভাবে বললে মুতাকাল্লিমে ফসীহ হতে পারবে না; বরং একক শব্দের কথকও ফসীহের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

قَوْلُهُ أَمَّا الرَّكْبُ فَظَاهِرٌ : অর্থাৎ মুরাক্কাব शामिल হওয়ার উদাহরণ এবং এর ক্ষেত্র প্রচুর। তাই এটিকে উদাহরণের সাহায্যে বুঝতে হবে না।

সার-সংক্ষেপ :

ফাসাহাতে মুতাকাল্লিম বলা হয় বক্তার এমন এক যোগ্যতাকে, যার সাহায্যে সে উদ্দেশ্য ও মনের ভাবকে বিশুদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়।

الكَلَامَ : قَوْلُهُ وَابِلَاغُهُ فِي الْكَلَامِ : এখন থেকে বালাগাতে কালামের সংজ্ঞা ও এর বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। লেখক বলেন, বালাগাতে কালাম বলা হয়—مُطَابَقَةُ الْمُقْتَضَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ অর্থাৎ কালাম حَالِ مُقْتَضَى-এর অনুযায়ী হওয়া এবং একই সাথে কালাম ফসীহ হওয়া বা ফাসাহাতযুক্ত হওয়া। এখানে مُطَابَقَةُ দ্বারা الْجُمْلَةُ উদ্দেশ্য। مطابقة -এর উদ্দেশ্য নয়। الْمُقْتَضَى অর্থ -এর একাধিক مقتضى থাকা অবস্থায় যদি কোনো একটি مقتضى -এর অনুযায়ী হয়, তাহলে الْجُمْلَةُ -এর হয়ে যাবে। যেমন—حال দু'টি জিনিস চাচ্ছে— ১. تأكيد ২. تعريف। এমতাবস্থায় কালাম যদি শুধুমাত্র তাকিদযুক্ত আনা হয়, তবেই الْجُمْلَةُ হয়ে গেল। আর যদি দু'টি বিষয় অনুযায়ী কালাম ব্যবহার হয়, তবে একে مُطَابَقَةٌ تَامَةٌ বলা হবে। مُطَابَقَةٌ تَامَةٌ হলে কালামটি বালাগাতের উচ্চ পর্যায়ে চলে যাবে। যেমন—আল্লাহ তা'আলার কালাম সব مقتضى -এর অনুযায়ী হয়ে থাকে। লেখকের সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় এসেছে, যথা— ১. حال ২. مُقْتَضَى حَال ৩. مُطَابَقَةُ مُقْتَضَى الْحَال। মুসান্নিফ (র.) এ তিনটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

حال সম্পর্কে বলেন, বক্তা তার কাক্ষিত অর্থ আদায় করতে যে বাক্য ব্যবহার করে সে বাক্যে শ্রোতার অবস্থানুপাতে যে বৈশিষ্ট্য দাবি করা হলো উক্ত দাবিকে حال বলা হয়, যেমন শ্রোতা যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়াকে অস্বীকার করেছে। শ্রোতার এ অস্বীকার বক্তাকে (যে **إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ** বলবে) উদ্বুদ্ধ করছে যেন বক্তা যায়েদ দণ্ডায়মান এ কথার সাথে তাকিদযুক্ত করে জোরালোভাবে বলে **إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ** আমরা লক্ষ্য করছি যে, শ্রোতার অস্বীকার বক্তব্যটিকে জোরালো বা তাকিদযুক্ত করার দাবি জানাচ্ছে। সুতরাং শ্রোতার অস্বীকার হলো حال। আর যে বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তাকিদযুক্ত বাক্য) তা হলো- **مُتَقَضًى حَال** হলো- **إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ** -এর পর বক্তার তাকিদযুক্ত কালাম বা বাক্য যেমন- **مُتَقَضًى حَال**। এখন থেকে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, লেখকের বাহ্যিক বক্তব্য থেকে **حَال** **مُتَقَضًى حَال** ও **مُطَابَقَةٌ مُتَقَضًى حَال**-এর উপরোক্ত সংজ্ঞাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভিন্ন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো।

حال সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তাই যা পূর্বে আলোচনা করা হলো। অর্থাৎ **حَال** বলা হয় অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের দাবি করাকে। **حَال** **مُتَقَضًى** এর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো **حَال** যে বৈশিষ্ট্য দাবি করে সেটিকে **حَال** বলা হয় না; বরং **حَال** **مُتَقَضًى** বলা হয় **حَال**-এর দাবিকৃত সেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক সামগ্রিক বাক্য **كَلَامٌ كُلِّي** কে **مُطَابِقٌ حَال** **إِنْ زَيْدًا** মুসান্নিফের বক্তব্য হলো **إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ** হলো বক্তার পক্ষ থেকে শ্রোতার সামনে পেশকৃত বাক্য অর্থাৎ **قَائِمٌ** মুসান্নিফের বক্তব্য হলো **مُطَابِقٌ حَال** বাক্যটি হচ্ছে- তাকিদযুক্ত সামগ্রিক বাক্যের একটি **جزئي** যা কালামে কুল্লী বা তাকিদযুক্ত সামগ্রিক বাক্যের **مُطَابِقٌ** হয়েছে। আর কালামে কুল্লী হলো **مُطَابِقٌ** তথা **بَاء**-এর উপর যবর দিয়ে। এ কথায় মুসান্নিফের গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ দাবি করে **حَال**-এর চাহিদা অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যযুক্ত সামগ্রিক বাক্য **حَال** **مُتَقَضًى** আর বক্তার শ্রোতার সামনে পেশকৃত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বাক্য যেমন- **مُطَابِقٌ مُتَقَضًى حَال** **إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ**।

মুসান্নিফের এ বিশ্লেষণে বুঝা যায় যে, **جزئي** মোতাবেক হবে **كُلِّي**-এর। অর্থাৎ **كُلِّي** হলো **مُطَابِقٌ** (اسم مفعول) আর **كُلِّي** তার **كُلِّي** (اسم فاعل) কিন্তু তার এ ব্যাখ্যাটি মানতিক বা তর্কশাস্ত্রের বিপরীত। কারণ, তাদের মতে **كُلِّي** তার **جزئي**-এর **مُطَابِقٌ** হয়। অর্থাৎ **كُلِّي** টি তার **جزئي**-এর উপর প্রয়োগ হয়। অতএব, এখানে এ প্রশ্নটি এসে যায় যে, মুসান্নিফ (র.) মানতিক বা তর্কশাস্ত্র-এর নীতি বিরুদ্ধ কাজ কেন করলেন? এর জবাব হলো, মুসান্নিফ (র.) তর্কশাস্ত্রের সাথে জাহেরী দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়েছেন। কেননা, লেখকের বক্তব্য হলো **مُطَابِقَةٌ لِمُتَقَضًى الْحَالِ**। এ বাক্যের **مُطَابِقَةٌ** অংশে মাসদারকে তার ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে। সুতরাং এটি **مُطَابِقٌ** (ইসমে ফায়েল)। আর **حَال** **مُتَقَضًى** যাকে মুসান্নিফ কালামে কুল্লী বলেছেন সেটিই **مُطَابِقٌ** (ইসমে মাফউল)। অতএব, **كَلَامٌ جَزْئِي** উদাহরণ স্বরূপ **إِنْ زَيْدًا فِي الدَّارِ** (তথা ইসমে ফায়েল) আর **حَال** **مُتَقَضًى** তথা কালামে কুল্লীকে **مُطَابِقٌ** তথা ইসমে মাফউল বানিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন- **هَذَا أَيْ إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ مُطَابِقٌ لَهُ أَيْ لِلْكَلَامِ الْكُلِّي الْمَوْكَّدِ** -সবশেষে তিনি বলেন, আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ জানার জন্য অনুসন্ধানী জ্ঞানপিপাসুরা মুতাওয়াল অধ্যয়ন করতে পারেন।

সার-সংক্ষেপ :

ক. বালগাতে কালাম বা **كَلَامٌ بَلِيغٌ** বলা হয় এমন বাক্যকে যা বাক্য **حَال** **مُتَقَضًى** হওয়ার সাথে সাথে (স্থান-কাল ও পাত্র) অনুযায়ী হয়।

খ. **حَال** বলা হয় এমন বিষয়কে, যা বাক্যের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করার দাবি করে।

গ. যে বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করার দাবি করা হয় তাকে **مُتَقَضًى** বলা হয়। যেমন শ্রোতা কর্তৃক সংবাদ অস্বীকার যা তাকিদযুক্ত বাক্য চায় তা হচ্ছে **حَال**, আর তাকিদযুক্ত বাক্য হচ্ছে **حَال**-এর **مُتَقَضًى**।

ঘ. মুসান্নিফ (র.)-এর ব্যাখ্যানুযায়ী বৈশিষ্ট্যযুক্ত **كَلَامٌ كُلِّي** (সামগ্রিক বাক্য) হচ্ছে **مُتَقَضًى الْحَال** আর বক্তা কর্তৃক শ্রোতার সামনে পেশকৃত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বাক্য (যেমন- **إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ**) হচ্ছে **مُطَابِقٌ مُتَقَضًى الْحَال**।

وَهُوَ آتَى مُفْتَضًى الْحَالِ مُخْتَلِفٌ فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَةٌ لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ اللَّاتِقَ
بِهَذَا الْمَقَامِ يُغَايِرُ الْإِعْتِبَارَ اللَّاتِقَ بِذَلِكَ وَهَذَا عَيْنُ تَفَاوُتِ مُفْتَضِّيَاتِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ
التَّغَايُرَ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ إِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْإِعْتِبَارِ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَوَهَّمُ فِي الْحَالِ كَوْنُهُ
زَمَانًا لِيُورُودَ الْكَلَامُ فِيهِ وَفِي الْمَقَامِ كَوْنُهُ مَحَلًّا لَهُ وَفِي هَذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِنْجَمَالِيَّةٌ إِلَى
ضَبْطِ مُفْتَضِّيَاتِ الْأَحْوَالِ وَتَحْقِيقِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ -

অনুবাদ : আর এটি অর্থাৎ মুকতায়াকে হাল বিভিন্ন ধরনের । কেননা, বাক্যের অবস্থানসমূহ পার্থক্যপূর্ণ । কেননা, যে বিষয়টি এ অবস্থার জন্য উপযোগী তা ঐ অবস্থার জন্য উপযোগী বিষয়ের বিপরীত হবে । এটিই বিভিন্ন মুকতায়াকে হালের পার্থক্য । কেননা, হাল এবং মাকামের পার্থক্য এ'তেবারী বিষয় । আর তা হচ্ছে, মনে করা হয় হাল হলো কালাম (বাক্য) বলার একটি সময়, আর মাকাম হলো বাক্য বলার স্থান । (সামনের) এই বাক্যে হালের বিভিন্ন মুকতায়ার সীমাবদ্ধতার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত রয়েছে এবং রয়েছে মুকতায়াকে হালের বিশ্লেষণ ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ آتَى مُفْتَضًى الْحَالِ الخ : উল্লিখিত ইবারতের পর মুসান্নিফ (র.) হালের মুকতায়গুলো তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ এবং মুকতায়াকে হালের বিশ্লেষণ করবেন । উল্লিখিত ইবারতে সেই আলোচনারই একটি ভূমিকা পেশ করা হচ্ছে । তিনি বলছেন, হালের মুকতায় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে । এর দলিল বা প্রমাণ কালামের স্থানসমূহ অর্থাৎ ঐ সকল বিষয় যা বাক্যের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং ইঙ্গিত বহনের দাবি করে বা বিভিন্ন ধরনের এবং পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ । আর কালামের স্থানসমূহ বিভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে, একটি বৈশিষ্ট্য একটি স্থানের উপযোগী হলো- তো অন্য একটি স্থানের জন্য তা উপযোগী নয়; বরং অন্য স্থানটির জন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে হয় । যেমন- শ্রোতার অস্বীকারের ক্ষেত্রে তাকীদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা উচিত । আবার শ্রোতার এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা অবস্থায় তাকিদ ছাড়া বাক্য ব্যবহার করা উচিত । আর এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাকিদ যা শ্রোতার অস্বীকারের বেলায় প্রযোজ্য, সেটি শ্রোতার সাধারণ অবস্থায় ব্যবহার করা অনুচিত । অতএব, **مُفْتَضًى حَال** তথা তাকিদযুক্ত বাক্য এবং তাকিদ ছাড়া বাক্য পরস্পর যেমন বিপরীত তেমনি অস্বীকার এবং সাধারণ অবস্থার মাকাম পরস্পর বিপরীত ।

মোটকথা, কালামের মাকাম বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যা পরস্পর পার্থক্যপূর্ণ । যেমন- শ্রোতার অস্বীকার ও শ্রোতার সাধারণ অবস্থা । আর একথা সকলের জানা যে, **حَال** এবং **مَقَام** সত্তাগতভাবে একই । তাদের মধ্যে অন্য হিসেবে সামান্য পার্থক্য রয়েছে ।

তাহলে ফলাফল এই দাঁড়াচ্ছে যে, কালামের মাকাম যেমন বিভিন্ন ধরনের তেমনি মুকতায়াকে হালও বিভিন্ন ধরনের ।

হাল ও মাকামের পার্থক্য : হাল এবং মাকাম বা অবস্থান বলা হয় ঐ বিষয়কে যার দাবি হলো- বক্তা যেন তার কথায় উদ্দেশ্যের সাথে অতিরিক্ত একটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, কিন্তু এ দু'টির মাঝে পার্থক্য হলো এই যে, এ বিষয়টিকে যদি বক্তার কথার কাল ধরা হয় তাহলে একে **حَال** বলা হয় । আর যদি বিষয়টিকে বক্তার কথার ক্ষেত্র ধরা হয়, তাহলে একে মাকাম বলা হয় । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি বক্তার কথার কালও নয়, আবার স্থানও নয়; বরং এটা এক ধরনের ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়েছে । তাই হাল ও মাকাম পরস্পর একই সংজ্ঞার অধীন একই জিনিস যা দু' নামে ব্যবহৃত হয়েছে, এ কারণেই **يَتَوَهَّم** বলা হয়েছে । এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, লেখক সামনের বাক্যগুলোতে মুকতায়াকে হাল যে তিন প্রকারে সীমাবদ্ধ এর আলোচনা এবং মুকতায়াকে হালের বিশ্লেষণ করেছেন ।

সার-সংক্ষেপ : ক. বাক্যসমূহের **مُفْتَضًى حَال** বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । কারণ, বাক্য বা কথা উপস্থাপন করার স্থান-কাল ও পাত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে ।

খ. **حَال** ও **مَقَام** শব্দদ্বয়ের মর্মার্থ একই । তবে এ দু'য়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করা যেতে পারে যে, কথা বলার কালকে **حَال** আর কথা বলার স্থানকে **مَقَام** বলা হয় ।

فَمَقَامٌ كُلٌّ مِّنَ التَّنْكِيرِ وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالذِّكْرِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ أَى خِلَافِ كُلِّ مِنْهَا يَعْنِي أَنَّ الْمَقَامَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ تَنْكِيرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ الْمُسْنَدِ يُبَيِّنُ الْمَقَامَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ التَّعْرِيفُ وَمَقَامُ إِطْلَاقِ الْحُكْمِ أَوْ التَّعْلُقِ أَوْ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ الْمُسْنَدِ أَوْ مُتَعَلِّقِهِ يُبَيِّنُ مَقَامَ تَقْيِيدِهِ بِمُؤَكِّدٍ أَوْ آدَاءٍ قَصْرِ أَوْ تَابِعٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ مَفْعُولٍ أَوْ مَا يَشَبَّهُ ذَلِكَ وَمَقَامُ تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ الْمُسْنَدِ أَوْ مُتَعَلِّقَاتِهِ يُبَيِّنُ مَقَامَ تَاخِيرِهِ وَكَذَا مَقَامُ ذِكْرِهِ يُبَيِّنُ مَقَامَ حَذْفِهِ فَقَوْلُهُ خِلَافِهِ شَامِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ -

অনুবাদ : নাকেরা (অনির্দিষ্টতা), ইতলাক (সাধারণ হুকুম বা কয়েদহীনতা), তাকদীম (যথাস্থানের আগের ব্যবহার) এবং যিকর (উল্লেখ করা) প্রত্যেকটি তার বিপরীত বিষয়ের মাকামের সাথে পার্থক্যপূর্ণ হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি তার বিপরীতের সাথে পার্থক্যপূর্ণ। তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন, যে স্থানটির জন্য মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য) অথবা মুসনাদ (বিধেয়) অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক হওয়া সমীচীন। সেটি বিপরীত হবে ঐ স্থানের যেখানে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য) নির্দিষ্টজ্ঞাপক হওয়া সমীচীন। এমনিভাবে হুকুম অথবা তা'আলুক (সম্পর্ক) অথবা মুসনাদ ইলাইহ অথবা মুসনাদ অথবা মুসনাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, মুতলাক (সাধারণ ফিদ বিহীন) হওয়া ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে এগুলো ফিদ যুক্ত হবে তাকীদকারী দ্বারা, অথবা কসরের অক্ষর দ্বারা, অথবা তাবে' দ্বারা, অথবা শর্ত দ্বারা কিংবা মাফউল দ্বারা বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা, আর (এমনিভাবে) মুসনাদ ইলাইহ অথবা মুসনাদ নতুবা মুসনাদের মুতা'আলিক যথাস্থানের আগে আসা ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে এগুলো পরে আসে এবং তেমনি উল্লেখ থাকা উহ্য থাকার বিপরীত। তার শব্দ خلافে এ সবকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

فَمَقَامٌ كُلٌّ مِّنَ التَّنْكِيرِ الخ : আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি, 'মুখতাসায়ে হাল' তিন প্রকার ডَكْر এবং اِطْلَاق, تَنْكِير, تَقْدِيم, তাকদীম বলে লেখক এখানে প্রথম প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, তَقْدِيم, তাকদীম এদের প্রত্যেকটির মাকাম প্রত্যেকটির বিপরীত বিষয়ের মাকামের খেলাফ। এ কথার বিশ্লেষণ এরূপ যে, উদাহরণ স্বরূপ যে স্থানে মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য)-কে অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক ব্যবহার করা সমীচীন। যথা-جَاءَ رَجُلٌ فِي الدَّارِ قَائِمٌ অথবা رَجُلٌ جَاءَ خَالِدٌ অথবা خَالِدٌ عَائِلٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টজ্ঞাপক আনা সমীচীন। যথা-جَاءَ خَالِدٌ فَاضِلٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদকে নির্দিষ্ট আনা সমীচীন। যেমন-يُضْرَبُ الْهَنَاءُ এমনিভাবে যেখানে হুকুম (বিষয়) মুতলাক অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে বিষয়টি মুতলাক নয়; বরং কোনো তাকিদ দ্বারা ফিদ যুক্ত। যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ قَائِمٌ অথবা কসরের শব্দ দ্বারা ফিদ যুক্ত। যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ قَائِمٌ

এমনিভাবে যে স্থানটিতে মুসনাদ অনির্দিষ্টজ্ঞাপক আনা সমীচীন। যেমন-يُضْرَبُ الْهَنَاءُ এমনিভাবে যেখানে হুকুম (বিষয়) মুতলাক অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ قَائِمٌ এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে বিষয়টি মুতলাক নয়; বরং কোনো তাকিদ দ্বারা ফিদ যুক্ত। যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ قَائِمٌ অথবা কসরের শব্দ দ্বারা ফিদ যুক্ত। যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ قَائِمٌ

প্রকাশ থাকে যে, হুকুম বলা হয় ঐ বিষয়কে যা মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ-এর মধ্য থেকে পাওয়া যায়। আর এ হুকুমের কারণেই মুসনাদ (বিধেয়) مَحْكُومٌ بِهِ ও তার উদ্দেশ্য مَحْكُومٌ عَلَيْهِ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এমনিভাবে যেখানে মুসনাদের تَعْلُق অর্থাৎ মুসনাদের مَفْعُول-এর সাথে মুসনাদের সম্পর্ক মুতলাক (সাধারণ) সেটি ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে তা কোনো ফিদ যুক্ত আছে। যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ অথবা ضَرْبٌ বা মুসনাদের সাথে তার مَعْمُول (যিদ্দা)-এর সম্পর্ক সাধারণ, এতে কোনো ফিদ নেই। আবার لَاضْرِبُ زَيْدٌ এখানে মুসনাদ ضَرْب-এর সাথে তার مَعْمُول (যিদ্দা)-এর সম্পর্ক তাকিদের দ্বারা ফিদ যুক্ত। অথবা সেটি কসরের শব্দ দ্বারা ফিদ যুক্ত, যেমন-يُضْرَبُ زَيْدٌ

এমনিভাবে যেখানে মুসনাদ ইলাইহ **تابع** (যথা- তাকিদ, সিফাত, বদল ইত্যাদি) থেকে মুক্ত সেটি ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে **تابع** আছে। যেমন- ১. **زَيْدٌ قَانِمٌ** ২. **زَيْدٌ قَانِمٌ** হুবহু এ বিষয়টি মুসনাদের দ্বারাও হতে পারে। অর্থাৎ যেখানে বিধেয়ের মুতাআল্লিক **تابع** থেকে মুক্ত। যেমন- **زَيْدٌ ضَارِبٌ رَجُلًا** এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে বিধেয়ের মুতাআল্লিক **تابع** দ্বারা যুক্ত। যেমন- **زَيْدٌ ضَارِبٌ رَجُلًا طَوِيلًا** এ স্থানে একটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার যে, তাকিদকারী, কসরের শব্দসমূহ, তাব'েসমূহ, শর্ত, মাফউল, হাল এবং তামস্বয় প্রত্যেকটি দ্বারা হুকুম তা'আল্লুক, মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতাআল্লিককে **قيد** যুক্ত করা যায় না; বরং বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবি রাখে,

এক. তাকিদকারী এবং কসরের শব্দ দ্বারা দু'টি বিষয়কে **قيد** যুক্ত করা যায়- ক. **حكم** বা বিষয়, খ. তা'আল্লুক।

দুই. **تابع** (অনুবর্তী ও অনুগামী)-এর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতা'আল্লিক (যথা- মাফউল ইত্যাদি) **قيد** যুক্ত করা হয়।

তিন. **شرط** দ্বারা কেবল মুসনাদকে কয়েদযুক্ত করা হয়। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ সবগুলো সব বিষয় দ্বারা **قيد** যুক্ত হতে পারে না। **شرط**-এর ব্যাপারে ব্যাখ্যা হলো, যেখানে মুসনাদকে শর্ত থেকে মুক্ত রাখা (মুতলাক রাখা) হয়, যেমন- **خَالِدٌ قَانِمٌ إِنْ قَامَ عَمْرُو** এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদকে শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়। যেমন- **خَالِدٌ قَانِمٌ إِنْ قَامَ عَمْرُو**

চার. মাফউল দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতা'আল্লিককে কয়েদযুক্ত করা হয়। অতএব, যেখানে এ তিনটি বিষয় মাফউলের দ্বারা কয়েদযুক্ত নয়, তা ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে তা মাফউল দ্বারা কয়েদযুক্ত।

উদাহরণ : ১. **زَيْدٌ ضَارِبٌ** ২. **زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرُو** দ্বিতীয় উদাহরণে মাফউল দ্বারা মুসনাদকে **قيد** যুক্ত করা হয়েছে, প্রথম উদাহরণে তা নেই।

قَوْلُهُ وَمَا يَشْبَهُ ذَلِكَ : অর্থ- এ জাতীয় আরো যা আছে, এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) **حال** এবং **تمييز**-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উল্লেখ্য যে, কেবল মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদের বিশেষ মুতা'আল্লিক অর্থাৎ মাফউলকে **حال** এবং **تمييز** দ্বারা কয়েদযুক্ত করা যায়। অতএব, যেখানে **حال** এবং **تمييز** দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ কয়েদযুক্ত নেই, যেমন- **طَابَ** এবং **ذَهَبَ زَيْدٌ** এবং **طَابَ** এবং **ذَهَبَ زَيْدٌ رَاكِبًا** এটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে **حال** এবং **تمييز** দ্বারা কয়েদযুক্ত করা হয়েছে। যেমন- **بَعْتُ** এবং **إِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ** এবং **رَايْتُ نَفْسًا**। এমনিভাবে যেখানে মাফউল **حال** ও **تمييز** দ্বারা কয়েদযুক্ত হয়নি, যেমন- **عِشْرِينَ** (আমি ঘোড়া ক্রয় করেছি এবং বিক্রয় করেছি বিশটি।) এ দু'টি ঐ দু'স্থানের বিপরীত, যেখানে কয়েদযুক্ত করা হয়েছে। যেমন- **إِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ مُسَرَّجًا وَبَعْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا**

পাঠক অবশ্য উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝতে পারছেন যে, সবকিছু দ্বারা সবকিছুকে কয়েদ করা যায় না। বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা সকলেই তা বুঝতে পারছেন। বিস্তারিত আলোচনা না করলে হয়তো তা বুঝা যেতো না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেস্থানে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা সমীচীন, যেমন- **رَايْتُ جَاهِلٌ** সেটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে মুসনাদ ইলাইহকে পরে আনা সমীচীন, যেমন- **فِي الدَّارِ رَايْتُ** এমনিভাবে যেখানে মুসনাদকে আগে আনা সমীচীন, যেমন- **قَامَ** তা ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে তাকে পরে আনা সমীচীন, যেমন- **زَيْدٌ قَانِمٌ**। এমনিভাবে মুসনাদের মুতাআল্লিককে যেস্থানে আগে আনা সমীচীন, যেমন- **زَيْدًا ضَرَبْتُ** সেটি ঐ স্থানের বিপরীত, যেখানে তা পরে আনা সমীচীন, যেমন- **زَيْدًا** তারপর মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেখানে মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ এবং মুসনাদের মুতা'আল্লিককে উল্লেখ করা সমীচীন, তা ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে সেটিকে উল্লেখ না করা সমীচীন। মূল লেখকের শব্দ **خلاف** প্রত্যেকটির বিপরীত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নাকেরার বিপরীত মা'রেফা (নির্দিষ্টজ্ঞাপক) মুতলাকের বিপরীত **تفديد** আর **تقديم**-এর বিপরীত **تاخير** (পরে আনা) এবং উল্লেখ করার বিপরীত হলো **উহ** রাখা ইত্যাদি।

وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْفَضْلِ يُبَيِّنُ مَقَامَ الْوَصْلِ تَنْبِيْهَا عَلَى عَظَمِ شَأْنِ هَذَا
الْبَابِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ وَأَظْهَرُ لِأَنَّ خِلَافَ الْفَضْلِ إِنَّمَا هُوَ الْوَصْلُ
وَلِلتَّنْبِيْهِ عَلَى عَظَمِ الشَّأْنِ فَصَّلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْإِنْجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ أَيْ الْإِطْنَابِ
وَالْمُسَاوَاةِ وَكَذَا خِطَابُ الذِّكْرِ مَعَ خِطَابِ الْغَيْبِ فَإِنَّ مَقَامَ الْأَوَّلِ يُبَيِّنُ مَقَامَ الثَّانِي فَإِنَّ
الذِّكْرَ يُنَاسِبُهُ مِنَ الْإِعْتِبَارَاتِ اللَّطِيفَةِ وَالْمَعَارِي الدَّقِيقَةِ الْخَفِيَّةِ مَا لَا يُنَاسِبُ
الْغَيْبَ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا أَيْ مَعَ كَلِمَةٍ أُخْرَى مُصَاحِبَةٍ لَهَا مَقَامٌ لَيْسَ لِتِلْكَ
الْكَلِمَةِ مَعَ مَا يُشَارِكُ تِلْكَ الصَّاحِبَةَ فِي أَصْلِ الْمَعْنَى مَثَلًا الْفِعْلُ الَّذِي قُصِدَ
إِقْتِرَانُهُ بِالشَّرْطِ فَلَهُ مَعَ إِنْ مَقَامٌ لَيْسَ لَهُ مَعَ إِذَا وَكَذَا لِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ مَعَ
الْمَاضِي مَقَامٌ لَيْسَ لَهُ مَعَ الْمُضَارِعِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ -

অনুবাদ : মুসান্নিফ তাঁর বাক্য وَمَقَامُ الْفَضْلِ يُبَيِّنُ مَقَامَ الْوَصْلِ (এবং পৃথক-বিচ্ছিন্ন স্থান মিলিত স্থানের বিপরীত) টিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন, এ পরিচ্ছেদের বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। আর (এখানে) مَقَامُ خِلَافِهِ এ কথাটি বলেননি (যেমন পূর্বে বলেছিলেন)। কেননা, এর বিপরীত বিষয়টি খুব সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টতর। কারণ, فصل-এর বিপরীত وصل। তদ্রূপ বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে তার বাক্য وَمَقَامُ الْإِنْجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ أَيْ الْإِطْنَابِ وَالْمُسَاوَاةِ (এবং বাক্যের সংক্ষেপণের বিষয়টি তার বিপরীত বিষয় তথা ইতনাব-বাক্যের দীর্ঘতা এবং মুসাওয়াত-ভাবের সমমাত্রিকতা-এর সাথে বৈপরীত্য রাখে। এমনভাবে মেধাবীর প্রতি সম্বোধন নির্বোধের প্রতি সম্বোধনের বিপরীত। নিশ্চয়ই প্রথমটির অবস্থা দ্বিতীয়টির অবস্থার বিপরীত। কেননা, মেধাবীকে বিশেষ সূক্ষ্ম বিষয় এবং তথ্যপূর্ণ-রহস্যপূর্ণ বিষয় সহকারে সম্বোধন করা হয়, যা নির্বোধের জন্য সমীচীন নয়। প্রত্যেকটি শব্দ তার সাথে বিশেষভাবে মিলিত শব্দের যে অবস্থা, তা ঐ শব্দের সমার্থক শব্দ আরেক শব্দের সাথে সম্মিলিত অবস্থা থেকে ভিন্ন, উদাহরণ স্বরূপ যে ফে'লটিকে শর্তের সাথে মিলানোর ইচ্ছা করা হয়েছে সেটির إِنْ-এর সাথে অবস্থা إِنْ-এর সাথে অবস্থার অমিল, এমনভাবে শর্তের শব্দগুলোর ফে'লে মাযী (অতীতকাল)-এর সাথে অবস্থা মুযারের সাথে ঐ শর্তের শব্দগুলোর অবস্থা সেরূপ নয়, এর উপর অন্যান্যগুলোকে কiyাস করে নিন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلَهُ وَمَقَامُ الْفَضْلِ : এখান থেকে মূল লেখক মুকতায়াকে হালের দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার হলো মুকতায়াকে হাল, যখন দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখা অবস্থায় মুকতায়াকে হাল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মূল লেখক বলেছেন, যে স্থানটিতে ফসল অর্থাৎ একটি বাক্যকে আরেকটি বাক্যের সাথে আত্ফ বা সংযুক্ত না করে ব্যবহার করা হয়, তা ঐ স্থানের বিপরীত যেখানে দু'টি বাক্যের মধ্যে আত্ফ করা হয়।

এখানে মুসান্নিফ প্রথমে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক **فصل**-কে তার পূর্বের আলোচনার সাথে কেন যুক্ত করলেন না, তিনি যদি এভাবে বলে দিতেন—**فَمَقَامُ كُلِّ مِنَ التَّنْكِيرِ وَالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْدِيمِ وَالذِّكْرِ وَالْفَصْلِ** তাহলেই তো চলত; কিন্তু তা না করে তিনি **فَمَقَامُ الْفَصْلِ** বলে পৃথকভাবে বিষয়টি কেন উল্লেখ করলেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, **أَرَأَيْتَ تَنْبِيْهَا عَلَى عَظَمِ شَأْنِ هَذَا الْبَابِ**, অর্থাৎ লেখক **فصل** এবং **وصل**-এর আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন **وصل** এবং **فصل**-এর অধ্যায় বালাগাতের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে।

قَوْلُهُ وَائِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ : এ বাক্য দ্বারাও মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো—লেখক পূর্বের অনুসরণ করত **فَمَقَامَ خِلَافِهِ** বললেই তো পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে **فَمَقَامُ الْوَصْلِ** কেন বললেন এবং পূর্বের রীতি কেন বর্জন করলেন? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যে কোনো বিষয়কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে নিয়ম, কিন্তু পূর্বের আলোচনাতে তিনি **فَمَقَامَ خِلَافِهِ** বলে সে রীতি ভঙ্গ করেছেন তার বাক্য দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে এ ভয়ে এবং সংক্ষেপে বক্তব্য প্রদানের উদ্দেশ্যে (তা করেছিলেন)। কিন্তু **فَمَقَامُ الْوَصْلِ**-এর চেয়ে **فَمَقَامُ الْوَصْلِ**-এর মধ্যে সংক্ষেপণ বেশি দু'ভাবে— ১. **خلافه**-এর মধ্যে দু'টি শব্দ **مضاف اليه** এবং **مضاف اليه** ২. **خلافه**-এর মধ্যে অক্ষর পাঁচটি। পক্ষান্তরে **الوصل**-এর মধ্যে শব্দ একটি এবং **وصل**-কে বাদ দিলে এতে অক্ষর হয় চারটি। কারণ, **وصل** পড়ার মধ্যে আসে না। দ্বিতীয়ত মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, **فَمَقَامُ الْوَصْلِ**-এর চেয়ে **فَمَقَامُ الْوَصْلِ**-এর মধ্যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়েছে বেশি, কেননা **خلافه** বললে তো **وصل** ছাড়া অন্য কিছুই ভাবনা আসে; কিন্তু **فَمَقَامُ الْوَصْلِ** বলা হলে বুঝা যায় **فصل**-এর বিপরীত কেবল **وصل**-ই রয়েছে অন্য কিছু নেই এবং বাস্তবতাও তাই অর্থাৎ **فصل**-এর বিপরীত কেবল **وصل**-ই।

قَوْلُهُ وَلِلتَّنْبِيْهِ عَلَى عَظَمِ الشَّأْنِ : এখান থেকে মুকতায়্যে হালের তৃতীয় প্রকারের আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃতীয় প্রকার হলো যা এক বাক্যের কোনো অংশের সাথে খাস নয় এবং দু'টি বাক্যের সাথেও খাস নয়; বরং উভয়ের সাথেই সম্পর্ক রাখে। তৃতীয় প্রকারের আলোচনা লেখক এভাবে শুরু করেছেন—**فَمَقَامُ الْإِنْجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ** মুসান্নিফ (ব্যাক্যাকার) **لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى عَظَمِ شَأْنِ** বলে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, **وصل** এবং **فصل**-এর মতো লেখক পৃথকভাবে **إِنْجَازٍ وَاطْنَابٍ**-এর আলোচনা কেন করলেন? উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূলত দু'টি কারণে এর আলোচনা পৃথকভাবে করা হয়েছে— ১. প্রথমত এ অধ্যায়ের আলোচনা যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এর আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন, ২. ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, এটি মুকতায়্যে হালের তৃতীয় প্রকার। আর একটি ভিন্ন প্রকারকে পৃথকভাবে আলোচনা করাই সমীচীন। তাই তিনি এর আলোচনা পৃথকভাবে করেছেন। এখানে যে আলোচনাটি করা হয়েছে তার বিবরণ মূলত এরূপ— বাক্য সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে— ভাবের চেয়ে বাক্যের দীর্ঘতা বেশি, ভাবের সমমাত্রিক বাক্য ও সংক্ষিপ্ত বাক্য। ১. (اطناب) তথা ভাবের চেয়ে বাক্যের দীর্ঘতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন বাক্যের মধ্যে মূল বক্তব্যের চেয়ে অতিরিক্ত কথা থাকে। তবে অতিরিক্ত কথার দ্বারা উপকার পাওয়া যায়, অতিরিক্ত কথা অনর্থক নয়। ২. (مساراة) ভাব ও বাক্যের সমমাত্রিকতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন প্রয়োজনের চেয়ে কমও না হয়, আবার বেশিও না হয়; বরং প্রয়োজন অনুপাতেই শব্দাবলি থাকে।

(إيجاز) তথা বক্তব্যের চেয়ে বাক্যের হ্রস্বতা তখন সাব্যস্ত হয়, যখন কোনো বাক্যের বক্তব্য বুঝাতে প্রয়োজনের চেয়ে কম শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ তিন প্রকারের অবস্থা পরস্পর ভিন্ন, একটির সাথে অপরটির সামঞ্জস্য নেই। তাই লেখক বলেছেন,

قَوْلُهُ وَمَقَامُ الْإِنْجَازِ يُبَيِّنُ مَقَامَ خِلَافِهِ : অর্থাৎ বাক্যের সংক্ষেপণের বিষয়টি তার বিপরীত তথা ইতনাব (বক্তব্যের চেয়ে বাক্যের দীর্ঘতা) এবং **مسارات** (ভাব ও বাক্যের সমমাত্রিকতা)-এর মাকামের সাথে ভিন্নতা বজায় রাখে। এরপর তিনি বলেছেন, এমনভাবে মেধাবীর প্রতি সন্মোদন এবং নির্বোধের প্রতি সন্মোদন-এর পরস্পরের অবস্থা ভিন্ন, কেননা, প্রথমটি (অর্থাৎ মেধাবীর প্রতি সন্মোদন)-এর মাকাম দ্বিতীয়টির (অর্থাৎ নির্বোধের প্রতি সন্মোদন) মাকামের বিপরীত। কেননা, মেধাবীর জন্য সূক্ষ্ম বিষয়াদি, রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতবহ কথা বলা উচিত; কিন্তু নির্বোধের ক্ষেত্রে এসব বিষয় বলা অনর্থক এবং বোকামি।

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَهَا صَاحِبَتُهَا : এখান থেকে লেখক আরেকটি বিষয়ের মাধ্যমে মুকতাযায়ে হাল-এর বিভিন্ন অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একটি শব্দ তার সাথে আসা, অপর একটি শব্দের দ্বারা যে অবস্থা সৃষ্টি হয় সেই শব্দের সাথে আগের শব্দের সমার্থবোধক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি শব্দ মিললে তার অবস্থা ভিন্ন হবে। যেমন- فعل একটি কালিমা। এর সাথে إن (حرف شرط)-এর যে মাকাম (شرطية) اذا-এর সাথে তার মাকাম ভিন্ন। এখানে আমরা দেখছি যে, ان ও اذا যদিও উভয়টি شرط-এর অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু তার পরেও দু'টির দু'অবস্থা। কেননা, ان (حرف شرط)-এর অনিশ্চিত-এর অর্থ দেয় আর اذا নিশ্চয়তার অর্থ প্রদান করে, তাই ان-এর অবস্থান اذا-এর অবস্থানের চেয়ে ভিন্নই হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, শর্তের অক্ষরগুলোকে মাযী (অতীত কালের ফে'ল)-এর সাথে মিলালে যে অর্থ পাওয়া যায়, মুযারের সাথে সে অর্থ থাকবে না। তাই মাযীর সাথে মাকাম মুযার-এর সাথে মাকাম থেকে ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই মাযী এবং মুযারে-এর মধ্যে কাল পাওয়া যাওয়া এবং নতুন অর্থ প্রকাশ পাওয়ার দিক থেকে সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু এদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায় এভাবে যে মাযী অতীতকালে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়, আর মুযারে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়াকে বুঝায়। অতএব, শর্তের শব্দ বা অক্ষর এ দু'টির সাথে মিলিত হওয়ার পর এ দু'টির অবস্থা ভিন্ন হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ : মুসান্নিফ বলেন, এর উপর অন্যান্য শব্দ বা অক্ষরকে কিয়াস করে নাও। যেমন-استفهام-এর দু'টি অক্ষর هـ و هـمزة এবং هل; কিন্তু এ দু'টি কোনো কালিমার সাথে মিলে আসলে দু'টির অবস্থা বা মাকাম ভিন্ন হবে, যদিও استفهام বা প্রশ্ন করার দিক থেকে উভয়ের অর্থ একই।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুকতাযায়ে হাল তিন ধরনের। একটি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, এ প্রকারে تَنْكِير , تَعْرِيف , تَقْيِيد , إِطْلَاق -এর মত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। অপর দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, এ প্রকারে تَقْيِيد , تَعْرِيف , تَنْكِير -এর মত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। অতএব, মুকতাযায়ে হাল তিন ধরনের। একটি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, এ প্রকারে تَنْكِير , تَعْرِيف , تَقْيِيد , إِطْلَاق -এর মত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। অপর দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত, এ প্রকারে تَقْيِيد , تَعْرِيف , تَنْكِير -এর মত ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়।

খ. মুকতাযায়ে হাল দু'টি বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হলে দু'টি বাক্যের মাঝে আত্মকরণ বা না করার কারণে মَقْتَضَى ভিন্ন হবে।

إِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلْإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَإِنْ حِطَّاطُهُ
 أَىْ إِنْ حِطَّاطُ شَأْنِهِ بِعَدَمِهَا أَىْ بِعَدَمِ مُطَابَقَتِهِ لِلْإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَالْمُرَادُ بِالْإِعْتِبَارِ
 الْمُنَاسِبِ الْأَمْرُ الَّذِى إِعْتَبَرَهُ الْمُتَكَلِّمُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ بِحَسَبِ السَّلِيلَةِ أَوْ بِحَسَبِ
 تَتَبُّعِ تَرَكَيبِ الْبُلْغَاءِ يُقَالُ إِعْتَبَرْتُ الشَّيْءَ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَرَاعَيْتُ حَالَهُ وَارَادَ بِالْكَلَامِ
 الْكَلَامُ الْفَصِيحَ وَبِالْحُسْنِ الْحُسْنُ الدَّائِي الدَّاخلُ فِي الْبَلَاغَةِ دُونَ الْعَرْضِيِّ الْخَارِجِ
 لِحُصُولِهِ بِالْمُحَسَّنَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ -

অনুবাদ : কালামের সৌন্দর্য এবং গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়া নির্ভর করে
 إِعْتِبَارِ মোতাবেক হওয়ার উপর এবং কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব হ্রাস পায় এটি না হওয়া অর্থাৎ إِعْتِبَارِ
 إِعْتِبَارِ-এর মোতাবেক না হওয়ার দ্বারা। إِعْتِبَارِ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ বিষয় যাকে বক্তা মাকাম
 (পরিবেশ-পরিস্থিতি)-এর জন্য উপযুক্ত মনে করেন- তার প্রতিভা বলে অথবা বালাগাত শাস্ত্রবিদদের রচনাবলি
 গভীর অধ্যয়নের সাহায্যে إِعْتِبَارِ শব্দের ব্যবহার যেমন إِعْتَبَرْتُ الشَّيْءَ অর্থ- যখন তুমি সেই বস্তুটিকে দেখ
 এবং সেটির অবস্থা বিবেচনা কর। এখানে কালাম বলে ফসীহ বাক্য বুঝানো হয়েছে। আর حُسْن শব্দ দ্বারা
 সত্তাগত সৌন্দর্য বুঝানো হয়েছে, বালাগাতের অন্তর্ভুক্ত حُسْنُ عَرْضِي (সংযুক্ত সৌন্দর্য)-কে বুঝানো হয়নি, যা
 (কালামের সত্তার) বহিরাগত। কেননা, তা হাশিল হয় مُحَسَّنَاتِ بَدِيعَةٍ দ্বারা।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

১. قَوْلُهُ إِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ الخ : প্রকাশ থাকে যে, যে কোনো বাক্য বালাগাতের ক্ষেত্রে দু'ধরনের হয়ে থাকে-
 বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ের। ২. এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের না হয়ে নিম্ন পর্যায়ের হওয়া। এ দু' প্রকার لَدَائِهِ حُسْن (সত্তাগত
 সৌন্দর্য) এবং قَبُولُ السَّامِعِ তথা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে। উল্লেখ্য যে, الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ-এর মধ্যে যে
 عَطْف হয়েছে, তাকে عَطْفٌ عَلَى الْمَلْزُوم বলা হয়। অর্থাৎ حسن হলো ملزوم-এর জন্য لازم হলো অর্থাৎ শ্রোতাদের
 কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে তা সুন্দর হতো না। শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কারণেই এটি حسن বা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।
 এ দু'টি কয়েদ দ্বারা লেখক অন্যভাবে কালামের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টিকে খারিজ করেছেন। যেমন-
 تَرْغِيبٍ وَتَرْهِيْبٍ হিসেবে কালামের কথা বলা হয়নি। কেননা, তখন সেই কালামেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের হয়ে যাবে যার মধ্যে
 প্রভাব সৃষ্টি করার যোগ্যতা বেশি থাকবে। মূল লেখক সৌন্দর্য এবং গ্রহণযোগ্যতার বিচারে সর্বোত্তম বাক্য এবং অন্যতম
 সুন্দর বাক্য হওয়ার জন্য إِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ-এর মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার শর্ত করেছেন। এখন আমাদের জানা দরকার
 إِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ কাকে বলে?

এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) إِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ-এর ব্যাক্য দিচ্ছেন, তিনি বলেন,
 قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ অর্থাৎ এমন একটি বিষয়,
 যাকে বক্তা শ্রোতার অবস্থা অনুপাতে উপযুক্ত মনে করেন। আর সে এটা মনে করে নিজ প্রতিভা বলে অথবা বালাগাত
 শাস্ত্রবিদদের রচনাবলি গভীর অধ্যয়নের সাহায্যে। অতএব বক্তার কথা যদি উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়,
 তাহলে সেটি সর্বোত্তম বাক্য। আর যদি তার কথা সেই বিষয়ের সাথে কোনোভাবেই না মিলে, তাহলে তার কথা
 বালাগাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে। তখন তার কথা আর পণ্ডদের আওয়াজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে
 না। এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. মুসান্নিফের اعتبار শব্দটি মাসদার, এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اسم مفعول তাই মুসান্নিফ (র.) পরে ব্যাখ্যায় এনেছেন اَلْأَمْرُ الْمُغْتَبَرُ বা اَلْأَمْرُ الَّذِي اُعْتَبِرَ

দুই. এখানে اَلْأَمْرُ الْمُغْتَبَرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই সব বৈশিষ্ট্য, যা বাক্যের মধ্যে আসল অর্থ আদায়ের পর গ্রহণ করা হয়। যেমন, শ্রোতার انكار বা অস্বীকারের সময় তাকিদ ইত্যাদি। এ কথায় বুঝা যাচ্ছে যে, পূর্বের বর্ণিত মুকতাযায়ে হালই হলো اِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ

اَلْاَسْلِفَةُ-এর অর্থ প্রতিভা, এটা বাগ্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা আরবীয় এবং ভাষাজ্ঞানে দক্ষ। আর যারা অনারবী তারা তাদের বাক্যকে اِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ-এর মোতাবেক করার জন্য আরবি বালাগাতশাস্ত্রবিদদের রচনার মুখাপেক্ষী হন। তাদের বালাগাতশাস্ত্রবিদদের রচনা থেকে আয়ত্ত করা দু'ভাবে হতে পারে-

১. بِاَلْوَاسِطَةِ ২. بِاَلْوَاسِطَةِ-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের রচনাবলির আলোকে তৈরি নিয়মাবলি তথা ব্যাকরণশাস্ত্রের সাহায্যে আয়ত্ত করা। بِاَلْوَاسِطَةِ-এর অর্থ হচ্ছে, ব্যাকরণের নিয়মের মাধ্যমে নয়; বরং সরাসরি বালাগাতশাস্ত্রবিদদের রচনা থেকে হাসিল করা।

قَوْلُهُ يُقَالُ اُعْتَبِرْتُ الشَّيْءَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) তার দেওয়া اِعْتِبَار-এর ব্যাখ্যার প্রমাণ অভিধান থেকে দিচ্ছেন। তিনি ব্যাখ্যায় বলেছিলেন যে, اِعْتِبَار-এর অর্থ مُغْتَبَرٌ তিনি বলেন اِعْتَبِرْتُ الشَّيْءَ তখন বলা হয়, যখন আপনি একটি বিষয়কে দেখবেন এবং তার অবস্থানকে বিবেচনা করবেন (আমলে নিবেন) যেমন- বক্তা শ্রোতাকে খবর অস্বীকার করতে দেখল, অতঃপর সে শ্রোতার সামনে তাকিদের সাথে কথা বলল। আর শ্রোতার অবস্থাকে বিবেচনা করাই হলো اِمْرٌ مُغْتَبَرٌ-ই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَارَادَ بِاَلْكَلَامِ اَلْكَلَامَ اَلْفَوْصِحِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখক বলেছেন اِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বাক্যের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, মোতাবেক হওয়ার দ্বারা কেবলমাত্র حسن (সৌন্দর্য) বৃদ্ধি পায়, বাক্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় না। মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কালামের পরিপূর্ণ মোতাবেক হওয়া জরুরি। তাই লেখকের এভাবে বলা উচিত ছিল- اِرْتِفَاعٌ اِرْتِفَاعٌ কিন্তু তিনি তো এরূপ বলেননি? এর উত্তর হলো, তার বক্তব্য اِرْتِفَاعٌ اِرْتِفَاعٌ-এর মধ্যে কলাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فَصِيح আর যদি কালামে ফাসীহ উদ্দেশ্য হয়, তবে সাধারণ حسن (সৌন্দর্য) তো কালামে ফাসীহ দ্বারা ই পাওয়া যায়। আর اِرْتِفَاعُ الشَّيْءِ-এর জন্য مُطَابَقَةٌ যথেষ্ট, আর যেহেতু সাধারণ مُطَابَقَةٌ-এর দ্বারা সৌন্দর্য পাওয়া যাওয়া সম্ভব, তাই এর মধ্যে مُطَابَقَةٌ-এর জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَيَا لِحُسْنِ اَلْحُسْنِ اَلذَّائِي : বাক্যের এ অংশ দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখকের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কালামের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় মোতাবেক হওয়ার দ্বারা, এ কথাটি সঠিক নয়। কারণ, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কালামের মর্যাদা مُحَسَّنَاتٌ بِدِيعَةٍ দ্বারা হাসিল হয়, মোতাবেক হওয়ার দ্বারা নয়। আর مُحَسَّنَاتٌ بِدِيعَةٍ-এর আলোচনা ইলমে বদী'-এ আসবে। এ প্রশ্নের উত্তর হলো حسن (কালামের সৌন্দর্য) দু'ধরনের- ১. حُسْنٌ ذَاتِي (সত্তাগত সৌন্দর্য), ২. حُسْنٌ عَرَضِي (অতিরিক্ত সংযুক্ত সৌন্দর্য)। مُحَسَّنَاتٌ بِدِيعَةٍ দ্বারা حُسْنٌ ذَاتِي হাসিল হয় চুসন ডাতী হাসিল হয় না। অথানে حُسْنٌ ডাতী হাসিল হয় বালাগাত দ্বারা। এখানে حُسْنٌ ডাতী উদ্দেশ্য حُسْنٌ ডাতী উদ্দেশ্য নয়। حُسْنٌ ডাতী-এর আলোচনা ইলমে মা'আনীতে হয় এবং حُسْنٌ عَرَضِي-এর আলোচনা ইলমে বদী'-এর মধ্যে হয়।

সার-সংক্ষেপ :

(ক) কোনো বাক্যের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় সে বাক্যটির اِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ বা اِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা। অর্থাৎ সে বাক্য যতটা اِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ-এর (স্থান-কাল ও পাত্র) অনুযায়ী হবে, সেই বাক্য ততটা সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হবে।

فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الْإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ لِلْحَالِ وَالْمَقَامِ يَعْنِي إِذَا عَلِمَ أَنْ لَيْسَ
إِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ فِي الْحُسْنِ الذَّاتِيِّ إِلَّا بِمُطَابَقَتِهِ لِلإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ
عَلَى مَا يُفِيدُهُ إِضَافَةُ الْمَضَدِّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ بِالْبَلَاغَةِ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ
مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ
وَمُقْتَضَى الْحَالِ وَاحِدٌ وَلَا لِمَا صَدَقَ أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِلإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ وَلَا
يَرْتَفِعُ إِلَّا بِالْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَلْيَتَأَمَّلْ -

অনুবাদ : আর মুকতাযায়ে হাল-ই হলো الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبُ لِلْحَالِ وَالْمَقَامِ (হাল এবং মাকামের উপযুক্ত
ই‘তিবার) অর্থাৎ যখন এ বিষয়টি জানা গেল যে, কালামে ফাসীহ (বিশুদ্ধ বাক্য)-এর মর্যাদা-গুরুত্ব
(তথা সত্তাগত সৌন্দর্য)-এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ হয় না, তবে (তখনই হয়) যখন الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ-এর মোতাবেক হয়-
এ কথার উপর যে, মাসদারের ইয়াফত এ অর্থই প্রদান করছে। আবার এ কথাও জ্ঞাত যে, কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব
বালাগাতের দ্বারাই হয়, যা মূলত কালামে ফাসীহ-এর মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়াকে বুঝায়। সুতরাং
এখন বুঝা গেল الإِعْتِبَارُ الْمُنَাসِبِ এবং মুকতাযায়ে হালের অর্থ একই। অন্যথায় এ কথা সত্য হতো না যে, শুধুমাত্র
الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারা কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব সর্বোচ্চ হয় এবং শুধুমাত্র মুকতাযায়ে হালের
মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই কালামের মর্যাদা-গুরুত্ব সর্বোচ্চ হয়। (অথচ এ দু’টি কথাই যখন সত্য) সুতরাং
মুকতাযায়ে হাল এবং الإِعْتِبَارُ الْمُنَাসِبِ উভয়টি একই, আপনি ভালোভাবে চিন্তা করে অনুধাবন করুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَمُقْتَضَى الْحَالِ : এখান থেকে লেখকের আগের বক্তব্য الْكَلَامِ শানِ إِرْتِفَاعُ-এর تَفْرِيع (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)
শুরু হয়েছে। তিনি বলেছেন, ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ-এর মোতাবেক হওয়ার দ্বারাই কালামের শান বৃদ্ধি
পায়। কিন্তু الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ কি? এর উত্তরে তিনি বলেছেন مُقْتَضَى الْحَالِ হলো الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ লেখক এ দু’টোর অর্থ বা
সত্তা যে এক তা বুঝানোর জন্য هُوَ সর্বনামটিকে এনেছেন। কেননা, ضَمِيرُ فَضْل (মুবতাদা এবং খবরের মাঝখানে যে
ضمير আসে) তা حَصْر (সীমাবদ্ধতার) অর্থ প্রদান করে। তাই আমরা অর্থ করেছি মুকতাযায়ে হালই হলো الإِعْتِبَارُ
الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ বা الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ মানেই মুকতাযায়ে হাল। এরপর মুসান্নিফ (র.) এ কথার পক্ষে দলিল পেশ করছেন। তার
দেওয়া দলিলটি মানতিকের বিখ্যাত কায়দা الشَّكْلُ الْأَوَّلُ দ্বারা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে صُغْرَى, এরপর كُبْرَى, এরপর
نتيجة এখানে মনে রাখা দরকার যে, মূল লেখক الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ বলে فَمُقْتَضَى الْحَالِ هُوَ الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ
করেছেন। এর আগে মূল লেখকের ইবারত الْكَلَامِ শানِ إِرْتِفَاعُ-কে মুসান্নিফ كُبْرَى বানিয়েছেন। আর صُغْرَى যা মূল
লেখক উল্লেখ করেননি। কিন্তু صُغْرَى-এর বক্তব্য ইলমে বালাগাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে জ্ঞাত এবং প্রসিদ্ধ
আছে। হয়তোবা এ কারণেই মূল লেখক এটি বর্ণনা করেননি। মুখতাসারুল মা'আনীর লেখক বিষয়টি সুবিন্যস্তভাবে
উপস্থাপন করেছেন। তিনি লেখকের উদ্ধৃত كُبْرَى-কে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

لَيْسَ إِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ فِي الْحُسْنِ الذَّاتِيِّ إِلَّا بِمُطَابَقَتِهِ لِلإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ

অর্থাৎ কালামে ফাসীহের সত্তাগত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি কেবল الإِعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ-এর মোতাবেক
হওয়ার দ্বারাই পাওয়া যায়; কিন্তু মুসান্নিফের এ বক্তব্যের উপর আপত্তি আসে যে, মূল লেখকের কথায় তো حَصْر
(সীমাবদ্ধতা) নেই। কারণ, তিনি এভাবে বলেছেন- إِرْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ فِي الْحُسْنِ وَالْقَبُولِ بِمُطَابَقَتِهِ لِلإِعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ

সার-সংক্ষেপ : ক. **إِعْتِبَارُ مَنْاسِبِ حَالٍ** উভয়ে একই এবং পরস্পর অভিন্ন। এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং বলা যায় এরা সমার্থক। সুতরাং **إِعْتِبَارُ مَنْاسِبِ حَالٍ** অনুযায়ী হওয়া হওয়া অর্থই হচ্ছে **إِعْتِبَارُ مَنْاسِبِ**-এর অনুযায়ী হওয়া।

فَالْبَلَاغَةُ صِفَةٌ رَاجِعَةٌ إِلَى اللَّفْظِ بِمَعْنَى أَنَّهُ كَلَامٌ بَلِيغٌ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَفْظٌ وَصَوْتُ
بَلٍ يَاعْتِبَارٍ إِفَادَتِهِ الْمَعْنَى أَيْ الْغَرَضُ الْمَصْنُوعُ لَهُ الْكَلَامُ بِالتَّرْكِيْبِ مُتَعَلِّقٌ بِإِفَادَتِهِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ
الْبَلَاغَةَ كَمَا مَرَّ عِبَارَةً عَنْ مُطَابَقَةِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَظَاهِرٌ أَنَّ إِعْتِبَارَ الْمُطَابَقَةِ
وَعَدَمِهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِإِعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَالْأَغْرَاضِ الَّتِي يُصَاغُ لَهَا الْكَلَامُ لَا بِإِعْتِبَارِ الْأَلْفَاظِ الْمُفْرَدَةِ
وَالْكَلِمِ الْمَجْرَدَةِ وَكَثِيرًا مَا نَصَّبَ عَلَى الظَّرْفِ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَةِ الْأَحْيَانِ وَمَا لِتَاكِيدِ مَعْنَى
الْكَثْرَةِ وَالْعَامِلِ فِيهِ قَوْلُهُ يُسَمَّى ذَلِكَ الْوَصْفَ الْمَذْكُورَ فَصَاحَةً أَيْضًا كَمَا يُسَمَّى بِلَاغَةً فَحَيْثُ
يُقَالُ إِنَّ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ فِي أَعْلَى طَبَقَاتِ الْفَصَاحَةِ يُرَادُ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى -

অনুবাদ : বালাগাত এমন একটি সিফাত যার সম্পর্ক লَفْظ (শব্দের) সাথে, তবে এ অর্থে যে, এটি হচ্ছে কَلَام (অর্থঃ কালাম মাওসুফ, বَلِيغ তার সিফাত)। এ হিসেবে (لَفْظ-এর সিফাত) নয় যে, এটি শুধুমাত্র শব্দ ও আওয়াজ; বরং ইবারত এমন অর্থ প্রদান করে, যে অর্থের জন্য বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। بِالتَّرْكِيْب শব্দটি إِفَادَتِهِ-এর সাথে মুতা'আল্লিক হবে। আর এটি এ কারণে যে, যেমনটি ইতঃপূর্বে বালাগাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কালামে ফাসীহ (বিশুদ্ধ বাক্য)-এর মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়াকে বালাগাত বলা হয়। আর এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, (যে কোনো বাক্যের) মোতাবেক হওয়া এবং মোতাবেক না হওয়ার সম্পর্ক অর্থ এবং উদ্দেশ্যের সাথে; যার জন্য বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে, শুধুমাত্র শব্দ (বা বাক্য)-এর সাথে নয়। অনেক সময় এটি (كَثِيرًا مَا) যবর যুক্ত হয়েছে ظَرْف-এর কারণে। কেননা, (মূলত) এটি أَحْيَان-এর সিফাত। مَا আধিক্যের অর্থের তাকিদ করার জন্য (আনা হয়েছে,) এর মধ্যে আমেল হলো লেখকের يُسَمَّى শব্দটি। উল্লিখিত বিষয় (অর্থঃ মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়া)-কে ফাসাহাতও বলা হয়ে থাকে, যেমনটি বালাগাত বলা হয়। সুতরাং যেখানে বলা হয় কুরআনের ই'জাজ ফাসাহাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হওয়ার কারণেই, সেখানে এ অর্থেই (অর্থঃ ফাসাহাত দ্বারা বালাগাত) উদ্দেশ্য করা হয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَالْبَلَاغَةُ صِفَةٌ الْخ : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা লেখক তার বর্ণিত বালাগাতের সংজ্ঞার একটি ভিন্নধর্মী বিশ্লেষণ শুরু করছেন। বিষয়টি হলো- পাঠকের বালাগাতের সংজ্ঞা থেকে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে, বালাগাত শব্দটি শুধুমাত্র لَفْظ (শব্দের) সিফাত, (অর্থের সাথে এর সম্পর্ক গৌণ)। এমন ধারণা হওয়ার কারণ হলো, সংজ্ঞার শব্দ চয়ন। সংজ্ঞার মধ্যে বলা হয়েছে لِمُقْتَضَى الْحَالِ এখানে মোতাবেক হওয়া যাকে বালাগাত বলা হচ্ছে- এটি কালামের সিফাত। তার মাওসুফ হলো কালাম। কালাম তো لَفْظ (শব্দ), অতএব তার সিফাত (বালাগাত) ও শব্দই হবে। কিন্তু পাঠকের এ ধারণা যাতে না হয়, তাই লেখক এ বিষয়টির অবতারণা করলেন। তিনি বলেন, বালাগাত যদিও لَفْظ-এর সিফাত, কিন্তু অর্থ ছাড়া শুধুমাত্র لَفْظ-এর সিফাত নয়; বরং এমন লَفْظ-এর সিফাত, যা অর্থ প্রদান করে। এ অর্থেই বালাগাত বিশারদগণ বালাগাতকে লَفْظ-এর সিফাত বলেছেন। পাঠকের এ ধারণা খণ্ডন করার সাথে লেখক আরেকটি تَنَاقُض (বৈপরীত্য)-কে দূর করতে চান। যা শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর বক্তব্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দালায়েলুল ই'জাজ গ্রন্থে বালাগাতকে কখনো لَفْظ-এর সিফাত বলেছেন, আবার কখনো مَعْنَى-এর সিফাত বলেছেন। তিনি কখনো لَفْظ থেকে বালাগাতকে نَفَى করেছেন; আবার কখনো مَعْنَى থেকে نَفَى করেছেন। তার এসব বক্তব্যে এক ধরনের বিভ্রান্তি এবং বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। মূল লেখক সেই বিভ্রান্তি দূর করতে গিয়ে বলেন, বালাগাত لَفْظ-এর সিফাত, তবে অর্থ প্রদানকারী হিসেবে لَفْظ বলতে সাধারণত যা বুঝা যায় (শব্দ বা আওয়াজ), এ হিসেবে বালাগাত لَفْظ-এর সিফাত

নয়। অর্থ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ অতিরিক্ত অর্থ যার উদ্দেশ্যে বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ বলতে ঐ সব বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাকিদ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে যাকে حال চায়, কেননা কালামে বালীগ (অলঙ্কারসমৃদ্ধ)-এর মধ্যে মূল অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য হয় না। কেননা, মূল অর্থ (বাক্যের সাধারণ অর্থ) তো বালাগাত ছাড়া কালামেও পাওয়া যায়। কালামে বালীগের মধ্যে সেই অতিরিক্ত অর্থ বুঝানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যাকে حال চায়। একেই মুকতায়্যে হাল বা **إِعْتِبَارٌ مُنَاسِبٌ** বলা হয়।

সারকথা হলো, আল্লামা জুরজানীর বক্তব্যে লেখকের ব্যাখ্যা অনুসারে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, তিনি যেখানে বালাগাতকে **لفظ**-এর সিফাত বলেছেন, সেখানে **لفظ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ **لفظ** যা কাক্ষিত অর্থ প্রদান করে। আর যেখানে তিনি **معنى**-এর সিফাত বলেছেন, সেখানে অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ অতিরিক্ত অর্থ, যার প্রতি **لفظ** ইঙ্গিত করে।
قَوْلُهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَلَاغَةَ كَمَا مَرَّ عِبَارَةً : এ ইবারত দ্বারা তিনি তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমি যে বলেছি বালাগাত **لفظ**-এর সিফাত, এর প্রমাণ হলো- বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে বলা হয়েছে যে, কালামে ফাসীহ মুকতায়্যে হালের মোতাবেক হওয়াকে বলে। এ সংজ্ঞার মধ্যে **مطابقة**-এর **اضافة** হয়েছে কালামের দিকে, আর কালাম হলো **لفظ**, সুতরাং একথা প্রমাণিত হলো যে, বালাগাত সিফাত হয়েছে এমন বিষয়ের থেকে যা **لفظ** বা শব্দ।

قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ إِعْتِبَارَ الْمُطَابَقَةِ : এখান থেকে লেখক তার দাবির আরেকটি অংশকে প্রমাণ করছেন। দাবির এ অংশটি হলো, বালাগাত শুধুমাত্র শব্দ বা আওয়াজের সিফাত নয়; বরং এমন শব্দের সিফাত যা উদ্দেশ্যকে বুঝায়। তার প্রমাণ এই যে, বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে মোতাবেক হওয়া এবং মোতাবেক না হওয়ার কথা রয়েছে। আর মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক অর্থ এবং উদ্দেশ্য (হালের বিভিন্ন মুকতায়্য)-এর সাথে, যার জন্য বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর সম্পর্ক ঐ শব্দের সাথে নেই, যা অর্থ এবং উদ্দেশ্যের প্রতি দিক নির্দেশ করে না।

মোটকথা, যেহেতু মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক অর্থ এবং উদ্দেশ্যের সাথে। তখন বলতে হবে- বালাগাত এমন শব্দের সিফাত, যা অর্থ ও উদ্দেশ্যের প্রতি দিক নির্দেশ করে।

قَوْلُهُ كَثِيرًا مَا نَصَّبَ عَلَى الظَّرْفِ : এখান থেকে লেখক উপরে উল্লিখিত বিষয়ের নামের ব্যবহারে যে ব্যাপকতা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, উল্লিখিত বিষয় (অর্থাৎ মুকতায়্যে হালের মোতাবেক হওয়া)-কে যেমন- বালাগাত বলা হয়, তেমনি কখনো এটিকে ফাসাহাত বলা হয়ে থাকে। মোটকথা, বিষয়টির নাম বালাগাত হলেও কখনো কখনো একে ফাসাহাত বলে ব্যক্ত করা হয়। যেমন- **إِنْ إِعْجَازَ الْقُرْآنِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ فِي أَعْلَى طَبَقَاتِ الْفَصَاحَةِ** -এখানে **فَصَاحَةٌ** শব্দ বলে কালামের মুকতায়্যে হালের অনুরূপ হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। মোদ্দাকথা এই যে, বালাগাতের স্থলে কখনো কখনো ফাসাহাত শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়।

মুসান্নিফ প্রথমেই **مَا كَثِيرًا**-এর ব্যাকরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি বলেন **كَثِيرًا**-এর মধ্যে **نصب** হয়েছে **زمان** হওয়ার কারণে। কিন্তু কিভাবে এটি **زمان** হলো? এর উত্তর মুসান্নিফ (র.) নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি **أَحْيَانًا** (মাওসুফ)-এর সিফাত। **أَحْيَانًا** (সময়) **زمان** হওয়ার কারণে **منصوب**, অতএব এর সিফাতও মানসূবই হবে। এখানে কারো এটা মনে করা উচিত হবে না যে, **كَثِيرًا** বর্তমানেও **أَحْيَانًا** উহা মাওসুফের সিফাত এবং উহা ইবারত এরূপ **أَحْيَانًا كَثِيرًا** কারণ এমনটি মনে করলে প্রশ্ন দেখা দিবে যে, তাহলে তো মাওসুফ এবং সিফাতের মাঝে **تطابق** হলো না। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি হলো, **أَحْيَانًا** প্রথমত **كَثِيرًا**-এর সিফাত ছিল **أَحْيَانًا كَثِيرًا** হিসেবে, এরপর **أَحْيَانًا**-কে স্থায়ীভাবে উহা রেখে তার স্থানে **كَثِيرًا**-কে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাই এখন **كَثِيرًا**-এর ঐ অর্থই হবে, যা **أَحْيَانًا**-এর হয়ে থাকে এবং **كَثِيرًا**-এর উপর **نصب** হবে যা ছিল **أَحْيَانًا**-এর উপর। কেননা, কোনো বস্তুকে **نائب** বানানো হলে সেটি আসলের ছকুম গ্রহণ করে। যেহেতু এখানে **كَثِيرًا**-কে **أَحْيَانًا**-এর স্থলবর্তী করা হয়েছে, তাই এখন **أَحْيَانًا**-এর সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না; বরং **كَثِيرًا** ই **أَحْيَانًا**-এর অর্থ প্রদান করবে এবং ই'রাব গ্রহণ করবে। **مَا** শব্দটি **كثرة**-এর তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। যেমন- **قلة**-এর তাকিদের জন্য **مَا**-কে আনা হয়, যেমন বলা হয় **وَالْعَامِلُ فِيهِ قَلِيلًا مَا** অর্থাৎ **زمان**-এর **عامل ناصب** (প্রদানকারী আমেল) হলো **يُسَمَّى** ফে'লটি। আর **نائب فاعل** মাজহলের **يُسَمَّى** ফে'লে **أَحْيَانًا** এটি **ذَلِكَ الرَّصْفُ**।

المطابقة لمقتضى الحال - দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- **قَوْلُهُ الرَّصْفُ الْمَذْكُورُ**
সার-সংক্ষেপ : **ك**- **بَلَاغَةٌ** যদিও **لفظ**-এর **صفت** (বিশেষণ), কিন্তু তা অর্থ বিবর্জিত **لفظ**-এর বিশেষণ নয়; বরং এতে **لفظ** এবং অর্থ উভয়ের সমান গুরুত্ব রয়েছে। **খ**- **بَلَاغَةٌ**-কে কখনো **فَصَاحَةٌ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।

مرکب حدّ الإعجازِ এটি স্তর। إعجاز-এর স্তর হলো : قوله اعلیٰ وهو حدّ الإعجازِ বা सर्वोচ্চ পর্যায়ের, তার স্তর হলো : حدّ -এর ইযাফত بیان হিসেবে হয়েছে। এ মতে অর্থ হবে বালাগাতের सर्वोচ্চ পর্যায় হলো : حدّ অর্থাৎ 'জায়'। উল্লেখ্য যে, এক্ষানে إعجاز-এর আগে একটি (مضاف) উহ্য আছে। অর্থাৎ বালাগাতের सर्वोচ্চ পর্যায়টি إعجازُ সম্বন্ধ অর্থাৎ তাতে إعجازُ রয়েছে।

এ স্তর মানুষকে তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অপারগ করে দেয়।

عَمَّ وَفَوَّلَهُ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ الْخَيْرُ : এ বাক্যটি معطوف হয়েছে। এর ব্যাপারে মুসান্নিফের বক্তব্য হলো فَوْ - هُوَ - اَعْلَى এ হিসেবে বাক্যটি এক্রূপ হবে- عَمَّ وَفَوَّلَهُ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ الْخَيْرُ -এর মধ্যস্থ হুও সর্বনাম। আর مِنْهُ -এর সর্বনাম-এর مرجع হলো اَعْلَى এ হিসেবে বাক্যটি এক্রূপ হবে- عَمَّ وَفَوَّلَهُ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ الْخَيْرُ অর্থাৎ বালাগাতের সর্বোচ্চ স্তর এবং সর্বোচ্চ স্তরের নিকটবর্তী স্তর উভয়টি ই'জাযের পর্যায়ে। অর্থাৎ শুধুমাত্র সর্বোচ্চ স্তরই ই'জাযের পর্যায়ে নয়; বরং সর্বোচ্চ স্তরের নিকটবর্তী স্তরও ই'জাযের পর্যায়ে, যা মানবীয় রচনার সাধারণ বাইরে। মুসান্নিফ حَدُّ الْأَعْجَازِ -এর (মبتدأ) -কে উহা রেখেছেন, যাতে حَدُّ الْمَنْشُورِ (খبر) -এর (مفعول) -কে উহা রেখেছেন, যাতে حَدُّ الْأَعْجَازِ (মবদ) -কে اَعْلَى এবং وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ উভয়ের খবর বলা বিস্তৃত হয়। কেননা, مَبْتَدَأ যদি দু'টি বিষয় হয়, তাহলে তার দ্বিবিচন আনতে হয়। তখন مَفْعُول খবর হতে পারে না। এখন حَدُّ الْأَعْجَازِ পুরো বাক্যটি খবর হবে।

এ-এর معطوف عليه-এর مَا يَقْرُبُ مِنْهُ, এরপর মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, قَوْلُهُ هَذَا هُوَ الْمَوَافِقُ لِمَا فِي الْمِفْتَاحِ
 এ-এর অনুক্রপ।

এর ব্যাপারে কতিপয় -مَعْطُونَ عَلَيْهِ-এর-وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ- মুসান্নিফ : قَوْلُهُ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ عَطْفٌ লোকের মন্তব্য উপস্থাপন করতঃ তার অসারতা প্রমাণ করেছেন। কতিপয় লোক হচ্ছেন اِيضًا এছের কতিপয় ব্যাখ্যাকার। তারা বলেন, مَا يَقْرُبُ مِنْهُ-এর معطون عليه হলো اِلْعَاجَاز আর مِنْهُ-এর সর্বনামের مَرْجِع হলো اِلْعَاجَاز অর্থাৎ মুসান্নিফ যা বলেছেন, তার বিপরীত। মুসান্নিফের কথা দ্বারা বুঝা গেল اِلْعَاجَاز একটি نوع যার দু'টি فرد আছে- ১. اَعْلَى ২. اَعْلَى ۲. اَعْلَى আর কতিপয় লোকের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে اَلطَّرْفُ اَلْاَعْلَى একটি نوع যার দু'টি فرد রয়েছে- ১. اَعْلَى ২. اَعْلَى ২. اَعْلَى

طَرْفَ اَعْلٰی-এর- طَرْفَ اَعْلٰی (র.) বলেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়, কারণ তাদের কথা দ্বারা বুঝা যায় طَرْفَ اَعْلٰی-এর দু' প্রকার- ১. حَذَّ الْاِعْجَازِ ২. حَذَّ الْاِعْجَازِ অথচ এটি সঠিক হতে পারে না। কারণ, طَرْفَ اَعْلٰی এমন একটি একক যা বিভক্তিকে চায় না। طَرْف বা শীর্ষের ক্ষেত্রে এ নীতিই কার্যকর। কেননা, طَرْف বা শীর্ষদেশ হলো نَقْطَه-এর মতো, যা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। তা ছাড়া তাদের বক্তব্য দ্বারা الْوَاحِدِ بِمُتَعَدِّ অর্থাৎ এক বস্তুর খবর একাধিক বস্তু দ্বারা দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এ দু'টি বিষয় সঠিক নয়।

সারকথা হলো, طَرْفَ اَعْلٰی একটিই হয়ে থাকে, একাধিক হতে পারে না। কিন্তু তাদের عطف অনুসারে طَرْفَ اَعْلٰی একাধিক হয়ে যায়, তাই তাদের বক্তব্য গ্রহণ করা গেল না। অর্থাৎ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ-এর আত্ফالِ اَعْجَاز-এর উপর হবে না; বরং هُوَ-এর উপরই হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমি মুতাওয়ালৈ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তোমাদের যাদের আগ্রহ আছে তারা মুতাওয়ালৈ দেখতে পার। কারণ, সমুদ্রের গভীর তলদেশে না গেলে মুক্তা পাওয়া যায় না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. বালাগাতে কালামের প্রধানতম দু'টি স্তর রয়েছে- ১. প্রথম স্তরটি হচ্ছে اَعْلٰى বা চূড়ান্ত পর্যায়ের ও সর্বোচ্চ স্তরের বালাগাত সমৃদ্ধ। এ স্তরকে حَدِّ الْأَعْيَارِ বলা হয়। পবিত্র কুরআনুল কারীম এ স্তরের উদাহরণ।

খ. লেখক বলেন, أَعْلَى-এর কাছাকাছি স্তরটিও أَعْلَى-এর পর্যায়ে।

وَأَسْفَلَ وَهُوَ مَا إِذَا غَيَّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ أَيْ إِلَى مَرْتَبَةٍ وَهِيَ أَدْنَى مِنْهُ وَأَنْزَلَ
الْتَّحَقَّ الْكَلَامُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحَ الْأَعْرَابِ عِنْدَ الْبُلْغَاءِ بِأَصْوَاتِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَصْدُرُ
عَنْ مَحَالِّهَا بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ مِنْ غَيْرِ إِعْتِبَارِ اللَّطَائِفِ وَالْخَوَاصِّ الزَّائِدَةِ عَلَى أَصْلِ
الْمُرَادِ وَيَبَيِّنُهُمَا أَيْ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ مَرَاتِبَ كَثِيرَةٍ مُتَفَاوِتَةٍ بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ
بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الْمَقَامَاتِ وَرِعَايَةِ الْأَعْتِبَارَاتِ وَالْبُعْدِ مِنْ أَسْبَابِ الْأَخْلَالِ بِالْفَصَاحَةِ -

অনুবাদ : আর (আরেক প্রকার হলো) 'أَسْفَلَ' তা হচ্ছে কালামকে তার থেকে নিচুস্তরের দিকে পরিবর্তন করে নিম্নগামী করে দেওয়া, যা তা থেকে নিচুস্তরের এবং কম মর্যাদার। ফলে ইবারত ব্যাকরণগতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বালাগাত শাস্ত্রবিদদের নিকট ইতর প্রাণীদের আওয়াজের সাথে মিলে যায় বা সমপর্যায়ে হয়ে যায়, যা স্বস্থান থেকে কোনো একভাবে নির্গত হয় এবং যার মধ্যে আসল অর্থের চেয়ে বেশি ঐ সব সূক্ষ্ম বিষয় এবং অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না। এতদুভয়ের মাঝে অর্থাৎ দু'দিকের মাঝে পরস্পর ভিন্ন অনেক স্তর রয়েছে। যার কতকগুলো অন্য কতকগুলো থেকে উত্তম, মাকামের ভিন্নতা, বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করা এবং ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে দূরে থাকার কারণে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

طَرَفٌ : উপরোক্ত ইবারতে বালাগাতের দ্বিতীয় প্রকারের আলোচনা এসেছে। দ্বিতীয় প্রকার **طَرَفٌ** **وَهُوَ مَا إِذَا** বা সর্ব নিম্নস্তর। **طَرَفٌ** (أَسْفَلَ) বা সর্ব নিম্নস্তর কাকে বলে? এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মূল লেখক বলেন— **أَسْفَلَ** **غَيَّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ** অর্থাৎ এটি এমন একটি স্তর যেখানে কালামকে **أَسْفَلَ**-এর নিচুস্তর নামিয়ে দেওয়া হয় বা কালাম এমন নিম্নমানের হয় যে, মুকতাযায়ে হালের প্রতি সামান্যতম লক্ষ্য করা হয়নি। যার ফলে এ ধরনের কথা ব্যাকরণগতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বালাগাত শাস্ত্রবিদদের নিকট ইতর প্রাণীদের আওয়াজের পর্যায়ে চলে যায়, যা কোনো একভাবে মুখ থেকে নির্গত হয়, না থাকে এতে সূক্ষ্ম বিষয়ের লক্ষ্য এবং না থাকে এতে আসল অর্থের বাইরে অতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ وَيَبَيِّنُهُمَا أَيْ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ مَرَاتِبَ كَثِيرَةٍ : এখান থেকে লেখক **أَعْلَى** এবং **أَسْفَلَ**-এর মধ্যবর্তী প্রকার সম্পর্কে আলোচনা শুরু করছেন। তিনি বলেন, **أَعْلَى** এবং **أَسْفَلَ**-এর মধ্যে অনেকগুলো মধ্যস্তরের প্রকার রয়েছে, যেগুলো পরস্পর ভিন্ন, তাদের মাঝে এই ভিন্নতা কালামের মাকামের ভিন্নতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করা বা না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণেই একটি অন্য আরেকটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ এক শোতার মাঝে দশটি **حَال** পাওয়া গেল, এর প্রত্যেকটি একেকটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এমতাবস্থায় বক্তা যদি তার কথায় দশটি বৈশিষ্ট্যকেই ব্যবহার করে, তাহলে তার কথা বালাগাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হলো। আর যদি শোতার **حَال** অনুসারে দশটির একটি বৈশিষ্ট্যকে তার কথায় ব্যবহার করে, তাহলে সেটি **أَسْفَلَ** বা সর্বনিম্নস্তরের বালাগাত হলো। এ দু'টির (দশ ও একের) মাঝে অনেকগুলো স্তর আছে। যাদের একটি অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। যেমন— বক্তার কথায় পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থাকলে সেটি উত্তম হবে বক্তার ঐ কথা থেকে, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এমনিভাবে যার কথায় ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি নেই এবং কথটি মুকতাযায়ে হাল অনুসারে ব্যবহার হয়েছে তার এ কথটি ঐ কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে যার মধ্যে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর সামান্য কিছু পাওয়া গেল, কিন্তু সেটি কথাকে ফাসাহাত থেকে বের করেনি। যদিও বাক্যটি মুকতাযায়ে হাল অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, কালামের হালের ভিন্নতা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করার কারণে বালাগাতের স্তরের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। এমনিভাবে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির উপস্থিতির কারণেও বালাগাতের স্তর বিভিন্ন ধরনের হয়।

সার-সংক্ষেপ : ক. বালাগাতে সর্ব নিম্নস্তর বা **أَسْفَلَ** স্তর হচ্ছে এমন ভাষা যা (লেখকের ভাষানুসারে) ইতর প্রাণীদের আওয়াজের পর্যায়ে পড়ে। খ. বালাগাতের সর্বোচ্চ স্তর ও সর্বনিম্ন স্তরের মাঝে অনেকগুলো মধ্যবর্তী স্তর রয়েছে।

وَتَتَّبَعُهَا أَى بَلَاغَةِ الْكَلَامِ وَجُوهٌ آخَرُ سِوَى الْمُطَابَقَةِ وَالْفَصَاحَةِ تَوَرَّثَ الْكَلَامَ حُسْنًا وَفَى قَوْلِهِ تَتَّبَعُهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ تَحْسِينَ هَذِهِ الْوُجُوهِ لِلْكَلَامِ عَرْضِيٌّ خَارِجٌ عَنِ حُدِّ الْبَلَاغَةِ وَالْإِلَى أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهِ إِنَّمَا تُعَدُّ مُحَسِّنَةً بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِبَلَاغَةِ الْكَلَامِ دُونَ الْمُتَكَلِّمِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُجَعَلُ الْمُتَكَلِّمُ مُتَّصِفًا بِصِفَةٍ -

অনুবাদ : বালাগাতে কালামের সাথে ফাসাহাত এবং মুতাবাকাত ছাড়া আরো কতক বিষয় যুক্ত হয়, যা কালাম বা কথাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। লেখকের *تَتَّبَعُهَا*-এর মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাক্যের সৌন্দর্যের এ সকল বিষয় সত্তাগত নয়। (এগুলো) বালাগাতের সংজ্ঞার বাইরে এবং এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এ সকল বিষয়কে সৌন্দর্য বর্ধনকারী হিসেবে গণ্য করা হয় ফাসাহাত ও মুতাবাকাতের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার পর। (লেখক) এ সকল বিষয়কে বালাগাতে কালামের অনুগামী করেছেন, মুতাকাল্লিম বা বক্তার গুণাবলির মধ্যে গণ্য করেননি। কেননা, এগুলো তো এমন নয় যে, বক্তাকে এগুলো দ্বারা ভূষিত করা যায়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَتَتَّبَعُهَا أَى بَلَاغَةِ الْكَلَامِ الخ : এ ইবারত দ্বারা লেখক ইলমে বদী'-এর *مُحَسِّنَات* বা সৌন্দর্যদানকারী বিষয়গুলোর আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, ফাসাহাত এবং বালাগাত দ্বারা যেমন বক্তার কথার সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তেমনি ইলমে বদী'-এর *مُحَسِّنَات* দ্বারাও কথার মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। অতএব, *مُحَسِّنَات*-এর আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে। তবে ফাসাহাত বালাগাতের সৌন্দর্য এবং *مُحَسِّنَات*-এর সৌন্দর্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে, তা হলো ফাসাহাত ও বালাগাতের সৌন্দর্য সত্তাগত, আর *مُحَسِّنَات*-এর সৌন্দর্য সত্তাগত নয়; বরং এগুলো সত্তাগত সৌন্দর্যের পরে যুক্ত হয়, তাই এগুলো বালাগাতের সংজ্ঞার বাইরে।

تَتَّبَع : এখানে মুসান্নিফ লেখকের *تَتَّبَعُهَا* বাক্যটির বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। *قَوْلُهُ وَفَى قَوْلِهِ تَتَّبَعُهَا إِشَارَةُ الخ* অর্থ- পিছু পিছু চলা, পদাঙ্ক অনুসরণ করা। উল্লেখ্য যে, যে জিনিস পিছনে পিছনে চলে বা অনুসরণ করে তা অগ্রগামী ব্যক্তির বা অনুসরণীয় ব্যক্তি বা বস্তুর সত্তা হয় না; বরং সত্তা থেকে ভিন্ন হয়। অতএব, *تَتَّبَعُهَا* শব্দের মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, বালাগাতে কালামের পেছনে যে বিষয়গুলো যুক্ত হয় সেগুলো বালাগাতে কালামের সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হয় এবং বালাগাত কালামের সংজ্ঞার বাইরের বলে গণ্য হয়।

এ ছাড়া *تَتَّبَعُهَا*-এর মধ্যে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফাসাহাত ও মুতাবাকাত তথা বালাগাত হাসিল হওয়ার পর এগুলো ধর্তব্য হয়, অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে প্রথমত বালাগাত থাকতে হবে, তারপর এতে ইলমে বদী'-এর সৌন্দর্যদানকারী বিষয়গুলোর অনুপ্রবেশ ঘটবে।

قَوْلُهُ وَجَعَلَهَا تَابِعَةً : এ কথার দ্বারা মুসান্নিফ একটি কারণ দর্শাচ্ছেন। কারণটি হলো লেখক ইলমে বদী'-এর বিষয়গুলোকে শুধুমাত্র বালাগাতে কালামের *تَابِع* বা অনুগামী কেন করলেন? এবং বালাগাতে কালামের সাথে মুতাকাল্লিমের অনুগামী কেন করলেন না? এর কারণ হলো, ইলমে বদী'-এর *مُحَسِّنَات* পরিভাষায় কালামের সিফাত হয়। মুতাকাল্লিম

এগুলো দ্বারা ভূষিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি যদি তার কথার মধ্যে تَطْبِيقٌ، تَجْنِيسٌ ইত্যাদি এগুলোকে ব্যবহার করে, তাহলে তার কথাকে যথাক্রমে كَلَامٌ مُطَبَّقٌ، كَلَامٌ مُجَنَّنٌ বলা হয়; কিন্তু এসব صنعت-কে মুতাকাল্লিম-এর সিফাত হিসেবে ব্যবহার করে مَتَكَلِّمٌ مُجَنَّنٌ وَمُطَبَّقٌ وَمُرَّصَعٌ বলা যায় না। অতএব, যেহেতু বালাগাতশাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় مُحَسَّنَاتٌ মুতাকাল্লিমের সিফাতরূপে ব্যবহার করার রীতি নেই, তাই এগুলোকে মুসান্নিফ মুতাকাল্লিমের সিফাত হিসেবে দেখাননি; বরং (বালাগাতের ব্যবহার অনুযায়ী) কালামের সিফাতরূপে দেখিয়েছেন। তা ছাড়া এভাবেও বলা যায় যে, এসব صنعت কেবল কালামের জন্য مُحَسِّنَةٌ বা সৌন্দর্য দানকারী, মুতাকাল্লিমের مُحَسِّنَةٌ নয়। এ কারণে মুসান্নিফ (র.) এগুলোকে মুতাকাল্লিমের সিফাত বলে ব্যক্ত করেননি।

এখানে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বালাগাতের ক্ষেত্রে তো মুতাকাল্লিমকে বালাগাত দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে مَتَكَلِّمٌ بَلِيجٌ এর কারণ এই ছিল যে, মুতাকাল্লিম বা বক্তার দ্বারা অর্থাৎ তার যোগ্যতা দ্বারা বালাগাত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। অতএব, সেই কারণ তো এখানেও পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ মুতাকাল্লিম দ্বারা ইলমে বদী'-এর تَرْصِيعٌ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা পায়। অতএব, এখানেও এগুলো বক্তার সিফাত বলা সমীচীন ছিল। এর উত্তর ইতঃপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, পরিভাষায় এমন ব্যবহার পাওয়া যায় না, যদিও যুক্তির দাবি এমনই ব্যবহার হওয়ার ছিল। যেমন-فَصِيحٌ أَوْ بَلِيجٌ যথা-

অনুবাদ : আর বালাগাতে মুতাকাল্লিম হলো এমন এক যোগ্যতা যার সাহায্যে বক্তা বালাগাতপূর্ণ কথা

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ كَلَامًا كَانَ أَوْ مُتَكَلِّمًا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْخ
 হলো- بَلِيغ শব্দটি كَلَامٌ بَلِيغٌ এবং مُتَكَلِّمٌ بَلِيغٌ-এর মাঝে لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ অর্থাৎ একটি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে।
 তবে প্রত্যেকটি অর্থ বুঝানোর জন্য শব্দটিকে আলাদা করে প্রয়োগ করতে হয়। এক প্রয়োগে একাধিক অর্থ বুঝায় না। কিন্তু
 মুসান্নিফ তা এখানে এক প্রয়োগে একাধিক অর্থ (كَلَامٌ بَلِيغٌ وَمُتَكَلِّمٌ بَلِيغٌ) উদ্দেশ্য করলেন, তবে তিনি তা কিভাবে
 করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই ইবারত বলছেন عَلَى اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْخ, উত্তরটিকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের
 مُشْتَرَكٌ সম্পর্কে বিশদ ধারণা থাকতে হবে তাই প্রথমে জেনে রাখা দরকার مُشْتَرَكٌ দু'ধরনের-

১. **إِشْتِرَاكَ لَفْظِي** ২. **إِشْتِرَاكَ مَعْنَوِي**
 সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, **إِشْتِرَاكَ لَفْظِي** একটা শব্দের একাধিক অর্থ থাকা। তবে শব্দটি এক প্রয়োগে একাধিক অর্থ বুঝাতে পারে না। প্রতিটি অর্থ বুঝানোর জন্য ভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে

হয়। যেমন- عَيْن শব্দের অর্থ চোখ এবং ঝরনা। অর্থাৎ عَيْن শব্দটি চোখ এবং ঝরনার অর্থের মধ্যে مُشْتَرَك কিছু عَيْن বলে এক সাথে দুটো অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না; বরং দু'টি অর্থের জন্য দুবার আলাদা প্রয়োগ করতে হবে।

اِشْتَرَاكَ مَعْنَوِي : اِشْتَرَاكَ مَعْنَوِي বলা হয় একটি শব্দের এমন একটি كَلِمَة বা সার্বিক অর্থ হওয়া, যার অধীনে একাধিক فرد রয়েছে। যেমন- اِنْسَان শব্দের অর্থ حَيَوَان نَاطِق, এর অধীনে অনেক সদস্য রয়েছে যার প্রত্যেকটিকে اِنْسَان বলা হয়। সুতরাং اِنْسَان শব্দটি এসবগুলো সদস্যের ক্ষেত্রে مَعْنَوِي উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা প্রশ্নের উত্তরের দিকে ফিরে আসছি। মুসান্নিফ (র.) বলেন, بَلِيغ শব্দটি مُتَكَلِّمٌ بَلِيغ-এর ক্ষেত্রে مُشْتَرَك লفظি আর এখানে بَلِيغ শব্দটি ব্যবহার করে এক সাথে দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, কারো কারো মতে مُشْتَرَك لَفْظِي-এর একাধিক অর্থ এক প্রয়োগে উদ্দেশ্য হতে পারে। যদিও অনেকের মতে এটি সঠিক নয়, যারা মনে করেন এটি সঠিক নয় তাদের জন্য মুসান্নিফের উত্তর হলো بَلِيغ শব্দটি مُشْتَرَك مَعْنَوِي অর্থাৎ بَلِيغ দ্বারা এখানে اَلْبَلِيغ كُلُّ مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ اَلْبَلِيغ উদ্দেশ্য। আর اَلْبَلِيغ كُلُّ مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ لَفْظُ اَلْبَلِيغ হলো একটি كَلِمَة مُفْهُوم বা সার্বিক অর্থ, যার অধীনে দু'টি فرد রয়েছে। আমরা জানি, مُشْتَرَك مَعْنَوِي-এর প্রত্যেক অর্থ এক সাথে উদ্দেশ্য হতে পারে।

লেখক বলেন, প্রত্যেক بَلِيغ অবশ্যই فَصِيح হবে। কারণ, সর্বাবস্থায় বালাগাতের সংজ্ঞার মধ্যে ফাসাহাত শর্ত অর্থাৎ বালাগাতে কালাম হলেও ফাসাহাত শর্ত, এমনিভাবে বালাগাতে মুতাকাল্লিম হলেও তা শর্ত। বালাগাতে কালামের জন্য ফাসাহাতের শর্ত স্পষ্ট এবং মাধ্যম ছাড়া বা সরাসরি। আর বালাগাতে মুতাকাল্লিমের ক্ষেত্রে বালাগাতে কালামের মাধ্যমে ফাসাহাতকে শর্ত করা হয়েছে। কেননা, বালাগাতে মুতাকাল্লিমের মধ্যে বলা হয়েছে اَلْمَلِكَةُ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى تَالِيفِ كَلَامٍ بَلِيغ আর اَلْمَلِكَةُ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى تَالِيفِ كَلَامٍ হওয়ার জন্য ফাসাহাত শর্ত।

মোটকথা, প্রত্যেক بَلِيغ অবশ্যই فَصِيح হবে; কিন্তু তার বিপরীত হবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক فَصِيح বালীগ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। কেননা, এমনও হতে পারে যে, একটি বাক্য ফসীহ হলো অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্যে ক্ষতিকর কিছু তাতে নেই; কিন্তু বাক্যটি মুকতাবায়ে হালের বিপরীত হলো। এমতাবস্থায় বাক্যটি ফসীহ হলেও বালীগ হয়নি। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির বিশুদ্ধ কথা বলার যোগ্যতা আছে; কিন্তু তার কথা মুকতাবায়ে হালের অনুযায়ী হয় না বা সে মুকতাবায়ে হালের অনুযায়ী বক্তব্য দানে সক্ষম নয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে مُتَكَلِّمٌ فَصِيح বলা হবে; কিন্তু مُتَكَلِّمٌ بَلِيغ বলা যাবে না।

اَلْمَعْنَى اَلْغَوِي وَلَا عَكْس : এখানে মুসান্নিফ (র.) عَكْس বলায় পরের عَكْس বা তর্কশাস্ত্রবিদদের عَكْس উদ্দেশ্য নয়। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে عَكْس দ্বারা পরিভাষাগত عَكْس বা তর্কশাস্ত্রবিদদের পরিভাষা অনুসারে كُلُّ بَلِيغٍ فَصِيح হলেও عَكْس হলেও عَكْس অর্থাৎ مَوْجِبُهُ جَزِيه অর্থাৎ بَعْضُ لَيْسَ بَعْضُ فَصِيحٍ بَلِيغًا অর্থাৎ عَكْس-এর অর্থ হলো لَا عَكْس-এর অর্থ হলো فَصِيحٍ فَصِيحٍ অর্থাৎ কতক ফসীহ বালীগ হয়ে থাকে। আর فَصِيحٍ فَصِيحٍ অর্থাৎ কতক ফসীহ বালীগ নয়। তার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, আরো কতক ফসীহ অবশ্যই বালীগ। অথচ এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, কোনো ফসীহ-এর বালীগ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। আর যদি আভিধানিক عَكْس উদ্দেশ্য হয়, যেমনটি মুসান্নিফ বলেছেন, তাহলে مَوْجِبُهُ كَلِمَة-এর আকস مَوْجِبُهُ كَلِمَة-ই আসে। সুতরাং لَا عَكْس-এর অর্থ হবে فَصِيحٍ فَصِيحٍ অর্থাৎ প্রত্যেক ফসীহ বালীগ হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। এই অর্থই সঠিক এবং এ স্থানে এটাই উদ্দেশ্য।

সার-সংক্ষেপ :

ক. اَلْبَلَاغَةُ فِي اَلْمُتَكَلِّمِ : কোনো মুতাকাল্লিমের মাঝে যখন মনের ভাব ও উদ্দিষ্ট বিষয় كَلَامٌ بَلِيغ (বালাগাতপূর্ণ বাক্য) দ্বারা ব্যক্ত করার স্বভাবগত যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, তখন তাকে مُتَكَلِّمٌ بَلِيغ বলা হবে।

খ. بَلِيغ শব্দ বাক্য ও বক্তা উভয়ের বিশেষণ হতে পারে। অতএব, যখন বলা হবে كُلُّ بَلِيغٍ তখন এর দ্বারা বক্তা ও বাক্য উভয়কে উদ্দেশ্য করা যাবে। কেননা, কারো কারো মতে لَفْظُ مُشْتَرَك দ্বারা একাধিক বিষয় একসাথে উদ্দেশ্য করা যায়। অথবা এভাবে উদ্দেশ্য করা হবে যে, بَلِيغ শব্দটি একটি كَلِمَة (কুল্লী), যার দু'টি فرد রয়েছে- ১. কালাম, ২. মুতাকাল্লিম। অথবা বক্তা যখনই بَلِيغ হবে তখন সে فَصِيح অবশ্যই হবে; কিন্তু فَصِيح হলেই বَلِيغ হবে এমনটি নয়।

وَعُلِمَ أَيضًا أَنَّ الْبَلَاغَةَ فِي الْكَلَامِ مَرْجِعُهَا إِلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَحْصُلَ حَتَّى يُمْكِنَ حُصُولُهَا كَمَا يَقَالُ مَرْجِعُ الْجُودِ إِلَى الْغِنَى إِلَى الْإِخْتِرَازِ عَنِ الْخَطِإِ فِي تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَالْأَلَرِّمَا أَدَّى الْمَعْنَى الْمُرَادَ بِلَفْظٍ غَيْرِ مُطَابِقٍ لِمُقْتَضَى الْحَالِ فَلَا يَكُونُ بَلِيغًا وَالْإِ تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ عَنْ غَيْرِهِ وَالْأَلَرِّمَا أَوْرَدَ الْكَلَامَ الْمُطَابِقَ لِمُقْتَضَى الْحَالِ غَيْرَ فَصِيحٍ فَلَا يَكُونُ بَلِيغًا لَوْجُوبِ الْفَصَاحَةِ فِي الْبَلَاغَةِ وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ تَمْيِيزُ الْكَلِمَاتِ الْفَصِيحَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِتَوْقُفِهِ عَلَيْهَا -

অনুবাদ : আর এ কথাও জানা গেল যে, বালাগাতে কালামের উৎস হলো অর্থাৎ যা শিক্ষা করা অত্যাৱশ্যকীয়, যাতে বালাগাতে কালাম অর্জন করা সম্ভব হয়। যেমন বলা হয়, বদান্যতার উৎস হলো ধনাঢ্যতা। (বালাগাতে কালামের প্রথম উৎস হলো) কাজীকৃত অর্থ আদায়ে ভুল থেকে বেঁচে থাকা। অন্যথায় সে কখনো তার উদ্দিষ্ট অর্থ এমন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করবে, যা মুকতায়্যে হালের অনুযায়ী হয় না। ফলে তা বালাগাতপূর্ণ হবে না।

(আর দ্বিতীয় উৎস হলো) ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা। অন্যথায় সে ফাসাহাতবিহীন মুকতায়্যে হালের অনুযায়ী বাক্য পেশ করে দিবে, ফলে তাও বালীগ হবে না। কেননা, বালাগাতের জন্য ফাসাহাত অত্যাৱশ্যকীয়। ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করার শর্তের মধ্যে ফাসাহাতপূর্ণ শব্দসমূহকে ফাসাহাতবিহীন শব্দসমূহ থেকে পৃথক করার কথাটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, কালাম বা বাক্য শব্দসমূহের উপর নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَعُلِمَ أَيضًا أَنَّ الْبَلَاغَةَ : উল্লিখিত ইবারতে বালাগাতের উৎস বা বালাগাত কোন কোন জিনিসের উপর নির্ভরশীল, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক বলেন, ফাসাহাত এবং বালাগাতের উৎস অর্থাৎ যার উপর বালাগাত নির্ভরশীল এবং যা হাসিল করলে বালাগাত হাসিল করা সম্ভব তা হলো মোটামুটিভাবে দু'টো।

মুসান্নিফ (র.) مَرْجِعُ শব্দের বা উৎসের ব্যবহার দেখাচ্ছেন এভাবে যেমন- اَلْمَرْجِعُ اِلَى الْغِنَى অর্থাৎ দানশীলতার উৎস ধনাঢ্যতা।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) এখানে শুধুমাত্র বালাগাতের উৎস বলেছেন, বালাগাত এবং ফাসাহাতের উৎস বলেননি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বালাগাতের উৎস বলে যে দু'টি বিষয়কে পেশ করেছেন, এর একটি হলো বালাগাতের উৎস আরেকটি ফাসাহাতের উৎস ফাসাহাতের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ না করার কারণ হলো, বালাগাতের জন্য ফাসাহাত শর্ত এবং বালাগাত পাওয়ার জন্য ফাসাহাতের উপস্থিতি জরুরি। তাই বলা যায় যে, বালাগাত বলার দ্বারা ফাসাহাত-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

মোটকথা, বালাগাতের উৎস দু'টি- ১. উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচা। ২. ঐ সকল কারণ থেকে বাঁচা যা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর। এমন কারণ সাতটি- ১. تَنَافَرُ حُرُوفٍ ২. غَرَابَتٌ ৩. مَخَالَفَةُ قِيَاسٍ لِقَوِيٍّ ৪. تَنَافَرُ كَلِمَاتٍ ৫. تَعْقِيدٌ مَعْنَوِيٍّ ৬. تَعْقِيدٌ لَفْظِيٍّ ৭. ضَعْفٌ تَأْلِيفٍ ৮. ضَعْفٌ تَأْلِيفٍ

مُخِلٌّ بِالنَّفْصَةِ থেকে বেঁচে থাকাকে লেখক এক কথায় এভাবে বলেছেন, ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতবিহীন বাক্য থেকে পৃথক করা। অতএব, যখন এ সাতটি বিষয়ের কোনো একটি বাক্যে পাওয়া যাবে, তখন আর ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করার বিষয়টি পাওয়া গেল না। আবার যখন এ বিষয়টি পাওয়া গেল না, তখন

ফাসাহাতও পাওয়া যাবে না। আর ফাসাহাত না পাওয়া গেলে বালাগাত পাওয়া যাবে না। কেননা, বালাগাত পাওয়া যাওয়ার জন্য ফাসাহাত পাওয়া যাওয়া শর্ত।

প্রথম উৎস হলো-**الْمَرَادُ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْخَطِإِ فِي تَأْوِيلِ الْمَعْنَى الْمَرَادُ** অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচা। এর জন্য বাক্যকে মুকতায়্যে হালের অনুযায়ী ব্যবহার করা জরুরি। সুতরাং যদি কেউ মুকতায়্যে হালের অনুযায়ী বাক্য ব্যবহার না করে, তবে তার বাক্য **بَلِيغ** হবে না।

দ্বিতীয় উৎস হলো-**تَمَيِّزُ الْفَصِيحِ عَنْ غَيْرِهِ** অর্থাৎ ফাসাহাতপূর্ণ বাক্যকে ফাসাহাতমুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা। এর জন্য তাকে পূর্বে ফাসাহাতের ক্ষতিকারক সাতটি বিষয় থেকে মুক্ত থাকা জরুরি। সুতরাং যদি কারো বাক্য মুকতায়্যে হাল অনুযায়ী হলো; কিন্তু ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর কোনো একটি বা একাধিক বিষয় তাতে রয়ে গেল, তাতেও বাক্যটি বালাগাতপূর্ণ বা **بَلِيغ** হলো।

قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي تَمَيِّزِ الْكَلَامِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো- বালাগাতে কালামের মধ্যে ফাসাহাতবিহীন কালামকে বাদ দিতে হয় এবং শুধুমাত্র ফসীহ কালামকে নিতে হয়; কিন্তু বালাগাতে কালামের মধ্যে ফাসাহাতবিহীন শব্দসমূহের বাদ দেওয়ার কথা তো নেই? অথচ আমরা জানি, ফাসাহাতবিহীন শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটলে বালাগাতে কালামের ক্ষতি হয় এবং বালাগাতে কালামের সংজ্ঞার মধ্যেও শব্দসমূহের ফসীহ হওয়ার শর্ত রয়েছে।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, **يَدْخُلُ فِي تَمَيِّزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ**-এর অর্থ হলো ফসীহ বাক্যকে ফাসাহাতবিহীন বাক্য থেকে পৃথক করার মধ্যেই ফসীহ শব্দসমূহকে অফসীহ শব্দসমূহ থেকে পৃথক করার বিষয়টি নিহিত রয়েছে। কেননা, বাক্য বা কালামের ফাসাহাত শব্দসমূহের ফাসাহাতের উপর নির্ভরশীল। অতএব, কালাম তখনই ফাসাহাতযুক্ত হবে, যখন কালামের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো কালিমা ফাসাহাতযুক্ত হবে। তাই মুসান্নিফ (র.) শব্দসমূহের ফাসাহাতযুক্ত হওয়ার বিষয়টি আলাদা করে উল্লেখ করেননি।

সার-সংক্ষেপ :

বালাগাতের উৎস দু'টি- ১. উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে স্থান-কাল-পাত্রের বিপরীত কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

২. শুদ্ধ-সাবলীল বাক্য (**كَلَامٌ فَصِيحٌ**)-কে অশুদ্ধ-অসাবলীল বাক্য থেকে পৃথক করা।

وَالثَّانِي أَيْ تَمَيِّزُ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْهُ أَيْ بَعْضُهُ مَا يُبَيِّنُ أَيْ يَوْضِعُ فِي عِلْمٍ مَتْنِ اللَّغَةِ كَالْغَرَابَةِ وَإِنَّمَا قَالَ مَتْنِ اللَّغَةِ أَيْ مَعْرِفَةَ أَوْضَاعِ الْمُفْرَدَاتِ لِأَنَّ اللَّغَةَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي بِهِ يُعَرَّفُ تَمَيِّزُ السَّالِمِ مِنَ الْغَرَابَةِ عَنْ غَيْرِهِ بِمَعْنَى أَنَّ مَنْ تَتَبَعَ الْكُتُبَ الْمُتَدَاوِلَةَ وَاحْتَاطَ بِمَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ الْمَانُوسَةِ عُلِمَ أَنَّ مَا عَدَاهَا عَمَّا يَفْتَقِرُ إِلَى تَنْقِيرٍ أَوْ تَخْرِيجٍ فَهُوَ غَيْرُ سَالِمٍ مِنَ الْغَرَابَةِ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَيْسَ فِي عِلْمٍ مَتْنِ اللَّغَةِ أَنَّ بَعْضَ الْأَلْفَاظِ يَحْتَاجُ فِي مَعْرِفَتِهِ إِلَى أَنْ يُبْحَثَ عَنْهُ فِي الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ فِي اللَّغَةِ أَوْ فِي عِلْمِ التَّصْرِيفِ كَمُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ إِذْ بِهِ يُعَرَّفُ أَنَّ الْأَجَلَّ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ دُونَ الْأَجَلِّ أَوْ فِي عِلْمِ التَّخْوِ كَضَعْفِ التَّالِيفِ وَالتَّعْقِيدِ اللَّفْظِيِّ أَوْ يُذَرَكُ بِالْحِسِّ كَالْتَّنَافِرِ إِذْ بِهِ يُعَرَّفُ أَنَّ الْمُسْتَشْزَرَ مُتَنَافِرٌ دُونَ مُرْتَفِعٍ وَكَذَا تَنَافَرُ الْكَلِمَاتِ -

অনুবাদ : এবং দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা, এর থেকে অর্থাৎ এর কতকগুলো (এমন যে, এগুলোকে) ইলমে মতনে লুগাত (অভিধানশাস্ত্র)-এ আলোচনা করা হয়। যেমন- গারাবাত লেখক (ইলমে লুগাত না বলে) ইলমে মাতনে লুগাত অর্থাৎ অর্থবোধক একক শব্দসমূহ জানা বলেছেন। কেননা, ইলমে লুগাত এর থেকে ব্যাপকতর। অর্থাৎ এর দ্বারা জানা যায় গারাবাতমুক্ত শব্দকে গারাবাতযুক্ত থেকে পৃথক করার প্রক্রিয়া। এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি প্রচলিত-প্রসিদ্ধ (অভিধান) গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করল এবং প্রচলিত ব্যবহৃত শব্দসমূহ জানল, তার একথা জানা হয়ে যাবে যে এ ছাড়া যা রয়েছে তা (এমন যে, এগুলো) জানার জন্য (ব্যাপক) অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রয়োজন হবে এবং সেগুলো গারাবাতমুক্ত নয়। এর দ্বারা এ ব্যাপারে যে (ভিন্ন) মত বর্ণিত আছে তার ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়ে গেল, অর্থাৎ ইলমে মতনে লুগাতের মধ্যে এমন কতক শব্দ নেই, যা জানার জন্য অভিধানের বড় বড় বই অনুসন্ধান করতে হয়, অথবা ইলমে তাসরীফে (বা শব্দপ্রকরণ সংক্রান্ত জ্ঞানে) আলোচনা করা হয়। যেমন- মুখালাফাতে কিয়াস। এ ইলম দ্বারা জানা যায় أَجَلُّ শব্দটি নিয়ম বহির্ভূত; কিন্তু أَجَلٌ শব্দটি নয়। অথবা ইলমে নাহ বা ব্যাকরণশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। যেমন- ضَعْفُ التَّالِيفِ এবং تَعْقِيدُ لَفْظِي অথবা অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায়, যেমন- তানাহুর। কেননা, (অনুভূতি) এর দ্বারা জানা যায় যে, مُسْتَشْزَرُ শব্দটি তানাহুরযুক্ত; কিন্তু مُرْتَفِعُ নয়, এমনভাবে (অনুভূতি দ্বারা) শব্দসমূহের তানাহুর জানা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ تَمَيِّزُ الْفَصِيحِ : ইতঃপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে, বালাগাতের উৎস দু'টি বিষয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, ফসীহবাক্য অফসীহবাক্য থেকে পৃথক করা। অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহকে জানা। এগুলো জানলেই ফসীহ এবং ফাসাহাতবিহীন বাক্যসমূহের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জন হবে। এখানে লেখক সংক্ষেপে ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়সমূহের কোনটি কিভাবে জানা যাবে তার আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, গারাবাত জানা যাবে অভিধানশাস্ত্রে। মুখালফাতে কিয়াস ইলমে সরফে যু'ফে তালীফ এবং তা'কীদে লফযী জানা যাবে ইলমে নাহতে এবং অনুভূতির দ্বারা তানাহুর জানা যাবে।

بَعْضُهُ আর **مِنْهُ** দ্বারা উদ্দেশ্য **تَمَيِّزُ الْفَصِيحِ** হলো **مَرْجِعُ** এর সর্বনামের **مِنْهُ** : **وَمِنْهُ** অর্থাৎ **يَوْضِعُ** দ্বারা উদ্দেশ্য **يُبَيِّنُ** দ্বারা উদ্দেশ্য **يَوْضِعُ** অর্থাৎ স্পষ্ট করে বলা বা আলোচনা করা।

عِلْمُ اللَّغَةِ : এর দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো লেখক عِلْمُ اللَّغَةِ না বলে عِلْمُ مَتْنِ اللَّغَةِ কেন বললেন? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, عِلْمُ اللَّغَةِ শব্দটি عِلْمُ থেকে ব্যাপক। কেননা, عِلْمُ اللَّغَةِ বললে এর মধ্যে বারোটি ইলম শামিল হয়ে যায়। এক কবি তার কবিতায় এ বারোটি ইলমকে শামিল করেছেন—

لُغَاتُ الْمَعَانِي نَحْوُ صَرْفٍ اِشْتِقَاقِهِمْ * بَيَانُ قَوَائِفٍ قُلْ عَرُوضٌ وَقَرُصُهُمْ
اِنْشَاءً وَتَارِيخٌ وَخَطٌّ وَاسْقَاطٌ * بَدِيعًا وَوَضْعًا فُرِزَتْ بِالْعِلْمِ بَعْدَهُمْ

অর্থাৎ ইলমে লুগাত বলা হলে নিম্নে বর্ণিত বারটি ইলমকে বুঝায় যথা—

১. নাহ, ২. সরফ, ৩. اِشْتِقَاقٌ, ৪. বয়ান, ৫. শব্দার্থ বা অভিধান, ৬. عَرُوض, ৭. قَرُص, ৮. تَارِيخ বা ইতিহাস ৯. خَط, ১০. ইনশা, ১১. قَوَائِف বা কবিতার অন্তঃমিল সংক্রান্ত জ্ঞান ও ১২. ইলমে বদী'। কিন্তু যদি বলা হয় عِلْمُ اللَّغَةِ তাহলে শুধুমাত্র শব্দ অর্থ এবং অর্থসংক্রান্ত জ্ঞানকে বুঝাবে। عِلْمُ শব্দের অর্থ পিঠ। এখানে مَتْن অর্থ أَصْل সূতরাং أَصْلُ اللَّغَةِ অর্থ— শুধুমাত্র অভিধান সংক্রান্ত জ্ঞান।

عِلْمُ : এ বাক্যে عِلْم শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে مَعْرِفَةً দ্বারা। তবে জেনে রাখা দরকার عِلْم শব্দটি যেমন—مَعْرِفَةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি عِلْم অর্থ مَسَائِل বা বিধানসমূহ। ইলম অর্থ مَلَكَةٌ বা যোগ্যতা। মুসান্নিফ যদি عِلْم-এর অর্থ এখানে مَسَائِل বলতেন, তাহলে উত্তম হতো। পুরো বাক্যটি এমন হতো—وَمِنْهُ مَا أَوْضَاعُ الْيَبِينِ فِي مَسَائِلِ أَوْضَاعِ الْمَفْرَدَاتِ الْخ-এর মধ্যে عِلْمُ اللَّغَةِ-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

عِلْمُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ একটি সন্দেহের খণ্ডন করেছেন। সন্দেহটি হলো يُبَيِّنُ لَكُمْ : এ বাক্য দ্বারা বাহ্যত মনে হয় যে, عِلْمُ مَتْنِ اللَّغَةِ-এর মধ্যে গারাবাতযুক্ত শব্দগুলোর আলোচনা করা হয়েছে; অথচ এই ইলমে এ জাতীয় শব্দ মোটেও নেই। এর খণ্ডন করতে গিয়ে মুসান্নিফ বলেন, يُبَيِّنُ فِي عِلْمِ مَتْنِ اللَّغَةِ : এটা দ্বারা লেখকের মোটেও উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এ ইলমের মধ্যে غَرَابَات-এর আলোচনা থাকবে; বরং উদ্দেশ্য হলো এ ইলমের সাহায্যে এ কথা জানা যাবে যে, কোন শব্দটি গারাবাতযুক্ত এবং কোন শব্দটি ফসীহ। এটা এভাবে হবে যে, যে ব্যক্তি অভিধানের বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি যথা কামুস, আসাস, মিসবাহ ও মুখতাসার ইত্যাদি কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে এবং ব্যবহৃত শব্দের ভাণ্ডার আয়ত্ত করবে, সে বুঝতে পারবে উপরোক্ত বিশিষ্ট গ্রন্থাবলির মধ্যে যে সকল শব্দাবলি নেই এবং এগুলো জানতে হলে বিশেষ তত্ত্ব-তালাশের প্রয়োজন। যেমন—اِفْرَنْقَعُوا، تَكَاكُنْتُ ইত্যাদি। এগুলো গারাবাতযুক্ত নয়।

اِنَّ مَنْ تَتَبَعَ الْكُتُبَ الْمُتَدَاوِلَةَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা একটি আপত্তির জবাব হয়ে গেছে, যা আল্লামা যাওয়ানীর পক্ষ থেকে মুসান্নিফের উপর করা হয়েছিল। আপত্তি সৃষ্টি হয়েছিল লেখকের বাহ্যিক বক্তব্যের উপর। কেননা, লেখকের বক্তব্য عِلْمُ مَتْنِ اللَّغَةِ كَالْغَرَابَةِ দ্বারা বুঝা যায় যে, অভিধানগ্রন্থগুলোর মধ্যে কতক গারাবাতযুক্ত শব্দসমূহ রয়েছে এবং সেগুলোকে জানার জন্য সুবিশাল অভিধানগ্রন্থসমূহে তত্ত্ব-তালাশের প্রয়োজন, অথচ বড় বড় অভিধানগ্রন্থগুলোতে গারাবাতের শব্দসমূহ নেই। তাহলে লেখকের কথা কি ভুল? এর উত্তর আমরা পিছনে বর্ণনা করেছি যে, লেখকের বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য সেটা নয় যা আল্লামা যাওয়ানী বুঝেছেন বা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়।

عِلْمُ : মূল লেখক বলেন, ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির কতগুলোর আলোচনা ইলমে সরফের মধ্যে করা হয়েছে। যেমন— মুখালাফাতে কিয়াস। কেননা, কোনো ব্যক্তির ইলমে সরফ জানা থাকলে সে বুঝতে পারে কোনটি কিয়াস মোতাবেক, আর কোনটি কিয়াসের বা নিয়মের ব্যতিক্রম। ইলমে সরফ জানা থাকলে সে বুঝতে পারে أَجَلٌ শব্দটি নিয়মের বিপরীত ব্যবহার হয়েছে; কিন্তু أَجَلٌ শব্দটি নিয়ম মোতাবেক ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ فِي عِلْمِ التَّحْرِ : মূল লেখক বলেন, ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির কতগুলোর আলোচনা ইলমে নাহতে করা হয়। যেমন- تَعْقِيدُ لَفْظٍ এবং ضَعْفُ التَّالِيفِ অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইলমে নাহ বা আরবি ব্যাকরণ জানা আছে, সে বুঝতে পারবে যে, কোন বাক্যটি নাহর প্রসিদ্ধ নিয়মের অনুযায়ী হয়েছে, আর কোনটি নাহ প্রসিদ্ধ নিয়মের বিরুদ্ধ তথা ضَعْفُ التَّالِيفِ বা تَعْقِيدُ لَفْظٍ হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ يَذْرُكُ بِالْحِسِّ كَالْتَّنَائِرِ : ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদির কোনোটি অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায়। যেমন- তানাহুর। কেননা, অনুভূতির সাহায্যে একটি লোক বলে দিতে পারে যে, مُسْتَشْزِرُ শব্দটি তানাহুরযুক্ত; কিন্তু مُرْتَفَعُ শব্দটি তানাহুরযুক্ত নয়। এমনি তানাহুরে কালিমাত বা একাধিক শব্দের মিলনে যে তানাহুর সৃষ্টি হয় তাও অনুভূতি ও বিশুদ্ধ রুচির সাহায্যে বুঝা যায়। যেমন- لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ বাক্যটি শোনা মাত্র অনুভূতি বলে দিবে বাক্যটিতে তানাহুরে কালিমাত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. বালাগাতের দ্বিতীয় উৎস তথা ক্রটিপূর্ণ শব্দ ও বাক্য পরিহার করার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে মৌলিকভাবে কি কি বিষয় বাক্যকে ক্রটিপূর্ণ করে।

৫. تَنَافُرُ كَلِمَاتٍ ৪. مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ لَغَوِيٍّ ৩. غَرَابَةٌ ২. تَنَافُرُ حُرُوفٍ ১. সাতটি বিষয় বাক্যকে ক্রটিপূর্ণ করে- ১. تَعْقِيدُ مَعْنَوِيٍّ ৯. تَعْقِيدُ لَفْظِيٍّ ৬. ضَعْفُ تَالِيفٍ

খ. প্রকাশ থাকে যে, ১. সাহিত্য ও বালাগাতের মননের সাহায্যে তানাহুর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। ২. অভিধানশাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা غَرَابَةٌ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ৩. مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ لَغَوِيٍّ থেকে বাঁচার জন্য ইলমুস সরফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। ৪. ضَعْفُ التَّالِيفِ وَتَعْقِيدُ لَفْظِيٍّ এ দুটি বিষয়কে ইলমে নাহর সাহায্যে পরিহার করা সম্ভব।

وَهُوَ أَيْ مَا يُبَيِّنُ فِي الْعُلُومِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ يُدْرِكُ بِالْحِسِّ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى مَا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَائِدٌ إِلَى مَا يُدْرِكُ بِالْحِسِّ فَقَدْ سَهَا سَهْوًا ظَاهِرًا مَا عَدَا التَّعْقِيدَ الْمَعْنَوِيَّ إِذْ لَا يُعْرِفُ بِتِلْكَ الْعُلُومِ وَلَا بِالْحِسِّ تَمَيُّزَ السَّالِمِ مِنَ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ عَنْ غَيْرِهِ فَعِلِمَ أَنَّ مَرْجِعَ الْبَلَاغَةِ بَعْضُهُ مُبَيِّنٌ فِي الْعُلُومِ الْمَذْكُورَةِ وَبَعْضُهُ مُدْرِكٌ بِالْحِسِّ وَبَقِيَ الْإِحْتِرَازُ عَنِ الْخَطَأِ فِي تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ وَالْإِحْتِرَازُ عَنِ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى عِلْمَيْنِ مُفِيدَيْنِ لِذَلِكَ فَوَضَعُوا عِلْمَ الْمَعْنَى لِلْأَوَّلِ وَعِلْمَ الْبَيَانِ لِلثَّانِي وَالْيَهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يَخْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْأَوَّلِ أَيْ الْخَطَأِ فِي تَأْدِيَةِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ عِلْمَ الْمَعْنَى وَمَا يَخْتَرِزُ بِهِ عَنِ التَّعْقِيدِ الْمَعْنَوِيِّ عِلْمَ الْبَيَانِ وَسَمَوْا هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ عِلْمَ الْبَلَاغَةِ لِمَكَانِ مَزِيدِ اخْتِصَاصٍ لَهُمَا بِالْبَلَاغَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْبَلَاغَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْعُلُومِ -

অনুবাদ : আর যা অর্থাৎ যা কিছু উল্লিখিত জ্ঞানসমূহে আলোচনা করা হয়, অথবা অনুভূতি দ্বারা জানা যায়। সুতরাং সর্বনাম مَا-এর দিকে ফিরেছে। আর যারা ধারণা করে সর্বনাম بِالْحِسِّ -এর দিকে ফিরেছে তারা স্পষ্টভাবে ভুল করেছে। তবে تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ ছাড়া। কেননা, উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ এবং অনুভূতি দ্বারা تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ থেকে মুক্ত বাক্যটিকে تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ যুক্ত বাক্য থেকে পৃথক করা যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, বালাগাতের কতিপয় উৎস বিবৃত হয়েছে উল্লিখিত জ্ঞানসমূহে আর কতকগুলো অনুভব করা যায় অনুভূতি দ্বারা। আর রয়ে গেল উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বিরত থাকা এবং تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ থেকে বেঁচে থাকার বিষয়টি। ফলে এমন দু'টি জ্ঞানের প্রয়োজন দেখা দিল যা উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের জন্য উপকারী। সুতরাং জ্ঞানীজন প্রথমটির জন্য ইলমে মা'আনী এবং দ্বিতীয়টির জন্য ইলমে বয়ানকে সংকলন বা আবিষ্কার করলেন, এ কথার প্রতি লেখক তার (সামনের) বক্তব্য দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। আর যে জ্ঞান দ্বারা প্রথম প্রকার অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বিরত থাকা যায়, তা হলো ইলমে মা'আনী। আর যে জ্ঞান দ্বারা تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ থেকে বিরত থাকা যায়, তা হলো ইলমে বয়ান। বালাগাত বিশারদগণ এ দু'টি ইলমকে ইলমে বালাগাত করে নাম রেখেছেন। কেননা, এ দু'টি ইলমের সাথে বালাগাতের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও বালাগাত এ দু'টি ছাড়া আরো অন্যান্য ইলমের উপরও নির্ভরশীল।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا يُبَيِّنُ النِّج : ইতঃপূর্বে বালাগাতের দ্বিতীয় উৎস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর অবশিষ্টাংশ এখানে আলোচনা করা হলো, দ্বিতীয় উৎস অর্থাৎ ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর সাতটি বিষয় থেকে ছয় বিষয় নাহ, সরফ, অভিধানশাস্ত্র ও সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা জানা যায়। এখন রয়ে গেছে একটি বিষয় অর্থাৎ تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ এ বিষয়টি কিভাবে জানা যাবে? যার দ্বারা ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করা যাবে। এ নিয়ে উপরোক্ত ইবারতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে মুসান্নিফ লেখকের ইবারত تَعْقِيدَ الْمَعْنَوِيٍّ -এর هُوَ সর্বনামের مَرْجِعَ নিয়ে তাঁর মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন, هُوَ-এর مَرْجِعَ হলো فِي الْعُلُومِ -এর مَا (ইসমে মাওসূল) এ হিসেবে পুরো বাক্যের অর্থ হবে, উল্লিখিত ইলমসমূহে বর্ণিত বিষয় এবং অনুভূতি দ্বারা জানা বিষয়গুলো تَعْقِيدَ مَعْنَوِيٍّ ছাড়া।

قَوْلُهُ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَائِدٌ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ হُو সর্বনাম-এর مَرْجِع-এর ব্যাপারে কতিপয় লোকের একটি ভিন্নমতকে তুলে ধরে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, অনেকে ধারণা করেন, مَرْجِع সর্বনামের مَرْجِع হলো بِالْحَيِّس, মুসান্নিফ বলেন, তাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ, তাদের মতানুযায়ী বাক্যের অর্থ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। তখন বাক্যের অর্থ হবে, যা অনুভূতি দ্বারা জানা যায় তা تَعْقِيدُ مَعْنَوِي-এর বিপরীত। অর্থাৎ تَعْقِيدُ مَعْنَوِي ছাড়া আর যত ফাসাহাতের ক্ষতিকর বিষয়াদি আছে, সবই অনুভূতির সাহায্যে জানা যায়। কিন্তু এ কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। কারণ, تَعْقِيدُ مَعْنَوِي ছাড়া ছয়টির একটি অর্থাৎ তানাহুফর শুধুমাত্র অনুভূতির সাহায্যে জানা যায়। এ ছাড়া যা আছে যেমন- গারাবাত, যু'ফে তালীফ, মুখালাফাতে কিয়াস এবং تَعْقِيدُ لَفْظِي-এর কোনোটিই অনুভূতি দ্বারা জানা যায় না। সুতরাং هُو সর্বনামের مَرْجِع তাই হবে যা আমাদের মুসান্নিফ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণ হয়ে গেল যে, تَعْقِيدُ مَعْنَوِي ছাড়া অন্যান্যগুলো উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ এবং অনুভূতির মাধ্যমে জানা সম্ভব; কিন্তু تَعْقِيدُ مَعْنَوِي এগুলোর দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

সারকথা এই যে, বালাগাতের দ্বিতীয় উৎস তথা ফসীহ বাক্যকে অফসীহ বাক্য থেকে পৃথক করার কতকগুলো নাই, সরফ, অভিধানগ্রহে জানা যাবে আর কতকগুলো সাহিত্য-প্রতিভা দ্বারা জানা যাবে; কিন্তু تَعْقِيدُ مَعْنَوِي তো এগুলো দ্বারা জানা যায় না। আর বালাগাতের প্রথম উৎস তথা উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচা। এ দু'টি বিষয় এমন যে, এগুলো না জানলেই নয়। তাই এগুলো জানার জন্য দু'টি ইলমের প্রয়োজন, যাতে এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে এবং এ দু'টি বিষয়ের জন্য বিশেষ উপকারী হবে। আর এ দু'টি ইলম জানা থাকলে এ দু'টি বিষয় থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। অতএব, বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ প্রথমটি অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে ভুল থেকে বাঁচার জন্য ইলমে মা'আনীকে আবিষ্কার করেছেন এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ تَعْقِيدُ مَعْنَوِي থেকে বাঁচার জন্য ইলমে বয়ানকে আবিষ্কার করেছেন।

قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَشَارَ يَقُولُهُ وَمَا يُحْتَزُّ بِهِ : ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ ইলমে বয়ান এবং ইলমে মা'আনীর প্রয়োজনীয়তা এবং তার আবিষ্কার সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, মূল লেখকের ইবারতেও এ কথাগুলো রয়েছে, যা তিনি তার রীতিমতো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। লেখক বলেন, مَعْنَوِي عِلْمُ الْمَعْنَى, অর্থ- যে ইলম দ্বারা প্রথম প্রকার অর্থাৎ উদ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশে কোনো ভুল করা থেকে বিরত থাকা যায়। তা হলো ইলমে মা'আনী।

আর (ইলমে বয়ান সম্পর্কে বলেন,) مَعْنَوِي عِلْمُ الْبَيَان, অর্থ- যে ইলম দ্বারা تَعْقِيدُ مَعْنَوِي থেকে বিরত থাকা যায়, তা হলো ইলমে বয়ান।

قَوْلُهُ وَسَمَرًا هَذَيْنِ الْعِلْمَيْنِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইলমে বালাগাত-এর তিনটি শাখা যথা- ইলমে বয়ান, মা'আনী ও বদী'-এর নামকরণ এবং এর হেতু সম্পর্কে বালাগাত বিশারদদের মতামত তুলে ধরেন। মুসান্নিফ বলেন, বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ ইলমে বয়ান এবং ইলমে মা'আনীকে একত্রে ইলমে বালাগাত নামে নামকরণ করেন। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّصَ لِهَذَا بِالْبَلَاغَةِ آمَامَنَا مَزِيدٍ إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّصَ لِهَذَا بِالْبَلَاغَةِ, আমরা প্রথমে বাক্যের এ অংশের ব্যাখ্যা করব, এরপর অর্থ বর্ণনা করব,

مَكَانٌ مصدر শব্দটি এর অর্থ- বিদ্যমান হওয়া, পাওয়া যাওয়া। مَزِيدٌ শব্দটিও মাসদার। অর্থাৎ مصدر ميمى, আর إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّصَ অর্থাৎ (এখানে) تعلق বা সম্পর্ক। এখানে إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّصَ-এর অর্থ تعلق করার কারণ হলো إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّصَ শব্দটি এমন একক যার মধ্যে কমবেশি হতে পারে না; কিন্তু تعلق বা সম্পর্ক এর মধ্যে কমবেশি হয়ে থাকে। সুতরাং পুরো বাক্যের অর্থগত আরবি এরূপ হবে إِمَّا أَنْ يَخْتَصَّصَ لِهَذَا بِالْبَلَاغَةِ অর্থাৎ এ দুটি ইলমের বালাগাতের সাথে বেশি সম্পর্কের কারণে এ দু'টি ইলমকে বালাগাত করে নাম করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বালাগাতের সাথে এ দু'টি ইলমের বেশি সম্পর্ক কিভাবে হলো। এর উত্তর হলো- বালাগাতের দু'টি উৎসের প্রথমটি সম্পূর্ণভাবে ইলমে মা'আনী-এর উপর নির্ভরশীল, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কালামে ফসীহকে কালামে গাইরে ফসীহ থেকে মুক্ত করা বা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে কালামকে মুক্ত করা যদিও ইলমে বয়ানের সাথে নাই, সরফ, অভিধান ইত্যাদির জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, তবুও বালাগাতের উদ্দেশ্য হিসেবে ইলমে বয়ানের সাথেই এর সম্পর্ক বেশি।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْبَلَاغَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْعِلْمِ : অর্থাৎ যদিও বালাগাত অন্যান্য ইলমের উপরও নির্ভরশীল। এর দ্বারা নাই, সরফ এবং লুগাত বা অভিধানশাস্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ثُمَّ احْتَاجُوا لِمَعْرِفَةِ تَوَابِعِ الْبَلَاغَةِ إِلَى عِلْمٍ آخَرَ فَوَضَعُوا لِذَلِكَ عِلْمَ الْبَدِيعِ وَالْبَيَانِ
أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَمَا يُعْرِفُ بِهِ وَجْهَ التَّحْسِينِ عِلْمَ الْبَدِيعِ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْمُخْتَصَرُ فِي
عِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَتَوَابِعِهَا انْحَصَرَ مَقْصُودُهُ فِي ثَلَاثَةِ فُنُونٍ وَكَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ يُسَمِّي
الْجَمِيعَ عِلْمَ الْبَيَانِ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الْأَوَّلَ عِلْمَ الْمَعَانِي وَالْآخِرِينَ يَعْنِي الْبَيَانَ
وَالْبَدِيعَ عِلْمَ الْبَيَانِ وَالثَّلَاثَةَ عِلْمَ الْبَدِيعِ وَلَا يَخْفَى وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ -

অনুবাদ : এরপর তারা বালাগাতের অনুগামী বিষয়াদির জন্য আরেকটি ইলমের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। অতএব, এর জন্য ইলমে বদী'কে সংকলন করলেন। এর প্রতিই লেখক তার এ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন “এবং যার দ্বারা (বাক্যের) সৌন্দর্যের পদ্ধতি জানা যায় তা হলো ইলমে বদী’” যখন এ সংক্ষিপ্ত (মুখতাসারুল মা'আনী) কিতাব ইলমে বালাগাত এবং এর অনুগামী ইলমের ব্যাপারে, তখন এর মূল উদ্দেশ্য আলোচনা তিন বিষয়েই সীমাবদ্ধ হয়েছে। অনেকে এ সবগুলোকে ইলমে বয়ান করে নাম রেখেছেন। আবার অনেকে প্রথমটিকে ইলমে মা'আনী করে এবং শেষ দু'টি তথা বয়ান এবং বদী'কে ইলমে বয়ান করে নাম রেখেছেন। (আবার কেউ) তিনটিকেই ইলমে বদী' করে নাম রেখেছেন। এসব (এ নামকরণের) কারণ অস্পষ্ট নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ احْتَاجُوا لِمَعْرِفَةِ تَوَابِعِ الْخ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইলমে বদী'-এর প্রয়োজনীয়তা এবং নামকরণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, বালাগাতের تَوَابِع বা অনুগামী বিষয় জানার জন্য বালাগাত বিশারদগণ আরেকটি ইলমের প্রয়োজন মনে করলেন এবং তারা সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য ইলমে বদী' রচনা করলেন, লেখক তার ভাষায় বলেন, আর যে ইলমের দ্বারা বাক্যের সৌন্দর্য বর্ধনকারী পদ্ধতিগুলো জানা যায়, তাকে ইলমে বদী' বলা হয়। এরপর মুসান্নিফ বলেন, যেহেতু ভূমিকার আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণ হলো যে, এই কিতাবের মধ্যে বালাগাত (অর্থাৎ ইলমে মা'আনী ও বয়ান) এবং বালাগাতের অনুগামী ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এ কিতাবের মধ্যে যে বিষয়গুলো আলোচনা হবে তা তিনটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ الْأَوَّلُ অর্থাৎ প্রথম বিষয় ইলমে মা'আনী الْبَيَانَ عِلْمَ الْمَعَانِي অর্থাৎ দ্বিতীয় বিষয় ইলমুল বয়ান, الْفَنُّ الثَّانِي عِلْمَ الْبَيَانِ অর্থাৎ তৃতীয় বিষয় ইলমুল বদী'।

প্রকাশ থাকে যে, এ তিনটি বিষয়ের নামকরণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে-

প্রথম মত : ১ম বিষয়ের নাম ইলমুল মা'আনী, দ্বিতীয় বিষয়ের নাম বয়ান এবং তৃতীয় বিষয়ের নাম ইলমুল বদী'।

দ্বিতীয় মত : তিনটি বিষয়ের নাম একত্রে ইলমুল বয়ান।

তৃতীয় মত : ১ম বিষয়ের নাম ইলমুল মা'আনী, ২য় এবং ৩য় বিষয়ের নাম ইলমুল বয়ান।

চতুর্থ মত : তিনটি বিষয়ের নাম ইলমুল বদী'।

নামকরণের কারণ : প্রথম মতানুসারে প্রথম বিষয়কে ইলমুল মা'আনী, বলা হয়। কারণ, এর দ্বারা বাক্যের কাক্ষিত অর্থ এবং বৈশিষ্ট্যকে জানা যায়, যার জন্য বাক্যটির প্রয়োগ হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়কে ইলমুল বয়ান বলা হয়- কারণ এ ইলমের দ্বারা একটি অর্থকে একাধিক পদ্ধতিতে (অর্থ স্পষ্ট এবং ইঙ্গিতবহ হিসেবে) প্রকাশ করার বয়ান জানা যায়। আর তৃতীয় বিষয়কে ইলমুল বদী' বলা হয়- কারণ এ ইলমের বিষয়গুলো বিশেষ সৌন্দর্য এবং অলঙ্কারপূর্ণ হয়। بَدِيع শব্দটি بَدَاعَةُ মাসদার থেকে নির্গত, অর্থ- সৌন্দর্য বা অলঙ্কার।

দ্বিতীয় মতানুসারে তিনটি বিষয়কে ইলমুল বয়ান বলার কারণ এই যে, বয়ান বলা হয় ঐ বিশুদ্ধ কথাকে যা মনের ভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। যেহেতু এ তিনটি বিষয় দ্বারাই মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়, (এ কারণে এ তিনটিকেই ইলমুল বয়ান বলা হয়)।

তৃতীয় মতানুসারে ১ম বিষয়কে ইলমুল মা'আনী বলা হয়— এর কারণ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। ২য় এবং ৩য় বিষয়কে ইলমুল বয়ান বলা হয়। যেহেতু এ দু'টি ইলমের বয়ানের সাথে বা মনের ভাব প্রকাশকারী বিশুদ্ধ বাক্যের সাথে সম্পর্ক আছে।

চতুর্থ মতানুসারে তিনটি বিষয়কে ইলমুল বদী' বলা হয়। কারণ, এ বিষয়গুলোর আলোচ্য বিষয়গুলো অত্যন্ত অভিনব এবং চমৎকার সুন্দর। আমরা ইতঃপূর্বে بَدِيع শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি। যার সাথে এ ব্যাখ্যা মিলে যায়। তাই এ তিনটি বিষয়কে ইলমুল বদী' বলারও যৌক্তিকতা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. উপরে উল্লিখিত জ্ঞানসমূহ যথা— নাহব, সরফ ও অভিধানশাস্ত্র এবং সাহিত্য প্রতিভা দ্বারা ফাসাহাতের জন্য ক্ষতিকর সাতটি বিষয়ের প্রায় সববিষয় থেকে বাঁচা সম্ভব, তবে تَعْفِيف থেকে এসব জ্ঞানের সাহায্যে রক্ষা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বালাগাতের প্রথম উৎস তথা উদ্দিষ্ট অর্থ আদায়ে ভুল থেকে বাঁচাও এসব জ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব নয়।

খ. এ দু'টি বিষয় থেকে বাঁচার জন্য বালাগাত বিশারদগণ ইলমুল বয়ান ও ইলমুল মা'আনীকে আবিষ্কার করেছেন।

গ. ইলমুল মা'আনী ও ইলমুল বয়ানে বালাগাতের প্রধান বিষয় হওয়ার কারণে এ দু'টি ইলমকে একত্রে ইলমুল বালাগাত বলা হয়।

বালাগাত হাসিল হওয়ার পর শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য যে ইলমের দ্বারা হাসিল হয়, তাকে ইলমুল বদী' বলা হয়। নামকরণের ব্যাপারে আরো ভিন্ন মতও রয়েছে।

الْفَنُّ الْأَوَّلُ عِلْمُ الْمَعَانِي قَدَّمَهُ عَلَى عِلْمِ الْبَيَانِ لِكَوْنِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَفْرَدِ مِنَ الْمَرْكَبِ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْمُطَابَقَةِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَهُوَ مَرْجِعُ عِلْمِ الْمَعَانِي مُغْتَبَرَةٌ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ مَعَ زِيَادَةِ شَيْءٍ آخَرَ وَهُوَ إِبْرَادُ الْمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي طَرُقٍ مُخْتَلِفَةٍ۔

অনুবাদ : প্রথম বিষয় : ইলমুল মা'আনী। এটিকে লেখক ইলমুল বয়ানের আগে এনেছেন, কেননা, এটি বয়ানের তুলনায় এমন স্থানে রয়েছে (যে স্থানটিতে রয়েছে) মুফরাদ মুরাক্কাবের তুলনায়। কেননা, মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়াকে বিবেচনা করা হচ্ছে ইলমুল মা'আনীর মূল উদ্দেশ্য। এটি (আবার) ইলমুল বয়ানের মধ্যেও ধর্তব্য, সাথে আরো বিষয়ও রয়েছে (ইলমুল বয়ানের মধ্যে) আর তা হচ্ছে একটি অর্থকে একাধিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ الْفَنُّ الْأَوَّلُ الخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এ কিতাবটি মূলত তিনটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ। উপরোল্লিখিত ইবারতে প্রথম বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো ইলমুল মা'আনী।

قَوْلُهُ قَدَّمَهُ عَلَى عِلْمِ الْبَيَانِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ইলমুল মা'আনীকে ইলমুল বয়ানের আগে আনার কারণ বর্ণনা করছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইলমুল মা'আনী মুফরাদের সাথে তুলনীয়, আর ইলমুল বয়ানের তুলনা মুরাক্কাবের সাথে। আমরা জানি, মুফরাদ সবসময় মুরাক্কাবের আগে আসে। তাই এখানে ইলমুল মা'আনীর আলোচনা প্রথমে করেছেন, তারপর ইলমুল বয়ানের আলোচনা করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হলো- মুফরাদ মুরাক্কাবের সাথে যথাক্রমে ইলমুল মা'আনী এবং ইলমুল বয়ানের তুলনা কিভাবে করা হলো?

এর উত্তর হলো- ইলমুল মা'আনীর ফলাফল হলো বিশুদ্ধবাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়া। এ ফলাফলটির উপর ইলমুল বয়ানের ফলাফল নির্ভরশীল। আর ইলমুল বয়ানের ফলাফল হলো- একটি অর্থকে একাধিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা। যার প্রত্যেকটি পদ্ধতির মর্ম স্পষ্ট এবং ইস্তিবাহ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের। তবে এ সবই মুকতাযায়ে হালের অনুযায়ী হওয়ার পর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যখন ইলমুল বয়ানের ফলাফল ইলমুল মা'আনীর ফলাফলের উপর নির্ভরশীল এবং খোদ ইলমুল বয়ান তার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল, তখন ইলমুল বয়ান দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল হলো- আর ইলমুল মা'আনী শুধুমাত্র তার ফলাফলের উপরই নির্ভরশীল। অতএব, ইলমুল মা'আনী নির্ভরশীল হলো একটি জিনিসের উপর।

সারকথা : ইলমুল বয়ান হলো দু'টি অংশ নিয়ে একটি বস্তু বা كل আর ইলমুল মা'আনী সেই বস্তু বা كل-এর একটি অংশ বা جزء যেমন- مركب একটি كل আর مفرد সেই كل-এর جزء। আর كل সবসময় كل-এর উপর مقدم হয় বা আগে আসে অথবা বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ইলমুল মা'আনীতে একটি বিষয়ের اعتبار করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি مفرد বা একক। আর ইলমুল বয়ানের মধ্যে দু'টি বিষয়ের ধর্তব্য করা হয়েছে। এ হিসেবে এটি مركب বা একাধিক এককযুক্ত। আর আমরা জানি, مفرد বা একক مركب-এর আগে আসে। উভয় ব্যাখ্যানুসারে ইলমুল মা'আনী ইলমুল বয়ানের আগে আসা উচিত; তাই লেখক ইলমুল মা'আনীকে ইলমুল বয়ানের আগে এনেছেন।

বি. দ্র. ইলমুল বয়ানের একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো- যায়েদ নামের এক ব্যক্তির দানশীলতাকে আমরা কয়েকভাবে ব্যক্ত করতে পারি- ১. যায়েদ দানশীল, ২. যায়েদের বাড়ির পেছনে অনেক ছাই, ৩. যায়েদের বাড়িতে গরিব-দুঃখী মানুষ জড়ো হয়, ৪. যায়েদ দু' হাতে বিতরণ করে, ৫. গোসল খানায় সাগর দেখতে পেলাম, যে দান করে যাচ্ছে (এটা তখন বলা হয়, যখন যায়েদ গোসল খানায় অবস্থান করে)।

সার-সংক্ষেপ : ইলমুল বয়ানের আগে ইলমুল মা'আনীর আলোচনা এনেছেন দু'টি কারণে- ১. ইলমুল মা'আনী মুফরাদের পর্যায়ে, আর ইলমুল বয়ান মুরাক্কাবের পর্যায়ে। যেহেতু মুফরাদ মুরাক্কাবের আগে, তাই ইলমুল মা'আনীর বহু আগে আনা হয়েছে। ২. মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর ইলমুল বয়ানের বিষয়গুলো বাক্যে আসে, আর মুকতাযায়ে হাল পাওয়া যায় ইলমুল মা'আনীতে।

وَهُوَ عِلْمٌ أَيْ مَلَكَهٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى إِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ وَبَجُوزٍ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْأَصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ وَلَا سَتَعْمَالِهِمُ الْمَعْرِفَةَ فِي الْجُزْئِيَّاتِ قَالَ يُعْرِفُ بِهِ أَحْوَالَ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ أَيْ هُوَ عِلْمٌ يُسْتَنْبِطُ مِنْهُ إِدْرَاكَاتٌ جُزْئِيَّةٌ هِيَ مَعْرِفَةُ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ بِمَعْنَى أَنَّ أَيْ فَرْدٍ يُوجَدُ مِنْهَا أَمْكَنَّا أَنْ نَعْرِفَهُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ إِحْتِرَازٌ عَنِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَيْسَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ مِثْلُ الْأَعْلَالِ وَالْإِدْغَامِ وَالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَأْدِيَةِ أَصْلِ الْمَعْنَى وَكَذَا الْمُحَسِّنَاتُ الْبَدِيعِيَّةُ مِنَ التَّجْنِيسِ وَالتَّرْصِيعِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُطَابَقَةِ -

অনুবাদ : এটি এমন এক ইলম অর্থাৎ যোগ্যতা যার সাহায্যে কোনো ব্যক্তি বিভিন্ন জু'জী বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়। তবে (ইলম)-এর দ্বারা নিয়মাবলি এবং প্রসিদ্ধ কায়দার অর্থও উদ্দেশ্য করা যায়। মعرفة শব্দটি তাদের ব্যবহারে জু'জী সম্পর্কে হওয়ার কারণে তিনি يُعْرِفُ بِهِ اللَّفْظُ الْعَرَبِيُّ বলেছেন। অর্থ যার দ্বারা অবগত হওয়া যায় আরবি শব্দের অবস্থাসমূহ। অর্থাৎ এটি এমন একটি ইলম যার সাহায্যে হাসিল হয় জু'জী বিষয়সমূহের উপলব্ধি। এটি হচ্ছে উল্লিখিত অবস্থাসমূহের জু'জী-এর প্রত্যেকটি ফَرْد কে জানা। এর অর্থ হচ্ছে এর যে ফَرْد-ই পাওয়া যাক, আমরা সেই ফَرْد-কে এই ইলমের দ্বারা জানতে সক্ষম হব। লেখকের উক্তি, الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ (অর্থ- যার দ্বারা শব্দটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক বা অনুযায়ী হয়) পরিহার করে সেই সব অবস্থাসমূহকে, যা এমন নয়, যেমন- শব্দের ইলাল (হরফে ইল্লত বিশিষ্ট শব্দের পরিবর্তন করা)। ইদগাম (একাক্ষরকে অন্যাক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়া) رَفْع (এবং جَر) হওয়া এ জাতীয় যা কিছু আছে যা শব্দের আসল অর্থ প্রদানে জরুরি বলে সাব্যস্ত হয়। এমনিভাবে ইলমে বদী'-এর مُحَسِّنَةٌ গুলো যেমন- তাজনীস, তারসী' ইত্যাদি যা লক্ষণীয় হয় বাক্যটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ ইবারতে লেখক ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ أَحْوَالَ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ

অর্থাৎ ইলমে মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি শব্দের এমন অবস্থাসমূহ জানা যায় যার সাহায্যে বাক্যটি মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়।

এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর সামনে ইলমে মা'আনী বিষয়াদির বিস্তারিত আলোচনা করবেন। লেখকের সংজ্ঞার عِلْم শব্দটির ব্যাখ্যা মুসান্নিফের মতে দু' ধরনের হতে পারে- ১. مَلَكَهٌ অর্থাৎ বা যোগ্যতা, ২. عِلْمٌ অর্থাৎ অসল, মুসান্নিফ ১ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, مَلَكَهٌ অর্থ- ইলমে মা'আনী এমন একটি যোগ্যতা বা মনের বদ্ধমূল অবস্থা যার দ্বারা ব্যক্তি জু'জী বিষয়ের উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইলমে মা'আনীর যোগ্যতা আছে সে বিভিন্ন জু'জী বিষয় আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এখানে إِدْرَاكَاتٍ جُزْئِيَّةٍ-এর উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা হয়, আপত্তিটি হলো- إِدْرَاكَ তো এমন বিষয় যা جُزْئী বা كُلِّ দ্বারা বিশেষিত হয় না; বরং مُدْرَكٌ-এর مُدْرَكٌ কখনো كُلِّ আবার কখনো جُزْئী হয়ে থাকে। যেমন- إِنْسَانٌ (মুদ্রক) كُلِّ, جُزْئী, سُوْتَرَاةٌ ইবারত হওয়ার দরকার ছিল مُدْرَكَاتٍ جُزْئِيَّاتٍ এ আপত্তি নিরসন করার জন্য কেউ কেউ উত্তর দেন যে, ইবারতে একটি مُضَافٌ উহা আছে। তখন ইবারত হবে- عَلَى إِدْرَاكِ مُدْرَكَاتٍ جُزْئِيَّاتٍ এরপর আমাদের জানতে

হবে **الْجُزْئِيَّةُ** দ্বারা কি উদ্দেশ্য? **الْأَدْرَاكَاتُ الْجُزْئِيَّةُ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব মাসআলা, যা সে যোগ্যতা দ্বারা হাসিল হয় বা মৌলিক নিয়ম থেকে বের হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ একটি নিয়ম- **كُلُّ كَلَامٍ يُلْقَى إِلَى الْمُنْكَرِ يَجِبُ** অর্থাৎ যে সকল বাক্য অস্বীকারকারীর সামনে পেশ করা হয় তাতে তাকিদ থাকা জরুরি। এর অধীন **جُزْئِي** যেমন এ কথাটি অস্বীকারকারীর সামনে পেশ করা হচ্ছে, তাই এর তাকিদ আনতে হবে। এ জাতীয় আরো নিয়ম আছে। যেমন- **كُلُّ كَلَامٍ يُلْقَى إِلَى مَحْبُوبٍ يَجِبُ فِيهِ الْإِطْنَابُ وَكُلُّ كَلَامٍ يُلْقَى إِلَى الْمَرِيضِ يَجِبُ فِيهِ الْإِنْجَازُ**।

অর্থাৎ যে সকল বাক্য প্রিয়জনকে বলা হয় তা দীর্ঘ হয়ে থাকে। আর যে সকল বাক্য অসুস্থ ব্যক্তির সামনে বলা হয় তা সংক্ষিপ্ত হওয়া আবশ্যিক।

ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি **عِلْم** শব্দটি **أُصُول** বা নিয়মাবলির অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- মুসান্নিফ তাঁর কথার দ্বারা সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন- **وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْسُ الْأُصُولِ وَالْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ** অর্থাৎ **عِلْم** দ্বারা নিয়ম-রীতিও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন সংজ্ঞার অর্থ হবে এরূপ- ইলমুল মা'আনী এমন কতক নিয়মাবলিকে বলা হয় যার সাহায্যে আরবি শব্দের এমন অবস্থাসমূহ জানা যায় যা দ্বারা বাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হয়।

এখানে মূল লেখকের উপর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রশ্নটি হলো মুসান্নিফের ব্যাখ্যা দ্বারা জানা গেল ইলমের দু'টি অর্থ, অন্যভাবে বললে **عِلْم** শব্দটি এখানে **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ** আর আমরা জানি, সংজ্ঞার মধ্যে **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ**-এর ব্যবহার শোভন নয়। তাহলে তিনি এ কাজটি কেন করলেন? এর উত্তর হলো- সংজ্ঞার মধ্যে **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ**-এর ব্যবহার সাধারণভাবে অবৈধ নয়; বরং যখন **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ**-এর প্রত্যেকটি অর্থ উদ্দেশ্য করা যায় না তখন **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ**-এর ব্যবহার অবৈধ। আর যখন **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ**-এর সবগুলো অর্থ উদ্দেশ্য করা যায়, তখন সংজ্ঞার মধ্যে **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ**-এর ব্যবহার অবৈধ বা অশোভন নয়। আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনায় যেহেতু **عِلْم**-এর উভয় অর্থ উদ্দেশ্য হওয়াতে কোনো বাধা নেই, তাই লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে **عِلْم** শব্দটি **لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ** হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যবহার বৈধ বা শোভন হবে।

উল্লেখ্য যে, **الْقَوَاعِدُ الْمَعْلُومَةُ** শব্দটি **نَفْسُ الْأُصُولِ**-এর **تَفْسِيرِي** অর্থাৎ **أُصُول** এবং **قَوَاعِدُ** দ্বারা উদ্দেশ্য একই। এখানে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে যা মুসান্নিফ বা ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যের ভিত্তিতে উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে- মুসান্নিফ **عِلْم**-এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ২য় অর্থ- (**قَوَاعِدُ** ও **أُصُول**) বর্ণনা করতে তিনি **يَجُوزُ** শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তার দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ তার বক্তব্য দ্বারা ধারণা হয় **عِلْم**-এর ১ম অর্থটি গ্রহণযোগ্য বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর দ্বিতীয় অর্থ সে রকম নয়; অথচ **أُصُول**-এর অর্থে **عِلْم** শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয় এবং **مَلَكَةٌ**-এর অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া সামান্য পরে যখন **يُنَحْصِرُ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ** বলা হবে তখন **عِلْم**-এর অর্থ **أُصُول** নেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। কেননা, যোগ্যতা আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হতে পারে না।

এর উত্তর দু'টি : ১. আল্লামা আব্দুল হাকীমের মতে **عِلْم**-এর ব্যবহার **مَلَكَةٌ**-এর ক্ষেত্রেই বেশি, **أُصُول**-এর ক্ষেত্রে কম। তাই মুসান্নিফ **أُصُول**-এর অর্থকে **يَجُوزُ**-এর সাথে বর্ণনা করেছেন। ২. এখানে **عِلْم**-কে **أُصُول**-এর অর্থে গ্রহণ করলে **يُعَرَّفُ بِهِ**-এর মধ্যে এক **مُضَافٌ** উহ্য রাখতে হয়। তখন বলতে হবে **يُعَرَّفُ بِعِلْمِهِ**, কেননা **أُصُول** শব্দের অবস্থা জানার কারণ হয় না; বরং **أُصُول**-এর **مَعْرِفَةٌ** বা **عِلْم** শব্দের অবস্থা জানার কারণ হয়।

অতএব, **مُضَافٌ** উহ্য রাখার চেয়ে উহ্য না রাখা উত্তম অথবা এভাবে বলা যায় যেহেতু **مَلَكَةٌ** উদ্দেশ্য করলে **مُضَافٌ** উহ্য মানতে হয় না, তাই **مَلَكَةٌ**-এর অর্থ **أُصُول**-এর অর্থের চেয়ে উত্তম হবে। সুতরাং **أُصُول**-এর অর্থ বর্ণনার শুরুতে **يَجُوزُ** শব্দের ব্যবহার (যা অনাধিকার সম্পন্ন বা কম প্রাধান্যপ্রাপ্ত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।) সঠিক হয়েছে, সঠিক ব্যবহার আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন।

قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَعْمَلُهُمُ الْمَعْرِفَةُ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে- মূল লেখক তার সংজ্ঞার মধ্যে **يُعَرَّفُ بِهِ** শব্দটি ব্যবহার করলেন, **يَعْلَمُ** শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন না? এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, আরব ভাষাভাষীগণ **مَعْرِفَةٌ** শব্দটিকে **جُزْئِيَّاتٍ**-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, আর **عِلْم**-কে **كُلِّيَّاتٍ**-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। আর এখানে **الْأَحْوَالُ** বা শব্দের অবস্থাসমূহ বলে যা বুঝানো হচ্ছে যথা- **تَاكِيدٌ**, **إِطْنَابٌ**, **تَقْدِيمُ الْمُسْتَنْدِ**, ইত্যাদি হলো **جُزْئِيَّاتٌ** অতএব, এখানে **مَعْرِفَةٌ** শব্দটিকে ব্যবহার করাই সমীচীন, তাই মূল লেখক **مَعْرِفَةٌ**-কে ব্যবহার করেছেন, **عِلْم**-কে ব্যবহার করেননি। মূল লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে।

প্রশ্নটি হলো— লেখকের সংজ্ঞাতে **دُرٌّ** সৃষ্টি হয় যার দ্বারা একই বিষয় একসাথে **مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ** এবং **مَوْقُوفٌ** হয়ে যায় যা বৈধ নয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো এরূপ— ইলমে মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে **أَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ** এ অংশটুকু আছে। সুতরাং **عِلْمُ الْمَعْنَى** হলো **مُعَرَّفٌ** (যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়) আর **أَحْوَالُ اللَّفْظِ الْخ** হলো **مُعَرَّفٌ** (যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়) যেহেতু **مُعَرَّفٌ** (এর উপর যবর) **مُعَرَّفٌ** (এর নিচে যের) —এর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু **عِلْمُ الْمَعْنَى** নির্ভরশীল হবে **أَحْوَالُ اللَّفْظِ** —এর উপর। এরপর আরো জানা দরকার যে, **أَحْوَالُ اللَّفْظِ** জানা যায় **عِلْمُ الْمَعْنَى** দ্বারা। তাই এটি **عِلْمُ الْمَعْنَى** —এর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে **عِلْمُ الْمَعْنَى** এক সময় **مَوْقُوفٌ** অন্য সময় **عَلَيْهِ مَوْقُوفٌ** আর একই জিনিস **مَوْقُوفٌ** (নির্ভরশীল) **مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ** (যার উপর নির্ভরশীল) হওয়া অসম্ভব। তাই এটা প্রমাণ হলো লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে **دُرٌّ** রয়েছে। যেহেতু **دُرٌّ** বাতিল তাই লেখকের সংজ্ঞা বাতিল বলে গণ্য হবে। এর জবাব হলো, এখানে **دُرٌّ** হয়নি। কারণ, **دُرٌّ** তখনই হতো যখন **عِلْمُ الْمَعْنَى** যে হিসেবে **مَوْقُوفٌ** হয়েছে একই হিসেবে যদি **مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ** হতো। কিন্তু এখানে একই হিসেবে **مَوْقُوفٌ** এবং **مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ** হয়নি। এখানে ইলমে মা'আনী **أَحْوَالُ اللَّفْظِ** —এর উপর তার **مَاهِيَةٌ** —এর **تَصَوُّرٌ** হিসেবে **مَوْقُوفٌ** হয়েছে। আর **أَحْوَالُ اللَّفْظِ** তার **حُصُولٌ فِي الْخَارِجِ** হিসেবে **مَوْقُوفٌ** হয়েছে ইলমুল মা'আনীর উপর। তাই এখানে **دُرٌّ** হয়নি। অতএব, সংজ্ঞা ঠিকই আছে।

قَوْلُهُ أَيْ هُوَ عِلْمٌ يَسْتَنْبِطُ مِنْهُ : অর্থ— এটি এমন একটি ইলম যার দ্বারা **جُزْئِيَّاتٍ** —এর উপলব্ধি হাসিল হয়। বাক্যে **مَلَكَةٌ** দ্বারা যদি **مَلَكَةٌ** উদ্দেশ্য হয়, তাহলে "من" হরফটি "ب" —এর অর্থে হবে। কেননা, **مَلَكَةٌ** দ্বারা **اسْتَنْبَاطٌ** হয়, **مَلَكَةٌ** দ্বারা যদি **اسْتَنْبَاطٌ** হয় না। আর যদি **عِلْمٌ** দ্বারা **اسْتَنْبَاطٌ** উদ্দেশ্য হয়, তাহলে **مِنْ** তার আপন অর্থে বহাল থাকবে। **جُزْئِيَّاتٍ** —এর **ادْرَاقٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উল্লেখিত **جُزْئِيَّاتٍ** —এর প্রত্যেকটি **فَرْدٌ** সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে। এখানে প্রত্যেকটি **فَرْدٌ** —কে **بِالْفِعْلِ** জানা জরুরি নয়; বরং সে কোনো **فرد** পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে ইলমুল মা'আনীর সাহায্যে জানা সম্ভব হবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, **أَحْوَالُ اللَّفْظِ** দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক, **مُفْرَدٌ** এবং **جُمْلَةٌ** সবার **أَحْوَالٌ** এখানে शामिल **مُفْرَدٌ** —এর **أَحْوَالٌ** যেমন **مُسْتَنْدٌ** —এর অবস্থা, **مُسْتَنْدٌ إِلَيْهِ** —এর অবস্থা ইত্যাদি। **جُمْلَةٌ** —এর অবস্থা যেমন **وَصْلٌ وَفَصْلٌ** —এর অবস্থা, **اِطْنَابٌ** এবং **مُسَارَاتٌ** —এর অবস্থা ইত্যাদি।

নিম্নে সংজ্ঞার **فَوَائِدُ قَبُولُ** সম্পর্কে আলোচনা করা হলো— ১. **أَحْوَالُ اللَّفْظِ** **قَيْدٌ** দ্বারা **عِلْمُ الْحِكْمَةِ** বের হয়ে গেছে। কেননা, **عِلْمُ جُكْمَةٍ** —এর মধ্যে **لَفْظٌ** —এর অবস্থা আলোচনা করা হয় না। এমনিভাবে **عِلْمُ الْمَنْطِقِ** ও বের হয়ে গেছে। কারণ, **مَنْطِقٌ** —এর মধ্যে **لَفْظٌ** নিয়ে আলোচনা করা হয় না; বরং **مَعْنَى** বা অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয় এমনিভাবে **عِلْمُ الْفِيهِ** ও বের হয়ে গেছে। কারণ, ইলমুল ফিকহ্ —এ আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২. **قَوْلُهُ أَلَّتِي بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ** : **قَيْدٌ** দ্বারা ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা থেকে **لَفْظٌ** —এর ঐসব অবস্থাসমূহ বের হয়ে গেছে, যা এমন নয়। যেমন— **لَفْظٌ** —এর বিভিন্ন অবস্থা— **إِعْلَالٌ** (হরফ ইল্লত বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে পরিবর্তন), **إِدْغَامٌ** (একই ধরনের বা কাছাকাছি **جِنْس** —এর দু'টি অক্ষর এক সাথে মিলিয়ে পড়া) যবর, যের এবং পেশ ইত্যাদি অবস্থা বের হয়ে গেছে। যা আসল অর্থ প্রদানের জন্য জরুরি; কিন্তু এগুলো মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। এমনিভাবে এ **قَيْدٌ** দ্বারা ইলমে বদী' —এর **مُحَسِّنَاتٌ** বের হয়ে গেছে। কেননা **مُحَسِّنَاتٌ** হয় বাক মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হওয়ার পর। সুতরাং এগুলোও বাক্যকে মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক করার ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখতে পারে না। **مُحَسِّنَاتٌ بَدِيعَةٌ** যেমন— **تَجْنِيسٌ**, **تَرْصِيعٌ** ইত্যাদি।

সার-সংক্ষেপ :

ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা : **هُوَ عِلْمٌ يُعَرِّفُ بِهِ أَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِي بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ** : অর্থাৎ ইলমুল মা'আনী এমন এক শাস্ত্রকে বলা হয় যে শাস্ত্রের সাহায্যে আরবি বাক্যের এমন অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়, যার দ্বারা বাক্য মুকতাযায়ে হাল অনুযায়ী হয়।

বাক্যের যেসব অবস্থা মূল অর্থ আদায়ের জন্য অপরিহার্য যথা— **إِعْلَالٌ**, **إِدْغَامٌ**, **إِعْرَابٌ** ইত্যাদি এবং ইলমে বদী' —এর **محسنات** এখানে উদ্দেশ্য নয়।

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عِلْمٌ بِهِ يُعْرِفُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ لِمُقْتَضَى
الْحَالِ لِيُظْهِرَ أَنَّ لَيْسَ عِلْمُ الْمَعَانِي عِبَارَةً عَنْ تَصَوُّرٍ مَعَانِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ
وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْإثْبَاتِ وَالْحَذْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَبِهَذَا يَخْرُجُ عَنِ التَّعْرِيفِ عِلْمُ
النَّبِيَانِ إِذْ لَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ -

অনুবাদ : আর উদ্দেশ্য হলো এই যে, ইলমুল মা'আনী ঐ 'عِلْم'-কে বলা হয়, যার দ্বারা এ সকল অবস্থা জানা যায় এ হিসেবে যে, এসব অবস্থা দ্বারা বাক্য মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হবে। কেননা, এ বিষয় তো সুস্পষ্টই যে, ইলমুল মা'আনী 'مَعْرِفَةٌ' (নির্দিষ্ট জ্ঞাপক), 'نَكْرَةٌ' (অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক), 'تَقْدِيمٌ' (আগে আনা), 'تَأْخِيرٌ' (পরে আনা), 'إِثْبَاتٌ' (বাক্যে উল্লেখ রাখা) ও 'حَذْفٌ' (উহ্য রাখা) ইত্যাদি বিষয়ের 'تَصَوُّرٌ' বা ধারণাকে বলা হয় না। এর দ্বারা ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞা থেকে ইলমে বয়ান বের হয়ে গেছে। কেননা, ইলমুল বয়ানের মধ্যে বাক্যের এ জাতীয় অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عِلْمٌ بِهِ يُعْرِفُ الْخ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। প্রশ্নটি হলো, লেখকের 'مَعْرِفَةٌ تَصَوُّرِيَّةٌ' দ্বারা 'تَصَوُّرٌ' এই 'قِيْد' দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, এখানে 'مَعْرِفَةٌ' দ্বারা 'عِلْمٌ' দ্বারা 'أَحْوَالِ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ' উদ্দেশ্য। কেননা, এখানে 'مَعْرِفَةٌ'-কে 'اسناد' করা হয়েছে 'مُفْرَدَاتٍ' তথা 'أَحْوَالِ'-এর দিকে। সুতরাং সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, ইলমুল মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার 'لَفْظ'-এর বিভিন্ন অবস্থা 'تَصَوُّرٌ' বা কল্পনা করা যায়। যেমন- 'نَكْرَةٌ', 'تَأْكِيدٌ', 'لَام تَأْكِيدٍ' ইত্যাদি। অথচ ইলমুল মা'আনী দ্বারা এসব জিনিসকে 'تَصَوُّرٌ' করা যায় না। এর উত্তর হলো, এখানে 'مَعْرِفَةٌ' দ্বারা উদ্দেশ্য 'تَصْدِيقِيَّةٌ'। কেননা, ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে 'حَيْثٌ'-এর 'قِيْد' আছে। সে কথার প্রতি মুসান্নিফ (র.) তার বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন-

أَنَّهُ عِلْمٌ بِهِ يُعْرِفُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا يُطَابِقُ بِهَا اللَّفْظُ

অর্থাৎ 'ইলমুল মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা এ সকল অবস্থা জানা যায় এ হিসেবে যে, এগুলো মুকতাযায়ে হালের মোতাবেক হবো' আর এটা জানা কথা যে, 'أَحْوَالِ'-এর 'حَيْثٌ' দ্বারা 'تَصْدِيقٌ' হয় 'تَصَوُّرٌ' হয় না। সুতরাং 'مَعْرِفَةٌ', 'نَكْرَةٌ', 'تَقْدِيمٌ', 'تَأْخِيرٌ' ইত্যাদির 'تَصَوُّرٌ'-কে ইলমুল মা'আনী বলা হবে না; বরং এ সকল অবস্থার দ্বারা যদি 'مُقْتَضَى' এর মোতাবেক হয়, তাহলে ইলমুল মা'আনী হবে। মুসান্নিফ বলেন, এই 'حَيْثٌ'-এর 'قِيْد'-এর দ্বারা ইলমুল বয়ান এ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা, ইলমুল বয়ানে যদিও শব্দ ও বাক্যের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়; কিন্তু এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নয়; বরং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

وَالْمُرَادُ بِأَحْوَالِ اللَّفْظِ الْأُمُورُ الْعَارِضَةُ لَهُ مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْإِثْبَاتِ وَالْحَذْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمُقْتَضَى الْحَالِ فِي التَّحْقِيقِ هُوَ الْكَلَامُ الْكُلِّيُّ الْمُتَكَيِّفُ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ عَلَى مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي الْمِفْتَاحِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ لَا نَفْسُ الْكَيْفِيَّاتِ مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ عِبَارَةِ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ وَالْأَلَّا لِمَا صَحَّ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا أَحْوَالٌ بِهَا يُطَابِقُ اللَّفْظُ مُقْتَضَى الْحَالِ لِأَنَّهَا عَيْنُ مُقْتَضَى الْحَالِ وَقَدْ حَقَّقْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ وَأَحْوَالُ الْإِنْسَانِ أَيْضًا مِنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ التَّكْيِيدَ وَتَرْكَهُ مَثَلًا مِنَ الْإِعْتِبَارَاتِ الرَّاجِعَةِ إِلَى نَفْسِ الْجُمْلَةِ وَتَخْصِصِ اللَّفْظِ بِالْعَرَبِيِّ مُجَرَّدُ إِصْطِلَاحٍ لِأَنَّ الصَّنَاعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِذَلِكَ -

অনুবাদ : আর **اللفظ** (বাক্যের অবস্থাসমূহ)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সব বিষয়, যা বাক্যের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। অর্থাৎ (বাক্যস্থিত কোনো অংশকে নিজ স্থানের) আগে আনা এবং পরে আনা, (কোনো অংশকে) বাক্যে বহাল রাখা এবং উহ্য রাখা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মুকতায়্যে হাল হলো ঐ সার্বিক কালাম, যা কোনো বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। এটি মিফতাহ গ্রন্থের ইঙ্গিত অনুসারে (ব্যাখ্যা) এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মিফতাহ এবং অন্যান্য গ্রন্থের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা যা বুঝা যায় অগ্রবর্তী করা, পশ্চাত্তবর্তী করা, নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা, অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা ইত্যাদি অবস্থা (মুকতায়্যে হাল) নয়। অন্যথায় এ কথা সহীহ হবে না যে, এটি এমন অবস্থাসমূহ, যার দ্বারা বাক্যটি মুকতায়্যে হালের মোতাবেক হয়। কেননা, এটাতো মুকতায়্যে হাল। এ বিষয়টি ব্যাখ্যাগ্রন্থে (মুতাওয়ালে) বিশ্লেষণ করেছি। ইসনাদের অবস্থাসমূহও বাক্যের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ হিসেবে যে, তাকিদ হওয়া বা না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্ক জুমলার সাথে। লফয বা বাক্যকে আরবি ভাষার সাথে খাস করা একটি পরিভাষা মাত্র। কেননা, এ শাস্ত্র আরবি ভাষার শব্দ ও বাক্যের জন্যই আবিষ্কার করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِأَحْوَالِ اللَّفْظِ الخ : ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞার মধ্যে **أَحْوَالِ اللَّفْظِ** শব্দটির দ্বারা কি উদ্দেশ্য, মুসান্নিফ (র.) তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, **أَحْوَالِ اللَّفْظِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল বিষয় বা অবস্থা, যা শব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময় দেখা দেয়। যেমন- **تَقْدِيمٌ**, **تَأْخِيرٌ**, **إِثْبَاتٌ**, **حَذْفٌ** ইত্যাদি বা বাক্যের মধ্যে শ্রোতার চাহিদানুপাতে -- যেসব বৈশিষ্ট্যকে নেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى الْحَالِ : (বাহ্যিক অবস্থার দাবি) বলা হয় (শ্রোতার চাহিদানুপাতে) কোনো বৈশিষ্ট্যধারী **كُلِّي** বাক্যকে। উদাহরণ স্বরূপ শ্রোতার **إِنْكَارٌ** হলো **حَالٌ**, আর এ **مُقْتَضَى** হলো তাকীদযুক্ত একটি **كُلِّي** বাক্য। আর **لَفْظٌ** হলো একটি বিশেষ বাক্য, যাতে বিশেষ তাকীদ রয়েছে, যা **كُلِّي** বাক্যের মোতাবেক হয়। শুধুমাত্র **كَيْفِيَّاتٌ** বা অবস্থাসমূহকে মুকতায়্যে হাল বলা হয় না। লেখকের সংজ্ঞার মধ্যে যে **أَحْوَالٌ** শব্দটি রয়েছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **كَيْفِيَّاتٌ** বা অবস্থাসমূহ।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, উক্ত ব্যাখ্যা মিফতাহুল উলূমের ইবারতের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায়। তালখীসুল মিফতাহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালের মধ্যে এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে রয়েছে। মুসান্নিফ বলেন, মিফতাহুল উলূমের বাহ্যিক ইবারত দ্বারা অবশ্য أَحْوَال বা كَيْفِيَّات-কেই মুকতায়্যে হাল বুঝা যায়। কিন্তু যদি مُفْتَضَى الْحَال দ্বারা বৈশিষ্ট্য এবং كَيْفِيَّات মনে করা হয়, তাহলে সংজ্ঞা ভুল হয়ে যাবে। কারণ, তখন أَحْوَال দ্বারা উদ্দেশ্য কَيْفِيَّات বা বৈশিষ্ট্য এবং مُفْتَضَى الْحَال দ্বারাও উদ্দেশ্য কَيْفِيَّات বা বৈশিষ্ট্য। এমতাবস্থায় পুরো সংজ্ঞাটির অর্থ একরূপ হবে, ইলমে মা'আনী ঐ ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি বাক্যের ঐ সব বৈশিষ্ট্যাবলিকে জানা যায়, যে বৈশিষ্ট্যাবলি দ্বারা বাক্য বৈশিষ্ট্যাবলির মোতাবেক হয়।

এ ব্যাখ্যানুসারে مُطَابِق (এ-এর নিচে যের) হলো كَيْفِيَّات বা বৈশিষ্ট্য এবং مُطَابِق (এ-এর উপর যবর) ও كَيْفِيَّات বা বৈশিষ্ট্য। সুতরাং مُطَابِق এবং مُطَابِق এক হওয়া লামেয়ম আসছে। অথচ উভয়টা এক হওয়া বাতিল। অতএব, উভয়টাই كَيْفِيَّات হবে না; বরং মুসান্নিফের মতানুসারে حَال مُفْتَضَى-কে একটি কলী বাক্য ধরতে হবে।

সারকথা হলো এই যে, লেখকের সংজ্ঞায় বর্ণিত أَحْوَال দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كَيْفِيَّات বা বৈশিষ্ট্য। আর مُفْتَضَى حَال দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি কলী বাক্য, যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَأَحْوَالُ الْإِسْنَادِ أَيضًا : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্নটি হলো, ইলমুল মা'আনীর সংজ্ঞায় اللَّفْظُ أَحْوَال শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় ইলমুল মা'আনীর মধ্যে আরবি শব্দের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে, তাই এ সংজ্ঞার মধ্যে أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আর যখন أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাই ইলমুল মা'আনীর আলোচনার মধ্যে أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ না আসা উচিত ছিল। অথচ লেখক أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ-এর আলোচনা তার কিতাবে অবতারণা করেছেন। এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, যেসব বিষয়কে ইসনাদের অবস্থা মনে করা হয়, যেমন- تَاكِيدٌ، عَدَمُ تَاكِيدٍ، حَقِيقَةٌ وَحُجُوزٌ ইত্যাদি। এগুলো এ হিসেবে جُمْلَةٌ বা বাক্যের অবস্থার মধ্যে গণ্য হবে যে, ইসনাদ جُمْلَةٌ বা বাক্যের جُزْء বা অংশ। আর جُزْء-এর অবস্থাসমূহ جُزْء-এর মাধ্যমে كُلٌّ-এর অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং ইসনাদ-এর অবস্থাসমূহ اسْنَاد-এর মাধ্যমে جُمْلَةٌ-এর অবস্থা বলে গণ্য হবে। আর جُمْلَةٌ বা বাক্য হলো لَفْظٌ। সুতরাং ইসনাদের অবস্থাসমূহ جُمْلَةٌ-এর মাধ্যমে لَفْظ-এর অবস্থা বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ وَتَخْصِصُ اللَّفْظِ بِالْعَرَبِيِّ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ইলমুল মা'আনী দ্বারা যেমন আরবি শব্দের বিভিন্ন অবস্থা জানা যায়, তেমনি অনারবি শব্দের বিভিন্ন অবস্থাও জানা যায়। তাহলে মুসান্নিফ সংজ্ঞাটিকে আরবি শব্দের সাথে কেন নির্দিষ্ট করলেন?

এর উত্তর হলো, সংজ্ঞাতে আরবি শব্দ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য অনারবি শব্দকে বাদ দেওয়া নয়; বরং এটি একটি পরিভাষারূপে উল্লিখিত হয়েছে। কারণ, ইলমুল মা'আনীকে সাধারণভাবে আরবি শব্দের অবস্থা জানার জন্যই সংকলন করা হয়েছে। আমরা জানি, ইলমুল মা'আনীসহ পুরো বালাগাতশাস্ত্রকে পবিত্র কুরআনের মু'জিয়া প্রমাণের জন্য এবং এর হিকমত ও সূক্ষ্ম বিষয় জানার জন্য সংকলন করা হয়েছে। আর কুরআনের শব্দ আরবি, এ কারণে আরবি শব্দের কথা সংজ্ঞার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথা ইলমুল মা'আনী আরবি শব্দের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং অন্যান্য ভাষার শব্দাবলির অবস্থাও ইলমুল মা'আনী দ্বারা জানা সম্ভব।

وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُودُ مِنْ عِلْمِ الْمَعَانِي فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ اِنْحَصَرَ الْكُلُّ فِي الْأَجْزَاءِ لَا الْكُلِّيُّ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَالْأَلَّا لَصَدَقَ عِلْمُ الْمَعَانِي عَلَى كُلِّ بَابٍ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ وَأَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَأَحْوَالُ الْمُسْنَدِ وَأَحْوَالُ مُتَعَلِّقَاتِ الْفِعْلِ وَالْقَضَرُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْفَضْلُ وَالْوَضْلُ وَالْإِنْجَازُ وَالْإِطْنَابُ وَالْمُسَاوَاةُ وَإِنَّمَا اِنْحَصَرَ فِيهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ أَمَّا خَبَرٌ أَوْ إِنْشَاءٌ لِأَنَّهُ لَا مُحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ قَائِمَةٍ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ تَعَلَّقُ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ بِالْآخِرِ بِحَيْثُ يَصِحُّ السُّكُوتُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ إِنْجَابًا أَوْ سَلْبًا أَوْ غَيْرَهُمَا كَمَا فِي الْإِنْشَائِيَّاتِ وَتَفْسِيرُهُمَا بِإِنْقَاعِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ سَلْبِهِ عَنْهُ خَطَأً فِي هَذَا الْمَقَامِ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَمِلُ النِّسْبَةُ الَّتِي فِي الْكَلَامِ الْإِنْشَائِيَّاتِ فَلَا يَصِحُّ التَّفْسِيرُ -

অনুবাদ : ইলমুল মা'আনীর মূল বিষয় আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ (এই সীমাবদ্ধকরণ) একটি কুল বা পূর্ণাবস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার মতো। একটি কুলি তার অধীন বিভিন্ন ফর্দ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার মতো নয়। অন্যথায় প্রত্যেকটি অধ্যায়কে ইলমুল মা'আনী বলা যেত। ১. ইসানদে খবরী-এর বিভিন্ন অবস্থা, ২. মুসনাদ ইলাইহ-এর বিভিন্ন অবস্থা, ৩. মুসনাদের বিভিন্ন অবস্থা, ৪. ফে'লের মুতা'আল্লিকের বিভিন্ন অবস্থা, ৫. কসর, ৬. ইনশা, ৭. ওয়াসল এবং ফসল, ৮. ই'জায়, ইতনাব ও মুসাওয়াত। এগুলোর মধ্যেই ইলমুল মা'আনী সীমাবদ্ধ। কারণ বাক্য (সাধারণভাবে) হয় বর্ণনামূলক অথবা আদেশ-নিষেধমূলক। কেননা, বাক্য অবশ্যই পরিপূর্ণ একটি নিসবত (সম্পর্ক)-কে শামিল করবে যা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ-এর মাঝে বিদ্যমান এবং বক্তার সাথে সংশ্লিষ্ট। (নিসবত বলা হয়) দু'টি বস্তুর একটির সম্পর্ক আরেকটির সাথে হওয়া এমনভাবে যে, এর উপর চুপ থাকা সহীহ, চাই সে সম্পর্ক না-বাচক হোক অথবা হ্যাঁ-বাচক হোক বা এ দু'টি ছাড়া অন্য কিছু হোক। যেমন- ইনশায়ী বাক্যের মধ্যে হয়ে থাকে।

নিসবতের সংজ্ঞা মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহর সাথে যুক্ত করা বা মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহ থেকে নফীকরণ দ্বারা করা এ স্থানে ভুল। কেননা, এ সংজ্ঞা ইনশায়ী বাক্যের নিসবতকে শামিল করে না। সুতরাং (এ সংজ্ঞার পর) প্রকারভেদ করা ঠিক হবে না।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيَنْحَصِرُ الْمَقْصُودُ الْخ: মূল লেখক বলেন, ইলমুল মা'আনীর মূল আলোচনা আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ। বিষয়টি এরূপে যে, ইলমুল মা'আনী একটি কুল, আর তার আটটি জু: রয়েছে অর্থাৎ একটি কুল আটটি জু: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিষয়টি এমন নয় যে, ইলমুল মা'আনী একটি কুলি তার জু: হলো আটটি।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, কুলি এবং কুল-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কুলি তার জু: এর উপর প্রয়োগ হয়: যেমন- إِنْسَانٌ (মানুষ) একটি কুলি তার জু: (যেমন রাশেদ)-এর উপর إِنْسَانٌ (মানুষ) কথাটি প্রয়োগ হবে; কিন্তু কুল তার জু: এর উপর প্রয়োগ হয় না। যেমন- রাশেদ একটি কুল তার হাত পা ইত্যাদি তার জু:। সুতরাং হাত, পা, ইত্যাদিকে কখনো রাশেদ বলা যাবে না। সুতরাং ইলমুল মা'আনী যদি কুলি হতো, তাহলে তার প্রত্যেকটি অধ্যায়কে ইলমুল মা'আনী বলা যেত, অথচ তা বলা যায় না।

هُوَ تَعَلَّقَ أَحَدُ الشَّيْبَانِ بِالْآخِرِ بِحَبْنُ بَصَحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ إِنْجَابًا أَوْ سَلْبًا أَوْ غَيْرَهُمَا

অর্থাৎ নিসবত বলা হয় দু'টি বিষয়ের একটি অপরটির সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত হওয়া যে, বক্তার জন্য বাক্যটি বলেই ক্ষান্ত হওয়া সহীহ হয় এবং শ্রোতা তার কথা বুঝার জন্য অতিরিক্ত কথা শোনার প্রয়োজন মনে করে না। এ সম্পর্ক ইতিবাচক হতে পারে, যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান) অথবা নেতিবাচকও হতে পারে, যেমন- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়) অথবা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক কোনোটাই নয়, যেমন- ইন্শা-এর বিভিন্ন প্রকার। যথা, আমার বা আদেশসূচক বাক্য- اِفْعَلْ (তুমি করো), নিষেধসূচক বাক্য- لَا تَفْعَلْ (তুমি করো না) ইত্যাদি।

قَوْلُهُ وَتَفْسِيرُهُمَا بِإِيقَاعِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ : মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোক নিসবতের সংজ্ঞা প্রদান করেন এভাবে যে, নিসবত বলা হয় মুসনাদ ইলাইহ বা বাক্যের উদ্দেশ্যের জন্য বিধেয়কে সাব্যস্ত করা অথবা উদ্দেশ্য থেকে বিধেয়কে না-বাচক করে দেওয়া।

মুসান্নিফ বলেন, তাদের এ সংজ্ঞা ক্ষেত্রবিশেষে (বর্ণনামূলক বাক্য) সঠিক হলেও এ স্থানের জন্য (অর্থাৎ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এবং جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ প্রকারভেদ করার ক্ষেত্রে) এ সংজ্ঞা ভুল বা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, তাদের এ সংজ্ঞা جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ-এর নিসবতকে অন্তর্ভুক্ত করে না। (কারণ, جُمْلَةٌ اِنْشَائِيَّةٌ-এর মধ্যে উদ্দেশ্যের জন্য বিধেয়কে প্রমাণ বা বিধেয়কে না-বাচক করা হয় না) অতএব, এখানে নিসবতের এমন একটি সংজ্ঞা আনতে হবে, যা اِنْشَائِيَّةٌ ও خَبَرِيَّةٌ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহলে এরপর উভয়ের প্রকারভেদ করা সঠিক হবে। এ হিসেবে মুসান্নিফের বর্ণিত সংজ্ঞাটিই সঠিক।

فَالْكَلَامُ إِنْ كَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ فِي أَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ أَيْ يَكُونُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ فِي
 الْخَارِجِ نِسْبَةٌ ثُبُوتِيَّةٌ أَوْ سَلْبِيَّةٌ تَطَابُقُهُ أَيْ تَطَابُقُ تِلْكَ النِّسْبَةِ ذَلِكَ الْخَارِجُ بِأَنْ
 يَكُونَا ثُبُوتِيَّيْنِ أَوْ سَلْبِيَّيْنِ أَوْ لَا تَطَابُقُهُ بِأَنْ تَكُونَ النِّسْبَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنَ الْكَلَامِ
 ثُبُوتِيَّةً وَالَّتِي بَيْنَهُمَا فِي الْخَارِجِ وَالْوَاقِعِ سَلْبِيَّةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ فَخَبَرٌ أَيْ فَاَلْكَلَامُ خَبَرٌ
 وَالْآيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ كَذَلِكَ فَإِنْشَاءٌ وَتَحْقِيقٌ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ
 لَهُ نِسْبَةٌ بِحَيْثُ تَحْصُلُ مِنَ اللَّفْظِ وَيَكُونُ اللَّفْظُ مُوجِدًا لَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى كَوْنِهِ
 دَالًّا عَلَى نِسْبَةٍ حَاصِلَةٍ فِي الْوَاقِعِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ الْإِنْشَاءُ أَوْ يَكُونُ نِسْبَتُهُ بِحَيْثُ
 يَقْصُدُ أَنَّ لَهَا نِسْبَةً خَارِجِيَّةً تَطَابُقُهَا أَوْ لَا تَطَابُقُهَا فَهُوَ الْخَبَرُ لِأَنَّ النِّسْبَةَ
 الْمَفْهُومَةَ مِنَ الْكَلَامِ الْحَاصِلَةَ فِي الذَّهْنِ لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَمَعَ قَطْعِ
 النَّظَرِ عَنِ الذَّهْنِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فِي الْوَاقِعِ نِسْبَةٌ ثُبُوتِيَّةٌ بِأَنْ
 يَكُونَ هَذَا ذَاكَ أَوْ سَلْبِيَّةٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ هَذَا ذَاكَ الْآ تَرَى أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ فَإِنَّ نِسْبَةَ
 الْقِيَامِ مَثَلًا حَاصِلَةً لَزَيْدٍ قَطْعًا سَوَاءً قُلْنَا إِنَّ النِّسْبَةَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ أَوْ لَيْسَتْ
 مِنْهَا وَهَذَا مَعْنَى وَجُودِ النِّسْبَةِ الْخَارِجِيَّةِ -

অনুবাদ : সূত্রাং বাক্যের (থেকে প্রাপ্ত) নিসবতের যদি একটি বাস্তবতা থাকে তিন কালের কোনো একটি
 কালে। অর্থাৎ বাক্যের প্রধান দু'টি অংশের মাঝে বাস্তবে যদি একটি ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক নিসবত থাকে
 (আর) সেই নিসবতটি বাস্তবে তার মোতাবেক হবে অর্থাৎ বাক্যের নিসবত ও বাস্তব উভয়টি ইতিবাচক হয়
 অথবা নেতিবাচক হয়। অথবা মোতাবেক হবে না। অর্থাৎ বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবতটি ইতিবাচক, আর বাক্যের
 দুই প্রধান অংশের মাঝের বাস্তব বা বাহ্যিক অবস্থার সম্পর্কটি নেতিবাচক হয় অথবা এর বিপরীত হয়, তাহলে তা
 খবর তথা বর্ণনামূলক বাক্য। অন্যথায় অর্থাৎ যদি সেই (বাক্যের) নিসবতটির কোনো রকম বাস্তবতা নেই, তাহলে
 তা ইনশা। এর বিশ্লেষণ হচ্ছে, কালাম বা বাক্যের একটি নিসবত বা সম্পর্ক থাকবে যা (বাক্যস্থিত) শব্দ থেকে
 অর্জিত হয় এবং শব্দটিই সেই নিসবতের জন্মদাতা হয়। এটি বাস্তবের দু'টি বস্তুর মাঝে কোনো নিসবতের প্রতি
 ইঙ্গিতবহ- এরকম ইচ্ছা করা ছাড়াই (এমন হলে) এটি ইনশা। অথবা, বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবতটি এমন যে, এর
 জন্য বাস্তব জগতের একটি সম্পর্কের ইচ্ছা করা হয় যা বাস্তবের নিসবতের মোতাবেক হবে, অথবা হবে না।
 (এমন হলে) এটি খবর বা বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য। কেননা, বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবত যা (বক্তার) মনোজগতে অর্জিত
 হয়েছে, অবশ্যই তা দু'টি জিনিসের মাঝে হতে হবে এবং মনোজগতের কথা বাদ দেওয়া অবস্থায়ও অবশ্যই এ
 দু'টি জিনিসের মাঝে বাস্তবে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক হয়ে থাকে অর্থাৎ এটি এমনই, অথবা নেতিবাচক অর্থাৎ এটি
 এমন নয়। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন না যে, আপনি যখন উদাহরণ স্বরূপ বললেন, زَيْدٌ قَائِمٌ (এর থেকে)
 নিশ্চিতভাবে দাঁড়ানোর সম্পর্ক যায়েদের সাথে পাওয়া গেল। তাই আমরা সে নিসবতটিকে বাস্তব জগতের বলে
 থাকি। অথবা বাস্তব জগতের নাই হোক, এটাই হচ্ছে নিসবতে খারিজিয়াহ-এর অস্তিত্বের অর্থ।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

جُمْلَةٌ এবং جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ : মূল লেখক অর্থাৎ তালখীসুল মিসফতাহের রচয়িতা جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ এবং جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ : 'দু' ধরনের বাক্যের সংজ্ঞা দিচ্ছেন। মুসান্নিফ (র.) তাঁর সংজ্ঞাটিকে নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণে উপস্থাপন করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাধারণভাবে কালাম বা বাক্য (খবরিয়াহ অথবা ইনশাইয়াহ)-এর নিসবত অর্থাৎ 'নিসবতে কালামিয়াহ' যদি তিনকাল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)-এর কোনো এক কালে নিসবতে খারিজীরূপে পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাক্যের দুই প্রধান অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাঝে বাস্তবে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্ক পাওয়া যায়। এরপর বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবত তথা নিসবতে কালামিয়াহ সেই বাস্তবতার নিসবতের মোতাবেক বা অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ নিসবতে কালামিয়াহ হ্যাঁ-বাচক এবং নিসবতে খারিজিয়া ও হ্যাঁ-বাচক। নিসবতে কালামিয়াহ না-বাচক এবং নিসবতে খারিজীও না-বাচক। অথবা নিসবতে কালামিয়াহ নিসবতে খারিজিয়াহ-এর মোতাবেক হয় না। অর্থাৎ নিসবতে কালামিয়াহ ইতিবাচক এবং নিসবতে খারিজিয়াহ নেতিবাচক অথবা এর উল্টো। যাই হোক মোতাবেক হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় এটি جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বা বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য এবং এর মধ্যে সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পক্ষান্তরে যে বাক্যের নিসবতে কালামিয়াহ-এর এমন কোনো বাস্তবতা নেই, যার মোতাবেক নিসবতে কালামিয়াহ হতে পারে অথবা হতে পারে না। সে বাক্যকে কালামে ইনশাইয়াহ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইনশায়ী বাক্যে বাস্তবে নিসবত না থাকার কারণে এটি সত্য বা মিথ্যা কোনোটাই হতে পারে না।

قَوْلُهُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ : এখান থেকে মুসান্নিফ উপরে উল্লিখিত দু' ধরনের বাক্য (ইনশা ও খবর)-এর মাঝে কি পার্থক্য তা বর্ণনা করেছেন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের বক্তব্য দ্বারা মনে হয়েছে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-এর নিসবতে কালামিয়াহ যেমন আছে তেমনি সেই নিসবতে কালামিয়াহ-এর একটি নিসবতে খারিজী আছে। কিন্তু جُمْلَةٌ انشائية-এর নিসবতে কালামিয়াহ আছে বটে, তবে তার নিসবতে খারিজী নেই। কিন্তু আমার তাহকীক হলো جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ انشائية উভয় ধরনের বাক্যের নিসবতে কালামিয়াহ এবং নিসবতে খারিজিয়াহ (উভয়টাই) আছে। তবে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-এর মধ্যে নিসবতে কালামিয়াহ-এর নিসবতে খারিজীর সাথে মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার ইচ্ছা করা হয়। কিন্তু ইনশায়ী বাক্যের মধ্যে নিসবতে কালামিয়াহ-এর নিসবতে খারিজীর সাথে মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার ইচ্ছা করা হয় না।

মুসান্নিফের ভাষায় সাধারণ বাক্য (খবর এবং ইনশা)-এর একটি নিসবত থাকে, যা বাক্যের শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় এবং শব্দগুলো সেই নিসবতের জন্মদাতা। এরপর যদি এ ইচ্ছা না করা হয় যে, এ নিসবত বাস্তবে দু'টি জিনিসের মাঝে যে নিসবত আছে তার উপর ইঙ্গিত করে; তাহলে তা ইনশা, (সুতরাং তার ব্যাক্যামতে ইনশার জন্য নিসবতে খারিজী প্রমাণ হলো)।

আর বাক্যের নিসবত থেকে বাস্তবের নিসবতের যেখানে ইচ্ছা করা হয় যে, এটি বাস্তবের মোতাবেক হবে বা হবে না; তাহলে একে جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ لَا التَّسَبُّعَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ الْكَلَامِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) জুমলায়ে খবরিয়ার দু' নিসবত এবং এক নিসবতের সাথে আরেক নিসবতের মোতাবেক হওয়া এবং না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, বাক্য থেকে যে নিসবতটি বুঝা যায় এবং বক্তার মনোজগতে যা স্থান লাভ করে এর জন্য অবশ্যই দু'টি বস্তুর দরকার যে দু'টি বস্তুর মাঝে উক্ত নিসবতটি হবে। এ দু'টি বস্তু হচ্ছে মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ।

আবার মনোজগতের কথা বাদ দিয়ে উক্ত দু'টি বস্তুর মাঝে বাস্তব বা বাহ্যিক জগতে যে নিসবত বা সম্পর্ক তৈরি হয় তা অবশ্যই দু'ভাবে হবে। ইতিবাচক হবে যেমন- (কেউ বলল) هَذَا ذَاكَ এটা হলো তা। এতে هَذَا হলো মুসনাদ ইলাইহ বা উদ্দেশ্য। অথবা শব্দ দু'টির মাঝে সম্পর্ক হবে নেতিবাচক যেমন- (কেউ বলল,) ذَاكَ لَا هَذَا এটা তা নয়। এখানে هَذَا বা এটা হলো উদ্দেশ্য, আর ذَاكَ বা তা হলো বিধেয়।

কথাটি আরো স্পষ্টভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, আপনি যখন বলবেন **زَيْدٌ قَائِمٌ** (যায়েদ দণ্ডায়মান) তখন অবশ্যজ্ঞাবীভাবে যায়েদের জন্য **قَائِمٌ** বা দাঁড়ানোর নিসবত বাস্তব বা বাহ্যিক জগতে সৃষ্টি হবে। চাই সে নিসবতকে **أَمْرٌ خَارِجِيٌّ** (বাহ্যিক বিষয়বলির) অন্তর্ভুক্ত মনে করা হোক। যেমন-**حُكْمًا** দের মাযহাব। অথবা সেই নিসবতটি বাহ্যিক বিষয়বলির অন্তর্ভুক্ত না হোক; বরং তা **إِعْتِبَارِيٌّ** (ধরে নেওয়া বা মনে করার) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হোক। এ মতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের।

সুতরাং নিসবতে খারিজীর অর্থ এটাই দাঁড়াল যে, এ নিসবতটি বাস্তবে এবং প্রকৃতপক্ষে দু'টি জিনিসের মধ্যে হবে বা দু'টি জিনিসের মাঝে তা বিদ্যমান থাকবে।

قَوْلُهُ سَرَاءٌ قُلْنَا إِنَّ النِّسْبَةَ الْخَارِجِيَّةَ : এ কথার দ্বারা মুসান্নিফ উক্ত নিসবত (যা **أَعْرَاضُ نَسَبِيَّةٍ**-এর অন্তর্ভুক্ত) সম্পর্কে দু'টি মাযহাব উল্লেখ করেছেন। মূলত এ মতবিরোধ যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত (আকিদাগতভাবে যথা আশায়েরা মাতুরীদিয়্যাহ) এবং **حُكْمًا**-এর মাঝে হয়েছে। আর **أَعْرَاضُ نَسَبِيَّةٍ** (এর আলোচনা **فَصَاحَةٌ مُتَكَلِّمٍ**-এর মধ্যে গেছে) নিয়ে হয়েছে। মতবিরোধটা হচ্ছে এই-**حُكْمًا** মনে করেন **أَعْرَاضُ نَسَبِيَّةٍ**-এর অস্তিত্ব বাস্তব জগতে এমনভাবে হয়ে থাকে, যা চোখে দেখা সম্ভব। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে মনে করেন **اعراض نسبية**-এর অস্তিত্ব **إِعْتِبَارِيٌّ** (বা যার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়) অর্থাৎ বাস্তব জগতে এর অস্তিত্ব এমন নয় যা দেখা যাওয়া সম্ভব। তারা বলেন, **أَعْرَاضُ نَسَبِيَّةٍ**-এর অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তা এতটুকু নয় যে, তা দেখা যেতে পারে; বরং তার অস্তিত্ব অনুভবে বা মস্তিষ্কে রয়েছে। উভয় মতানুসারে বাস্তব জগতে **قَائِمٌ** বা দাঁড়ানোর নিসবত বা সম্পর্ক অবশ্যই যায়েদের সাথে হয়েছে। (এতে কারো দ্বিমত নেই) এটাই নিসবতে খারিজী বা নিসবতে খারিজীর অস্তিত্বের অর্থ এটাই (চাই সেটা দেখা সম্ভব হোক বা না হোক)। উল্লেখ্য যে, কারো কারো মতে **أَعْرَاضُ نَسَبِيَّةٍ**-এর কোনো অস্তিত্ব মনোজগতেও নেই; বরং তা মনোগত বিষয়। এ মতানুসারে প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে যে, আপনারা যখন বললেন, এটি **أَمْرٌ إِعْتِبَارِيٌّ**, এর অস্তিত্ব বাহ্যিক জগতেও নেই এবং মনোজগতেও নেই, তাহলে এর সত্য বা মিথ্যা হওয়ার কি অর্থ? এর উত্তর হলো, এ মতে **كَذِبٌ** বা মিথ্যার জন্য কোনো বিষয়ের প্রতি নির্ভর করতে হবে না; বরং বিষয়টি এমন হবে যে, মস্তিষ্ক তাকে পৃথক করবে এবং এতেই **كَذِبٌ** বা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। যেমন-**كُرْمُ الْبَغِيلِ** কৃপণের দানশীলতা, অথবা **بُخْلُ الْكَرِيمِ** দানশীল ব্যক্তির কৃপণতা। প্রথম উদাহরণে কৃপণ থেকে কৃপণতা এবং দ্বিতীয় উদাহরণে দানশীল থেকে দানশীলতাকে পৃথক করা হয়েছে। আর **صَادِقٌ** বা সত্য বলা হবে যার মধ্যে কোনো বাস্তব বিষয়ের প্রতি নির্ভরশীলতা থাকবে। যেমন- যায়েদের পিতৃত্ব আমরের জন্য। [আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন।]

সার-সংক্ষেপ :

বাক্য প্রধানত দু'প্রকার : ১. সংবাদ বা বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য, ২. ইনশামূলক বাক্য। আট প্রকারের দলিলে হসর এই যে, যদি বাক্যের একটি **نِسْبَةُ خَارِجِيَّةٍ** থাকে এবং **نِسْبَةُ كَلَامِيَّةٍ** তার মোতাবেক হয়, তাহলে বাক্যটি বর্ণনামূলক। আর যদি বাক্যের **نِسْبَةُ خَارِجِيَّةٍ** না থাকে, তাহলে তা ইনশামূলক বাক্য বা **جُمْلَةٌ إِنشَائِيَّةٍ**; বর্ণনামূলক বাক্যে মুসনাদ, মুসনাদ ইলাইহ ও ইসনাদ থাকা আবশ্যিক। মুসনাদ যদি শাব্বিক অথবা অর্থগতভাবে ফেল হয়, তাহলে তার **مُتَعَلِّقَاتٌ** হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ইসনাদ **مَقْصُورٌ** (সীমাবদ্ধ) হবে অথবা হবে না। প্রত্যেকটি বাক্য অন্যের সাথে মিলে আসবে (**وَصَلَ**) অথবা ভিন্ন-স্বতন্ত্ররূপে (**فَصَلَ**) আসবে।

বালাগাতসম্পন্ন বাক্য কখনো আসল অর্থ থেকে বেশি শব্দে বর্ণিত হবে, অথবা আসল অর্থ আদায় করা হবে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে, কিংবা মধ্যমপন্থায় বাক্যের আসল অর্থ বিবৃত হবে। প্রথম প্রকারকে **إِطْنَابٌ** দ্বিতীয় প্রকারকে **إِيجَازٌ** আর তৃতীয় প্রকারকে **مُسَارَاتٌ** বলা হয়।

وَالْخَبْرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَمُسْنَدٍ وَاسْنَادٍ وَالْمُسْنَدُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مُتَعَلِّقَاتٌ إِذَا كَانَ فِعْلًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَالْمَصْدَرِ وَاسْمَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ هَذَا الْكَلَامِ بِالْخَبَرِ وَكُلُّ مَنْ الْإِسْنَادِ وَالْتَّعَلُّقِ إِمَّا بِقَصْرِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْرِ وَكُلُّ جُمْلَةٍ قُرِئَتْ بِأُخْرَى إِمَّا مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرُ مَعْطُوفَةٍ وَالْكَلَامُ الْبَلِيغُ إِمَّا زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ لِفَائِدَةٍ اخْتَرَزَ بِهِ عَنِ التَّطْوِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ بَعْدَ تَقْيِيدِ الْكَلَامِ بِالْبَلِيغِ أَوْ غَيْرِ زَائِدٍ هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ لَكِنْ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْقَصْرِ وَالْفَضْلِ وَالْوَصْلِ وَالْإِيجَازِ وَمُقَابِلَتِهِ إِمَّا هِيَ مِنْ أَحْوَالِ الْجُمْلَةِ أَوْ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ الْمُسْنَدِ مِثْلُ التَّائِيدِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَيَانُ سَبَبِ أَفْرَادِهَا وَجَعْلُهَا أَبْوَابًا بِرَأْسِهَا وَقَدْ لَخَّصْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ -

অনুবাদ : আর সংবাদমূলক বাক্যের জন্য অবশ্যই একটি মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য), একটি মুসনাদ (বিধেয়) এবং একটি ইসনাদ জরুরি। মুসনাদ যখন ফে'ল অথবা যা ফে'লের অর্থে যেমন, মাসদার, ইসমে ফায়েল ও ইসমে মফউল এ জাতীয় কিছু হয়, তখন তার জন্য مُتَعَلِّقَات (সম্পর্কিত আরো কিছু) হয়। এ কালামকে সংবাদমূলক বাক্যের সাথে খাস করার কোনো বিশেষ যুক্তি নেই; (বরং এটি সংবাদমূলক বাক্য এবং ইনশা উভয়ই হতে পারে) ইসনাদ এবং তা'আলুক প্রত্যেকটি কসরের সাথে হবে অথবা কসর ছাড়া হবে। প্রত্যেকটি বাক্য আরেকটি বাক্যের সাথে মিলে আসবে, হয়তো অপরটির উপর আত্মফ হবে অথবা আত্মফ হবে না। আর বালাগাতপূর্ণ বাক্য হয়তো কোনো বিশেষ উপকারিতার জন্য আসল অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত হবে। (এ-ফাইদে-এর (ফَيْد) দ্বারা تَطْوِيل থেকে বাক্যকে মুক্ত করা হয়েছে। তবে বাক্যকে বালাগাতপূর্ণ হতে হবে (এ শর্ত দ্বারা) সীমাবদ্ধ করার পর (فَائِدَة) এই ফَيْد টির প্রয়োজন পড়ে না। অথবা (বালাগাতপূর্ণ বাক্য) অতিরিক্ত হবে না। এসব তো প্রকাশ্য বিষয়। ভিন্নভাবে এর আলোচনাতে কোনো বিশেষ উপকারিতা নেই। কেননা, এসব কিছু যা তিনি উল্লেখ করলেন অর্থাৎ কসর, ফসল ও ওয়াসল, ঈজায এবং তার বিপরীতগুলো। এগুলো তো বাক্য অথবা মুসনাদ ইলাইহ বা মুসনাদেরই বিভিন্ন অবস্থা। এগুলো তাকীদ, তাকদীম ও তাখীর ইত্যাদির মতো (মুসনাদ ইলাইহ, মুসনাদ ও ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থা, যা তিনি পৃথকভাবে বর্ণনা করেননি) এ স্থানে যা বর্ণনা করার দরকার (ছিল, তা হলো) এগুলোকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার এবং এগুলোর জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায় নির্ধারণ করার কারণ উল্লেখ করা। এ বিষয়টি আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওয়াল)-এ সংক্ষেপে তুলে ধরেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْخَبْرُ لَا بُدَّ لَهُ الْخ মূল লেখক উল্লিখিত ইবারতে ইতঃপূর্বে ذَلِيلُ حَصْر তথা আট অধ্যায়ে ইলমূল মা'আনী সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলেন, তারই অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করে দলিলে হসরের সমাপ্তি টানেন।

তিনি বলেছিলেন, বাক্য থেকে প্রাপ্ত নিসবতে কালামিয়্যার জন্য হয়তো একটি নিসবতে খারিজী থাকবে এবং নিসবতে কালামিয়্যাহ নিসবতে খারিজীর মোতাবেক হবে অথবা হবে না। এমন হলে এ ধরনের বাক্যকে خَبْر বা সংবাদমূলক বাক্য বলা হবে।

আর যদি নিসবতে কালামিয়্যাহর নিসবতে খারিজী না থাকে, তবে তাকে أَنْشَاء বলা হবে। أَنْشَاء-এর আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হয়েছে। আর যদি خَبْر বা সংবাদ বর্ণনামূলক বাক্য হয় তাহলে তার তিনটি অংশ থাকবে- ১. ইসনাদ, ২. মুসনাদ ইলাইহ ও ৩. মুসনাদ।

সার-সংক্ষেপ : দলিলে হসরের পূর্ণ বিবরণ পূর্ববর্তী সার-সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ মূল লেখকের উপর আপত্তি করেন যে, قَصْرٌ وَصَلٌ এবং فَصْلٌ إِنِّجَازٌ ইত্যাদি জুমলা, মুসনাদ ইলাইহ কিংবা মুসনাদের অবস্থার মধ্যে গণ্য হয়। অতএব, ভিন্ন ভিন্নভাবে এর আলোচনা না করলেও চলত। যেহেতু লেখক ভিন্ন ভিন্ন এগুলো আলোচনা করেছেন তাই এখানে লেখকের পৃথককরণের কারণ বর্ণনা করা উচিত ছিল।

تَنْبِيْهِ عَلَى تَفْسِيْرِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ الَّذِي قَدْ سَبَقَ اِشَارَةُ مَا اِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ
 تُطَابِقُهُ اَوْ لَا تُطَابِقُهُ اِخْتَلَفَ الْفَائِلُونَ بِاِنْحِصَارِ الْخَبَرِ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فِي
 تَفْسِيْرِهِمَا فِقِبِلَ صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ اَيَّ مُطَابَقَةٍ حُكِمَ لِلْوَاقِعِ وَهُوَ الْخَارِجُ الَّذِي
 يَكُوْنُ لِنِسْبَةِ الْكَلَامِ الْخَبَرِيُّ وَكَذِبُهُ اَيَّ كِذْبٍ الْخَبَرِ عَدَمُهَا اَيَّ عَدَمٍ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ
 يَعْنِي اَنَّ الشَّيْئَيْنِ الَّذَيْنِ اَوْقَعَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةً فِي الْخَبَرِ لَا بُدَّ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ
 فِي الْوَاقِعِ اَيَّ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِي الدِّهْنِ وَعَمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فَمُطَابَقَةٌ تِلْكَ
 النِّسْبَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنَ الْكَلَامِ لِلنِّسْبَةِ الَّتِي فِي الْخَارِجِ بِاَنْ تَكُوْنَا ثُبُوْتِيَّتَيْنِ اَوْ
 سَلْبِيَّتَيْنِ صِدْقٌ وَعَدَمُهَا بِاَنْ تَكُوْنَا اِحْدَهُمَا ثُبُوْتِيَّةٌ وَالْاُخْرَى سَلْبِيَّةٌ كِذْبٌ -

অনুবাদ : জ্ঞাতব্য : সত্য (সত্য) এবং কذب (মিথ্যা)-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে। লেখকের ইবারত **تَنْبِيْهِ** অর্থে **تُطَابِقُهُ** অর্থে এর মধ্যে এর প্রতি কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। যারা খবরকে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন তারা **صِدْقُ** (সত্য) **كَذِبُ** (মিথ্যা)-এর সংজ্ঞার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, **صِدْقُ الْخَبَرِ** বলা হয় খবরের হুকুম বাস্তবের মোতাবেক হওয়াকে। **وَاقِعٌ** বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবতের বাস্তব অবস্থাকে। আর **كَذِبُ الْخَبَرِ** বলা হয় (খবরের হুকুম) বাস্তবের মোতাবেক না হওয়াকে। অর্থাৎ যে দু'টি বস্তুর মাঝে খবরের ক্ষেত্রে একটি নিসবত করা হয় তার জন্য বাস্তবে একটি নিসবত থাকা আবশ্যিক। অর্থাৎ মনের মধ্যে যা আছে এবং বাক্য যে নিসবতের উপর নির্দেশনা করে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। সুতরাং বাক্য বা কালাম থেকে অর্জিত নিসবতটি বাস্তবের নিসবতের মোতাবেক হওয়া অর্থাৎ উভয়টি হ্যাঁ-বাচক হওয়া অথবা না-বাচক হওয়া হলো সিদ্ধ বা সত্য। আর মোতাবেক না হওয়া অর্থাৎ (কালামের বা বাস্তবের) দু'টি নিসবতের একটি নাবাচক হওয়া এবং অপরটি হ্যাঁ-বাচক হওয়াকে কিয়ব বা মিথ্যা বলা হয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

هَذَا تَنْبِيْهِ عَلَى تَفْسِيْرِ الْخَبَرِ : শব্দের অর্থ- সতর্কতা, বিশেষ দ্রষ্টব্য, টীকা, জ্ঞাতব্য ইত্যাদি। পরিভাষায় **تَنْبِيْهِ** বলা হয় কোনো কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলার পর **تَنْبِيْهِ**-এর মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বলা। ইতঃপূর্বে মূল লেখক ইলমুল মা'আনী আটটি অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে **خَبَرٌ**-এর আলোচনা করেছেন। সেখানে খবরের নিসবতে কালামী নিসবতে খারেরজীর মোতাবেক হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে বলেছেন **تُطَابِقُهُ وَلَا تُطَابِقُهُ** সুতরাং উক্ত বাক্যের এ অংশের মধ্যে **صِدْقٌ** এবং **كَذِبٌ**-এর আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে চলে গেছে। সেই আলোচনাটি বিস্তারিতভাবে করার জন্য এখানে **تَنْبِيْهِ** শব্দটি আনা হয়েছে।

هَذَا تَنْبِيْهِ عَلَى تَفْسِيْرِ الْخَبَرِ : এখানে **تَنْبِيْهِ** শব্দটি মুবতাদার খবর হয়েছে। সুতরাং মূল ইবারত হবে এরূপ- **تَنْبِيْهِ عَلَى تَفْسِيْرِ الْخَبَرِ** : **قَوْلُهُ اِخْتَلَفَ الْفَائِلُونَ بِاِنْحِصَارِ الْخَبَرِ** : মুসান্নিফ বলেন, **خَبَرٌ** বা বর্ণনামূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিনা এ ব্যাপারে বালাগাত বিশারদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম এবং নিয়াম মু'তাযেলীর মতে **خَبَرٌ** সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ একটি **جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ** বা বর্ণনামূলক বাক্য হয়তো সত্য হবে অথবা মিথ্যা হবে। এ দু'য়ের বাইরে আর কিছু হবে না।

আল্লামা জাহিযের মতে, খবর বা বর্ণনামূলক বাক্য এ দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এ দু'য়ের বাইরে এমন সব বাক্যও রয়েছে, যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। জমহুর ওলামা এবং নিয়াম মু'তাযেলী **صَدَقَ** (সত্য) এবং **كَذَبَ** (মিথ্যা)-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আবার দু'টি মতে বিভক্ত হয়ে পড়েন। উল্লেখ্য যে, এখানে **صَدَقَ** এবং **كَذَبَ** দ্বারা **صَادِقٌ** এবং **كَاذِبٌ** উদ্দেশ্য। কারণ, **خبر** যে দু'প্রকারে বিভক্ত তা হচ্ছে **صَادِقٌ** এবং **كَاذِبٌ** **صَدَقَ** এবং **كَذَبَ** নয়।

صَدَقَ -এখান থেকে জমহুরের বর্ণিত সংজ্ঞা শুরু হয়েছে। জমহুর বলেন- **صَدَقَ** **الْخَبَرُ مُطَابَقَتَهُ** অর্থাৎ সত্য খবর বলা হয়- খবরটি বাস্তবের সাথে মিলে যাওয়াকে। এখানে মুসান্নিফ **الْخَبَرُ مُطَابَقَتَهُ لِلرَّاقِعِ** -এর ব্যাখ্যা বলেন **أَيُّ مُطَابَقَةٍ حُكْمٍ** অর্থাৎ খবরের **حُكْم** বাস্তবের অনুরূপ হওয়া। তার এরূপে ব্যাখ্যা করার কারণ হলো মূলত **خَبَرٌ** বলা হয় **لَفْظٌ** -কে, যা বাস্তবের অনুযায়ী বা বিপরীত হয়। বাস্তবের অনুযায়ী বা বিপরীত হয় নিসবতে কালামী বা **وَقُوعٌ** ও **لَا وَقُوعٌ**। এটাকেই মুসান্নিফ **حُكْم** বলেছেন। **رَاقِعٌ** -এর ব্যাখ্যা মুসান্নিফ বলেন, **هُوَ الْخَارِجُ** **كَذَبَ الْخَبَرِ** -এর **رَاقِعٌ** বলা হয়। অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবতের বাস্তবতাকে **رَاقِعٌ** বলা হয়। **كَذَبَ الْخَبَرِ** -এর ব্যাপারে জমহুর বলেন, **كَذَبَ الْخَبَرِ عَدَمُهَا** অর্থাৎ মিথ্যা খবর বলা হয়, খবরটি বাস্তবতার সাথে না মিলাকে। এ বিষয়টিকে বিশদভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সে দু'টি জিনিস অর্থাৎ মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় এদের মধ্যে বাস্তবে বা বাহ্যিক জগতে একটি নিসবত থাকবে, যা নিসবতে যাহ্নী এবং নিসবতে কালামী থেকে ভিন্ন হবে। সুতরাং এ বাস্তবের নিসবতকেই নিসবতে খারিজী বলা হয়। অতএব বর্ণনামূলক বাক্য থেকে যে নিসবত অর্জিত হয় তা বাস্তবের নিসবতের সাথে মিলে যাওয়াকে **صَدَقَ** বা সত্য বলা হয়। যেমন- কোনো বর্ণনামূলক বাক্যের অর্থ হ্যাঁ-বাচক এর বাস্তবের নিসবত বা সম্পর্কও হ্যাঁ-বাচক; অথবা এর উল্টো অর্থাৎ উভয় নিসবত না-বাচক তাহলে একে **صَدَقَ** বা সত্য বলা হবে। আর এর বিপরীত অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবত হ্যাঁ-বাচক আর বাস্তবের নিসবত নাবাচক অথবা এর বিপরীত (অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের নিসবত না-বাচক আর বাস্তবের নিসবত হ্যাঁ-বাচক) হলে তা **كَذَبَ** বা মিথ্যা।

সার-সংক্ষেপ :

বালাগাত বিশারদগণের মধ্যে প্রথমত **جُمْلَةُ خَبَرِيَّةٍ** (বর্ণনামূলক বাক্য) সত্য ও মিথ্যা দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ।

জমহুর ও নিজাম মু'তাযেলীর মতে বর্ণনামূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে আল্লামা জাহিযের মতে, বর্ণনামূলক বাক্য এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর আরেকটি প্রকার রয়েছে যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়।

وَقِيلَ صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِإِعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْإِعْتِقَادُ خَطَاً غَيْرَ
مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَكَذِبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا أَيْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِإِعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَلَوْ كَانَ خَطَاً
فَقَوْلُ الْقَائِلِ السَّمَاءُ تَحْتَنَا مُعْتَقِدًا ذَلِكَ صِدْقٌ وَقَوْلُهُ السَّمَاءُ فَوْقَنَا غَيْرُ مُعْتَقِدٍ
لِذَلِكَ كِذْبٌ وَالْمَرَادُ بِإِلْعَاقِ الْحُكْمِ الدِّهْنِيِّ الْجَازِمِ أَوْ الرَّاجِحِ فَيَعْمُ الْعِلْمُ وَالظَّنُّ
وَهَذَا يُشْكِلُ بِخَبَرِ الشَّاكِّ لِعَدَمِ الْإِعْتِقَادِ فِيهِ فَيَلْزِمُ الْوَاسِطَةَ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِنْحِصَارُ
اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ كَاذِبٌ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الْإِعْتِقَادُ صَدَقَ عَدَمُ مُطَابَقَةِ الْإِعْتِقَادِ
وَالْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمَشْكُوكَ خَبَرٌ أَوْ لَيْسَ بِخَبَرٍ مَذْكُورٌ فِي الشَّرْحِ فَلْيُطَالَعِ ثُمَّ -

অনুবাদ : আর কেউ কেউ বলেন, সত্য খবর হলো- সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাস অনুযায়ী হওয়াকে ।
যদিও (সংবাদদাতার) বিশ্বাস ভুল বা বাস্তবতা বিবর্জিত হোক । আর মিথ্যা খবর হলো সংবাদটি সংবাদদাতার
অনুকূল বিশ্বাসের না হওয়াকে, যদিও তার বিশ্বাস ভুল হোক । সুতরাং কারো উক্তি السَّمَاءُ تَحْتَنَا (আকাশ
আমাদের নিচে) তার বিশ্বাস সহকারে সত্য সংবাদ । আবার তারই উক্তি السَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের উপর)
অবিশ্বাসের সাথে হলে মিথ্যা সংবাদ । এখানে إِعْتِقَادُ শব্দের অর্থ হলো মনোগত বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস অথবা
প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিশ্বাস । সুতরাং এতে عِلْمٌ এবং ظَنٌّ উভয় বিষয়ই शामिल থাকবে । কিন্তু এ মতটিতে সন্দেহের দোলায়
দৌল্যমান ব্যক্তির সংবাদ দ্বারা আপত্তি সৃষ্টি হয় যে, তার সংবাদে কোনো বিশ্বাস না থাকার কারণে এর ফলে
(সত্য ও মিথ্যার মাঝে) একটি স্তর প্রমাণিত হয় এবং খবরটি (সত্য ও মিথ্যার মাঝে) সীমাবদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়
না । হে আল্লাহ! (সঠিক পথ দেখাও) তবে একথা বলা যেতে পারে যে, তার সংবাদ মিথ্যা । কেননা, যখন বিশ্বাস
অনুপস্থিত তখন তো বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়ার বিষয়টি (প্রকারান্তরে) প্রযোজ্য হলো । (আর বিশ্বাসের
মোতাবেক না হওয়াকে যেহেতু মিথ্যা বলা হয়, সে হিসেবে এটা মিথ্যা) আর সন্দেহপূর্ণ বাক্য খবর নাকি খবর না
এ আলোচনা ব্যাখ্যাগ্রন্থ তথা মুতাওয়ালে রয়েছে । সেখানে (বিষয়টি) দ্রষ্টব্য ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقِيلَ صِدْقُ الْخَبَرِ الخ : এখান থেকে লেখক সত্য সংবাদ এবং মিথ্যা সংবাদ কাকে বলা হয় এবং এ ব্যাপারে
আল্লামা নিয়াম মু'তাহেলীর সংজ্ঞা কি? তার আলোচনা করেছেন । উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে আমরা জমহুর ওলামায়ে কেরামের
সংজ্ঞা আলোচনা করেছি । নিয়াম মু'তাহেলীর মতে- صِدْقُ الْخَبَرِ বলা হয়, সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাসের অনুকূলে
হওয়া । যদিও সংবাদদাতার বিশ্বাস ভুল হয়ে থাকে এবং বাস্তবতার সাথে বিরোধপূর্ণ হয় যেমন, সংবাদদাতা বলল- السَّمَاءُ
تَحْتَنَا তথা আকাশ আমাদের নিচে । আর তার বিশ্বাসও এরূপ । তাহলে তার সংবাদটি সত্য হবে । কেননা, তার সংবাদ
তার বিশ্বাসের সাথে মিলে গেছে, যদিও সংবাদটি বাস্তবতা বিবর্জিত ।

كِذْبُ الْخَبَرِ বলা হয়- সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাসের অনুকূল না হওয়াকে, যদিও তার বিশ্বাস ভুল এবং বাস্তবতা
বিবর্জিত হয় । যেমন, কেউ বলল- السَّمَاءُ فَوْقَنَا (আকাশ আমাদের উপর) কিন্তু তার বিশ্বাস এর বিপরীত । তাহলে তার
এ সংবাদটি মিথ্যা বলে গণ্য হবে । কেননা, তার খবর তার বিশ্বাসের বিরোধী ।

قَوْلُهُ وَالْمَرَادُ بِالْإِعْتِبَارِ الْحُكْمِ الدِّهْنِيِّ : এ ইবারতে মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । মূল
প্রশ্নে যাওয়ার আগে ইলম, এ'তেকাদ ظَنٌّ বা ধারণা এর সংজ্ঞা জেনে নেওয়া দরকার ।

عِلْمٌ বলা হয়, দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত ঐ নিশ্চিত হুকুমকে যা সন্দেহকে গ্রহণ করে না । কারো সন্দেহ সৃষ্টি করার
দ্বারা সেই عِلْمٌ দূর হয়ে যায় না ।

إِعْتِقَادٌ বলা হয়, ঐ দলিলবিহীন নিশ্চিত বিশ্বাসকে, যাতে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এবং কারো সন্দেহ সৃষ্টি করার দ্বারা সে বিশ্বাস নষ্টও হয়ে যায়।

ظَنُّ বলা হয়, কোনো বিষয়ের প্রাধান্যপ্রাপ্ত দিককে। সুতরাং নিয়াম মু'তাযেলীর সংজ্ঞায় বর্ণিত إِعْتِقَادٌ-কে যদি তার প্রসিদ্ধ অর্থে নেওয়া হয়, তাহলে إِعْتِقَادٌ থেকে عِلْمٌ এবং ظَنُّ উভয়টা বের হয়ে যায়। আর عِلْمٌ এবং ظَنُّ বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে এ দু'টিকে صِدْقٌ এবং كِذْبٌ দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না। এর ফলে صِدْقٌ এবং كِذْبٌ-এর মাঝে একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ হয়ে যায়। অথচ নিয়াম মু'তাযেলী صِدْقٌ এবং كِذْبٌ-এর মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তরকে স্বীকার করেন না। এর সমাধান কি?

قَوْلُهُ وَالْمَرَادُ بِالْإِعْتِقَادِ الْحُكْمُ الدَّهْنِيُّ الْجَارِمُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) উপরে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, إِعْتِقَادٌ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো একটি মানসিক হুকুম বা বিষয়, চাই সে বিষয়টি নিশ্চিত হোক অথবা ধারণায় ভরপুর হোক। চাই সেটা সন্দেহকে গ্রহণ করুক বা না করুক। এ ব্যাখ্যার পর বিষয়টি ব্যাপক হয়ে গেল, যার ফলে এতে عِلْمٌ এবং ظَنُّ উভয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এখন যেহেতু এ দু'টি বিষয় إِعْتِقَادٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, সেহেতু صِدْقٌ এবং كِذْبٌ-এর মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তর রইল না।

قَوْلُهُ وَهَذَا يَشْكُلُ بِخَبَرِ الشَّائِكِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতটির উপর সন্দেহ পোষণকারী বা দ্বিধাগ্রস্ত (যে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হয়নি)-এর সংবাদ দ্বারা প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, সন্দেহ পোষণকারীর যেহেতু কোনো বিশ্বাস নেই, তাই তার সংবাদ বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া বা না হওয়ার দ্বারা সত্য বা মিথ্যার কিছুই হবে না। সুতরাং আবারো সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর সৃষ্টি হলো এবং খবর সত্য মিথ্যার মাঝে সীমাবদ্ধ রইল না।

قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُفَالَ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) সন্দেহ পোষণকারীর সংবাদ দ্বারা যে আপত্তি সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। اللَّهُم্ বলে তিনি তার উত্তরটি শুরু করেন। প্রকাশ থাকে যে, জবাবের মধ্যে দুর্বলতা আছে, তাই যেন اللَّهُম্ বলে আল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে।

জবাবের সারকথা হলো- সন্দেহ-পোষণকারীর সংবাদ মিথ্যা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সন্দেহের ক্ষেত্রে যখন বিশ্বাস অনুপস্থিত বা বিশ্বাস নেই, তখন এ কথা বলা যায় যে, সংবাদটি সংবাদদাতার বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি। অর্থাৎ তার তো বিশ্বাসই নেই যে, সংবাদ বিশ্বাসের মোতাবেক হবে। আর তার মতে সংবাদ যে কোনোভাবে বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়াকে خَيْرٌ كَاذِبٌ বা মিথ্যা সংবাদ বলা হয়। অতএব যখন সন্দেহ-পোষণকারীর সংবাদ মিথ্যা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, এখন خَيْرٌ সত্য এবং মিথ্যা এ দু'প্রকারেই সীমাবদ্ধ রইল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ হলো না।

قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِي أَنْ الْمَشْكُوكَ خَيْرٌ أَوْ لَيْسَ الْخَيْرُ : মুসান্নিফ বলেন, সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির সংবাদ যাকে خَيْرٌ (সন্দেহযুক্ত সংবাদ) বলা হয়, তা খবর বলে গণ্য হবে কিনা এ আলোচনা থেকে উপরোল্লিখিত প্রশ্নের উৎপত্তি। তাই আমাদের আগে জানতে হবে خَيْرٌ مَشْكُوكٌ সংবাদ কিনা? এ ব্যাপারে সাধারণভাবে তিনটি মত পাওয়া যায়- ক. مَشْكُوكٌ সংবাদ, খ. مَشْكُوكٌ সংবাদ নয়, গ. مَشْكُوكٌ এক হিসেবে সংবাদ অন্য হিসেবে সংবাদ নয়।

প্রথম মতানুসারে উল্লিখিত প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, যার আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। দ্বিতীয় মতানুসারে যেহেতু مَشْكُوكٌ সংবাদই নয়, তাই এটি সত্য নাকি মিথ্যা, না অন্যকিছু তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় মতানুসারে যে হিসেবে مَشْكُوكٌ-কে সংবাদ বলা যায় সে মতে আমাদের বক্তব্য হলো مَشْكُوكٌ মিথ্যা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। আর যে মতে সংবাদ নয়, সে মতে সত্য বা মিথ্যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

উপরে مَشْكُوكٌ বা সন্দেহযুক্ত সংবাদ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো, বিস্তারিত আলোচনা মুসান্নিফের সুদীর্ঘ ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালে বিবৃত হয়েছে। ইলম পিপাসুদের সেটি দেখার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ : জমহূর এবং নিয়াম মু'তাযেলীর মাঝে صِدْقٌ ও كِذْبٌ-এর সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। জমহূরের মতানুসারে صِدْقٌ বলা হয় বাক্যের كَلَامِيَّةٌ তার نِسْبَتٌ خَارِجِيَّةٌ-এর মোতাবেক হওয়া। আর বাক্যের كَلَامِيَّةٌ তার نِسْبَتٌ خَارِجِيَّةٌ-এর মোতাবেক না হওয়াকে كِذْبٌ বলা হয়।

নিয়াম মু'তাযেলীর মতানুযায়ী صِدْقٌ বলা হয় বাক্যের كَلَامِيَّةٌ মুতাকাল্লিমের বিশ্বাস অনুযায়ী হওয়াকে, চাই যে বিশ্বাস ভ্রান্তই হোক না কেন। আর كِذْبٌ বলা হয় বাক্যের كَلَامِيَّةٌ মুতাকাল্লিমের বিশ্বাসের বিপরীত হওয়া, চাই সে বিশ্বাস অবাস্তব হোক না কেন?

بَدِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ فَإِنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُمْ كَاذِبِينَ فِي
 قَوْلِهِمْ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ لِعَدِمِ مُطَابَقَتِهِ لِإِعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لِلَوَاقِعِ -

অনুবাদ : (নিয়াম মু'তাযেলীর) বক্তব্যের দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী (যার অর্থ) যখন মুনাফিকগণ আপনার কাছে আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তো জানেনই আপনি তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী, (এখানে) আল্লাহ তা'আলা তাদের বক্তব্য “নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল”-এর ক্ষেত্রে তাদের মিথ্যাবাদীরূপে উপস্থাপন করেছেন, তাদের বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের অনুকূল না হওয়ার কারণে। যদিও (তাদের বক্তব্য) বাস্তবের মোতাবেক ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ بِدِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : قَوْلُهُ وَكَذَّبَ -এর সংজ্ঞাতে ভিন্নমত পোষণকারী নিয়াম মু'তাযেলী তার বক্তব্যের সমর্থনে আল-কুরআনুল কারীম থেকে দলিল পেশ করেন সূরা মুনাফিকের আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হলো-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ -

“তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে তাদের বক্তব্য اللَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ (আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল)-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। যদিও তাদের বক্তব্য বাস্তবতার নিরিখে সঠিক। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন, اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ (আপনি যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এ কথা আল্লাহ জানেন)” এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তবে কেন আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী বললেন? এর উত্তর হলো, তারা মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহর রাসূল স্বীকার করতো না। এ কারণে তাদের বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি। আর এ মোতাবেক না হওয়ার কারণেই তাদের বক্তব্য বা সংবাদ মিথ্যা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদদাতার বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া বা না হওয়াই গ্রহণযোগ্য। এখানে বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বা না হওয়ার কোনো দখল নেই।

সারকথা হলো, উপরোক্ত আয়াত দ্বারা নিয়াম মু'তাযেলীর মতামতই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো।

وَرَدَّ هَذَا الْإِسْتِدْلَالَ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَكَاذِبُونَ فِي الشَّهَادَةِ وَفِي إِدْعَائِهِمُ الْمَوَاطَاةَ
فَالْتَّكْذِيبُ رَاجِعٌ إِلَى الشَّهَادَةِ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِهَا خَبْرًا كَاذِبًا غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَهُوَ
أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ صَمِيمِ الْقَلْبِ وَخُلُوصِ الْإِعْتِقَادِ بِشَهَادَةِ إِنْ وَاللَّامِ وَالْجُمْلَةِ
الْإِسْمِيَّةِ أَوْ الْمَعْنَى إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي تَسْمِيَّتِهَا أَيْ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا الْخَبَرِ شَهَادَةً
لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مَا تَكُونُ عَلَى وَفْقِ الْإِعْتِقَادِ فَقَوْلُهُ تَسْمِيَّتُهَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى
الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ مَحذُوفٌ أَوْ الْمَعْنَى إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ أَعْنَى
قَوْلَهُمْ إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ لَكِنْ لَا فِي الْوَاقِعِ بَلْ فِي زَعْمِهِمُ الْفَاسِدِ وَاعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ
لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ فَيَكُونُ كَاذِبًا فِي إِعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا
فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَكَانَتْ قِيلَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الصَّادِقِ وَج
لَا يَكُونُ الْكِذْبُ إِلَّا بِمَعْنَى عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ لِلْوَاقِعِ فَلْيَتَأَمَّلْ لِيَلَّا يَتَوَهَّمَنَّ أَنَّ هَذَا إِعْتِرَافٌ
بِكَوْنِ الصِّدْقِ وَالْكِذْبِ رَاجِعَيْنِ إِلَى الْإِعْتِقَادِ -

অনুবাদ : (তার) এ প্রমাণ প্রত্যাখ্যানযোগ্য এভাবে যে, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তারা সাক্ষ্যদান এবং তাদের সত্যতার দাবি (আমাদের কথা আমাদের অন্তরের সাথে সামাজ্যস্বপূর্ণ)-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী, সুতরাং মিথ্যার বিষয়টি শাহাদতের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ হিসেবে যে, এটি মিথ্যা এবং বাস্তবতার পরিপন্থি একটি সংবাদকে शामिल করেছে। (আর এখানে বাস্তবতার হচ্ছে) এই যে, এই সাক্ষ্য অন্তরের ভিতর এবং একান্ত বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে (বলে মনে হয়, কারণ এখানে) সাক্ষ্য হয়েছে إِنْ, لَمْ এবং জুমলাতুল ইসমিয়াহ দ্বারা, (যা বক্তব্যকে তাকিদ করে, আর তাকিদ তার বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করে) অথবা (আয়াতের) অর্থ হচ্ছে তারা নামকরণের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অর্থাৎ এ খবরটি শাহাদত করে নামকরণের ক্ষেত্রে। কেননা, শাহাদত বা সাক্ষ্য বলা হয় এমন জিনিসকে, যা বিশ্বাসের অনুকূল হয়। তার বাক্যাংশ تَسْمِيَّتِهَا (এর মধ্যে) মাসদার সম্বন্ধ হয়েছে দ্বিতীয় মাফউলের দিকে, প্রথম মাফউলটি উহ্য আছে। অথবা আয়াতের অর্থ হচ্ছে তারা সাক্ষ্যদানের বিষয়বস্তুর অর্থাৎ তাদের বক্তব্য إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ-এর ক্ষেত্রেই মিথ্যাবাদী, তবে তা বাস্তবতার ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের ভ্রান্ত ধারণা বাতিল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে। কেননা, তারা বিশ্বাস করে, এটি বাস্তবতা অনুযায়ী নয়। সুতরাং সংবাদটি তাদের বিশ্বাসে মিথ্যা, যদিও প্রকৃতপক্ষে সংবাদটি সত্য। সুতরাং যেন এ কথাই বলা হচ্ছে, তারা ধারণা করে তারা সত্য সংবাদটির বেলায় মিথ্যাবাদী। (এভাবে অর্থ করলে) তখন সংবাদ মিথ্যা হচ্ছে কেবল বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার কারণেই। সুতরাং যেন (বিষয়টি পাঠক) চিন্তা করে। যেন এ ধারণা না করে বসে যে, সত্য-মিথ্যার সম্পর্ক বিশ্বাসের সাথেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَرَدَّ هَذَا الْإِسْتِدْلَالَ : উল্লিখিত ইবারতে নিয়াম মু'তাযেলীর মতবাদ-এর স্বপক্ষে ইতঃপূর্বে যে প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল তার জবাব দেওয়া হয়েছে। তার দলিলের জবাব প্রথমত দু' প্রকার ১. جَوَابٌ تَسْلِيْمِي ২. جَوَابٌ اِنْكَارِي

جَوَابُ انْكَارِي আবার দু' প্রকারে বিভক্ত, সুতরাং জবাব তিনটি।

উল্লেখ্য যে, جَوَابُ انْكَارِي বলা হয় প্রতিপক্ষের দলিলকে স্বীকার না করে যে জবাব দেওয়া হয়।

جَوَابُ تَسْلِينِي : প্রতিপক্ষের দলিলকে স্বীকার করে সে দলিলের যে জবাব দেওয়া হয়, তাকে جَوَابُ تَسْلِينِي বলা হয়। প্রথমত جَوَابُ انْكَارِي দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের مَشْهُودُ بِهِ তথা তাদের উক্তি إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ -এর ব্যাপারে তাদের মিথ্যাবাদী বলেননি; বরং তাদেরকে شَهَادَةُ-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন। অর্থাৎ তারা যে বলেছে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং আমাদের বক্তব্য আমাদের অন্তরের কথা, এ বিষয়ে তারা মিথ্যাবাদী। অথচ তাদের অন্তর তাদের বক্তব্যের সাথে একমত ছিল না। তারা তাদের বক্তব্যকে 'অন্তরের কথা' বলে বুঝানোর জন্য جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٍ, اِنَّ, جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٍ দ্বারা তাদের বক্তব্যকে মজবুত করেছে। আর এসব তাকিদ দিক নির্দেশ করে যে, তাদের এ সাক্ষ্য একান্ত অন্তর থেকে এবং বিতর্ক বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে; অথচ তাদের বিষয়টি এরূপ ছিল না। সুতরাং شَهَادَةُ যা তাদের বাক্য تَشْهَدُ-এর মধ্যে রয়েছে, তা বাস্তবের সাথে মিলেনি। এ কারণে আল্লাহ তাদের شَهَادَةُ-কে মিথ্যা বলেছেন তথা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে তাদের মিথ্যাবাদী বলেছেন। অতএব, আয়াতের মধ্যে তাদের খবর তথা مَشْهُودُ بِهِ-এর কারণে তাদের মিথ্যাবাদী বলা হয়নি; বরং তাদের সাক্ষ্যের কারণে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে।

عَرَفَ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো- شَهَادَةُ তো اِنْشَاء-এর মধ্যে গণ্য হবে, তাহলে শাহাদতকে কিভাবে (সত্য বা) মিথ্যার দ্বারা বিশেষিত করা হচ্ছে?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে শাহাদতকে তার সত্তাগতভাবে মিথ্যা বলা হচ্ছে না; বরং শাহাদত যে সংবাদকে তার মধ্যে ধারণ করেছে সে সংবাদ ধারণ করার কারণে শাহাদতকে মিথ্যা বলা হয়েছে। কারণ, সংবাদটি মিথ্যা, যা বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। এখন প্রশ্ন আসবে তবে সে সংবাদটি কি? যা বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। এর উত্তর হলো- মুনাফিকগণ তাদের مَشْهُودُ بِهِ (যে বিষয়ে শাহাদত দান করা হয়েছে)-এর মধ্যে اِنَّ, اِنْ, এবং جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٍ এবং جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٍ ইত্যাদি (যা বক্তব্যকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়)-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এগুলো প্রমাণ করে, বক্তা যা বলেছে তা তার অন্তর থেকে বলছে এবং তার বক্তব্য অন্তরের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তারা যেন বলছে আমরা যা বলছি তা আমাদের মনের কথা এবং আমাদের এ সাক্ষ্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে বের হয়েছে, আর এটিই আমাদের বিশ্বাস। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমাদের এ দাবি এবং সংবাদ যে, এই শাহাদত অন্তর থেকে উৎসারিত তা মিথ্যা এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ বাস্তবতা হচ্ছে- এ সাক্ষ্য অন্তর থেকে বের হয়নি এবং তাদের কথার সাথে অন্তরের মিল নেই। সুতরাং তাদের দাবি এবং সংবাদের কারণে তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলা হচ্ছে।

মোটকথা, আয়াতের দ্বারা জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাযহাবই প্রমাণিত হলো। তা হচ্ছে وَافِعٌ বা বাস্তবের সাথে মিল না হলে كَذِبٌ আর وَافِعٌ বা বাস্তবের সাথে মিল হলে صَدَقَ সুতরাং খবর বা সংবাদ সত্য ও মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবতার মিল-অমিলের বিষয়টিই গ্রহণযোগ্য, اِعْتِقَادُ-এর এতে কোনো দখল নেই।

দ্বিতীয় জবাব : (جَوَابُ انْكَارِي) আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকে مَشْهُودُ بِهِ অর্থাৎ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ -এর ব্যাপারে তাদের মিথ্যাবাদী বলেননি; বরং তারা إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ (সংবাদ)-কে যে সাক্ষ্য বলে নামকরণ করেছে এবং বলেছে إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ একে মিথ্যা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তারা এই সংবাদকে সাক্ষ্য বলে নামকরণের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। কারণ, সাক্ষ্য বলা হয় যা সাক্ষ্যদাতার মন থেকে বের হয় এবং বিশ্বাসের সাথে মিলে যায়। কিন্তু তাদের এই সংবাদ তাদের বিশ্বাসের সাথে মিলেনি। সুতরাং তারা এ সংবাদটিকে সাক্ষ্য করে নামকরণের কারণে মিথ্যাবাদী। সুতরাং আয়াতের এ অর্থানুসারে নিয়াম মু'তামিলীর মাযহাব প্রমাণিত হলো না।

عَرَفَ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বাক্যের تَسْمِيَّتِهَا শব্দের তারকীব বলছেন। তিনি বলেন تَسْمِيَّةٌ শব্দটি মাসদার, এটি مَضَافٌ হয়েছে مَا-এর দিকে (যা شَهَادَةُ-এর দিকে ফিরেছে) مَا হলো تَسْمِيَّةٌ মাসদারের দ্বিতীয় মাফউল। এর প্রথম মাফউল উহ্য আছে। ১ম মাফউল হলো هَذَا الْاِخْبَارُ পুরো উহ্য বাক্যটি এরূপ- تَسْمِيَّةٌ هَذَا الْاِخْبَارِ شَهَادَةُ

তৃতীয় জবাব : (جَوَابُ تَسْلِيمِي) মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকগণকে যে মিথ্যাবাদী বলেছেন, তা إِنَّكَ لِرَسُولٍ مَشْهُودٍ بِهٍ তথা إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তারা مَشْهُودٍ بِهٍ তথা لِرَسُولِ اللَّهِ-এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। কিন্তু তাদের এ কারণে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে না যে, তাদের সংবাদ বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। (এবং তাদের দাবি মতে এ কারণেও মিথ্যাবাদী বলা হয়নি যে, সংবাদটি তাদের বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি।) বরং এ কারণে মিথ্যাবাদী বলা হচ্ছে যে, তাদের সংবাদ তাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং অসত্য বিশ্বাসের মাঝে যে وَانْع বা বাস্তবতা আছে তার মোতাবেক হয়নি। কেননা, তাদের বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, বাস্তবে মুহাম্মদ ﷺ নবী নন। অতএব, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এ কথা মিথ্যা হয়ে যাবে। যদিও বাস্তবে এ কথাটি অটুট সত্য। সুতরাং যেন আল্লাহ বলছেন, এরা ধারণা করে তারা এ খবরের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। কেননা, তাদের বিশ্বাসে এ সংবাদ বাস্তবের মোতাবেক নয়; অথচ সংবাদটি বাস্তব সম্মত এবং বাস্তব অনুযায়ী সত্য; যদিও তাদের বিশ্বাসে এটি বাস্তব অনুযায়ী হয়নি।

মোটকথা, উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ তাদের সংবাদ তাদের বিশ্বাসের বিপরীত হওয়ার জন্য নয়, যেমনটি নিয়াম মু'তাযেলী মনে করে থাকেন; বরং তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার কারণে সংবাদটি মিথ্যা বলা হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এভাবে বিষয়টি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো পাঠকের যাতে এ কথা মনে না হয় যে, فَنِي زَعِيمُهُمْ وَاعْتِقَادُهُمْ বলার দ্বারা নিয়াম মু'তাযেলীর মতবাদকেই সমর্থন করা হচ্ছে; বরং তাদের ধারণা ও বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়ার অর্থ হলো তাদের ধারণার মধ্যে যে বিশ্বাস আছে তার মোতাবেক না হওয়া।

সার-সংক্ষেপ :

নিয়াম মু'তাযেলীর পেশকৃত আয়াতের বা দলিলের তিনটি জবাব দেওয়া হয়-

১. আল্লাহ তাদেরকে শাহাদতের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন।
২. সংবাদ বা খবরকে শাহাদত করে নামকরণের কারণে মিথ্যাবাদী।
৩. مَشْهُودٍ بِهٍ-এর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

وَالْجَاحِظُ أَنْكَرَ انْحِصَارَ الْخَبَرِ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَاثْبَتَ الْوَاسِطَةَ وَزَعَمَ أَنَّ صِدْقَ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِلْوَاقِعِ مَعَ الْإِعْتِقَادِ بِأَنَّهُ مُطَابِقٌ وَكَذِبُ الْخَبَرِ عَدَمُهَا أَيْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِعِ مَعَهُ أَيْ مَعَ إِعْتِقَادِ أَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَغَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَعْنَى الْمُطَابَقَةِ مَعَ إِعْتِقَادِ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ أَوْ بِدُونِ الْإِعْتِقَادِ أَصْلًا وَعَدَمُ الْمُطَابَقَةِ مَعَ إِعْتِقَادِ الْمُطَابَقَةِ أَوْ بِدُونِ الْإِعْتِقَادِ أَصْلًا لَيْسَ بِصِدْقٍ وَلَا كِذْبٍ فَكُلٌّ مِنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ بِتَفْسِيرِهِ أَخْصَصَ مِنْهُ بِالتَّفْسِيرَيْنِ السَّابِقَيْنِ لِأَنَّهُ إِعْتَبَرَ فِي الصِّدْقِ مُطَابَقَةَ الْوَاقِعِ وَالْإِعْتِقَادِ جَمِيعًا وَفِي الْكَذِبِ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِمَا جَمِيعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِعْتِقَادَ الْمُطَابَقَةِ يَسْتَلْزِمُ مُطَابَقَةَ الْإِعْتِقَادِ ضُرُورَةً تَوَافُقِ الْوَاقِعِ وَالْإِعْتِقَادِ حِينَئِذٍ وَكَذَا إِعْتِقَادُ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مُطَابَقَةِ الْإِعْتِقَادِ وَقَدْ اقْتَصَرَ فِي التَّفْسِيرَيْنِ السَّابِقَيْنِ عَلَى أَحَدِهِمَا -

অনুবাদ : ইমাম জাহিয় খবর বা বর্ণনামূলক বাক্য সত্য মিথ্যা (এ দু' প্রকার)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং একটি স্তর আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করেন, صِدْقُ الْخَبَرِ বা সত্য সংবাদ বলা হয়- সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হওয়া এ বিশ্বাসের সাথে যে, সংবাদটি বাস্তবের অনুযায়ী হয়েছে। আর كَذِبُ الْخَبَرِ বা মিথ্যা সংবাদ বলা হয়- খবরটি বাস্তবের মোতাবেক না হওয়া এ বিশ্বাসের সাথে যে, সংবাদটি বাস্তব অনুযায়ী হয়নি এবং এ দু'টি ব্যতীত অর্থাৎ এ দু' প্রকার ব্যতীত তার আরো চার প্রকার- ১. খবর বাস্তব অনুযায়ী না হওয়ার বিশ্বাসের সাথে (আসলেই) বাস্তবের মোতাবেক না হওয়া। ২. কোনো ধরনের বিশ্বাস ছাড়া বাস্তব অনুযায়ী হওয়া। ৩. বাস্তব অনুযায়ী হওয়ার বিশ্বাসের সাথে বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া। ৪. কোনো ধরনের বিশ্বাস ছাড়া বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া। (এ চার প্রকার) সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। সুতরাং সত্য এবং মিথ্যা তার ব্যাখ্যা মতে পূর্বের দু'টি তাফসীরের চেয়ে সংকীর্ণ হয়ে গেল। কেননা, তিনি صِدْقُ-এর সংজ্ঞাতে বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হওয়ার শর্ত করেছেন। আর كَذِبُ-এর সংজ্ঞায় উভয়ের মোতাবেক না হওয়ার শর্ত করেছেন, এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস বিশ্বাসের অনুযায়ী হওয়াকে আবশ্যিক করে, বিশ্বাস এবং বাস্তবতার মাঝে ঐক্য থাকার কারণে, এমনভাবে বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাস বিশ্বাসের মোতাবেক না হওয়াকে আবশ্যিক করে। বিগত ব্যাখ্যাগুলো একটি শর্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْجَاحِظُ أَنْكَرَ الْخَبَرَ : ইমাম জাহিয় বর্ণনামূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা এ দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, বর্ণনামূলক বাক্যের সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর রয়েছে যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়।

জাহিযের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : জাহিয় তাঁর উপাধি, তার মূল নাম আমর ইবনে বাহর আল-ইস্পাহানী। তাঁর উপনাম আবু ওসমান। জাহিয় শব্দের অর্থ- অক্ষিগোলক বা চোখের ভিতরের গোল অংশ। তার উপাধি জাহিয় হওয়ার কারণ তার চোখের গোলক অনেকটা কোটরের বাইরে এসে গিয়েছিল। তিনি মু'তামিল সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত এবং বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছিলেন নিয়াম মু'তামিলীর একজন বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের সবচেয়ে বড় মু'তামিলী আলেম। ইলমের প্রতিটি শাখায় তাঁর রচনা পাওয়া যায়। তিনি দেখতে কদাকার ও কুশী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়-

لَوْ يَمَسُّ الْخَزِيرُ مَسْخًا ثَانِيًا * مَا كَانَ إِلَّا دُونَ مَسْخِ الْجَاحِظِ

অর্থাৎ যদি শূকরের পূর্ণবার বিকৃত ঘটানো হয় তবু সে জাহিযের চেয়ে কম কদাকার হবে।

ইস্তেকাল : ইমাম জাহিয ২৫৫ হিজরিতে কিতাবের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

জাহিয **صَدَّقَ الْخَبْرَ مُطَابَقَتَهُ لِلْوَأَاقِعِ مَعَ الْإِعْتِقَادِ بِأَنَّهُ مُطَابَقٌ** -এর সংজ্ঞা দেন এভাবে অর্থাৎ সত্য খবর বলা হয় সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হওয়া এবং সংবাদদাতার সংবাদ সম্পর্কে এ বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হয়েছে।

তিনি **كَذَبَ الْخَبْرَ عَدَمَ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَأَاقِعِ مَعَ الْإِعْتِقَادِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ** -এর সংজ্ঞা দেন এই বলে অর্থাৎ মিথ্যা খবর বলা হয় সংবাদটি বাস্তব অনুযায়ী না হওয়া এবং সংবাদদাতার সংবাদ সম্পর্কে এই বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হয়নি। তিনি বলেন, এ দু'প্রকার ছাড়া সংবাদের আরো চারটি অবস্থা এমন রয়েছে যা সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। সেই চারটি অবস্থা হচ্ছে-

১. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে; কিন্তু সংবাদদাতার বিশ্বাসে তা বাস্তব অনুযায়ী হয়নি।

২. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে; কিন্তু সংবাদদাতার সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হওয়া বা না হওয়া কোনো ধরনের বিশ্বাস নেই।

৩. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়নি; কিন্তু সংবাদদাতার বিশ্বাসে সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়েছে।

৪. সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হয়নি; কিন্তু সংবাদদাতার সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হওয়া বা বাস্তব অনুযায়ী না হওয়ার কোনো বিশ্বাস নেই।

জাহিয বলেন, এ চার অবস্থার সংবাদ সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। প্রথম দু' অবস্থায় সংবাদ বাস্তব অনুযায়ী হলেও সংবাদদাতার সেই বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস নেই। অথচ সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস থাকা অত্যাবশ্যকীয়। আবার মিথ্যাও নয় এ জন্য যে, তা বাস্তবতার মোতাবেক হয়েছে। অথচ সংবাদ মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবতার বিপরীত হওয়া প্রয়োজন। শেষ দু' অবস্থার সংবাদ সত্য নয়, কারণ সংবাদ বাস্তবতার মোতাবেক হয়নি। অথচ সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক হওয়া জরুরি। আবার সংবাদ মিথ্যাও নয়, কারণ সংবাদ মিথ্যা হওয়ার জন্য বাস্তবতার মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাস থাকতে হয়, কিন্তু এখানে তা নেই।

মোটকথা, উপরোক্ত চারটি অবস্থায় সংবাদ সত্য ও মিথ্যার মাঝে দোদুল্যমান।

قَوْلُهُ فَكُلُّ مَنْ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ يَتَنَفَّسُهُ أَحْصَى مِنْهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লামা জাহিযের বর্ণিত **صَدَّقَ** ও **كَذَّبَ** -এর সংজ্ঞাটি সংকীর্ণ। পূর্বে বর্ণিত (আল্লামা নিয়াম মু'তাহেলী এবং জমহুরের) সংজ্ঞা দু'টির তুলনায়। কেননা, জাহিয তার **صَدَّقَ** -এর সংজ্ঞায় বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, আর **كَذَّبَ** -এর সংজ্ঞায় বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী না হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। অথচ পূর্বে বর্ণিত দুটি সংজ্ঞার মধ্যে বাস্তবতা (জমহুরের সংজ্ঞায়) অথবা বিশ্বাস (নিয়ামের সংজ্ঞায়) যে কোনো একটির শর্তারোপ করা হয়েছিল সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার জন্য। সুতরাং জাহিযের সংজ্ঞায় দুটি শর্ত থাকার কারণে সংজ্ঞাটি **أَحْصَى** বা সংকীর্ণ হলো।

قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنْ إِعْتِقَادَ الْمُطَابَقَةِ يَسْتَلْزِمُ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, আল্লামা জাহিয সংবাদ সত্য হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন দুটি- ১. বাস্তবের মোতাবেক হওয়া, ২. বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস থাকা। এমনই বলেছেন তালখীসুল মিফতাহের লেখক; অথচ মুসান্নিফ এখানে জাহিযের দ্বিতীয় শর্তের ব্যাপারে বললেন যে, তিনি বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়াকে শর্ত করেছেন। সুতরাং **صَدَّقَ** -এর সংজ্ঞার ব্যাপারে মুসান্নিফ এবং মূল লেখকের বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল।

তদ্রূপ (মূল লেখকের বর্ণনানুসারে) **كَذَّبَ** বলা হয় সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হবে না এবং সংবাদদাতার বাস্তবের মোতাবেক না হওয়ার বিশ্বাসও থাকবে। কিন্তু মুসান্নিফ (র.) জাহিযের **كَذَّبَ** -এর সংজ্ঞা দিলেন এভাবে যে, **كَذَّبَ** বলা হয় সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক হবে না এবং বিশ্বাসের মোতাবেক হবে না।

মোটকথা হলো, জাহিযের সংজ্ঞা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তালখীসুল মিফাতাহের লেখক এবং মুসান্নিফের বর্ণনা ভিন্ন। মুসান্নিফের বর্ণনা ভিন্ন হওয়ার যে আপত্তি তার উপর হয়েছে মুসান্নিফ তার জবাব দিতে গিয়ে বলেন। **إِعْتِقَادٌ مُطَابَقٌ** (মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস) **مُطَابَقٌ** (বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া)-কে লামেয়ম করে। এর ব্যাখ্যা এরূপ যে, যখন কোনো সংবাদ বাস্তবতার অনুযায়ী হবে এবং সংবাদদাতা বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস করবে তথা **إِعْتِقَادٌ مُطَابَقٌ** (বাস্তবতার মোতাবেক হওয়ার বিশ্বাস) করবে, তখন বাস্তবতা এবং বিশ্বাস দু'টো পরস্পরের অনুযায়ী হয়ে যাবে বা অভিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ **وَاقِعٌ** বা বাস্তবতা **إِعْتِقَادٌ** বা বিশ্বাসের মোতাবেক হবে এবং **إِعْتِقَادٌ** ও **وَاقِعٌ**-এর মোতাবেক হয়ে যাবে। সুতরাং এ দু'টো এক ও অভিন্ন হয়ে গেল। কোনো জিনিস যদি এ দু'টোর একটির মোতাবেক হয় তাহলে অপরটির মোতাবেক থাকবে। সুতরাং যে সংবাদ বাস্তব সম্মত হবে তা বিশ্বাস অনুযায়ীও হবে। সুতরাং **صِدْقٌ خَيْرٌ** বা সত্য সংবাদে মধ্যে সংবাদ বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হবে। যখন বিষয়টি এমন, তখন তো এ কথা প্রমাণিত হলো যে, **إِعْتِقَادٌ مُطَابَقٌ** আবশ্যিক করে **إِعْتِقَادٌ**-কে। অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর জাহিযের (**صِدْقٌ خَيْرٌ**-এর) সংজ্ঞা বর্ণনাতে **إِعْتِقَادٌ مُطَابَقٌ** বলাটা সঠিক। কেননা, তার **إِعْتِقَادٌ مُطَابَقٌ** কথাটি তালখীসের লেখকের বর্ণিত জাহিযের সংজ্ঞার **إِعْتِقَادٌ مُطَابَقٌ** কথারই সমার্থক। এমনিভাবে তার বর্ণিত জাহিযের (**كُذِّبَ خَيْرٌ**-এর) সংজ্ঞার **إِعْتِقَادٌ عَدَمٌ مُطَابَقٌ** কথাটিও সঠিক। কেননা, **إِعْتِقَادٌ عَدَمٌ مُطَابَقٌ** সমার্থক হয় **إِعْتِقَادٌ**-এর। সুতরাং মুসান্নিফ (র.) বর্ণিত জাহিযের সংজ্ঞা এবং তালখীসের লেখক বর্ণিত জাহিযের সংজ্ঞার মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য না থাকাটাই প্রমাণিত হলো।

بِدَلِيلٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ لَّانَ الْكُفَّارَ حَصَرُوا أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَشْرِ
وَالْتَشْرِ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا مَرَّ قَوْمٌ كُلٌّ مُمْرِقٌ لَكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ فِي
الْإِفْتِرَاءِ وَالْإِخْبَارِ حَالَ الْجِنَّةِ عَلَى سَبِيلِ مَنَعِ الْخُلُوعِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّانِي أَى الْإِخْبَارِ
حَالَ الْجِنَّةِ لَا قَوْلُهُ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ عَلَى مَا سَبَقَ إِلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ غَيْرِ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ قَسِيمُهُ أَى
لِأَنَّ الثَّانِي قَسِيمُ الْكَذِبِ إِذِ الْمَعْنَى أَكْذَبَ أَمْ أَخْبَرَ حَالَ الْجِنَّةِ وَقَسِيمُ الشَّيْءِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ
غَيْرَهُ وَغَيْرُ الصِّدْقِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَغْتَقِدُوهُ أَى لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَمْ يَغْتَقِدُوا صِدْقَهُ فَلَا يَرِيدُونَ فَهَذَا
الْمَقَامَ الصِّدْقِ الَّذِي هُوَ بَعِيدٌ بِمَرَاحِلَ عَنْ إِعْتِقَادِهِمْ وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُمْ إِعْتَقَدُوا عَدَمَ صِدْقِهِ
لَكَانَ أَظْهَرَ فَمَرَادُهُمْ بِكَوْنِهِ خَبَرٌ حَالَ الْجِنَّةِ غَيْرُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ وَهُمْ عُقْلَاءُ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ
عَارِفُونَ بِاللُّغَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخَبَرِ مَا لَيْسَ بِصَادِقٍ وَلَا كَاذِبٍ حَتَّى يَكُونَ هَذَا مِنْهُ
بِزَعْمِهِمْ وَعَلَى هَذَا لَا يَتَوَجَّهُ مَا قِيلَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ إِعْتِقَادِ الصِّدْقِ عَدَمُ الصِّدْقِ لِأَنَّهُ لَمْ
يَجْعَلْهُ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ الصِّدْقِ بَلْ عَلَى عَدَمِ إِرَادَةِ الصِّدْقِ فَلْيَتَأَمَّلْ -

অনুবাদ : (জাহিযের) দলিল হলো (কুআনের আয়াত, যার অর্থ) সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে নাকি তার মধ্যে উন্মাদনা আছে? কেননা, কাফিররা রাসূল ﷺ-এর পুনরুত্থান এবং (কিয়ামতের ময়দানে) জমায়েত হওয়া সংক্রান্ত সংবাদ যার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী ইঙ্গিত করে “যখন তোমরা পরিপূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তবুও কি তোমরা নতুন করে সৃজিত হবে”। (উক্ত সংবাদ)-কে **مَانِعَةُ الْخُلُوعِ** হিসেবে সীমাবদ্ধ করেছে মিথ্যারোপ করা এবং উন্মাদনা থাকা অবস্থায় সংবাদ দানের মধ্যে। নিঃসন্দেহে **দ্বিতীয় অবস্থা** অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দান দ্বারা উদ্দেশ্য-**أَمْ بِهِ جِنَّةٌ** শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য নয়, যেমনটি ধারণা করে কতিপয় লোক মিথ্যা ব্যতীত (অন্য কিছু)। কেননা, এটি মিথ্যার বিপরীত প্রকার। অর্থাৎ কেননা, দ্বিতীয়টি (উন্মাদ অবস্থার সংবাদ) মিথ্যার বিপরীত প্রকার (তাহলে তো কিছুতেই মিথ্যা হতে পারে না) সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, সে মিথ্যা বলেছে, অথবা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দিয়েছে। (এটা জানা কথা যে,) কোনো বিষয়ের বিপরীত প্রকার অবশ্যই সেই বিষয় থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। (দ্বিতীয়টি) সত্যও নয়। কেননা, তারা এটি সত্য হওয়াকে বিশ্বাস করেনি। অর্থাৎ তারা এ স্থানে সত্য সংবাদের ইচ্ছাই করেনি, যা তাদের বিশ্বাস থেকে বহুদূরে। তবে মূল লেখক যদি বলতেন “কেননা, তারা অসত্যের ইচ্ছা করেছিল” তাহলে বিষয়টি স্পষ্টতর হতো।

সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য উন্মাদ অবস্থার সংবাদ সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়; অথচ তারা স্বজাতির ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তারা ভাষা সম্পর্কে ভালো জানতেন। সুতরাং বর্ণনামূলক বাক্যের একটি প্রকার এমন হলো, ‘যা সত্য নয়; কিন্তু আবার মিথ্যাও নয়। ফলে এ (উন্মাদ অবস্থার) সংবাদটি তাদের ধারণা মতে এ (নতুন প্রকার) থেকেই। এ মতানুসারে যা বলা হয়েছে (তাতে) সে কথার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না যে, সত্য হওয়ার বিশ্বাস না থাকা তো সত্য না হওয়াকে লায়ম করে। কেননা, তিনি তার কথাটি (তারা এ স্থানে সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে না) সত্য না হওয়ার দলিলরূপে পেশ করেননি; বরং সত্য হওয়ার ইচ্ছা না করার দলিলরূপে পেশ করেছেন। সুতরাং তুমি বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ بِدَلِيلٍ أَفْتَرَى الْخ: উল্লিখিত ইবারতে আল্লামা জাহিযের বক্তব্যের স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা সম্পূর্ণ আয়াতটি হলো—

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْتَغِيكُمْ إِذَا مَرَّقْتُمْ كُلَّ مَرْجَلٍ لَّنِي خَلْقٌ جَدِيدٌ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ
অর্থাৎ কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে বলে, তোমরা পরিপূর্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তোমরা নতুনভাবে সৃজিত হবে। সে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে; নয়তো সে একজন উন্মাদ।

এ আয়াত দ্বারা জাহিয صَدَقَ এবং كَذَبَ-এর মাঝে একটি স্তর প্রমাণ করেন, যা সত্য ও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। আর যখন আয়াত দ্বারা উক্ত স্তরটি প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণিত হবে।

তিনি এভাবে (তার বক্তব্যের) দলিল পেশ করেন যে, রাসূল ﷺ কিয়ামত, পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যে খবর দিয়েছেন মক্কার কাফিররা তাকে مَانِعَةُ الْخُلُ-এর ভিত্তিতে দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ করেছেন— ১. রাসূল (নাউযবিলাহ) মিথ্যা বলেছেন, ২. রাসূল উন্মাদ অবস্থায় খবর দিয়েছেন।

مَانِعَةُ الْخُلُ-এর অর্থ হচ্ছে, উক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বিষয় অবশ্যই হয়েছে। অর্থাৎ হয় মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করেছেন; নয়তো রাসূল ﷺ উন্মাদ অবস্থায় উক্ত সংবাদটি দিয়েছেন। এ দু'টোর কোনোটাই হবে না এমন নয়। অর্থাৎ এ দু'টোর বাইরে কিছু হবে না।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, দলিল প্রমাণের জন্য শুধুমাত্র مَانِعَةُ الْخُلُ বলা হলে লেখকের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না; বরং সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর প্রমাণের জন্য এ দু'টিকে مَانِعَةُ الْجَمْع ও বলতে হবে

مَانِعَةُ الْجَمْع বলা হয় এ দু'টি বিষয় একসাথে একত্রিত হতে পারবে না। কেননা, যদি এ দু'টিকে শুধুমাত্র مَانِعَةُ الْخُلُ বলা হয় (এবং مَانِعَةُ الْجَمْع না বলা হয়) তাহলে যদিও মিথ্যা ও উন্মাদ অবস্থার সংবাদ এ দু'টির কোনো একটির থেকে খালি হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তখন এ দু'টি একত্রিত হওয়া অসম্ভব হবে না। তখন আয়াতের মিথ্যা এবং উন্মাদ অবস্থার সংবাদ একসাথে একত্রিত হতে পারবে। আর দু'টি একসাথে একত্রিত হলে উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যা বলেই গণ্য হবে। আর উন্মাদ অবস্থার সংবাদ মিথ্যার মধ্যে গণ্য হলে সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি স্তর প্রমাণিত হলো না; অথচ মুসান্নিফের ইচ্ছা হলো মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণ করা— যা সত্যও নয় এবং মিথ্যাও নয়।

তাই আয়াতের দু'টি বিষয় তথা أَفْتَرَى এবং إِخْبَارٌ حَالِ الْجِنَّةِ-এর মধ্যে مَانِعَةُ الْخُلُ এবং مَانِعَةُ الْجَمْع উভয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ দু'টি বিষয় এক সাথে একত্রিত হতে যেমন পারবে না তেমনি দু'টি বিষয় একত্রে উঠেও যেতে পারবে না।

অতএব, মুসান্নিফ (র.) যদিও বাক্যের মধ্যে একটিকে (مَانِعَةُ الْخُلُ) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য (مَانِعَةُ الْخُلُ) ও مَانِعَةُ الْجَمْع উভয়টি। সুতরাং কাফিরগণ রাসূল ﷺ-এর পরকাল সংক্রান্ত সংবাদকে مَانِعَةُ الْخُلُ এবং مَانِعَةُ الْجَمْع-এর ভিত্তিতে দু'টি অবস্থা তথা মিথ্যা এবং উন্মাদ অবস্থার সংবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। সুতরাং রাসূলের সংবাদ হয়তো মিথ্যা হবে, নয়তো উন্মাদ অবস্থার সংবাদ হবে।

قَوْلُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَرَادَ بِالشَّائِنِ: মুসান্নিফ বলেন, দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য মিথ্যা নয়। এর কারণ তিনি একটু পরেই বর্ণনা করবেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ مَانِعَةُ الْجَمْع (উন্মাদ অবস্থার সংবাদ) দ্বিতীয়টি অর্থাৎ مَانِعَةُ الْجَمْع নয়। মোটকথা, তিনি দ্বিতীয়টি বলে مَانِعَةُ الْجَمْع বা ভাবার্থে مَانِعَةُ الْجَمْع উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি আয়াতের مَانِعَةُ الْجَمْع শব্দটিকে উদ্দেশ্য করেননি, যা কতিপয় লোক মনে করেন। এর কারণ হলো, مَانِعَةُ الْجَمْع শব্দটিতে مَانِعَةُ হলো اسْتِفْهَام আর اسْتِفْهَام বা প্রশ্নবোধক বাক্য হলো اسْتِفْهَام-এর প্রকার। আমরা জানি, اسْتِفْهَام সত্য মিথ্যা দ্বারা বিশেষিত হতে পারে না। সুতরাং যদি দ্বিতীয়টি অর্থাৎ مَانِعَةُ الْجَمْع শব্দটি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাক্যের অর্থ হবে مَانِعَةُ الْجَمْع দ্বারা বিশেষিত করা হইবে। অথচ আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি اسْتِفْهَام-কে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা বিশেষিত করা যাবে না। সুতরাং ثَانِي দ্বারা উদ্দেশ্য مَانِعَةُ الْجَمْع অর্থাৎ উন্মাদ অবস্থার সংবাদ।

মুসান্নিফ বলেন, দ্বিতীয়টি মিথ্যা নয়। এর দলিল হলো, দ্বিতীয়টিকে মিথ্যার **قَسِيمٌ** বানানো হয়েছে। কেননা, আয়াতের ভাবার্থ হলো **أَكْذَبَ أَمْ أَخْبَرَ حَالِ الْجَنَّةِ** সে মিথ্যা বলেছে অথবা উন্মাদ অবস্থায় সংবাদ দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোনো জিনিসের অধীন বিভিন্ন প্রকারকে **قَسِيمٌ** বা প্রকার বলা হয়। আর প্রত্যেক প্রকারের সাথে অপর প্রকারের সম্পর্কে **قَسِيمٌ** বলা হয়। যেমন- এখানে **خَبَرَ** বা সংবাদ-এর অধীন প্রকার তিনটি- মিথ্যা খবর; সত্য খবর এবং উন্মাদ অবস্থার খবর। এ তিন প্রকার পরস্পর বিপরীত হবে বা **قَسِيمٌ** হবে।

মিথ্যা খবর বিপরীত হবে সত্য খবর এবং উন্মাদ অবস্থার খবরের। সুতরাং যেহেতু মিথ্যার **قَسِيمٌ** উন্মাদ অবস্থার খবর, অতএব, উন্মাদ অবস্থার খবর মিথ্যা নয়; কিন্তু উন্মাদ অবস্থার খবর সত্যও নয়। কেননা, কাফিররা শত্রুতাবশত রাসূল ﷺ-কে সত্যবাদী মনে করত না, যার ফলে তার খবরকেও সত্য মনে করত না। তাই এখানে (পুনরুত্থান সংক্রান্ত সংবাদ, যা মূলত তাদের অস্বীকারের বিষয়) তারা রাসূলের সংবাদকে সত্য মনে করবে না। সুতরাং তাদের ধারণা মতে **إِخْبَارُ حَالِ الْجَنَّةِ** সত্য নয় এবং মিথ্যাও নয়। তাহলে তো এটি সত্য ও মিথ্যার মাঝের একটি স্তর হলো। তাই আল্লামা জাহিয বলেন, সংবাদমূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَأَنْتُمْ إِعْتَقَدُوا عَدَمَ صِدْقِهِ لَكَانَ الْخَبَرُ لَأَنْتُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারতের একটি সংশোধনী দিচ্ছেন। মূল লেখক উন্মাদ অবস্থার সংবাদ সত্য নয়-এর দলিল পেশ করেন এই বলে যে, **لَأَنْتُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ** (অর্থাৎ কেননা তারা সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে না) কিন্তু মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক যদি এভাবে বলতেন যে, **لَأَنْتُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ** (অর্থাৎ কেননা তারা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস করে) তাহলে বিষয়টির মর্ম বুঝতে আরো উৎকৃষ্ট হতো। এর কারণ এই যে, মূল লেখকের বক্তব্য অনুসারে অর্থাৎ তারা সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে না এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা এ সংবাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে সত্যবাদী জানে বটে; কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। এ ব্যাখ্যানুসারে সংবাদটি তো সত্যই হয়ে গেল। যদিও তাদের বিশ্বাস এরূপ নয়। আর যেহেতু এ সংবাদ সত্য হয়ে গেল, সুতরাং সত্য এবং মিথ্যার মাঝে কোনো মধ্যবর্তী স্তর রইল না। কাজেই উপরোক্ত আয়াত জাহিযের পক্ষে দলিল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি বলা হয় **إِعْتَقَدُوا عَدَمَ صِدْقِهِ** তারা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস করে, তবে পূর্বোক্ত অর্থের সম্ভাবনা আর থাকে না। অর্থাৎ কাফিররা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে, আবার এ বিষয়ে তাকে সত্যবাদী মনে করে এটা অসম্ভব।

যখন বিষয়টি এরূপ হবে তখন এ সংবাদ নিঃসন্দেহে সত্য হবে না। আর সত্য না হওয়ার অর্থ হলো উন্মাদ অবস্থার সংবাদ সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়। অতএব, সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি একটি স্তর প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهُ وَهُمْ عَقَلَاءُ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ : এ বাক্যটি দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, আমরা মেনে নিলাম উক্ত আয়াত দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি এক ধরনের খবর প্রমাণিত হলো। কিন্তু যাদের বক্তব্য দ্বারা হলো তারা তো কাফির, আর কাফিরদের কথা যেহেতু গ্রহণযোগ্য তাই তাদের কথার দ্বারা প্রমাণিত সংবাদ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যবর্তী সংবাদও গ্রহণযোগ্য। এর উত্তর হলো, ভাষা ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে ভাষাভাষী এবং সাহিত্যিকদের কথা গ্রহণযোগ্য। এখানে সে কোন ধর্মের অনুসারী সে বিষয়টি গৌণ। সুতরাং কুরাইশ কাফিরগণও যেহেতু আরবি ভাষাভাষী এবং সে ভাষার সাহিত্য রসিকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, তাই সংবাদমূলক বাক্য সত্য ও মিথ্যা হওয়ার পাশাপাশি সত্যও নয় আবার মিথ্যাও নয়, এমন একটি প্রকার হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, তাদের উক্তি মোতাবেক রাসূল ﷺ-এর উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা যেহেতু কাফিরদের উদ্দেশ্য সত্যও নয় এবং মিথ্যাও নয়, তখন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কতক সংবাদ এমন রয়েছে যা সত্যও নয় এবং মিথ্যাও নয়। আর এ উন্মাদ অবস্থার সংবাদ তাদের ধারণা মতে সে প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا لَا يُتَوَجَّهُ مَا قَبِلَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলছেন যে, আমাদের ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লামা খালখালীর পক্ষ থেকে যে আপত্তিটি তোলা হয়েছিল তার নিরসন হয়ে গেছে।

আল্লামা খালখালী বলেন, মূল লেখকের বাক্য **وَعَلَى هَذَا لَا يُتَوَجَّهُ مَا قَبِلَ** দ্বারা উন্মাদ অবস্থার খবর সত্য না হওয়ার যে দলিল দিয়েছেন তা সঠিক নয়, কেননা, সত্য না হওয়ার বিশ্বাস দ্বারা বিষয়টি সত্য নয় এটা কিন্তু প্রমাণ হয় না, অথচ মূল লেখক তাই বললেন যে, সত্য নয়। কারণ, তারা সত্য না হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে।

তার এ আপত্তির জবাব হচ্ছে, মূল লেখক তার বাক্য لَا تَهُمُّ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ-কে 'সত্য নয়' এ কথার দলিলরূপে পেশ করেননি; বরং তিনি তার এ বাক্য 'সত্যটিকে হওয়ার ইচ্ছা করেনি' এ কথার দলিল বানিয়েছেন। সে কথার প্রতি মুসান্নিফ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন- তার ইবারতের মধ্যে فَلَا يُرِيدُونَ এবং فَمَرَادُهُمْ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে।

পুরো বাক্যটির অর্থ এরূপ হবে যে, কাফিররা উন্মাদ অবস্থার সংবাদ দ্বারা রাসূল ﷺ-এর সংবাদ সত্য হওয়ার ইচ্ছা করেনি, এর দলিল হলো তারা রাসূল-এর সত্যতাকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং যখন তারা রাসূল ﷺ-কে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেই না তখন তারা রাসূলের সংবাদকে কি করে সত্য মনে করবে!

মোটকথা, মুসান্নিফ (র.)-এর বাক্য لَا تَهُمُّ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ সত্য না হওয়ার দলিল নয়; বরং 'তারা সত্যের ইচ্ছা করেনি' এর দলিল। সুতরাং এরপর আল্লামা খালখালীর আপত্তি এ ব্যাপারে আসতে পারে না।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা জাহিযের বক্তবের দলিল- أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ এ আয়াতে অংশটুকু সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এটি সত্যও নয়, আবার মিথ্যাও নয়। অতএব, সত্য ও মিথ্যার মাঝে একটি মধ্যবর্তী স্তর প্রমাণিত হলো।

সার-সংক্ষেপ : আল্লামা জাহিযের দলিলের জবাব : জমহুর বলেন, তার পেশকৃত আয়াতটিতে দু'প্রকার **كَذَّبَ** (মিথ্যা)-এর আলোচনা করা হয়েছে। **كَذَّبَ عَمْدِي** অংশে **أَمْرٌ بِهِ جُنَّةٌ** আর **كَذَّبَ عَمْدِي** অংশে **كَذَّبَ غَيْرَ عَمْدِي** এর আলোচনা করা হয়েছে।

أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ وَهُوَ ضَمُّ كَلِمَةٍ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرُهَا إِلَى أُخْرَى بِحَيْثُ يُفِيدُ الْمُخَاطَبُ أَنَّ مَفْهُومَ أَحَدِهِمَا ثَابِتٌ لِمَفْهُومِ الْأُخْرَى أَوْ مَنْفَى عَنْهُ وَإِنَّمَا قَدَّمَ بَحْثَ الْخَبَرِ لِعَظَمِ شَأْنِهِ وَكَثْرَةِ مَبَاحِثِهِ ثُمَّ قَدَّمَ أَحْوَالَ الْإِسْنَادِ عَلَى أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ مَعَ تَأْخِيرِ النَّسْبَةِ عَنِ الطَّرْفَيْنِ لِأَنَّ الْبَحْثَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ الْمَوْصُوفِ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ أَوْ مُسْنَدًا وَهَذَا الْوَصْفُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِسْنَادِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النَّسْبَةِ إِنَّمَا هُوَ ذَاتُ الطَّرْفَيْنِ وَلَا يَبْحَثُ لَنَا عَنْهَا -

অনুবাদ : ইসনাদ-এর বিভিন্ন অবস্থা। (ইসনাদ বলা হয়) একটি কালিমা বা তার সমপর্যায়ের কিছুকে অন্য শব্দের সাথে এমনভাবে যুক্ত করা, যাতে এটি শ্রোতাকে এ ফায়দা দিবে যে, একটির বিষয়বস্তু অপরটির বিষয়বস্তুর জন্য প্রমাণিত হবে, অথবা প্রমাণিত হবে না। তিনি সংবাদমূলক বাক্যের বিষয়াবলিকে (রচনায়) আগে এনেছেন এর সুউচ্চ মর্যাদা এবং বিষয়বস্তুর বিস্তৃতির কারণে, এরপর ইসনাদের বিষয়াবলিকে মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের আগে এনেছেন, নিসবত বাক্যের দু' প্রধান অংশের পরে হওয়া সত্ত্বেও। কেননা, এখানে আলোচনা চলছে শব্দের মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ হওয়ার ভিত্তিতে। আর (শব্দের) এ গুণটি ইসনাদ পাওয়া যাওয়ার পরই পাওয়া যায়। নিসবতের আগে যা আসে তা তো বাক্যের দু' প্রধান অংশ। আর তা নিয়ে আলোচনা তো এখানে নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ : ইলমুল মা'আনী যে আট প্রকারে সীমাবদ্ধ এর প্রথম প্রকার হলো أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ তারকীব হিসেবে أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ একটি উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য মুবতাদা হলো الْبَابُ الْأَوَّلُ সে মতে পুরো বাক্যটি এরূপ হবে- الْبَابُ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ

حَقِيقَةُ الْإِسْنَادِ : ইলমুল মা'আনী যে আট প্রকারে সীমাবদ্ধ এর প্রথম প্রকার হলো أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ তারকীব হিসেবে أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ একটি উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য মুবতাদা হলো الْبَابُ الْأَوَّلُ সে মতে পুরো বাক্যটি এরূপ হবে- الْبَابُ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ

حَقِيقَةُ الْإِسْنَادِ : ইলমুল মা'আনী যে আট প্রকারে সীমাবদ্ধ এর প্রথম প্রকার হলো أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ তারকীব হিসেবে أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ একটি উহ্য মুবতাদার খবর। উহ্য মুবতাদা হলো الْبَابُ الْأَوَّلُ সে মতে পুরো বাক্যটি এরূপ হবে- الْبَابُ الْأَوَّلُ أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ

ইসনাদ বলা হয়- একটি কালিমা অথবা তার স্থলাভিষিক্ত (অর্থাৎ জুমলা, যা মুফরাদের হুকুম লাভ করে) শব্দকে (মুসনাদকে) অপর আরেকটি কালিমার (মুসনাদ ইলাইহের) সাথে যুক্ত করা এমনভাবে যে, শ্রোতাগণ এ সংবাদ দ্বারা একটি উপকার লাভ করে অর্থাৎ একটি বিষয় অনুধাবন করতে পারে। সে উপকারটি হচ্ছে সে বুঝতে পারে যে, দু'টি কালিমার একটি (অর্থাৎ مَحْكُومٌ بِهِ) অপরটি (অর্থাৎ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ) এর জন্য প্রমাণিত অথবা একটি অপরটি থেকে অপ্রমাণিত।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মূল লেখক বলেছেন أَحْوَالُ الْإِسْنَادِ الْخَبَرِيُّ অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্যের ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থা। এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসনাদ বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, ইসনাদ শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যের সাথেই হয় না; বরং বিভিন্ন ইনশাইয়াহ-এর সাথে ইসনাদ হয় এবং সেই ইসনাদের মধ্যেও বিভিন্ন অবস্থা দেখা যায়। যেমন- تَاكِيدٌ , حَقِيقَةُ عَقْلِيَّةٌ , عَدَمُ تَاكِيدٍ , ইত্যাদি। এর উদাহরণ কেউ বলল, إِنْ لِي قَصْرًا (আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো) সুতরাং যদি নির্দেশিত ব্যক্তি উক্ত কাজ করার যোগ্য হয়, তাহলে তাকে مَجَازٌ عَقْلِيٌّ বলা হবে।

এমনভাবে কেউ যদি সহজে কাজ করে তাকে (তাকিদ ছাড়া) اضْرِبْ (তুমি মারো) বললেই হয়। আর যদি নির্দেশিত ব্যক্তি সহজে কাজ না করে; বরং তাকিদ করে বললে তাকে তাকিদযুক্ত করে নির্দেশ দিতে হয়। যেমন- اضْرِبَنَّ

মোটকথা, যে সকল বিষয় বর্ণনামূলক বাক্যে দেখা যায় তা ইনশাইয়াহ-এর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। তাই মূল লেখকের জন্য إِسْنَاد-কে বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা কি সমীচীন হয়েছে?

এর উত্তর হলো, খবর বা বর্ণনামূলক বাক্য ইনশার জন্য أَصْل বা মূল। তদ্রূপ বালাগাত বিশারদদের জন্য উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনামূলক বাক্যে ইনশার চেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

তা ছাড়া বর্ণনামূলক বাক্য বালাগাত শাস্ত্রবিদদের কাছে মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য, তাই إِسْنَاد-কে خَبَر বা বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস করা হয়েছে। এমন অধিক ব্যবহৃত বিষয়ের সাথে খাস করা বিধিসম্মত, তাই এটি দৃশ্যীয় নয়। অতএব, خَبَر-এর সাথে নির্দিষ্ট করা ইনশার মধ্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

قَوْلُهُ وَاتِّمَامُ قَدَمِ بَعَثَ الْخَبَرِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক বর্ণনামূলক বাক্যের আলোচনাকে সর্বাত্মক কেন বর্ণনা করলেন? এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, خَبَر বা বর্ণনামূলক বাক্যের মর্যাদা (ইনশার চেয়ে) বেশি এবং এর আলোচ্য সূচিও অনেক বিস্তৃত। বর্ণনামূলক বাক্যের মর্যাদা বেশি হওয়ার কারণ হলো, আকিদা-বিশ্বাসের বিষয়গুলো বর্ণনামূলক এবং ভাষা সংক্রান্ত বিষয়াবলিও বর্ণনামূলক। এর বিষয়বস্তু বিস্তৃত হওয়ার কারণ হলো বালাগাতশাস্ত্রবিদগণ যে সকল বৈশিষ্ট্য ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলি প্রমাণ করেন, এর সবই প্রায় বর্ণনামূলক বাক্যে।

মোটকথা, মর্যাদা ও আলোচ্য সূচি উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বর্ণনামূলক বাক্যের আলোচনা সর্বাত্মক আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ قَدَمَ أَحْوَالَ الْأَسْنَادِ عَلَى الْخَبَرِ : এ বাক্যটি দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, মর্যাদা বা অস্তিত্ব হিসেবে إِسْنَاد বাক্যের প্রধান দু' অংশ তথা মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদ-এর পিছনে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসনাদের অবস্থাসমূহের আলোচনা মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহর অবস্থাসমূহের আগে কেন আনা হলো?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইলমুল মা'আনীর মধ্যে এখানে আলোচনা হচ্ছে ঐ শব্দাবলি সম্পর্কে যে শব্দাবলি মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে।

অথবা, বাক্যের দু'অংশ ইসনাদ দ্বারা বিশেষিত হিসেবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এ দু'অংশ ইসনাদ দ্বারা বিশেষিত হওয়ার জন্য নিশ্চিতভাবে সর্বাত্মক ইসনাদ হতে হবে। অর্থাৎ ইসনাদ হওয়ার পর এগুলো মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ হবে। ইসনাদ না হলে এগুলোকে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ বলা যাবে না। এ কারণেই ইসনাদ ও তার অবস্থাসমূহের আলোচনা প্রথমে এসেছে। এরপর পর্যায়ক্রমে মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদের আলোচনা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, বাক্যের প্রধান দু'অংশ সত্তাগতভাবে বা অস্তিত্বের দিক থেকে অবশ্য নিসবতের আগে; কিন্তু সত্তা বা অস্তিত্বের বিষয়ে ইলমুল মা'আনীতে আলোচনা হয় না। তাই সত্তাগতভাবে অগ্রগামী হওয়াটা এখানে লক্ষণীয় নয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. জুমলায়ে খবরিয়্যাহ-এর আলোচনা প্রথমে আনার কারণ দু'টি— ১. ইনশার তুলনায় খবরের গুরুত্ব বেশি এবং খবরের জন্য ইনশা হচ্ছে মূল। ২. সংবাদমূলক বাক্যের আলোচনার পরিধি বড় ও বিস্তৃত।

খ. 'ইসনাদের অবস্থাসমূহ'কে মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহর অবস্থাসমূহের আগে আনা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে ইসনাদ সবার আগে, ইসনাদ ছাড়া মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্ক হতে পারে না।

لَا شَكَّ أَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ أَيْ مَنْ يَكُونُ بِصَدِّ الْأَخْبَارِ وَالْإِعْلَامِ وَالْأَلَّا فَالْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ كَثِيرًا مَّا تُورَدُ لِأَعْرَاضٍ أُخَرَ غَيْرَ إِفَادَةِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ مِثْلُ التَّحْزِنِ وَالتَّحَسُّرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ امْرَأَةِ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِخَبَرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَصْدِ إِفَادَةِ الْمُخَاطَبِ خَبْرًا إِنْ أَمَّا الْحُكْمَ مَفْعُولُ الْإِفَادَةِ أَوْ كَوْنَهُ أَيْ كَوْنُ الْمُخْبِرِ عَالِمًا بِهِ أَيْ بِالْحُكْمِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هَهُنَا وَقُوعُ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وَقُوعُهَا وَكَوْنُهُ مَقْصُودًا لِلْمُخْبِرِ بِخَبَرِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَهُ فِي الْوَاقِعِ وَهَذَا مُرَادٌ مَنْ قَالَ إِنَّ الْخَبَرَ لَا يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ الْمَعْنَى وَانْتِفَائِهِ وَالْأَلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّ مَدْلُولَ قَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْقِيَامَ ثَابِتٌ لِزَيْدٍ وَعَدَمُ ثُبُوتِهِ لَهُ إِحْتِمَالٌ عَقْلِيٌّ لَا مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَلَا مَفْهُومُهُ فَلْيَفْهَمْ -

অনুবাদ : নিঃসন্দেহে সংবাদদাতার ইচ্ছা অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে (কোনো সংবাদ) জানানোর বা ঘোষণা দেওয়ার ইচ্ছা করে। অন্যথায় (যে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করে না; বরং বর্ণনামূলক বাক্য বলে) সংবাদমূলক বাক্যগুলো অনেক সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। যাতে হুকুম বা লায়মে হুকুম (উভয়ের সংজ্ঞা সামনে আসবে)-এর ফায়দা দেওয়া হয় না। যেমন- দুঃখ প্রকাশ ও অনুতাপ প্রকাশ করা। (এর উদ্দেশ্যে বর্ণনামূলক বাক্য ব্যবহৃত হয়) আল্লাহ তা'আলার বাণী যা তিনি ইমরানের (মারইয়ামের বাবা) স্ত্রী (মারইয়ামের মা)-এর পক্ষে বর্ণনা করেন। আয়াত : 'হে আমার প্রভু! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।' এবং এ জাতীয় আরো উদাহরণ রয়েছে। 'يَخْبِرُهُ' এটি قَعْد-এর সাথে মুতাআল্লিক। إِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ শ্রোতাকে উপকার পৌঁছানো তথা এটি إِنَّ-এর খবর। হয়তো এটি قَعْد-এর সাথে মুতাআল্লিক। إِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ শ্রোতাকে উপকার পৌঁছানো এ ব্যাপারে যে) সংবাদদাতা হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত। এখানে হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের মাঝে নিসবত ঘটবে অথবা নিসবত ঘটবে না। সংবাদদাতার উদ্দেশ্য (সেই সংবাদ)-এর দ্বারা এটি বাস্তবে সংঘটিত হওয়াকে লায়ম করে না। যারা বলে, সংবাদমূলক বাক্য কোনো বিষয় হওয়া বা না হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে না। তাদের উদ্দেশ্য তাই, যা পূর্বে বর্ণনা করা হলো। অন্যথায় এটি অস্পষ্ট নয় যে, আমাদের উক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ-এর অর্থ এবং দাবি দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি যায়েদের জন্যে প্রমাণিত এবং (সেই সাথে) যায়েদের জন্যে দণ্ডায়মান না হওয়ার একটি যৌক্তিক সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে এটি বাক্যের অর্থ বা দাবি মোটেও নয়। সুতরাং বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া চাই।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

أَحْوَالُ الْإِنْسَانِ فَإِنْبَغَىٰ: قَوْلُهُ لَا شَكَّ أَنَّ قَصْدَ الْمُخْبِرِ: মূল লেখকের ইবারত لَا شَكَّ থেকে শুরু করে ফাইবগী পর্যন্ত অসন্দ পূর্ণ। বা ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থাসমূহের আলোচনার একটি ভূমিকা। এখানে لَا شَكَّ-এর ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা হলো مُخْبِر অর্থ সংবাদ দাতা হতে পারে অথবা এর অর্থ হবে যে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ বলে। এ কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, এক ব্যক্তি زَيْدٌ قَائِمٌ বলল, তার এ বাক্য দ্বারা কোনো সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হবে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্য হবে। উভয় অবস্থায় একে مُخْبِر-ই বলা হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, خَبَر দ্বারা মূল লেখকের প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ বলে সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা করে।

মুসান্নিফ বলেন, এখানে خَبَر দ্বারা দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। কেননা, জুমলায়ে খবরিয়্যাহ বা বর্ণনামূলক বাক্যের অনেক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন- দুঃখ প্রকাশ করা, অনুতাপ প্রকাশ করা ও হতাশা প্রকাশ করা ইত্যাদি। এর উদাহরণ আল্লাহর কালামের একটি আয়াত (যে আয়াতে তিনি হযরত মারইয়ামের জননী তথা ইমরানের স্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরেছেন)

নিম্নে আয়াতটি দেওয়া হলো-

رَبِّ اتَى وَضَعَهَا اُنْتِ - হে আমার প্রভু! আমি একজন কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। এ বাক্যটি যদিও সংবাদমূলক বাক্য, কিন্তু এতে কোনো সংবাদ দেওয়া হচ্ছে না; বরং এতে হতাশা প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে সংবাদমূলক বাক্যের যে দু'টি উদ্দেশ্য তথা হুকুমের ফায়দা দেওয়া অথবা লাযেম হুকুমের ফায়দা দেওয়া (এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অচিরেই আসছে)-এর কোনোটিই উদ্দেশ্য নয়। এরপর مُخْبِر (দ্বারা যদি সংবাদদাতা উদ্দেশ্য হয়) তার সংবাদ দ্বারা সে দু'টি ইচ্ছা করতে পারে- ১. তার শ্রোতাকে বাক্যের হুকুম বা বিষয়টি জানাবে, ২. অথবা তার শ্রোতাকে একথা জানাবে যে, সে বাক্যের হুকুম সম্পর্কে জানে। (প্রথমটি فَاَيِدَةُ الْخَبَرِ এবং দ্বিতীয়টিকে فَاَيِدَةُ الْخَبَرِ বলা হয়।) সংবাদদাতার প্রথম উদ্দেশ্য তখন হয়ে থাকে যখন তার শ্রোতা হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। যেমন- আপনি খালেদকে বললেন ذَهَبَ رَاشِدٌ (রাশেদ চলে গেছে) খালেদ ইতঃপূর্বে রাশেদের যাওয়ার বিষয় অবহিত ছিল। সংবাদদাতার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তখন হয় যখন শ্রোতা বাক্যের হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। কিন্তু সংবাদদাতা যে খবরটি জানে তা জানে না। এমতাবস্থায় সংবাদদাতা সংবাদটি দ্বারা শ্রোতাকে বুঝায় যে, সেও হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত। যেমন- কোনো ব্যক্তি কুরআনের হাফেজকে বলল اَنْتَ حَفِظْتَ الْقُرْآنَ অর্থাৎ তুমি কুরআন মুখস্থ করেছ।

اِفَادَةُ الْمُخَاطَبِ اِمَّا الْعَمَلُ : আর এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারতে الْعَمَلُ (র.) মূল লেখকের ইবারতে الْعَمَلُ শব্দটি এসেছে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, حُكْم শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ক. حُكْم শব্দটি নিসবতে কালামিয়াহ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কালাম বা বাক্য থেকে যে নিসবতটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে বাক্যের মুসনাদ বা বিধেয় তার মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অথবা বিধেয় উদ্দেশ্য থেকে বিদূরীত হওয়া- একেই মুসান্নিফ وَقَوْلُ النَّسَبِ এবং وَقَوْلُ النَّسَبِ বলা হয়।

খ. মানতিকশাস্ত্রবিদদের মতে حُكْم অর্থ اِذْعَانُ النَّسَبِ অর্থাৎ নিসবতকে অনুভব করা। একে তারা اِنْتِزَاعٌ এবং اِنْقَاعٌ বলে ব্যক্ত করে থাকেন।

গ. নীতিশাস্ত্রবিদদের মতে আল্লাহর আদেশ নির্দেশ, যা বান্দাদের আমলের ক্ষেত্রে করে থাকেন, তাকে حُكْم বলা হয়।

ঘ. ফিক্‌হশাস্ত্রবিদদের মতে حُكْم বলা হয় আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়াদিকে। যেমন- ওয়াজিব ও ফরজ ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহর নির্দেশে প্রমাণিত হয়েছে।

وَقَوْلُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ বলতে চাচ্ছেন যে, সংবাদদাতা তার সংবাদ তথা وَقَوْلُ এবং وَقَوْلُ النَّسَبِ-এর ইচ্ছা করার কারণে এর বাস্তবতা জরুরি নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, কোনো সংবাদদাতা যদি তার বাক্য (যথা- زَيْدٌ قَانِمٌ -এর) নিসবত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার (তথা যায়েদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া প্রতিষ্ঠিত করার সংবাদে) ইচ্ছা করে, তাহলে বাস্তবে নিসবতটি হতেই হবে (অর্থাৎ যায়েদ দণ্ডায়মান অবশ্যই হয়েছে) এটা আবশ্যিক নয়; বরং তার বাক্য দ্বারা যায়েদের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি শ্রোতাকে জানানোই যথেষ্ট। বাস্তবতা এমনই হোক বা না হোক। বাস্তবতা এমন হতে পারে, আবার এর বিপরীতও হতে পারে; এ অর্থেই বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্য সত্য এবং মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে। প্রসঙ্গক্রমে মুসান্নিফ বলেন, যারা বলেন- বর্ণনামূলক কোনো হুকুম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বা হুকুম বিদূরীত হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না, তারা উপরোক্ত অর্থানুসারেই এ কথা বলেন অর্থাৎ সংবাদদাতার হুকুমের ইচ্ছা হুকুমের বাস্তবতাকে আবশ্যিক করে না।

তাদের বক্তব্যের অর্থ মোটেই এটা না যে, ইতিবাচক বাক্য যথা- زَيْدٌ قَانِمٌ -এর মধ্যে বাক্যটি قَانِمٌ -এর অর্থ যায়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে না। এমনভাবে নেতিবাচক বাক্য যথা- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَانِمٍ -এর মধ্যে বাক্যটি قَانِمٌ -এর অর্থ (এর অর্থ) দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ যায়েদ থেকে পৃথক করে না এমন নয়; বরং এর অর্থ হচ্ছে প্রথম বাক্যে এর অর্থ বাস্তবে যায়েদের দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যিক নয়; এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর অর্থ হচ্ছে বাস্তবে যায়েদের না দাঁড়ানো আবশ্যিক নয়। মুসান্নিফ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা যখন বলি- زَيْدٌ قَانِمٌ -এর শব্দের দাবি এবং অর্থ হচ্ছে قَانِمٌ (দাঁড়ানো) যায়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত, তবে তাতে দণ্ডায়মান না হওয়ার একটি যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে। এটি শব্দের অর্থ বা দাবি হিসেবে নয়।

মোটকথা, যারা বলেন, বর্ণনামূলক বাক্য ثُبُوتٌ এবং ثُبُوتٌ -এর ফায়দা দেয় না তাদের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে সংবাদদাতার সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছা সেই সংবাদের বাস্তবায়নকে আবশ্যিক করে না। আল্লাহ আমাদের বিষয়টি বুঝার তৌফিক দিন।

সার-সংক্ষেপ : সংবাদমূলক বাক্য (جُملَةٌ خَبَرِيَّةٌ) -এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য সাধারণত দু'টি হয়ে থাকে। ক. শ্রোতাকে কোনো খবর-সংবাদ জানানো। খ. শ্রোতাকে এ কথা জানানো যে, সংবাদদাতা সংবাদটি জানে।

وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي يُقْصَدُ بِالْخَبَرِ إِفَادَتُهُ فَائِدَةُ الْخَبَرِ وَالثَّانِي أَيْ كَوْنُ الْمُنْخَبَرِ عَالِمًا بِهِ لَا زِمَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا أَفَادَ الْحُكْمُ أَفَادَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِهِ وَلَيْسَ كُلَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِالْحُكْمِ أَفَادَ نَفْسَ الْحُكْمِ لِيَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مَعْلُومًا قَبْلَ الْإِخْبَارِ كَمَا فِي قَوْلِنَا لِمَنْ حَفِظَ التَّوْرَةَ قَدْ حَفِظْتَ التَّوْرَةَ وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ فَائِدَةُ الْخَبَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ بِالْخَبَرِ وَيُسْتَفَادَ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَالِمًا بِالْحُكْمِ حُصُولُ صُورَةِ الْحُكْمِ فِي ذَهْنِهِ وَهَهُنَا ابْتِحَاطٌ شَرِيفٌ سَمَحْنَا بِهَا فِي الشَّرْحِ -

অনুবাদ : প্রথমটি অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্য দ্বারা যে হুকুমের ফায়দা (শ্রোতাকে) দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তার নামকরণ করা হয়েছে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সংবাদদাতা সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া- এর নামকরণ করা হয়েছে **لَا زِمَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলে। কেননা, যখন কোনো বাক্য হুকুমের ফায়দা দেবে তখন এরও ফায়দা দেবে যে, সে হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু যখনই বাক্য এই ফায়দা দিবে যে, (সংবাদদাতা) হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত তখন হুকুমের ফায়দা দেওয়ার বিষয়টি আবশ্যিক নয়। কেননা, এটা সম্ভব যে, সংবাদ দানের আগেই হুকুমটি জানা আছে। যেমন- তাওরাত মুখস্থকারী ব্যক্তিকে আমরা বলি, তুমি তাওরাত মুখস্থ করেছ। এর মধ্যে (হুকুমটি সংবাদ দানের আগেই জানা আছে।) এ জাতীয় সংবাদকে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলে নামকরণ করা হয়েছে এ ভিত্তিতে যে, এটাই সংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য এবং এ থেকে সংবাদ লাভের ফায়দাটুকু নেওয়া হয়। হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার অর্থ হলো হুকুমের একটি অবয়ব মনোজগতে স্থান পাওয়া।

এ স্থলে কতিপয় উৎকৃষ্ট আলোচনা রয়েছে, ব্যাখ্যাগ্রন্থে (মুতাওয়ালে) এ বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ الْخَبَرُ : বিগত আলোচনায় আমরা সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা দু'ধরনের ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছি। এ দু'টি বিষয়ের নামকরণ সম্পর্কে উপরোক্ত ইবারতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সংবাদদাতার যদি সংবাদমূলক বাক্য দ্বারা শ্রোতার কাছে সংবাদ পৌছানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এর নাম হবে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** (সংবাদমূলক বাক্যের উপকারিতা)। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সংবাদদাতা যখন সংবাদ দ্বারা শ্রোতাকে এ কথা জানানো উদ্দেশ্য করে যে, (সংবাদদাতা) সংবাদটি জানে, তখন একে **لَا زِمَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ** (সংবাদমূলক বাক্যের ফায়দার জন্য যা লাযেম) বলা হবে।

عَالِمٌ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ সংবাদদাতা **عَالِمٌ** (সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত) এ কথা জানানোকে **لَا زِمَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলে নামকরণ করার যুক্তি এই দেখিয়েছেন যে, সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত এ খবরটি **فَائِدَةُ الْخَبَرِ**-এর জন্য লাযেম। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সংবাদদাতা যখনই শ্রোতাকে বর্ণনামূলক বাক্য বলবে অর্থাৎ শ্রোতাকে সংবাদ দিবে তখন এ সংবাদও দেওয়া হয়ে যাবে যে, সে (সংবাদদাতা) খবরটি জানে। তাই এটিকে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ**-এর জন্য লাযেম বলা হয়েছে।

অবশ্য এর বিপরীত বিষয়টি হয় না। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, সংবাদদাতা যখন শ্রোতাকে এ কথা জানাতে চায় যে, সে সংবাদটি জানে তখন সংবাদ জানানোর কাজ সব সময় হয় না। কারণ, সে শ্রোতাকে যে নিজের **بِالْخَبَرِ** হওয়ার কথা জানাচ্ছে- হতে পারে সে সংবাদটি আগ থেকেই জানে। যেমন- কুরআনের হাফেজকে কেউ বলল, তুমি কুরআনের হাফেজ। এখানে কুরআনের হাফেজ তো আগ থেকেই জানে যে, সে হাফেজ। তাই তার এ সংবাদ দ্বারা কোনো জ্ঞান অর্জিত হয়নি।

মোটকথা, সংবাদদাতার প্রথম উদ্দেশ্যটির জন্য দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি লাযেম; কিন্তু দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটি লাযেম নয়, তাই দ্বিতীয়টিকে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলা হয়।

قَوْلُهُ وَتَسْمِيَةُ مِثْلِ هَذَا الْعُكْمِ الْخَبَرِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, উপরে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলা হবে। **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** -এর যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ **أَنْتَ حَفِظْتَ الْقُرْآنَ** -এর মধ্যে হুকুমকে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলা হবে। এরপর যখন শ্রোতাকে **عَالِمٌ بِالْخَبَرِ** -এর কথা জানানো উদ্দেশ্য, তখন তা **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হলো। কিন্তু এখানে যেহেতু শ্রোতা আগ থেকেই হুকুম সম্পর্কে জানে তখন তো এ বাক্য শ্রোতাকে কোনো সংবাদ বা হুকুমের ফায়দা দিল না। যখন এটি ফায়দা দিল না তখন একে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলা যাবে কি?

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, এ জাতীয় সংবাদকে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলার অর্থ হচ্ছে এর দ্বারা খবর দেওয়া উদ্দেশ্য হয় এবং সংবাদ এগুলো থেকে লাভ করা সম্ভব। **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** অর্থ এই নয় যে, তা সব সময় খবরের ফায়দা দিবে এবং সব সময় এসব বাক্য দ্বারা খবরই উদ্দেশ্য হবে; বরং এর অর্থ হচ্ছে তা সংবাদ বহন করে। তাই যখন ইচ্ছা এ জাতীয় শব্দ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। এ হিসেবেই একে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِكُونِهِ عَالِمًا : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, আমরা মুসান্নিফের বক্তব্যের সাথে একমত নই যে, **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হওয়া মাত্রই তা **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হয়। যেমন- কোনো সংবাদদাতা শ্রোতাকে একটি **خَبَرٌ** জানাল, কিন্তু উক্ত সংবাদদের ব্যাপারে সংবাদদাতা নিজে নিশ্চিত জ্ঞান রাখে না; বরং তিনি সংবাদের ব্যাপারে সন্দেহান অথবা বিভ্রান্তির শিকার। এমতাবস্থায় সংবাদদাতার সংবাদ তো **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হলো, কিন্তু **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হলো না। অথচ আপনি দাবি করেছেন যে, **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হওয়া মাত্রই তা **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** হয়ে যায়। এর উত্তর হলো, প্রশ্ন উত্থাপনকারীর প্রশ্নটি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন **عَالِمٌ بِالْخَبَرِ** -এর মধ্যে **عِلْمٌ** আছে। তাকে যদি এই অর্থে নেওয়া হয় যে, **عِلْمٌ بِمَعْنَى إِعْتِقَادٍ جَائِزٍ لَا يَقْبَلُ التَّشْكِيكَ** (নিশ্চিত বিশ্বাস, যা কোনো ধরনের সন্দেহকে আশ্রয় দেয় না) অথচ আমাদের এখানে **عِلْمٌ** শব্দ দ্বারা উপরোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে **عِلْمٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সংবাদদাতার মনোজগতে সংবাদের একটি অবয়ব তৈরি হওয়া। হুকুম সংবাদদাতার মনোজগতে যেমনিভাবে **إِعْتِقَادٌ** নিশ্চিত বিশ্বাস আকারে হাসিল হয়- তেমনি **شَكٌّ** (সন্দেহ), **ظَنٌّ** (অনিশ্চিত ধারণা) এবং **وَهْمٌ** (সাধারণ অপ্রাধান্য ধারণা) ইত্যাদি আকারেও হুকুম মনোজগতে হাসিল হতে পারে। সুতরাং যখন **عِلْمٌ** দ্বারা এখানেও এ অর্থ উদ্দেশ্য তখন সংবাদমূলক বাক্য সবসময়ই সংবাদদাতার **عَالِمٌ بِالْخَبَرِ** (সংবাদ সম্পর্কে অবগত) হওয়ার ফায়দা দিবে, যাকে **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** বলা হয়। আর **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** -এর সাথে সাথে এমনিতেই পাওয়া যায়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে আরো উৎকৃষ্ট কিছু আলোচনা আছে, যা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়ালে উপস্থাপন করেছি।

وَقَدْ يُنَزِّلُ الْمُخَاطَبُ الْعَالِمُ بِهِمَا أَىْ بِفَائِدَةِ الْخَبَرِ وَلَا زِمَهَا مَنَزِلَةَ الْجَاهِلِ فَيُلْقَى
إِلَيْهِ الْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفَائِدَتَيْنِ لِعَدَمِ جَرِيهِ عَلَى مُوجِبِ الْعِلْمِ فَإِنَّ مَنْ لَا يَجْرِي
عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ هُوَ وَالْجَاهِلُ سَوَاءٌ كَمَا تَقُولُ لِلْعَالِمِ التَّارِكِ لِلصَّلَاةِ الْوَجِبَةِ
وَأَجِبَةِ وَتَنْزِيلُ الْعَالِمِ بِالشَّيْءِ مَنَزِلَةَ الْجَاهِلِ بِهِ لِاعْتِبَارَاتٍ خُطَابِيَّةٍ كَثِيرَةٍ فِي الْكَلَامِ
مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى "وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا
بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" بَلْ تَنْزِيلُ وَجُودِ الشَّيْءِ مَنَزِلَةَ عَدَمِهِ كَثِيرٌ مِنْهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى : "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ" -

অনুবাদ : কখনো উভয় বিষয় তথা فَائِدَةُ الْخَبَرِ ও فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্পর্কে অবগত শ্রোতাকে অজ্ঞ ব্যক্তির স্তরে রাখা হয়। অতঃপর তার কাছে সংবাদ পেশ করা হয়; যদিও সে উভয় ফায়দা সম্পর্কে অবগত। তার জ্ঞানুসারে না চলার কারণে। কেননা, যে ব্যক্তি তার জ্ঞানের দাবি মতো চলে না, সে এবং অজ্ঞ সমান। যেমন তুমি বেনামাজি জ্ঞানীকে বল, নামাজ অত্যাবশ্যকীয়। কোনো বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিকে সে বিষয়ের অজ্ঞের স্থানে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য রাখার নীতি রচনাবলিতে প্রচুর দেখা যায়। এর একটি উদাহরণ আল্লাহর বাণী : 'তারা (ইহুদিরা) অবশ্যই জানে যে, যারা এগুলো (অর্থৎ যাদুকে) গ্রহণ করেছে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রয় করেছে তা খুবই মন্দ, যদি তারা জানত'; বরং কোনো বিদ্যমান জিনিসকে অস্তিত্বহীন জিনিসের স্থানে রাখার বিষয়টিও অনেক। এর উদাহরণ, আল্লাহর কালাম : (হে মুহাম্মদ!) যখন আপনি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন আপনি তো নিক্ষেপ করেননি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَدْ يُنَزِّلُ الْمُخَاطَبُ الْعَالِمُ بِهِمَا : মুসল্লিফ (র.) সাধারণভাবে বর্ণনামূলক বাক্যের ব্যবহারের মূল দু'টি ক্ষেত্র আলোচনা করার পর এখানে আরো দু'টি ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর একটি হচ্ছে সংবাদদাতা এমন শ্রোতার কাছে সংবাদ পেশ করে, যে فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং فَائِدَةُ الْخَبَرِ উভয়টি সম্পর্কে জানে; কিন্তু সে সংবাদ মোতাবেক আমল করে না। তাই সংবাদদাতা তাকে উভয় ধরনের ফায়দা সম্পর্কে অজ্ঞ মনে করে তার সামনে বর্ণনামূলক বাক্যটি পেশ করে, যেমন- প্রকৃত অজ্ঞদের সামনে পেশ করা হয়। কেননা, যে ব্যক্তি তার জ্ঞান মোতাবেক আমল করে না, সে এবং অজ্ঞ উভয় সমান। কারণ, জ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জ্ঞাত বিষয়ের উপর আমল করা। এখানে যেহেতু আমল উভয় (অজ্ঞ এবং জ্ঞানী) থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই উভয় একই স্তরের। এর উদাহরণ হলো, বেনামাজিকে বলা وَأَجِبَةُ الصَّلَاةِ নামাজ ফরজ। وَأَجِبَةُ الصَّلَاةِ বাক্যটি ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্পর্কে জানে, কিন্তু সে জ্ঞান মোতাবেক আমল করছে না। তাই তাকে সে নামাজের ফরজ হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির স্তরে রেখে তাকে বলা হচ্ছে- 'নামাজ ফরজ'। উল্লেখ্য যে, عَالِمٌ-কে جَاهِلٌ-এর স্তরে রাখার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে-

১. শুধুমাত্র فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্পর্কে عَالِمٌ (অবগত) ব্যক্তি।
২. শুধুমাত্র فَائِدَةُ الْخَبَرِ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।
৩. فَائِدَةُ الْخَبَرِ এবং فَائِدَةُ الْخَبَرِ উভয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি।

উল্লিখিত উদাহরণটি প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অথবা শুধুমাত্র প্রথম প্রকারের উদাহরণও বলা যায়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো— এক ব্যক্তি জানে যে, সে যায়েদকে মেরেছে— এ কথা তুমি জান, তুমি সেই ব্যক্তিকে বললে **ضَرَبْتُ زَيْدًا**। শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ হলো— যেমন তুমি কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে বললে, যে একথা জানে যে, তুমি জান সে মু'মিন; কিন্তু সে তোমাকে এমন কষ্ট দিয়েছে যা কোনো মু'মিনের পক্ষে সম্ভব নয়, আল্লাহ আমাদের প্রভু, মুহাম্মদ ﷺ আমাদের রাসূল। এ উদাহরণে শ্রোতা **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** এবং **لَا زِمَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ** উভয় সম্পর্কে অবগত ছিল; কিন্তু তাকে অজ্ঞ মনে করে বাক্যটি বলা হয়েছে।

এখানে একটি আপত্তি দেখা দিতে পারে যে, **عَالِمٌ**-কে **جَاهِلٌ**-এর স্তরে রাখার তিনটি অবস্থা হতে পারে; কিন্তু মুসান্নিফ সর্বনাম ব্যবহার করলেন দ্বিবাচনের এবং বললেন **عَالِمٌ بِهِمَا**-এর কারণ কি? এর জবাব হলো, **مَرْجِعُ** সর্বনামের **هُمَا** হলো **مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ** তাহলে বাক্যের অর্থ হবে এরূপ— কখনো উভয়ের সমষ্টির অবগত ব্যক্তিকে অজ্ঞের স্থানে রাখা হয়। অতএব, উক্ত (ব্যাখ্যাকৃত) সর্বনাম (**فَائِدَةُ الْخَبَرِ** এবং **لَا زِمَ فَائِدَةُ الْخَبَرِ**) উভয়টি এবং **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** অথবা **فَائِدَةُ الْخَبَرِ** কোনো একটি দু'টোর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

মুসান্নিফ বলেন, কখনো সম্বোধনের বিভিন্ন বিষয়গুলো লক্ষ্য করে কোনো বিষয়ে অবগত ব্যক্তিকে সে বিষয়ের অনবহিত ব্যক্তির স্থানে রাখা হয় এবং এ ধরনের ব্যবহার আরবি রচনাতে প্রচুর। এর একটি উদাহরণ হলো, পবিত্র কুরআনের আয়াত— **وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَائٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**—

অর্থাৎ তারা ভালোভাবেই জানে যে, যে ব্যক্তি যাদু অবলম্বন করে তার জন্য পরকালের কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মা বিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ; যদি তারা জানত। এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, আয়াতের প্রথমাংশে ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ভালোভাবে জানে (**وَلَقَدْ عَلِمُوا**) কিন্তু তারা তাদের অবগতি অনুসারে কাজ করেনি। তাই তাদের অজ্ঞদের স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জ্ঞানকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে— **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** “যদি তারা জানত”।

সারকথা হলো এই যে, কখনো জ্ঞানীকে মূর্খের স্থানে রাখা হয়।

এরপর মুসান্নিফ আরো বলেন, কখনো কোনো বিষয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করত অনস্তিত্বের স্থানে রাখা হয়। যেমন— কুরআনে রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ** (যখন আপনি কাফিরদের প্রতি কঙ্কর ও বালু নিক্ষেপ করেছেন তখন আপনি তা নিক্ষেপ করেননি।) এ আয়াতে আল্লাহ রাসূল ﷺ-এর কঙ্কর নিক্ষেপকে অস্বীকার করেছেন এবং নিক্ষেপ করার অস্তিত্বকে অনস্তিত্বে পরিণত করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, কঙ্কর নিক্ষেপ একটি কাজ কোনো জ্ঞান নয়। অতএব, এ কথা প্রমাণিত হলো যে, কোনো অস্তিত্ববান জিনিসকে অস্তিত্বহীন মনে করা হয়। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কঙ্কর রাসূল ﷺ নিক্ষেপ করলেও তার আসল কার্যকারিতা আল্লাহ তা'আলা সাধন করেছেন। আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা বলেন **وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى** অর্থাৎ তবে আল্লাহ কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

ক. কখনো বর্ণনামূলক বাক্যের উভয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিকে অজ্ঞাত ব্যক্তির স্তরে রাখা হয় এবং সেই অনুযায়ী বাক্য পেশ করা হয়। যেমন— **وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**

খ. কখনো অস্তিত্বশীল বিষয়কে অস্তিত্বহীনের স্থানে রাখা হয়। যেমন— **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ**

فَيَنْبَغِي أَى إِذَا كَانَ قَصْدُ الْمُخِيرِ بِخَبَرِهِ إِفَادَةَ الْمُخَاطَبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ مِنَ التَّرْكِيبِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ حَذْرًا عَنِ اللَّغْوِ فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِي الذَّهْنِ مِنَ الْحُكْمِ وَالتَّرَدُّدِ فِيهِ أَى لَا يَكُونُ عَالِمًا بِوُقُوعِ النَّسْبَةِ أَوْ لَا وَقُوعِهَا وَلَا مُتَرَدِّدًا فِي أَنَّ النَّسْبَةَ هَلْ هِيَ وَاقِعَةٌ أَمْ لَا وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قِيلَ أَنَّ الْخُلُوَّ عَنِ الْحُكْمِ يَسْتَلْزِمُ الْخُلُوَّ عَنِ التَّرَدُّدِ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهِ بَلِ التَّحْقِيقُ أَنَّ الْحُكْمَ وَالتَّرَدُّدَ فِيهِ مُتَنَافِيَانِ أَسْتَغْنَى عَلَى لَفْظِ الْمَبْنَى لِلْمَفْعُولِ عَنْ مُوَكَّدَاتِ الْحُكْمِ لِیْتِمَكَّنَ الْحُكْمُ فِي الذَّهْنِ حَيْثُ وَجَدَهُ خَالِيًا وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُتَرَدِّدًا فِيهِ أَى فِي الْحُكْمِ طَالِبًا لَهُ بِأَنْ حَضَرَ فِي ذَهْنِهِ طَرَفَا الْحُكْمِ وَتَحَيَّرَ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَهُمَا وَقُوعُ النَّسْبَةِ أَوْ لَا وَقُوعِهَا حَسَنَ تَقْوِيَّتِهِ أَى تَقْوِيَةِ الْحُكْمِ بِمُؤَكَّدٍ لِيُزِيلَ ذَلِكَ الْمُؤَكَّدَ تَرَدُّدَهُ وَيَتِمَكَّنَ الْحُكْمُ -

অনুবাদ : সুতরাং সমীচীন হবে অর্থাৎ যখন সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা শ্রোতাকে ফায়দা দেওয়ার ইচ্ছা হবে তখন সমীচীন হবে বাক্যকে প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষিপ্ত করা, অনর্থক কথা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে। অতএব যখন শ্রোতা মুক্ত মনের হবে কোনো সংবাদ বিষয়ে এবং সংবাদে সন্দেহ করা থেকে। অর্থাৎ সে নিসবত সংঘটিত হওয়া বা না হওয়া (কোনো বিষয়েই) অবহিত হবে না এবং সন্দেহ পোষণকারীও হবে না যে, নিসবতটি হলো বা না হলো। সুতরাং এর দ্বারা কথিত মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত হলো তথা সংবাদ বিষয়ে মুক্ত মন হওয়া সংবাদ বিষয়ে সন্দেহ প্রবণতা না করাকে আবশ্যিক করে। সুতরাং (সন্দেহপ্রবণতামুক্ত হওয়া)-এর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে গবেষণালব্ধ কথা এই যে, হুকুম বা সংবাদ এবং এতে সন্দেহ প্রবণতা এ দু'য়ের মাঝে বৈপরীত্য) রয়েছে। (বর্ণনামূলক বাক্যটিকে) অমুখাপেক্ষী করা হবে হুকুমের তাকীদকারী শব্দাবলি থেকে। أَسْتَغْنَى শব্দটি মাফউল-এর সীগাহ। যাতে হুকুমটি মুক্ত মস্তিষ্ক পাওয়া মাত্রই তাতে স্থান করে নিতে পারে। আর যদি শ্রোতা হুকুমের ব্যাপারে সন্দ্বিহান হয় এবং হুকুমকে অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ তার মনোজগতে হুকুমের দু' প্রধান অংশ (তথা মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ) থাকে কিন্তু শ্রোতা এ দু'য়ের মাঝে ইতিবাচক হুকুম নাকি নেতিবাচক হুকুম এ ব্যাপারে সন্দ্বিহান, এমতাবস্থায় হুকুমকে তাকিদকারী দ্বারা জোরালো করা উত্তম; যাতে সেই তাকিদকারী বিষয়টি তার সন্দেহকে দূর করে দেয় এবং হুকুম স্থিরভাবে বসে যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي : এখান থেকে পূর্ববর্তী আলোচনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে অর্থাৎ সংবাদদাতার বর্ণনামূলক বাক্য দ্বারা যখন সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হবে তখন শ্রোতার অবস্থানুপাতে বাক্যটি কিরূপ হবে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। মূল লেখক বলেন, সংবাদদাতার যখন সংবাদমূলক বাক্য দ্বারা সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তখন যথাসম্ভব বাক্যটিকে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা উচিত। যেন বাক্যটিতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথার সমাবেশ না ঘটে। সেই সাথে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, বাক্যটি যেন বেশি সংক্ষিপ্ত না হয়ে যায়- যার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। বাক্যের শ্রোতা মোট তিন প্রকার-

১. সাধারণ শ্রোতা, যে বর্ণনামূলক বাক্যটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।
 ২. দ্বিধাগ্রস্থ শ্রোতা, যে বর্ণনামূলক বাক্যটি সম্পর্কে ধারণা রাখে সন্দেহের সাথে, কিন্তু তার নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।
 ৩. অস্বীকারকারী শ্রোতা, যে বর্ণনামূলক বাক্যটিকে অস্বীকার করে।
- এ তিন অবস্থায় বাক্যের অবস্থা তিন ধরনের হয়ে থাকে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি শ্রোতার মনে কোনো সংবাদ না থাকে বা সংবাদ সম্পর্কে কোনো ধরনের সংশয় না থাকে অর্থাৎ মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নাকি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এ ধরনের কোনো সংবাদ জানে না এবং এ ব্যাপারে তার কোনো সংশয়-সন্দেহও নেই, তাহলে শ্রোতার সামনে যে বর্ণনামূলক বাক্যটি পেশ করা হবে তা তাকিদমুক্ত হবে।

قَوْلُهُ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ مَا قَبِلَ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, কেউ কেউ মনে করেন, যখন শ্রোতার মনে কোনো সংবাদ থাকে না, তখন তার মনে সংবাদসংক্রান্ত কোনো ধরনের সংশয়-সন্দেহও থাকে না। অর্থাৎ শ্রোতার মন সংবাদ না জানাটাই একথা বুঝায় যে, তার মনে সংবাদ সম্পর্কিত কোনো সংশয় নেই। অতএব, যখন বলা হলো শ্রোতার মনোজগতে কোনো সংবাদ নেই, তখন একথা বলা হয়ে গেল যে, তার মনে কোনো সংবাদ সংক্রান্ত সংশয়ও নেই।

মোটকথা, যেহেতু সংবাদ না জানা সংবাদের ব্যাপারে দ্বিধা না থাকাকে বুঝায় সেহেতু সংবাদ না জানার সাথে সংবাদের ব্যাপারে দ্বিধা না থাকার শর্তারোপ করা ঠিক হয়নি।

অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর এ কথা বললেই হতো, যখন শ্রোতার মন হুকুম থেকে মুক্ত হয়।

এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শ্রোতার মনে সংবাদ বা হুকুম না থাকা শ্রোতার মনে সংবাদ সম্পর্কে সংশয় না থাকাকে তখনই লাযেম করবে যখন এ দু'টোর মাঝে تَلَازُمٌ বা مَلَزُومٌ-এর সম্পর্ক থাকবে; অথচ এ দু'টোর মাঝে تَلَازُمٌ-এর সম্পর্ক নেই; বরং এ দু'টোর মাঝে পরস্পর বৈপরীত্যের সম্পর্ক এবং এ দু'টো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। সুতরাং যখন এ দু'টোর মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান এবং এগুলো পরস্পর ভিন্ন তখন একটি অপরটিকে লাযেম করতে পারে না এবং একটিকে উল্লেখ করলে অপরটির কথা বলা হয়ে যায় না। সুতরাং خَالٍ عَنِ الْحُكْمِ বলার পর التَّرَدُّدُ فِي الْحُكْمِ বলা সঠিক হয়েছে বলেই গণ্য হবে। استغْنَى শব্দটি مَجْهُول-এর صِيغَةٌ। এর নায়েবে ফায়েল হলো تَرْكِبٌ বা ইবারত।

দ্বিতীয় প্রকারের শ্রোতা অর্থাৎ যাদের মনে সংবাদ সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় আছে এবং তারা সংবাদ (শোনার) প্রত্যাশী অর্থাৎ তার মনে কোনো সংবাদ সংক্রান্ত মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ রয়েছে, কিন্তু সে এ বিষয়ে সন্দিহান যে, এ দু'টি বিষয়ের মাঝে কি ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, নাকি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এমতাবস্থায় হুকুম বা সংবাদটি জোরালো করার জন্য তাকিদ ব্যবহার করা উত্তম। যাতে এ তাকিদটি সন্দেহপোষণকারীর সন্দেহটি দূর করে দেয় এবং তার মনে হুকুমটি স্থান লাভ করে।

لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُحْسِنُ التَّائِيدَ إِذَا كَانَ لِلْمُخَاطَبِ ظَنٌّ فِي خِلَافِ حُكْمِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ مُنْكَرًا لِلْحُكْمِ وَجَبَ تَوْكِيدُهُ أَيْ تَوْكِيدُ الْحُكْمِ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ أَيْ بِقُدْرَةِ قُوَّةٍ وَضَعْفًا يَعْنِي يَجِبُ زِيَادَةُ التَّائِيدِ بِحَسَبِ إِزْدِيَادِ الْإِنْكَارِ أَزَالَهُ لَهُ -

অনুবাদ : কিন্তু ‘দালাইলুল ই‘জাজ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তাকিদ ব্যবহার তখনই উত্তম যখন তোমার (মুতাকাল্লিমের) হুকুমের বিপরীতে শ্রোতার প্রবল ধারণা থাকে। আর যদি শ্রোতা হুকুমের অস্বীকারকারী হয়, তাহলে হুকুমের তাকিদ ব্যবহার ওয়াজিব অস্বীকারের মাত্রানুপাতে। অর্থাৎ অস্বীকারের পরিমাণ তথা শক্তিশালী ও দুর্বলতা অনুপাতে অর্থাৎ অস্বীকার বেশি হওয়ার অনুপাতে বেশি তাকিদ ব্যবহার ওয়াজিব, অস্বীকার দূরীকরণের জন্য।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي دَلَائِلِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ‘দালাইলুল ই‘জাজ’ গ্রন্থে এ ব্যাপারে শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, শ্রোতা যখন সংবাদদাতা বা বক্তার সংবাদের বিপরীত ধারণা করে, যেমন- সংবাদদাতা বলল, যাকে দণ্ডায়মান, কিন্তু শ্রোতা ধারণা করছে যাকে দণ্ডায়মান নয়। এমতাবস্থায় তাকিদ ব্যবহার করা উত্তম। তাঁর মতে শ্রোতা যখন সংবাদদাতার বক্তব্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয় অর্থাৎ তার কথার সত্যতা ও অসত্যতা উভয়টাই শ্রোতার কাছে সমান হয়, তখন শ্রোতার সামনে সংবাদকে তাকিদমুক্ত অবস্থায় পেশ করা বাঞ্ছনীয়; তাকিদযুক্তভাবে উপস্থাপন অবৈধ। যেমনটি শ্রোতা সংবাদ সম্পর্কে না জানলে তাকিদযুক্তভাবে উপস্থাপন করা অবৈধ।

উপরের আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রোতার সংবাদের ব্যাপারে সাধারণ সন্দেহ হলে শায়খ জুরজানীর কাছে সেই সংবাদে তাকিদ ব্যবহার অবৈধ।

আর তালখীসুল মিফতাহের লেখকের মতে, এমতাবস্থায় তাকিদ ব্যবহার করা শুধু বৈধই নয়; বরং উত্তম।

আর যখন শ্রোতা সংবাদদাতার সংবাদকে অস্বীকার করে, তখন শ্রোতার অস্বীকারের মাত্রানুপাতে তাকিদ আনা ওয়াজিব। অর্থাৎ অস্বীকার যদি বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে তাকিদও বেশি শক্তিশালী হতে হবে, অস্বীকার যদি সাধারণ মানের হয় তাহলে তাকিদও সাধারণ মানের হবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. শ্রোতা যদি সংবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ও সংশয়হীন হয়, তাহলে বক্তার সংক্ষিপ্তভাবে তাকিদমুক্ত সংবাদ দেওয়া আবশ্যিক।

খ. যদি শ্রোতা সংবাদের ব্যাপারে সন্দিহান হয় এবং সে সংবাদ জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তাহলে বর্ণনামূলক বাক্যে তাকিদ ব্যবহার করা উত্তম।

গ. আর যদি শ্রোতা সংবাদ অস্বীকার করে, তাহলে তার অস্বীকারের মাত্রানুযায়ী তাকিদ ব্যবহার করা আবশ্যিক।

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ رَسُولٍ عَيْسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ حِينَ
 أَرْسَلَهُمْ إِلَى أَهْلِ انْطَاكِيَّةَ إِذْ كَذَّبُوا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ مُؤَكَّدًا بِإِنَّ
 وَاسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ وَفِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ مُؤَكَّدًا بِالْقَسَمِ وَإِنَّ
 وَاللَّامِ وَاسْمِيَّةِ الْجُمْلَةِ لِمُبَالَغَةِ الْمُخَاطَبِينَ فِي الْإِنْكَارِ حَيْثُ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
 مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وَقَوْلُهُ إِذْ كَذَّبُوا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ
 تَكْذِيبَ الْإِثْنَيْنِ تَكْذِيبُ الثَّلَاثَةِ وَالْأَلَّا فَالْمُكْذَّبُ أَوَّلًا إِثْنَانِ -

অনুবাদ : (অস্বীকারকারীর সংবাদ সম্পর্কে) যেমনটি আল্লাহ হযরত ইসা (আ.)-এর প্রতিনিধিগণ (তাদের এবং আমাদের নবীর উপর দরুদ ও সালাম) সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, যখন তাদের ইস্তাকিয়াবাসীদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাদের প্রথমবার মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়। (তারা বলেন,) নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে নবীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (حرف مشبه بالفعل) ان (বাক্যটিকে) এবং জুমলায় ইসমিয়াহ দ্বারা জোরালো করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়বার (যখন তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হলো) তারা বলল, আমাদের প্রভু অবগত আছেন যে, নিশ্চয়ই আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।

বাক্যটিকে (حرف مشبه بالفعل) ان, قَسَمُ (পেশ করা হয়েছে) শ্রোতাদের অস্বীকারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের কারণে, কেননা, তারা বলেছিল, তোমরা তো আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। পরম মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পক্ষে কোনো দলিল নাজিল করেননি। তোমরা নিরেট মিথ্যাবাদী। মূল লেখক (بصحة) বলেছেন, এ ভিত্তিতে যে, দু'জনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তিনজন (بصحة)-কেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। অন্যথায় প্রথমত মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে দু'জনকে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً الخ : উল্লিখিত ইবারতে বর্ণনামূলক বাক্যের তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মূল লেখক প্রথম দু' প্রকারের উদাহরণ এ কারণে দেননি যে, সেগুলো সকলের কাছেই পরিচিত। এ উদাহরণটি পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা পেশ করেছেন। আয়াতের মধ্যে হযরত ইসা (আ.)-এর যুগের একটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ঘটনাটি এরূপ যে, হযরত ইসা (আ.) ইস্তাকিয়াবাসীদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য বাওলাশ এবং ইয়াহইয়া নামক দু'জন প্রতিনিধি পাঠান। যখন তারা ইস্তাকিয়াবাসীদের সামনে আল্লাহর বাণী প্রচার করলেন এবং আসমানী কিতাব ইনজীল পেশ করলেন, তখন তারা প্রতিনিধি দলকে অস্বীকার করল এবং তাদের দাওয়াতের আহ্বানকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। এ কারণে প্রতিনিধিগণ তাদের বক্তব্যকে (حرف مشبه بالفعل) ان এবং জুমলায় ইসমিয়াহ-এর তাকিদ দ্বারা পেশ করলেন। তারা বললেন, إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এরপর তাদের দু'জনের সহযোগিতা করার জন্য হযরত শামউন (আ.)-কে পাঠালেন। কিন্তু এবার ইস্তাকিয়াবাসীগণ আরো জোরালোভাবে তাদেরকে অস্বীকার করল। তারা বলল- قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ -

অর্থাৎ তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ, তোমাদের পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণাদি অবতীর্ণ করেননি, তোমরা কেবলই মিথ্যাবাদী।

তাদের এ জোরালো প্রত্যাখ্যানের জবাবে প্রতিনিধিগণ قَسَمَ (কসম), اِنَّ (حرف مشبه بالفعل), لَاَمَ تَاَكِيْدَ এবং জুমলায়ে ইসমিয়াহ— এ চারটি তাকিদ দ্বারা তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানকারীদের সামনে পেশ করেন। তারা বলেন, رَيْنَا يَفْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمَرْسَلُونَ আমাদের প্রভু জানেন, অবশ্যই অবশ্যই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এ বাক্যে رَيْنَا শব্দটি বিধানগতভাবে কসম, আর اِنَّ (حرف مشبه بالفعل) একটি তাকিদ, لَمَرْسَلُونَ-এর لَاَمَ হলো تَاَكِيْدَ لَاَمَ আর জুমলাতুল ইসমিয়াহ একটি তাকিদ।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কাফিররা তিনভাবে তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করেছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে। যথা— ১. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ ৩. مَا اَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ২. مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ১. এর জবাবে প্রতিনিধিগণের বক্তব্যে চারটি তাকিদ এসেছে। অথচ ইতঃপূর্বে বলা হয়েছিল যে, অস্বীকারের মাত্রানুসারের তাকিদ আসবে। সে মতে এখানে তিনটি তাকিদ আনাই সমীচীন ছিল; কিন্তু চারটি কেন আনা হলো?

এর জবাব হলো, অস্বীকারের মাত্রা বলতে বুঝানো হয়েছে, শক্ত বা নরম হিসেবে তাকিদ আনা হবে। অস্বীকারের মাত্রা বলতে সংখ্যার হিসাব উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ অস্বীকারের সংখ্যা পাঁচ হলে তাকিদ পাঁচটি হবে— এমন উদ্দেশ্য নয়; বরং এমনও হতে পারে অস্বীকারের বাক্যটি তিনটি কিন্তু তাকিদ পাঁচটি। এর উল্টোও হতে পারে। অর্থাৎ অস্বীকার তিনটি, কিন্তু তাকিদ দু'টি।

এখানে ইস্তিকিয়াবাসীদের তিনটি অস্বীকারের বাক্য চারটি তাকিদের সমান সমান হয়েছে। অতএব আর কোনো আপত্তি রইল না। অবশ্য কেউ কেউ বলে থাকেন, এখানে অস্বীকারের সংখ্যাও চারটি। চতুর্থ নাম্বার অস্বীকারটি হচ্ছে مَا اَنْتُمْ اِلَّا এবং اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا বাক্যদ্বয়ে যে حَصْر বা সীমাবদ্ধকরণটি হয়েছে তাই চতুর্থ অস্বীকার।

এ বাক্যটির সাহায্যে মুসান্নিফ একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, প্রথমে ইস্তিকিয়াবাসীদের কাছে প্রতিনিধি গিয়েছিলেন দু'জন; কিন্তু তাদের সম্পর্কে মূল লেখক كَذَّبُوا বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করলেন না কেন?

এর উত্তর হলো, দ্বিতীয়বার যখন হযরত শামউন (আ.) পরবর্তী দু'জন প্রতিনিধির সাথে যোগ দিলেন তখন তিনি পূর্বের দু'জনের অনুরূপ আহ্বান করলেন বা আহ্বান জানালেন। তাই সকলের বক্তব্য এক হওয়াতে দু'জনকে অস্বীকার করার অর্থ সকলকে অস্বীকার করা। এ কারণে বহুবচন (তিনজন)-এর সীগাহ ব্যবহার করা অনুচিত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রশ্ন তখনই আরোপিত হয় যখন فِي الْمَرْءِ الْأُولَى-এর তعلق হবে كَذَّبُوا-এর সাথে। তবে ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'স্বিয়াহ'-এর বক্তব্য হচ্ছে فِي الْمَرْءِ الْأُولَى-এর তعلق আমরা حِكَايَةِ-এর সাথে করবো। আর তখন উক্ত প্রশ্নটি আরোপিত হবে না।

મુખ્યતાસાક્ષરતા મા' આતી -૨૨

وَكَثِيرًا مَّا يُخْرِجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ أَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ فَيُجْعَلُ غَيْرَ
السَّائِلِ كَالسَّائِلِ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ أَى إِلَى غَيْرِ السَّائِلِ مَّا يَلُوحُ أَى مَّا يُشِيرُ لَهُ أَى لِغَيْرِ
السَّائِلِ بِالْخَبَرِ فَيَسْتَشْرِفُ غَيْرَ السَّائِلِ لَهُ أَى لِلْخَبَرِ يَغْنَى يَنْظُرُ إِلَيْهِ يُقَالُ
اسْتَشْرَفَ الشَّيْءُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيَبْسُطُ كَفَّهُ فَوْقَ الْحَاجِبِ كَالْمُسْتَظِلِّ مِنَ
الشَّمْسِ اسْتَشْرَفَ الطَّالِبُ الْمُتَرَدِّدُ نَحْوُ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى لَا تَدْعُنِي
بِأَنْ نُوحَ فِي شَأْنِ قَوْمِكَ وَاسْتِدْفَاعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ بِشَفَاعَتِكَ فَهَذَا الْكَلَامُ يَلُوحُ بِالْخَبَرِ
تَلْوِيحًا وَيُشِيرُ بِأَنَّهُ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ فَصَارَ الْمَقَامُ مَقَامَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُخَاطَبُ
فِي أَنَّهُمْ هَلْ صَارُوا مَحْكُومًا عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقِ أَمْ لَا فَقِيلَ إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ مُؤَكَّدًا أَى هُمْ
مَحْكُومًا عَلَيْهِمْ بِالْإِغْرَاقِ -

অনুবাদ : অনেক সময় মুকতায়াকে যাহিরের বিপরীত বাক্য আনা হয়। সুতরাং (সে মতে) বাক্যের ব্যাপারে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তিকে আগ্রহীর স্থানে রাখা হয় (এটা তখন করা হয়) যখন আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তির সামনে তার খবরের ইঙ্গিতবহ কিছু প্রকাশ করা হয়। ফলে অনাগ্রহী ব্যক্তি খবরের জন্য উদ্ধীবি হয় অর্থাৎ তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। اسْتَشْرَفَ الشَّيْءُ বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তি তার মাথাকে উঁচু করে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং তার হাত জ-এর উপর বিছিয়ে দেয় সূর্যতাপ থেকে ছায়া গ্রহণকারীর ন্যায়- সন্দেহ পোষণকারী আগ্রহী ব্যক্তির অপেক্ষার ন্যায়। যেমন- (হে নূহ) তুমি আমাকে ডেকো না অত্যাচারীদের ব্যাপারে। অর্থাৎ হে নূহ! তোমার জাতি সম্পর্কে দোয়া করবে না এবং তাদের থেকে তোমার সুপারিশের মাধ্যমে আজাব দূর করার আহ্বান জানাবে না। এ বাক্যটি একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং দিক নির্দেশ করেছে এ ব্যাপারে যে, তাদের উপর আজাব অবধারিত হয়েছে। ফলে এ স্থানটি হয়ে গেছে শ্রোতার সন্দেহ করার স্থান যে, তাদের কি সলিল-সমাধি হবে নাকি হবে না? অতএব বলা হলো নিশ্চয়ই তারা ডুববে, তাদের সলিল-সমাধিস্থ হবে। বাক্যটি তাকিদযুক্ত করে অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে ডুবে মরার হুকুম করা হয়েছে।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

خَرَجَ : ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে- শ্রোতার অবস্থানুপাতে তিনভাবে বাক্য উপস্থাপন করাকে خَرَجَ قَوْلُهُ وَكَثِيرًا مَّا يُخْرِجُ الْكَلَامَ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ বলা হয়। উপরোল্লিখিত ইবারতে বলা হচ্ছে যে, কখনো শ্রোতার অবস্থানুপাতে বাক্য পেশ করা হলো না। অর্থাৎ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ -এর বিপরীত বাক্য পেশ করা হয়। যেমন- কোনো শ্রোতা বাক্যের হুকুম জানতে আগ্রহী নয় এবং হুকুমের ব্যাপারে সন্দিহানও নয়, এতদসত্ত্বেও তাকে হুকুমের ব্যাপারে আগ্রহী এবং সন্দিহান মনে করে তার সামনে এমন (তাকিদযুক্ত বাক্য) পেশ করা হয় যেমনটি করা হয় প্রকৃত সন্দিহান ব্যক্তির সামনে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন হুকুমের ব্যাপারে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তিকে আগ্রহীর স্থানে রাখা হয়? এর উত্তরে মূল লেখক বলেন- إِذَا قُدِّمَ إِلَيْهِ مَّا يَلُوحُ لَهُ بِالْخَبَرِ فَيَسْتَشْرِفُ الْخَبَرَ অর্থাৎ যখন প্রকৃত সন্দেহ পোষণকারী নয় এমন ব্যক্তির সামনে সংবাদ বিষয়ক কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় যা সংবাদের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে, তা শুনে জ্ঞানী ব্যক্তি মূল সংবাদের ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে এবং সংবাদের প্রত্যাশায় উদ্ধীবি হয়।

فَيَسْتَشِيرُ শব্দটি اِسْتِشْرَاءٌ মাসদার থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে— জর উপর হাত রেখে কোনো কিছু অবলোকন করা। এখানে অপেক্ষায় থাকা বা উদ্দীপ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু এখানে উদ্দীপ হওয়ার দ্বারা প্রকৃত উদ্দীপ হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে উদ্দীপের মতো হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য। এর উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে লক্ষ্য করে বললেন— وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الذِّينَ ظَلَمُوا অর্থাৎ যারা জুলুম-অবিচার করেছে তাদের ব্যাপারে আমার সাথে কোনো কথা বলবে না। অর্থাৎ তাদের উপর আজাব অবধারিত হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করবে না। মোটকথা, এ বাক্যটিতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতির উপর কোনো আজাব আসছে। এরপর আল্লাহ বলেছেন— وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا (আমার তত্ত্বাবধানে নৌযান তৈরি করো) আল্লাহ তা'আলার এ কথাটি ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাতিকে পানিতে ডুবিয়ে মারার শাস্তি দেওয়া হবে। এ দু'টি বাক্য শুনে হযরত নূহ (আ.)-এর মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, আমার সম্প্রদায়ের পাপী লোকদের ডুবিয়ে মারার কথা বলা হলো? নাকি অন্যভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে? সুতরাং হযরত নূহ (আ.) যিনি কোনো সংবাদ শোনার প্রার্থী ছিলেন না, তাঁকে সংবাদ শোনার প্রার্থী এবং দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির স্থানে রাখা হলো— সে মতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য পেশ করলেন। আল্লাহ বললেন إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ নিশ্চয় তারা ডুবে মরবে।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো خَلَاْفٌ مُّقْتَضَى الظَّاهِرِ বাক্য ব্যবহার করা হয়। যেমন সাধারণ শ্রোতাকে প্রশ্নকারী এবং সংবাদে সন্দেহ পোষণকারীর স্থানে রাখা হয়। (আর এরূপ তখনই করা হয়, যখন শ্রোতার সামনে মূল সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় প্রথমে পেশ করা হয়) এবং তার সামনে সন্দিহান ব্যক্তির অনুরূপ সংবাদ পেশ করা হয়। যেমন, হযরত নূহ (আ.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ নিশ্চয় তারা ডুবে মরবে। এখানে হযরত নূহ (আ.) তাঁর স্বজাতির উপর আজাব আসা সংক্রান্ত সংবাদের ব্যাপারে প্রশ্নকারী বা অগ্রহী ছিলেন না।

وَجَعَلَ غَيْرَ الْمُنْكَرِ كَالْمُنْكَرِ إِذَا لَاحَ أَيْ ظَهَرَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى غَيْرِ الْمُنْكَرِ شَيْءٌ مِنْ
 أَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ نَحْوُ قَوْلِ حَجَلِ بْنِ نَضْلَةَ شَعْرٌ جَاءَ شَقِيقٌ إِسْمُ رَجُلٍ عَارِضًا رُمَحَهُ * أَيْ
 وَاضِعًا عَلَى الْبَعْضِ فَهُوَ لَا يُنْكَرُ أَنْ فِي بَنَى عَمِهِ رِمَاحًا لَكِنَّ مَجِئَهُ وَاضِعًا لِلرُّمَحِ عَلَى
 الْبَعْضِ مِنْ غَيْرِ الْتِفَافٍ وَتَهَيُّوْ أَمَارَةٌ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَارْمَحَ فِيهِمْ بَلْ كُلُّهُمْ عَزَلَ لَا سِلَاحَ مَعَهُمْ
 فَنَزَلَ مَنَزِلَةَ الْمُنْكَرِ وَخُوطِبَ خُطَابَ الْتِفَافِ بِقَوْلِهِ إِنَّ بَنَى عَمِكَ فِيهِمْ رِمَاحٌ مُؤَكَّدًا بِإِنَّ وَفِي
 الْبَيْتِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ الْمَرْزُوقِيُّ تَهْكُمَ وَاسْتَهْزَأَ كَأَنَّهُ يَرْمِيهِ بِأَنَّهُ مِنَ الضُّعْفِ
 وَالْجُبْنِ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ رِمَاحًا لَمَا اِلْتَفَتَ لِفَتْ الْكِفَاجِ وَلَمْ تَقْوِيْدُهُ عَلَى حَمْلِ
 الرِّمَاحِ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِ شَعْرٌ فَقُلْتُ لِمُحَرِّزٍ لَمَّا التَّقِينَا * تَنْكَبُ لَا يُقْطِرُكَ الزَّحَامُ *
 يَرْمِيهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرِ الشَّدَائِدَ وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَى مَضَائِقِ الْمَجَامِعِ كَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ
 بِالْقَوَائِمِ كَمَا يُخَافُ عَلَى الصَّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ لِقَلَّةِ غَنَائِهِ وَضَعْفِ بَنَائِهِ -

অনুবাদ : এবং (সংবাদ) অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তিকে অস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয়, যখন অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তির নিকট অস্বীকারের কোনো নিদর্শন প্রকাশ পায়। যেমন- কবি হাজল ইবনে নায়লার কবিতা চরণ : শাকীক নামীয় এক ব্যক্তি স্বীয় বর্ষা আড়াআড়ি রেখে আগমন করল। অর্থাৎ বর্ষাটিকে (লম্বালম্বি না ধরে শত্রুপক্ষের সামনে) প্রস্তুত ধরে রাখল। সে তাব চাচার বংশের মধ্যে বর্ষা থাকার বিষয়টি অস্বীকার করছে না বটে, কিন্তু বর্ষাকে আড়াআড়িভাবে ধরে রেখে ক্ষেপহীন এবং প্রস্তুতিবিহীন তার আগমনটাই ইঙ্গিত করে, সে তাদের মধ্যে কোনো বর্ষা না থাকা বিশ্বাস করে; বরং (তার ধারণা) তারা সকলেই নিরস্ত্র, তাদের হাতে অস্ত্র নেই। সুতরাং তাকে অস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হলো এবং তার প্রতি উপস্থিত ব্যক্তির সম্বোধন করা হলো (তারই উক্তি দ্বারা) নিশ্চয়ই তোমার চাচার বংশে অনেক বর্ষা রয়েছে (তার এই বাক্যটিকে) (حَرْفُ إِنَّ) দ্বারা তাকিদযুক্ত করা হয়েছে। ইমাম মারযুকীর মতানুসারে এ পঙ্ক্তিটিতে এক ধরনের বিদ্রূপ ও উপহাস রয়েছে। যেন কবি তার প্রতি শক্তিহীনতা এবং কাপুরুষত্বের ইঙ্গিত করেছেন যে, সে যদি জানত তাদের মধ্যে বর্ষাদি আছে তবু যুদ্ধের মতো প্রস্তুতি নিত না এবং অস্ত্র ধারণে তার হাত মজবুত হতো না। এটি ঐ কবির উক্তির মতোই যিনি বলেছেন (কবিতার চরণ) আমি মুহররজকে বললাম, যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো, তুমি সরে দাঁড়াবে। যেন জনসমাগম তোমাকে পদপিষ্ট না করে। এখানে কবি তাচ্ছিল্যের সাথে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, সে কষ্ট-ক্লেশের মুখোমুখি হয়নি এবং যুদ্ধের বিভীষিকাময় অবস্থা সহ্য করেনি। তার ব্যাপারে পদপিষ্ট হওয়ার ভয় করা হচ্ছে, যেমনটি ভয় করা হয়ে থাকে শিশু ও মহিলাদের ব্যাপারে, তাঁর সক্ষমতার স্বল্পতা এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَجَعَلَ غَيْرَ الْمُنْكَرِ الْخ : পূর্বের আলোচনায় মুকতাবায়ে যাহিরের বিপরীত একটি অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। তা ছিল সংবাদের ব্যাপারে সন্ধিহান নয় এমন ব্যক্তিকে সন্ধিহানের স্থানে রেখে তার সামনে অনুরূপে বাক্য পেশ করা।

এখানে আরেকটি বিপরীত ব্যবহার দেখানো হচ্ছে- তা হলো বাক্যের হুকুম বা সংবাদ অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তিকে অস্বীকারকারীর স্থানে রেখে সে মতে বাক্য পেশ করা। এটা তখন করা হয় যখন অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তি থেকে অস্বীকারের কোনো আলামত পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ মূল লেখক হাজল ইবনে নাদলার কবিতার একটি শে'র দ্বারা পেশ করেছেন :

হাজল ইবনে নাদলার পরিচয় :

কবির নাম আহমদ, তার উপাধি হাজল, তার বংশ পরিক্রমা নিম্নে দেওয়া হলো أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ بْنِ তার মায়ের নাম নাদলাহ। কবি ছিলেন কবিতায় উল্লিখিত শাকীকের চাচার বংশের এক ব্যক্তি। কবিতাটি নিম্নরূপ-

جَاءَ شَقِيقٌ عَارِضًا رُمَحَهُ * إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحٌ
هَلْ أَحَدٌ الدُّهْرُ لَنَا نَكْبَةٌ * أَمْ هَلْ رَقَّتْ أُمُّ شَقِيقٍ سِلَاحٌ

কবিতার প্রথম লাইনে শাকীক নামক এক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে যুদ্ধের পোশাক পরে বর্শা আড়াআড়িভাবে ধরে আসছিল তার চাচাতো ভাইদের দিকে (চাচাতো ভাইদের সাথে তার বিরোধ ছিল তাই) তার এভাবে আগমন চাচাতো ভাইদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র না থাকার ইঙ্গিত বহন করে। (কারণ যদি তাদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র থাকার স্বীকৃতি তার থাকত তাহলে সে এভাবে আগমন করত না) তার এ অবস্থা দেখে কবি তাকিদের সাথে বলছেন, “অবশ্যই তোমার চাচাতো ভাইদের কাছে অনেক বর্শা আছে।” উল্লিখিত কবিতায় শাকীক তার চাচাতো ভাইদের মাঝে যুদ্ধাস্ত্র থাকার প্রকৃত অস্বীকারকারী নয়। যদি প্রকৃত অস্বীকারকারী হতো, তাহলে তাকিদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করা মুকতাযায়ে হালের বা যাহিরের মোতাবেক হতো। কিন্তু তার মাঝে অস্বীকারের নিদর্শন পরিলক্ষিত হওয়ায় এবং প্রকৃত অস্বীকারকারীর স্থানে রেখে সে অনুযায়ী বাক্য পেশ করার কারণে একে মুকতাযায়ে জাহিরের বিপরীত বলা হবে। কেননা, প্রকৃত অস্বীকারকারীর সামনে তাকিদযুক্ত বাক্য ব্যবহার করাকেই মুকতাযায়ে যাহিরের মোতাবেক বলা হয়।

কবিতার মর্মার্থ : মুসান্নিফ বলেন, উক্ত কবিতায় শাকীক নামক ব্যক্তিকে কবি উপহাস ও বিদ্রূপ করেছেন।

তিনি বলতে চাচ্ছেন শাকীক একজন ভীর্ণ-কাপুরুষ। সে তার চাচাতো ভাইদের দিকে এ কারণে রওয়ানা হয়েছে যে, সে মনে করেছে তাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র নেই। অর্থাৎ তাদের নিরস্ত্র মনে করার কারণে তাদের দিকে সে রওয়ানা হয়েছে। সে যদি জানত তারা অস্ত্রধারী তাহলে সে কিছুতেই তাদের অভিমুখে রওয়ানা করত না এবং বর্শা নিতে সাহস করত না। মুসান্নিফ বলেন, কবিতাটিতে এমনি বিদ্রূপ করা হয়েছে যেমন বিদ্রূপ করেছিলেন আবু ছুমামা বারা ইবনে আযেব আল-আনসারী। তিনি বনু যাব্বাহ-এর মুহরিয নামক এক ব্যক্তির সাথে বিদ্রূপ করেছিলেন। আবু ছুমামা বলেন-

فَقُلْتُ لِمُعْرٍ لَمَّا التَقَيْنَا * تَنَكَّبَ لَا يُقْطِرُكَ الرِّحَامُ

অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানে আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হলাম তখন মুহরিযকে বললাম, তুমি সরে দাঁড়াও, নয়তো তোমাকে লোকসমাগম অর্থাৎ যোদ্ধারা পায়ে পিষে ফেলবে। কবি বলতে চাচ্ছেন যে, মুহরিয কষ্ট-ক্লেশে পরীক্ষিত নয়, সে যুদ্ধের ময়দানের কঠিন অবস্থা সহ্য করেনি। তাই তার উচিত যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে অর্থাৎ নিজগৃহে অবস্থান করা। অন্যথায় সে মহিলা ও শিশুদের মতো যুদ্ধের ময়দানে পদপিষ্ট হতে পারে।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো সংবাদ অস্বীকারকারী নয় এমন ব্যক্তিকে সংবাদ অস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয় (উক্ত ব্যক্তি থেকে অস্বীকারের আলামত প্রকাশ হওয়ার কারণে)। এরপর তার সামনে অস্বীকারকারী হিসেবে خَبَرْتُكَ إِنِّي পেশ করা হয়, যেমন-

جَاءَ شَقِيقٌ عَارِضًا رُمَحَهُ * إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحٌ

وَيُجْعَلُ الْمُنْكَرُ كَغَيْرِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مَعَهُ آتَى مَعَ الْمُنْكَرِ مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ آتَى شَيْءٌ مِّنَ الدَّلَائِلِ وَالشَّوَاهِدِ إِنْ تَأَمَّلَ الْمُنْكَرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ اِزْتَدَعَ عَنْ انْكَارِهِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لَهُ مُشَاهَدًا عِنْدَهُ كَمَا تَقُولُ لِمُنْكَرِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامُ حَقٌّ مِنْ غَيْرِ تَاكِيدٍ لِأَنَّ مَعَ ذَلِكَ الْمُنْكَرِ دَلَائِلٌ دَالَّةٌ عَلَى حَقِّيَّةِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ مَعْنَى كَوْنِهِ مَعَهُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِهِ لَا يَكْفِي فِي الْاِزْتِدَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا عِنْدَهُ وَقِيلَ مَعْنَى مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْعَقْلِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ مَا إِنْ تَأَمَّلَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَمَّلُ الْعَقْلُ بَلْ يَتَأَمَّلُ بِهِ -

অনুবাদ : এবং অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর মতো করা হয়। যখন অস্বীকারকারীর সাথে এমন প্রমাণাদি ও প্রত্যক্ষ দলিল থাকে, যাতে সে যদি দলিল চিন্তা-ভাবনা করে অর্থাৎ অস্বীকারকারী যদি তাতে চিন্তা করে, তাহলে সে তার অস্বীকার থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। 'তার সাথে' এ কথার অর্থ হলো, তার জ্ঞানে থাকে এবং তার কাছে প্রত্যক্ষ হয়। যেমন- তুমি ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারীকে বললে 'ইসলাম সত্য' তাকিদ ছাড়া। কেননা, সেই অস্বীকারকারীর সাথে এমন প্রমাণাদি আছে, যা ইসলামের সত্যতার প্রতি দিকনির্দেশ করে। বলা হয়ে থাকে 'তার সাথে' এ কথার অর্থ হলো- বাস্তবে এর প্রমাণ আছে; কিন্তু এ মতটি আপত্তির উদ্দেশ্য নয়। কারণ, বাস্তবে কোনো প্রমাণ থাকাটা মানুষকে অস্বীকার থেকে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করে না, যে পর্যন্ত না দলিল-প্রমাণ তার কাছে অর্জিত থাকে, কেউ কেউ বলেন, **مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ**-এর অর্থ আকল বা জ্ঞান। (মুসান্নিফ (র.) বলেন,) এ মতটিতে আপত্তি রয়েছে। কেননা, এমতাবস্থায় **مَا إِنْ تَأَمَّلَ بِهِ** বলা সমীচীন হতো। কারণ, আকল-এর মধ্যে চিন্তা করা হয় না; বরং আকলের সাহায্যে চিন্তা করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ الْمُنْكَرُ كَغَيْرِ الْمُنْكَرِ الْخ : উপরোক্ত ইবারতে লেখক মুকতাবায়ে যাহিরের বিপরীত আরেকটি সুরত নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুরতটি এই যে, কখনো অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয় এবং সে মোতাবেক তার সামনে বাক্য পেশ করা হয়। অর্থাৎ অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে অনস্বীকারকারী বা সাধারণ মানুষ মনে করা হয় এবং তার সামনে তাকিদমুক্ত সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্য পেশ করা হয়। এরূপ বাক্য পেশ করা মুকতাবায়ে যাহিরের বিপরীত কাজ। কারণ, অস্বীকারকারী হিসেবে তার সামনে তাকিদমুক্ত বাক্য পেশ করা মুকতাবায়ে যাহিরের দাবি। কিন্তু যেহেতু অস্বীকারকারীকে এখানে অস্বীকারকারী ধরা হয়নি, তাই তাকিদমুক্ত সাধারণ বাক্য তার সামনে পেশ করা হচ্ছে।

এ পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন আসবে যে, অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর পর্যায়ে কখন ধরা যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে মূল লেখক বলেন, **إِذَا كَانَ مَعَهُ مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ**, অর্থাৎ যখন অস্বীকারকারীর সাথে এমন দলিল-প্রমাণ থাকে যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করলে তার অস্বীকৃতি দূর হয়ে যায়, তখন তাকে অনস্বীকার কারীর পর্যায়ে ধরা হবে।

উল্লেখ্য যে, **مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ**-এর মধ্যে "مَا"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য দলিল-প্রমাণ। আর "مَا" সর্বনামের **مَرْجِعٌ** হলো অস্বীকারকারী। এ হিসেবে বাক্যের অর্থ হচ্ছে যখন অস্বীকারকারীর কাছে দলিল-প্রমাণ থাকে। কেননা, যদি সে এতে চিন্তা করে তাহলে অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে। মুসান্নিফের মতে, অস্বীকারকারীর কাছে দলিল-প্রমাণ থাকার অর্থ হচ্ছে দলিল তার জানা থাকে। যেমন ইসলাম অস্বীকারকারীর সামনে বলা হলো ইসলাম সত্য বা **"الْإِسْلَامُ حَقٌّ"** অর্থাৎ শ্রোতার কাছে ইসলামের সত্যতার দলিল থাকার কারণে অস্বীকারকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকিদবিহীন বাক্য পেশ করা হলো মুকতাবায়ে যাহিরের বিপরীত বাক্য করার নীতি অনুযায়ী।

قَوْلُهُ وَقِيلَ مَعْنَى كُنْهُ مَعَهُ أَنْ يَكُونُ : এ বাক্য দ্বারা লেখক কতিপয় লোকদের মতামত উল্লেখ করেছেন। কতিপয় লোক মনে করেন, অস্বীকারকারীর কাছে দলিল-প্রমাণ থাকার অর্থ হচ্ছে দলিল-প্রমাণ বাস্তবে থাকা, যদিও তা অস্বীকারকারীর জানা না থাকে। তাদের মতে, দলিল-প্রমাণ থাকার অর্থ অস্বীকারকারীর জানা থাকা নয়। তাদের মতের বিপক্ষে মুসান্নিফ (র.) বলেন, فِيهِ نَظَرٌ। অর্থাৎ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, যদি দলিল-প্রমাণ বাস্তবে থাকে, কিন্তু অস্বীকারকারীর জানা না থাকে, তাহলে অস্বীকারকারী তার অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে না। অস্বীকারকারীর অস্বীকার থেকে ফিরে আসার জন্য অবশ্যই দলিল-প্রমাণ জানতে ও বুঝতে হবে। সে যখন দলিল-প্রমাণগুলো সম্পর্কে জানবে তখনই তো তার অবস্থান থেকে ফিরে আসার কথা ভাববে।

কেউ কেউ অবশ্য তাদের উপর আরোপিত উক্ত প্রশ্নের জবাব দেন এই বলে যে, মুসান্নিফ (র.) যে مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ বলেছেন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে— এমন দলিল-প্রমাণ যাতে চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব, বাস্তবিক চিন্তা-ভাবনা উদ্দেশ্য নয়। এ মতে যেসব প্রমাণাদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান তা বর্তমানে জানা না থাকলেও এতে চিন্তা-ভাবনা করাও এক পর্যায়ে সম্ভব। তৎক্ষণাৎ চিন্তা-ভাবনার জন্য অবশ্য দলিল জানা থাকা প্রয়োজন।

মোটকথা, অস্বীকারকারীকে অস্বীকারকারীর স্থানে রাখার জন্য মূল লেখকের মতে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য দলিল জানা প্রয়োজন। আর ভিন্নমত পোষণকারীদের মতে দলিলের বিদ্যমান হওয়াটা জরুরি, যদিও বা তার জানা না থাকে।

قَوْلُهُ وَقِيلَ مَعْنَى مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ : মুসান্নিফ এ বাক্যটি দ্বারা মূল লেখকের ইবারতে তার ব্যাখ্যার বিপরীত আরেকটি ভিন্নমত উল্লেখ করে তার জবাব দিচ্ছেন। ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ-এর ما এবং "و" সর্বনামের مرجع হলো দলিল-প্রমাণ। সে মতে আমরা এ বাক্যের অর্থ করেছি, তার জানা এমন প্রমাণাদি রয়েছে, যাতে সে চিন্তা করলে অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে; কিন্তু ভিন্নমত পোষণকারী বলেন, ما এবং "و"-এর مرجع হলো عقل বা জ্ঞান। তার ব্যাখ্যা মতে ইবারতের অর্থ হবে এরূপ— যখন অস্বীকারকারীর কাছে আকল বা জ্ঞান থাকে, সে তাতে চিন্তা করলে তার থেকে ফিরে আসবে। অর্থাৎ আকলের মধ্যে চিন্তা করলে ফিরে আসবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, যদি 'ما'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য আকল হতো, তাহলে মূল লেখক مَا إِنْ تَأَمَّلَهُ বলতেন না; বরং تَأَمَّلَ بِهِ বলতেন। কারণ, মানুষ আকলের মধ্যে চিন্তা করে না; বরং আকলের বা জ্ঞানের সাহায্যে চিন্তা করে।

نَحْوُ لَارْتَبَ فِيهِ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ مِثَالٌ لِحَجَلٍ مُنْكَرٍ الْحُكْمِ كَغَيْرِهِ وَتَرْكِ التَّأَكِيدِ لِذَلِكَ وَبَيَانُهُ أَنَّ مَعْنَى لَا رَيْبَ فِيهِ لَيْسَ الْقُرْآنُ بِمَظْنَّةٍ لِلرَّيْبِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَابَ فِيهِ وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُنْكَرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُخَاطِبِينَ لَكِنْ نُزِّلَ إِنْكَارُهُمْ مَنَزِلَةً عَدِمَهُ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ الدَّلَائِلِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَابَ فِيهِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ نَظِيرٌ لِتَنْزِيلِ وَجُودِ الشَّيْءِ مَنَزِلَةً عَدِمَهُ بِنَاءً عَلَى وَجُودِ مَا يُزِيلُهُ فَإِنَّهُ نُزِّلَ رَيْبُ الْمُرتَابِينَ مَنَزِلَةً عَدِمَهُ تَعْوِيلًا عَلَى مَا يُزِيلُهُ حَتَّى نَفَى الرَّيْبُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِغْرَاقِ كَمَا نُزِّلَ الْإِنْكَارُ مَنَزِلَةً عَدِمَهُ لِذَلِكَ حَتَّى صَحَّ تَرْكُ التَّأَكِيدِ -

অনুবাদ : যেমন- (এতে কোনো সন্দেহ নেই)। এ বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা প্রমাণ করে, এটি হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর মতো করার উদাহরণ। এ কারণেই তাকিদ পরিহার করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, কুরআন সন্দেহের স্থানই নয় এবং এতে সন্দেহ করা উচিত নয়। এ হুকুমটি অনেক সম্বোধিত ব্যক্তিই অস্বীকার করে। কিন্তু তাদের সে অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখা হয়েছে। এ কারণে যে, তাদের সাথে এমন প্রমাণাদি রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, তাতে সন্দেহ করা সমীচীন নয়। তবে সর্বোত্তম কথা হলো, এটি কোনো অস্তিত্বশীল জিনিসকে অনস্তিত্বের স্থানে রাখার উদাহরণ, ঐ দলিল প্রমাণের উপস্থিতির কারণে, যা সে অস্তিত্বকে দূর করে দেয়। নিশ্চয় (এখানে) সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহকে রাখা হয়েছে সন্দেহহীনতার স্থানে সন্দেহ দূরকারী দলিলের (উপস্থিতির) ভিত্তিতে, এমনকি সন্দেহকে পরিপূর্ণভাবে তিরোহিত করা হয়েছে, যেমন- একই কারণে অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখা হয়েছে। যার ফলে তাকিদকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ نَحْوُ لَارْتَبَ فِيهِ الْخ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয়- এখানে এরই একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হলো لَارْتَبَ فِيهِ অর্থ কুরআনে কোনো সন্দেহ- দ্বিধা নেই। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের ইবারত দ্বারা বাহ্যত মনে হচ্ছে, এটি হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখার উদাহরণ নয়।

এর মাঝে পার্থক্য : এবং مِثَال

এর মধ্য গণ্য হয়; কিন্তু তার مِثَالُ তার মধ্য গণ্য হয় না। এ-এর মধ্য গণ্য হয়; কিন্তু তার مِثَالُ তার মধ্য গণ্য হয় না। মুসান্নিফ এটিকে مثال বলার কারণ হচ্ছে মূল লেখক ইতঃপূর্বে যে নিয়মটির কথা আলোচনা করেছেন অর্থাৎ হুকুমের অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা, এর পর পরই نحو-এর মধ্য সে উক্ত উদাহরণটি এনেছেন। এভাবেই উদাহরণ বা مثال আনা হয়। আর তা ছাড়া نحو দ্বারাও مثال বর্ণনা করা হয়, نظير বর্ণনা করা হয় না। অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখার কারণে তাকিদকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় মুকতাযায়ে যাহির অনুসারে এখানে তাকিদ আনার দরকার ছিল, তখন বাক্যটি হতো- إِنَّهُ لَارْتَبَ فِيهِ ।

قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ مَعْنَى لَا رَيْبَ فِيهِ لَيْسَ الْقُرْآنُ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন, ‘অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা’-এর উদাহরণ হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, কুরআন সন্দেহ করার স্থান নয় এবং তাতে কোনে ধরনের সংশয়-দ্বিধা করা সমীচীন নয়, এটাই বাস্তব অবস্থা। কিন্তু তারপরেও এটিকে অনেকে অস্বীকার করে, তাই এ বাক্যটি তাকিদযুক্ত করে ব্যবহার করা উচিত ছিল। কেননা, তাদের কাছে কুরআনকে বিশ্বাস করার মতো প্রচুর প্রমাণ

রয়েছে। যেগুলোর উপর চিন্তা করলে তারা অস্বীকার থেকে ফিরে আসবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে তাকিদ ছাড়া বাক্য পেশ করেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মুসান্নিফ **لَا رَيْبَ فِيهِ** -এর প্রকৃত অর্থ- “এতে কোনো সন্দেহ নেই” না নিয়ে এর মধ্যে কেন **تَوَلَّى** করলেন এবং বললেন যে, এটি সন্দেহ করার স্থান নয়। এর জবাব হলো- বাক্যের প্রকৃত অর্থের উপর যদি আমরা বাক্যটি ব্যবহার করি, তাহলে এ অর্থ বাস্তবসম্মত হয় না। কেননা, আসলে কুরআনের মধ্যে অনেক সন্দেহকারীর সন্দেহ রয়েছে। তখন অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখার বিষয়টি হয় না। কেননা, তখন আয়াত দ্বারা অস্বীকারকারী আছে তাই প্রমাণিত হয় না। কারণ, বাহ্যত আয়াতে তো **رَيْب**-কে সম্পূর্ণ রূপে **استغراق**-এর ভিত্তিতে নফী করা হয়েছে।

عَنْ مَطْنَةِ الرَّيْبِ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন **هَذَا الْحُكْمُ** এ বাক্যে **قَوْلُهُ وَهَذَا الْحُكْمُ مِمَّا يُنْكِرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْخ** -এর **تَنْزِيلٌ وَجُودٌ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ** (র.) বলেন, এটিকে **قَوْلُهُ وَالْأَخْسَنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ نَظِيرٌ لِنَظِيرِ** **لَارَيْبَ** বলাটাই শ্রেয়, অর্থাৎ **لَارَيْبَ فِيهِ**-কে **مِثَال** না বলে **نَظِير** বলা শ্রেয়। তাহলে এমনভাবে বলার দরকার ছিল **نَظِير** হতো কোনো বিদ্যমান বিষয়কে অবিদ্যমান বিষয়ের স্থানে রাখার **نَظِير**, এ কারণে যে, এতে উক্ত অস্তিত্বকে দূরকারী দলিল রয়েছে। এখানে সন্দেহকারীদের সন্দেহকে সন্দেহ না হওয়ার স্থানে রাখা হয়েছে, এ ভিত্তিতে যে, কুরআনে এমন দলিল আছে, যা তাদের সন্দেহকে দূর করে দেয়। দলিলসমূহ এতটা শক্তিশালী যে, তাদের সন্দেহকে সম্পূর্ণ রূপে মুছে দেয়। এমনকি তা অনস্তিত্বের পর্যায়ে চলে যায়। তাই তো কুরআনে তাদের **رَيْب** বা সন্দেহকে **استغراق** বা পরিপূর্ণ রূপে খণ্ডন করা হয়েছে।

মোটকথা, এটিকে **نَظِير** বলা হলে **رَيْب**-কে সম্পূর্ণভাবে না-সূচক করা হয়। কিন্তু **مِثَال** বলা হলে এটি **رَيْب**-কে নফী করে না; বরং কুরআন **مَحَلَّ رَيْبٍ** হওয়াকে নফী করা হয়। আর আমাদের এখানে **رَيْب**-কে পরিপূর্ণভাবে নফী করা হচ্ছে উদ্দেশ্য।

উক্ত ব্যাখ্যার উপর আপত্তি হয় এই বলে যে, এটিকে **نَظِير** বলা উচিত নয়, কারণ **نَظِير** তার **مُسْتَلْ**-এর **مِثَال**-এর বাইরে হয়, **مُسْتَلْ**-এর **مِثَال**-এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। অর্থাৎ অস্বীকারকারীদের সন্দেহকে সন্দেহহীনতার স্থানে রাখা **شَيْءٍ**-কে **عَدَمٌ**-এর স্থানে রাখার একটি **فرد** বা অন্তর্গত বিষয়। এটি **مِثَال**-এর বৈশিষ্ট্য। অতএব, এটি **نَظِير** হয়নি; বরং **مِثَال**-ই রয়ে গেছে।

সবচেয়ে উত্তম হতো- এটি অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখার **نَظِير** বলে দেওয়া। কেননা, সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহকে অসন্দেহের স্থানে রাখা অস্বীকারকে অনস্বীকারের স্থানে রাখার **افراد**-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ **نَظِير** হবে, **مِثَال** হবে না। এর জবাব এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, মুসান্নিফের ইবারতের মধ্যে সামান্য অংশ উহ্য আছে। তার ইবারতটি এরূপ হবে- **إِنَّهُ نَظِيرٌ لِنَظِيرِ الْإِنْكَارِ مَنْزِلَةَ عَدَمِهِ لِأَجْلِ وَجُودِ الشَّيْءِ مَنْزِلَةَ عَدَمِهِ** অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহকে সন্দেহ না হওয়ার স্থানে রাখা অস্তিত্বশীল বিষয়কে অনস্তিত্বশীল বিষয়ের স্থানে রাখার কারণে এটি অস্বীকারকে অনস্বীকার -এর স্থানে রাখার **نَظِير**। এটিকে **نَظِير** বলা এ কারণে উত্তম যে, এ অবস্থায় কাউকে শ্রোতা না বানিয়েই **رَيْب**-কে সম্পূর্ণভাবে না-সূচক করা সম্ভব। অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। এ কারণেই কুরআনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। আর যদি এটিকে (**مِثَال**) উদাহরণ বলা হয়, তখন অস্বীকারকারীদের প্রতি লক্ষ্য করে কুরআনকে সন্দেহের স্থান হওয়াকে না-সূচক করা হবে। তখন অর্থ হবে, কুরআন সন্দেহের স্থান নয়, তাই এতে সন্দেহ করা অনুচিত। আর এটাতো সম্ভব যে, একটি বিষয় সন্দেহের স্থান নয়, তাই এতে সন্দেহ করা উচিত নয়। এতদসত্ত্বেও এতে সন্দেহকারীদের সন্দেহ রয়েছে।

মোটকথা, **نَظِير** বলার ক্ষেত্রে এতে নফীর অর্থ পরিপূর্ণ; কিন্তু **مِثَال** বলার ক্ষেত্রে ততটা নয়। তাই **نَظِير** বলাটাই শ্রেয়।

সারসংক্ষেপ : কখনো সংবাদ অস্বীকারকারীকে অনস্বীকারকারীর স্থানে রাখা হয় এবং সে মতে তার সামনে তাকিদমুক্ত সংবাদ দেওয়া হয়। আর এটা তখনই করা হয় যখন অস্বীকারকারীর আয়াতে এমন প্রমাণাদি থাকে, যাতে চিন্তা করলে সে অস্বীকার থেকে ফিরে আসতে পারে। যেমন **لَا رَيْبَ فِيهِ** (কুরআনে কোনো সন্দেহ নেই)। এ আয়াত এসব ব্যক্তিদের সামনে পেশ করা হচ্ছে, যারা এটাকে (অর্থাৎ কুরআনে সন্দেহ না থাকাকে) অস্বীকার করে। যেহেতু তাদের সামনে অস্বীকার দূর হওয়ার দলিল আছে তাই তাদের সামনে তাকিদমুক্ত বাক্য পেশ করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এটা অস্তিত্ববান বস্তুকে অস্তিত্বহীনের স্থানে রাখার উদাহরণ হলে ভালো হতো।

وَهَكَذَا أَنَّى مِثْلُ إغْتِبَارَاتِ الْإثْبَاتِ إغْتِبَارَاتُ النِّفْيِ مِنَ التَّجْرِيدِ عَنِ الْمُؤَكَّدَاتِ فِي
الْإِبْتِدَائِيِّ وَتَقْوِيَّتِهِ بِمُؤَكَّدٍ اسْتِحْسَانًا فِي الطَّلَبِيِّ وَوُجُوبِ التَّكْيِيدِ بِحَسَبِ الْإِنْكَارِ
فِي الْإِنْكَارِيِّ تَقُولُ لِخَالِي الذِّهْنِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا أَوْ لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا وَلِلطَّالِبِ مَا زَيْدٌ
بِقَائِمٍ وَلِلْمُنْكَرِ وَاللَّهُ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ -

অনুবাদ : এমন করে অর্থাৎ ইতিবাচক দিকগুলোর মতো নেতিবাচকের দিকগুলো অর্থাৎ প্রাথমিক বাক্য তাকিদযুক্ত হওয়া থেকে তালাবী বাক্য তাকিদ দ্বারা শক্তিশালী হওয়া উত্তম এবং ইনকারী বাক্যে অস্বীকারের মাত্রানুপাতে তাকিদ আবশ্যিক হওয়া। অতএব, আপনি সংবাদ সম্পর্কে ধারণাহীন ব্যক্তিকে বলবেন **مَا زَيْدٌ قَائِمًا** অথবা **لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا** (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। সংবাদপ্রত্যাশী ব্যক্তিকে বলবেন **مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ** (নিশ্চয় যায়েদ দণ্ডায়মান নয়) এবং সংবাদ অস্বীকারকারীকে বলবেন **وَاللَّهُ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ** (আল্লাহর শপথ অবশ্যই যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)। এরই উপরে অন্যান্য উদাহরণ অনুমেয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهَكَذَا أَنَّى مِثْلُ الْخ : লেখক বলেন, শ্রোতার অবস্থানুপাতে বাক্যের বিভিন্ন অবস্থা যথা ইবতেদায়ী, তালাবী, ইনকারী যেমনটি **إثبات** বা ইতিবাচকের মধ্যে হয়েছে, তেমনি **نفي** বা নেতিবাচকের মধ্যেও হবে। সুতরাং ১. শ্রোতারা যদি সংবাদ বা বাক্যের হুকুম সম্পর্কে অনবহিত হয় তাহলে বাক্যটি হবে তাকিদযুক্ত, যেমন- ২. **لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا مَا زَيْدٌ قَائِمًا**। শ্রোতা যদি সংবাদ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী হয়, তাহলে বাক্যটিকে কিছুটা তাকিদযুক্ত করে পেশ করা উত্তম। যথা- ৩. **لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ**। শ্রোতা যদি সংবাদকে অস্বীকার করে, তাহলে তার অস্বীকারের মাত্রানুপাতে বাক্যটিকে তাকিদযুক্ত করা অত্যাবশ্যকীয়। যথা- **وَاللَّهُ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ**

সার-সংক্ষেপ :

ইতিবাচক ক্ষেত্রে শ্রোতার অবস্থানুপাতে যেমন বাক্য তিন ধরনের হয়ে থাকে তদ্রূপ নেতিবাচক ক্ষেত্রেও বাক্য তিন ধরনের হবে। অর্থাৎ **إِنْكَارِي** ও **طَلَبِي**, **إِبْتِدَائِي**।

ثُمَّ الْإِسْنَادَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ إِنشَائِيًّا أَوْ إخبارِيًّا مِنْهُ حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً وَلَمْ يَقُلْ إِمَّا حَقِيقَةً وَإِمَّا مَجَازًى لِأَنَّ بَعْضَ الْإِسْنَادِ عِنْدَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ كَقَوْلِنَا الْحَيَوَانُ جِسْمٌ وَالْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ وَجَعَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ صِفَةً الْإِسْنَادِ دُونَ الْكَلَامِ لِأَنَّ اتِّصَافَ الْكَلَامِ بِهِمَا إِنَّمَا هُوَ بِإِغْتِبَارِ الْإِسْنَادِ وَأَوْرَدَهُمَا فِي عِلْمِ الْمَعَانِي لِأَنَّهُمَا مِنْ أَحْوَالِ اللَّفْظِ فَيَدْخُلَانِ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي -

অনুবাদ : অতঃপর সাধারণ ইসনাদ চাই ইনশায়ী হোক অথবা বর্ণনামূলক হোক। এর কতকগুলো **حَقِيقَةً** হয়েছে। মূল লেখক **إِمَّا حَقِيقَةً** (হয়তো প্রকৃতার্থে) (অথবা মাজায) বলেননি। কেননা, তার মতে এমন কতিপয় ইসনাদ রয়েছে, যা হাকীকত নয় এবং মাজাযও নয়। যেমন, আমাদের উক্তি- **الْحَيَوَانُ جِسْمٌ** (প্রাণীকুল দেহধারী) এবং **الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ** (মানুষ প্রাণী)।

মূল লেখক হাকীকত এবং মাজাযকে ইসনাদের বিশেষণ করেছেন, কালামের বিশেষণ করেননি। কেননা, কালামের এ দু'টির সাথে সম্পর্ক ইসনাদের ভিত্তিতে। এ দু'টিকে ইলমুল মা'আনী (আলোচনা)-এর মধ্যে এনেছেন। কেননা, এ দু'টি শব্দের অবস্থার অন্তর্গত। সুতরাং এগুলো ইলমুল মা'আনী মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ الْإِسْنَادَ مُطْلَقًا : মূল লেখক বলেন, মুতলাক বা সাধারণ ইসনাদ ইনশায়ী হোক অথবা খবরী হোক, দু' প্রকার-১. **حَقِيقَةً** ২. **مَجَازَ عَقْلِي**।

এখানে ইসনাদ দ্বারা শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যের ইসনাদ নয়; বরং তার ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মুসান্নিফ **سَوَاءٌ كَانَ إِنشَائِيًّا أَوْ إخبارِيًّا** বলেছেন।

এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মূল লেখক ইসনাদকে **إِسْمٌ ظَاهِرٌ** হিসেবে এনেছেন। কেননা, **ضمير** ব্যবহার করা হলে **إِسْنَادٌ خَبَرِيٌّ**-এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করত। তবে ইসনাদ ব্যাপক হলেও মুসান্নিফ-এর **انشائيا** এবং **خبريا**-এর দ্বারা **إِسْنَاد**-এর ব্যাখ্যা করার কারণে এখানে শুধুমাত্র ইসনাদে তামই বুঝা যায়। অথচ হাকীকত ও মাজায শুধুমাত্র **إِسْنَاد**-এর সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসনাদে নাকেস তথা মাসদারের ক্ষেত্রেও হাকীকত ও মাজায হয়ে থাকে। যেমন- **أَعَجَبْنِي ضَرْبُ زَيْدٍ وَجَرَى النَّهَارِ**

এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, এখানে **إِسْنَادٌ نَاقِصٌ**ও शामिल হবে। অতএব, **خبريا** এবং **انشائيا** দ্বারা এখানে তাই উদ্দেশ্য, যা জুমলায়ে খবরিয়্যাহ এবং ইনশাইয়্যাহ-এর মধ্যে হয়। চাই সেটা ইসনাদে তাম হোক অথবা নাকেস হোক। যেহেতু **نَاقِصٌ** জুমলার মাঝে হয়, তাই উপরোক্ত আপত্তি প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ إِمَّا حَقِيقَةً وَإِمَّا مَجَازًى : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ইসনাদ যখন দু' প্রকার তখন মূল লেখক **إِمَّا حَقِيقَةً** এবং **إِمَّا مَجَازًى** বলতেন, তাহলে ইসনাদ এ প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যেত।

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক **إِمَّا حَقِيقَةً وَإِمَّا مَجَازًى** এরূপ বলেননি, কারণ মূল লেখকের কাছে ইসনাদ হাকীকত এবং মাজায এ দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ নয়। তার মতে ইসনাদের আরেকটি প্রকার আছে, যা হাকীকতও নয় এবং মাজাযও নয়। যেমন- **الْحَيَوَانُ جِسْمٌ**, **الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ** এ দু'টি উদাহরণ এবং যে সকল উদাহরণে মুসনাদ **فعل** অথবা

مَعْنَى فِعْلٍ হয় না। তাই তিনি إِمَّا حَقِيقَةً، إِمَّا مَجَازً ব বলেননি। কারণ, সেভাবে বললে ইসনাদ এ দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ হয়ে যেত এবং উল্লিখিত উদাহরণদ্বয় সহ অন্যান্য مثال যার মধ্যে মুসনাদ فعل অথবা فِعْلٍ হয়নি, সেগুলোর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যেত না।

আল্লামা সাক্কাকীর মতে ইসনাদ উপরের দু' প্রকারেই সীমাবদ্ধ।

قَوْلُهُ وَجَعَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ صِفَةً الْإِنْسَادِ : মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক حَقِيقَةً এবং مَجَاز -কে ইসনাদের সিফাত বা বিশেষণ বলেছেন। (এখানে সিফাত দ্বারা অর্থগত সিফাত উদ্দেশ্য, কেননা خبر তার মুসনাদ ইলাইহের অর্থগত সিফাত হয়) কিন্তু কালাম বা বাক্যের সিফাত বলেননি (যেমনটি আল্লামা সাক্কাকী বলেছেন, তার ইবারত হলো تَمَّ الْكَلَامُ مِنْهُ حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً وَمِنْهُ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ এর কারণ কি?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বাস্তবে حَقِيقَةً এবং مَجَاز দ্বারা বিশেষিত হয় ইসনাদ, অর্থাৎ حَقِيقَةً ও مَجَاز ইসনাদের সিফাত হয়। আর কালাম বা বাক্যের সাথে حَقِيقَةً এবং مَجَاز সম্পর্ক ইসনাদের মাধ্যমেই হয়। তাই মূল লেখক حَقِيقَةً এবং مَجَاز -কে ইসনাদের সিফাত বানিয়েছেন, কালামের সিফাত বানাননি। আর মূল লেখকের পদ্ধতিটিই উত্তম। কেননা, এতে সরাসরি মাওসুফের সাথে সিফাতের সম্পর্ক বর্ণনা করা হচ্ছে। আর সাক্কাকীর মতানুসারে সিফাতের সম্পর্ক মাওসুফের সাথে সরাসরি হচ্ছে না।

قَوْلُهُ وَأَوْرَدَهُمَا فِي عِلْمِ الْمَعَانِي : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً এবং مَجَاز عَقْلِي -কে ইলমুল মা'আনীর আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে বলেছেন। তিনি এগুলো ইলমুল বয়ানের অন্তর্ভুক্ত করেননি; বরং ইলমুল মা'আনীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর কারণ হচ্ছে এগুলো ইসনাদের মধ্যে لَفْظ -এর অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর لَفْظ -এর বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে ইলমুল মা'আনীতে আলোচনা করা হয়, ইলমুল বয়ানে আলোচনা করা হয় না। তাই ইলমুল মা'আনীতে এর আলোচনা সমীচীন হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

খবর ও ইনশা উভয় প্রকারের ইসনাদ সাধারণত দু' প্রকার। ১. حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً ও ২. مَجَاز عَقْلِي

লেখক হয়তো حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً, নয়তো مَجَاز عَقْلِي এভাবে বলেননি। কারণ, তাঁর মতে এ দু' প্রকার ছাড়াও আরেক প্রকারের ইসনাদ রয়েছে, যা এ দু'প্রকারের বাইরে।

وَهِيَ أَيْ الْحَقِيقَةُ الْعَقْلِيَّةُ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ كَالْمُضَدِّ وَإِسْمَى الْفَاعِلِ
وَالْمَفْعُولِ وَالصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ وَإِسْمِ التَّفْضِيلِ وَالظَّرْفِ إِلَى مَا أَيْ إِلَى شَيْءٍ هُوَ أَيْ الْفِعْلُ
أَوْ مَعْنَاهُ لَهُ أَيْ لِذَلِكَ الشَّيْءِ كَالْفَاعِلِ فِيمَا بُنِيَ لَهُ نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا وَالْمَفْعُولِ بِهِ
فِيمَا بُنِيَ لَهُ نَحْوُ ضَرَبَ عَمْرٍو فَإِنَّ الضَّارِبِيَّةَ لَزِيدٍ وَالْمَضْرُوبِيَّةَ لِعَمْرٍو عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ
مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَهُ وَبِهَذَا دَخَلَ فِيهِ مَا يَطَائِقُ الْإِغْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ أَيْضًا
مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَهُ وَبِهِ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يَطَائِقُ الْإِغْتِقَادَ وَالْمَعْنَى إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ
مَعْنَاهُ إِلَى مَا يَكُونُ هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِيمَا يُفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ وَذَلِكَ بِأَنَّ
لَا يُنْصَبُ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِي إِغْتِقَادِهِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ لَهُ أَنَّ مَعْنَاهُ
قَائِمٌ بِهِ وَوَصَفٌ لَهُ وَحَقُّهُ أَنْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ سِوَاءَ كَانَ مَخْلُوقًا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِغَيْرِهِ وَسِوَاءَ
كَانَ صَادِرًا عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَرَبَ أَوْ لَا كَمَرَضَ وَمَاتَ -

অনুবাদ : আর তা অর্থাৎ হাকীকতে আকলিয়ায় হচ্ছে ফে'ল অথবা তার অর্থবোধক শব্দ যথা মাসদার, ইসমে ফায়েল, ইসমে মাহফউল, সিফাতে মুশাব্বাহ, ইসমে তাফযীল ও ইসমে যরফ-এর নিসবত বা সম্পর্ক করা এমন বিষয়ের প্রতি যার জন্য ফে'ল অথবা তার অর্থবোধক শব্দ যেমন- ফে'লে মা'রুফের মধ্যে ফায়েল। যথা- **ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا** (যায়েদ আমরকে মারল) অথবা ফে'লে মাজহুলের মধ্যে মাহফউল। যথা- **ضَرَبَ عَمْرٍو** নিশ্চয়ই (এখানে) প্রহার করার কর্মটি যায়েদের জন্য এবং প্রহারিত হওয়ার কর্মটি আমরের জন্য, মুতাকাল্লিমের নিকট (এটি তার শব্দ **ل**-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই **(عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ)** দ্বারা যা বাস্তবের মোতাবেক হয় না, কিন্তু বিশ্বাসের অনুকূলে হয়, তা সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। বাহ্যিক অবস্থানুপাতে **(فِي الظَّاهِرِ)** কথাটিও **ل**-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই **(فِي الظَّاهِرِ)** দ্বারা যা বিশ্বাসের অনুকূলে হয় না তাও সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। পুরো সংজ্ঞার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, ফে'লকে অথবা মা'নায়ে ফে'লকে (প্রকৃতপক্ষে) মুতাকাল্লিমের মতে তার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা যার জন্য ফে'ল তার দিকেই নিসবত করা (বাহ্যিক অবস্থা থেকে যা বুঝা যায়) এর অর্থ হচ্ছে এমন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া- যা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, এটি তার বিশ্বাসে যার জন্য ফে'ল তার জন্য নয়। **ل**-এর অর্থ হলো ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দ তার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলো তার বিশেষণ। আর তার প্রতি ইসনাদ করাটাই তার হক। চাই সেই ফে'লটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট হোক অথবা অন্যের হোক। চাই সেটা (যার জন্য ফে'ল) তার থেকে তার ইচ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে, যেমন- **ضَرَبَ** (সে প্রহার করল) অথবা অনিচ্ছায় প্রকাশ পেয়েছে, যেমন- **مَرَضَ** (সে অসুস্থ হলো), **مَاتَ** (সে মৃত্যুবরণ করল)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক **حَقِيقَةُ عَقْلِيَّة**-এর সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞাস্থিত বিভিন্ন **إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ**-এর উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূল লেখকের সংজ্ঞাটি হলো **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ** অর্থাৎ **حَقِيقَةُ عَقْلِيَّة** বলা হয়, ফে'ল অথবা **فعل** -কে মুতাকাল্লিমের মতে তার বাহ্যিক

অবস্থানুপাতে যার জন্য ফে'ল তার দিকে নিসবত করা। বাক্যস্থিত **فَعْلٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **مَصْدَرٌ**, **إِسْمٌ فَاعِلٌ**, **إِسْمٌ مَفْعُولٌ** এবং **إِسْمٌ ظَرْفٌ** ইত্যাদি।

مَعْنَى অথবা **فَعْلٌ** এর **مَرْجِعٌ** হলো **هُوَ** বা **شَيْءٌ** কোনো বস্তু বা বিষয়, **هُوَ**-এর **مَرْجِعٌ** হলো **مَا** ইসমে মাওসূল, অর্থ **إِلَى مَا هُوَ لَهُ**। **فَعْلٌ**-এর **مَرْجِعٌ** হলো **مَا** অর্থাৎ সেই বিষয়বস্তুর জন্য যে বিষয়বস্তুটি হচ্ছে **مَعْرُوفٌ**-এর মধ্যে **فَاعِلٌ** এবং **فَعْلٌ**। **مَفْعُولٌ**-এর মধ্যে **مَجْهُولٌ**।

প্রথমটির উদাহরণ- **عَمِرُوا** এ উদাহরণে **زَيْدٌ** হচ্ছে (ফاعِل) যার কারণে ফে'ল সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ- **عَمِرُوا**-এর উদাহরণে **عَمِرُوا** হচ্ছে (মفعول), যার জন্য ফে'ল বানানো হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, প্রথমটির উদাহরণে প্রহার করার কাজটি যায়েদের দ্বারা আর প্রহৃত হওয়ার বিষয়টি আমরের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। তাই প্রথম ফে'লটি যায়েদের আর ২য় ফে'লটি আমরের জন্য হয়েছে। উভয়ের দিকে ফে'লের ইসনাদ **حَقِيقَةٌ** হয়েছে। অতএব, এটি **عَقْلِيَّةٌ**।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَهُ : মুতাকাল্লিমের নিকট অর্থাৎ মুতাকাল্লিমের ধারণা বা বিশ্বাসানুসারে। মুসান্নিফ বলেন, **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ** শব্দটি **مُتَعَلِّقٌ** হবে **لَهُ**-এর সাথে, অর্থাৎ **لَهُ**-এর সাথে **عَامِلٌ مُقَدَّرٌ**-এর সাথে। উহা আমেল হচ্ছে (না)। **ظَرْفٌ**-এর সাথে হয় না)। **الظَرْفُ لَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ** (এর সম্পর্ক অনুরূপ **ظَرْفٌ**-এর সাথে হয় না)। **اِسْتَقَرَّ**। তাহলে এই **اِسْكَالٌ** হবে না যে, **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ**।

মোটকথা, **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ** ঐ ফে'লের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা **لَهُ**-এর আমেল এবং যার সাথে **لَهُ** সম্পর্কযুক্ত। **قَوْلُهُ وَبِهَذَا دَخَلَ فِيهِ مَا يُطَاقُ الْإِعْتِقَادُ دُونَ الْوَاقِعِ** : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ** দ্বারা সংজ্ঞার মধ্যে এমন ইসনাদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা বিশ্বাসের মোতাবেক; কিন্তু বাস্তবের মোতাবেক নয়।

مَجْرُورٌ এবং **حَرْفُ جَرٍّ** **فِي الظَّاهِرِ** (র.) মুসান্নিফ (র.) : **قَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ وَهُوَ أَيْضًا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ** মিলে **مُتَعَلِّقٌ** (সম্পর্কযুক্ত) হবে **لَهُ**-এর আমেলের সাথে। তাহলে পুরো সংজ্ঞার ভাবার্থ এই যে, হাকীকতে আকলিয়া বলা হয় ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে এমন বিষয়বস্তুর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা, মুতাকাল্লিমের বিশ্বাস অনুসারে যার জন্য ফে'ল বা ফে'লের শব্দগুলো হয়েছে এবং মুতাকাল্লিমের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় যে, ফে'লের নিসবত যথাস্থানেই হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, **فِي الظَّاهِرِ**-এর দ্বারা হাকীকতে আকলিয়ার মধ্যে এমন ইসনাদও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যা বাস্তবের মোতাবেক; কিন্তু বিশ্বাসের মোতাবেক নয়।

قَوْلُهُ مَا هُوَ لَهُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ : মূল লেখকের শব্দ **مَا هُوَ لَهُ**-এর দ্বারা বাহ্যিকভাবে মনে হয় **قَوْلُهُ قَوْلُهُ** অর্থাৎ যার জন্য ফে'ল বাস্তবতা অনুসারে এ দু'ধরনের ইসনাদকে শামিল করে- ১. যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক এবং ২. যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক; কিন্তু বিশ্বাসের মোতাবেক নয়। এতটুকু দ্বারা এমন ইসনাদ শামিল হয় না, যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক; কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক নয় এবং যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস কোনোটার মোতাবেক নয়। এরপর যখন **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ**-এর **قَيْدٌ** টি বৃদ্ধি করা হলো এর দ্বারা সংজ্ঞার আওতায় এমন ইসনাদ অন্তর্ভুক্ত হলো যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক। পূর্ব থেকে অন্তর্ভুক্ত উভয়ের মোতাবেক ইসনাদটি বহাল রইল, কিন্তু **عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ**-এর **قَيْদٌ** দ্বারা, যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক তা অন্তর্ভুক্ত থাকার পরও বের হয়ে গেল। এরপর **فِي الظَّاهِرِ**-এর **قَيْদٌ** টি বৃদ্ধি করার পর যে ইসনাদ শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক তা অন্তর্ভুক্ত হলো এবং এমন ইসনাদও শামিল হলো, যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস কোনোটার-ই মোতাবেক নয়। ফলে সংজ্ঞার মধ্যে মোট চার ধরনের ইসনাদ অন্তর্ভুক্ত হলো- ১. **مَا يُطَاقُ الْوَاقِعَ**। যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক। ২. **مَا لَا يُطَاقُ شَيْئًا مِنْهُمَا** যা কোনোটারই মোতাবেক নয়, ৩. **مَا يُطَاقُ الْوَاقِعَ دُونَ الْإِعْتِقَادِ** যা বাস্তবতার মোতাবেক, কিন্তু বিশ্বাসের মোতাবেক নয়, ৪. **مَا يُطَاقُ الْإِعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ** যা বিশ্বাসের মোতাবেক কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক নয়।

অর্থঃ وَهِيَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ : حَقِيقَةُ عَقْلِيَّةٍ
বলা হয়, মুতাকাল্লিমের যাহেরী অবস্থা অনুযায়ী মুতাকাল্লিমের দৃষ্টিতে ফে'ল যার দ্বারা সংঘটিত, তার
দিকে مَعْنَى فِعْلٍ অথবা فِعْلٍ-কে নিসবত করা।

فَأَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ التَّغْرِيفُ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ
وَالْإِعْتِقَادَ جَمِيعًا كَقَوْلِ الْمُؤْمِنِ أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ وَالثَّانِي مَا يُطَابِقُ الْإِعْتِقَادَ فَقَطْ
نَحْوُ قَوْلِ الْجَاهِلِ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ وَالثَّالِثُ مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ فَقَطْ كَقَوْلِ الْمُعْتَزِلِيِّ
لِمَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ وَهُوَ يُخْفِيهَا مِنْهُ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَفْعَالَ كُلَّهَا وَهَذَا الْمِثَالُ
مَتْرُوكٌ فِي الْمَتْنِ وَالرَّابِعُ مَا لَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَلَا الْإِعْتِقَادَ جَمِيعًا نَحْوُ قَوْلِكَ جَاءَ زَيْدٌ
وَأَنْتَ أَتَى وَالْحَالُ أَنَّكَ خَاصَّةٌ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِئْ دُونَ الْمُخَاطَبِ إِذْ لَوْ عَلِمَهُ الْمُخَاطَبُ أَيْضًا
لَمَا تَعَيَّنَ كَوْنُهُ حَقِيقَةً لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ قَدْ جَعَلَ عِلْمَ السَّامِعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ
قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ ظَاهِرُهُ فَلَا يَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ -

অনুবাদ : সংজ্ঞার ব্যাপকতায় 'হাকীকতে আকলিয়া' চার প্রকার। প্রথম প্রকার যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হয়, যেমন, মু'মিনের উক্তি- أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ (আল্লাহ তা'আলা তরি-তরকারি সৃষ্টি করেছেন)। দ্বিতীয় প্রকার যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক হয়, যেমন, নাস্তিকের উক্তি- أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ (বসন্তকাল তরি-তরকারি সৃষ্টি করেছে)। তৃতীয় প্রকার যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক হয়, যেমন- মু'তাযিলাপন্থি লোক তার সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি (শ্রোতা) যার থেকে নিজ অবস্থা গোপন করছে এমন ব্যক্তিকে বলল- خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَفْعَالَ كُلَّهَا (আল্লাহ সব ধরনের কাজ সৃষ্টি করেছেন, মু'তাযিলাপন্থিরা মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষকেই মনে করে, আল্লাহকে নয়।) এ উদাহরণটি মূল লেখকের ইবারতে বাদ পড়েছে। চতুর্থ প্রকার, যা বাস্তবতা এবং বিশ্বাস কোনোটারই মোতাবেক নয়। যেমন, তুমি বললে- جَاءَ زَيْدٌ (যায়েদ এসেছে); অথচ অবস্থা হলো এই যে, শুধু তুমি জান, সে আসেনি; শ্রোতা নয়, (অর্থাৎ সে জানে না যে, যায়েদ আসেনি) কেননা, তা যদি শ্রোতা জেনে যায়, তাহলে হাকীকত হওয়া নিশ্চিত হবে না। (তখন) এ সম্ভাবনা থাকে যে, বক্তা শ্রোতার জানা কথা 'সে আসেনি'-কে দলিল বানাবে যে, বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করেনি। সুতরাং তখন ইসনাদটা যার জন্য ফে'ল তার দিকে বক্তার প্রকাশ্য অবস্থানুসারে হচ্ছে না।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ فَأَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ الْعَقْلِيَّةِ الْخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) হাকীকতে আকলিয়া-এর সংজ্ঞার ভিত্তিতে তাকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। এর প্রথম প্রকার হলো- مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে ইসনাদ বাস্তবতা এবং বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হবে। যেমন, মু'মিন বলল- أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ (আল্লাহ তা'আলা সবজি উৎপাদন করেছেন)। এ উদাহরণে أَنْبَات-এর নিসবাত আল্লাহ তা'আলার (مَا هُوَ لَهُ)-এর দিকে করা হয়েছে, যা বাস্তবতা এবং (মু'মিনের) বিশ্বাস উভয়ের অনুযায়ী হয়েছে।

২য় প্রকার : ইসনাদটি বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হবে, কিন্তু বাস্তবতার বিপরীত হবে। যেমন- (নাস্তিক বলল) أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ (বসন্তকাল সবজি উৎপাদন করেছে)। এ উদাহরণে أَنْبَات-এর নিসবাত বসন্তকালের দিকে করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে أَنْبَات আল্লাহ তা'আলার কাজ। কিন্তু এটি নাস্তিকের বিশ্বাস মোতাবেক হয়েছে। কেননা, নাস্তিকের মনে করে বসন্তকালই সবজি উৎপাদন করে।

৩য় প্রকার : ইসনাদটি বাস্তবের মোতাবেক হবে তবে বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হবে না। যেমন- মু'তায়িলা সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি তার শ্রোতাকে বলল, (যে তার সম্পর্কে জানে না এবং সে নিজের মু'তায়িলাপন্থি হওয়ার বিষয়টি শ্রোতা থেকে গোপন করছে) **خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَنْعَالَ كُلَّهَا** আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কর্মের স্রষ্টা।

মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের লেখায় এ উদাহরণটি নেই।

বি. দ্র. মু'তায়িলা সম্প্রদায় একটি পথভ্রষ্ট দল, যারা ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাদের প্রধান নেতা হলো ওয়াসেল ইবনে আতা- সে হাসান বসরী (র.)-এর ছাত্র ছিল। সে তার কতিপয় অনুসারীসহ হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করে। সেই থেকে তাদের নাম হয় মু'তায়িলা। নিম্নে তাদের কয়েকটি ভ্রান্ত আকিদা দেওয়া হলো।

১. কবীরাহ ওনাহ মানুষকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

২. মানুষের কর্মের স্রষ্টা মানুষ।

৩. আল্লাহ তা'আলা কোনো মন্দ বিষয়ের স্রষ্টা হতে পারেন না।

৪র্থ প্রকার : ইসনাদটি বাস্তবতা এবং বক্তার বিশ্বাস কোনোটিরই মোতাবেক নয়। যেমন- তুমি বললে **جَاءَ زَيْدٌ** (যায়েদ এসেছে) অথচ তুমি জান যে, সে আসেনি; কিন্তু শ্রোতা জানে না। শ্রোতা তোমার প্রকাশ্য অবস্থা দ্বারা ধারণা করছে, তুমি যা বলেছ তা সত্য। কেননা, যদি শ্রোতা জানে যে, তুমি সত্য বলছ না, তাহলে তা **حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ** হওয়া নিশ্চিত নয়। তখন বক্তা শ্রোতার বিপরীত জানাকে দলিল বানাবে যে, সে যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য করেনি। ফলে এটি **حَقِيقَةٌ** থাকবে না। অতএব এ উদাহরণে শ্রোতার প্রকৃত অবস্থা না জানা জরুরি।

উল্লিখিত উদাহরণটি বাস্তবতা এবং বক্তার বিশ্বাস কোনোটির মোতাবেক হয়নি। কিন্তু বক্তার প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী মনে হয়েছে যে, ইসনাদটি **مَا هُوَ لَهُ**-এর দিকেই হয়েছে। এ কারণেই এটিকে **حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ**-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ-এর সংজ্ঞা দ্বারা এর চারটি প্রকার বের হয়ে আসে- ১. যা বাস্তবতা ও বিশ্বাস উভয়ের মোতাবেক হয়, যেমন- (মু'মিনের উক্তি) **أُنْبِتَ اللَّهُ الْبَقْلَ** ২. যা শুধুমাত্র বিশ্বাসের মোতাবেক হয়। যেমন (নাস্তিকের উক্তি) **أُنْبِتَ خَلَقَ اللَّهُ الْأَنْعَالَ** ৩. যা শুধুমাত্র বাস্তবতার মোতাবেক হয়। যেমন (মু'তায়িলা সম্প্রদায়ের কেউ বলল) **الرَّبِيعُ الْبَقْلَ** ৪. যা বাস্তবতা ও বিশ্বাস কোনোটার মোতাবেক নয়। যেমন- (মিথ্যা কথায় কেউ বলল,) **جَاءَ زَيْدٌ** অথচ সে জানে যে, যায়েদ আসেনি। কিন্তু শ্রোতা জানে না যে, মুতাকাল্লিম মিথ্যা বলেছে।

وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْإِسْنَادِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَيُسَمَّى مَجَازًا حُكْمِيًّا وَمَجَازًا فِي الْإِثْبَاتِ
وَرِاسَنَادًا مَجَازِيًّا وَهُوَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَعْنَاهُ إِلَى مُلَابِسٍ لَهُ أَيْ لِلْفِعْلِ أَوْ
مَعْنَاهُ غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ أَيْ غَيْرِ الْمَلَابِسِ الَّذِي ذَلِكَ الْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ مَبْنِيٌّ لَهُ يَعْنِي غَيْرَ
الْفَاعِلِ فِي الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ وَغَيْرِ الْمَفْعُولِ بِهِ فِي الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ
الْغَيْرُ غَيْرًا فِي الْوَاقِعِ أَوْ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ
غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِهِ بِتَأَوُّلٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ
غَيْرَ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ خَرَجَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجَاهِلِ أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ مَجَازًا عَقْلِيًّا
بِإِعْتِبَارِ الْإِسْنَادِ إِلَى السَّبَبِ بِتَأَوُّلٍ مُتَعَلِّقٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى التَّأَوُّلِ أَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يُؤَوَّلُ
إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ تَنْصَبَ قَرِينَةً
صَارِفَةً عَنْ أَنْ يَكُونَ الْإِسْنَادُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ -

অনুবাদ : ইসনাদের আরেকটি প্রকার হলো মাজাযে আকলী। এর আরো নাম রয়েছে। (যথা-) মাজাযে
হুকমী, মাজায ফিল ইহবাত এবং ইসনাদে মাজাযী। অ (ইসনাদে মাজাযী) এই যে, ফে'ল অথবা ফে'লের
অর্থবোধক শব্দকে ফে'লের সাথে সম্পর্কিত কোনো ইসমের প্রতি নিসবত করা, যা مَا هُوَ لَهُ থেকে ভিন্ন অর্থাৎ
ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে যার জন্য বানানো হয়েছে তা সেই সম্পৃক্ত জিনিসের ভিন্ন। অর্থাৎ ফে'লে
মা'রুফের মধ্যে ফায়েল ভিন্ন অন্যের দিকে এবং ফে'লে মাজহুলের মধ্যে মাফউল ভিন্ন অন্য ইসমের প্রতি নিসবত
করা। এ ভিন্নতা বাস্তবতার নিরিখে হতে পারে অথবা বক্তার প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতেও হতে পারে। এর দ্বারা খণ্ডন
হয়ে গেল (এ ব্যাপারে বর্ণিত ভিন্নমত) অর্থাৎ যদি তিনি বক্তার প্রকাশ্য অবস্থা বিবেচনা করত ভিন্নতা ইচ্ছা করেন,
তাহলে تَأَوَّلُ কথাটির প্রয়োজন নেই। এটা তো স্পষ্ট। আর যদি তিনি বাস্তবে مَا هُوَ لَهُ-এর ভিন্ন কিছু মনে
করেন, তাহলে এর দ্বারা নাস্তিকের উক্তি أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ কার্যকারণের দিকে নিসবত হিসেবে মাজায থেকে বের
হয়ে যায়। এটি إِسْنَادِهِ-এর সাথে متعلق আর تَأَوَّلُ অর্থ হচ্ছে তুমি এমন বিষয়কে অনুসন্ধান করছ যার
দিকে মাজায প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ হাকীকত। অথবা এমন স্থান অনুসন্ধান করছ, যার প্রতি মাজায প্রত্যাবর্তন
করে। অর্থাৎ জ্ঞান বা আকল (এর মাধ্যমে) (এটি এমন স্থানে হয় যেখানে মাজাযের জন্য কোনো হাকীকত থাকে
না) সারকথা এই যে, এমন লক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, যা ইসনাদকে مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَيْ مِنَ الْإِسْنَادِ الخ : ইতঃপূর্বে হাকীকতে আকলিয়াহ-এর সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। এখান থেকে
مَجَازٌ আর عَقْلِيٌّ-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইসনাদের ২য় প্রকার হলো مَجَازٌ আর عَقْلِيٌّ
عَقْلِيٌّ বেশ কয়েকটি নামে অবহিত হয়, যথা- مَجَازٌ فِي الْإِثْبَاتِ, مَجَازٌ حُكْمِيٌّ ও ইসনাদে মাজাযী।

قَوْلُهُ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ: মুসান্নিফ বলেন, غير-এর ক্ষেত্রে আমরা যে ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করেছি এর দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব হয়ে গেছে। প্রশ্নটি হলো, سَجَازٌ عَقْلِيٌّ-এর সংজ্ঞাতে যে غَيْرٌ مَا هُوَ কথটি রয়েছে, এর দ্বারা হয়তো غَيْرٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِر (বাস্তবতার ভিন্ন) উদ্দেশ্য হবে, নয়তো غَيْرٌ فِي الْوَاقِع (উদ্দেশ্য হবে। যদি

الظَّاهِرِ غَيْرُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো মূল লেখকের সংজ্ঞায় বর্ণিত تَأْوِيلُ কথাটির দরকার নেই, কেননা تَأْوِيلُ কথার অর্থ হলো قَرِينُهُ। আর আমরা জানি الظَّاهِرِ فِي الظَّاهِرِ তখনই উদ্দেশ্য, যখন قَرِينُهُ থাকে, তাই تَأْوِيلُ কথাটির প্রয়োজন নেই। আর যদি غَيْرُ فِي الرَّاوِقِ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ - মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উক্ত উদাহরণে أَنْبَاتُ বাস্তবে অন্য কারো জন্য জানা নেই। সুতরাং যখন বাস্তবে এর غَيْرُ নেই, তাই এটি مَجَازٌ عَقْلِيٌّ হতে পারছে না; অথচ এটি مَجَازٌ-এর উদাহরণ। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো غَيْرُ-এর দ্বারা কোন غَيْرُ আপনার উদ্দেশ্য। এর জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে غَيْرُ-এর অর্থ ব্যাপক, এর মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই। মুসান্নিফের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, غَيْرُ এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, চাই সেটা বাস্তবতার غَيْرُ হোক, অথবা মুতাকাল্লিমের প্রকাশ্য অবস্থার غَيْرُ হোক। এ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে উল্লিখিত আপত্তি বাতিল হয়ে যায়। কেননা, বক্তার প্রকাশ্য অবস্থার غَيْرُ মনে করা হলে যদিও تَأْوِيلُ শব্দের প্রয়োজন নেই; কিন্তু বাস্তবতার غَيْرُ মনে করা হলে অবশ্যই تَأْوِيلُ শব্দের প্রয়োজন আছে, এমনিভাবে বাস্তবতার غَيْرُ মনে করা হলে যদিও কাফিরের উক্তি أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ মাজায হয় না বা মাজাযের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যায়; কিন্তু বক্তার প্রকাশ্য অবস্থার غَيْرُ মনে করা হলে এটি মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতএব, বুঝা গেল غَيْرُ শব্দটি দ্বারা যদি ব্যাপকার্থে উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোনো আপত্তি থাকে না।

تَأْوِيلُ শব্দের ব্যাকরণগত তারকীব এবং تَأْوِيلُ শব্দের ব্যাকরণগত তারকীব এবং تَأْوِيلُ শব্দের ব্যাকরণগত তারকীব : قَوْلُهُ تَأْوِيلٌ مُتَعَلِّقٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَى التَّأْوِيلِ শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, تَأْوِيلُ হরফে জার এবং মাজরুর মিলে اسناد মাসদারের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

تَأْوِيلُ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) বলেন, تَأْوِيلُ শব্দটি (باب تفعّل)-এর মাসদার, ال থেকে শব্দটি উদ্ভূত, ال অর্থ ফিরে আসা। تَأْوِيلُ শব্দের অর্থ, কোনো জিনিসকে তালাশ করা, তার প্রতি লক্ষ্য করা, এখানে تَأْوِيلُ শব্দের অর্থ হলো ঐ হাকীকতকে খুঁজে ফেরা, যার দিকে مَجَازٌ প্রত্যাবর্তন করবে, এ কথায় مَجَازٌ عَقْلِيٌّ থেকে حَقِيقَةُ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকেই تَأْوِيلُ বলা হয়। তবে تَأْوِيلُ-এর এ অর্থ তখনই পাওয়া যায়, যখন مَجَازٌ-এর হাকীকত থাকবে, যেমন- أَنْبَتَ الرِّبْعُ الْبَقْلَ-এর মধ্যে أَنْبَاتُ-এর নিসবত ربيع-এর দিকে মজায হিসেবে হয়েছে। এর মধ্যে تَأْوِيلُ হলো এর হাকীকত তথা مَجَازٌ-এর নিসবত آتِهَا-এর নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে হওয়া হলো হাকীকত। যেমন- أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ।

تَأْوِيلُ-এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো- تَأْوِيلُ বলা হয় এমন স্থান খুঁজে বের করা, যার প্রতি জ্ঞানের ভিত্তিতে مَجَازٌ-এর নিসবত প্রত্যাবর্তিত হয়। এটি তখন হয় যখন مَجَازٌ-এর জন্য কোনো হাকীকত থাকে না। যেমন- كَعْدُ بَلَلٍ, أَقْدَمَنِي-এর (তোমার কাছে আমার পাওনাই আমাকে তোমার শহরে এনেছে) এ উদাহরণে أَقْدَمَ حَقٌّ لِي-এর (আমি قَدِمْتُ بَلَدَكَ لِحَقِّي لِي عَلَيْكَ-এর জন্য মূলত (إِسْنَادُ مَجَازِي) أَقْدَمَنِي حَقٌّ-এর জন্য মূলত فَاعِلٌ حَقِيقَتِي নেই, যার দিকে এটি প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ, এখানে কেউ إِقْدَامٌ করায়নি, তবে عَقْلٌ বা জ্ঞান একটি স্থানের প্রতি দিক নির্দেশ করছে, তা হচ্ছে قُدْرَمٌ لِحَقِّي (হকের কারণে আগমন)। এর প্রতি مَجَازٌ-টি প্রত্যাবর্তন করছে।

সারকথা হলো, تَأْوِيلُ বলা হয় مَجَازٌ থেকে হাকীকতের প্রতি প্রত্যাবর্তন, চাই সে হাকীকত বাস্তবে থাকুক অথবা বাস্তবে না থাকুক; বরং ধরে নেওয়ার পর্যায়ে হোক। এ কথাকে আরো সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, বক্তা তার রূপক কথার মধ্যে এমন একটি লক্ষণ বা প্রমাণ দাঁড় করাবে যা দ্বারা اسناد যে যথার্থ স্থানের দিকে হয়নি তা বুঝা যাবে এবং এটাও বুঝা যাবে যে, এখানে اسناد হয়েছে مَجَازٌ-এর দিকে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَازٌ عَقْلِيٌّ-এর বলা হয় ফে'ল/ফে'লের অর্থবোধক কোনো ইসমকে যার থেকে সংঘটিত ফে'ল তা ছাড়া ফে'লের সাথে সম্পর্কিত কোনো কিছুর দিকে দলিলের সাহায্যে সন্ধান করা।

مَجَازٌ عَقْلِيٌّ-এর আরো কতিপয় নাম হলো- ক. مَجَازٌ حُكْمِي. খ. مَجَازٌ فِي الْأَنْبَاتِ. গ. مَجَازٌ مَجَازِي. গ. مَجَازٌ عَقْلِيٌّ-এর উদাহরণ- ১. بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ. ২. نَمَا رِبْعٌ تَجَارَتْهُمْ

وَلَهُ أَى لِّلْفِعْلِ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى تَفْصِيلٍ وَتَحْقِيقٍ لِّلْتَّعْرِيفَيْنِ مُلَابَسَاتٍ شَتَّى أَى مُخْتَلِفَةً جَمْعُ شَتَيْتٍ كَمَرِيضٍ وَمَرَضِي يُلَابِسُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ وَالْمُضَدَّرُ وَالزَّمَانُ وَالْمَكَانُ وَالسَّبَبُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمَفْعُولِ مَعَهُ وَالْحَالِ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يُسْنَدُ إِلَيْهَا فَرَأَيْنَاهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ أَى لِّلْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ يَغْنَى إِنَّ إِسْنَادَهُ إِلَى الْفَاعِلِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ أَوْ إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا لَهُ حَقِيقَةً كَمَا مَرَّ مِنَ الْأَمْثِلَةِ وَإِسْنَادُهُ إِلَى غَيْرِهِمَا أَى غَيْرِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ يَغْنَى غَيْرَ الْفَاعِلِ فِي الْمَبْنِيِّ لِلْفَاعِلِ وَغَيْرَ الْمَفْعُولِ بِهِ فِي الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ لِلْمُلَابَسَةِ يَغْنَى لِأَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرَ يُشَابَهُ مَا هُوَ لَهُ فِي مُلَابَسَةِ الْفِعْلِ مَجَازًى -

অনুবাদ : এবং তার জন্য অর্থাৎ ফে'লের জন্য- এটি হাকীকত এবং মাজায়ের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ এবং বিস্তারিত আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কিত ইসম রয়েছে। **شَتَّى** অর্থ- বিভিন্ন, এটি **شَتَيْتٍ**-এর বহুবচন। যেমন- **مَرِيضٌ**-এর বহুবচন **مَرَضِي** যা সম্পর্ক রাখে ফায়েলের সাথে, মাফউলে বিহীর সাথে, মাসদারের সাথে, কালের সাথে, স্থানের সাথে এবং কার্যকারণের সাথে। তিনি মাফউলে মা'আহ এবং হাল ইত্যাদির আলোচনা আনেননি, এর কারণ ফে'লকে এগুলোর প্রতি ইসনাদ করা হয় না। সুতরাং ফায়েল এবং মাফউলের প্রতি ফে'লের ইসনাদ যখন যথাক্রমে ফায়েল এবং মাফউলের জন্য ফায়েল গঠিত হয় (তখন এটি হাকীকত হয়) অর্থাৎ ফে'লের নিসবত ফায়েলের দিকে যখন ফে'লটি ফায়েলের জন্য গঠিত। আর মাফউলের নিসবত ফে'লের দিকে যখন ফে'লটিকে মাফউলের বানানো হয়- হাকীকত। যেমনটি এর উদাহরণ অতীত হয়েছে। আর ফে'লের নিসবত ফায়েল এবং মাফউলে বিহী ছাড়া অন্য দিকে অর্থাৎ ফায়েলের জন্য গঠিত ফে'লের মধ্যে ফায়েল ছাড়া অন্য দিকে এবং মাফউলের জন্য গঠিত ফে'লের মধ্যে মাফউল ছাড়া অন্য দিকে (করা হয়) বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে। অথচ সেই ভিন্ন ইসমটি যার জন্য ফে'ল তার সাথে সামঞ্জস্য রাখে ফে'লের সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়- তখন তা মাজায় বলে গণ্য হয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَهُ أَى لِّلْفِعْلِ الخ : এখান থেকে হাকীকত এবং মাজায়ের সংজ্ঞার বিস্তারিত বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। মূল লেখক বলেন, ফে'লের সাথে অনেক ইসমের সম্পর্ক থাকে। একেকটি ইসমের একেকভাবে সম্পর্ক। যেমন- কোনো ইসম ফে'লের মাসদার, সেই হিসেবে তার ফে'লের সাথে সম্পর্ক। কোনো ইসম ফে'লের স্থান অথবা কাল সে হিসেবে ইসমটির সাথে ফে'লের সম্পর্ক। কোনো ইসম ফে'লের জন্য **سَبَب** বা কার্যকারণ সেই হিসেবে ইসমটির সাথে ফে'লের সম্পর্ক। কোনো ইসম ফে'লের মাফউল হয়, সেই হিসেবে ইসমটির সাথে ফে'লের সম্পর্ক। সুতরাং ফে'লে মারুফের মধ্যে ফায়েলের দিকে যদি ফে'লটি নিসবত করা হয়, তাহলে ইসনাদটি হাকীকী হলো। এমনি ফে'লে মাজহুলের মধ্যে ফে'লের নিসবত যদি মাফউলে বিহীর দিকে করা হয়, তাহলে এটিও হাকীকী হবে। কিন্তু যদি কোনো সম্পর্কের ভিত্তিতে উপরোল্লিখিত ইসমসমূহের কোনো ইসমের দিকে ফে'লের নিসবত করা হয়, যা ফে'লে মা'রুফের মধ্যে ফায়েল ছাড়া এবং ফে'লে মাজহুলের মধ্যে মাফউল ছাড়া হয় তাহলে সেই নিসবতটিকে **مَجَاز عَقْلِي** বলা হবে।

উল্লেখ্য যে, **لِلْفِعْلِ** (ফে'লের জন্য) বলা হলেও **فَعْلٌ** এর অন্তর্ভুক্ত হবে ফে'লের **تَابِع** হিসেবে।

মুসান্নিফ شَتَّى مُلَابِسَاتٍ شَتَّى এ ইবারতের শব্দটির তাহকীক করেন যে, شَتَّى শব্দটি شَتِيَتْ-এর বহুবচন। এ ধরনের একবচন ও বহুবচন অন্যস্থানেও পাওয়া যায়। যেমন- مَرَضٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো مَرَضَى। মূল লেখক এখানে فَعَلَ-এর মোট ছয়টি مُلَابِس-কে উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর দিকে ফে'লকে নিসবত করা হয়। ফে'লের আরো مُلَابِس রয়েছে। যথা- মাফউলে মা'আহ, হাল ও তামঈয ইত্যাদি। মূল লেখক সেগুলোর আলোচনা করেননি। কারণ এগুলোর দিকে ফে'লকে নিসবত করা হয় না।

قَوْلُهُ فَيَسْتَدُّهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ إِذَا كَانَ مُبَيَّنًّا لَهُ : মূল লেখক বলেন, ফে'লকে যখন معروف-এর মধ্যে ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয় এবং مجهول-এর মধ্যে مَفْعُول-এর দিকে নিসবত করা হয়, তখন তা حَقِيقَةٌ ফায়েলের মধ্যে গণ্য হয়। আর যদি এর ব্যতিক্রম করা হয় অর্থাৎ معروف-এর মধ্যে ফায়েলের দিকে নিসবত না করে অন্য কোনো مُلَابِس-এর দিকে নিসবত করা হয়, এমনিভাবে مَجْهُول-এর মধ্যে মাফউলে বিহীর দিকে নিসবত না করে অন্য কোনো مُلَابِس-এর দিকে নিসবত করা হলে, তাকে مَجَازٌ عَقْلِيٌّ বলা হবে। আর অন্য مُلَابِس-এর নিসবত করার কারণ হচ্ছে ফে'লের সাথে সম্পর্ক। অর্থাৎ مُسْتَدُّ إِلَيْهِ مَجَازِي-এর সাথে ফে'লের একটি সম্পর্ক থাকে, যেমন সম্পর্ক থাকে مُسْتَدُّ إِلَيْهِ حَقِيقِي-এর সাথে। ফে'লের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে مُسْتَدُّ إِلَيْهِ مَجَازِي যেন مُسْتَدُّ إِلَيْهِ حَقِيقِي-এর অনুরূপ হয়ে যায়। আর সে ভিত্তিতে ফে'লের নিসবতটি তার দিকে করা হয়। যদিও উভয়ের সম্পর্ক একই ধরনের না থাকে।

উদাহরণ : جَرَى الْمَاءُ : পানি প্রবাহিত হলো। এখানে الماء হলো مُسْتَدُّ إِلَيْهِ حَقِيقِي আর جَرَى النُّهْرُ নদী প্রবাহিত হয়েছে। এখানে النُّهْر হলো مُسْتَدُّ إِلَيْهِ مَجَازِي। এখানে مجاز এবং حقیقة-এর মাঝে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, جَرَى ফে'লটির সাথে ماء-এর যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি نهر-এর সম্পর্ক আছে। ماء ফে'লটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর نهر হলো ফে'লটি সংঘটিত হওয়ার স্থান, উল্লিখিত এ স্থানের ভিত্তিতে ফে'লটিকে ماء (حقیقة)-এর দিকে নিসবত না করে نهر (مجاز)-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. مُلَابِسَاتٍ فَعَلَ বা ফে'লের সাথে সম্পর্কিত বিষয় কয়েকটি। যথা- ১. ফায়েল, ২. মাফউলে বিহী, ৩. মাসদার, ৪. ফে'লের কাল, ৫. ফে'লের স্থান, ৬. ফে'লের সবব।

খ. فَعَلَ-এর মধ্যে ফে'লকে তার ফায়েলের দিকে নিসবত করা হলে তা حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ হবে। এ ছাড়া অন্য দিকে নিসবত করা হলে তা مَجَازٌ عَقْلِيٌّ হবে। তদ্রূপ مَجْهُول-এর ফে'লকে তার مَفْعُولُ بِهِ-এর দিকে নিসবত করা হলে حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّةٌ হবে, আর অন্যথায় তা مَجَازٌ عَقْلِيٌّ হবে।

كَقَوْلِهِمْ عَيْشَةً رَّاضِيَةً فِيمَا بُنِيَ لِلْفَاعِلِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْمَفْعُولِ بِهِ إِذِ الْعَيْشُ مَرْضِيَّةٌ
وَسَبِيلٌ مُفْعَمٌ فِي عَكْسِهِ أَعْنَى فِيمَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ وَأُسْنِدَ إِلَى الْفَاعِلِ لِأَنَّ السَّبِيلَ هُوَ
الَّذِي يُفْعَمُ أَيْ يَمْلَأُ مِنْ أَفْعَمَتِ الْإِنَاءَ إِذَا مَلَأْتَهُ وَشَعَرَ شَاعِرٌ فِي الْمَصْدَرِ وَالْأَوَّلَى التَّمَثِيلُ
يَنْحُو جَدَّ جَدُّهُ لِأَنَّ الشَّعَرَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ وَنَهَارُهُ صَائِمٌ فِي الزَّمَانِ وَنَهْرٌ جَارٍ فِي
الْمَكَانِ لِأَنَّ الشَّخْصَ صَائِمٌ فِي النَّهَارِ وَالْمَاءُ جَارٍ فِي الشَّهْرِ وَبَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ فِي
السَّبَبِ وَتَبَغَى أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ يَجْرِي فِي النِّسْبَةِ الْغَيْرِ الْإِسْنَادِيَّةِ أَيْضًا
مِنْ الْإِضَافِيَّةِ وَالْإِنْقَاعِيَّةِ نَحْوُ أَعْجَبَنِي إنبَاتُ الرَّبِيعِ وَجَرَى الْإِنْتِهَارُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَمَكَرُ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ وَنَحْوُ تَوَمَّتُ اللَّيْلُ وَاجْرَيْنَتْ النَّهْرُ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَالتَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ لِلْإِسْنَادِ أَللَّهُمَّ
إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِسْنَادِ مُطْلَقُ النِّسْبَةِ وَهُنَا مَبَاحِثُ نَفِيسَةٍ وَشَحْنَا بِهَا الشَّرْحُ -

অনুবাদ : যেমন, তাদের উক্তি - (মনোমুগ্ধকর জীবন) (رَاضِيَةً) এটি ফায়েলের জন্য
বানানো; অথচ নিসবত করা হয়েছে মাফউলে বিহীর দিকে, কেননা, (মূলবাক্য এরূপ) (عَيْشَةً مَرْضِيَّةً) এবং
سَبِيلٌ (পরিব্যাপ্ত প্লাবন) এর উল্টো। অর্থাৎ এটি (مُفْعَمٌ)-কে বানানো হয়েছে মাফউলের জন্য, কিন্তু একে
ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে। কেননা, প্লাবন বা বন্যাই ভরে- পরিপূর্ণ করে দেয়। এটি (أَفْعَمَتِ الْإِنَاءَ) তুমি তখন বল, যখন তুমি পাত্র ভরে
থেকে নেওয়া হয়েছে। (যার অর্থ আমি পাত্র ভরে দিলাম) (أَفْعَمَتِ الْإِنَاءَ) তুমি তখন বল, যখন তুমি পাত্র ভরে
দাও এবং (شَعَرَ شَاعِرٌ) (সারগর্ভ কবিতা) মাসদারের দিকে ইসনাদ হয়েছে, তবে এখানে (جَدَّ جَدُّهُ) দ্বারা উদাহরণ
দেওয়া উত্তম হতো। কেননা, এখানে (شَعَرَ) (মাসদারটি) ইসমে মাফউলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং (نَهَارُهُ) (তার দিবস রোজাদার) এতে কালের প্রতি ইসনাদ হয়েছে এবং (نَهْرٌ جَارٍ) (প্রবাহিত নদী) এতে স্থানের
প্রতি ইসনাদ হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে দিনের বেলায় ব্যক্তি রোজাদার হয় এবং পানি প্রবাহিত হয় নদীর
মধ্যে। এবং (আরেকটি (مَجَاز-এর উদাহরণ হলো) (بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ) (রাজা শহরটি নির্মাণ করলেন) এতে
ইসনাদ কার্যকারণের দিকে হয়েছে।

জানা উচিত যে, (إِنْقَاعِيَّةِ) (ইফায়েত এবং ইকাইয়্যাহ) (إِنْقَاعِيَّةِ) এর
ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। যেমন- (أَعْجَبَنِي إنبَاتُ الرَّبِيعِ وَجَرَى الْإِنْتِهَارِ) (আমাকে বসন্তকালের উৎপাদন এবং
নদ-নদীর প্রবাহ মুগ্ধ করেছে)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَمَكَرُ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ) (যদি তুমি তাদের মধ্যকার
মতবিরোধকে ভয় কর) এবং (مَكَرُ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ) (দিন-রাতের ষড়যন্ত্র) এ সকলই হলো (إِضَافَةِ) এর ক্ষেত্রে
(আমি নদীকে) (وَأَجْرَيْنَتْ النَّهْرَ) (আমি রাতকে ঘুম পাড়িয়েছি), (تَوَمَّتُ اللَّيْلُ) (আমি রাতকে ঘুম পাড়িয়েছি), এবং (يَعْمَلُ) (আমি নদীকে
প্রবাহিত করেছি) এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী (وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) (তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের
নির্দেশের আনুগত্য করো না) এগুলো (نِسْبَةِ إِنْقَاعِيَّةِ) এর উদাহরণ। অথচ উল্লিখিত সংজ্ঞাটি শুধুমাত্র ইসনাদীর
জন্য। (هَ أَهْلًا! তোমার সাহায্য কামনা করছি) তবে যদি ইসনাদ দ্বারা সাধারণ নিসবত উদ্দেশ্য করা
হয়, তাহলে (উল্লিখিত আপত্তি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।) এ প্রসঙ্গে কিছু উৎকৃষ্ট আলোচনা রয়েছে, যা
দ্বারা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ (মুতাওওয়াল)-কে অলঙ্কৃত করেছি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মাসদারের দিকে ইসনাদের জন্য উত্তম উদাহরণ হলো جَدِّ جَدُّ (তার চেষ্ঠা সফল হয়েছে) এখানে جَدِّ ফে'লটি معروف বা ফায়েলের জন্য বানানো, কিন্তু এটি এখানে ফায়েলের صَاحِبِ جَدِّ বা চেষ্ঠাকারীর দিকে নিসবত হয়নি; বরং এটি মাসদারের দিকে নিসবত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, এটিকে পূর্বের উদাহরণ থেকে উত্তম বনার কারণ কি? এর উত্তর হলো, এখানে شَعْر (মাসদার) اسم مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে মতে شَاعِر-এর সর্বনাম

যার مرجع হলো شعر (মাসদার) বাহ্যত হলেও তা ইসমে মাফউলের দিকে হয়েছে। অতএব, এখানে إِسْنَادٌ إِلَى الْمَصْدَرِ হলো না; বরং إِسْنَادٌ إِلَى الْمَفْعُولِ হয়ে গেল। তাই جد جده উদাহরণটি উত্তম। কারণ, এতে إِسْنَادٌ إِلَى الْمَصْدَرِ হওয়ার মধ্যে কোনোরূপ সন্দেহ নেই।

চতুর্থ উদাহরণ : চতুর্থ উদাহরণ : نَهَارٌ نَهَارٌ এখানে نَهَارٌ শব্দের অর্থ- দিবস, "ه" সর্বনামের مرجع হলো রোজাদার ব্যক্তি, صَانِعٌ হলো اسم فاعل-এর সীগাহ। এ উদাহরণে صَانِعٌ যা ফায়েলের জন্য বানানো হয়েছে; তার ইসনাদ উহ্য সর্বনামের দিকে করা হয়েছে। সেই সর্বনামটির مرجع হলো نَهَار (ظرف زمان) শব্দটি। অতএব, ফায়েলের জন্য গঠিত شبه فعل-এর ইসনাদ ظرف-এর দিকে হওয়ার কারণে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ হয়েছিল। কেননা, ব্যক্তি রোজাদার হয়, কোনো দিবস রোজাদার হয় না। আর إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ হলে তা مَجَاز عَقْلِي-এর মধ্যে গণ্য হয়।

পঞ্চম উদাহরণ : جَرَى جَارٍ, أَنْهَارٌ, نَهْرٌ অর্থাৎ নহর প্রবাহিত। এখানে نَهْرٌ শব্দের অর্থ নদী এর বহুবচন جَرَى এটি جَارٍ-এর সীগাহ। এ উদাহরণে جَارٍ যা ফায়েলের জন্য বানানো হয়েছে, তাকে এখানে উহ্য সর্বনামের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে। সর্বনামটির مرجع হলো نَهْرٌ যা মূল ফায়েল ماء-এর জন্য ظَرْفٌ কেননা, পানি প্রবাহিত হয় নদীর মাঝে, নদী প্রবাহিত হয় না। তাই এখানে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ হয়েছিল। আর إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ হলে তা مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হয়।

ষষ্ঠ উদাহরণ : بَنَى الْإِمِيرُ الْمَدِينَةَ (রাজা শহরটি নির্মাণ করলেন) بَنَى-এর অর্থ- নির্মাণ করা الْمَدِينَةَ বা শহর নির্মাণ করে নির্মাণ শ্রমিকরা। أَمِيرٌ বা রাজা সেই নির্মাণ শ্রমিকদের নির্দেশ দিয়ে থাকে। অতএব, এখানে بَنَى-এর নিসবত তার মূল ফায়েল- নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি না করে নির্দেশদাতা যিনি নির্মাণের سَبَب তার প্রতি নিসবত করা হয়েছে। আর এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, مَجَاز عَقْلِي এবং حَقِيقَةُ عَقْلِيَّةٍ : قَوْلُهُ وَتَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ وَشُذُومًا مَجَاز عَقْلِي হয়ে থাকে। এখানে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ-এর ক্ষেত্রেও مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, নিসবতে ইসনাদী বলা হয় نِسْبَتِ تَأَمِّهِ-কে, আর نِسْبَتِ غَيْرِ إِسْنَادِي বলা হয় নিসবতে নাকেসাকে।

এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের উপর আপত্তি তুলছেন যে, তিনি مَجَاز عَقْلِي-এর সংজ্ঞার মধ্যে শুধুমাত্র إِسْنَاد-কে शामिल করলেন; অথচ আমরা দেখি نِسْبَتِ غَيْرِ تَأَمِّهِ-এর ক্ষেত্রেও مَجَاز عَقْلِي হয়ে থাকে।

এরপর মুসান্নিফ নিসবতে ইয়াফী এবং ইকাইয়্যা-এর কতগুলো উদাহরণ পেশ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي পাওয়া গেছে। প্রথমত তিনি ইয়াফীর উদাহরণ দিয়েছেন।

প্রথম উদাহরণ : اَعْجَبْنِي اِنْبَاتُ الرَّبِيعِ وَجَرَى الْاَنْهَارِ অর্থাৎ আমাকে বসন্ত কালের শস্য উৎপাদন এবং নদ-নদীর প্রবাহ মুগ্ধ করেছে। এখানে اِنْبَات-এর نسبة اضافی রয়েছে الرَّبِيعِ-এর দিকে। এমনিভাবে جَرَى-এর نسبة اضافی রয়েছে اِنْبَات-এর দিকে। উভয়স্থানে মাসদারের اضافت রয়েছে; কিন্তু اِنْبَات-এর জন্য رِبْع এবং جَرَى-এর জন্য اَنْهَار প্রকৃত مضاف إليه (ফায়েল) নয়; বরং উভয়স্থানে نسبة اضافی তার مَجَازِي তার نسبة اضافی (ফায়েল)-এর দিকে হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমরা ভয় কর তাদের মাঝের মতবিরোধের) এ আয়াতে شِقَاق মাসদার-এর اضافত বাহ্যত হয়েছে ظرف-এর দিকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর مضاف إليه হবে الزوجين কারণ আয়াতের মূল তারকীব হলো এভাবে اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْحَالَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمَا তাই এখানে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ-এর দিকে নিসবত করা হয়নি; বরং এখানে إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ-এর দিকে হয়েছে। এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় উদাহরণ : مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ অর্থ- রাত ও দিনের ষড়যন্ত্র। এ উদাহরণে مَكْر মাসদারের اضافত হয়েছে مَكْرُ النَّاسِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ-এর দিকে, এ اضافতটি مجاز হয়েছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইবারত হবে اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ হতে লোকদের ষড়যন্ত্র রাত এবং দিনে।

إِنْقَاعِي-এর উদাহরণ : نَسَبْتُ النَّهْرَ : অর্থাৎ আমি রাতকে ঘুম পাড়িয়েছি এবং নদীকে প্রবাহিত করেছি। উভয় বাক্যতে مجاز হয়েছে। কারণ, আমরা জানি, রাতকে ঘুম পাড়ানো যায় না। যেমনটি নদীকে প্রবাহিত করা যায় না। মূল ইবারত হবে نَوَمْتُ الشَّخْصَ فِي اللَّيْلِ আমি লোকটিকে রাতে ঘুম পাড়িয়েছি এবং أَجَرْتُ النَّهْرَ আমি নদীতে পানি প্রবাহিত করেছি। সুতরাং এখানে ঘুম পাড়ানো রাতকে এবং প্রবাহিত করা নদীকে নিসবতে ইকায়ী, যার মধ্যে মাজায পাওয়া গেল।

إِنْقَاعِي-এর আরেকটি উদাহরণ : وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ : তথা তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না। এখানে اطاعت (আনুগত্য)-কে নির্দেশের উপর ইনْقَاع করা হচ্ছে। তাই এটি نَسَبْتُ إِنْقَاعِي-এর মাঝে مجاز হয়েছে, এক্ষেপে যে, আনুগত্যকে নির্দেশদাতার উপর ইনْقَاع করা হয়। امر বা নির্দেশের উপর ইনْقَاع করা হয় না। তাই এখানে ইনْقَاع-এর নিসবত مِمَّا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়নি। আর এ কারণে এটি مَجَاز عَقْلِي-এর মধ্যে গণ্য হবে।

عَنْ : قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِسْنَادِ مُطْلَقُ الْخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের সংজ্ঞার উপর যে আপত্তি করেছিলেন, তার একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যার দ্বারা মূল লেখকের সংজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের সংজ্ঞার اسناد শব্দটি যদিও نَسَبْتُ تَامَهُ-কে বুঝায়, কিন্তু এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণ নিসবত, যা تَامَهُ এবং غَيْرُ تَامَهُ-কে শামিল করে। مَجَاز مُرْسَل হিসেবে এ ধরনের উদ্দেশ্য নেওয়া যায়। যেমন-إِطْلَاقُ الْمُقَيِّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ (কায়েদযুক্ত শব্দকে কয়েদবিহীন শব্দের উপর প্রয়োগ করা) সাধারণ নিসবত উদ্দেশ্য হলে উপরোক্ত আপত্তি আর থাকে না। কেননা, তখন نَسَبْتُ تَامَهُ এবং نَسَبْتُ غَيْرُ تَامَهُ উভয়ে শামিল হয়ে যাবে। نَسَبْتُ غَيْرُ تَامَهُ-এর মধ্যে نَسَبْتُ إِضَافِي وَإِنْقَاعِي উভয়টি অন্তর্ভুক্ত।

এখানে প্রশ্ন হলো, মুসান্নিফ (র.) আপত্তির জবাবটির মধ্যে اللهم শব্দটি কেন আনলেন? কেননা, اللهم শব্দটি জবাবের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে। এর উত্তর হলো জবাবটি আসলেই দুর্বল। কারণ, এখানে যে প্রক্রিয়ায় জবাব দেওয়া হয়েছে তা হলো-إِطْلَاقُ الْمُقَيِّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ আর এটি হলো এক ধরনের مجاز। আর সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে مجاز-এর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। কেউ কেউ আপত্তির জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, এ مجاز টি তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ। তাই এর ব্যবহারে ব্যাপকতা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক উপরোক্ত ইবারত مَجَاز عَقْلِي-এর কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন-

১. عَيْشَةُ رَاضِيَةٌ এ উদাহরণে ফে'লকে ফায়েলের দিকে নিসবত না করে مَفْعُولُ بِهِ-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে।

২. سَبِيلُ مُنْعَمٍ এ উদাহরণে ফে'লকে মাফউলের দিকে নিসবত না করে ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৩. شِعْرُ شَاعِرٍ এ উদাহরণে ফে'লকে মাসদারের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৪. نَهَارُ صَائِمٍ এ উদাহরণে ফে'লকে কালের প্রতি নিসবত করা হয়েছে।

৫. نَهْرُ جَارٍ এ উদাহরণে ফে'লকে স্থানের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

৬. بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ এ উদাহরণে ফে'লকে سَبَب-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, اسناد-এর মাঝে

যেমন-مَجَاز عَقْلِي হয়, অদ্রপ اضافت ও ইনْقَاع-এর মাঝেও مجاز হয়। যেমন-

أَعْجَبَنِي أَنْبَاتُ الرَّيِّحِ وَجَرَى الْأَنْهَارِ

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

وَقَوْلَنَا فِي التَّغْرِيفِ بِتَأْوِيلٍ يُخْرِجُ نَحْوَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِ أَنْبَتَ الرَّبِيعِ الْبَقْلَ
رَأْيًا الْأَنْبَاتِ مِنَ الرَّبِيعِ فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ وَإِنْ كَانَ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ لَكِنْ لَا
تَأْوِيلَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُرَادُهُ وَمُعْتَقَدُهُ وَكَذَا شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُطَاقُ
الْإِعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ فَقَوْلُهُ بِتَأْوِيلٍ يُخْرِجُ ذَلِكَ كَمَا يُخْرِجُ الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ وَهَذَا تَغْرِضُ
بِالسَّكَاكِينِ حَيْثُ جَعَلَ التَّأْوِيلَ لِإِخْرَاجِ الْأَقْوَالِ الْكَاذِبَةِ فَقَطْ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى هَذَا تَعَرَّضَ
الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ لِبَيَانِ فَائِدَةِ هَذَا الْقَيْدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ دَائِبِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ
وَاقْتَصَرَ عَلَى بَيَانِ إِخْرَاجِهِ بِنَحْوِ قَوْلِ الْجَاهِلِ مَعَ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ أَيْضًا -

অনুবাদ : (মূল লেখক বলেন,) সংজ্ঞার মধ্যে আমাদের তাঁর কথটি ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হওয়া নাস্তিকের
উক্তি **أَنْبَتَ الرَّبِيعِ الْبَقْلَ** (এমতাবস্থায় যে, সে সবজি উৎপাদনকারী হিসেবে বসন্তকালকেই বিশ্বাস করে)-কে
সংজ্ঞা থেকে বের করে দেয়। এ ইসনাদ যদিও **غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ**-এর দিকে হয়েছে, কিন্তু এর জন্য তো কোনো
দলিল নেই। কেননা, এটি উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস অনুযায়ী হয়েছে। এমনিভাবে চিকিৎসক রোগীকে আরোগ্য দান
করেছে এবং এ জাতীয় উদাহরণ যা বিশ্বাসের মোতাবেক; কিন্তু বাস্তবতার মোতাবেক নয় (সেগুলোকে বের করে
দেয়)। সুতরাং তার উক্তি **تَأْوِيلَ** সেগুলোকে বের করে দেয় যেমনিভাবে সাধারণ মিথ্যা কথাকে বের করে দেয়। এ
বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য মূল লেখক মূল ইবারতে এ **قيد**-এর উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। অথচ এটি
(**فَوَائِدُ قِيُودُ** বর্ণনা করা) এ কিতাবে তার স্বভাবগত বিষয় নয়। আর তিনি কাফিরের উক্তি বের করার উপর
বিষয়টি সীমাবদ্ধ করেছেন; অথচ এটি মিথ্যা কথাকে বের করে দেয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَوْلَنَا فِي التَّغْرِيفِ الْخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক তাঁর সংজ্ঞায় বর্ণিত শব্দ **تَأْوِيلَ** কয়েদটির উপকারিতা
আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, **مَجَازٌ عَقْلِي**-এর সংজ্ঞায় বর্ণিত **تَأْوِيلَ** (দলিল-লক্ষণ)-এর **قيد** দ্বারা নাস্তিকের উক্তি
أَنْبَتَ الرَّبِيعِ الْبَقْلَ-কে **مَجَازٌ عَقْلِي** থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা তখনই হবে যখন নাস্তিক একথা বিশ্বাস করবে
যে, বসন্তকালই সবজির উৎপাদন ঘটায়, আল্লাহ তা'আলা উৎপাদনকারী নন। এ উদাহরণটি **مَجَازٌ عَقْلِي** থেকে বের হয়ে
যাবে। এর কারণ হচ্ছে, নাস্তিকের বক্তব্য যদিও বাস্তবতা বিবর্জিত হয়েছে এবং উদাহরণে **إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ**
হয়েছে; কিন্তু এখানে এমন কোনো দলিল বা লক্ষণ নেই, যা একথা প্রমাণ করবে যে, **إِسْنَادٌ إِلَى مَا هُوَ لَهُ** হয়নি; বরং
إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ-এর দিকে হয়েছে।

এখানে দলিল বা লক্ষণ না থাকার কারণ হচ্ছে, নাস্তিকের বিশ্বাস, নাস্তিক বিশ্বাস করে বসন্তকালই শস্যাদি উৎপাদন
করে। মুসান্নিফ (র.) বলেন-**شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ** (ডাক্তার রোগী ভালো করেছেন) এটি যখন কাফির বলবে তখন
এটিও **مَجَازٌ عَقْلِي**-এর সংজ্ঞার আওতায় আসবে না। কেননা, এখানে কোনো দলিল-লক্ষণ নেই। এমনিভাবে ঐ সকল
উদাহরণ **مَجَازٌ عَقْلِي** থেকে বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে ইসনাদ বক্তার বিশ্বাসের মোতাবেক হয়; কিন্তু বাস্তবের মোতাবেক
হয় না। যেমন- নাস্তিকের উক্তি **أَحْرَقَتِ النَّارُ الْحَطَبَ** (আগুন লাকড়ি জ্বালিয়েছে) এবং **قَطَعَ السَّكِينُ الْحَبْلَ** (চাকু রশি
কেটে দিয়েছে।)

মুসান্নিফ (র.) বলেন, **تَأْوِيلَ**-এর যেমনিটি **كَاذِبَةٌ** (মিথ্যা কথা)-কে দলিল বা লক্ষণ না থাকায় **مَجَازٌ عَقْلِي**
থেকে বের করে দেয় তেমনি বাস্তবতার মোতাবেক নয়, এমন উদাহরণগুলোকে বের করে দেয়।

মিথ্যা কথার উদাহরণ : যেমন কেউ বলল **ذَهَبَ خَالِدٌ** (খালেদ চলে গেল) অথচ সে জানে খালেদ যায়নি। এ উদাহরণে **ذَهَبَ** ফে'লটির ইসনাদ **مَا هُوَ**-এর দিকে হয়নি; বরং **غَيْرَ مَا هُوَ**-এর দিকে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যেহেতু **غَيْرَ مَا هُوَ**-এর দিকে হওয়ার কোনো দলিল নেই, তাই এটি **مَجَازٌ عَقْلِي**-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং এটি **حَقِيقَةٌ عَقْلِيَّة**-এর মধ্যেই পড়বে, যেমনটি ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মুসান্নিফ মিথ্যা কথা এবং নাস্তিকের উক্তিকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তার মতে নাস্তিকের উক্তি মিথ্যা কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

বাস্তবতার বিপরীত কথাকে যদিও মিথ্যা বলা হয়, কিন্তু এখানে নাস্তিকের কথা যেহেতু তার বিশ্বাস মোতাবেক হয়েছে এবং সে এটি সত্য হওয়ার বিশ্বাস করে তাই এটিকে মিথ্যা কথার অন্তর্ভুক্ত না করায় মুসান্নিফের মতটিই যুক্তিযুক্ত।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখক **الْبَخْبُورِيُّ** এ ইবারত দ্বারা আল্লামা সাক্বাকীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা সাক্বাকী **تَأَوَّلَ**-এর **قَيْد** দ্বারা **مَجَازٌ عَقْلِي**-এর সংজ্ঞা থেকে শুধুমাত্র মিথ্যা কথাকে বের করেছেন। তিনি নাস্তিকের উক্তি **أَتَيْتَ الرَّبَّعَ الْبَقْلَ**-কে বের করেননি। মূল লেখক তার উপরোক্ত ইবারত দ্বারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, **تَأَوَّلَ**-এর কয়েদ দ্বারা যেমন মিথ্যা কথা বের হয়ে যায়, তেমনি নাস্তিকের উক্তিও বের হয়ে যায়। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই তার স্বভাববিরুদ্ধভাবে এখানে **فَوَائِدُ قُبُورٍ** বর্ণনা করেছেন। অথচ এ কিতাবে **فَوَائِدُ قُبُورٍ** বর্ণনা করতে তাকে দেখা যায় না। আর এ কয়েদ দ্বারা শুধুমাত্র নাস্তিকের উক্তিকে বের করেছেন। অথচ এ **قَيْد** দ্বারা নাস্তিকের উক্তির মতো মিথ্যা কথাও **مَجَازٌ عَقْلِي** থেকে বের হয়ে যায়।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক তার ইবারতে উল্লিখিত **تَأَوَّلَ** শব্দটির উপযোগিতা বর্ণনা করছেন। লেখক বলেন, **مَجَاز** প্রমাণের জন্য দলিলের প্রয়োজন। যেমন ইতঃপূর্বে নাস্তিকের সে উক্তি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে—**أَتَيْتَ الرَّبَّعَ الْبَقْلَ**-এর মধ্যে **إِسْنَادٌ** **إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ** হওয়া সত্ত্বেও একে **مَجَاز** বলা যাচ্ছে দলিলের অভাবে যে, মুতাকাল্লিমের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

লেখকের মতে **تَأَوَّلَ** এ জাতীয় উক্তিকে (যেমন **مَجَازٌ عَقْلِي**-কে, বের করে দেয়) **أَقْوَالُ الْكَاذِبَةِ**-কেও বের করে দেয়। পক্ষান্তরে আল্লামা সাক্বাকীর মতে **تَأَوَّلَ** শুধুমাত্র **كَاذِبَةٍ**-কে বের করে।

وَلِهَذَا أَيْ وَلَإِنَّ مِثْلَ قَوْلِ الْجَاهِلِ خَارِجٌ عَنِ الْمَجَازِ لِإِشْتِرَاطِ التَّأْوِيلِ فِيهِ لَمْ يُحْمَلْ
 نَحْوُ قَوْلِهِ شَعْرٌ أَشَابَ الصَّغِيرَ وَ أَفْنَى الْكَبِيرَ * مَرَّ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعِشِيِّ - عَلَى الْمَجَازِ
 أَيْ عَلَى أَنَّ إِسْنَادَ أَشَابَ وَ أَفْنَى إِلَى كَرِّ الْغَدَاةِ وَ مَرِّ الْعِشِيِّ مَجَازٌ مَا دَامَ لَمْ يُعْلَمَ أَوْ لَمْ
 يَظُنَّ أَنَّ قَائِلَهُ أَيْ قَائِلَ هَذَا الْقَوْلِ لَمْ يَعْتَقِدْ ظَاهِرَهُ أَيْ ظَاهِرَ الْإِسْنَادِ لِإِنْتِفَاءِ التَّأْوِيلِ
 لِإِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هُوَ مُعْتَقِدًا لِلظَّاهِرِ فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الْجَاهِلِ أَنْبَتَ الرَّبِيعُ
 الْبَقْلَ كَمَا أُسْتَدِلَّ بِغَيْرِ مَا لَمْ يُعْلَمَ وَلَمْ يُسْتَدَلَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ظَاهِرَهُ مِثْلُ
 الْإِسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ إِسْنَادَ مَيَّزَ إِلَى جَذِبِ اللَّيَالِي فِي قَوْلِ أَبِي النَّجْمِ شَعْرٌ مَيَّزَ عَنْهُ أَيْ
 عَنِ الرَّأْسِ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ * هُوَ الشَّعْرُ الْمُجْتَمِعُ فِي تَوَاحِي الرَّأْسِ جَذِبَ اللَّيَالِي أَيْ
 مُضِيِّهَا وَ اخْتِلَافُهَا إِبْطَى أَوْ إِسْرَعَى حَالٌ مِنَ اللَّيَالِي عَلَى تَقْدِيرِ الْمَقُولِ أَيْ مَقُولًا
 فِيهَا وَ سَجُوزٌ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ مَجَازٌ خَبَرٌ أَنْ أُسْتَدِلَّ عَلَى أَنَّ إِسْنَادَ مَيَّزَ
 إِلَى جَذِبِ اللَّيَالِي مَجَازٌ بِقَوْلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِأُسْتَدِلَّ أَيْ بِقَوْلِ أَبِي النَّجْمِ عَقِيبَهُ أَيْ عَقِيبَ
 قَوْلِهِ مَيَّزَ عَنْهُ قُنْزَعًا عَنْ قُنْزَعٍ أَفْنَاهُ أَيْ أَبَا النَّجْمِ أَوْ شَعْرَ رَأْسِهِ قِيلَ اللَّهُ أَيْ أَمْرُهُ
 وَارَادَتُهُ لِلشَّمْسِ أُطْلِعْنِي فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنَّهُ الْمُبْدِيُّ وَالْمُعِينُ
 وَالْمُنْشِئُ وَالْمُفْنِي فَيَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَى جَذِبِ اللَّيَالِي بِتَأْوِيلٍ عَلَى أَنَّهُ زَمَانٌ أَوْ سَبَبٌ -

অনুবাদ : আর এ কারণে অর্থাৎ এতে -তَأْوِيل-এর শর্তের কারণে যেহেতু নাস্তিকের উক্তি মাজাযের সংজ্ঞা থেকে
 বের হয়ে যায় একই কারণে কবির কবিতাটিকে মাজাযের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কবিতার চরণ : সকাল এবং
 সন্ধ্যার আবর্তন শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করেছে এবং বয়স্ক ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে পতিত করেছে। অর্থাৎ أَشَابَ ও
 أَفْنَى (ফে'লদয়)-এর ইসনাদ যথাক্রমে كَرُّ الْغَدَاةِ এবং مَرُّ الْعِشِيِّ-এর দিকে মাজায হবে না যে পর্যন্ত না জানা
 যাবে অথবা প্রবল ধারণা করা যাবে যে, এর রচয়িতা অর্থাৎ এ কবিতার রচয়িতা কবিতার প্রকাশ্য অর্থকে
 বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ প্রকাশ্য ইসনাদ। কেননা, তখন দলিল-লক্ষণ না থাকার কারণে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে,
 রচয়িতা যাহিরী ইসনাদকেই বিশ্বাস করে, তবে এটা নাস্তিকের উক্তির মতোই হবে। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে
 অর্থাৎ যে পর্যন্ত জানা না যাবে এবং কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণ করা না যাবে যে, সে প্রকাশ্য ইসনাদের ইচ্ছা
 করেনি। যেমন প্রমাণ করা হয়েছে যে, -مَيَّزَ-এর নিসবত جَذِبُ اللَّيَالِي-এর মধ্যে আবুন নাজ্জের কবিতায়
 কবিতার চরণ : তার মাথার একটি চুলের গোছা আরেকটি গোছা থেকে পৃথক করেছে قُنْزَعًا শব্দের অর্থ
 মাথার পার্শ্বদেশে জমানো চুল। রাতের আবর্তন অর্থাৎ অতিক্রম ও পালাবদল। (হে রাত) তুমি দ্রুত অতিক্রম কর
 অথবা ধীরে অতিক্রম কর। এ দু'টি (অর্থাৎ إِبْطَى অথবা إِسْرَعَى) থেকে حال হয়েছে, উহ্য مَقُول-এর
 সহযোগিতায়। অর্থাৎ إِسْرَعَى وَ إِبْطَى فِيهَا مَقُولًا এখানে امر বর্ণনামূলক বাক্যের অর্থেও হতে পারে। এটি

মাজাজ শব্দটি **إِنْ**-এর **خَبَر**। অর্থাৎ ইবারত **إِلَى جَذِبِ اللَّيَالِي** অর্থাৎ রাতের আবর্তন এ কথার প্রতি **مِيز**-এর ইসনাদ যে **مِيز** হয়েছে এর উপর তারই কবিতা দ্বারা প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। **بقوله** শব্দটি **استدل**-এর সাথে **متعلق** এর **مرجع** হলো আবুন নাজম। আবুন নাজমের কবিতা দ্বারা যা (পূর্ববর্তী পঙ্ক্তির) পরে এসেছে। অর্থাৎ তার কবিতাংশ **مِيزَ عَنْهُ قُنُزًا عَنْ قُنُزٍ** এর পরে। তাকে অর্থাৎ আবুন নাজমকে অথবা তার মাথার চুলকে নিঃশেষ করে দিয়েছে আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ অথবা তাঁর ইচ্ছা— (যা তিনি করেছেন) সূর্যকে, তুমি উদয় হও। তার কবিতার এ অংশটি প্রমাণ করে নিঃশেষ করা আল্লাহর কাজ। আর তিনিই প্রথম সূচনাকারী পুনরুত্থানকারী, সৃষ্টিকর্তা এবং মৃত্যুদাতা। সুতরাং রাতের পালাবদলের দিকে নিসবতটি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ হলো যে, এটি (ফে'ল সংঘটিত হওয়ার) সময় বা কারণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ মূল লেখক বলেন, কাফরের উক্তি **أَنْتَ الرِّبُّ الْبَقْلُ** মাজাজ থেকে এ কারণে বের হয়ে গেছে যে, এতে বাহ্যিক ইসনাদ উদ্দেশ্য নয়, এ কথার উপর কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। অথচ মাজাজ হওয়ার জন্য দলিল প্রমাণ থাকা জরুরি। সে একই কারণে কবি (صَلَاتَان) সালাতান আল-আবদী আল-হামাসীর কবিতা (أَشَابَ الشَّابَ الصَّغِيرَ) এ ইসনাদ **هَوَّلَهُ** এর দিকে হওয়া সত্ত্বেও মাজাজ হয়নি। কারণ তার কবিতায় এমন কোনো প্রমাণ নেই, যার সাহায্যে মাজাজ হওয়া সাব্যস্ত হবে। কবি আবদে কায়েস গোত্রের অধিবাসী ছিলেন (সূত্র মুতাওয়াল) আল্লামা জাহিয় কিতাবুল হাইওয়ানে এ কবিতার কবি হিসেবে সালাতান আদ-দাব্বী-এর নাম উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন, সালাতান আদ-দাব্বী আর সালাতান আল-আবদী ও সালাতান আল-ফাহসা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। সালাতান আল-আবদীর নাম হচ্ছে কুছাম ইবনে খাবিয়্যাহ ইবনে আবদুল কাইস। কবিতাটি এরূপ—

أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ * رَكَرَأَلْفَدَا وَمَرُّ الْعَيْشِ

এর পরের পঙ্ক্তিগুলো হলো—

إِذَا الْبَلَّةُ أَهْرَمَتْ يَوْمَهَا * أَلَّتِي بَعْدَ ذَالِكَ يَوْمَ فِتْنَى
نَرُوحُ وَنَغْدُو لِحَاجَاتِنَا * وَحَاجَةٌ مِّنْ عَاشٍ لَا تَنْقُضِي
تَمُوتُ مَعَ الْمَرِّ حَاجَاتُهُ * وَتَبْقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِيَ

কবিতার অর্থ—সকাল ও সন্ধ্যার আবর্তন যুবককে বৃদ্ধ পরিণত করেছে আর বয়স্ক ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে পতিত করেছে।

أَشَابَ এবং **أَفْنَى** দু'টি ফে'ল। এগুলোকে **كَرَأَلْفَدَا** এবং **مَرُّ الْعَيْشِ** এর প্রতি নিসবত করা হয়েছে। এ ইসনাদকে **مِيز** বলা যাচ্ছে না। যে পর্যন্ত জানা না যায় যে, কবি এর যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য করেননি। এ কথা জানার আগ পর্যন্ত **قِرْنَهُ** বা দলিল অবিদ্যমান। কেননা, এমনও হতে পারে যে, কবি বাক্যের যাহিরী ইসনাদে বিশ্বাসী ছিল এবং এটাই তার উদ্দেশ্য। তখন তো ইসনাদ **مِيز** হবে না; বরং **حَقِيقَى** বলে গণ্য হবে।

এ কারণে কবির কবিতা নাস্তিকের উক্তি **أَنْتَ الرِّبُّ الْبَقْلُ** এর মতো হয়ে গেল। তবে যদি কোনোভাবে জানা যায় যে, কবি আল্লাহকে বিশ্বাস করত, তাহলে এটি **مِيزَ عَنْهُ** এর মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, কবির মু'মিন হওয়াটাই দলিল যে, সে যাহিরী ইসনাদ বিশ্বাস করে না এবং এটা তার উদ্দেশ্যও নয়। তখন **أَشَابَ** এবং **أَفْنَى** এর ইসনাদ **كَرَأَلْفَدَا** এবং **مَرُّ الْعَيْشِ** এর দিকে **إِسْنَادٌ إِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ** হবে।

মোটকথা, এখানে যাহিরী ইসনাদ উদ্দেশ্য না হওয়ার কোনো দলিল যেহেতু নেই, তাই এটি **مِيزَ عَنْهُ** এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। এরপর মূল লেখক আরেকটি কবিতা পেশ করেন, যার মধ্যে প্রকাশ্য ইসনাদ উদ্দেশ্য না হওয়ার দলিল পাওয়া যায়। মুসলিম কবি আবুন নাজমের উক্তি— **مِيزَ عَنْهُ قُنُزًا عَنْ قُنُزٍ * جَذِبَ اللَّيَالِي إِبْطَى وَإِسْرَعَى**

কবিতায় মِيز ফে'লটিকে ইসনাদ করা হয়েছে جَذْبُ اللَّيَالِي-এর দিকে। আর ইসনাদটি هُوَ لَهُ اِسْنَادٌ اِلَى غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ এ পঙ্ক্তিটি প্রমাণ হওয়ার কারণে মাজায়-এর দলিল হচ্ছে, এরপর আবুন নাজম বলছেন اُطْلِعْنِي اَنَّاهُ قَبِلَ اللّٰهُ لِلشَّمْسِ اُطْلِعْنِي করে আবুন নাজম একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এবং সব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। অতএব, আবুন নাজম মِيز-এর যে নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِي-এর দিকে করেছে এর যাহিরী ইসনাদ, তার বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই যাহিরী ইসনাদ তার উদ্দেশ্যও নয়; বরং সে جَذْبُ اللَّيَالِي-এর দিকে নিসবত করেছে ফে'লের নিসবত সময়-কালের দিকে করা হিসেবে। অথবা সে সাধারণভাবে কালের পালাবদলকে মানুষের বার্ষিক্যের কারণ মনে করে। সে মতে কারণের দিকে ফে'লের নিসবত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বার্ষিক্যকালে মানুষের মাথায় টাক পড়ে। টাক পড়ার কারণে মাথার দু'পাশে চুল থাকে বটে; কিন্তু মাঝে চুল থাকে না। সে অবস্থাটাকে মুসান্নিফ কবিতার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন قُنْزَعٌ শব্দের অর্থ- চুলের গোছা বা সমষ্টি। جَذْبُ শব্দের অর্থ- অতিক্রম এবং পালাবদল। الليالى দ্বারা এখানে জমানা উদ্দেশ্য। জমানার মধ্যে যেহেতু রাত আছে। তাই রাত বলে জমানাকে বুঝানো হয়েছে।

ইবারতের তারকীব প্রসঙ্গে কিছু কথা :

মুসান্নিফ (র.) বলেন, مجاز শব্দটি ان-এর (حرف مشبه بفعل) خبر আর ان-এর اسم হলো اِسْنَادٌ مَّيْزَ পুরো বাক্যটি একত্রে একরূপ হবে اُسْتَدِلَّ عَلَى اَنَّ اِسْنَادَ مَيْزٍ اِلَى جَذْبِ اللَّيَالِي مَجَازٌ ।

এর সাথে। اسناد متعلق হবে جار مجرور এ-এর মধ্যে قوله কবিতায় اِبْطِئْ وَاَسْرِعْ শব্দ দু'টি امر-এর (وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ) সীগাহ। মুসান্নিফ (র.) এ দু'টিকে لَيَالِي থেকে مَقُولًا হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যেহেতু اِنْشَاء হতে পারে না, তাই তিনি বলেন اِبْطِئْ وَاَسْرِعْ-এর পূর্বে مَقُولًا শব্দটি উহা আছে। অথবা সীগাহ দু'টি শাব্দিকভাবে امر হলেও অর্থগতভাবে এগুলো خبر বা বর্ণনামূলক বাক্য। আর বর্ণনামূলক বাক্য حال হতে কোনো সমস্যা নেই।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক তার ইবারতে দু'টি কবিতা উল্লেখ করেছেন, প্রথম কবিতাটিতে দলিল (تَأْوِيل) না থাকাতে তা حَقِيقَةً عَقْلِيَّةً غَيْرِ اِسْنَادِ اَفْنَى وَ اَشَابَ الصُّغَيْرِ وَ اَفْنَى الْكَبِيرِ * رَكَرُ الْغَدَاةِ وَ مَرُّ الْعِشْيِ হয়েছে। কবিতা اَشَابَ اَفْنَى وَ اَشَابَ الصُّغَيْرِ وَ اَفْنَى الْكَبِيرِ * (তথা رَكَرُ الْغَدَاةِ وَ مَرُّ الْعِشْيِ) এর দিকে হওয়া সত্ত্বেও মাজায় বলা যাচ্ছে না কবির ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে না জানার কারণে। অন্যদিকে দ্বিতীয় কবিতা جَذْبُ اللَّيَالِي اِبْطِئْ اَوْ اَسْرِعْ-এর মধ্যে মِيز-এর নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِي-এর দিকে مجاز হিসেবে হয়েছে। কেননা, এর দলিল এ কবির কবিতাতেই বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে পরবর্তী পঙ্ক্তি اَفْنَاهُ قَبِلَ اللّٰهُ পরবর্তী এ পঙ্ক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবি মু'মিন ছিলেন। অতএব, তার কবিতায় মِيز-এর নিসবত جَذْبُ اللَّيَالِي-এর দিকে মাজায় রূপেই হয়েছে।

وَأَقْسَامُهُ أَىْ أَقْسَامُ الْمَجَازِ الْعَقْلِيَّ بِإِعْتِبَارِ حَقِيقَةِ الطَّرْفَيْنِ وَمَجَازِيَّتِهِمَا
 أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ طَرَفَيْهِ وَهُمَا الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدُ إِمَّا حَقِيقَتَانِ لُغَوِيَّتَانِ نَحْوُ أَنْبَتِ
 الرَّبِيعِ الْبَقْلِ أَوْ مَجَازَانِ لُغَوِيَّتَانِ نَحْوُ أَحَى الْأَرْضِ شَبَابُ الزَّمَانِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِإِخْيَاءِ
 الْأَرْضِ تَهْيِجُ الْقُوَى النَّامِيَةِ فِيهَا وَإِحْدَاثُ نَضَارَتِهَا بِأَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ وَالْإِخْيَاءُ فِي
 الْحَقِيقَةِ إِعْطَاءُ الْحَيَوَةِ وَهِيَ صِفَةٌ تَقْتَضِي الْحِسَّ وَالْحَرَكَةَ وَكَذَا الْمُرَادُ بِشَبَابِ
 الزَّمَانِ إِزْدِيَادُ قُوَّتِهَا النَّامِيَةِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْحَيَوَانِ فِي زَمَانٍ
 يَكُونُ حَرَارَتُهُ الْعَرِيزِيَّةَ مُشْبُوْبَةً أَىْ قِيَّةً مُشْتَعِلَةً أَوْ مُخْتَلِفَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ
 الطَّرْفَيْنِ حَقِيقَةً وَالْآخَرُ مَجَازًا نَحْوُ أَنْبَتِ الْبَقْلِ شَبَابُ الزَّمَانِ فِيمَا الْمُسْنَدُ حَقِيقَةً
 وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَجَازٌ أَوْ أَحَى الْأَرْضِ الرَّبِيعُ فِي عَكْسِهِ وَوَجْهُ الْإِنْحِصَارِ فِي الْأَرْبَعَةِ
 عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الْمُسْنَدِ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا أَوْ مَا فِي
 مَعْنَاهُ فَيَكُونُ مُفْرَدًا وَكُلُّ مُفْرَدٍ مُسْتَعْمَلٍ إِمَّا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازً -

অনুবাদ : বাক্যের দুই প্রধান অংশ (মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ) প্রকৃতার্থে এবং রূপকার্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিবেচনায় عَقْلِيَّ-এর প্রকার চারটি। কেননা, এর (দু' প্রধান অংশ) তথা মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ হয়তো আভিধানিক অর্থে হাকীকী হবে। যেমন- أَنْبَتَ الرَّبِيعِ الْبَقْلِ অথবা উভয়টি আভিধানিক অর্থে রূপক হবে। যেমন- كُنْ أَحَى الْأَرْضِ شَبَابُ الزَّمَانِ কেননা, ভূমিকে জীবিত করার অর্থ হলো, ভূমির উর্বরাশক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ-এর মাধ্যমে এর শ্যামলতা-সজীবতা তৈরি করা। إِخْيَاءُ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জীবন-দান করা। এটাতো এমন বিশেষণ যা অনুভূতি এবং গতিময়তাকে চায়। এমনভাবে কালের যৌবন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ভূমির উর্বরাশক্তির মধ্যে প্রবৃদ্ধি ঘটা। আর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, কোনো প্রাণী তার জীবনের এমন সময়ে উপনীত হওয়া, যখন তার স্বভাবজাত উষ্ণতা শক্তিশালী এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে।

অথবা, পরস্পর বিপরীত হবে অর্থাৎ বাক্যের দু' প্রধান অংশের একটি হাকীকত অপরটি মাজায়। যেমন- أَحَى الْأَرْضِ الرَّبِيعُ (বসন্তকাল ভূমিকে জীবন দিয়েছে।) অথবা এর বিপরীত (অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ হাকীকত এবং মুসনাদ মাজায়)। মূল লেখকের মতানুসারে চার প্রকারে সীমাবদ্ধ করার বিষয়টি স্পষ্ট। কেননা, তিনি মুসনাদের জন্য ফে'ল অথবা ফে'লের অর্থবোধক শব্দকে শর্ত করেছেন। সুতরাং এটি মুফরাদ হবে। প্রত্যেক একক শব্দ হয়তো প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে অথবা রূপকার্থে ব্যবহৃত হবে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

مَجَازٍ এবং حَقِيقَةٍ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ (প্রকৃত অর্থে এবং রূপকার্থে ব্যবহার হওয়ার দিক থেকে مَجَازٍ চার প্রকার। এক. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ উভয়টি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন- কোনো তাওহীদ/বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল, أَنْبَتَ الرَّبِيعِ الْبَقْلُ এই উদাহরণে أَنْبَتَ শব্দটি তার প্রকৃত অর্থ (উৎপন্ন করা)-এর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এমনভাবে الرَّبِيعِ শব্দটিও প্রকৃত অর্থ (বসন্তকাল)-এর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

দুই. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ উভয়টি রূপকার্থে ব্যবহার হবে। যেমন কোনো তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল- أَحَى الْأَرْضَ شَبَابُ الزَّمَانِ এ উদাহরণে মুসনাদ হলো أَحَى যা তার প্রকৃতার্থে এখানে ব্যবহার হয়নি। কারণ, أَحَى-এর অর্থ হলো প্রাণ দান করা। প্রাণ তো এমন একটি বিষয় যা অনুভূতি, নড়াচড়া এবং গতিময়তা তৈরি করে। অর্থাৎ যার মধ্যে প্রাণ আছে সে নড়বে এবং তার অনুভূতি থাকবে। মাটি বা ভূমির ক্ষেত্রে এ অর্থের বাস্তবায়ন মোটেও সম্ভব নয়। ভূমির ক্ষেত্রে أَحَى-এর (রূপক) অর্থ হলো- ভূমির উর্বরশক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মানোর মাধ্যমে এতে শ্যামলতা দান করা। شَبَابُ الزَّمَانِ হলো মুসনাদ ইলাইহ, যা এখানে প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ شَبَاب-এর অর্থ যৌবন, যা প্রাণী জীবনের একটি বিশেষ কাল। যখন সে প্রাণীর জৈবিক চাহিদা সবচেয়ে বেশি হয় এবং তার উত্তেজনা বেশি থাকে। এখানে প্রকৃতার্থ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। এর রূপকার্থ হলো ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি।

তিন. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহের একটি প্রকৃতার্থে অপরটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হওয়া। যেমন- তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল- أَنْبَتَ الْبَقْلَ شَبَابُ الزَّمَانِ এ উদাহরণে মুসনাদ- أَنْبَات প্রকৃত অর্থ (উৎপাদন করা)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু شَبَابُ الزَّمَانِ মুসনাদ ইলাইহ রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

চার. মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতার্থে আর মুসনাদ রূপকার্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন- একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলল- أَحَى الْأَرْضَ الرِّينُوعُ এ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহ (বসন্তকাল) প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুসনাদ أَحَى (জীবনদান করা) প্রকৃতার্থে ব্যবহৃত হয়নি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ চার প্রকারে সীমাবদ্ধ করার কারণ তো স্পষ্ট। কেননা, মূল লেখকের মতে মুসনাদ হওয়ার জন্য فَعَلَ অথবা فَعِّلَ হওয়া জরুরি। আর এ শর্তের কারণে মুসনাদ অবশ্যই মুফরাদ হবে। আর মুসনাদ ইলাইহ তো আগে থেকে মুফরাদ বা একক (যা অন্যের সাথে যুক্ত হয়নি)। প্রত্যেকটি مفرد হয় প্রকৃত অর্থ ব্যবহৃত হবে অথবা ব্যবহৃত হবে না। দু'টির মধ্যে প্রকৃত অর্থ এবং রূপকার্থ হিসেবে মোট চার প্রকার হবে।

বি. দ্র. মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতার্থ এবং রূপকার্থ হিসেবে যেমন مجاز عقلى-এর মধ্যে চার প্রকার হয় তেমনি حَقِيقَةُ عَقْلِيَّة-এর মধ্যেও চার প্রকার হবে। উল্লিখিত مجاز عقلى-এর উদাহরণগুলোই حَقِيقَةُ عَقْلِيَّة-এর উদাহরণ হবে, যখন উদাহরণগুলোর মুতাকাল্লিম নাস্তিক হবে।

وَهُوَ أَى الْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِى الْقُرْآنِ كَثِيرٌ أَى كَثِيرٌ فِى نَفْسِهِ لَا بِإِلْضَافَةٍ إِلَى مُقَابِلِهِ حَتَّى يَكُونَ الْحَقِيقَةُ الْعَقْلِيَّةُ قَلِيلَةً وَتَقْدِيمُ "فِى الْقُرْآنِ" عَلَى "كَثِيرٌ" لِمُجَرَّدِ الْإِهْتِمَامِ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ أَى آيَاتُ اللَّهِ تَعَالَى زَادَتْهُمْ إِيمَانًا أَسْنَدَ الزِّيَادَةُ وَهِيَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْآيَاتِ لِيَكُونَهَا سَبَبًا لَهَا يُذَيِّعُ أَبْنَاءَهُمْ نُسَبَ التَّذْيِيعِ الَّذِى هُوَ فِعْلُ الْجَيْشِ إِلَى فِرْعَوْنَ لِأَنَّهُ سَبَبٌ أَمْرٌ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا نُسَبَ نَزْعِ اللَّبَاسِ عَنْ آدَمَ وَحَوَاءَ عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى إِبْلِيسَ لِأَنَّ سَبَبَهُ الْأَكْلُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَسَبَبُ الْأَكْلِ وَسَوَسْتُهُ وَمُقَاسَمَتُهُ إِيَّاهُمَا بِأَنَّهُ لَهُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ يَوْمًا نَصَبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ لِيَتَقَفَّوْنَ أَى كَيْفَ تَتَقَفَّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ بَقِيتُمْ عَلَى الْكُفْرِ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا نُسَبَ الْفِعْلُ إِلَى الزَّمَانِ وَهُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّتِهِ وَكَثْرَةِ الْهُمُومِ وَالْأَحْزَانِ فِيهِ لِأَنَّ الشَّيْبَ مِمَّا يَتَسَارَعُ عِنْدَ تَفَاقُمِ الشَّدَائِدِ وَالْمِحَنِ أَوْ عَنْ طُولِهِ لِأَنَّ الْأَطْفَالَ يَبْلُغُونَ فِيهِ أَوْ أَنَّ الشَّيْخُوخَةَ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا أَى مَا فِيهَا مِنَ الدَّفَائِنِ وَالْخَزَائِنِ نُسَبَ الْإِخْرَاجُ إِلَى مَكَانِهِ وَهُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً -

অনুবাদ : আর এটি অর্থাৎ مَجَازُ عَقْلِي পবিত্র কুরআন মাজীদে অনেক অর্থাৎ বাস্তব সংখ্যা বিবেচনায় প্রচুর। তার প্রতিপক্ষ (হাকীকতের) তুলনায় বেশি নয়। তাহলে তো হাকীকতে আকলিয়া কম হয়ে যায়। (তারকীবের মধ্যে) فِى الْقُرْآنِ অংশটিকে كَثِير-এর আগে আনা শুধুমাত্র (কুরআনের প্রতি) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।

১ম উদাহরণ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (যখন তাদের উপর আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করা হয়) وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ এই আয়াতসমূহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দেয়। এখানে زَادَ বা বৃদ্ধি করার কাজটি আয়াতের দিকে ইসনাদ করা হয়েছে; অথচ এটি আল্লাহর কাজ। অতএব, إِسْنَادٌ إِلَى مَا هُوَ لَهُ না হওয়ার কারণে এটা مَجَاز। কেননা, তা (বৃদ্ধি করা) কারণ বা সبব।

২য় উদাহরণ : يُذَيِّعُ أَبْنَاءَهُمْ (সে জবাই করে তাদের পুত্র সন্তানদের) এখানে জবাই করার কাজটিকে ফেরাউনের দিকে নিসবত করা হয়েছে, অথচ এটি তাঁর সেনাবাহিনীর কাজ। কেননা, সে হচ্ছে কার্যকারণ অর্থাৎ নির্দেশদাতা।

৩য় উদাহরণ : يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا অর্থাৎ সে তাদের থেকে তাদের পোশাক খুলে ফেলে। এখানে হযরত আদম হাওয়া (আ.) থেকে পোশাক খুলে ফেলার নিসবত ইবলিসের প্রতি করা হয়েছে। অথচ এটি আল্লাহ তা'আলার কাজ। কেননা, পোশাক খোলার কারণ হলো নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়া। আর খাওয়ার কারণ হলো তার (শয়তানের) প্ররোচনা, আর তাদের কাছে তার শপথ করা এই বলে যে, সে তাদের কল্যাণকামী। (يَوْمًا) يَكْفُفُ تَتَقَفَّوْنَ يَوْمًا মানসূব হয়েছে يَكْفُفُونَ-এর মفعول হিসেবে। পুরোবাক্য একরূপ হবে- كَيْفَ تَتَقَفَّوْنَ يَوْمًا (তোমরা কিয়ামতের দিবস থেকে কিভাবে বাঁচবে, যদি তোমরা কুফরির উপর

8. قَوْلُهُ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا অর্থঃ সেদিন থেকে কিভাবে বাঁচবে, যেদিন শিশুদের বৃদ্ধিতে পরিণত করবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, يَوْمًا তারকীবের মধ্যে تَتَّقُونَ-এর মাফউলে বিহী হিসেবে মানসূব হয়েছে। এটি يجعل-এর মাফউলে ফীহি নয়। মূল ইবরাত এরূপ হবে- كَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا إِنْ بَقِيَْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ - আয়াতের মধ্যে يجعل يجعل ফে'লের নিসবত করা হয়েছে সর্বনামের দিকে। সর্বনামের مرجع হলো يَوْمًا। সুতরাং ফে'লের নিসবত ফায়েল তথা আল্লাহর দিকে না হয়ে জমানার দিকে হয়েছে। এ কারণে এটি مَجَازِ عَقْلٍ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয়াতের মর্মার্থ : মুসান্নিফ (রা.) বলেন, সেদিন বাচ্চাদের বৃদ্ধ করে দেবে- এ কথার দ্বারা সেদিনের ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। সেদিন মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট হবে। আর ধারাবাহিক কষ্ট-মসিবতে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়। অথবা, এ কথার অর্থ হচ্ছে- সেদিনের দৈর্ঘ্য অনেক বেশি হবে। এত বেশি যে, এ সময়ের মধ্যে শিশুরাও বার্ধক্যে উপনীত হয়। এর প্রমাণ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- **وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ** অর্থাৎ তোমার প্রভুর নিকটের (পুনরুত্থানের পরবর্তী) দিনগুলো তোমাদের গণনার হিসেবে হাজার বছরের সমান।

৫. **قَوْلُهُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا** : অর্থাৎ জমিন তার মধ্যস্থ লোকগুলো এবং সঞ্চিত ধনভাণ্ডার বের করে দেবে। এ আয়াতে **أَخْرَجَتِ** ফে'লটির নিসবত জমিনের দিকে করা হয়েছে, যা তার প্রকৃত ফায়েল নয়; বরং প্রকৃত ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর জমিন হচ্ছে ফে'ল সংঘটিত হওয়ার স্থান। যেহেতু এখানে ফায়েলের দিকে নিসবত না করে ফে'লটিকে স্থানের দিকে নিসবত করা হয়েছে, তাই এটি **مَجَاز عَقْلِي**-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ পবিত্র কুরআনে অনেক রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

১. **وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا** এ আয়াতে **زَادَهُ**-এর নিসবত আল্লাহর দিকে না করে **آيَات**-এর দিকে করার কারণে **مَجَاز** হয়েছে।

২. **يُذِخُ أَبْنَاءَهُمْ** এ আয়াতে **فَرَعُونَ**-এর দিকে নিসবত **مَجَاز** রূপে করা হয়েছে।

৩. **يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا** এ আয়াতে পোশাক খোলার নিসবত শয়তানের দিকে **مَجَاز** রূপে করা হয়েছে।

وَعَبَّرَ مُخْتَصِرًا بِالْخَبَرِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَن تَسْمِيَتَهُ
بِالْمَجَازِ فِي الْإِثْبَاتِ وَإِرَادَهُ فِي أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ الْخَبَرَ يُؤْهِمُ اخْتِصَاصَهُ بِالْخَبَرِ
بَلْ يَجْرِي فِي الْإِنْشَاءِ نَحْوُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا فَإِنَّ الْبِنَاءَ فِعْلُ الْعَمَلَةِ وَهَامَانُ
سَبَبٌ أَمْرٌ وَكَذَا قَوْلُكَ فَلْيُنْبِتِ الرَّبِيعُ مَا شَاءَ وَلْيَصُمْ نَهَارُكَ وَلْيَجِدْ جِدُّكَ وَمَا أَشْبَهَ
ذَلِكَ مِمَّا أُسْنَدَ فِيهِ الْأَمْرُ أَوْ النَّهْيُ إِلَى مَا لَيْسَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ صُدُورُ الْفِعْلِ أَوْ التَّركِ
عَنْهُ وَكَذَا قَوْلُكَ لَيْتَ النَّهْرَ جَارٍ وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ -

অনুবাদ : আর বর্ণনামূলক বাক্যের সাথে খাস নয়। বাক্যটি **وَهُوَ كَثِيرٌ**-এর উপর আতফ হয়েছে।
তিনি **مَجَاز** (এর সাথে খাস নয়) এ কথাটি বলেছেন- এ কারণে যে, **مَجَاز**-কে (ইতঃপূর্বে) **فِي الْإِثْبَاتِ** করে
নামকরণ করা এবং এটিকে 'ইসনাদে খবরী'-এর অবস্থাসমূহের মধ্যে আনয়ন করা- খবর বা বর্ণনামূলক বাক্যের
সাথে খাস হওয়ার ধারণা জন্ম দেয়। বরং এটি 'ইনশা'বাক্যের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- **يَا هَامَانَ ابْنِ لِي**-
صَرْحًا (হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো।) নির্মাণ করা শ্রমিকদের কাজ। হামান হলো নির্দেশদাতা-
সবব। এমনিভাবে তোমার উক্তি **لْيُنْبِتِ الرَّبِيعُ مَا شَاءَ** এবং **لْيَصُمْ نَهَارُكَ** ইত্যাদি যার মধ্যে
আমর (আদেশসূচক বাক্য) অথবা নাহী (নিষেধসূচক বাক্য)-কে নিসবত করা হয় এমন জিনিসের প্রতি, যার
থেকে ফে'লটির বাস্তবায়ন বা ফে'লটির পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নয়। এমনিভাবে (মাজায় হয়েছে) **لَيْتَ النَّهْرَ جَارٍ** এবং
আল্লাহর বাণী **أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ**-এর মধ্যে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

উল্লিখিত ইবারতে বলা হয়েছে, **مَجَاز** শুধুমাত্র জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস নয়; বরং জুমলায়ে ইনশাইয়ার
মধ্যেও এর ব্যবহার প্রচুর। মূল লেখক পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা তার দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন।

وَهُوَ فِي غَيْرِ مُخْتَصِرٍ بِالْخَبَرِ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী বাক্য **قَوْلُهُ وَغَيْرِ مُخْتَصِرٍ بِالْخَبَرِ** মুসান্নিফ (র.) বলেন, **وَهُوَ**
وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصِرٍ بِالْخَبَرِ-এর উপর **عَطْف** হয়েছে। তাহলে এ বাক্যটির উহা ইবারত হবে এরূপ **وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصِرٍ بِالْخَبَرِ**
এখানে **مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ** ও **مَعْطُوفٌ** মিলে অর্থ হবে **مَجَاز** (এর ব্যবহার) কুরআনে অনেক এবং তা জুমলায়ে
খবরিয়ার সাথে খাস নয়।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এখানে এ কথাটি বঙ্গার প্রয়োজন এ কারণে দেখা দিয়েছে যে, অনেকে
مَجَاز-এর অপর নাম **الْإِثْبَاتِ** বলেছেন। আবার মূল লেখক **إِسْنَادُ خَبَرِي**-এর মধ্যে **مَجَاز**-এর উপর **عَطْف**
আলোচনা এনেছেন। এ দু'টি কারণে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, **مَجَاز** শুধুমাত্র জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস।

অতএব, মূল লেখক বয়ান করে দিলেন তা জুমলায়ে খবরিয়ার সাথে খাস নয়। এতে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ
থাকে না। এরপর তিনি 'ইনশা'-এর মধ্যে থেকে **مَجَاز**-এর উদাহরণ দিয়েছেন।

উদাহরণ : ১. **يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا** অর্থাৎ হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো। আয়াতে নির্মাণ করার
টিকে হামানের প্রতি নিসবত করা হয়েছে। কিন্তু **أَمْر** টি প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের প্রতি। কেননা, শ্রমিকরাই বাড়ি-প্রাসাদ
নির্মাণ করে। হামান (মন্ত্রী) বাড়ি-প্রাসাদ নির্মাণ করে না। যেহেতু হামান এখানে শ্রমিকদের নির্দেশদাতা বা সবব, তাই
হামানের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে **مَجَاز** ভাবে। এটি ইনশার উদাহরণ, কারণ **أَمْر** তথা আদেশসূচক বাক্য ইনশার
অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : ২. মূল লেখকের অনুসরণ করে মুসান্নিফ কয়েকটি ইনশার উদাহরণ দিয়েছেন। তার উদাহরণগুলো মূলত ইতঃপূর্বে বর্ণনামূলক বাক্যের مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণগুলোকেই ইনশা বানানো হয়েছে। যেমন- لَيْسَ مِنَ الرِّبْعِ مَاشَاءَ- (যেমন- لَيْسَ مِنَ الرِّبْعِ مَاشَاءَ)-এর দিকে না করে سَبَب (الربيع)-এর দিকে করা হয়েছে। এমনিভাবে لَيْسَ مِنْ نَهَارِكَ-এর মধ্যে 'আমর'-এর নিসবত প্রকৃত ফায়েল (ব্যক্তি)-এর দিকে না করে সময়ের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

وَلَيْجِدَ جِدْكَ এ উদাহরণের মধ্যে 'আমর'-এর নিসবত প্রকৃত ফায়েল (ব্যক্তি)-এর দিকে না করে মাসদারের দিকে করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে (আমর) আদেশসূচক বাক্য ইনশার প্রকার। অতএব, এসবই এমন ইনশার উদাহরণ যার মধ্যে مَجَاز عَقْلِي পাওয়া যায়।

ترك-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ : لَا يَنْقُصُ لَيْلُكَ অর্থাৎ তোমার রাত যেন না দাঁড়ায়। نَهَى অর্থ- ترك-এর মধ্যে চাওয়া। এখানে কিয়াম বা রাত জাগরণ না করাকে চাওয়া হচ্ছে রাত থেকে। অথচ রাতের পক্ষে উক্ত কাজ করা সম্ভব নয়। বরং এর ফায়েল ব্যক্তি। এখানে ব্যক্তির দিকে নিসবত না করে রাতের দিকে নিসবত করা হচ্ছে, তাই এটি مَجَاز عَقْلِي হবে।

تمنى-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ- تمنى-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ- أَيْهَا! نَدَى يَدِي إِذَا جَارَ অর্থ- আহা! নদী যদি প্রবাহিত হতো। এখানে নদী প্রবাহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে। অথচ নদী প্রবাহিত হয় না, নদীর পানি প্রবাহিত হয়।

استفهام-এর মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ : أَصَلُّوْكَ تَأْمُرُكَ অর্থাৎ তোমার নামাজ কি তোমাকে আদেশ করে? এখানে প্রশ্নযুক্ত ফে'ল (تَأْمُرُ)-এর নিসবত- নামাজের দিকে করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতার্থে এর নিসবত হবে আল্লাহ তা'আলার দিকে। যেহেতু مَا هُوَ-এর দিকে নিসবত হয়নি, তাই এটি مَجَاز عَقْلِي-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, تمنى (নিষেধসূচক বাক্য), استفهام (আকাঙ্ক্ষাসূচক বাক্য) এবং استفهام (প্রশ্নবোধক বাক্য) সবই ইনশার উদাহরণ। তাই এ সবই ইনশার মধ্যে مَجَاز عَقْلِي-এর উদাহরণ রূপে গণ্য হবে।

বি. দ্র. মুসান্নিফ (র.) ইনশার প্রকার- استفهام-এর যে উদাহরণ দিয়েছেন, এটিকে مَجَاز عَقْلِي-এর অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। কারণ এটি হযরত হযরত শূয়াইব (আ.)-কে লক্ষ্য করে তৎকালীন কাফিররা বলেছিল।

কাফিরদের উক্ত উক্তি তাদের ধারণা মতে إِسْنَادٌ إِلَى مَا هُوَ-এর দিকেই হয়েছে, তাই এটি مَجَاز عَقْلِي না হয়ে حَقِيقَةُ عَقْلِي-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي জুমলায়ে খবরিয়্যাহ-এর সাথে খাস নয়; বরং খবরিয়্যাহের মতো ইনশা-এর মধ্যে مَجَاز ব্যবহার হয়। যেমন- يَا هَامَانُ ابْنُ لِي صَرَحًا এ আয়াতে হামানের দিকে صَرَحًا-এর নিসবত করা হয়েছে রূপকভাবে। কারণ, নির্মাণকারী হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকগণ।

وَلَا بُدَّ لَهُ أَى لِمَجَازِ الْعَقْلِ مِنْ قَرْنَةٍ صَارِفَةٍ عَنْ إِرَادَةِ ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْمَتَبَادِرَ إِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْقَرْنَةِ هُوَ الْحَقِيقَةُ لَفْظِيَّةٌ كَمَا مَرَّ فِى قَوْلِ أَبِي النَّجْمِ مِنْ قَوْلِهِ أَفْنَاهُ قِيلَ اللَّهُ أَوْ مَعْنَوِيَّةٌ كَاسْتِحَالَةِ قِيَامِ الْمُسْنَدِ بِالْمَذْكُورِ أَى بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمَذْكُورِ مَعَ الْمُسْنَدِ عَقْلًا أَى مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ يَعْْنَى يَكُونُ بِحَيْثُ لَا يَدْعَى أَحَدٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْمُبْطِلِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ قِيَامُهُ بِهِ لِأَنَّ الْعَقْلَ إِذَا خَلَّى وَنَفْسَهُ يَعُدُّهُ مُحَالًا كَقَوْلِكَ مَحَبَّتُكَ جَاءَتْ بِى إِلَيْكَ لِيُظْهِرَ اسْتِحَالَةَ قِيَامِ الْمَجْنُونِ بِالْمَحَبَّةِ أَوْ عَادَةً أَى مِنْ جِهَةِ الْعَادَةِ نَحْوُ هَزَمِ الْأَمِيرِ الْجُنْدَ لِاسْتِحَالَةِ قِيَامِ هَزَمِ الْجُنْدِ بِالْأَمِيرِ وَحْدَهُ عَادَةً وَإِنْ كَانَ مُمَكِّنًا عَقْلًا وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بِهِ لِيَعْمَ الصُّدُورَ عَنْهُ مِثْلَ ضَرْبٍ وَهَزَمٍ وَغَيْرَةٍ كَقُرْبٍ وَبُعْدٍ وَصُدُورٍ عَطْفٌ عَلَى اسْتِحَالَةِ أَى أَوْ كَصُدُورِ الْكَلَامِ عَنِ الْمَوْجِدِ مِثْلُ أَشَابَ الصَّغِيرَ الْبَيْتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَرْنَةً مَعْنَوِيَّةً عَلَى أَنَّ إِسْنَادَ أَشَابَ وَأَفْنَى إِلَى كَرِّ الْغَدَاةِ وَمَرِّ الْعَيْشِ مَجَازٌ لَا يُقَالُ هَذَا دَاخِلٌ فِى الْإِسْتِحَالَةِ لِأَنَّ نَقُولَ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ ذَوَى الْعُقُولِ وَاجْتَنَبْنَا فِى إِبْطَالِهِ إِلَى دَلِيلٍ -

অনুবাদ : এবং مَجَازِ عَقْلِي-এর জন্য করীনা থাকা জরুরি, যা বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করতে বাধা দেয়। কেননা, করীনার অনুপস্থিতিতে বিবেক মতে হাকীকত হওয়াটাই স্বাভাবিক। (সেই দলিলটি) শব্দগত হবে- যেমন ইতঃপূর্বে আবুন নাজমের কবিতায় لِلَّهِ أَفْنَاهُ হয়েছে। অথবা অর্থগত হবে। যেমন- মুসনাদ উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের দ্বারা বাস্তবায়ন অসম্ভব। (এ অসম্ভবতা) বিবেকের দৃষ্টিতে অর্থাৎ এমন হওয়া যে, হকপন্থি কিংবা বাতিলপন্থি কেউ মুসনাদটি উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলে দাবি করেন না। কেননা, এতে বিবেককে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে সে তাকে অসম্ভব মনে করে। যেমন- تُؤْمِنُ بِلِلَّةٍ, তোমার ভালোবাসা আমাকে তোমার দ্বারে নিয়ে এসেছে। (এটি মাজায) কারণ, আগমন করার বিষয়টি ভালোবাসা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অসম্ভবতা সুস্পষ্ট হওয়াতে। অথবা (অসম্ভব হবে) স্বভাবত। অর্থাৎ সাধারণ অভ্যাস মতে (এটি অসম্ভব) যেমন- আমির একাই (শত্রুপক্ষের) সেনাবাহিনী পরাস্ত করেছে। (এটি মাজায) সেনাবাহিনীর পরাজয় আমিরের একার দ্বারা সংঘটিত হওয়া স্বভাবত অসম্ভব হওয়ার কারণে। যদিও যুক্তিগতভাবে এটি সম্ভব। তিনি তার দ্বারা কায়ম হওয়ার কথা বলেছেন, যাতে মুসনাদ ইলাইহ থেকে প্রকাশিত ফে'লকে शामिल করে। যেমন- هَزَمَ ও ضَرَبَ (মুসনাদ ইলাইহ থেকে প্রকাশিত হওয়া) এবং ভিন্ন ফে'লকে शामिल করে। যেমন- قُرِبَ ও بُعِدَ তার প্রকাশ পাওয়া (দলিল হবে মাজাযের জন্য) صُدُورٍ এটি আত্মফ হয়েছে اسْتِحَالَةِ-এর উপর। অথবা বাক্যটি প্রকাশ পাওয়া তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে। যেমন- أَشَابَ الصَّغِيرَ থেকে নিয়ে সম্পূর্ণ কবিতা (একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তির কথা) অর্থগত দলিল হবে যে, أَفْنَى এবং كَرُّ الْغَدَاةِ-এর ইসনাদ এবং مَرَّ الْعَيْشِ-এর দিকে হওয়াটা মাজায। এ কথা বলে আপত্তি তোলা যাবে না যে, এটি অসম্ভবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ মু'মিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।) কেননা, (এর উত্তরে) আমরা বলি, এই বক্তব্য আমরা মানি না। আর কিভাবেই বা এ বক্তব্য (মু'মিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব) সমর্থন করা যায়? কেননা, অনেক (বিশ্বাসী) জ্ঞানী লোকেরা এ জাতীয় কথা বলেছেন এবং আমরা তাদের বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি।

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ لَهُ أَيْ لِلْمَجَازِ الْخ : উল্লিখিত ইবারতে মাজায়ে আকলীর দলিলের প্রয়োজনীয়তা এবং দলিলের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত তিনি বলেন, مَجَازٌ عَقْلِيٌّ এর জন্য এমন একটি করীনা থাকা আবশ্যিক, যা বাক্যের যাহেরী অর্থ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। কেননা, সে রকম কোনো قَرِينَةٌ না থাকলে যাহেরী অর্থকেই হাকীকত বলে ধরে নেওয়া হয়।

তিনি বলেন, قَرِينَةٌ প্রথমত দু' প্রকার। ক. لَفْظِيَّةٌ বা শব্দগত। খ. مَعْنَوِيَّةٌ বা অর্থগত।

قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ-এর উদাহরণ : আবু নাজমের কবিতার পঙ্ক্তি-جَذَبَ اللَّيَالِي إِنْطِي * مِيزَ عَنْهُ قُنُزًا عَنْ قُنُزٍ এর জন্য এমন একটি করীনা থাকা আবশ্যিক, এ পঙ্ক্তিটিতে مِيزَ-এর নিসবত اللَّيَالِي-এর দিকে যে মাজায়রূপে হয়েছে, এর শব্দগত দলিল হলো কবির পরবর্তী উক্তি قِيلَ اللَّهُ পরবর্তী উক্তিটি কবির একত্ববাদী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি প্রথম পঙ্ক্তিটিতে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য করেননি।

قَرِينَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ কয়েকভাবে হতে পারে- ক. মুসনাদের যাহেরী নিসবত মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্তির নিরিখে অসম্ভব হওয়া। খ. উল্লিখিত নিসবত স্বভাবগতভাবে অসম্ভব হওয়া। গ. একত্ববাদে বিশ্বাসী থেকে এ ধরনের নিসবত হওয়া।

قَرِينَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ-এর প্রথম প্রকার : অর্থাৎ মুসনাদের যাহেরী নিসবত মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্তির আলোকে অসম্ভব। এ কথার ব্যাক্যা এই যে, হকপস্থি তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং নাস্তিক/নিরশ্বরবাদী কেউই মুসনাদ ইলাইহের সাথে মুসনাদের সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি মেনে নেন না। এর কারণ হচ্ছে, যদি উক্ত নিসবতটির বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে দেওয়া হয়, তাহলে বিবেক একে অসম্ভব মনে করে। যেমন- (কেউ বলল) مَحَبَّتُكَ جَاءَتْ بِئِي إِلَيْكَ অর্থাৎ তোমার ভালোবাসা আমাকে তোমার কাছে এনেছে। এ বাক্যে মুসনাদ হলো جَاءَتْ (ফে'ল) আর মুসনাদ ইলাইহ হলো مَحَبَّتُكَ। এ মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহ (مَحَبَّتُ)-এর সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। কোনো ব্যক্তিই এ কথা বলেন না যে, مَحَبَّتُكَ দ্বারা 'আনয়ন'-এর কাজটি সংঘটিত হওয়া সম্ভব। আর এই অসম্ভবতাই প্রমাণ করে যে, আনয়নের নিসবত 'মহব্বত'-এর দিকে হাকীকী হয়নি; বরং মাজায় হয়েছে। হাকীকী নিসবতটি এরূপ-نَفْسِي جَاءَتْ بِئِي إِلَيْكَ لِأَجْلِ-আমার মন তোমার ভালোবাসার কারণে তোমার কাছে আমাকে এনেছে।

قَرِينَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ-এর ২য় প্রকার : মুসনাদের প্রকাশ্য নিসবত মুসনাদ ইলাইহের সাথে হওয়া স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। যেমন- هَزَمَ الْأَمِيرُ الْجُنْدَ-সেনাপ্রধান প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেছে। এ বাক্যে هَزَمَ হলো মুসনাদ এবং মুসনাদ ইলাইহ হলো الْأَمِيرُ যুক্তির আলোকে যদিও আমিরের একার পক্ষে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা সম্ভব; কিন্তু সাধারণ রেওয়াজ অনুযায়ী তা অসম্ভব। কেননা, একার পক্ষে শতশত মানুষকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই অসম্ভব হওয়াটা দলিল হবে যে, বাক্যের প্রকাশ্য ইসনাদ এখানে উদ্দেশ্য নয়। হাকীকী ইসনাদ হয়েছে আমিরের সেনাবাহিনীর দিকে। অর্থাৎ তারা শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে, আমিরের নির্দেশে কিংবা আমিরের নেতৃত্বে হওয়ার কারণে আমিরের প্রতি মَجَاز হিসেবে নিসবত করা হয়েছে।

قِيَامُ الْمُسْنَدِ بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ : মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখক قِيَامُهُ بِهِ বলেছেন অর্থাৎ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَ قِيَامُهُ بِهِ তার এভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো ঐ মুসনাদকে शामिल করা, যা মুসনাদ ইলাইহ থেকে বের হয় বা প্রকাশ পায় এবং যা প্রকাশ পায় না।

১ম প্রকারের উদাহরণ হলো-هَزَمَ وَضَرَبَ মারল এবং পরাজিত করল।

هَزَمَ এবং هَضَبَ মুসনাদ ইলাইহ তথা ফায়েল থেকে প্রকাশ পায় :

২য় প্রকারের উদাহরণ হলো-بَعُدَ وَ قُرِبَ নিকটবর্তী হলো এবং দূরবর্তী হলো, এ দু'টি ফে'ল বা মুসনাদ মুসনাদ ইলাইহ বা ফায়েল থেকে বের হয় না; কিন্তু এ দু'টি ফে'ল তার মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্ত হয় এবং কায়ম হয় মোটকথা, উভয় প্রকারকে शामिल করার জন্য মুসান্নিফ (র.) قِيَامُهُ بِهِ বলেছেন।

معنوی দলিলের ৩য় প্রকার : মুসান্নিফ বলেন, صدره-এর আতফ হয়েছে استحالة-এর উপর, তাহলে معطوف এবং مَعْطُوف عَلَيْهِ মিলে বাক্যটি এরূপ হবে كَصُدُورِهِ عَنِ الْمَوْجِدِ الْخ অর্থাৎ অথবা করীনাটি অর্থগত হবে, যেমন- বাক্যটি একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পাওয়া। সারকথা হলো معنوی দলিলের এক প্রকার হলো বাক্যটি একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পাওয়া, যে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই مؤثر حقیقی মনে করে এবং যাহিরী কারণকে مؤثر মনে করে না। যেমন- কোনো মু'মিন বলল أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَنْتَى الْكَبِيرَ كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعِشِيِّ (অর্থঃ মু'মিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব) কেননা আমরা বলবো আমরা এটি সমর্থ করি না, আর কিভাবেই বা একথা সমর্থন করা যায়, অথচ অনেক (মু'মিন) জ্ঞানী লোকেরা এ ধরনের কথা বলেছেন এবং আমরা এগুলোকে বাতিল করার জন্য দলিল উপস্থাপন করছি।

أَشَابَ الْخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, প্রশ্নটি হলো أَشَابَ الصَّغِيرَ এ জাতীয় উদাহরণ যুক্তির বিচারে একত্ববাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের থেকে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব, তাই এটি যুক্তির বিচারে অসম্ভব সেই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এটিকে যুক্তির বিচারে অসম্ভব-এর প্রকারে না এনে পৃথকভাবে কেন আনা হলো?

এর উত্তর হচ্ছে, أَشَابَ الصَّغِيرَ ইত্যাদি বাক্য মু'মিন থেকে প্রকাশ পাওয়া আমরা অসম্ভব মনে করি না। কেননা, যুক্তির বিচারে অসম্ভব বলা হয় এমন বিষয়কে, যাকে জ্ঞান বা বিবেক অসম্ভব মনে করে এবং জ্ঞানী লোকেরা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে অসম্ভব মনে করে, তা ছাড়া আন্তিক বা নাস্তিক কেউই তার সম্ভাব্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণটি সেরকম নয়; বরং অনেক জ্ঞানী লোকেরা মনে করে যে, শিশু বৃদ্ধ হওয়া এবং বৃদ্ধ মারা যাওয়া কালের আবর্তনের কারণে হয়। আল্লাহ তা'আলা এরূপ করেন না। তারা সংখ্যায় এত যে, তাদের মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য আমরা দলিল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী, তাই দলিল প্রমাণ বের করতে আমরা সচেষ্টও হয়েছি। অতএব, এ ধরনের উদাহরণকে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের একদল লোক অসম্ভব না মনে করা এবং তাদের মতবাদ বাতিল করার মুখাপেক্ষী হওয়া এ কথা প্রমাণ করে যে, এটি যুক্তির বিচারে অসম্ভব নয়। সুতরাং এটিকে যুক্তির বিচারে অসম্ভবের প্রকারে না ফেলে পৃথক আনাটা সঠিক সিদ্ধান্ত মোতাবেকই হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَاز عَقْلِي-এর জন্য এমন একটি করীনা থাকা আবশ্যিক যা তার যাহিরী অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের করীনা প্রথমত দু' ধরনের لَفْظِيَّة ও مَعْنَوِيَّة।

قَرِينَةٌ مَعْنَوِيَّة আবার দু'ভাবে হতে পারে। (এক) যুক্তির বিচারে মুসনাদ তার মুসনাদ ইলাইহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হওয়া। যেমন- مَحَبَّتُكَ جَاءَتْ بِنِي إِلَيْكَ (দুই) মুসনাদ তার মুসনাদ ইলাইহের সাথে স্বভাবগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব হওয়া। যেমন- فَرَمَ الْأَمِيرُ الْجُنْدَ

وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَتِهِ يَغْنِيَنَّ أَنْ الْفِعْلَ فِي الْمَجَازِ الْعَقْلِيَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعِلٌ أَوْ
مَفْعُولٌ بِهِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ يَكُونُ الْإِسْنَادُ حَقِيقَةً فَمَعْرِفَةُ فَاعِلِهِ أَوْ مَفْعُولِهِ الَّذِي إِذَا
أُسْنِدَ إِلَيْهِ يَكُونُ الْإِسْنَادُ حَقِيقَةً إِمَّا ظَاهِرَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا رَيْحَتْ تِجَارَتُهُمْ
أَيَّ فَمَا رَيْحُوا فِي تِجَارَتِهِمْ وَإِمَّا خَفِيَّةً لَا تَظْهَرُ إِلَّا بَعْدَ نَظَرٍ وَتَأْمُلٍ كَمَا فِي قَوْلِكَ
سَرَّنِي رُؤْيَتَكَ أَيَّ سَرَّنِيَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ رُؤْيَتِكَ وَقَوْلُهُ شَعَّرَ يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا إِذَا
مَا زِدْتَهُ نَظْرًا أَيَّ يَزِيدُكَ اللَّهُ حُسْنًا فِي وَجْهِهِ لِمَا أَوْدَعَهُ مِنْ دَقَائِقِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ
يَظْهَرُ بَعْدَ التَّأْمُلِ وَالْإِمْعَانِ -

অনুবাদ : এবং তার (মাজারের) হাকীকতের পরিচয়। অর্থাৎ মাজায়ে আকলীর মধ্যে ফে'লের ফায়েল অথবা
মাফউলে বিহী হওয়া জরুরি। যখন তার দিকে ইসনাদ হবে, ইসনাদটি হাকীকত হবে। সুতরাং তার ফায়েল এবং
মাফউলের যার দিকে ইসনাদ করা হয়েছে- ইসনাদ হবে তখন হাকীকী। সেটার পরিচয় হয়তো প্রকাশ্য হবে,
যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- **فَمَا رَيْحَتْ تِجَارَتُهُمْ** (এর হাকীকী ফায়েল হলো **تجارة**-এর **إليه** সে
মতে বাক্যটি হবে এরূপ) **فَمَا رَيْحُوا فِي تِجَارَتِهِمْ** অর্থ বা পরিচয় অস্পষ্ট হবে অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া প্রকাশ
পায় না। যেমন- তোমার উক্তি **سَرَّنِي رُؤْيَتَكَ** অর্থাৎ তোমার সাক্ষাৎ আমাকে উৎফুল্ল করেছে অর্থাৎ আল্লাহ
তা'আলা আমাকে তোমার সাক্ষাতের সময় উৎফুল্ল করেছেন এবং কবিতার চরণ : তার চেহারা তোমার মাঝে
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, যখন তুমি তার প্রতি অধিক পরিমাণে দৃষ্টিপাত করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার
চেহারার মাঝে তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করুন, কেননা তার চেহারাতে আল্লাহ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও কমনীয়তা লুক্কায়িত
রেখেছেন সেটা প্রকাশ পায় চিন্তা ও গভীর দৃষ্টির পর।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةُ حَقِيقَتِهِ : মূল লেখক বলেন, **مَجَازِ عَقْلِي**-এর পরিচয় জানা সহজ হবে অথবা হবে
না। অর্থাৎ **مَجَازِ عَقْلِي**-এর ফে'ল অথবা **مَعْنَى فِعْلٍ**-এর ইসনাদ যদিও **هُوَ** -এর দিকে হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ
ফেল অথবা **مَعْنَى فِعْلٍ**-এর জন্য একটি **مَا هُوَ** অর্থাৎ এমন এক **فاعل** অথবা **مَفْعُولٌ بِهِ** হওয়া প্রয়োজন যার দিকে
ইসনাদ করা হলে ইসনাদটি হাকীকত হয়। সুতরাং যেই **فاعل** অথবা **مَفْعُولٌ بِهِ**-এর দিকে ইসনাদ করাটা হাকীকী ইসনাদ
হয় ঐ **فاعل** অথবা **مَفْعُولٌ بِهِ**-এর পরিচয়টি শ্রোতার কাছে হয়তো স্পষ্ট হবে অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বুঝা যাবে অথবা
অস্পষ্ট হবে- যা চিন্তা-ভাবনা করার পর প্রতিভাত হয়। আর অস্পষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, ফে'লের নিসবত (ব্যবহার)
কখনো মাজাযী ফায়েল অথবা মাফউলের দিকে বেশি হয় এবং হাকীকী ফায়েল অথবা মাফউলের প্রতি ইসনাদ প্রায় লোপ
পেয়ে যায়। এ কারণেই পাঠকের ধারণা হাকীকতের দিকে যায় না এবং হাকীকতের পরিচয় লাভ করার জন্য চিন্তা-ভাবনার
আশ্রয় নিতে হয়।

হাকীকতের পরিচয় স্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ : যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- **فَمَا رَيْحَتْ تِجَارَتُهُمْ**। এর অর্থ
হচ্ছে- **فَمَا رَيْحُوا فِي تِجَارَتِهِمْ** তারা তাদের ব্যবসায় লাভবান হয়নি। ব্যবসা মুনাফা পাওয়ার সবব বা কারণ। এ কারণে
বিস্তারিত-এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা লাভকারী হলো ব্যবসায়ীরা। আর তা সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট

হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরবি ভাষাভাষীদের পরিভাষা এরূপ যে, তারা তাদের মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এরূপ বলে থাকে 'ব্যবসায়ী ব্যবসাতে মুনাফা অর্জন করেছে' তখন তারা ব্যবসার প্রতি লাভবান হওয়ার বিষয়টি নিসবত করে না। সুতরাং এদের এ পরিভাষা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, এ আয়াতটিতে إِسْنَادٌ مَّجَازِي হয়েছে।

অথবা, হাকীকী ফায়েল অথবা মাফউলের পরিচয় স্পষ্ট থাকে না। অথবা, এমন যা চিন্তা-ভাবনার পর হাসিল হয়। যেমন-سَرَرْتَنِي رُؤْيَاكَ তোমার সাক্ষাৎ আমাকে আনন্দিত করেছে। এ বাক্যে سَرَت ফে'লের নিসবত رُؤْيَاكَ-এর দিকে মাজায় হিসেবে হয়েছে। কেননা, আনন্দ দানের হাকীকী ফায়েল হলো আল্লাহ। তখন বাক্যটি এরূপ হবে سَرَرَنِي اللَّهُ عِنْدَ رُؤْيَاكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আনন্দিত করেছেন তোমার সাক্ষাতের সময়। এ মতে رُؤْيَا হলো ظَرْفُ زَمَانٍ বা আনন্দ লাভ করার কাল। আমরা জানি, ফে'লের নিসবত যদি তার ফায়েলের দিক না করে কাল বা সময়ের দিকে করা হয় তখন এটি মাজায় হয়। সুতরাং رُؤْيَا এখানে ফায়েলে মাজায়ী। উদাহরণটিতে ফায়েলে হাকীকী স্পষ্ট নয়। কারণ, হাকীকী ফায়েলের দিকে নিসবত করে ভাষাভাষীদের ব্যবহার পাওয়া যায় না। তারা মাজায়টিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যেন এর হাকীকী ফায়েলই নেই। আর এ কারণেই পাঠক ও শ্রোতাদের কারো মন হাকীকী ফায়েল-এর প্রতি যায় না। ফলে এর হাকীকী ফায়েলের পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যায়।

এ ধরনের আরো একটি উদাহরণ হলো-إِذَا مَا زِدْتَهُ نَظْرًا অর্থাৎ তোমার নিকটতার চেহারা সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে তুমি যত বেশি তাকে দেখবে। অর্থাৎ তুমি গভীরভাবে যত বেশি তাকে দেখবে তোমার কাছে তার চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

কবিতার রচয়িতা কে? এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়। ঈযাহ গ্রন্থের লেখকের মতে, এটি আবু নুওয়াসের কবিতা। আর আল্লামা তাফতযানীর মতে, এটি ইবনুল মুআয্যালের কবিতা। কেউ কেউ এ দু'টি মতকে সমন্বিত করে বলেন, আবু নুওয়াস হলো ইবনুল মুআয্যালের উপনাম। এ ব্যাখ্যানুসারে তারা দুই ব্যক্তি নয়; বরং একই ব্যক্তি। তবে সমন্বয় সাধনের এ অভিমত সঠিক নয়; বরং ঈযাহের অভিমতই সঠিক। অতএব, মতানৈক্য আর রইল না। এ কবিতাটিতে হাকীকী ফায়েলের পরিচয় স্পষ্ট নয়; এর কারণ তাই যা আমরা سَرَرْتَنِي رُؤْيَاكَ-এর মধ্যে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ সাধারণ ব্যবহারে এর হাকীকতকে উদ্দেশ্য করা হয় না এবং হাকীকতের প্রতি ইসনাদ করে ফে'লকে ব্যবহার করা হয় না।

وَفِي هَذَا تَعْرِضُ بِالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ وَرَدُّ عَلَيْهِ حَيْثُ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي الْمَجَازِ الْعَقْلِي أَنْ يَكُونَ لِلْفِعْلِ فَاعِلٌ يَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ لِسَرْتَنِي فِي سَرَّتَنِي رُؤْيُكَ وَلِيَزِيدُكَ فِي يَزِيدُكَ وَجْهَهُ حُسْنًا فَاعِلٌ يَكُونُ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ حَقِيقَةً وَكَذَا أَقْدَمَنِي بِلَدِّكَ حَقٌّ لِي عَلَى فَلَانٍ بَلِ الْمَوْجُودُ هُنَا هُوَ السُّرُورُ وَالزِّيَادَةُ وَالْقُدُومُ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَخَرُ الدِّينِ الرَّازِيُّ بِأَنَّ الْفِعْلَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَاعِلٌ حَقِيقَةً لِامْتِنَاعِ صُدُورِ الْفِعْلِ لَا عَنْ فَاعِلٍ فَهُوَ إِنْ كَانَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ فَلَا مَجَازَ وَإِلَّا فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ وَزَعَمَ صَاحِبُ الْمِفْتَاحِ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْإِمَامِ حَقٌّ وَإِنَّ فَاعِلَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّ الشَّيْخَ لَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهَا لِخَفَائِهَا فَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ وَظَنَّى أَنَّ هَذَا تَكْلُفٌ وَالْحَقُّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ -

অনুবাদ : এতে শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এবং তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, তিনি মনে করেন *مَجَاز عَقْلِي*-এর মধ্যে ফে'লের জন্য এমন কোনো ফায়েলের দরকার নেই। যার প্রতি ফে'লের ইসনাদটি হাকীকী হবে। তিনি বলেন, *سَرَّتَنِي*-এর মধ্যে *رُؤْيُكَ*-এর জন্য আর *يَزِيدُكَ*-এর মধ্যে *وَجْهَهُ حُسْنًا*-এর মধ্যে *يَزِيدُكَ*-এর জন্য কোনো ফায়েল নেই, যার প্রতি ফে'লের ইসনাদটি হাকীকী হয়েছে। ঠিক এরূপই হলো *أَقْدَمَنِي بِلَدِّكَ حَقٌّ لِي عَلَى فَلَانٍ* (এতে কোনো হাকীকী ফায়েল নেই) বরং এখানে ফে'লগুলো হলো আনন্দ পাওয়া, বেশি হওয়া এবং আগমন করা (অর্থাৎ এগুলো হলো ফে'লে লাযেম, ফে'লে মুতা'আদী নয়)। ইমাম ফখরুদ্দীন রায়ী (র.) তাঁর উপর আপত্তি করে বলেন, ফে'লের জন্য অবশ্যই প্রকৃত ফায়েলের প্রয়োজন, ফায়েল ছাড়া ফে'ল সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ফায়েলটি যদি এমন বস্তু হয় যার প্রতি ফে'লের নিসবত করা হয়েছে তাহলে তো তা *مَجَاز* হলো না, অন্যথায় *فاعل*-কে উহা মানা সম্ভব। মিফতাহ গ্রন্থের লেখক (আল্লামা ইউসুফ সাক্বাকী) বলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রায়ীর মতামত সঠিক এবং এসব ফে'লের ফায়েল হলেন আল্লাহ। আর শায়খ বিষয়টির মূলতত্ত্ব অনুধাবন করেননি। অতএব, তার (সাক্বাকীর) অনুসরণ করলেন মূল লেখক। আমার মতে, এসবই হলো এক ধরনের অতিরঞ্জন। শায়েখ (আব্দুল কাহির) যা উল্লেখ করেছেন তা-ই সঠিক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مَعْرِفَةٌ حَقِيقَةً إِنَّمَا ظَاهِرَةٌ أَمَّا : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের ইবারত *وَفِي هَذَا تَعْرِضُ بِالشَّيْخِ* এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মূল লেখক এ ইবারত দ্বারা শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মাযহাবের প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং তার মাযহাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মূল লেখকের দাবি হলো, *مَجَاز عَقْلِي*-এর মধ্যে ফে'লের জন্য ফায়েলে হাকীকী থাকা জরুরি। চাই সে ফায়েলের পরিচয় প্রকাশ্য হোক অথবা অস্পষ্ট হোক। আর শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মত হলো, *مَجَاز عَقْلِي*-এর মধ্যে ফে'লের জন্য বাস্তবে ফায়েলে হাকীকী এবং *مَا هُوَ لَهُ* থাকা অত্যাবশ্যক নয়।

তাদের মতবিরোধকৃত বিষয়টি হচ্ছে, *مَجَاز عَقْلِي* হওয়ার জন্যে শর্ত হলো তার ফে'লের (মুসনাদের) জন্য বাস্তবিক একটি ফায়েল থাকা, যার প্রতি ফে'লের ইসনাদ করা হয়েছে, মাজাহ হওয়ার আগে *عرف* হিসেবে অথবা ব্যবহার হিসেবে। অথবা এ ধরনের কোনো শর্ত মাজাহের নেই।

মিফতাহের লেখক আল্লামা সাক্কাকী এবং তালখীসের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ আবু আব্দুল্লাহ কাযবিনীর কাছে মাজায হওয়ার এরূপ শর্ত রয়েছে। আর আল্লামা শায়খ আব্দুল কাহিরের মতে, এরূপ শর্ত অত্যাৱশ্যকীয় নয়। তাঁর মতে سَرْتَنِي-এর মধ্যে سَرْتَنِي-এর জন্য এবং وَجْهَهُ حُسْنًا-এর মধ্যে يَزِيدُكَ-এর জন্য সাধারণের কাছে এবং ব্যবহারিকভাবে এমন কোনো ফায়েল নেই, যার প্রতি ইসনাদটি হাকীকী হয়। এমনভাবে أَقْدَمَنِي بَلَدَكَ حَقٌّ لِي عَلَى-এর মধ্যে أَقْدَمَنِي-এর জন্য এমন কোনো হাকীকী ফায়েল নেই, যার প্রতি ফে'লের ইসনাদ হাকীকী হয়। তাঁর মতে এ তিনটি উদাহরণের ফে'লগুলো যদিও متعدی ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো ফে'লে লায়িম।

سَرْتَنِي-এর অর্থ আমি মুগ্ধ হলাম, يَزِيدُكَ-এর অর্থ- বেশি হলো এবং أَقْدَمَنِي-এর অর্থ আগমন করলাম।

কিন্তু মূল লেখক এবং সাক্কাকী (র.)-এর মতে এই ফায়েলগুলোর প্রকৃত ফায়েল হলো আল্লাহ তা'আলা। এর থেকে যখন ইসনাদকে সরিয়ে وَجْهَهُ , رُؤْيَتْ , حَقٌّ-এর দিকে ইসনাদ করা হয়েছে, তখন তা মাজায হয়েছে। আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানির মতে, এগুলোর প্রকৃত কোনো ফায়েল এই অর্থে নেই যে, প্রথমে প্রকৃত ফায়েলের দিকে নিসবত করে তা থেকে সরিয়ে (বর্তমান) মাজাযী ফায়েলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) শায়খ জুরজানির এ মতের উপর আপত্তি করে বলেন, ফে'লের জন্য হাকীকী ফায়েল থাকতেই হবে। যদি ফে'লের হাকীকী ফায়েল না থাকে, তাহলে ফায়েল ছাড়া ফে'লের সংঘটিত হওয়া আবশ্যক হয়; অথচ ফায়েল ছাড়া ফে'লের অস্তিত্ব অসম্ভব।

অতএব, বর্তমানে ফে'লকে যার দিকে ইসনাদ করা হয়েছে, যদি সেটাই হাকীকী ফায়েল হয়, তাহলে তো এটি মাজায হলো না। আর যদি তা হাকীকী ফায়েল না হয়, তাহলে তো একটি হাকীকী ফায়েল উহ্য মানা আবশ্যকীয়।

আল্লামা সাক্কাকী (র.) বলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর প্রশ্নটি যথার্থ এবং উল্লিখিত তিনটি ফে'লের হাকীকী ফায়েল অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা। তিনি বলেন, শায়খ জুরজানির কাছে ফায়েলগুলো অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এর হাকীকী ফায়েলগুলো চিনতে পারেননি এবং এগুলোর হাকীকী ফায়েল থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

আল্লামা তাফতযানী বলেন, মূল লেখক এক্ষেত্রে আল্লামা সাক্কাকীর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমার ব্যক্তিগত মত হলো- শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানির মতটি সঠিক। তারা যা বলেছেন তা এক ধরনের অবাস্তব ব্যাখ্যা। কেননা, তারা যে বলেছেন উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি সঠিক নয়। যদি আল্লাহ ফায়েল হন তবে এ হিসেবে যে, আল্লাহ সব জিনিসের উদ্ভাবক এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী। আর এ কথাতো শায়খ জুরজানিও অস্বীকার করেন না। তবে এখানে ফায়েল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যার দ্বারা ফে'ল সংঘটিত হয়। এখানে উল্লিখিত ফে'লগুলো আল্লাহ কর্তৃক সংঘটিত নয়। যখন এগুলো আল্লাহ তা'আলা দ্বারা সংঘটিত নয়, তখন এগুলোর হাকীকী ফায়েল আল্লাহ তা'আলা হবেন না। অতএব, এসব ফে'লের হাকীকী ফায়েল না থাকাই প্রমাণিত হলো।

সার-সংক্ষেপ :

مَجَازٍ عَفْلِي-এর হাকীকী ইসনাদের পরিচয় কখনো সুস্পষ্ট হবে, আবার কখনো হাকীকী ইসনাদের পরিচয় অস্পষ্ট হবে।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে- فَمَا رَيْبَتْ تَجَارَتُهُمْ (এটি مَجَازٍ عَفْلِي-এর উদাহরণ) এর প্রকৃত বা হাকীকী ইসনাদযুক্ত বাক্যটি হলো- فَمَا رَيْبُوا فِي تَجَارَتِهِمْ

مَجَازٍ عَفْلِي-এর হাকীকী ইসনাদের পরিচয় অস্পষ্ট হওয়ার উদাহরণ سَرْتَنِي رُؤْيَتْكَ (এটি مَجَازٍ-এর উদাহরণ)-এর প্রকৃত ইসনাদযুক্ত বাক্যটি হচ্ছে سَرَّنِي اللَّهُ عِنْدَ رُؤْيِكَ দ্বিতীয় উদাহরণের মাঝে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, তার প্রকৃত ইসনাদটি এমন যে, তা এমনিতে বুঝা যায় না; বরং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তা স্পষ্ট হয়।

তালখীসুল মিফতাহের লেখক আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ জালালুদ্দীন কাযবীনী, মিফতাহ গ্রন্থের লেখক ইউসুফ সাক্কাকী ও আল্লামা রাযীর মতে مَجَازٍ عَفْلِي-এর জন্য ফায়েলে হাকীকী/মাফউলে হাকীকী থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানী ও সা'দ উদ্দীন তাফতযানীর মতে مَجَازٍ عَفْلِي-এর জন্য এরূপ ফায়েল/মাফউলে বিহীর আবশ্যকতা নেই।

وَأَنكَرَهُ أَيْ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ السَّكَامِيَّ وَقَالَ الَّذِي عِنْدِي نَظْمُهُ فِي سِلْكِ الْإِسْتِعَارَةِ
بِالْكِنَايَةِ بِجَعْلِ الرَّبِيعِ إِسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ عَنِ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ بِوَاسِطَةِ الْمُبَالَغَةِ
فِي التَّشْبِيهِ وَجَعَلَ نِسْبَةَ الْإِنْبَاتِ إِلَيْهِ قَرْنَةً لِإِسْتِعَارَةِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ذَاهِبًا إِلَى
أَنَّ مَا مَرَّ مِنَ الْأَمْثَلَةِ وَنَحْوِهِ إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ وَهُوَ عِنْدَ السَّكَامِيِّ أَنْ تَذْكُرَ الْمُشَبَّهَ
وَتُرِيدَ الْمُشَبَّهَ بِهِ بِوَاسِطَةِ قَرْنَةٍ وَهِيَ أَنْ تَنْسِبَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنَ اللَّوَاظِمِ الْمُسَاوِيَةِ
لِلْمُشَبَّهِ بِهِ مِثْلُ أَنْ تُشَبِّهَ الْمَنِيَّةَ بِالسَّبْعِ ثُمَّ تُفْرِدُهَا بِالذِّكْرِ وَتُضَيِّفُ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ
لَوَاظِمِ السَّبْعِ فَتَقُولُ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّبِيعِ الْفَاعِلُ
الْحَقِيقِيُّ لِلْإِنْبَاتِ يَعْنِي الْقَادِرَ الْمُخْتَارَ بِقَرْنَةٍ نِسْبَةِ الْإِنْبَاتِ الَّذِي هُوَ مِنَ اللَّوَاظِمِ
الْمُسَاوِيَةِ لِلْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ هَذَا
الْمِثَالِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ يُشَبَّهَ الْفَاعِلُ الْمَجَازِيُّ بِالْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ فِي تَعَلُّقِ وَجُودِ الْفِعْلِ
بِهِ ثُمَّ يُفْرَدُ الْفَاعِلُ الْمَجَازِيُّ بِالذِّكْرِ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ لَوَاظِمِ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ -

অনুবাদ : সাক্বাকী (র.) মাজাযে আকলী (-এর অস্তিত্ব)-কে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমার মতে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) (أَنْبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ) এর সুতোয় গাঁথা চাই। আর ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে
একে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে ঐক্যবাদের (এ-এর উদাহরণ) থেকে

এর উপর অন্যান্যগুলোকে ক্রিয়াস (তুলনা) করা হবে। অর্থাৎ এ উদাহরণ ছাড়া। মোটকথা হলো, ফায়েলে
মাজাযীকে ফায়েলে হাকীকীর সাথে تشبيه দেওয়া হবে, ফে'লের অস্তিত্ব তার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে।
এরপর শুধুমাত্র ফায়েলে মাজাযীকে উল্লেখ করা হবে এবং ফায়েলে হাকীকীর কোনো লাযেমী জিনিসকে তার প্রতি
নিসবত করা হবে।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَنكَرَهُ أَيْ السَّجَّازَ الْخ : মূল লেখক বলেন, আল্লামা সাক্বাকী مَجَّازَ عَقْلِي-কে অস্বীকার করেন- তিনি বলেন, مَجَّازَ عَقْلِي বলে কিছু নেই। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন مَجَّازَ হলো বাস্তববিরোধী কথা। আর বাস্তববিরোধী কথা আরবি ভাষায় অগ্রহণযোগ্য। অতএব, مَجَّازَ عَقْلِيও অগ্রহণযোগ্য; কিন্তু তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় ইতঃপূর্বে أَنَبَتَ الرَّيْبُ الْبَقْلُ সহ আরো যতগুলো উদাহরণ গেল, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

এর উত্তরে তিনি বলেন, সেগুলো সব اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ তার মতে اِنْبَتَ الرَّيْبُ الْبَقْلُ-এর মধ্যে رَيْبٌ হলো مُشَبَّه আর اِنْبَتَ الرَّيْبُ الْبَقْلُ-এর মাধ্যমে رَيْبٌ-কে اِنْبَتَ الرَّيْبُ الْبَقْلُ-এর মাধ্যমে উপমা দেওয়া হয়েছে। এই مُشَبَّه উহ্য আছে। এই اِسْتِعَارَةٌ-এর উপর দলিল হলো اِنْبَات-কে رَيْب-এর নিসবত করা হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার জন্য اِلْزَامُ مُسَاوِي উল্লেখ্য যে, আল্লামা সাক্বাকী ইতঃপূর্বে বর্ণিত যতগুলো مَجَّازَ عَقْلِي-এর উদাহরণ গেছে সবগুলোকে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলেছেন। তাই উদাহরণগুলোর নতুন ব্যাক্য সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে তার মতে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ কাকে বলে?

উত্তর : একটি বিষয়কে (مُشَبَّه) অপর আরেকটি বিষয় (مُشَبِّه) এর সাথে মনে মনে উপমা দেওয়া হবে। অতঃপর مُشَبَّহ-কে উল্লেখ করা হবে দলিলের মাধ্যমে مُشَبِّه-কে মনে মনে ধরে নেওয়া হবে। দলিল হলো- مُشَبَّه-এর اِلْزَامُ مُسَاوِي-এর মধ্য থেকে যে কোনো اِلْزَامُ مُسَاوِي-এর দিকে নিসবত করা হবে।

اِلْزَامُ مُسَاوِي বলা হয়- এমন সব গুণাবলিকে, যা مُشَبِّহ-এর সাথে খাস। مُشَبَّহ পাওয়া গেলে এসব গুণাবলিও পাওয়া যাবে, আবার مُشَبَّহ না পাওয়া গেলে এসব গুণাবলিও পাওয়া যাবে না। যেমন- اِنْبَات (অর্থ উদ্ভগত করা) আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন একটি গুণ যা আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের সাথে اِنْبَاتও প্রমাণিত হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.) সাক্বাকীর اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করে তার অলোকে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন- مُشَبَّه (মৃত্যু)-কে উপমা দেওয়া হলো হিংস্রজন্তুর সাথে। এরপর مُشَبَّহ-কে উল্লেখ করা হলো (এবং مُشَبِّহ-কে উহ্য রাখা হলো) এবং مُشَبَّহ (হিংস্র জন্তু) لازم مسابه (অত্যাবশ্যকীয় বিষয়) مَخَالِب (থাবা)-কে مُشَبَّহ (মৃত্যু)-এর দিকে নিসবত করা হলো। অতএব, اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হলো, যেমন তুমি বললে مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ نَشَبَتْ بِقُلَانٍ অর্থাৎ মৃত্যুর থাবা তাকে আঁকড়ে ধরেছে। মূল লেখক বলেন, উদাহরণের মধ্যে (مُشَبَّه) رَيْب-কে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِنْبَات-এর হাকীকী ফায়েল তথা আল্লাহ তা'আলা, যিনি তার ইচ্ছার ব্যাপারে স্বাধীন এবং সর্বশক্তিমান।

হাকীকী ফায়েল যে উদ্দেশ্যের দলিল হলো اِنْبَات যা আল্লাহ তা'আলার লায়মি মুসাবী তাকে নিসবত করা হয়েছে- رَيْب-এর দিকে। মুসান্নিফ বলেন, এ উদাহরণের উপর অন্যান্য উদাহরণগুলোকে কিয়াস করা হবে। এটির মধ্যে যেমন اِسْتِعَارَةٌ হয়েছে তেমনি অন্যান্য উদাহরণেও اِسْتِعَارَةٌ হয়েছে। অর্থাৎ اِعْمَالُ مَجَّازِي উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে اِعْمَالُ حَقِيقِي-কে। আর এটা করা হয়েছে উভয় ফায়েলের সাথে ফে'লের সম্পর্কের ভিত্তিতে। তবে সব কিছুই আগে اِعْمَالُ مَجَّازِي-কে اِعْمَالُ حَقِيقِي-এর সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা আবু ইয়াকুব ইউসুফ সাক্বাকী (র.) مَجَّازَ عَقْلِي-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে ইতঃপূর্বে বর্ণিত مَجَّاز-এর উদাহরণগুলোতে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। তাঁর মতে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ।

সংজ্ঞা : কোনো একটি বিষয় (مُشَبَّه)-কে অন্য আরেকটি বিষয় (مُشَبِّه)-এর সাথে মনে মনে উপমা দেওয়া হবে, তারপর مُشَبَّহ-কে উল্লেখ করে مُشَبِّহ-কে ধরে নেওয়া হবে। আর مُشَبَّহ-কে মনে মনে ধরে নেওয়ার দলিল হিসেবে مُشَبِّহ-এর اِلْزَامُ مُسَاوِي-কে বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করা হবে। যেমন- اِنْبَتَ الرَّيْبُ الْبَقْلُ এ উদাহরণে رَيْب দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ, আর তার اِلْزَامُ مُسَاوِي হচ্ছে اِنْبَات।

وَفِيهِ أَىٰ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَائِيُّ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْعَيْشَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ صَاحِبَهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ مِنْ تَفْسِيرِ الْإِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ عَلَىٰ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَائِيُّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ يَفْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْفَاعِلِ الْمَجَازَىٰ هُوَ الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُّ فَيَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَيْشَةٍ صَاحِبَهَا وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إِذَا لَا مَعْنَىٰ لِقَوْلِنَا هُوَ فِي صَاحِبِ عَيْشَةٍ وَهَذَا مَبْنًى عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَيْشَةٍ وَضَمِيرٍ رَاضِيَةٍ وَاحِدٌ وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْإِضَافَةُ فِي كُلِّ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ الْفَاعِلُ الْمَجَازَىٰ إِلَىٰ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ نَحْوُ نَهَارُهُ صَائِمٌ لِبُطْلَانِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَىٰ نَفْسِهِ اللَّازِمَةِ مِنْ مَذْهِبِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّهَارِ فَلَانَّ نَفْسَهُ وَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْإِضَافَةِ وَوُقُوعِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَمَا رِيحَتْ تَجَارَتُهُمْ وَهَذَا أَوَّلَىٰ بِالْتَّمَثِيلِ -

অনুবাদ : কিন্তু তাতে অর্থাৎ সাক্ষ্যকী যে মত গ্রহণ করেছেন তাতে আপত্তি আছে। কেননা, এ অভিমত আল্লাহ তা'আলার বাণী-*فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ*-এর *عَيْشَةٍ* জীবন দ্বারা জীবনের অধিকারী উদ্দেশ্য হওয়াকে আবশ্যক করে। যেমনটি কিতাবে আসবে অর্থাৎ সাক্ষ্যকীর মতানুসারে *إِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ*-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী। আমরা অবশ্য এটি (অর্থাৎ তার *إِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ*-এর ব্যাখ্যা) আলোচনা করেছি, যা *فَاعِلٌ مَجَازَى* দ্বারা *فَاعِل* উদ্দেশ্য হওয়াকে দাবি করে। ফলে *عَيْشَةٍ* (জীবন) দ্বারা জীবনের অধিকারী ব্যক্তি উদ্দেশ্য হওয়া অনিবার্য হবে। আর এ ধরনের (একটা শব্দ দ্বারা অন্য অর্থের) আবশ্যকতা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আমাদের উক্তি *هُوَ فِي عَيْشَةٍ* (সে জীবনের অধিকারী ব্যক্তির মধ্যে)-এর কোনো অর্থ নেই। এ অর্থ তখনই হবে যখন *عَيْشَةٍ* এবং *راضية*-এর সর্বনাম এক হবে এবং (তার মাযহাব দ্বারা) ইযাফত সহীহ না হওয়া লামেয় আসে প্রত্যেক এ সব উদাহরণে যাতে ফায়েলে মাজাযীকে হাকীকী ফায়েলের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যেমন-*نَهَارُهُ صَائِمٌ* (তার দিবস রোজাদার এটি সহীহ নয়) *إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَىٰ نَفْسِهِ* বাতিল হওয়ার কারণে। এ ধরনের লামেয় সাক্ষ্যকীর মাযহাবের কারণে হয়। কেননা, *نَهَار* দ্বারা সেই (রোজাদার) ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। অথচ এ ইযাফতগুলো সঠিক হওয়ার ব্যাপারে এবং এর ব্যবহার আল্লাহ তা'আলার কালামে ব্যবহার হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন-*فَمَا رِيحَتْ تَجَارَتُهُمْ* এ আয়াতে *فَاعِلٌ مَجَازَى* কে-*فَاعِلٌ حَقِيقَى*-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটিই উদাহরণ হিসেবে বেশি উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيهِ أَىٰ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخ : মূল লেখক বলেন, মিফতাহুল উলূমের লেখক আল্লামা সাক্ষ্যকীর মাযহাব বিতর্কের উল্লেখ নয়; বরং তার মাযহাব মতে *مَجَازٌ عَلَى*-এর উদাহরণগুলোকে যদি *إِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ* বলা হয়- তাহলে অনেকগুলো আপত্তি দেখা দেয়, যা এসব উদাহরণের বিভুদ্ধতার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি সৃষ্টি করে। সাক্ষ্যকীর মতানুসারে যে সমস্যা দেখা দেয়, তা উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

১ম উদাহরণ : فَهَرَفِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ অর্থাৎ সে তার পছন্দনীয় জীবন লাভ করবে। আমাদের মতে এটি مَجَاز-এর উদাহরণ, যেমনটি ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা সাক্বাকীর মতানুসারে যদি এটিকে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা হয়, তাহলে ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ দেখা দেবে। ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ-এর ব্যাখ্যা : ظرف বলা হয় কোনো বস্তু রাখার পাত্র বা স্থানকে। যেমন- আম রাখার টুকরিকে আমার ظرف বলা হবে। আর ظرف-এর মধ্যে যা রাখা হয় তাকে مظروف বলা হয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, ظرف এবং مظروف ভিন্ন জিনিস ও পরস্পর বিপরীত। ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ-এর অর্থ হচ্ছে- مظروف এবং ظرف এক হয়ে যাওয়া, যা অসম্ভব।

এ উদাহরণের মধ্যে راضية-এর সর্বনামের مرجع হলো عَيْشَةٍ যা مَجَازِي আর এর হাকীকী ফায়েল হলো صَاحِبُ عَيْشَةٍ বা ব্যক্তি। اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর মধ্যে যেহেতু ফায়েলে মাজাযী বলে ফায়েলে হাকীকী উদ্দেশ্য করা হয়। তাই مشبه দ্বারা উদ্দেশ্য হবে صَاحِبُ عَيْشَةٍ বা ব্যক্তি। فهو-এর মধ্যে مرجع হলো من যা এর আগের বাক্য ব্যক্তি তার সত্ত্বষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আছে। অর্থাৎ ظرف জীবনের অধিকারী এবং مظروف ও জীবনের অধিকারী। সুতরাং এখানে ظرف এবং مظروف হওয়ার দ্বারা ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ হলো। যেহেতু ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ বাতিল, অতএব যার দ্বারা এ বাতিল হওয়া লাযেম হলো তাও বাতিল। অর্থাৎ اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ দ্বারা যেহেতু এই বাতিল হওয়ার প্রক্রিয়া হয়েছে, তাই اِسْتِعَارَةٌ বাতিল হবে এবং তা مَجَازِ عَقْلِي-এর উদাহরণ হিসেবেই গণ্য হবে।

২য় উদাহরণ : نَهَارُهُ صَائِمٌ এটি মূল লেখকের মতে مَجَازِ عَقْلِي-এর উদাহরণ। ইতঃপূর্বে এর বিশদ বর্ণনা আমরা দিয়েছি। যদি সাক্বাকী (র.)-এর মতানুসারে তাকে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা হয়, তাহলে اِصَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ লাযেম হবে। আর তা এভাবে যে, صائم-এর সর্বনাম مَجَازِي-এর দিকে ফিরেছে। যার مرجع হলো نَهَارُ এখানে اِسْتِعَارَةٌ হাকীকী হিসেবে اِصَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ উল্লেখ করা হবে; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে فَاعِلٌ حَقِيقَتِي আবার نَهَار-কে সম্বন্ধ করা হয়েছে فَاعِلٌ حَقِيقَتِي-এর সর্বনাম "ه" -এর দিকে অতএব, এখানে نَهَار দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فَاعِلٌ حَقِيقَتِي যাকে সম্বন্ধ করা হয়েছে হাকীকী ফায়েলের দিকে অর্থাৎ ফায়েলে হাকীকীর সম্বন্ধ ফায়েলে হাকীকীর দিকে। সুতরাং اِصَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ হলো, আর এ ধরনের সম্বন্ধ বাতিল। কিন্তু এ সম্বন্ধটি লাযেম হয়েছে এ উদাহরণটিকে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলার কারণে। আমরা ইতঃপূর্বে বলেছি যে, যা বাতিল হওয়াকে লাযেম করে তাও বাতিল বলে গণ্য হয়। অতএব, উদাহরণটিকে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা ঠিক হবে না। উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ধরনের উদাহরণ যার মধ্যে فَاعِلٌ مَجَازِي-কে ফায়েলে হাকীকীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সেগুলোকে সাক্বাকীর মতানুসারে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা হলে এর দ্বারা অনুরূপ সমস্যা হবে। অর্থাৎ اِصَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ লাযেম হবে।

এখানে যদি কেউ এ কথা বলেন, মুসান্নিফ (র.) اِصَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ এবং ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ ইত্যাদির কারণে মূল লেখকের اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর দাবিকে বাতিল করলেন; অথচ উদাহরণগুলোকে বহাল রাখলেন কেন? এর উত্তর হলো উদাহরণগুলো সঠিক। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তা ছাড়া এ উদাহরণগুলো থেকে কতকগুলো পবিত্র কুরআন কারীমেও রয়েছে। যদি এগুলো সঠিক না হতো তাহলে কুরআন কারীমে এর ব্যবহার পাওয়া যেত না। যেমন- পবিত্র কুরআনে فَاعِلٌ مَجَازِي-কে فَاعِلٌ حَقِيقَتِي-এর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে। উদাহরণ فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ এ উদাহরণে تِجَارَةٌ হলো فَاعِلٌ مَجَازِي যার সম্বন্ধ করা হয় فَاعِلٌ حَقِيقَتِي তথা هم সর্বনামের দিকে। অতএব, উদাহরণগুলো সঠিক আর সঠিক উদাহরণগুলোকে যে কারণে বাতিল বলতে হয়, সেই কারণগুলো বরঞ্চ বাতিল।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, نَهَارُهُ صَائِمٌ (যে উদাহরণ মূল লেখক উল্লেখ করেছেন)-এর চেয়ে فَمَا رِيحَتْ تِجَارَتُهُمْ উত্তম হতো। কেননা, এটি কুরআনের আয়াত হওয়ার কারণে এর সম্বন্ধ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকত না। যার কারণে সাক্বাকী (র.)-এর মাহযাব যে বাতিল তা আরো বেশি প্রতিভাত হতো।

وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْبِنَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا هَامَانُ ابْنُ لِي صَرْحًا لِهَامَانَ
لَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ جِنْدُهُ هُوَ الْعَمَلَةُ أَنْفُسُهُمْ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّ النِّدَاءَ لَهُ وَالْخَطَابَ مَعَهُ وَ
يَسْتَلْزِمُ أَنْ يُتَوَقَّفَ نَحْوُ أَنْبَتِ الرَّبِيعِ الْبَقْلَ وَشَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ وَسَرَّتْنِي رُؤْيَتُكَ
مِمَّا يَكُونُ الْفَاعِلُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى السَّمْعِ مِنَ الشَّارِعِ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ
تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّرْكِيبِ صَحِيحٌ شَائِعٌ ذَائِعٌ عِنْدَ الْقَائِلِينَ
بِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةٌ وَغَيْرِهِمْ سَمِعَ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ -

অনুবাদ : এবং লায়েম হবে আল্লাহ তা'আলার বাণী- হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো-এর মধ্যে নির্মাণের নির্দেশ হামানের প্রতি না হওয়া। কেননা, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র নির্মাণ শ্রমিকগণ। কিন্তু এ ধরনের লায়েম বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আহ্বান হামানকেই করা হয়েছে এবং তার সাথেই কথোপকথন হয়েছে এবং লায়েম হবে أَنْبَتِ الرَّبِيعِ الْبَقْلَ এবং شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ অর্থাৎ যার মধ্যে ফায়েলে হাকীকী আল্লাহ তা'আলা। এগুলোর বিশুদ্ধতা ধর্মবেত্তা থেকে শোনার উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ তা'আলার নাম শোনার উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের লায়েম বাতিল। কারণ, এ জাতীয় তারকীব সঠিক। সর্বজনবিদিত এবং বহুল ব্যবহৃত তাদের নিকট যারা বলে আল্লাহ তা'আলার নাম শোনার উপর নির্ভরশীল এবং যারা বলে না, চাই সেটা ধর্মপ্রবর্তকের পক্ষ থেকে শোনা যাক অথবা শোনা না যাক।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

৩য় উদাহরণ : يَا هَامَانُ ابْنُ لِي صَرْحًا হে হামান! আমার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করো। মূল লেখক এই উদাহরণটির মাধ্যমে পূর্বের দু' উদাহরণ থেকে ভিন্নভাবে সাক্ষাকীর মায়হাবকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয়াতের মধ্যে ফেরাউন তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে প্রাসাদ নির্মাণের হুকুম করছে, আমাদের মতে এটি مَجَازٍ عَقْلِي-এর উদাহরণ। কারণ হামানের প্রতি নির্দেশ মূলত হামানের প্রতি নির্দেশ নয়; বরং নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি নির্দেশ। হামান নির্দেশদাতা (সবব) হিসেবে তার প্রতি إِسْنَاد করা হয়েছে।

আল্লামা সাক্ষাকীর মতে, আয়াতে إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। অর্থাৎ হামান مَجَازِي-এর প্রতি নির্মাণ করার নির্দেশ উদ্দেশ্য নয়; বরং নির্মাণ শ্রমিকরা (فاعل حقيقي) নির্দেশ দ্বারা উদ্দেশ্য। এখন এই ব্যাখ্যা অর্থাৎ হামানকে নির্মাণের নির্দেশ না করা বাতিল বা অগ্রহণযোগ্য। এ ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ হলো আয়াতে يَا هَامَانُ বলে আহ্বান করা হয়েছে হামানকে এবং কথোপকথন হয়েছে হামানের সাথেই। অতএব, এটা কি করে সম্ভব যে, আহ্বান করা হলো এবং কথা বলা হলো হামানের সাথে; অথচ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নির্মাণ শ্রমিকদের। মোটকথা, যদি এ বাক্যটিকে إِسْتِعَارَةٌ বলা হয় তাহলে কাজটি একটি অগ্রহণযোগ্য বিষয়কে মেনে নেওয়ার নামাস্তর হলো। যেহেতু إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ দ্বারাই সেই অগ্রহণযোগ্য কাজে লিপ্ত হতে হয়, তাই আমরা إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-কে বাতিল বলবো এবং উক্ত বাক্য যে কোনো বাতিল থেকে মুক্ত, এ কথা মেনে নেব।

৪র্থ উদাহরণ : মূল লেখক এখানে বেশ কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন, সেসবগুলোর হাকীকী ফায়েল হলেন আল্লাহ তা'আলা। এ উদাহরণগুলোকে إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা হলে উদাহরণগুলোর فاعِل مَجَازِي-কে আল্লাহ তা'আলার নাম বলতে হয়। কারণ, ওগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ

সার-সংক্ষেপ : مَجَازِ عَقْلِي-এর ব্যাপারে আল্লামা সাক্বাকী (র.)-এর মতটি সঠিক নয়। কেননা, তাঁর মতটি সঠিক বলা হলে পূর্বোক্ত উদাহরণগুলোতে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। যেমন-فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ-এর মধ্যে الشَّيْءُ লাযেম আসে। তদ্রূপ إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ লাযেম আসে। আর এ দু'টি বিষয় অসম্ভব। অতএব, যার কারণে এ দু'টি বিষয় লাযেম হয়েছে সে বিষয়টিই বাতিল বলে গণ্য হবে। লেখক বলেন, যদি সাক্বাকী (র.)-এর মত গ্রহণ করা হয়, তাহলে যেসব উদাহরণের হাকিকী ফায়েল আল্লাহ সেসব উদাহরণের মাজাযী ফায়েলগুলো আল্লাহর নাম হওয়া লাযেম হবে। অথচ এগুলো আল্লাহর নাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল নেই।

وَاللَّوْازِمُ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَنْتَفِي كَوْنُهُ مِنْ بَابِ الْإِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ لِأَنَّ
إِنْتِفَاءَ اللَّازِمِ يُوجِبُ إِنْتِفَاءَ الْمَلْزُومِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَبْنَى هَذِهِ الْإِعْتِرَاضَاتِ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ فِي
الْإِسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ أَنْ يَذْكَرَ الْمَشَبَّهُ وَيُرَادُ الْمَشَبَّهُ بِهِ حَقِيقَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُرَادُ الْمَشَبَّهُ
بِهِ إِدْعَاءٌ أَوْ مُبَالَغَةٌ لِيُظْهِرَ أَنَّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَنْبِيَةِ فِي قَوْلِنَا مَخَالِبُ الْمَنْبِيَةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ
هُوَ السَّبْعُ حَقِيقَةً وَالسَّكَاكِيُّ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهِ -

অনুবাদ : সব লায়মই বাতিল যেমনটি আমরা আলোচনা করলাম। সূত্রাং এগুলো إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হওয়াও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, লায়মের বাতিল হওয়া মালযুমের বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে। এর জবাব হলো, এসব আপত্তিগুলোর ভিত্তি একথার উপর যে, إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর মধ্যে তার মাযহাব হলো মুশাব্বাহকে উল্লেখ করে মুশাব্বাহ বিহীকে হাকীকীভাবে উদ্দেশ্য করার ক্ষেত্রে; কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয় (যা বলা হলো); বরং এতে মুশাব্বাহ বিহীকে (হাকীকীভাবে উদ্দেশ্য করা হবে না) উদ্দেশ্য করা হবে দাবি স্বরূপ এবং মুবালাগার ভিত্তিতে। কেননা, এটা স্পষ্ট যে, আমাদের উক্তি مَخَالِبُ الْمَنْبِيَةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ-এর মধ্যে منية দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হিংস্র জন্তু উদ্দেশ্য নয়। সাক্বাকী তার কিতাব (মিফতাহুল উলূমে) এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন, মূল লেখক এ বিষয়টি জানেন না। তাই সাক্বাকী (র.)-এর মাহযাবের উপর নানাভাবে আপত্তি তুলেছেন।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاللَّوْازِمُ كُلُّهَا مُنْتَفِيَةٌ : মূল লেখক বলেন, পূর্বের আলোচনায় مَجَازٌ عَقْلِي-এর উদাহরণগুলোতে সাক্বাকীর মাযহাব অনুসারে إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বললে যেসব বিষয় লায়ম আসে সবগুলোই বাতিল, অতএব إِسْتِعَارَةٌ বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, নিয়ম হলো যদি লায়ম বাতিল হয়, তাহলে مَلْزُومٌও বাতিল হয়। ঐ সব আপত্তিগুলো হলো إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর লায়ম এবং তা হলো مَلْزُومٌ। অতএব, সবগুলো লায়ম বাতিল হলে إِسْتِعَارَةٌও বাতিল হবে। অতএব, এগুলো مَجَازٌ عَقْلِي-এর উদাহরণ সাব্যস্ত হলো।

وَالْجَوَابُ أَنَّ مَبْنَى هَذِهِ : মুসান্নিফ (র.) সাক্বাকী (র.)-এর পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছেন। তিনি বলেন, সাক্বাকী (র.)-এর উপর উল্লিখিত আপত্তিগুলোর ভিত্তি হলো সাক্বাকী (র.)-এর إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর সংজ্ঞার উপর। কেননা, সংজ্ঞাটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, ইবারতের মধ্যে فَاعِلٌ مَجَازِي-কে উল্লেখ করা হবে এবং এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হাকীকী ফায়েল উদ্দেশ্য করা হবে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়; বরং তার সংজ্ঞা হলো ইবারতের মধ্যে মুশাব্বাহ তথা فَاعِلٌ مَجَازِي-কে উল্লেখ করা হবে এবং এর দ্বারা দাবি স্বরূপ অথবা مُبَالَغَةٌ হিসেবে মুশাব্বাহ বিহী তথা فَاعِلٌ حَقِيقِي-কে উদ্দেশ্য করা হবে।

উল্লিখিত উদাহরণ مَخَالِبُ الْمَنْبِيَةِ نَشَبَتْ بِفُلَانٍ-এর মধ্যে منية বা মৃত্যু দ্বারা হাকীকীভাবে سَبْعٌ তথা হিংস্রপ্রাণী উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং দাবি স্বরূপ একথা বলা হচ্ছে যে, منية যেন হিংস্রপ্রাণীর গোত্রীয় কোনো কিছু। মুসান্নিফ বলেন, আল্লামা সাক্বাকী তার মতের কথা তার নিজ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়; কিন্তু তালখীসুল মিফতাহ গ্রন্থের লেখক সাক্বাকী (র.)-এর লেখাটির সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি সাক্বাকীর উপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি তুলেছেন।

মোটকথা, যদি فَاعِلٌ مَجَازِي দ্বারা হাকীকীভাবে فَاعِلٌ حَقِيقِي উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সেসব আপত্তিগুলো আর থাকে না। কেননা, সেসব আপত্তির মূল কারণ ছিল فَاعِلٌ حَقِيقِي-কে পৃথকভাবে উদ্দেশ্য করা।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক বলেন, সাক্বাকী (র.) مَجَازٌ عَقْلِي-এর উদাহরণগুলো إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলার কারণে যে সমস্যাগুলো লায়ম আসে সবগুলোই বাতিল। অতএব إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর দাবিও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, লায়ম বাতিল হলে মালযুমও বাতিল হয় আল্লামা তাফতাহানী (র.) সাক্বাকীর পক্ষে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, সাক্বাকী (র.)-এর উপর আপত্তিগুলো এসেছে তার প্রদত্ত إِسْتِعَارَةٌ-এর সংজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যা করার কারণে। إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, বাক্যের মধ্যে ফায়েলে মাজাযীকে উদ্দেশ্য করা হবে এবং দাবি স্বরূপ বা مُبَالَغَةٌ হিসেবে فَاعِلٌ حَقِيقِي-কে উদ্দেশ্য করা হবে। প্রকৃতপক্ষে فَاعِلٌ حَقِيقِي-কে উদ্দেশ্য করা হবে এমন নয়। উল্লেখ্য, এভাবে ব্যাখ্যা করা হলে কোনো আপত্তি বাকি থাকে না।

وَلَا تَهُ أَيُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَّاكِيُّ يَنْتَقِضُ بِنَحْوِ نَهَارِهِ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ لِإِشْتِمَالِهِ عَلَى ذِكْرِ طَرَفِي التَّشْبِيهِ وَهُوَ مَانِعٌ
مِنْ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّكَّاكِيُّ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ مَانِعًا إِذَا
كَانَ ذِكْرُهُمَا عَلَى وَجْهِ يُنْبِئُ عَنِ التَّشْبِيهِ بِدَلِيلٍ أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ عَ قَدْ زُرَّ أَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ
مِنْ أَيْدِ الْإِسْتِعَارَةِ مَعَ ذِكْرِ الطَّرَفَيْنِ وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفْ عَلَى مُرَادِ السَّكَّاكِيِّ بِالْإِسْتِعَارَةِ
بِالْكِنَايَةِ أَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْإِعْتِرَاضَاتِ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَرَأَيْنَا تَرْكَهُ أَوَّلَى -

অনুবাদ : আর এ কারণে তা অর্থাৎ সাক্কাকী (র.) যে মাযহাব গ্রহণ করেছেন- তা বাতিল হয়ে যায় **لَيْلُهُ** কেননা, উদাহরণটি তাশবীহের উভয় দিককে शामिल করেছে। আর এটি বাক্যকে **استعارة** বলতে বাধা প্রদান করে। যেমন- সাক্কাকী স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এর জবাব হচ্ছে, এ ধরনের (মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহীর একই সাথে উল্লেখ) তখনই **استعارة**-এর জন্য প্রতিবন্ধক হয় যখন উভয়টা এমনভাবে উল্লেখ করা হয়, যা তাশবীহ বুঝায়। এর দলিল এই যে, তিনি কবির উক্তি **قَدْ زُرَّ أَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ** (অর্থ- তাদের কাপড়ের বাঁধনটি চাঁদের উপরে বাঁধা)-কে মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও **استعارة**-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। কতিপয় লোক যখন সাক্কাকী (র.)-এর **إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ** দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা অনুধাবন করতে পারেনি, তখন তারা এসব আপত্তিসমূহের জবাব দিয়েছেন, যার সাথে সাক্কাকীর কোনো সম্পর্ক নেই। এসবের অনুল্লেখকে আমরা উত্তম মনে করেছি (তাই উল্লেখ করিনি)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَا تَهُ أَيُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَّاكِيُّ : এ ইবারতে মূল লেখক সাক্কাকী (র.)-এর মাযহাবের উপর আরেকটি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটি হলো, যেসব বাক্যের মধ্যে **فَاعِلٌ حَقِيقِي** এবং **فَاعِلٌ مَجَازِي** উভয় উল্লেখ থাকে, তাকে **إِسْتِعَارَةٌ** বলা যায় না। যেমন- **نَهَارُهُ صَائِمٌ** এ বাক্যগুলোকে **إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ** বলা না যাওয়ার কারণ হলো - একটি নিয়ম (যা আমরা **الاستعارة**-এর অধ্যায়ে বলে এসেছি) তা হলো যে বাক্যের মধ্যে **تشبيه**-এর মূল দু'অংশ তথা মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উভয়টি উল্লেখ থাকে সে বাক্যকে **استعارة** বলা যায় না। উল্লিখিত উদাহরণ **نَهَارُهُ صَائِمٌ** এর মধ্যে **نَهَارٌ** হলো মুশাব্বাহ তথা- **فَاعِلٌ مَجَازِي** এর **مُضَافٌ إِلَيْهِ** হলো মুশাব্বাহ বিহী বা **فَاعِلٌ حَقِيقِي** যা দ্বারা রোজাদারকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, এ জাতীয় উদাহরণগুলোতে উভয়টি উল্লেখ করার কারণে এগুলোকে **إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ** বলা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন আসে যে, সাক্কাকী (র.) কিভাবে এগুলোকে **إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ** বললেন এবং **مَجَازٍ عَقْلِي** হওয়াকে অস্বীকার করলেন?

সাক্কাকী (র.)-এর পক্ষ থেকে মুসান্নিফ জবাব দিচ্ছেন তিনি বলেন, 'তাশবীহ'-এর দু'দিক তথা মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উল্লেখ হলেই যে, **إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ** হতে পারবে না এমন নয়; বরং **استعارة** তখনই নিষিদ্ধ হবে যখন উভয়টিকে তাশবীহ হিসেবে আনা হবে। অর্থাৎ এমন ইবারত যার অর্থ তাশবীহ-এর সংকল্প করা ব্যতীত সহীহ হবে না। যেমন- মুশাব্বাহ বিহীটা মুশাব্বাহের খবর হলো। যেমন- **زَيْدٌ أَسَدٌ** (যায়েদ সিংহ) অথবা মুশাব্বাহ থেকে হাল হবে যেমন-

رَأَيْتُ زَيْدًا أَسَدًا এ উদাহরণগুলোতে প্রকৃত সিংহকে যারো এবং ব্যক্তির প্রতি (তাশবীহ ছাড়া) সরাসরি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ এবং সিংহের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। তদ্রূপ যারো এবং সিংহের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে। তাই اسد-কে رجل বা زيد-এর বেলায় প্রয়োগ সম্ভব নয়। এ কারণে এখানে تشبيه উহা মেনে বাক্যটিকে তাশবীহের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। তখন ইবারত এরূপ হবে زَيْدٌ كَأَسَدٍ এখানে লক্ষণীয় এই যে, উদাহরণগুলোতে মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উভয়টাকে তাশবীহ-এর ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাশবীহের অর্থ নেওয়া ছাড়া বাক্যগুলোর কোনো বিশুদ্ধ অর্থ থাকে না। অতএব, এগুলোকে استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা যাবে না।

কিন্তু যদি মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহীকে একটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়, যাদের অর্থের মাঝে তাশবীহ-এর বিষয়টি না থাকে তাহলে তাকে استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ উভয়টি উল্লেখ করার পরও বাক্যটি استِعَارَةٌ لَا تَعْبَرُ مِنْ بَلَى غَلَاتِهِ * قَدْ زُرَّ أَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন, কবি বলেন- অর্থাৎ তোমরা তার কাপড় পুরান হওয়াতে আশ্চর্য হয়ো না। (কারণ) তার কাপড়ের বাঁধন তো চাঁদের উপর। কবি তার দ্বিতীয় লাইনে মুশাব্বাহ বিহী (القمر) এবং মুশাব্বাহ অ-অ-এর সর্বনাম (যা কবির প্রিয়জনের প্রতি ফিরেছে) উভয়টি উল্লেখ আছে এতদসত্ত্বেও আল্লামা সাক্বাকী, তাকে استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলেছেন। কারণ, এ কবিতায় উভয়টির উল্লেখ তাশবীহ হিসেবে হয়নি।

এমনভাবে نَهَارُهُ صَائِمٌ ইত্যাদি উদাহরণ-এর মধ্যে মুশাব্বাহ এবং মুশাব্বাহ বিহী উভয়টি উল্লেখ আছে কিন্তু তা তাশবীহের ভিত্তিতে না হওয়ার কারণে এগুলোকে استِعَارَةٌ হিসেবে ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই।

মুসান্নিফ বলেন, অনেকে সাক্বাকী (র.)-এর استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ দ্বারা কি বুঝতে চান তা বুঝতে সক্ষম হননি, তাই তারা বিভিন্নভাবে উক্ত আপত্তিগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের জবাবগুলোও এমন, যার সাথে সাক্বাকীর মতের দূরতম সম্পর্ক নেই এবং তিনি সেসব জবাবকে পছন্দ করতেন না। তাই সেসব জবাবকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে বাদ দিয়েছি।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা সাক্বাকী (র.)-এর উপর মূল লেখক আরেকটি উদাহরণের মাধ্যমে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, نَهَارُهُ صَائِمٌ জাতীয় উদাহরণে فَاعِلٌ حَقِيقِي و فَاعِلٌ مَجَازِي উভয়টিই উল্লেখ আছে। যদি সাক্বাকীর মতানুযায়ী একে استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বলা হয়, তাহলে তাতে তাশবীহ-এর উভয় রকম তথা مشبه و مشبه به উল্লিখিত হয়েছে বলতে হবে। আর যে বাক্যে مشبه و مشبه به উভয়টি থাকে সে বাক্যকে استِعَارَةٌ-এর বাক্য বলা যায় না।

এর উত্তরে আল্লামা তাফতযানী (র.) বলেন, কোনো বাক্যে مشبه و مشبه به উল্লেখ হলেই উদ্দেশ্য করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না; বরং এমন তা استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ বাক্য তখনই استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ-এর জন্য প্রতিবন্ধক হয় যখন সেই বাক্যের তাশবীহ-এর রোকনদ্বয়ের উল্লেখ তাশবীহের অর্থ প্রদান করে। যেমন- زَيْدٌ أَسَدٌ

এরপর মুসান্নিফ এমন একটি কবিতা দ্বারা তার বক্তব্যকে প্রমাণিত করেন, যাতে مشبه و مشبه به উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও استِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। কবিতাটি হচ্ছে- لَا تَعْجَبُوا مِنْ بَلَى غَلَاتِهِ * قَدْ زُرَّ أَزْرَارُهُ عَلَى الْقَمَرِ

أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَى الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ لَهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ وَقَدْ مَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ لِمَا سَبَأْتَنِي أَمَا حَذَفَهُ قَدَمَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِكُونِهِ عِبَارَةً عَنْ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ وَعَدَمِ الْحَادِثِ سَابِقٌ عَلَى وُجُودِهِ وَ ذَكَرَهُ هَهُنَا بِلَفْظِ الْحَذْفِ وَفِي الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ التَّوَكُّلِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ شَدِيدُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ حَتَّى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُذَكَّرْ فَكَانَهُ أُتِيَ بِهِ ثُمَّ حُذِفَ بِخِلَافِ الْمُسْنَدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَكَانَتْ تَرْكٌ عَنْ أَصْلِهِ -

অনুবাদ : মুসনাদ ইলাইহ (উদ্দেশ্য) -এর বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ হিসেবে তার উপর যে সকল বিষয়ে আসে। তিনি মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে এনেছেন। যে কারণে তার আলোচনা অচিরেই আসবে। (আর মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা হলো) মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা। এটিকে তিনি অন্য সকল অবস্থার (আলোচনার) আগে এনেছেন। কেননা, (حذف)-এর অর্থ আনয়ন না করা।

আর ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের অনন্তিত্ব তার অস্তিত্বের আগে (হয়)। তিনি এখানে حذف বা উহ্য শব্দটি ব্যবহার করলেন অথচ মুসনাদের মধ্যে ترك বা বাদ দেওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন একথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহ হলো প্রধান সত্ত্ব যার প্রয়োজন খুব বেশি। এমনকি যখন তা উল্লেখ করা হয় না তখন যেন তাকে এনে পরে উহ্য করা হয়েছে। কিন্তু মুসনাদ তার ব্যতিক্রম। কেননা, তার মর্যাদা এরূপ নয়, যেন তা মূল থেকেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الخ : ইসনাদের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনার পর মূল লেখক বাক্যের প্রধান অংশ মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। أَحْوَالُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, مُسْنَدٌ إِلَيْهِ (মুসনাদ ইলাইহ) হওয়া হিসেবে তার মধ্যে যে সকল অবস্থা হয়- সেগুলো উদ্দেশ্য। উৎপত্তিগতভাবে কি হয়েছে অর্থাৎ হাকীকত নাকি মাজায় সেসব অবস্থা এখানে আলোচনা হবে না। এমনিভাবে শব্দ হিসেবে মুসনাদ ইলাইহ جزئى হলো নাকি كلى সেসব অবস্থাও এখানে আলোচিত হবে না। এমনিভাবে মুসনাদ ইলাইহ সত্ত্বগতভাবে কি হলো অর্থাৎ جوهر না عرض সেসব অবস্থাও এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। এরূপভাবে আসল অক্ষরের দিক থেকে মুসনাদ ইলাইহ তিন অক্ষর বিশিষ্ট নাকি তিনের অধিক ইত্যাদি কোনো কিছুই এখানে আলোচনা করা হবে না।

কেননা, উল্লিখিত অবস্থাগুলো মুসনাদ ইলাইহের মুসনাদ ইলাইহ হওয়া হিসেবে অবস্থা নয়। অতএব, এসবের আলোচনা এখানে করা হবে না। মুসনাদ ইলাইহ হিসেবে যেসব অবস্থা আসে, যথা- মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করাও উহ্য রাখা, নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা, অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা, মুসনাদ ইলাইহের সংজ্ঞা আনা ইত্যাদি নিয়েই الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর মধ্যে আলোচনা করা হবে।

قَوْلُهُ وَقَدْ مَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে কেন আনলেন তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে আনার কারণ অচিরেই আলোচনার মধ্যে আসবে। যা সামনে আসছে তা হলো বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ প্রধান অংশ। তার কারণ হলো, মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা যে কোনো সত্ত্বকে বুঝানো হয়। আর মুসনাদ হলো সে সত্ত্বের একটি গুণ বা বিশেষ অবস্থা। অতএব, এ কথা বলা যায় যে, প্রধান অংশ অপ্রধান অংশের আগে আসা বাঞ্ছনীয় বা সত্ত্বের আলোচনা তার গুণাবলির আলোচনার আগে আসে। সে কারণেই মুসনাদ ইলাইহের আলোচনা আগে আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَمَّا حَذْفُ : মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহের অحوাল-এর আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি সর্বাত্মে যে حال টি বয়ান করলেন তা হলো - حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ না করা। এখানে প্রসঙ্গক্রমে জানা দরকার যে, মূল লেখক রীতি অনুসারে -أما-এর পরে যে কথাটি উল্লেখ করে থাকেন তা হলো مُقْتَضَى حَالٍ আর এরপর تَعْلِيلٌ (কারণ দর্শানো লাম)-এর পরে যা উল্লেখ করেন তা হলো حال। সুতরাং সামনের ইবারত الْعَبَثِ عَنْ الْعَبَثِ এবং এরপর যা আসছে তা হবে অحوাল যা مُسْنَد إِلَيْهِ-এর-حذف-কে চায়। এ মতে حذف এবং এরপর যা আসছে তা হলো مُقْتَضَى حَالٍ অতএব مُقْتَضَى حَالٍ অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের অحوাল-এর উহ্য ইবারত হলো حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের উপর قَرِينَةٌ (লক্ষণ) অবশ্যই থাকবে।

قَوْلُهُ قَدَّمَ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ : ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মুসনাদ ইলাইহের এ অবস্থাটিকে অন্যান্য অবস্থার আগে আনার কারণ দর্শাচ্ছেন। তিনি বলেন, যে কোনো আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত জিনিসের মধ্যে عدم আগে, তারপর وجود। সে ভিত্তিতে তিনি حذف-কে আগে এনেছেন। কেননা, حذف-এর অর্থ হলো عَدَمُ الوجود যেহেতু الوجود عَدَمُ الوجود (حذف) আগে আসে তাই মূল লেখক حذف-কে حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর আগে এনেছেন।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, মুসান্নিফ (র.) উপরের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছেন এতে বুঝা গেল حذف-কে-এর আগে কেন আনা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অحوাল যথা নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, تابع ব্যবহার করা ইত্যাদির উপর حذف-কে কেন আগে আনা হলো, তাতো তিনি বর্ণনা করেননি। এর জবাব হলো, মুসনাদ ইলাইহের অন্যান্য অবস্থাসমূহের প্রায় সবগুলোই حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর অনুগামী, সুতরাং কোনো বস্তু যদি অন্য বস্তুর অনুগামী হয়ে যায় তাহলে অনুগামীকে সেই বস্তুর অধীন করা হয়। আসল বস্তুর যে হুকুম অনুগামীরও সেই হুকুম সাব্যস্ত হয়। অতএব, حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-এর উপর حذف কে প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে অন্যগুলোর উপর প্রাধান্য দেওয়া হলো।

قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ الْخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ একটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। আপত্তিটি হলো, মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার বিষয়টি حذف শব্দ দ্বারা, আর (মুসনাদের আলোচনায়) মুসনাদকে উহ্য রাখার কথাটি ترك শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

প্রশ্ন হলো তিনি দু'স্থানে দু'ধরনের শব্দ ব্যবহার করার পেছনে কি কোনো বিশেষ কারণ রয়েছে? নাকি তা এমনই করেছেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ না করাকে حذف শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা যায় যে, মুসনাদ ইলাইহ হলো বাক্যের মূল এবং প্রধান অংশ। আর বক্তা এটির প্রতি খুব বেশি মুখাপেক্ষী। তাই যেখানে এটিকে উল্লেখ করা হয়নি, সেখানে যেন এমন হয়েছে যে, তা আনা হয়েছিল বটে, তবে حذف করা হয়েছে। (কেননা, حذف অর্থ- উল্লেখ করার পর সেটিকে বাদ দেওয়া) পক্ষান্তরে মুসনাদের অবস্থা সেরূপ নয়, অর্থাৎ সেটি বাক্যের প্রধান অংশ নয় এবং এর প্রতি বক্তা (মুসনাদ ইলাইহের মতো) বেশি মুখাপেক্ষী নয়। তাই তার উল্লেখ না করা যেন ترك বা বাদ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম থেকেই যেন তাকে উল্লেখ করা হয়নি।

সারকথা হলো, মুসনাদ ইলাইহের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের অবস্থাসমূহের মধ্য থেকে লেখক প্রথমে حَذْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ-কে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ বলেন, عدم ও وجود-এর মধ্যে عدم আগে, তারপর وجود। আর حذف অর্থ হচ্ছে الذِّكْرُ এ জন্য প্রথমে حذف-এর আলোচনা করা হয়েছে, তারপর ذِكْرُ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে।

فَلِإِخْتِرَازٍ عَنِ الْعَبَثِ بِنَاءٌ عَلَى الظَّاهِرِ لِدَلَالَةِ الْقَرْنَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ رُكْنًا مِنَ الْكَلَامِ أَوْ تَخْيِيلِ الْعُدُولِ إِلَى أَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ مِنَ الْعَقْلِ وَاللَّفْظِ فَإِنَّ الْإِعْتِمَادَ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَعِنْدَ الْحَذْفِ عَلَى دَلَالَةِ الْعَقْلِ وَهُوَ أَقْوَى لِإِفْتِقَارِ اللَّفْظِ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ تَخْيِيلٌ لِأَنَّ الدَّالَّ حَقِيقَةً عِنْدَ الْحَذْفِ أَيْضًا هُوَ اللَّفْظُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ كَقَوْلِهِ ع قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتَ عَلِيلٌ لَمْ يَقُلْ أَنَا عَلِيلٌ لِإِخْتِرَازٍ وَالتَّخْيِيلِ الْمَذْكُورَيْنِ أَوْ إِخْتِبَارِ تَنْبِهِ السَّامِعِ عِنْدَ الْقَرْنَةِ هَلْ يَتَنَبَّهُ أَمْ لَا أَوْ إِخْتِبَارِ مِقْدَارِ تَنْبِهِمْ هَلْ يَتَنَبَّهُ بِالْقَرَائِنِ الْخَفِيَّةِ أَمْ لَا أَوْ إِنْهَامِ صَوْنِهِ أَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ عَنِ لِسَانِكَ تَعْظِيمًا لَهُ أَوْ عَكْسِهِ أَى إِنْهَامِ صَوْنِ لِسَانِكَ عَنْهُ تَخْقِيرًا لَهُ -

অনুবাদ : (মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়) অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য যাহিবী অবস্থার উপর ভিত্তি করে। কেননা, তখন قرينة-এর (মুসনাদ ইলাইহের অবস্থানের) প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এটি বাক্যের মূল অংশ (অথবা মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়) জ্ঞান এবং শব্দ এ দু'দলিলের মধ্য থেকে শক্তিশালী দলিলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার খেয়াল করার উদ্দেশ্যে। কেননা, মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করার অবস্থায় প্রকাশ্যে শব্দের উপরই নির্ভরতা থাকে, আর উহ্য রাখার সময় নির্ভরতা থাকে জ্ঞান বা বুদ্ধির উপর। আর এটি (জ্ঞান) হচ্ছে বেশি শক্তিশালী। কেননা, শব্দ এর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর তিনি বলেছেন, (প্রত্যাবর্তনের) খেয়াল করা। কেননা, উহ্য রাখার সময়ও (মুসনাদ ইলাইহের উপর) ইঙ্গিত প্রদানকারী শব্দই হয়ে থাকে। যার উপর দলিলের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন (উভয় অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার উদাহরণ) কবি বলেন, قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتَ عَلِيلٌ তিনি বলেননি أَنَا عَلِيلٌ উল্লিখিত উদাহরণটি অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য এবং প্রত্যাবর্তনের খেয়ালের জন্য। অথবা, করীনা থাকা অবস্থায় শোতার সতর্কতা যাচাইয়ের জন্য অর্থাৎ সে কি সতর্ক হলো, নাকি উদাসীন। অথবা, তার সতর্কতার পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য অর্থাৎ সে কি অস্পষ্ট লক্ষণের মাধ্যমে সতর্ক হলো কি, না হয়নি। অথবা, মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদানপূর্বক তাকে (তোমার) মুখ থেকে বাঁচানোর খেয়াল করে, অথবা এর উল্টো। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের প্রতি তাক্ষিল্যের কারণে তোমার মুখকে বাঁচানোর খেয়ালে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

مقتضى الخ : قَوْلُهُ فَلِإِخْتِرَازٍ عَنِ الْعَبَثِ : ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা একটি **مقتضى** আর উপরের ইবারতের মধ্যে লেখক সেই মুকতয়ায়ে হালের **حال**টি বর্ণনা করেছেন। মূল লেখক বলেন, মূলত দু'টি কারণে মুসনাদ ইলাইহকে **حذف** করা হয়। (এক) মুসনাদ ইলাইহ **حذف** হওয়ার কোনো লক্ষণ বা করীনা আছে যা উহ্য মুসনাদ ইলাইহের প্রতি ইঙ্গিত করে বিধায় মুসনাদ ইলাইহকে **حذف** করা। (দুই) মুসনাদ ইলাইহের **ذكر** এবং **حذف**-এর মধ্যে **حذف**-এর দলিলটি শক্তিশালী হওয়া।

এ দু'টি কারণের প্রথম কারণটি ব্যাকরণের মধ্যে আলোচিত হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মূল লেখক বলেন, দু'টি কারণে মুসনাদ ইলাইহকে **حذف** করা হয়। ১. অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য অর্থাৎ মুসনাদ

ইলাইহের ذِكْرُ যদি অনর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ذِكْر-এর স্থলে حذف করা হয়। আর এটা তখনই করা হয় যখন শ্রোতার সামনে মুসনাদ ইলাইহের কোনো এমন লক্ষণ থাকে, যার দ্বারা শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হয়ে পড়ে। তাই শ্রোতা ও বক্তার অবগতির পর মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা অনর্থক কাজের মধ্যে পড়বে। তাই সে অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَبِيُّ الْحَقِيقَةِ : এ বাক্যটি দ্বারা মূল লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মুসনাদ ইলাইহ হলো বাক্যের প্রধান রোকন। এ রোকনের উপর যদিও কোনো লক্ষণ বা দলিল থাকে তবু তাকে উল্লেখ করা সমীচীন। অথচ এখানে মুসান্নিফ (র.)-এর উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক বলছেন? এর জবাব হলো, কোনো বাক্যাংশ রোকন হওয়া এবং সেটি বাক্যের জন্য অপ্রয়োজনীয় হওয়াতে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ একটি রোকন অনর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। আমরা দেখতে পাই যে, যদি একজন শ্রোতার জানা থাকে এবং বক্তাও জানে যে, শ্রোতা এ বাক্যটি সম্পর্কে অবহিত এমতাবস্থায় পুরো বাক্যটি উল্লেখ করাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। বাক্যাংশ তো অপ্রয়োজনীয় হবেই। সুতরাং বুঝা গেল যে, শ্রোতার বাক্য কিংবা বাক্যাংশ জানা থাকলে সেটার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক হয়। শ্রোতার বাক্য কিংবা বাক্যাংশ সম্পর্কে জানা না থাকলে এর উল্লেখ কখনোই অপ্রয়োজনীয় বা অনর্থক হয় না।

তাহলে বুঝা গেল, মুসনাদ ইলাইহের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় কিংবা প্রয়োজনীয় হওয়ার সম্পর্ক শ্রোতার বাক্য কিংবা বাক্যাংশের জানার সাথে, মুসনাদ ইলাইহের রোকন হওয়া বা না হওয়ার সাথে নয়। তা ছাড়া আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি, যে কথা বা শব্দ বলার প্রয়োজন নেই সেটি অনর্থক। এখানে সে কথাটি অনর্থক হওয়ার কারণ শুধুমাত্র অপ্রয়োজন, অন্য কিছু নয়।

قَوْلُهُ أَوْ تَخْيِيلِ الْعُدُولِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حذف করার প্রাধান্য দানকারী দ্বিতীয় দলিলটির কথা আলোচনা করেছেন। আর তা হলো, বক্তা কখনো حذف করার মাধ্যমে শ্রোতাদের মনে এ ধারণা জন্মাতে চেষ্টা করে যে, বক্তা দু' দলিলের মধ্য থেকে শক্তিশালী দলিলের প্রতি অভিমুখী হয়েছেন।

দু'টি দলিল হলো عقل এবং لفظ, বিষয়টির ব্যাখ্যা এরূপ যে, মুসনাদ ইলাইহের উপর দালালতকারী দলিল হলো لفظ বা শব্দ এবং عقل বা জ্ঞান, এর মধ্যে জ্ঞান হলো শক্তিশালী। কারণ, জ্ঞান তার দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে শব্দের মুখাপেক্ষী নয়। পক্ষান্তরে শব্দ দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের মুখাপেক্ষী।

অতএব, মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ না করা হলে যেহেতু জ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা থাকে তাই শক্তিশালী দলিলের খেয়াল করে মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় না।

قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ : এ বাক্য দ্বারা একটি আপত্তির উত্তর দিয়েছেন। আপত্তি হলো, শুধুমাত্র শব্দের দ্বারা কিভাবে মুসনাদ ইলাইহকে বুঝানো যায়? কেননা, শব্দের সাথে জ্ঞানেরও প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা এটা জানবে যে, এ শব্দটি দ্বারা ঐ অর্থ বুঝানো হয়েছে। অতএব, মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করার সময় শুধুমাত্র শব্দের উপর ভরসা করা যথেষ্ট হবে না। অথচ এখানে বলা হলো শব্দের উপর নির্ভর করবে। এটা কিভাবে বলা হলো?

এর জবাব প্রকৃতপক্ষে যদিও শব্দের সাথে জ্ঞানের সমন্বয় দালালত করবে; কিন্তু বাহ্যত তা শব্দের উপরই নির্ভর করবে। لِنَعُدُّوْهُ إِلَى : এ বাক্যটি দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَبِيُّ الْحَقِيقَةِ কেন বললেন? এর জবাব হলো, এখানে এক দলিল থেকে আরেক দলিলে যাওয়ার খেয়াল করা হয়েছে, এক দলিল বাদ দিয়ে আরেক দলিলে যাওয়া হয়নি। কারণ, এক দলিল সম্পূর্ণ ত্যাগ করে আরেক দলিল গ্রহণ করা তখনই সম্ভব হয় যখন প্রত্যেকটি দলিল স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এখানে عقل এবং لفظ কোনোটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল নয়; বরং عقل এবং لفظ প্রত্যেকটি একটি অপরটির সাহায্য ছাড়া দলিল হতে পারে না। কেননা, আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, যখন বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ থাকে তখন সেই মুসনাদ ইলাইহের উপর দালালতকারী যেমন শব্দ তেমনি মুসনাদ ইলাইহ উহ্য থাকা অবস্থায় তার উপর দালালতকারীও শব্দ (যা উহ্য আছে) যার প্রতি করীনা বা লক্ষণ দালালত করে। উভয় অবস্থায় (মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ্য/অনুল্লেখ্য) عقل বা জ্ঞানের সাহায্য ছাড়া উল্লিখিত দালালত সম্ভব

নয়। তাই আমরা দেখছি যে, শব্দ এবং জ্ঞান কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ দলিল নয়; বরং একটির দলিল হওয়ার জন্য অপরটির সহযোগিতা যেমন দরকার, তেমনি উভয় অবস্থায় উভয় দলিলের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজন। মোটকথা, উভয় অবস্থায় জ্ঞান এবং শব্দ উভয়ের সমন্বয়ে একটি মাত্র দলিল হচ্ছে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দলিল নয়। তাই একটি ছেড়ে অপরটির দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এখানে এক দলিল থেকে অপর দলিলের দিকে যাওয়ার খেয়ালের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বক্তা মুসনাদ ইলাইহ উহ্য থাকার সময় খেয়াল করবে যে, শব্দ থেকে عقل-এর দিকে যাচ্ছে। তদ্রূপ মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ থাকলে যেন সে আকল ছেড়ে শব্দের দিকে গেল। অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর تَخْيِيل বলা যথার্থ হয়েছে।

মূল লেখক উপরোক্ত যে দু'টি কারণে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা উত্তম মনে করেন। এর উদাহরণ দিচ্ছেন। কবিতার চরণ—

قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ قُلْتَ عَيْلٌ * سَهْرٌ دَائِمٌ وَحَزَنٌ طَوِيلٌ

অর্থাৎ সে আমাকে বলল, তুমি কেমন আছো? আমি বললাম— অসুস্থ লাগাতার অনিদ্রা এবং দীর্ঘ দুঃখ (আমাকে অসুস্থ করেছে) এ কবিতায় অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য এবং শক্তিশালী দলিলের প্রতি গমনের খেয়ালে মুসনাদ ইলাইহ انا-কে উহ্য রাখা হয়েছে। কেননা, মূলবাক্য ছিল انا عليل এখানে মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার ক্ষেত্রে দলিল হয়েছে পূর্বের বাক্য انت كيف-এর انت শ্রোতাকে বক্তা যখন জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেমন আছো? এর জবাবে শ্রোতা নিজের সম্পর্কেই বলবে অসুস্থ বা সুস্থ।

মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় শ্রোতার সচেতনতা যাচাই করার জন্য যখন উহ্য মুসনাদ ইলাইহের জন্য কোনো প্রমাণ থাকে অর্থাৎ শ্রোতা উহ্য মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হতে পারল কি পারল না। যেমন—

نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ অর্থাৎ এর আলো সূর্যের আলো থেকে অর্জিত। এ বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ القمر উহ্য আছে। পুরো বাক্যটি এরূপ ছিল الْقَمَرُ نُورُهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ যেহেতু চাঁদের আলো সূর্যের আলো থেকেই অর্জিত হয়, তাই চাঁদ (মুসনাদ ইলাইহ) উহ্য রাখার দ্বারা শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহকে বুঝতে পারছে কিনা তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এ বাক্য দ্বারা।

এরপর মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখা হয় শ্রোতা কি পরিমাণ সচেতন রয়েছে তা যাচাইয়ের জন্য অর্থাৎ শ্রোতা করীনা গোপন হলে মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে কিনা, মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রেখে তা যাচাই করা হচ্ছে। যেমন—

هُوَ وَاسِطَةُ عَقْدِ الْكَوَائِبِ “এটি তারকারাজির হারের লকেট”, এখানে মুসনাদ ইলাইহ القمر উহ্য আছে। মূল ইবারতটি হবে—

وَاسِطَةُ الْقَمَرِ هُوَ وَاسِطَةُ عَقْدِ الْكَوَائِبِ উল্লেখ্য واسطة বলা হয় হারের লকেটকে, হারের মধ্যস্থিত মনিকে।

প্রকাশ থাকে যে, রাতের আকাশে যখন আমরা তারকারাজির দিকে তাকাই তখন চাঁদের চারপাশে হাজারো নক্ষত্র চমকাতে দেখা যায়। উক্ত নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চাঁদ সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল। তাই একে واسطة বলা হয়েছে। এখানে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হলে সাধারণ শ্রোতাগণ মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে না বটে; কিন্তু খুব সচেতন ব্যক্তির ঠিকই বুঝতে পারে যে, এখানে মুসনাদ ইলাইহ (القمر) উহ্য আছে। এ প্রকার উহ্য মুসনাদ ইলাইহের প্রতি শ্রোতার মনোনিবেশ আগের উদাহরণ অপেক্ষা বিলম্বে ঘটে। কারণ, আগের মুসনাদ ইলাইহের দলিল এটির তুলনায় বেশি স্পষ্ট।

এ প্রসঙ্গে কিতাবের পার্শ্ব টীকায় একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। ঘটনাটি জনৈক আব্বাসীয় খলিফা ও তার একজন সফর সঙ্গীর। তারা দু'জন নৌবিহারে বের হলেন, খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন— কোন্ খাবার তোমার প্রিয়? সে বলল, আধা সিদ্ধ ডিম। কাকতালীয়ভাবে পরবর্তী বছর তাদের দু'জনের একই স্থান দিয়ে নৌযানে করে কোথাও যাওয়া হলো। পূর্বের স্থানে পৌঁছতেই খলিফা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কি দিয়ে (অর্থাৎ কি দিয়ে তোমার সিদ্ধ ডিম খেতে ভালো লাগে) সঙ্গী বলল, লবণ দিয়ে। খলিফা তার মেধা, স্মৃতিশক্তি এবং পূর্ণ সচেতনতার প্রশংসা করলেন।

মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে কখনো বাক্য থেকে উহ্য রাখা হয় মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। যেমন—

مُقَرَّرٌ لِلشَّرَائِعِ مُوَضِّعٌ لِلدَّلَائِلِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُهُ অর্থাৎ শরিয়তের প্রতিষ্ঠাতা এবং দলিলসমূহের সুস্পষ্ট বিবরণদানকারী, তাই তার অনুসরণ অত্যাवশ্যকীয়। এ বাক্যে مُقَرَّرٌ لِلشَّرَائِعِ এবং مُوَضِّعٌ لِلدَّلَائِلِ হলো মুসনাদ, এর

মুসনাদ ইলাইহ হলো রাসূল ﷺ, যা বক্তা তার কথায় উহ্য রেখেছে রাসূলের নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। অর্থাৎ এ স্থানে তার (নাপাক) মুখকে রাসূল ﷺ-এর মতো সুমহান ব্যক্তির নাম উচ্চারণের জন্য অযোগ্য মনে করছে।

মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে বাক্য থেকে উহ্য রাখা হয় তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনপূর্বক। অর্থাৎ বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে এতটা তুচ্ছ মনে করে যে, তার নাম মুখে নেওয়ার অযোগ্য। যেমন- কেউ বলল **مُسَوِّسٌ سَاعٍ فِي** (কুমন্ত্রণা দানকারী, অরাজকতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সুতরাং তার বিরোধিতা করা ওয়াজিব) এ বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ হলো **شیطان** যা বাক্যের শুরুতে উহ্য আছে। এখানে বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে উচ্চারণ করেনি মুসনাদ ইলাইহের প্রতি তাচ্ছিল্যের কারণে, অর্থাৎ শয়তানের নাম নেওয়া থেকে নিজেকে হেফাজত করার জন্য শয়তানের নাম নেয়নি।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে সাধারণভাবে দু' কারণে উহ্য রাখা হয়। ক. মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার কোনো করীনা বাক্যে থাকা। খ. মুসনাদ ইলাইহের **ذكر** ও **حذف**-এর মধ্যে **حذف**-এর দলিল শক্তিশালী হওয়া। এ দু'টির ২য় কারণ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। ২য় কারণের অধীন কয়েকটি বিষয় নিয়ে লেখক এখানে আলোচনা করেছেন।

ক. মুসনাদ ইলাইহের উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা থেকে বাঁচার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে **حذف** করা হয়।

খ. **لفظ** ও **عقل**-এর মধ্যে শক্তিশালী দলিল হলো **عقل**। সুতরাং শক্তিশালী দলিল গ্রহণ করত শাব্দিকভাবে মুসনাদ ইলাইহ **حذف** করা হয়।

গ. করীনা থাকা অবস্থায় শ্রোতার সচেতনতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে **حذف** করা।

ঘ. শ্রোতার সচেতনতার পরিমাণ পরীক্ষার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা।

ঙ. অতি উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে মুসনাদ ইলাইহকে মুখে না আনা।

চ. অতি তুচ্ছ মনে করে মুসনাদ ইলাইহকে মুখে না আনা বা **حذف** করা।

أَوْ تَأْتِي الْإِنْكَارَ أَى تَبْسُرِهِ لَدَى الْحَاجَةِ نَحْوُ فَاجِرٍ فَاسِقٍ عِنْدَ قِيَامِ الْقَرْنَيْنَةِ عَلَى
 أَنَّ الْمُرَادَ زَيْدٌ لِيَتَأْتَى لَكَ أَنْ تَقُولَ مَا أَرَدْتُ زَيْدًا بَلْ غَيْرُهُ أَوْ تَعْنِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذِكْرَ
 الْإِخْتِرَازِ عَنِ الْعَبَثِ يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ ذَكَرَهُ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا الْإِخْتِرَازُ عَنْ سُوءِ الْأَدَبِ
 فِيمَا ذَكَرُوا لَهُ مِنَ الْمِثَالِ وَهُوَ خَالِقٌ لِمَا يَشَاءُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ أَى اللَّهُ تَعَالَى الثَّانِي
 التَّوْطِئَةُ وَالتَّمْهِيدُ لِقَوْلِهِ أَوْ إِدْعَائِهِ التَّعَيْنَ نَحْوُ وَهَابُ الْأَلُوفِ أَى السُّلْطَانُ أَوْ نَحْوِ
 ذَلِكَ كَضَيْقِ الْمَقَامِ عَنْ إطَالَةِ الْكَلَامِ بِسَبَبِ ضَجَرٍ أَوْ سَامَةٍ أَوْ فَوَاتِ فُرْصَةٍ أَوْ مُحَافَظَةٍ
 عَلَى وَزْنٍ أَوْ سَجْعٍ أَوْ قَافِيَةٍ أَوْ مَا أَشَبَهُ ذَلِكَ كَقَوْلِ الصَّبَّادِ غَزَالٌ أَى هَذَا غَزَالٌ وَكَالْإِخْفَاءِ
 عَنْ غَيْرِ السَّامِعِ مِنَ الْحَاضِرِينَ مِثْلُ جَاءَ وَكَاتَبَاعِ الْإِسْتِعْمَالِ الْوَارِدِ عَلَى تَرْكِهِ مِثْلُ
 رَمِيَةٍ مِنْ غَيْرِ رَامٍ أَوْ تَرَكَ نَظَائِرِهِ مِثْلُ الرَّفْعِ عَلَى الْمَذْحِ أَوْ الذَّمِّ أَوْ التَّخْرِيمِ -

অনুবাদ : অথবা প্রয়োজনের সময় অস্বীকারের সুযোগ নেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়।
 যেমন- কেউ বলল **فَاجِرٌ فَاسِقٌ** (পাপী ও অপরাধী) যখন করীনা থাকে এ ব্যাপারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো
 (উদাহরণ স্বরূপ) যায়েদ। যাতে তোমার এ কথা বলার সুযোগ থাকে যে, আমি যায়েদকে উদ্দেশ্য করিনি; বরং
 অন্যকে উদ্দেশ্য করেছি। অথবা (মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়) সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে। সাধারণভাবে বুঝা
 যায় অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা এর আলোচনার (সুনির্দিষ্ট হওয়া) উল্লেখকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছে। কিন্তু
 তারপরেও এটিকে তিনি দু'টি কারণে উল্লেখ করেছেন। (এক) বেআদবি থেকে বিরত থাকা, এর যে উদাহরণ
 তারা পেশ করেছেন তথা **هُوَ خَالِقٌ لِمَا يَشَاءُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ** (তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান সৃষ্টি করেন
 এবং যা ইচ্ছা তাই করেন)। (দুই) তার বাক্য “অথবা সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবির কারণে” এর ভূমিকা হয়েছে
 যেমন- সহস্র জনের দাতা অর্থাৎ বাদশাহ। অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো কারণে। যেমন- পরিস্থিতি দীর্ঘ কথা
 বলার অনুকূল নয়, বিষণ্ণতা এবং বিরক্তির কারণে। অথবা সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কারণে অথবা ছন্দ বা অন্তর্মিল
 রক্ষার ইত্যাদির জন্য। যেমন- শিকারি বলল হরিণ। অর্থাৎ এই হরিণ এবং যেমন- শ্রোতা ছাড়া উপস্থিত অন্য
 ব্যক্তিদের থেকে মুসনাদ ইলাইহ গোপন রাখা (এর জন্য তাকে উহ্য রাখা হয়) যথা- সে আসল এবং যেমন
 মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার ব্যবহার অনুসরণ করার জন্য (তাকে উহ্য রাখা হয়) যথা- **رَمِيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ** (এতে
 মুবতাদা উহ্য রূপে উদাহরণটি প্রচলিত) অথবা মুসনাদ ইলাইহের অনুরূপ ইসম উহ্য হওয়ার ব্যবহারের অনুসরণ
 করত মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়। যেমন- প্রশংসা, নিন্দা, অথবা দয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে মারফু' পড়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ تَأْتِي الْإِنْكَارَ الخ : মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার আরেকটি বিষয় হলো প্রয়োজনের সময় অস্বীকারের
 সুযোগ নেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা। যেমন- কোনো ব্যক্তি বলল **فَاجِرٌ فَاسِقٌ** (মুসনাদ ইলাইহ-কে উহ্য
 রেখে) যখন এ ব্যাপারে প্রমাণ থাকবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যায়েদ। এরপর যায়েদ যদি লোকটিকে বলে- তুমি
 আমাকে **فَاجِرٌ** ও **فَاسِقٌ** কেন বলেছ? এর উত্তরে সে বলবে, জনাব! আমি তো আপনাকে বলিনি; বরং আমি আরেক
 ব্যক্তিকে এ কথা বলেছি। অথবা সে বলতে পারবে যে, আমি তো আপনার নাম উল্লেখ করিনি।

লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে কখনো উহ্য রাখা হয় মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে। যেমন- **مَرْخَالِي**। **لِمَا يَسْتَأْ فَعَالٌ لِمَا يَرْئِدُ** এ বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ হলো **اللَّهُ** যাঁকে সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য রাখা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইতঃপূর্বে আলোচিত মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার একটি কারণ ছিল 'অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা'।

আমরা জানি, যদি কোনো শব্দ জানা থাকে অথবা সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে তার উল্লেখ অনর্থক হয়, সে মতে এখানে মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার যে কারণটি বলা হলো অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট হওয়া এবং পূর্বের অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা তো দু'টি একই হলো। তাই সেটা আলোচনা করার পর এখানে এটি নতুন করে আলোচনা না করলেও চলত; কিন্তু কেন এটিকে আলাদা করে বর্ণনা করা হলো?

এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. বালাগাতবিশারদগণ এই প্রকারের যে উদাহরণ পেশ করেছেন তাকে অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাহলে তা বেআদবির মধ্যে গণ্য হবে। কারণ, তখন বলতে হবে- এ উদাহরণের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ (আল্লাহ)-কে অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে উহ্য রাখা হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ শব্দটি উল্লেখ করা অনর্থক, এটা বেআদবি।

২. অথবা এ প্রকার তথা মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হওয়া সামনের প্রকার **تَغْيِينِ**-এর ভূমিকা।

মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখার আরেকটি প্রকার হলো, মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় তা সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবি করার জন্য। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট নয়; কিন্তু বক্তা তার বক্তব্যে মুসনাদ ইলাইহকে সুনির্দিষ্ট দাবি করে, সে মতে বাক্য পেশ করে। যেমন- কেউ বলল **وَهَابُ الْأَلُرْنِ** হাজারজনকে যে দান করে। এখানে বক্তা তার বক্তব্যের মুসনাদ ইলাইহ **السلطان** বা বাদশাহকে উহ্য রেখেছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এ কাজ একমাত্র বাদশাহের পক্ষেই করা সম্ভব, অন্য কারো পক্ষে নয়। মোটকথা, হাজারজনকে দান করা ধনী প্রজাদের দ্বারাও সম্ভব। কিন্তু এটাকে শুধুমাত্র বাদশাহের জন্য সুনির্দিষ্ট করা (কথাটি যিনি বলেছেন) শুধুমাত্র তার দাবি।

মুসান্নিফ বলেন, আরো বিভিন্ন কারণে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়। যেমন- দুঃখ-ভারাক্রান্ত বা ক্লান্ত-শ্রান্ত হলে কথা দীর্ঘ না করার জন্য কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য করে বাক্য বলা হয়।

এমনিভাবে দীর্ঘ কথা বললে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে এ কারণে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়, যেমন- শিকারি বলে- **غزال** অথচ তার পুরো বাক্যে হলো **هذا غزال** আবার কখনো মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখা হয়- বাক্যের শেষে অনুপ্রাস রক্ষা করার জন্য কিংবা আবার দু' বাক্যের সাথে ছন্দমিল রক্ষার জন্য। আবার কখনো বক্তা নির্দিষ্ট শ্রোতা ছাড়া উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখার জন্য তাকে উহ্য রাখে। যেমন সে বলল, **جاء** (এর ফায়েল উদাহরণস্বরূপ খালেদকে উহ্য করে।)

আবার কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় ঐ প্রবাদকে অনুসরণ করার জন্য যাতে মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রয়েছে। যেমন- **هَذِهِ رَمِيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ**-এর মূলবাক্য হলো **رَمِيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ** এ প্রবাদ বাক্যটি বলা হয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যার দ্বারা অভিহিত কোনো কাজ হয়ে যায়। যেমন- বাংলায় বলা হয় “ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে”।

কথিত আছে, এ প্রবাদটি জৈনিক হাকাম ইবনে আবাদ ইয়াওস প্রথমে বলেছিলেন, ঘটনাটি ছিল এরূপ যে, হাকাম মান্নত করল সে কয়েকটি বন্যগরু শিকার করে তা গাবগাব পাহাড়ে জবাই করবে। সে নিপুণ তীরন্দাজ হওয়া সত্ত্বেও তার তীর শিকার করতে ব্যর্থ হলো। তার এ ব্যর্থতা তাকে আত্মহত্যা করার পথে ধাবিত করল। এ অবস্থা দেখে তার সাথে থাকা তার ছেলে মৃতআম পিতার হাত থেকে ধনুক নিয়ে যেই তীর মারল সাথে সাথেই তীর সফলতা পেল, শিকার হাতে আসল, তা দেখে পিতা হাকাম বলে উঠল **رَمِيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ** যেহেতু প্রবাদ প্রবচনে পরিবর্তন হয় না, তাই এ প্রবাদ মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রূপে প্রচলিত হয়ে গেল।

মুসান্নিফ বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে এমন প্রচলিত ব্যবহারের অনুসরণ করে উহ্য রাখা হয় যে, ব্যবহারে মুসনাদ ইলাইহের উহ্য করা তার নিজের (অনুরূপ ইসম)-এর ক্ষেত্রে হয়েছে।

প্রশংসা-নিন্দা অথবা মমতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেই শব্দটি এ হিসেবে মারফু' বিশিষ্ট পড়া যে, এটি মুসনাদ বা খবর। আর এর মুসনাদ ইলাইহ উহ্য আছে। যেমন- প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হলো **أَمَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَهْلَ الْحَمْدِ** এখানে **أَمَلَّ الْحَمْدُ**-কে **هو**-এর কারণে মারফু' পড়া হলো, মূলবাক্য হবে এরূপ **أَمَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ هُوَ أَهْلُ الْحَمْدِ** মুসনাদ ইলাইহ **هو**-কে উহ্য রাখা হয়েছে।

নিন্দার ক্ষেত্রে বলা হয়- **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** এ বাক্যের **رَجِيم** শব্দটিকে মারফু' সহকারে পড়া হয়েছে নিন্দা বা **ذَم**-এর কারণে। মূলবাক্যটি হলো **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ هُوَ الرَّجِيمُ** এ বাক্য থেকে **الرَّجِيمُ**-এর আগের **هُوَ** মূবতাদা উহ্য রাখা হয়েছে।

অথবা অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয় এবং মুসনাদকে মারফু' পড়া হয়। যেমন- **اللَّهُمَّ أَرْحَمَ عَبْدَكَ** এ বাক্যের **أَلْسِكِينُ** শব্দটিকে অনুগ্রহবশত মারফু' পড়া হয়েছে এবং মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়েছে। পুরো বাক্যটি এরূপ **اللَّهُمَّ أَرْحَمَ عَبْدَكَ هُوَ أَلْسِكِينُ**

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিনটি মুসনাদ ইলাইহকে সেই ব্যবহারের অনুসরণ করত উহ্য রাখা হয়েছে, যে ব্যবহার উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের অনুরূপ মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রে হয়েছে। যেমন- আরবরা **اللَّهُمَّ أَرْحَمَ عَبْدَكَ الْفَقِيرُ**-এর মধ্যে **الْفَقِيرُ**-কে পেশ সহকারে পড়ে এবং এর পূর্বের মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য করে।

এমনিভাবে তারা **أَلْغَيْتُكَ مَرْزُتُ بَرْزِدُ الْغَيْثُ**-এর মধ্যে **أَلْغَيْتُكَ**-কে পেশ সহকারে এবং এর পূর্বের মুসনাদ ইলাইহ **هو**-কে উহ্য রাখে। এমনিভাবে তারা **أَلْكَرْنُمُ لِلَّهِ الْكَرْنُمُ**-এর মধ্যে **أَلْكَرْنُمُ**-কে পেশ দিয়ে পড়ে এবং এর পূর্বের মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখে।

এ উদাহরণগুলোর অনুসরণ করত আমাদের উপরে উদাহরণগুলোর মুসনাদ ইলাইহকে উহ্য রাখা হয়েছে।

মোটকথা, মুসনাদ ইলাইহকে ঐ ব্যবহারের অনুসরণ করত উহ্য রাখা হয় যে, ব্যবহার মুসনাদ ইলাইহের নজিরের মাঝে অর্থাৎ উহ্য রাখার ক্ষেত্রে হয়েছে। যার বর্ণনা এতক্ষণ দেওয়া হলো।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুসনাদ ইলাইহকে কখনো উহ্য রাখা হয় প্রয়োজনে অস্বীকারের সুযোগ নেওয়ার জন্য। যেমন- **فَاسَنَّ فَاجِرٌ**

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহ সুস্পষ্ট হওয়ার কারণে উহ্য রাখা হয়। যেমন- **خَالِقٌ لِمَنْ يَشَاءُ نَعَالٌ لِمَا يَرِيدُ**

গ. কখনো মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হওয়ার দাবি করত তা উহ্য রাখা হয়। যেমন- **وَهَابُ الْأَلْوَبِ**

গ. সময়ের সস্কীর্ণতার কারণে বা বিরক্তির কারণে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে কিংবা কবিতার ছন্দমিল বা বাক্যের অনুপ্রাস রক্ষায় মুসনাদ ইলাইহ উহ্য রাখা হয়।

وَأَمَّا ذِكْرُهُ أَى ذَكَرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِكُونِهِ أَى الذِّكْرِ الْأَصْلَ وَلَا مُقْتَضَى لِلْعُدُولِ عَنْهُ
 أَوِ الْإِحْتِيَاطِ لِضَعْفِ التَّعْوِيلِ أَى الْإِعْتِمَادِ عَلَى الْقَرِينَةِ أَوِ التَّنْبِيهِ عَلَى غِبَاوَةِ
 السَّامِعِ أَوْ زِيَادَةِ الْإِبْطَاحِ وَالتَّفْرِيرِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَ
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَوْ إِظْهَارِ تَعْظِيمِهِ لِكُونِ إِسْمِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعْظِيمِ نَحْوُ أَمِيرِ
 الْمُؤْمِنِينَ حَاضِرٍ أَوْ إِهَانَتِهِ نَحْوُ السَّارِقِ اللَّئِيمِ حَاضِرٍ أَوِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِهِ مِثْلُ النَّبِيِّ
 ﷺ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ اسْتِلْذَافِهِ مِثْلُ الْحَبِيبِ حَاضِرٍ أَوْ بَسْطِ الْكَلَامِ حَيْثُ الْإِضْغَاءُ
 مَطْلُوبٌ أَى فِى مَقَامٍ يَكُونُ إِضْغَاءُ السَّامِعِ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ لِعَظَمَتِهِ وَشَرَفِهِ وَلِهَذَا
 يُطَالُ الْكَلَامُ مَعَ الْأَحْبَاءِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ
 السَّلَامُ هِىَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَقَدْ يَكُونُ الذِّكْرُ لِلتَّهْوِيلِ أَوِ التَّعَجُّبِ أَوِ الْإِشْهَادِ فِى
 قَضِيَّةٍ أَوِ التَّسْجِيلِ عَلَى السَّامِعِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الْإِنْكَارِ -

অনুবাদ : (মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো) একে উল্লেখ করা অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা। কেননা, উল্লেখ করাই হলো আসল এবং এ থেকে অন্য অবস্থাতে যাওয়ার কোনো মুকতয়াও নেই। অথবা (উহ্য রাখার) প্রমাণের উপর নির্ভরতা দুর্বল হওয়ার কারণে। অথবা শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। (বিষয়টিকে) অতিরিক্ত স্পষ্ট ও মজবুত করার জন্য। আল্লাহ তা'আলার বাণী- **أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ** (আয়াত **أُولَئِكَ**-কে অতিরিক্ত স্পষ্ট করার জন্য আনা হয়েছে) অথবা তার সম্মান প্রকাশের জন্য, কেননা, মুসনাদ ইলাইহ এমন ইসম যা সম্মান প্রদর্শন করে। যেমন- **أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَاضِرٌ** (মু'মিনগণের নেতা উপস্থিত)। এখানে **أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ** এমন ইসম যা তার ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শন করছে। অথবা তার তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য, যেমন- **السَّارِقُ اللَّئِيمُ حَاضِرٌ** (নিকৃষ্ট চোর উপস্থিত) অথবা তার নাম উল্লেখ করত বরকত লাভ করা। যেমন- **النَّبِيُّ ﷺ** (মহানবী ﷺ এই উক্তিটির প্রবক্তা)। অথবা মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা সুখ লাভ করার জন্য। যেমন- **الْحَبِيبُ حَاضِرٌ** (বন্ধু উপস্থিত)। অথবা বাক্যকে দীর্ঘায়িত করা যেখানে প্রিয়জনকে কথা শোনানো উদ্দেশ্য অর্থাৎ এমন স্থানে যেখানে শ্রোতাকে তার সম্মান ও মর্যাদার কারণে কথা শোনানো বক্তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর এ কারণে প্রিয়জনদের সাথে কথা দীর্ঘায়িত করা হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী যা তিনি হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন (হযরত মুসা (আ.) বললেন) এটি আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই, এর দ্বারা আমার মেসপালের জন্য গাছ থেকে পাতা ঝরাই এবং এর দ্বারা আমার অনেক প্রয়োজন পূরণ হয়। কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় ভয় দেখানোর জন্য অথবা বিস্ময় প্রকাশের জন্য কিংবা কোনো বিষয়ের সাক্ষাৎ দেওয়ার জন্য নতুবা শ্রোতার কাছে বিষয়টি পাকাপোক্ত করার জন্য যাতে তার কোনো ধরনের অস্বীকারের সুযোগ না থাকে।

কখনো বিষয় প্রকাশের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়। যেমন- صَبِيٍّ قَاوِمٍ الْأَسَدَ অর্থাৎ একটি শিশু সিংহের সাথে লড়েছে। এখানে মুসনাদ ইলাইহ-কে বিষয় প্রকাশের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় সাক্ষী রাখার জন্য, যাতে পরবর্তীতে অস্বীকারের কোনো সুযোগ না থাকে। যেমন- ইমরান প্রশ্ন করল আদনানকে (যে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল) সে কি এ বস্তুটি এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে?

এর জবাবে আদনান বলল, খালেদ এত টাকার বিনিময় অমুকের কাছে বিক্রয় করেছে। এখানে মুসনাদ ইলাইহ খালেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে খালেদ বা অন্য কেউ তাতে অস্বীকার করতে না পারে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয় শ্রোতার মনে বিষয়টিকে গেঁথে দেওয়ার জন্য, যাতে সে শ্রোতা অস্বীকার করার সুযোগ না পায়। যেমন- বিচারক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল هَلْ أَقْرَزْتُكَ بِكَذَا-এর উত্তরে প্রত্যক্ষদর্শী বলল أَقْرَزْتُكَ عَلَيْهِ بِكَذَا এখানে মুসনাদ ইলাইহ-কে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে গেঁথে দেওয়ার জন্য।

সার-সংক্ষেপ :

উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে বাক্যে উল্লেখ করার কতিপয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করাই যেহেতু সাধারণ নিয়ম তাই মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়।

খ. মুসনাদ ইলাইহ উহ রাখার করীনা দুর্বল হওয়ার কারণে উল্লেখ করা হয়।

গ. শ্রোতাকে সতর্ক করা অতিরিক্ত স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করা হয়।

ঘ. সম্মান প্রদর্শনের জন্য বা তুচ্ছতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে উল্লেখ করা হয়।

ঙ. বরকত হাসিলের জন্য কিংবা সুখ লাভ করার জন্যও মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করা হয়।

وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ أَيَّ إِبْرَادِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً وَأَيْمًا قَدَّمَ هَهُنَا التَّعْرِيفَ وَفِي الْمُسْنَدِ
التَّنْكِيرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ التَّعْرِيفُ وَفِي الْمُسْنَدِ التَّنْكِيرُ فَبِالْإِضْمَارِ لِأَنَّ
الْمَقَامَ لِلْمُتَكَلِّمِ نَحْوُ أَنَا ضَرَبْتُ أَوْ الْخِطَابِ نَحْوُ أَنْتَ ضَرَبْتَ أَوْ الْغَيْبَةِ لِتَقْدِيمِ ذِكْرِهِ
إِمَّا لَفْظًا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَإِمَّا مَعْنَى بَدَلَالَةٍ لَفْظٍ عَلَيْهِ أَوْ قَرِينَةٍ حَالٍ وَإِمَّا حُكْمًا
وَأَصْلُ الْخِطَابِ أَنْ يَكُونَ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْمَعَارِفِ عَلَى أَنْ
تُسْتَعْمَلَ لِمُعَيَّنٍ مَعَ أَنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ إِلَى حَاضِرٍ -

অনুবাদ : মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে আনয়ন করা (একটি অবস্থা)। এখানে তিনি معرفة এর আলোচনা আগে এনেছেন; অথচ মুসনাদের মধ্যে (نكره) অনির্দিষ্টকরণকে আগে এনেছেন। এর কারণ হলো মুসনাদ ইলাইহের আসল হলো নির্দিষ্ট হওয়া, আর মুসনাদের অনির্দিষ্ট হওয়া। (مسند নির্দিষ্ট করা হয়) সর্বনামের দ্বারা, কেননা (কথাবার্তার মধ্যে) স্থানটি হবে উত্তম পুরুষের, যেমন- أَنَا ضَرَبْتُ (আমি প্রহার করলাম) অথবা মধ্যম পুরুষের, যেমন- أَنْتَ ضَرَبْتَ (তুমি প্রহার করলে) অথবা নাম পুরুষের-এর আলোচনা অতীত হওয়ার কারণে শাব্দিকভাবে, বাস্তবে অথবা উহ্যভাবে। অথবা অর্থগত শব্দ এর উপর ইঙ্গিত করার বা পরিস্থিতির প্রমাণের কারণে অথবা ছকুমের দিক থেকে। আর মধ্যম পুরুষ মূলত নির্দিষ্ট জনের জন্যই হয়, সেটা এক হোক অথবা অনেক। কেননা, মারেফাসমূহের উৎপত্তিই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। সেই সাথে মধ্যম পুরুষতো উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি বাক্য ব্যবহার করাকেই বলা হয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ الخ : এখান থেকে মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থার আলোচনা শুরু হয়েছে। তা হচ্ছে- মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা। নির্দিষ্ট বিশেষ্য সাত প্রকার : ১. ضَمِير (সর্বনাম), ২. عَلَم (নামবাচক বিশেষ্য), ৩. ইসমে মাওসূল, ৪. ইসমে ইশারা ৫. আলিফ লাম দ্বারা নির্দিষ্টকরণ, ৬. إِصْفَاء (সম্বন্ধের সাহায্যে নির্দিষ্টকরণ) ও ৭. نِدَاء (আহ্বানের মাধ্যমে নির্দিষ্টকরণ)। প্রথমে মূল লেখক সর্বনাম দ্বারা নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্যের আলোচনা শুরু করেছেন।

قَوْلُهُ أَيْمًا قَدَّمَ هَهُنَا الخ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের অবসান ঘটান। প্রশ্নটি হলো, মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে নির্দিষ্টকরণের আলোচনা প্রথমে আনা হলো কেন? অথচ আমরা দেখি মুসনাদের মধ্যে অনির্দিষ্টকরণের আলোচনা প্রথমে আনা হয়েছে।

এর উত্তরে তিনি বলেন, মুসনাদের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হওয়া নিয়মাবদ্ধ ও রীতিগত, পক্ষান্তরে মুসনাদ ইলাইহের জন্য নির্দিষ্ট হওয়াই নিয়ম ও বিধি সম্মত। তাই মূল নিয়মের অনুসরণ করত মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে নির্দিষ্টকরণ নিয়ে প্রথমে আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَبِالْإِضْمَارِ لِأَنَّ الخ : মুসানাদ ইলাইহের নির্দিষ্টকরণের একটি পন্থা হলো সর্বনাম ব্যবহার করা। অর্থাৎ সর্বনামকে মুসনাদ ইলাইহ বানিয়ে দেওয়া। সর্বনামকে মুসনাদ ইলাইহ বানানোর কারণ হচ্ছে- বাক্যের অবস্থা তিনটি, হয়তো উত্তম পুরুষের হবে কিংবা মধ্যম পুরুষের হবে অথবা নাম পুরুষের হবে। উদাহরণ স্বরূপ খালিদ আমরকে বলল- مَن أَكْرَمَ رَبِّدًا (যায়েদকে কে সম্মান করেছে?) এখন যদি আমার স্বয়ং তাকে সম্মান করে থাকে, তাহলে সে (উত্তম পুরুষ) বলবে, আমি সম্মান করেছি। আর যদি অবস্থা এমন যে, প্রশ্নকারী নিজেই সম্মান করে থাকে, তাহলে আমার বলবে তুমি (মধ্যম পুরুষ) সম্মান করেছে। আর যদি অনুপস্থিত কোনো (নাম পুরুষ) ব্যক্তি সম্মান করে থাকে এবং সে ব্যক্তির নাম পূর্বে আলোচিত হয়ে থাকে, তাহলে আমার বলবে সে (নাম পুরুষ) সম্মান করেছে।

قَوْلُهُ لَتَقْدِرُنَّ ذَرِيرَهُ إِنَّا لَنُظَا تَحْقِيقًا : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) নাম পুরুষের আলোচনা বিস্তারিতভাবে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, যদি বাক্যের ব্যবহার নাম পুরুষের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে একে অনুপস্থিত সর্বনামের দ্বারা নির্দিষ্ট করে বলা হবে। তার কারণ হচ্ছে, এর আলোচনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

উক্ত সর্বনামের বিশেষ্য পূর্বের আলোচনাতে যাওয়ার তিনটি পস্থা হতে পারে— ১. শাব্দিকভাবে (لَفْظِي) গেছে, ২. অর্থগতভাবে (مَعْنَوِي) গেছে, ৩. বিধিগত ভাবে (حُكْمِي) গেছে।

শাব্দিকভাবে যাওয়ার অবস্থা দু'ধরনের— ১. لَفْظِي تَقْدِيرِي ২. لَفْظِي تَحْقِيقِي

১ম প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে— زَيْدٌ يَضْرِبُ -এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে এর বিশেষ্য (زَيْدٌ) শাব্দিকভাবে এবং বাস্তবিকপক্ষেই এর আগে উল্লেখ আছে।

২য় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে— فِي دَارِهِ زَيْدٌ এ বাক্যে دَارِهِ-এর সর্বনামের বিশেষ্য (زَيْدٌ) যেহেতু মুবতাদা। আর মুবতাদা মর্যাদাগতভাবে অগ্রগামী হয়ে থাকে। তাই যদিও এটি শাব্দিকভাবে এবং বাস্তবে সর্বনামের আগে আসেনি; কিন্তু মর্যাদাগতভাবে আগে এসেছে, কেননা زَيْدٌ فِي دَارِهِ -এর মূল ইবারত دَارِهِ, অতএব এটি تَقْدِيرًا لَفْظًا আগে এসেছে।

সর্বনামের বিশেষ্য অর্থগতভাবে পূর্বে যাওয়ারও দু'টি সুরত হতে পারে (ক) সে বিশেষ্যের উপর কোনো শব্দ দিক নির্দেশ করবে। অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর প্রতি দিক নির্দেশ করবে।

১ম প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে— إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى এ বাক্যের هُوَ সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে عَدْلٌ (যা শাব্দিকভাবে ভিন্ন করে তো যায়নি) যা إِعْدِلُوا-এর মধ্যে অর্থগতভাবে গেছে এবং إِعْدِلُوا তার প্রতি ইঙ্গিত করছে।

২য় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে— وَلَآئِيهِ -এর সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে মৃতব্যক্তি। এর বিশেষ্য অর্থগতভাবে আগে গেছে। কেননা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তথা মৃতব্যক্তির সম্পদ বা উত্তরাধিকারী সম্পদের আলোচনা এ কথার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তার পিতা বলতে এখানে মৃতব্যক্তির পিতাকেই বুঝানো হয়েছে।

সর্বনামের বিশেষ্য حُكْمِي বিধিগতভাবে আগে যাওয়ার উদাহরণ হচ্ছে رُبُّهُ رَجُلًا এবং هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ। প্রথম বাক্যের "هُوَ" এবং দ্বিতীয় বাক্যের هُوَ সর্বনামের বিশেষ্যদ্বয় যদিও শাব্দিকভাবে সর্বনামদ্বয়ের পরে এসেছে; কিন্তু বিধিগতভাবে আগেই এসেছে। এর কারণ হচ্ছে প্রকৃতভাবে সর্বনামের বিশেষ্য আগেই থাকে, কিন্তু কখনো কোনো পরিস্থিতির কারণে এর ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন— تَفْصِيلٌ بَعْدَ الْإِجْمَالِ (সংক্ষেপের পর বিস্তারিত বর্ণনা) ইত্যাদির কারণে যদিও বা বিশেষ্যটি পরে আসছে, কিন্তু বিধিগতভাবে উক্ত বিশেষ্যকে অগ্রগামীই ধরা হবে।

قَوْلُهُ وَأَصْلُ الْخِطَابِ أَنْ يَكُونَ لِمُعَيَّنٍ : বিধিগতভাবে خِطَابٌ (সম্বোধন) নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, সেই নির্দিষ্ট সম্বোধিত একজনও হতে পারে, একাধিকও হতে পারে। সম্বোধিত ব্যক্তি বলে মধ্যম পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। অতএব, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম সর্বদাই বিধিগতভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং বস্তু বা বস্তুসমূহের জন্যই হবে।

মূল লেখকের উক্ত দাবির পক্ষে মুসান্নিফ দু'টি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন— ১. أَصْلُ وَضْعِ النَّمَارِ عَلَى أَنْ مَعْرِفَةُ (নির্দিষ্ট বাক্যে বিশেষ্য) নির্দিষ্ট বস্তুর বা ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে। মধ্যম পুরুষের সর্বনামও যেহেতু নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য সেহেতু এটি নির্দিষ্ট বস্তু অথবা ব্যক্তির জন্যই হবে।

২. خِطَابٌ. إِنَّ الْخِطَابَ هُوَ تَرْجِيءُ الْكَلَامِ إِلَى حَاضِرٍ (সম্বোধন) বলা হয় কথক তার কথা উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি প্রেরণ করা অর্থাৎ উপস্থিত আছে এমন ব্যক্তির সামনে কথাকে উপস্থাপন করা। যে ব্যক্তি উপস্থিত সে নিশ্চিতভাবেই নির্দিষ্ট। অতএব এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার হওয়া তার একটি অবস্থা। মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট হয় সর্বনাম ব্যবহার করার দ্বারা। সর্বনাম তিনভাবে ব্যবহৃত হয়, বাক্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি উত্তম পুরুষের হয় তখন মুতাকাল্লিমের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। আর যদি মধ্যম পুরুষের হয়, তাহলে حَاضِر -এর সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। এছাড়া যদি বাক্যের ব্যবহার এমন নাম পুরুষের ক্ষেত্রে হয় যার আলোচনা কোনো একভাবে গত হয়ে থাকে, তাহলে নাম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। মধ্যম পুরুষের ব্যবহার সাধারণভাবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য হয়ে থাকে।

وَقَدْ يُتْرَكَ الْخِطَابُ مَعَ مُعَيَّنٍ إِلَى غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ لِيَعْمَ الْخِطَابُ كُلَّ مُحَاظٍ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ نَحْوُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَرَى مُحَاظًا مُعَيَّنًا قَصْدًا إِلَى تَفْطِيعِ حَالِ الْمُجْرِمِينَ أَيْ تَنَاهَتْ حَالُهُمْ فِي الظُّهُورِ لِأَهْلِ الْمَخْشَرِ حَيْثُ يَمْتَنِعُ خِفَاؤُهَا فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا رُؤْيَا رَأٍ دُونَ رَأٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ أَيْ بِهَذَا الْخِطَابِ مُحَاظٌ دُونَ مُحَاظٍ بَلْ كُلُّ مَنْ يَتَأْتِي مِنَ الرُّؤْيَا فَلَهُ مَدْخَلٌ فِي هَذَا الْخِطَابِ وَفِي بَعْضِ التَّنْسِخِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا أَيْ بِرُؤْيَا حَالِهِمْ مُحَاظٌ أَوْ بِحَالِهِمْ رُؤْيَا مُحَاظٍ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ -

অনুবাদ : কখনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন না করে অনির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি করা হয় যাতে সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতাকে স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন- যখন তুমি অপরাধীদেরকে আপন প্রভুর সামনে অবনত মস্তক দেখতে পাবে। তিনি (আল্লাহ) নিজ উক্তি *لَوْ تَرَى* দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট শ্রোতাকে ইচ্ছা করেননি, অপরাধীদের শোচনীয় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অর্থাৎ হাশরবাসীদের সামনে এদের অবস্থা ভয়াবহ হবে, যা গোপন করা অসম্ভব হবে। ফলে তাদের অবস্থা কতিপয় লোকদের দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে না এবং এ সম্বোধনের কোনো শ্রোতা বিশেষভাবে খাস হবে না; বরং যাদের পক্ষেই দেখা সম্ভব তারা (সকলেই) উক্ত সম্বোধনের আওতাভুক্ত থাকবে। অন্য নুসখায় (*لَا يَخْتَصُّ بِهَا*-এর স্থলে) *لَا يَخْتَصُّ بِهِ* রয়েছে। অর্থাৎ *رُؤْيَا حَالِهِمْ* তাদের অবস্থা দেখার মাঝে কোনো শ্রোতা খাস নয় অথবা *رُؤْيَا مُحَاظٍ* বা তাদের অবস্থার সাথে কোনো শ্রোতার দর্শন খাস নয়। উভয় সুরতে মুযাফ উহ্য থাকবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَدْ يُتْرَكَ الْخِطَابُ : মধ্যম পুরুষের সর্বনাম তথা *حَاضِر*-এর সর্বনাম তো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়ে থাকে। তবে কখনো কোনো উদ্দেশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে। এমনই একটি ব্যতিক্রম নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, কখনো নির্দিষ্ট শ্রোতার সম্বোধনকে অনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি করা হয় মাজাযে মুরসাল হিসেবে। যাতে করে উক্ত সম্বোধন সকলের প্রতি এক একজন করে প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন- *عِنْدَ رَبِّهِمْ* আয়াতের *لَوْ* "حرف شرط" উল্লিখিত পুরো বাক্য শর্ত। এর জওয়াব উহ্য আছে। জওয়াব হলো *فَطِيعًا* অর্থাৎ যদি তুমি অপরাধীদের অবনত মস্তক অবস্থায় তাদের প্রভুর সামনে দেখতে পাও তাহলে তুমি ভয়ানক অবস্থা দেখতে পাবে। আয়াতে *تَرَى* ফেলের ফায়েল হলো *أَنْتَ* উহ্য সর্বনাম। এখানে *أَنْتَ* দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং কিয়ামতের ময়দানের সব মানুষ একেক জন স্বতন্ত্রভাবে উক্ত সর্বনামের বিশেষ্য। আয়াতে সম্বোধিত ব্যক্তি ব্যাপক রাখার উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের সবার সামনে অপমানিত এবং লাঞ্চিত করা। তাদের মন্দ ও অন্যায় কাজের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান সবার সামান প্রদর্শন করতে চান, যাতে উপস্থিত সব লোক তাদের দেখে এবং এতে করে তাদের লজ্জার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাদের এ অবস্থা হাশরের ময়দানের লোকদের সামনে গোপন থাকবে না; বরং যাদের চোখ আছে তারা সকলেই তাদের দেখতে পাবে। এমন হবে না যে, কতিপয় লোকতো দেখবে, কিন্তু অন্যরা তাদের দেখতে পাবে না; বরং সকলেই তাদের শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করবে। তাই আল্লাহ তা'আলা *تَرَى*-কে ব্যাপক অর্থে এখানে ব্যবহার করেছেন, নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেননি।

مُحَاظٌ : এর মধ্যে *يَه*-এর সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে *خُطَابٌ* আর *يَخْتَصُّ*-এর ফায়েল হলো *مُحَاظٌ* অন্য অনুলিপিতে *فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا* আছে। *بِهَا*-এর বিশেষ্য হচ্ছে *رُؤْيَا* অথবা *حَالِهِمْ* তখন ইবারত হবে *رُؤْيَا* *فَلَا يَخْتَصُّ بِرُؤْيَا* (মুযাফ) *رُؤْيَا*-এর আগে *حَالِهِمْ* ১ম অবস্থায় ইবারতের মধ্যে *حَالِهِمْ*-এর আগে *رُؤْيَا* (মুযাফ) উহ্য আছে।

وَبِالْعَلَمِيَّةِ أَيْ تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِإِرَادِهِ عَلَمًا وَهُوَ مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مَعَ جَمِيعِ
 مَشَخَّصَاتِهِ لِاحْتِضَارِهِ أَيْ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ أَيْ بِشَخْصِهِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُتَمَيِّزًا عَنْ
 جَمِيعِ مَا عَدَاهُ وَاحْتَرَزَ بِهَذَا عَنْ احْتِضَارِهِ بِاسْمِ جَنْسِهِ نَحْوُ رَجُلٍ عَالِمٍ جَاءَ نِي فِي ذَهْنِ
 السَّامِعِ ابْتِدَاءً أَيْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْوِ جَاءَ نِي زَيْدٌ وَهُوَ رَاكِبٌ بِاسْمِ مُخْتَصِرٍ بِهِ أَيْ
 بِالْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْوَضْعِ عَلَى غَيْرِهِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ احْتِضَارِهِ
 بِضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ الْمُخَاطَبِ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ وَالْمَوْصُولِ وَالْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْعَهْدِ وَالْإِضَافَةِ
 وَهَذِهِ الْقِيُودُ لِتَحْقِيقِ مَقَامِ الْعَلَمِيَّةِ وَالْأَفَالِقِيْدُ الْأَخِيرُ مُغْنٍ عَمَّا سَبَقَ وَقِيلَ وَاحْتَرَزَ
 بِقَوْلِهِ ابْتِدَاءً عَنِ الْإِحْضَارِ بِشَرْطِ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ كَمَا فِي الْمُضْمِرِ الْغَائِبِ وَالْمُعَرَّفِ بِلَامِ
 الْعَهْدِ فَإِنَّهُ يُشْتَرِطُ تَقَدُّمُ ذِكْرِهِ وَالْمَوْصُولُ فَإِنَّهُ يُشْتَرِطُ تَقَدُّمُ الْعِلْمِ بِالصِّلَةِ وَفِيهِ
 نَظَرٌ لِأَنَّ جَمِيعَ طُرُقِ التَّعْرِيفِ كَذَلِكَ حَتَّى الْعِلْمِ فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ الْعِلْمِ بِالْوَضْعِ -

অনুবাদ : এবং নাম দ্বারা অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় নামবাচক বিশেষ্য দ্বারা । আর এটি (নামবাচক বিশেষ্য) হচ্ছে এমন শব্দ যাকে গঠন করা হয়েছে নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য, তার সার্বিক বৈশিষ্ট্যসহ মুসনাদ ইলাইহকে সুনির্দিষ্টরূপে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে । আর তা এমনভাবে যে, এটি তার বিপরীত সব কিছু থেকে যেন স্বতন্ত্র হয়ে যায় । এ (بِعَيْنِهِ) কয়েদ দ্বারা ইসমে জিনস দ্বারা উপস্থিত করার বিষয়টি সংজ্ঞা থেকে খারিজ করে দিয়েছেন, যেমন- رَجُلٌ عَالِمٌ جَاءَ نِي (একজন জ্ঞানী ব্যক্তি আমার কাছে এসেছেন) । (মুসনাদ ইলাইহকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করা) শ্রোতার মনে প্রাথমিকভাবে অর্থাৎ প্রথমবার (ابْتِدَاءً) এ কয়েদের দ্বারা জাতীয় উদাহরণ থেকে সংজ্ঞাকে মুক্ত রেখেছেন, এমন ইসম দ্বারা যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস । এভাবে যে, উক্ত ব্যবহারে এটাকে অন্য কারোর উপর প্রয়োগ করা যায় না । اسمٌ مُخْتَصَرٌ কয়েদ দ্বারা উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা উপস্থিত করা থেকে সংজ্ঞাটিকে মুক্ত করেছেন । তদ্রূপ ইসমে মাওসূল, ইসমে ইশারা, আলিফ লাম দ্বারা নির্দিষ্ট এবং ইযাফাত দ্বারা নির্দিষ্ট ইসম থেকেও । মুসান্নিফ বলেন, এসব কয়েদ নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রটিকে নিশ্চিত করার জন্য । অন্যথা শেষের কয়েদটি আগের যাবতীয় কয়েদকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছে । তার শব্দ (ابْتِدَاءً-কে (সংজ্ঞার মধ্যে) নেওয়া হয়েছে (যার আলোচনা অতীত হয়েছে) এমন সব ইসমকে উপস্থিত করা থেকে মুক্ত করার জন্য । যেমন- নাম পুরুষের সর্বনামের মধ্যে এবং আলিফ লাম বিশিষ্ট নির্দিষ্টবাচক শব্দের মধ্যে । কেননা, এর মধ্যেও এর আলোচনা হওয়া শর্ত এবং ইসমে মাওসূলের মধ্যে, কেননা, এর মধ্যেও সিলাহ সম্পর্কিত জ্ঞান পূর্বে থাকা শর্ত । কিন্তু এতে আপত্তি রয়েছে । কেননা, নির্দিষ্টজ্ঞাপক সম ইসমের মধ্যে এ শর্ত প্রযোজ্য হচ্ছে । এমনকি নামবাচক বিশেষ্যও । কেননা, এতেও নামের মনোনয়ন সম্পর্কে থেকে জানা শর্ত ।

৩. ইসমে মাওসূল, ইসমে মাওসূল দ্বারাও মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ইসমে মাওসূল ও মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়। যেমন- **الَّذِي يَفُوزُ فِي الْإِمْتِحَانِ حَاضِرٌ** (যে পরীক্ষায় সফল হয় সে উপস্থিত) এ বাক্যে **الَّذِي** মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে প্রথমবারেই উপস্থিত করেছে। কিন্তু যেহেতু এটি এমন বিশেষ্য নয় যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস, তাই তা সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে; বরং **الَّذِي** প্রত্যেক একক পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪. আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট। আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে, এমন বিশেষ্য যদিও মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে প্রথমবার উপস্থিত করে, কিন্তু এটি মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস না হওয়ার কারণে মুসনাদ ইলাইহের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন- **الذِّكْرُ** উদাহরণের **الذِّكْرُ كَالْأُنْثَى** (আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে) যদিও মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে এবং তা শ্রোতার মনে নির্দিষ্টভাবে পৌঁছেছে, তথাপি এটি মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়; বরং **أَيْفٌ** প্রত্যেক নির্দিষ্ট শব্দের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

৫. ইয়াফাত (সম্বন্ধ)-এর দ্বারা নির্দিষ্ট জ্ঞাপক হওয়া। উল্লেখ্য যে, **يَذُ** ছাড়া যে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ্য-এর প্রতি সম্বন্ধ করা হলে সম্বন্ধকৃত অনির্দিষ্ট বিশেষ্যটি নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে প্রথমবার উপস্থিত করা হয়। যেমন- **كَلِمَى كَاتِبٍ** এ বাক্যের মুসনাদ ইলাইহকে ইয়াফাত প্রথমবার উপস্থিত করলেও এ ইয়াফাত যেহেতু এ মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়, তাই একে নামবাচক বিশেষ্য বলা যাবে না। মুসান্নিফ (র.) বলেন, **يَعْنِيهِ** এবং **إِنِّدَاءٌ**-এর কয়েদ মূলত আলম (নামবাচক বিশেষ্য)-এর অবস্থানকে সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। নামবাচক বিশেষ্যের জন্য তো **يَا سَمٍ مُّخْتَصِّ بِهٖ** এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট।

قَوْلُهُ وَقِيلَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إِنِّدَاءٌ عَنِ الْأَحْضَارِ الْخ এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ **إِنِّدَاءٌ** এ কয়েদটির ব্যাপারে কতিপয় লোকদের ব্যাখ্যা উল্লেখ করত তা খণ্ডন করেছেন। তারা বলেন, **إِنِّدَاءٌ**, কয়েদটি দ্বারা এসব ইসমকে সংজ্ঞা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যেগুলোর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের আলোচনা আগে যাওয়া শর্ত। অতএব, তাদের মতানুসারে **إِنِّدَاءٌ**-এর অর্থ হলো কোনো শর্ত ছাড়া। তাহলে পুরো বাক্যের অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে উপস্থিত করা শর্তহীনভাবে। সুতরাং তাদের বক্তব্য অনুসারে সংজ্ঞা থেকে এমন ইসম বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে তার আলোচনা পূর্বে যাওয়া শর্ত। যেমন- ১. নামপুরুষের সর্বনাম তা সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এর মধ্যে তার **مَرْجِعٍ** আগে যাওয়া শর্ত ২. আলিফ লাম (**عَهْدٌ**) দ্বারা যেসব ইসম নির্দিষ্ট হয়েছে। কেননা, এসব ইসমের আলোচনাও আগে অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। ৩. ইসমে মাউসূল, এটিও সংজ্ঞার আওতায় আসবে না; বরং **إِنِّدَاءٌ**-এর কয়েদ দ্বারা বের হয়ে যাবে। কেননা, এর মধ্যে সিলাহ সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান না থাকা অবস্থায় ইসমে মাওসূলের ব্যবহার সঠিক নয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কতিপয় লোকের **إِنِّدَاءٌ**-এর এরূপ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। তা ছাড়া তাদের ব্যাখ্যা মতে কয়েকটি বিশেষ্যকে **إِنِّدَاءٌ**-এর কয়েদ দ্বারা বাদ দেওয়া এবং কয়েকটিকে সংজ্ঞার আওতায় রাখাও সঠিক নয়। কেননা, তাদের ব্যাখ্যামতে নির্দিষ্টজ্ঞাপক প্রত্যেকটি ইসমই সমান অর্থাৎ প্রত্যেকটির মধ্যেই পূর্ব জ্ঞান থাকা জরুরি, এমনকি **عَلَّمَ** (নামবাচক বিশেষ্য)-এর মধ্যে নামের মনোনয়ন সম্পর্কে ব্যবহারের আগে অবগত হওয়া জরুরি। অতএব, পূর্বে অবগত হওয়ার শর্তারোপ করে কতককে বাদ দেওয়া, আর কতককে রাখা সঠিক নয়; বরং প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জ্ঞাপক বিশেষ্যের মধ্যে পূর্বজ্ঞান থাকা জরুরি, এমনকি নামবাচক বিশেষ্যের মধ্যেও। সুতরাং তাদের ব্যাখ্যা মতে তো নামবাচক বিশেষ্যের সংজ্ঞা থেকে নামবাচক বিশেষ্য বের হয়ে যাচ্ছে। অতএব তাদের এ মতকে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। **إِنِّدَاءٌ** দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমবারই হবে যা মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

কোনো মুসনাদ ইলাইহ যখন নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয় তখন তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। **عَلَّمَ** বলা হয় মুসনাদ ইলাইহকে বিশেষ নামে তার সন্তোষ প্রথমবারেই শ্রোতার মনে উপস্থিত করা।

মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের সংজ্ঞায় বর্ণিত কয়েদগুলোর **فَرَايِدُ** বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, **يَعْنِيهِ**-এর কয়েদ দ্বারা 'ইসমে জিনস'-এর সাহায্যে উপস্থিত করার বিষয়টি খারিজ করা হয়েছে।

إِنِّدَاءٌ-এর কয়েদ দ্বারা নাম পুরুষের সর্বনামকে খারিজ করা হয়েছে। **إِسْمٌ مُّخْتَصِّ بِهٖ**-এর কয়েদ দ্বারা উত্তম পুরুষের সর্বনাম ও মধ্যমপুরুষের সর্বনাম, ইসমে মাউসূল, ইসমে ইশারা, 'আলিফ-লাম'-এর সাহায্যে নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্য ও 'ইয়াফাত' দ্বারা নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্য সবই খারিজ হয়ে গেছে।

نَحْوُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاللَّهُ أَصْلُهُ إِلَّا لَهُ حُذِفَتِ الْهَمْزَةُ وَعَوِضَتْ عَنْهَا حَرْفُ التَّعْرِيفِ
ثُمَّ جُعِلَ عَلَمًا لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ الْخَالِقِ لِلْعَالَمِ وَ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ اسْمٌ لِمَفْهُومِ
الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ أَوْ الْمُسْتَحِقِّ لِلْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَكُلٌّ مِنْهَا كِلَىٌّ اِنْحَصَرَ فِي فَرْدٍ فَلَا يَكُونُ
عَلَمًا لِأَنَّ مَفْهُومَ الْعَلَمِ جُزْئِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّا لَا نَسَلِّمُ أَنَّهُ اسْمٌ لِهَذَا الْمَفْهُومِ الْكِلَى
كَيْفَ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ اسْمًا
لِمَفْهُومِ كِلَىٍّ لَمَا أَفَادَتِ التَّوْحِيدَ لِأَنَّ الْكِلَىَّ مِنْ حَيْثُ هُوَ كِلَىٌّ يَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ -

অনুবাদ : যেমন- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এর মধ্যে اللَّهُ শব্দটির মূল হলো الْإِلَهُ; হামযাকে বিলুপ্ত করত এর পরিবর্তে নির্দিষ্টজ্ঞাপক 'আলিফ লাম' আনা হয়েছে। এরপর এটিকে নামবাচক বিশেষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ সত্তার জন্য, যিনি জগতের স্রষ্টা এবং যার অস্তিত্ব অবশ্যজ্ঞাবী। কতিপয় লোক মনে করেন এটি যার সত্তা অবশ্যজ্ঞাবী অথবা যিনি ইবাদতের উপযুক্ত এমন বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতকারী বিশেষ্য বা اسْم (এ অর্থে) এদের প্রত্যেকটি এমন কِلَى যা একটি মাত্র فَرْد-এর মাঝে সীমাবদ্ধ। সুতরাং (এ অবস্থায়) এটি নামবাচক বিশেষ্য নয়। কেননা, নামবাচক বিশেষ্যের অর্থ جَزْئِي এ মতে আপত্তি রয়েছে, কারণ আমরা এ কথা সমর্থন করি না যে, এটি একটি কِلَى-এর অর্থ প্রদানকারী বিশেষ্য। আর এ অভিমত কি করে (সমর্থন করা) সম্ভব, যেখানে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, আমাদের উক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ হাচ্ছে তাওহীদের কালিমা (একত্ববাদ প্রমাণের বাক্য) যদি আল্লাহ শব্দটি কোনো কِلَى-এর অর্থ প্রদানকারী হয়, তাহলে তো এ বাক্য একত্ববাদ প্রমাণ করবে না। কেননা, যে কোনো কِلَى তার কুলী হওয়ার দাবি মতে তার অধীন অধিক فَرْد হওয়ার সম্ভবনা রাখে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক নামবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ হলো قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, এ বাক্যের اللَّهُ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ। এ বাক্যের هُوَ হলো প্রথম মুবতাদা, اللَّهُ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। أَحَدٌ হলো দ্বিতীয় মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে ১ম মুবতাদার খবর অথবা هُوَ হলো মুবতাদা اللَّهُ হলো মুবতাদা مِنْهُ মিলে মুবতাদার খবর। এখান ঐ ও তার مِنْهُ মিলে মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ فَاللَّهُ أَصْلُهُ إِلَّا لَهُ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, اللَّهُ শব্দের মূল হাচ্ছে إِلَهُ, এর হামযাটিকে নির্দিষ্টজ্ঞাপক আলিফ লাম দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর লামকে লামের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ جُعِلَ عَلَمًا : এখান থেকে আল্লাহ শব্দের হাকীকত সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বলেন, اللَّهُ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য, এটি সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও অবশ্যজ্ঞাবী অস্তিত্বের অধিকারী সত্তার নাম।

قَوْلُهُ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আল্লাহ শব্দের হাকীকত সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মায়হাব উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, কতিপয় লোক মনে করে আল্লাহ হাচ্ছে একটি مَفْهُوم كِلَى যার একটি মাত্র فَرْد রয়েছে। তারা বলেন, ইবাদতের উপযুক্ত অথবা যার অস্তিত্ব অবশ্যজ্ঞাবী এমন সত্তাকে আল্লাহ বলা হয়। যে কোনো অর্থে গ্রহণ করা হোক না কেন এটি একটি مَفْهُوم كِلَى। মুসান্নিফসহ জমহুরের মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য এবং এর অর্থ جَزْئِي।

ভিন্নমত পোষণকারীদের মতে আপত্তি :

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমরা তাদের এ মতটিকে গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সকলেরই অভিমত হচ্ছে, কালিমায়ে তাওহীদ হলো **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)। অর্থাৎ এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ প্রমাণিত হয়। আর এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ তখনই প্রমাণিত হবে, যখন আল্লাহ শব্দটিকে নামবাচক বিশেষ্য বলা হবে। যদি এর আল্লাহ শব্দটিকে **مَنْهُمُ كَلْبِي** বলা হয়, তাহলে এ বাক্য দ্বারা একত্ববাদ প্রমাণ হয় না। কেননা, তখন বাক্যের অর্থ হবে “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই।” অথচ আল্লাহ কোনো সত্তার নাম নয়।

আল্লাহ যেহেতু **كَلْبِي** সে হিসেবে **اللَّهُ**-এর মধ্যে একাধিক **فَرْد** (সদস্য) হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, যে কোনো **كَلْبِي**-এর **كَلْبِي** হওয়ার দাবি মতে তার একাধিক **فَرْد** হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ শব্দটিকে নামবাচক বলা হলে তখন সেটা **جَزْنِي** হবে। **جَزْنِي**-এর কোনো **فَرْد** নেই; বরং **جَزْنِي** টাই একমাত্র **فَرْد**। তাই আল্লাহ শব্দের অর্থের মধ্যে একাধিক সদস্য থাকার সম্ভাবনা নেই, থাকবে না, যার দ্বারা একত্ববাদ প্রমাণে কোনো সমস্যা হবে।

সারকথা হলো, আল্লাহ শব্দটিকে **كَلْبِي** বলা হলে কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা একত্ববাদ প্রমাণিত হয় না। যেহেতু কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা সবার মতে একত্ববাদ প্রমাণিত হয়, তাই **كَلْبِي** হওয়ার মতটি অগ্রহণযোগ্য।

সার-সংক্ষেপ :

মূল লেখক **عَلَّمَ** বা নামবাচক বিশেষ্য মুসনাদ ইলাইহের উদাহরণ দিয়েছেন ‘আল্লাহ’ শব্দ দ্বারা। যেমন— **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** এ আয়াতে আল্লাহ শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ যা নামবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোক **اللَّهُ** শব্দটিকে নামবাচক বিশেষ্য রূপে স্বীকার করেন না। তাদের মতে, এটি একটি **كَلْبِي** **مَنْهُمُ**।

মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোকের এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, যদি তাদের মত গ্রহণ করা হয়, তাহলে কালিমায়ে তাওহীদ দ্বারা একত্ববাদ বা তাওহীদ প্রমাণিত হয় না। সেহেতু সকল আলিমের মতে, কালিমায়ে তাওহীদ একত্ববাদ প্রমাণকারী, তাই তাদের মত অগ্রহণযোগ্য।

أَوْ تَعْظِيمٍ أَوْ إِهَانَةٍ كَمَا فِي الْأَلْقَابِ الصَّالِحَةِ لِذَلِكَ مِثْلُ رَكِبَ عَلِيٌّ وَهَرَبَ مُعَاوِيَةُ أَوْ كِنَايَةً عَنْ مَعْنَى يَضْلَعُ الْعِلْمُ لَهُ نَحْوُ أَبُو لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا كِنَايَةً عَنْ كَوْنِهِ جَهَنَّمِيًّا بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَضْعِ الْأَوَّلِ أَعْنَى الْإِضَافَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَلَزَمُ النَّارِ وَمُلَابِسُهَا وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ جَهَنَّمِيٌّ فَيَكُونُ إِنْتِقَالًا مِنَ الْمَلْزُومِ إِلَى الْإِلْزَامِ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ الْأَوَّلِ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي الْكِنَايَةِ وَقِيلَ فِي هَذَا الْمَقَامِ إِنَّ الْكِنَايَةَ كَمَا يُقَالُ جَاءَ حَاتِمٌ وَيُرَادُ مِنْهُ لَزِمُهُ أَيْ جَوَادٌ لَا الشَّخْصُ الْمُسَمَّى بِحَاتِمٍ وَيُقَالُ رَأَيْتُ أَبَا لَهَبٍ أَيْ جَهَنَّمِيًّا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ جَ يَكُونُ إِسْتِعَارَةً لَا كِنَايَةً عَلَى مَا سَيَجِيءُ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرَهُ لَكَانَ قَوْلُنَا فَعَلَ كَذَا هَذَا الرَّجُلُ مُشِيرًا إِلَى الْكَافِرِ وَقَوْلُنَا أَبُو جَهْلٍ فَعَلَ كَذَا كِنَايَةً عَنِ الْجَهَنَّمِيِّ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ ذَلِكَ أَنَّهُ مِثْلُ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ فِي هَذِهِ الْكِنَايَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّخْصُ الْمُسَمَّى بِأَبِي لَهَبٍ لَا كَافِرٌ آخَرُ أَوْ إِيْهَامٌ اسْتِلْذَازِهِ أَيْ وَجْدَانِ الْعِلْمِ لِذِيذًا نَحْوُ قَوْلِهِ بِاللَّهِ يَا ظَبِيَّاتُ الْقَاعِ قُلْنَ لَنَا * الْبِلَآئِ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ الْبَشَرِ أَوْ التَّبَرُّكِ بِهِ نَحْوُ اللَّهِ الْهَادِي وَمُحَمَّدُ الشَّفِيعُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَالْتَفَاوُلِ وَالتَّطْيِيرِ وَالتَّسْجِيلِ عَلَى السَّامِعِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُنَاسِبُ إِعْتِبَارَهُ فِي الْأَعْلَامِ -

অনুবাদ : মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক আনা হয় সম্মান অথবা তুচ্ছতা প্রদর্শন করার জন্য। যেমন উল্লিখিত বিষয়দ্বয়ের উপযুক্ত উপাধিসমূহে হয়ে থাকে। যেমন- **رَكِبَ عَلِيٌّ وَهَرَبَ مُعَاوِيَةُ** 'আলী আরোহণ করল, আর মু'আবিয়া পালিয়ে গেল' অথবা নামবাচক শব্দ ইঙ্গিতপূর্ণ (**كِنَايَتِي**) অর্থ প্রদান করে- সে যার সম্ভাবনা রাখে তার মধ্যে সন্তাগতভাবে আছে। যেমন- **أَبُو لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا** (আবু লাহাব এমনটি করেছে) এটি দোজখী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হলো। (এ অর্থ) তার প্রথম **وَضَع** তথা ইযাফতের ভিত্তিতে, কেননা এর অর্থ হচ্ছে আগুনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং সংশ্রব গ্রহণকারী। আর এটা দোজখী হওয়াকে আবশ্যক করে। (কারণ, দোজখীরা সবসময় আগুনের মধ্যে অবস্থান করে।) অতএব, এটি প্রথম ব্যবহার হিসেবে **مَلْزُوم** থেকে **لَزِم** -এর প্রতি ইঙ্গিত হলো। আর কিনায়ার মধ্যে এতটুকুই (মালয়ুম বলে লাযিম উদ্দেশ্য করা) যথেষ্ট। এ ব্যাপারে কতিপয় লোক আপত্তি করে বলেন, (এ জাতীয় উদাহরণে দ্বিতীয় মনোনয়ন হিসেবে কিনায়া হয়েছে। তা এভাবে যে,) নিশ্চয়ই কিনায়া হয় এ উদাহরণে যেমন হলো **جَاءَ حَاتِمٌ** তথা হাতেম আসল এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হলো এর লাযিম অর্থাৎ দানশীল। এখানে হাতেম নামীয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয় না এবং বলা হলো **رَأَيْتُ أَبَا لَهَبٍ** (আমি আবু লাহাবকে দেখলাম) অর্থাৎ দোজখী ব্যক্তিকে। কিন্তু এ মতে আপত্তি আছে। কেননা, এরূপ উদ্দেশ্য করা হলে বাক্যগুলো ইসতি'আরা হবে, কিনায়া হবে না। যার সম্পর্কে আলোচনা অচিরেই আসবে। (ভিন্নমতাবলম্বী) যা উল্লেখ করেছে তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কানফিরের ইশারা করে আমাদের বাক্য **هَذَا الرَّجُلُ فَعَلَ كَذَا** (এই লোকটি এমন করেছে) এবং **أَبُو جَهْلٍ فَعَلَ كَذَا** (আবু জাহল এমন করেছে) দোজখী হওয়ার কিনায়া (ইঙ্গিত) হবে। অথচ এ অর্থ কেউ বলেননি, এ মতটি যে ভ্রান্ত তার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় এভাবে যে, মিসফতাহ্ গ্রন্থের

লেখক ও অন্যরা এই কিনায়া-এর উদাহরণ দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী- **لَهُبَّ** দ্বারা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, (এ আয়াতে) আবু লাহাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তি অন্য কোনো কাফির নয়। অথবা নামবাচক শব্দ থেকে সুখ লাভ করার ধারণা সৃষ্টি করার জন্য অর্থাৎ নামবাচক শব্দটিকে মনোমুগ্ধকর পাওয়া। যেমন কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) আল্লাহর শপথ! হে বনের হরিণীরা, তোমরা আমাকে বল, আমার লায়লা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; না মানুষের অন্তর্ভুক্ত। অথবা নামবাচক শব্দ দ্বারা বরকত হাসিলের জন্য, যেমন- আল্লাহ পথপ্রদর্শক। মুহাম্মদ ﷺ সুপারিশকারী। অথবা এ জাতীয় কোনো উদ্দেশ্যে (মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক করে উল্লেখ করা হয়) যেমন সুলক্ষণের উদ্দেশ্য, কুলক্ষণের উদ্দেশ্য, শ্রোতার কাছে (মুসনাদ ইলাইহকে) পাকাপোক্ত করার জন্য ইত্যাদি যা নামবাচকের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য করা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ تَعْظِيمُ أَوْ إِهَانَةُ الْخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করার কতিপয় কারণ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। এর মধ্য থেকে একটি কারণ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য এবং মুসনাদ ইলাইহের প্রতি তুচ্ছতা প্রদর্শন করা। এ ধরনের সম্মান এবং অসম্মান প্রদর্শন করা যায় এমন উপাধি এবং নাম দ্বারা, যেগুলোর মধ্যে এমন অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকে। যেমন- মুহাম্মদ নামের মধ্যে প্রশংসার অর্থ বিদ্যমান এবং (كَلْب) নামের মধ্যে হীনতার প্রকাশ রয়েছে। অথবা, নামের মধ্যে এসব অর্থ না থাকলেও কোনো নাম যদি গুণ বা দোষের দ্বারা প্রসিদ্ধ হয় তাহলে কিনায়া করা যায়। যেমন- দানশীলতায় প্রসিদ্ধ আর কারুন কৃপণতায় প্রসিদ্ধ। অথবা উপনাম বা ডাকনামের মধ্যে যদি এরূপ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থের কিনায়া করা যায়, যেমন- আবুল খায়ের (কল্যাণের পিতা) ও আবুল ফযল (সম্মানের অধিকারী) ইত্যাদি।

যেসব নাম সম্মান ও অসম্মানের অর্থ ধারণ করে সেগুলোর যে উদাহরণ মুসান্নিফ (র.) দিয়েছেন তা হলো (সম্মানের) **رَكِبَ عَلِيٌّ** অর্থাৎ আলী আরোহণ করেছে, এতে **عَلِيٌّ** মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে সম্মানের অর্থ রয়েছে। কেননা **عَلِيٌّ** শব্দটি **عُلُو** (উচ্চতা) থেকে নির্গত।

অসম্মান বা তুচ্ছতার উদাহরণ হচ্ছে **مُعَارَاةٌ** এতে মু'আবিয়া মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে অসম্মানের অর্থ বিদ্যমান। কেননা, **مُعَارَاةٌ** শব্দটি **عَرَاءٌ** থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ হলো কুকুর বা হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ। উল্লেখ্য যে, আলী এবং মু'আবিয়া এ দু'টি শব্দ কারো নামও হতে পারে, আবার কারো উপাধি রূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে উপাধি ধরাই শ্রেয়। কেননা, এ দু'টি শব্দ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই সাহাবীর নাম উদ্দেশ্য হলে দ্বিতীয় উদাহরণটি দ্বারা হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, যা কোনো হকপন্থি মুসলমানের কাম্য নয়।

قَوْلُهُ أَوْ كِنَايَةٌ عَنْ مَعْنَى يَصْلَحُ الْعَلَمُ لَهُ : কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করা হয় কিনায়া করার জন্য। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এমন নাম দ্বারা কিনায়া (ইঙ্গিত) করা হয়, যার মধ্যে ইঙ্গিতের অর্থ রয়েছে। যেমন- কেউ বলল **كَذَا**। এতে **أَبُو لَهُبٍ** হচ্ছে এক ব্যক্তির নাম যা এখানে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে এখানে আবু লাহাব দ্বারা দোজখী হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, **أَبُو لَهُبٍ** শব্দটির মধ্যে দু'ধরনের গঠন প্রক্রিয়া কাজ করেছে। প্রথমত **أَبُو** মুযাফ **لَهُبٍ** মুযাফ ইলাইহ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ একত্রিত হয়ে একটি শব্দ হয়েছে। দ্বিতীয়ত **أَبُو لَهُبٍ** শব্দটি কারো নামের জন্য মনোনীত হয়েছে মুসান্নিফের দাবি হলো, এখানে প্রথম গঠন প্রক্রিয়া হিসেবে **أَبُو لَهُبٍ**-এর অর্থ হচ্ছে আগুনের সারাক্ষণের সঙ্গী, কেননা **لَهُبٍ** শব্দের অর্থ হচ্ছে অগ্নিশিখা, আর **أَبُو** হচ্ছে পিতা। সুতরাং অগ্নিশিখার পিতা সেই হবে যে সবসময় অগ্নিশিখার সাথে থাকে আর একটা লোক সবসময় আগুনের সাথে থাকার জন্য লায়িম হচ্ছে জাহান্নামী হওয়া। সুতরাং এখানে **أَبُو لَهُبٍ** (মালযূম বলে লায়িম তথা দোজখীর অর্থ নেওয়া হচ্ছে। অতএব, আবু লাহাব নামীয় কোনো কাফির সম্পর্কে যদি বলা হয় **أَبُو لَهُبٍ** তাহলে এর দ্বারা তার দোজখী হওয়ার প্রতি কিনায়া করা যায়। কেননা, মালযূম বলে লায়িম উদ্দেশ্য **كَذَا** কিনায়ার নিয়ম। অতএব উক্ত উদাহরণের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ আবু লাহাবকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে দোজখী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। সুতরাং আবু লাহাব এটা করেছে, এর অর্থ হচ্ছে দোজখী লোকটি এটা করেছে

দুই. যদি ভিন্নমতাবলম্বীদের মতানুসারে তাকে কিনায়া বলা হয়। তাহলে নিম্নের সমস্যা দেখা দেবে। যেমন- কোনো ব্যক্তি এক কাফিরের প্রতি ইশারা করে বলল **فَعَلَ كَذَا هَذَا الرَّجُلُ** (এ লোকটি এমন করেছে) কিন্তু সে উদ্দেশ্য করল ইশারাকৃত লোকটি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজটি করেছে অথবা আবু জাহল নাম নয়, এমন কাফিরকে বলল **أَبْرَجَهْلُ فَعَلَ** **أَبْرَجَهْلُ** এবং উভয় অবস্থায় এর দ্বারা ব্যক্তিদ্বয়ের দোজখী হওয়ার কিনায়া করা হলো অর্থাৎ **مَنْزُومٌ** যথা আবু জাহল এবং কাফিরের প্রতিই ইঙ্গিত বলে লাযিম (দোজখী হওয়া) উদ্দেশ্য করা হলো। মোটকথা, উভয় উদাহরণের মধ্যে আবু জাহল এবং ইশারাকৃত কাফির ব্যক্তির মধ্যে প্রথমেই লাজিমী অর্থ তথা দোজখী হওয়া ইচ্ছা করা হয়েছে। আর এটি হচ্ছে ভিন্নমতাবলম্বীদের মতে কিনায়া; অথচ এ জাতীয় উদাহরণের মধ্যে কিনায়া হয়েছে, এ কথা কেউই সমর্থন করেন না। এমন উদাহরণে কিনায়া হওয়ার বিষয়টি সকলের অস্বীকার প্রমাণ করে যে, এতে কিনায়া হয়নি। অতএব, কিনায়া-এর ব্যাখ্যা এটা হবে না, যা তারা বলেছেন; বরং কিনায়ার ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ অর্থাৎ মুসান্নিফ যা বলেছেন তাই হবে।

তিন. তাদের কিনায়ার সংজ্ঞার বিপক্ষে তৃতীয় দলিলটি হচ্ছে, মিফতাহ গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাক্বাকীসহ অন্যরা এ স্থলে কিনায়ার যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হলো **لَهَبٍ أَبَى لَهَبٍ** (আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক) ভিন্নমতাবলম্বীদের মতানুসারে আয়াতে কিনায়া হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, আয়াতে আবু লাহাব দ্বারা রাসূলের যুগের সেই আবু লাহাবই উদ্দেশ্য, অন্য কোনো কাফির দোজখী উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আয়াতের মধ্যে প্রথমেই লায়িমী অর্থ তথা দোজখীর অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। সুতরাং অন্যদের মতানুসারে আয়াতে কিনায়া হয়নি। তবে আয়াতে মুসান্নিফসহ জমহুরের মতানুসারে কিনায়া হবে। কেননা, আল্লামা সাক্বাকী প্রমুখ একে কিনায়ার উদাহরণ বলেছেন। মোটকথা, এটাই প্রমাণিত হলো যে, কিনায়ার ঐ সংজ্ঞাই সঠিক যা মুসান্নিফসহ সকলেই বলেছেন। ভিন্নমতাবলম্বী বর্ণিত কিনায়ার সংজ্ঞাটি সঠিক নয়; বরং এতে নানা সমস্যা রয়েছে।

বি. দ্র. **لَهَبٍ أَبَى لَهَبٍ** এ উদাহরণটিকে মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হওয়ার উদাহরণ হওয়ার উপর অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। তারা বলেন, আয়াতের মধ্যে **لَهَبٍ أَبَى** মুসনাদ ইলাইহ হয়নি; বরং এটি **يَدَا**-এর মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। এর জবাব হচ্ছে, আয়াতে **يَدَا** শব্দটি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত **لَهَبٍ أَبَى** মুসনাদ ইলাইহ।

قَوْلُهُ أَوْ إِنَّهُمْ اسْتَلْزَمُوا: এখান থেকে মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দে নির্দিষ্টরূপে আনার আরেকটি কারণ বর্ণনা করছেন। তা হচ্ছে মুতাকাল্লিম তার শ্রোতার মাঝে এ ধারণা সৃষ্টি করবে যে, সে মুসনাদ ইলাইহের নাম নিতে তৃপ্তি লাভ করে। যেমনটি এ কবিতার চরণে দেখা যাচ্ছে—

এ কবিতার দ্বিতীয় লাইনে **أَمْ لَيْلَى** বলা হয়েছে নাম উচ্চারণ করত তৃপ্তি লাভ করার জন্য। অন্যথায় এখানে **أَمْ هِيَ** বলা দরকার ছিল। কেননা আগের লাইনে **لَيْلَى** আসাতে পরের লাইনে সর্বনাম আসাটাই ভাষাগত দাবি; কিন্তু কবি তা করেননি শ্রোতাকে এ ধারণা দেওয়ার জন্য যে, তিনি লাইলার নাম নিতে তৃপ্তি লাভ করেন।

قَوْلُهُ أَوْ التَّبَرُّكُ: কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ দ্বারা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা হয় বরকত নেওয়ার জন্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলার আলোচনা চলা কালে **اللَّهُ الْهَادِي** বলা। এমনভাবে রাসূল ﷺ সম্পর্কে আলোচনা করা অবস্থায় **مُحَمَّدٌ الشَّفِيعُ** বলা। এখানে **اللَّهُ** এবং **مُحَمَّدٌ** নাম দুটি বরকত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। যদিও **هُوَ** সর্বনাম দ্বারা এখানে বলা যেত। কখনো **تَفَاوُلُ** (শুভলক্ষণ), **التَّطَيُّرُ** (কুলক্ষণ), **التَّسْجِيلُ عَلَى السَّامِعِ** (শ্রোতার কাছে বিষয়কে শক্তিশালী করার জন্য) মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক শব্দ করে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক করা হয়। যেমন—

১. অশুভ লক্ষণের জন্য বলল **الْسَّفَاحُ فِي دَارِ صَدِيقِكَ** (খুনী তোমার বন্ধুর ঘরে)।

২. শুভলক্ষণের জন্য বলল **سَعِيدٌ فِي دَارِكَ** (সৌভাগ্যবান তোমার ঘরে)।

৩. শ্রোতার কাছে বিষয়কে মজবুত করার জন্য বলল **نَعَمْ زَيْدٌ أَقْرَبُ بِكَذَا** এটি ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলল, যে জিজ্ঞাসা করেছিল **هَلْ أَقْرَبُ زَيْدٌ بِكَذَا** বলা বাহুল্য যে, এখানে **نَعَمْ** অথবা **هُوَ** বললেই চলত; কিন্তু তা না বলে সে **زَيْدٌ**-কে উল্লেখ করল বিষয়টিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ছাড়া আরো অন্যান্য উদ্দেশ্য মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক রূপে ব্যবহার করা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করার আরো অনেকগুলো কারণ রয়েছে। নিম্নে সে কারণগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো।

১. তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য বা সম্মান প্রকাশের জন্য। যেমন—**رَكِبَ عَلَيَّ وَهَرَبَ مَعَاوِيَةَ**—যেমন—

২. শুধু তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য। যেমন—**أَبَى لَهَبٍ فَعَلَ كَذَا** উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.)-এর মতে **لَهَبٍ**-এর মধ্যে ইযাফত হিসেবে কিনায়া হয়েছে—**عَلَّمَ** হিসেবে নয়। কতিপয় লোকের মতে, এতে **عَلَّمَ** হিসেবে কিনায়া হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) তাদের মতকে খণ্ডন করেছেন।

৩. সুখ লাভের ধারণা সৃষ্টি করার জন্য বা বরকত হাসিলের জন্য।

৪. শুভলক্ষণ ও কুলক্ষণ প্রকাশের জন্য।

৫. শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে সুদৃঢ় করার জন্য ইত্যাদি।

وَبِالْمَوْصُولِيَّةِ أَيْ تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِإِيرَادِهِ إِسْمَ مَوْصُولٍ لِعَدَمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِالْأَحْوَالِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ سِوَى الصِّلَةِ كَقَوْلِكَ الَّذِي كَانَ مَعَنَا أَمْسَ رَجُلٌ عَالِمٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا لَا يَكُونُ لِلْمُتَكَلِّمِ أَوْ لِكُلَيْهِمَا عِلْمٌ بِغَيْرِ الصِّلَةِ نَحْوِ الَّذِينَ فِي بِلَادِ الشَّرْقِ لَا أَعْرِفُهُمْ أَوْ لَا نَعْرِفُهُمْ لِقِلَّةِ جَدْوَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ وَنَذْرَةٌ وَقُوْعُهُ أَوْ اسْتِهْجَانِ التَّصْرِيحِ بِالْإِسْمِ أَوْ زِيَادَةِ التَّقْرِيرِ أَيْ تَقْرِيرِ الْغَرَضِ الْمُسَوِّقِ لَهُ الْكَلَامُ وَقِيلَ تَقْرِيرِ الْمُسْنَدِ وَقِيلَ تَقْرِيرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ نَحْوُ وَرَأَوْتُهُ أَيْ يَوْسُفَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُرَادُ مَفَاعَلَةٌ مِنْ رَادٍ يَرُودُ جَاءَ وَذَهَبَ فَكَانَ الْمَعْنَى خَادَعْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَفَعَلْتَ فِعْلَ الْمُخَادِعِ لِصَاحِبِهِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ يَحْتَالُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْلِبَهُ وَيَأْخُذَهُ مِنْهُ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمَحُّلِ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأَوْتُهُ فَالْغَرَضُ الْمُسَوِّقُ لَهُ الْكَلَامُ نَزَاهَةُ يَوْسُفَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَطَهَارَةُ ذَيْلِهِ وَالْمَذْكُورُ أَدْلٌ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرَةِ الْعَزِيزِ أَوْ زُلَيْخَا لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهَا وَتَمَكَّنَ مِنْ نَيْلِ الْمُرَادِ عَنْهَا وَلَمْ يَفْعَلْ كَانَ فِي غَايَةِ النَّزَاهَةِ وَقِيلَ هُوَ تَقْرِيرٌ لِلْمُرَادَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ فَرْطِ الْإِخْتِلَاطِ وَالْأَلْفَةِ وَقِيلَ هُوَ تَقْرِيرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِإِمْكَانِ وَقُوعِ الْإِبْهَامِ وَالْإِشْتِرَاكِ فِي أَمْرَةِ الْعَزِيزِ وَزُلَيْخَا وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْآيَةَ مِثَالٌ لَزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ فَقَطْ وَظَنِّي أَنَّهَا مِثَالٌ لَهَا وَلَا اسْتِهْجَانِ التَّصْرِيحِ بِالْإِسْمِ وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي الشَّرْحِ -

অনুবাদ : এবং ইসমে মাওসুল দ্বারা অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসুল রূপে আনার দ্বারা মাওসুলের মাওসুল করা হয়, শ্রোতার মাওসুল ব্যতীত তার সাথে খাস বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে না জানার কারণে। যেমন তুমি বললে, যে আমাদের সাথে গতকাল ছিল সে একজন আলিম। মূল লেখক সেই প্রকারের উল্লেখ করেননি যাতে বক্তা অথবা বক্তা ও শ্রোতা কারোই মাওসুল ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন- (কেউ বলল,) যারা পূর্বের রাষ্ট্রগুলোতে বাস করে তাদের আমি চিনি না অথবা বলল, আমরা চিনি না। এ ধরনের বাক্যের উপকারিতা সীমিত এবং এর ব্যবহার সচরাচর পাওয়া যায় না। অথবা (নাম) স্পষ্টভাবে বলাকে খারাপ মনে করার কারণে কিংবা অতিরিক্ত স্পষ্ট করার জন্য অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তাকে জোরালো করার জন্য কেউ কেউ বলেন, মুসনাদকে জোরালো করার জন্য আবার কেউ কেউ মুসনাদ ইলাইহ জোরালো করার জন্য। যেমন- وَرَأَوْتُهُ الَّتِي অর্থাৎ যার ঘরে তিনি ছিলেন সে তাকে নিজের প্রতি ফুসলালো এবং প্রলুব্ধ করল তাকে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে।-এর-مُفَاعَلَةٌ-এর-رَادٍ يَرُودُ-এর-مُرَادُ-এর-مُفَاعَلَةٌ-এর-مُسْنَدُ-এর-مُسْنَدُ-এর-مُسْنَدُ-এর-مُسْنَدُ-এর-মুতান্নি এ বাক্যের عَنْ نَفْسِهِ মুতান্নি আল্লিক হবে وَرَأَوْتُهُ-এর সাথে। এ

বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণ করা। আযীযে মিসরের স্ত্রী অথবা যুলায়খা বলার চেয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিটি উদ্দেশ্যের উপর অধিক অর্থবহ। কেননা, যখন তিনি তার ঘরে অবস্থান করছেন এবং তার উদ্দেশ্য যুলায়খার সাথে পূরণ করার সুযোগও পেলেন, কিন্তু তারপরেও করলেন না; তাই তিনি পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। কেউ কেউ বলেন, এতে প্রতারণার বিষয়টি শক্তিশালী করা হয়েছে। কেননা, এতে (ঘরে অবস্থানের কারণে) চূড়ান্ত পর্যায়ে মেলমেশা ও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটি মুসনাদ ইলাইহকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কেননা, আযীযে মিসরের স্ত্রী এবং যুলায়খা নামের মধ্যে সন্দেহ ও অনির্দিষ্টতা রয়েছে। (কিন্তু যার ঘরে তিনি ছিলেন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশটুকু নেই) প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে আয়াতটি শুধুমাত্র বক্তব্যকে মজবুত করেছে (মুসান্নিফ বলেন) আমার ধারণা হচ্ছে— এটি বক্তব্যকে মজবুত করা এবং নামোল্লেখ করা অপছন্দনীয় উভয় প্রকারের উদাহরণ। বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্ধে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الَّتِي. - নির্দিষ্টজ্ঞাপক বিশেষ্যের এক প্রকার হলো ইসমে মাওসূল, যেমন- قَوْلُهُ وَبِالْمَوْصُولِيَّةِ أَيْ تَعْرِيفِ الْخَالِدِي. - أَلَّذِي. - أَلَّذِي. ইত্যাদি।

ইসমে মাওসূল তার সিলাহ ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। ইসমে মাওসূল দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়, যখন শ্রোতা শুধুমাত্র মাওসূলের সিলাহ সম্পর্কে অবগত থাকে মুসনাদ ইলাইহের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য বা পরিচয় জানে না। যেমন- মামুন এক ব্যক্তি সম্পর্কে এতটুকু জানে যে, সে গতকাল হাসানের সাথে ছিল। মামুন তার সম্পর্কে আর কিছুই জানে না, এমতাবস্থায় হাসান যদি মামুনকে সেই ব্যক্তির কোনো গুণ বা তথ্য জানাতে চায় তাহলে মামুনকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা নির্দিষ্ট করে বলবে অর্থাৎ كَانَ مَعِيَ أَمْسَ رَجُلٌ عَالِمٌ যে আমার সাথে গতকাল ছিল সে আলিম। মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইসমে মাওসূল ব্যবহার করার মোট তিনটি অবস্থা রয়েছে।

১. শ্রোতা সিলাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না।
২. বক্তা সিলাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না।
৩. শ্রোতা এবং কথক কেউই সিলাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না।

মূল লেখক ১ম অবস্থাটির উদাহরণ দিলেন; কিন্তু শেষ দুটির উদাহরণ দেননি, এর কারণ হচ্ছে— ২য় এবং ৩য় অবস্থা ব্যবহারিক দিক থেকে বিরল এবং এ ধরনের বাক্য বিশেষ উপকারীও নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ, যেমন- أَلَّذِيْنَ فِيْ بِلَادِ الشَّرْقِ لَا أَعْرِفُهُمْ অর্থাৎ যারা প্রাচ্যে থাকে তাদের আমি চিনি না।

তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ, যেমন- أَلَّذِيْنَ فِيْ السَّعُوْدِيَّةِ لَا نَعْرِفُهُمْ অর্থাৎ যারা সৌদি আরবে থাকে তাদের আমি চিনি না।

কখনো ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয় নাম উচ্চারণ করাকে খারাপ মনে করার কারণে। যেমন- পেশাব, বায়ু নির্গত হওয়া ইত্যাদি অজু ভঙ্গকারী। এ কথা বুঝাতে কেউ বলল أَلَّذِيْ يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ এখানে পেশাব ও নির্গত বায়ুর উচ্চারণকে অপছন্দনীয় মনে করার কারণে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় বাক্যের উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী ও জোরালো করার জন্য অর্থাৎ বাক্যটি যখন ইসমে মাওসূল দ্বারা প্রকাশ করলে বেশি শক্তিশালী হয় তখন ইসমে মাওসূল দ্বারা বাক্যটি প্রকাশ করা হয়। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইসমে মাওসূল বাক্যের উদ্দেশ্যকে শক্তিশালী করে, না মুসনাদকে, নাকি মুসনাদ ইলাইহকে এ ব্যাপারে তিনটি মতই পাওয়া যায়।

وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ : - زِيَادَةُ التَّفَرُّبِ

অর্থাৎ আর তিনি যে রমণীর ঘরে ছিলেন, সে রমণী তাঁকে প্রলুব্ধ করল।

এ বাক্যের رَأَوْدَتْ-এর ফায়েল (মুসনাদ ইলাইহ) হলো الَّتِي هُوَ فِيْ بَيْتِهَا (ইসমে মাওসূল) এবং মাফউল হলো সর্বনাম যার বিশেষ্য হলো ইউসুফ (আ.) عَنْ نَفْسِهِ হরফে জার এবং মাসদার মিলে رَأَوْدَتْ-এর সাথে মুতাআল্লিক।

بَابُ ثَلَاثِي مَجَرَّدُ-এর তাহকীক : **بَابُ مُفَاعَلَةٍ**-এর মাসদার-এর আসল অক্ষর হচ্ছে **رَوَدَ** এটি **رَوَدَ** থেকে ব্যবহৃত হয় **رَادَ** **رَوَدَ**-এর অর্থ হচ্ছে আসা-যাওয়া করা, অনুসন্ধান করা; **بَابُ مُفَاعَلَةٍ** থেকে আসলে এর অর্থ হবে বাধা দেওয়া, প্রতারণা করা। সুতরাং **رَادَتْهُ**-এর অর্থ রমণী তাকে তার মন আকর্ষণের জন্য প্রতারণা করল। প্রতারক তার হাতের জিনিস যাতে ছুটে না যায় এ জন্য তার সাথীর সাথে যেরূপ প্রতারণা করে যুলাইখা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে এরূপ ব্যবহারই করল। এখানে প্রতারণা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যুলাইখা ইউসুফকে সঙ্গম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। এ আয়াতে ইসমে মাওসূল ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা বর্ণনা করা। ইসমে মাওসূল (**الَّتِي**) কে মুসনাদ ইলাইহ বানানোর দ্বারা উদ্দেশ্যটি দারুণভাবে সাধিত হয়েছে। যদি মুসনাদ ইলাইহ আযীযে মিসরের স্ত্রী কিংবা যুলাইখাকে বানানো হতো, তাহলে উদ্দেশ্যটি পরিপূর্ণভাবে সাধিত হতো না। কারণ, **الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا** বলার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইউসুফ (আ.) যুলাইখার ঘরেই অবস্থান করছিলেন। তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে থাকার সুযোগ ছিল এবং ইচ্ছা করলে তিনি সহসাই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারতেন। তার পরেও যখন তিনি নিজেকে পবিত্র রাখলেন, এতে তিনি নিজেকে পবিত্রতার চরম শিখরে অবস্থান করালেন। আযীযে মিসরের স্ত্রী অথবা যুলাইখা ইউসুফ (আ.)-কে ফুসলিয়েছেন, কিন্তু তিনি তার কুমন্ত্রণায় সাড়া দেননি, এ কথা যদি বলা হতো তাহলেও ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা বুঝা যেত, কিন্তু ততটা নয় যেমনটি ইসমে মাওসূল ব্যবহার করার দ্বারা হয়েছে। কেননা, তখন তো এ সম্ভাবনা থাকত যে, ইউসুফকে দূর থেকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, আর হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে এড়িয়ে চলেছেন।

قَوْلُهُ قَبِلَ هُوَ تَقَرَّرَ لِلْمُرَادَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَرْطِ الْخ : কারো মতে আয়াতের মধ্যে ইসমে মাওসূলকে ব্যবহার করার দ্বারা **مُرَادَةُ** তথা মুসনাদকে শক্তিশালী করা হয়েছে। **مُرَادَةُ** অর্থ- ফুসলানো। ইসমে মাওসূল ব্যবহার করার দ্বারা জানা গেল যে, হযরত ইউসুফের সাথে একস্থানে থাকার কারণে প্রচুর মেলামেশার সুযোগ ছিল। যার ফলে পরস্পর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা ছিল। অতএব, যুলাইখা খুব সহজেই যে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিভ্রান্ত করতে পারবেন তাই স্বাভাবিক।

আয়াতে যদি মুসনাদ ইলাইহ হিসেবে যুলাইখা অথবা আযীযে মিসরের স্ত্রী বলা হতো তবে ফুসলানোর বিষয়টি এতটা স্পষ্ট হতো না। কেননা, তখন এ ধারণাও হতে পারত যে, যুলাইখার সাথে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কদাচিৎ হয়তো সাক্ষাৎ হয়েছে। তাই সে ফুসলানোর সুযোগ এতটা পেয়েছে কোথায়।

قَوْلُهُ قَبِلَ هُوَ تَقَرَّرَ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ : কারো কারো মতে উক্ত আয়াতে ইসমে মাওসূলকে মুসনাদ ইলাইহ বানানোর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের অর্থকে শক্তিশালী করা হয়েছে। কেননা, আয়াতে যদি **الَّتِي هُوَ** কে মুসনাদ ইলাইহ না বানিয়ে, **وَرَادَتْهُ أَمْرًا الْعَزِيزُ** বলা হতো তাহলে এই সন্দেহ থেকেই যেত যে, আযীযে মিসরের কোনো স্ত্রী হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ফুসলিয়েছেন যার ঘরে তিনি থাকতেন সে না অন্য কেউ? এমনভাবে যুলাইখাকে মুসনাদ ইলাইহ করে বাক্যটি ব্যবহার করলেও এতে সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, যুলাইখা নামের কত রমণীই থাকতে পারে, ইউসুফ যার ঘরে ছিলেন এটা সেই যুলাইখা তা বুঝা যেত না। পক্ষান্তরে **الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا** দ্বারা বলা হলে এতে ভুল-ভ্রান্তি সন্দেহের কোনো সম্ভাবনা থাকে না; বরং বিভিন্ন প্রমাণাদি দ্বারা এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যার ঘরে ছিলেন সেই আযীযে মিসরের স্ত্রী এবং তারই নাম যুলাইখা।

অতএব, মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল রূপে ব্যবহার করায় কাক্ষিত মুসনাদ ইলাইহ পাকাপোক্ত ও সন্দেহের উর্ধ্বে উঠে গেল।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, তালখীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারদের কাছে উক্ত আয়াতে **زِيَادَةُ تَقَرَّرَ**-এর উদাহরণ। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এটি **زِيَادَةُ تَقَرَّرَ** এবং **إِسْتِهْجَانُ التَّضَرُّعِ** উভয়ের উদাহরণ। অর্থাৎ আয়াতে ইসমে মাওসূল দ্বারা বক্তব্যকে যেমন জোরালো ও শক্তিশালী করা হয়েছে, তেমনি আয়াতে জুলাইখা নামক মহিলার নাম নেওয়াকে অনুচিত মনে করত ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে কখনো ইসমে মাউসূলের সাহায্যে নির্দিষ্ট করা হয়, আর তা করা হয় যখন শ্রোতা **صَلَاةً** ব্যতীত মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে আর কিছু না জানে যেমন- **الَّذِي كَانَ مَعَنَا امْسَ رَجُلٌ عَالِمٌ** এ ছাড়াও ইসমে মাওসূল আরো বিভিন্ন কারণে ব্যবহৃত হয়।

● নামোল্লেখকে খারাপ মনে করা হলে বা বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্য। যেমন- **وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ** **نَفْسِهَا** এ আয়াতে মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে **الَّتِي** যার দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতার বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

أَوِ التَّفْخِيمِ أَى التَّعْظِيمِ وَالتَّهْوِيلِ نَحْوُ فَغْشِيَهُمْ مِنَ الْبَيْمِ مَا غَشِيَهُمْ فَإِنَّ فِى هَذَا
الْإِبْهَامِ مِنَ التَّفْخِيمِ مَا لَا يَخْفَى أَوْ تَنْبِيهِ الْمُخَاطَبِ عَلَى الْخَطَا نَحْوُ شَعْرَانِ الَّذِينَ تُرَوَّنُهُمْ
أَى تَطْنُونُهُمْ إِخْوَانَكُمْ * يَشْفَى غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوا أَى تَهْلِكُوا أَوْ تَصَابُوا بِالْحَوَادِثِ
فَفِيهِ مِنَ التَّنْبِيهِ فِى خَطَائِهِمْ فِى هَذَا الظَّنِّ مَا لَيْسَ فِى قَوْلِكَ إِنَّ الْقَوْمَ الْفُلَانِيَّ -

অনুবাদ : অথবা (মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়) বড়করণ অর্থাৎ বিশালতা এবং ভয়াবহতা বুঝানোর জন্য। যেমন- অতঃপর তাদের নিমজ্জিত করল সমুদ্রের ঐ অবস্থা যা তাদেরকে নিমজ্জিত করল। নিশ্চয়ই এই অস্পষ্টতার মধ্যে এক ধরনের বিশালতা রয়েছে যা গোপনীয় নয়। অথবা শ্রোতাকে ভুলের প্রতি সতর্ক করার জন্য, যেমন- [কবিতার চরণ (অনুবাদ)] তোমরা যাদের ভাই মনে করছ তোমাদের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ তাদের অন্তরের হিংসা দূর করে অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস এবং বিপদাপদে গ্রাস হওয়ার সংবাদ এতে তাদের ভুল ধারণার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তোমার 'অমুক সম্প্রদায়' কথাটিতে নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

خ : মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল রূপে ব্যবহার করার আরেকটি কারণ হচ্ছে- বিশালতা ও ভয়াবহতা বুঝানো। যেমন- কুরআনের আয়াত فَغْشِيَهُمْ مِنَ الْبَيْمِ مَا غَشِيَهُمْ অর্থাৎ ফেরাআউন ও তার অনুসারীদের নিমজ্জিত করেছে সমুদ্রের যা তাদেরকে নিমজ্জিত করেছে অর্থাৎ বিশাল তরঙ্গমালা। আয়াতে তরঙ্গমালার উল্লেখ করা হয়নি; বরং ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, ঢেউ বর্ণনাতীত ভয়াবহ ও বিশাল ছিল। কখনো শ্রোতাকে তার ভুল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ইসমে মাওসূল ব্যবহার করা হয়। যেমনটি কবিতার নিম্নোক্ত চরণের মাঝে আমরা দেখতে পাই : إِنَّ الَّذِينَ تُرَوَّنُهُمْ إِخْوَانَكُمْ * يَشْفَى غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوا :

অর্থাৎ যেসব লোককে তোমরা সুধারণাবশত ভাই মনে কর (তারা তোমাদের ভাইতো নয়ই; বরং শত্রু। কেননা,) তোমাদের পরাজিত হওয়ার দ্বারা তাদের অন্তরের হিংসা বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

এ বাক্যে ইসমে মাওসূল এবং তার সিলাহ (إِنَّ الَّذِينَ تُرَوَّنُهُمْ إِخْوَانَكُمْ)-এর দ্বারা শ্রোতাকে বক্তা এই সংকেত দিচ্ছে যে, তোমাদের সুধারণা ভুল এবং আত্মঘাতীমূলক। তাদের তোমরা ভাই ভাবলে কি হবে তারা তো তোমাদের ধ্বংস চায়। যদি তুমি শ্রোতাকে ইসমে মাওসূল ও সিলার সাথে না বলে বলতো, তাহলে তাদের সুধারণা যে ভুল তার ইঙ্গিত হতো না।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা مَعْرِفَةٌ করা হয় বড়ত্ব ও বিশালতা বুঝানোর জন্য। যেমন-

فَغْشِيَهُمْ مِنَ الْبَيْمِ مَا غَشِيَهُمْ

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা مَعْرِفَةٌ করা হয় শ্রোতার ভুলের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। যেমন-

إِنَّ الَّذِينَ تُرَوَّنُهُمْ إِخْوَانَكُمْ * يَشْفَى غَلِيلَ صُدُورِهِمْ أَنْ تُصْرَعُوا

أَوْ الْإِيمَاءِ إِلَى الْإِشَارَةِ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ إِلَى طَرِيقِهِ تَقُولُ عَمِلْتُ هَذَا الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ عَمَلِكَ وَعَلَى جِهَتِهِ أَيْ طَرَزِهِ وَطَرِيقَتِهِ يَعْنِي تَأْتِي بِالْمَوْصُولِ وَالصَّلَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ بِنَاءَ الْخَبَرِ عَلَيْهِ مِنْ أَيْ وَجْهِ وَأَيْ طَرِيقٍ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ نَحْوُ أَنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي فَإِنَّ فِيهِ إِيمَاءً إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنَى عَلَيْهِ أَمْرٌ مِنْ جَنْسِ الْعِقَابِ وَالْإِذْلَالِ وَهُوَ قَوْلُهُ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وَمِنْ الْخَطَأِ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَفْسِيرُ الْوَجْهِ فِي قَوْلِهِ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ بِالْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ -

অনুবাদ : অথবা খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য অর্থাৎ খবরের পদ্ধতি বা ধরনের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। (عَمِلْتُ هَذَا الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ-এর অর্থ- ধরন ও পদ্ধতি। এর ব্যবহার এরূপ) তুমি বল (عَمِلْتُ هَذَا الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ-এর অর্থ) আমি এ কাজটি করেছি তোমার কাজের পদ্ধতিতে অর্থাৎ সে রকম বা ধরনে। অর্থাৎ তুমি ইসমে মাওসূল ও সিলাহকে ব্যবহার করছ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য যে, খবর কিরূপে ও ধরনে গঠিত অর্থাৎ ভালো প্রতিদান, শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দা ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিতদানের জন্য। যেমন- নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার করে। এতে (ইসমে মাওসূল ও সিলাহ-এর মাধ্যমে) ইঙ্গিত রয়েছে এ কথার প্রতি যে, খবর গঠিত শাস্তি ও অপমান জাতীয় কোনো বিষয় দ্বারা। আর তার খবর হচ্ছে আয়াত “তারা দোজখে অপমানিত অবস্থায় প্রবেশ করবে।” এ স্থানে الْخَبَرِ بِنَاءِ-এর وَجْهِ-এর ব্যাখ্যা ইল্লাত এবং সবব (কার্যকারণ ও হেতু) দ্বারা করা একটা ভ্রান্তি (যার শিকার অনেকেই হয়েছে)। আমি একে ব্যাখ্যাগ্ৰন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ الْإِيمَاءِ إِلَى الْإِشَارَةِ الخ : মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করে ব্যবহারের আরেকটি কারণ হচ্ছে- এর মাধ্যমে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে। ব্যাপারটি হচ্ছে এরূপ যে, ইসমে মাওসূল ও সিলাহ মিলে এমন একটি মুবতাদা হবে, যে মুবতাদার মধ্যে খবর কেমন হতে পারে তার ইঙ্গিত থাকবে। যেমন- মুবতাদার মধ্যে কাফিরদের অবাদ্যাচারণের কথা থাকবে, যার ফলে খবরে সেই কাফিরদের শাস্তির বিষয় আলোচিত হবে, এমন একটা অনুমান আমরা ইসমে মাওসূল ও সিলার সাহায্যে যে মুবতাদা হয়েছে তার থেকেই পেয়ে যাব।

قَوْلُهُ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ : এখান থেকে সামনের কতটুকু ইবারতের মধ্যে وَجْهِ শব্দের তাহকীক ও ব্যবহার দেখানো হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, وَجْهِ শব্দের অর্থ এখানে جِهَةٌ বাংলায় যার অর্থ হচ্ছে পথ; পদ্ধতি; ধরন ও রকম ইত্যাদি। আবার وَجْهِ শব্দের অর্থ- عِلَّةٌ وَ سَبَبٌ ও ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

عَمِلْتُ هَذَا الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ عَمَلِكَ : মুসান্নিফ (র.) প্রথম অর্থে وَجْهِ-এর ব্যবহার দেখাচ্ছেন, যেমন- বলা হয়ে থাকে عَمِلْتُ هَذَا الْعَمَلَ عَلَى وَجْهِ عَمَلِكَ অর্থাৎ আমি এ কাজটি তোমার কাজের ধরনে করেছি অর্থাৎ তোমার কাজ যে ধরনের ও পদ্ধতির আমার কাজটিও সেরূপই হয়েছে।

মোটকথা, ইসমে মাওসূল এবং সিলার সাহায্যে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করতে খবরের প্রকৃতি ও ধরনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ খবরটি শাস্তির বিষয়ে বা ছওয়াবের বিষয়ে কিংবা প্রশংসা জাতীয় ও নিন্দাসূচক ইত্যাদির নির্দেশ ইসমে মাওসূল ও সিলাহ দ্বারা গঠিত মুবতাদা থেকেই পাওয়া যাবে। যেমন- إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي (নিশ্চয় যারা

আমার ইবাদত করতে অহঙ্কার বোধ করে) আয়াতের **الَّذِينَ** হলো ইসমে মাওসূল **يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي** হলো তার সিলাহ। উভয়ে মিলে **إِنَّ**-এর ইসম তথা মুসনাদ ইলাইহ। পাঠক লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করতে পারবে যে, উক্ত মুসনাদ ইলাইহের খবর গঠিত হবে শাস্তি এবং অপমানজনক বিষয় দ্বারা। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সাথে অবাধ্যতার পরিণতি হচ্ছে শাস্তি ও স্থায়ী লাঞ্ছনা। অতএব, যারা এমন করেছেন তারা আজাব ও শাস্তির মুখোমুখি হবে। তাইতো আমরা দেখতে পেলাম, উপরোক্ত মুসনাদ ইলাইহের খবর বা মুসনাদ রূপে **سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ** (অচিরেই তারা দোজখে অপমানিত অবস্থায় প্রবেশ করবে)।

سَبَبٌ ও **عِلَّةٌ** -এর অর্থ অনেকে **وَجْه**-এর অর্থ অনেক **قَوْلُهُ** وَمِنْ الْخَطَا فِي هَذَا الْمَقَامِ الْخ দ্বারা করেন। তিনি বলেন, এখানে এরূপ অর্থ নেওয়া সঠিক নয়। যদিও **وَجْه**-এর এ অর্থও প্রচলিত আছে। কেননা ইল্লত ও সববের অর্থ সব স্থানে চলে না। উক্ত আয়াতের **يَسْتَكْبِرُونَ** যদিও শাস্তির ইল্লত; তদ্রূপ হযরত গুয়ায়েব (আ.)-কে অস্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ ও ইল্লত সামনে আগত কবিতার চরণ।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল দ্বারা **مَعْرِفَةٌ** করা হয় খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অর্থাৎ ইসমে মাওসূলের ব্যবহার দ্বারাই খবর কি প্রকৃতির শাস্তি সম্পর্কিত, নাকি প্রশংসাসূচক বা পুরস্কার সম্পর্কিত ইত্যাদি, তা বুঝা যাবে।

যেমন (মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে) **إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي** এর দ্বারাই খবর কি ধরনের হবে তা অনুমান করা যাচ্ছে। এরপর খবর এসেছে **سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ**

ثُمَّ إِنَّهُ أَيُّ الْإِيمَاءِ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ لَا مُجَرَّدُ جَعَلَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَوْصُولًا كَمَا
سَبَقَ إِلَى بَعْضِ الْأَوْهَامِ رَبَّمَا يُجْعَلُ ذَرْيَةً أَوْ وَسِيلَةً إِلَى التَّغْرِیْضِ بِالتَّعْظِيمِ لِشَانِهِ
أَيُّ لِسَانِ الْخَبَرِ نَحْوِ شَعْرٍ إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ أَيْ رَفَعَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا * بَيْتًا أَرَادَ
بِهِ الْكُعْبَةَ أَوْ بَيْتَ الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ مِنْ دَعَائِمِ كُلِّ بَيْتٍ فَفِي قَوْلِهِ
إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنَى عَلَيْهِ أَمْرٌ مِنْ جِنْسِ الرَّفْعَةِ وَالْبِنَاءِ
عِنْدَ مَنْ لَهُ ذَوْقٌ سَلِيمٌ ثُمَّ فِيهِ تَغْرِیْضٌ بِتَعْظِيمِ شَانِ بِنَاءِ بَيْتِهِ لِكُونِهِ فِعْلٌ مَنْ رَفَعَ
السَّمَاءَ الَّتِي لَا بِنَاءَ أَعْظَمَ مِنْهَا وَارْفَعُ

অনুবাদ : অতঃপর নিশ্চয় এটি অর্থাৎ খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা শুধুমাত্র মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল বানানো নয়, যেমনটি অনেক লোক ভেবে থাকেন। কখনো খবরের বিরাট মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যম বা অসিলা করা হয়।

কবিতার চরণ (অনুবাদ) : যিনি আকাশকে সুউচ্চ স্থাপন করেছেন, তিনি আমাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তিনি এর দ্বারা কা'বাঘর অথবা সম্মান ও মর্যাদার ঘরের ইচ্ছা করেছেন, যার স্তম্ভগুলো বাড়ি-ঘরের স্তম্ভের চেয়ে সুদীর্ঘ এবং শক্তিশালী। এখানে إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ-এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, খবরটির মধ্যে নির্মাণ এবং সুউচ্চতার কোনো কথা থাকবে, এ কথা সাহিত্য রুচির যে কোনো ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবে। অতঃপর কবিতায় (কবির) বাড়ির মর্যাদার প্রতি এক প্রকার ইঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে। কেননা, এ ঘরটি এমন হাতের তৈরি যিনি সুউচ্চ আকাশ নির্মাণ করেছেন, যার চেয়ে উঁচু ও বৃহৎ কোনো নির্মিত জিনিস নেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

إِنَّ الَّتِي ضَرَبْتَ بَيْتًا مُهَاجِرَةً : এমন হয়নি। প্রথমোক্ত চরণে زَوَالَ مُعَبِّتٍ-এর জন্য ইল্লত হয়নি ضَرَبَ بَيْتٍ-এর জন্যে এবং ২য় চরণে ইল্লত হয়নি سَمَكَ السَّمَاءَ-এর জন্যে। অতএব, رَجَعِ-এর অর্থ ইল্লত করা যেহেতু সব স্থানে প্রযোজ্য হয় না, তাই وَجْه-এর অর্থ ইল্লত দ্বারা করা সঠিক হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَيُّ الْإِيمَاءِ : উল্লিখিত ইবারত দ্বারা ইসমে মাওসূলের আরেকটি ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। পেছনের পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, ইসমে মাওসূল দ্বারা খবরের প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়। এখানে বলা হচ্ছে- সেই ইঙ্গিতের সাথে কখনো খবরের মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

মুসান্নিফ (র.) প্রথমে إِنَّ-এর সর্বনামের বিশেষ্য কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এর مَرْجِع (বিশেষ্য) হলো الْخَبَرِ بِنَاءِ الْإِيمَاءِ মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল আনা এ সর্বনামের مَرْجِع নয়। দ্বিতীয় মতটিকে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লামা খালখালীও রয়েছেন।

... মূল লেখক উক্ত প্রকারের উদাহরণ হিসেবে কবি ফারায়দাকের একটি কবিতা এনেছেন। তিনি এটি কবি জারীরের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রচনা করেছেন। কবি ফারায়দাক আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র কুরাইশের বংশোদ্ভূত ছিলেন। পক্ষান্তরে জারীর ছিলেন বনু তামীম গোত্রের অধিবাসী।

কবিতার চরণ : إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا * بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ :

যে সত্তা আকাশকে সুউচ্চে নির্মাণ করেছেন, তিনি আমাদের জন্য এমন এক ঘর তৈরি করেছেন, যার স্তম্ভ ও খুঁটিগুলো সুমহান এবং সুদীর্ঘ।

যে কোনো সাহিত্যরসিক কবিতার প্রথম লাইনটি (ইসমে মাওসূল এবং সিলাহ মিলে মুবতাদা) দেখা মাত্র অনুধাবন করতে পারবে যে, খবরটিতেও সুউচ্চতা এবং নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়টি ছাড়া মুবতাদা দ্বারা এখানে খবরের উঁচু মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটা এভাবে যে, তিনি এমন সত্তা যার প্রতিটি কাজ মহৎ ও বিশাল। সুতরাং আমাদের এই ঘরও মহান ও আযীমুশশান হবে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এখানে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিতের সাথে সাথে খবরের বিশালতার যে ইঙ্গিত এখানে রয়েছে তা মূলত বাগদাদ। **الَّذِي** (ইসমে মাওসূল)-এর সাথে **سَكَ السَّمَاءِ**-এর যুক্ত হওয়ার কারণে। কেননা, যদি এর পরিবর্তে অন্য কোনো বাক্য নেওয়া হতো যেমন- **الَّذِي بَنَى بَيْتًا لَنَا** বলা হলে খবর যে আযীমুশশান একথা বুঝা যায় না, যদিও ইসমে মাওসূল এবং সিলাহ দ্বারা খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

قَوْلُهُ دَعَانِمُ-এর বহুবচন হচ্ছে **دَعَانِمُ** অর্থ- খুঁটি। কবিতায় **بَيْتًا** দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া যায়- ১. কা'বা শরীফ, ২. সম্মান ও মর্যাদার ঘর। প্রথম মতানুসারে কা'বা শরীফ দ্বারা গর্ব করা হয়েছে। কা'বা ফারায়দাকের বসতির নিকটে ছিল বলে, তা ছাড়া ফারায়দাকের সম্প্রদায়ের লোকেরা কা'বার খিদমতে নিয়োজিত ছিল। অথচ জারীরের গোত্রের এ দু'টি মর্যাদার কোনোটি হাসিল ছিল না। কবি জারীর মুসলমান ছিলেন, তাই ফারায়দাকের কা'বা নিয়ে গর্ব উপরোক্ত দু'টি কারণে। যদিও মুসলমান হওয়ার ভিত্তিতে কা'বা সব মুসলমানের গর্ব ও আত্ম গৌরবের প্রতীক।

আর ২য় মতানুসারে কবিতার মর্মার্থ হলো, কুরাইশী হওয়ার কারণে ফারায়দাকের বংশের লোকদের আল্লাহ তা'আলা বিরাট প্রতিপত্তি ও উত্তম মর্যাদা দান করেছেন, যা জারীরের বংশের লোকদের মাঝে অনুপস্থিত।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিতকে খবরের মর্যাদার বুঝানোর মাধ্যম বানানো হয়। যেমন-

إِنَّ الَّذِي سَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا * بَيْتًا دَعَانِمُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ

কবিতার এ পঙ্ক্তির প্রথম লাইন শোনা বা দেখা মাত্র যে কোনো সাহিত্য রসিক অনুধাবন করতে পারবে যে, এর দ্বিতীয় লাইনে সুউচ্চ নির্মাণ সংক্রান্ত কোনো কথা থাকবে।

أَوْ ذَرْعَةً إِلَى تَعْظِيمِ شَأْنٍ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْخَبَرِ نَحْوُ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ فَفِيهِ إِيْمَاءٌ إِلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمَبْنَى عَلَيْهِ مِمَّا يَنْبِئُ عَنِ الْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ وَتَعْظِيمِ لِسَانِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُبَّمَا يُجْعَلُ ذَرْعَةً إِلَى الْإِهَانَةِ لِشَأْنِ الْخَبَرِ نَحْوُ أَنَّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا -

অনুবাদ : অথবা (খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত) খবর ভিন্ন অন্য বিষয়ের মহত্ত্ব বুঝানোর মাধ্যম বানানো হয়। যেমন-**الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ** (অর্থঃ যারা শু'আইব (আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।) এ আয়াতের ইসমে মাউসূল ও সিলাহ দ্বারা গঠিত মুসনাদ ইলাইহতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, খবর গঠিত হয়েছে এমন বিষয় দ্বারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ব্যর্থতার কথা থাকবে এবং (সেই সাথে) শু'আইব (আ.)-এর সুমহান মর্যাদার কথাও। আবার কখনো একে খবরের অমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতের মাধ্যম বানানো হয়। যেমন-**إِنَّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا** (অর্থঃ যে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কে ভালো অবগত নয়- সে এ বিষয়ে কিতাব লিখেছে।) অথবা খবর ব্যতীত অন্য বিষয়ের মর্যাদা খাটো করার মাধ্যম করা হবে। যেমন- নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শয়তানের অনুকরণ করে সে ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ ذَرْعَةً إِلَى تَعْظِيمِ : মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল দ্বারা নির্দিষ্ট করত খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দানের মাধ্যমে কখনো খবর ভিন্ন অন্য বিষয়ের মর্যাদার কথা বুঝানো হয়। এর উদাহরণ হলো-

الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ উক্ত আয়াতে ইসমে মাওসূল (**الَّذِينَ**) এবং সিলাহ (**كَذَبُوا شُعَيْبًا**) মিলে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে যা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, খবরের মধ্যে আশাহত হওয়ার ও ব্যর্থতার কথা থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার নবীর বিরুদ্ধাচরণ ক্ষতি ও ব্যর্থতাই ডেকে আনে। এর সাথে সাথে আয়াতে হযরত শু'আইব (আ.)-এর সুমহান মর্যাদার কথাও জানা গেল। এভাবে যে, যার বিরুদ্ধাচরণ ক্ষতির কারণ তিনি সাধারণ কোনো মানুষ নন; বরং তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহ (ইসমে মাওসূল ও সিলাহ) খবরের প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদানের সাথে সাথে একে খবরের মর্যাদাহীনতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন-**إِنَّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ** **الَّذِي** এ উদাহরণে ইসমে মাওসূল (**الَّذِي**) এবং সিলাহ (**لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ**) মিলে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে যা তার পরবর্তীতে আগমনকারী খবরের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, খবরটা ফিক্‌হ সংক্রান্ত কোনো বিষয় হবে। যেমন- ফিক্‌হশাস্ত্র সংকলন করে কিতাব লিখবে। কিন্তু মুবতাদার মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তার সংকলন ভালো হবে না। কেননা, যখন সে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ তখন তার থেকে আর কতটুকুই ভালো রচনা আসতে পারে, এটাই তার মর্যাদাহীনতা। কেননা, জ্ঞান যেমনি মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, তেমনি মুর্থতা ও অপারগতা মানুষের মর্যাদাকে খাটো করে। মুসান্নিফ বলেন, কখনো এর মধ্যে খবর ছাড়া অন্য বিষয়ের অমর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন-**إِنَّ الَّذِي يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ** এ বাক্যে (**الَّذِي**) ইসমে মাওসূল ও (**يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ**) সিলাহ মিলিতভাবে খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, খবরটিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও পরিণামে ব্যর্থতার কথা থাকবে, সেই সাথে শয়তানের তুচ্ছতা ও চরম লাঞ্ছনার কথাও এতে রয়েছে। কারণ, যার অনুকরণ করলে ক্ষতি হয় এবং ব্যর্থতার শিকার হতে হয় সে অবশ্যই চরম নিকৃষ্ট।

সার-সংক্ষেপ : ইসমে মাওসূল ও সিলাহ দ্বারা গঠিত মুসনাদ ইলাইহ কখনো খবরের প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দানের সাথে সাথে খবর ব্যতীত অন্য কিছুর সম্মান বুঝায়, আবার কখনো খবরের অসম্মানও বুঝায়।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ-**الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ** এ উদাহরণে হযরত শু'আইব (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ পেয়েছে, তিনি ইবারতে **خَيْرٌ** নন। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ-**إِنَّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ مَعْرِفَةَ الْفِقْهِ قَدْ صَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا**

কখনো **خَيْرٌ** ব্যতীত অন্য বিষয়ের তুচ্ছতা বুঝায়। যেমন-**إِنَّ الَّذِي يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ خَاسِرٌ** এ উদাহরণে শয়তানের তুচ্ছতা প্রকাশ পেয়েছে, শয়তান এখানে **خَيْرٌ**-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটাই হচ্ছে تَحْقِيقُ خَيْرٍ-এর অর্থ

إِنَّ الَّذِي : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পরবর্তী কবিতা

تَحْقِيقُ الْخَيْرِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي مِثْلِ إِنْ الَّذِي : মুসান্নিফ (র.) বলেন, পরবর্তী কবিতা

سَكَ السَّمَاءِ : আল্লাহ তা'আলার আকাশকে

تَحْقِيقُ خَيْرٍ-এর মধ্যে

পাওয়া যায় না। কেননা,

সুউচ্ছে স্থাপন করা তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করার কারণ নয় এবং দলিলও নয়। সুতরাং তাদের বাড়ি বানানোর খবরটিকে তা নিশ্চিত করছে না এবং খবরের বক্তব্যকে শক্তিশালীও করছে না। فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيمَاءِ وَتَحْقِيقِ الْخَبَرِ।

মুসান্নিফ বলেন, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা الْخَبَرِ الْإِيمَاءِ-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। আর তা হলো الْإِيمَاءِ-এর মধ্যে শুধুমাত্র খবরের ধরন কিরূপ হবে তার নির্দেশনা থাকে; কিন্তু تَحْقِيقِ الْخَبَرِ-এর খবরের ধরনের নির্দেশনার সাথে খবরটি যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নিশ্চিত ঘটেছে তার ইঙ্গিত থাকে। বরং বলতে গেলে খবরটি যে নিশ্চিত ঘটেছে এর জন্য মুসনাদ ইলাইহ দলিল হয়ে থাকে। যেমন উপরের কবিতায় ضَرْبُ تَارِ তার مُعَبِّتٌ زَوَالٌ-এর জন্য দলিল ছিল; কিন্তু শুধুমাত্র الْإِيمَاءِ-এর মধ্যে এ কথাটি নেই। যেমন পূর্ববর্তী কবিতা سَمَكَ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءِ তাদের জন্য বাড়ি নির্মাণের কারণ ও দলিল নয়।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো ইসমে মাওসুল ও সিলাহ সম্মিলিতভাবে মুসনাদ ইলাইহরূপে ব্যবহৃত হয়ে খবরের প্রকৃতি সম্পর্কে সংবাদ দানের সাথে সাথে খবরের নিশ্চয়তা বুঝায় এবং খবর সংঘটিত হওয়ার দলিল হয়। যেমন—

إِنَّ الَّتِي ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً * بِكُوفَةِ الْجُنْدِ غَالَتْ وَدَّهَا غَوْلٌ

এ কবিতার চরণে মুবতাদা অংশে দেশত্যাগ ও প্রবাসে বসতি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আর খবর অংশে ভালোবাসা ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মুবতাদা খবরের বক্তব্যকে মজবুত করল। কারণ, দেশত্যাগ করা ভালোবাসা ছিন্ন হওয়ার দলিল। মুসান্নিফ (র.) বলেন, تَحْقِيقِ الْخَبَرِ এবং الْإِيمَاءِ إِلَى وَجْهِ بِنَاءِ الْخَبَرِ এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। কেননা, الْإِيمَاءِ-এর মাঝে تَحْقِيقِ الْخَبَرِ-এর বিষয়টি নেই। যেমন পূর্ববর্তী কবিতা سَمَكَ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءِ-এর মধ্যে تَحْقِيقِ الْخَبَرِ পাওয়া যায় না।

وَبِالْإِشَارَةِ أَيْ تَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِإِبْرَادِهِ إِسْمَ الْإِشَارَةِ لِتَمَيُّزِهِ أَيْ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
 أَكْمَلَ تَمَيُّزٍ لِفَرْضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ نَحْوُ قَوْلِهِ عَ هَذَا أَبُو الصَّفْرِ فَرْدًا نَصَبَ عَلَى الْمَدْحِ أَوْ
 عَلَى الْحَالِ فِي مَحَاسِنِهِ * مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِّ وَالسَّلَامِ * وَهُمَا شَجَرَتَانِ
 بِالْبَادِيَةِ يَغْنِي بَقِيمُونَ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّ فَقْدَ الْعِزِّ فِي الْحَضَرِ -

অনুবাদ : এবং ইশারা দ্বারা অর্থাৎ ইসমে ইশারা ব্যবহার করার দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে যে কোনো উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা হয় যাতে মুসনাদ ইলাইহ সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও চিহ্নিত হয়। যেমন কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) এই আবুস সাকার উত্তম গুণাবলিতে অদ্বিতীয়। এতে মানসূব হয়েছে প্রশংসাসূচক ফে'লের (মাফউলের) ভিত্তিতে, নয়তো হালের ভিত্তিতে। সে দাল এবং সালামের মধ্যবর্তী গোত্র শায়বানের বংশোদ্ভূত। (দাল এবং সালাম) এগুলো জঙ্গলের দু'টি বৃক্ষ। অর্থাৎ তারা উপত্যকায় বাস করে। কেননা, শহুরে জীবনে মর্যাদাহানি হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِالْإِشَارَةِ أَيْ تَعْرِيفِ الْخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারার সাহায্যে নির্দিষ্ট করা। এর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ সবচেয়ে উত্তম পন্থায় চিহ্নিত হয়। ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হলে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাপারে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। আর এভাবে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমরূপে প্রশংসা করা। যেমন নিম্নের কবিতার চরণে করা হয়েছে—

هَذَا أَبُو الصَّفْرِ فَرْدًا فِي مَحَاسِنِهِ * مِنْ نَسْلِ شَيْبَانَ بَيْنَ الضَّالِّ وَالسَّلَامِ

فَرْدًا শব্দটি মানসূব, মাফউল হিসেবে অথবা حال হিসেবে। মাফউল হলে এর আমেল হলো اَمَدَحُ অথবা اَعْنَى উহা ফে'ল যা প্রশংসার অর্থ প্রদান করে। অথবা (أَبُو الصَّفْرِ) যুলহাল ফَرْدًا হলো হাল। তারকীবের মধ্যে أَبُو الصَّفْرِ হচ্ছে هَذَا মুবতাদার খবর। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে, যুলহালের জন্য ফায়েল অথবা মাফউল হওয়া জরুরি। কিন্তু এখানে তো ফে'লের অন্তিত্বই অনুপস্থিত, তাহলে হালের তারকীব কিভাবে সম্ভব? এর জওয়াব হলো, أَبُو الصَّفْرِ অর্থগতভাবে মাফউল হয়েছে ইসমে ইশারার কারণে অথবা هاء তান্বীহের কারণে, কেননা ইসমে ইশারাতে اُشِيرَ-এর অর্থ এবং هاء তান্বীহে اُنِي-এর অর্থ রয়েছে। অতএব, فَرْدًا অর্থগতভাবে মাফউল থেকে হাল হয়েছে। সুতরাং এখন কোনো আপত্তি বাকি নেই।

مَحَاسِن শব্দটি مَحْسِن-এর বহুবচন। مَحْسِن এখানে حَسَن-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য মতে এটি حُسْن-এর বহুবচন خِلَافِ قِيَّاس হিসেবে। এর অর্থ শারীরিক সৌন্দর্য, উত্তম চরিত্র। شَيْبَانَ এক ব্যক্তির নাম। তার নামে তার অধস্তন বংশধরেরা শায়বানী নামে পরিচিত হয়। এক সময় এটি গোত্রের নামে পরিচিত হয়ে যায়। ضَالٌ বন্যকূল গাছ। سَلَمٌ মরুভূমির এক প্রকার কাটাবিশিষ্ট গাছ। উভয় ধরনের গাছ বনে-জঙ্গলে হয়ে থাকে, এখানে উভয় প্রকার বৃক্ষের মধ্যবর্তী জায়গার দ্বারা উপত্যকা উদ্দেশ্য।

এ কবিতায় মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার প্রশংসা করার জন্য। কেননা, যখন একটি বস্তুকে ইসমে ইশারার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা হবে, তখন এর প্রশংসা যথার্থরূপে হবে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এই আবুস সাকার যে গুণাবলিতে অদ্বিতীয় এবং শায়বান বংশোদ্ভূত, সে বন্যকূল বন ও সালামবনের মধ্যবর্তী উপত্যকায় বাস করে। কেননা, শহুরে জীবনে প্রতিষ্ঠার অভাবে তার মর্যাদার হানি হয়।

أَوِ التَّعْرِیْضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ حَتَّى كَانَتْ لَا یُذْرِكُ غَیْرَ الْمَحْسُوسِ كَقَوْرِ

أَوْلَئِكَ أَبَائِي فَجَنَنْتُ بِمِثْلِهِمْ * إِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعِ أَوْ بَيَّانَ حَالِهِ أَيْ الْمَسِدِ
إِلَيْهِ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَوْ التَّوَسُّطِ كَقَوْلِكَ هَذَا وَ ذَلِكَ أَوْ ذَاكَ زَيْدٌ وَآخَرُ ذَكَرَ التَّوَسُّطَ لِأَنَّهُ
إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الطَّرْفَيْنِ وَآمَثَالُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ يَنْظُرُ فِيهَا أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْ
حَيْثُ أَنَّهَا تُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا مَثَلًا لِلْقُرْبِ وَ ذَلِكَ لِلْمُتَوَسُّطِ وَ ذَلِكَ لِلْبُعْدِ وَعِلْمُ الْمَعَانِي
مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِذَا أُريدَ قُرْبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ يُؤْتَى بِهَذَا وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ الَّذِي هُوَ
الْحُكْمُ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمَذْكُورِ الْمُعْبَّرِ عَنْهُ بِشَيْءٍ يُوجِبُ تَصَوُّرَهُ عَلَى أَيْ وَجْهِ كَانَ -

অনুবাদ : অথবা (ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়) শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য। যেন সে অনুভূতির বাইরের বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে না। যেমন- কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) এরা হচ্ছে আমার পূর্বপুরুষ হে জারীর! সভা-সমাবেশগুলো যখন আমাদের জমায়েত করে সম্ভব হলে তাদের ন্যায় মর্যাদাবান লোক তুমি হাজির করো। অথবা মুসনাদ ইলাইহের অবস্থান তথা নিকটে, দূরে এবং মাঝখানে বর্ণনা করার জন্য। যেমন- তুমি বললে এই, ঐ এবং এই যে যায়েদ। মধ্যবর্তী ইসমে ইশারার উল্লেখ পরে করেছেন। কেননা, তার অবস্থান নির্ণয় উভয় পার্শ্বের (নিকটবর্তী ও দূরবর্তী) অবস্থান নির্ণয়ের পর করা যায়। এ জাতীয় অধ্যায়গুলোতে অভিধানশাস্ত্রবিদগণ এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন যে, অভিধান বর্ণনা করে- উদাহরণস্বরূপ هَذَا নিকটবর্তী (ইশারার) জন্য, هَذَا মধ্যবর্তীর জন্য এবং ذَلِكَ দূরবর্তীর জন্য। ইলমুল মা'আনী এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে, যখন মুসনাদ ইলাইহের নিকটবর্তী অবস্থান ইচ্ছা করা হয়, ইসমে ইশারা তখন هَذَا দ্বারা আনা হয়, এ বিষয়টি আসল অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত। আসল অর্থ তো উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের ব্যাপারে যে কোনো হুকুম দেওয়া এবং এমন বিষয় দ্বারা ব্যক্ত করা যা তার প্রতিচ্ছবিকে সাব্যস্ত করে, তা যে কোনোভাবেই হোক না কেন?

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوِ التَّعْرِیْضِ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ : উক্ত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করার অপরাপর কারণগুলোর মধ্যে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়, শ্রোতার মেধাহীনতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য। অর্থাৎ শ্রোতা এতটা নির্বোধ ও বোকা যে, সে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা যা বুঝা যায় না, এমন কিছু অনুভব করতে পারে না, তাই তার জন্য ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। কারণ, ইসমে ইশারার উৎপত্তি হয়েছে অনুভূত বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অতএব, তাকে ইসমে ইশারা দ্বারা বলা হলে সে সহজে বুঝে যাবে। যেমন কবি ফারায়দাক তার যুগের অপর বিখ্যাত কবি জারীরের প্রতি কটাক্ষ করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা বলেছেন।

أَوْلَئِكَ أَبَائِي فَجَنَنْتُ بِمِثْلِهِمْ * إِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِعِ

কবিতার উক্ত চরণে ফারায়দাক জারীরের প্রতি কটাক্ষ করার জন্য أَوْلَئِكَ ইসমে ইশারা ব্যবহার করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, জারীর এতটা বোকা ও মেধাহীন যে, তাকে ইসমে ইশারার সাহায্যে না বললে সে মেধাহীনতার কারণে মুসনাদ ইলাইহকে অনুধাবন করতে পারবে না। তাই জারীরকে বলছেন হে জারীর, চোখ কান খুলে দেখ, এই যে এরাই আমার বংশের মহৎ লোকেরা। ফারায়দাক যদি অমুক অমুক ও অমুক আমার বংশের লোক বলতেন, তাহলে জারীরের প্রতি উক্ত কটাক্ষ করা হতো না।

قَوْلُهُ أَوْ بَيَّانٌ حَالِهِ فِي الْقُرْبِ وَالْبَعْدِ : মুসনাদ ইলাইহ কাছে, দূরে ও মাঝামাঝি, এর কোনো এক অবস্থায় আছে এ কথা বুঝানোর জন্য ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয়। মুসনাদ ইলাইহ কাছে আছে একথা বুঝানোর জন্য বলা হয় (যেমন- هَذَا) ذَلِكَ زَيْدٌ। আর যদি দূরে কোথাও থাকে, তাহলে বলা হয় ذَلِكَ زَيْدٌ। যদি মধ্যবর্তী কোনো স্থানে থাকে, তাহলে বলা হয় ذَلِكَ زَيْدٌ। এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, সিরিয়াল অনুসারে প্রথমে কাছে, এরপর মাঝে, এরপর দূরে এভাবে ইসমে ইশারার বর্ণনা দরকার ছিল। কিন্তু মূল লেখক এ সিরিয়ালের অনুসরণ না করে মধ্যবর্তী ইশারাকে দূরবর্তী ইশারার পরে কেন আনলেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, تَوَسُّطٌ হলো নিকট ও দূর-এর মাঝের স্থানের নাম। মধ্যবর্তী স্থানের অস্তিত্ব উভয় পার্শ্বের অবস্থান নির্ণয়ের পর হয়ে থাকে, তাই تَوَسُّطٌ (মধ্যবর্তী)-এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَمْثَالُ هَذِهِ السَّبَاحِثِ : এই ইবারত দ্বারাও একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, هَذَا দ্বারা নিকটবর্তী ইঙ্গিত, ذَلِكَ দ্বারা মধ্যবর্তী ইঙ্গিত এবং ذَلِكَ দ্বারা দূরবর্তী ইঙ্গিত, এ সবার আলোচনা তো অভিধানশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ইলমে মা'আনীতে যে কোনো বিষয়ের মূল অর্থের বাইরে অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লিখিত ইসমে ইশারার অর্থসমূহ বর্ণনা করা মূল (অভিধানগত) অর্থের আলোচনা। এগুলো মূল অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অর্থ নয়। তাই বালাগাত বিশারাদগণ এ আলোচনায় কিভাবে নিজেদের নিয়োজিত করলেন?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, অভিধানশাস্ত্রবিদগণ শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেন। যেমন (তারা বলেন, هَذَا) নিকটবর্তী অর্থ দেয় ذَلِكَ দূরবর্তী অর্থ দেয় ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইলমে মা'আনীর ইমামগণের বর্ণনার ধারা হলো, যখন মুসনাদ ইলাইহ নিকটবর্তী হয় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসনাদ ইলাইহের উক্ত অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন هَذَا কে ব্যবহার করা হয়। এমনভাবে যখন মুসনাদ ইলাইহ দূরবর্তী হয় এবং সেই দূরবর্তী মুসনাদ ইলাইহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন ذَلِكَ ব্যবহার করা হয়। এ ধারার বর্ণনা তার মূল অর্থ বর্ণনার মতো নয়; বরং এতে অতিরিক্ত অর্থ বিদ্যমান। মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রে আসল অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহের উপর যে কোনোভাবে মুসনাদের হুকুম দেওয়া- মুসনাদ ইলাইহ ইসমে মাওসূল, নামবাচক ও ইসমে ইশারা যাই হোক না কেন; কিন্তু তার নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী হওয়া যখন বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তখন ইসমে ইশারা هَذَا, অথবা ذَلِكَ ব্যবহার করা হয়। অতএব, নামবাচক বিশেষ্য অথবা ইসমে মাওসূল, যা মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে সেটাকে নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী বুঝানোর উদ্দেশ্যে যদি هَذَا অথবা ذَلِكَ ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাই হবে অতিরিক্ত অর্থ যা মূল মুসনাদ ইলাইহ (নামবাচক বা ইসমে মাওসূল)-এর চেয়ে বেশি অর্থসম্পন্ন। অতএব, তাদের উপর আপত্তি উঠতে পারে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. ইসমে ইশারাহ রূপে মুসনাদ ইলাইহের ব্যবহার করা হয় কখনো শ্রোতার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণের জন্য। যেমন-

أَوَّلِيكَ أَبَانِي فَيَحْنِي بِمَثَلِهِمْ * إِذَا جَمَعْتَنَا يَا جَرِيرُ الْمَجَامِ

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহের অবস্থান বুঝানোর জন্য ইসমে ইশারাহ রূপে মুসনাদ ইলাইহকে প্রকাশ করা হয়। যেমন- ১. هَذَا زَيْدٌ ২. هَذَا زَيْدٌ ৩. ذَلِكَ زَيْدٌ ৪. ذَلِكَ زَيْدٌ

গ. উল্লেখ্য যে, ইসমে ইশারাহ দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ সম্পর্কে অতিরিক্ত একটি বিষয় জানা যায়। আর তা হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থান। ইসমে ইশারাহ ব্যবহার না করা হলে তা জানা হতো না।

أَوْ تَحْقِيرهَ أَى تَحْقِيرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْقُرْبِ نَحْوُ أَهَذَا الَّذِى يَذْكُرُ إِلَهَتَكُمْ أَوْ
تَعْظِيمِهِ بِالْبُعْدِ نَحْوُ أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ تَنْزِيلًا لِبُعْدِ دَرَجَتِهِ وَ رَفْعِهِ مَحَلِّهِ مَنْزِلَةً بَعْدَ
الْمَسَافَةِ أَوْ تَحْقِيرهَ بِالْبُعْدِ كَمَا يُقَالُ ذَلِكَ اللَّعِينُ فَعَلَ كَذَا تَنْزِيلًا لِبُعْدِهِ عَنِ سَاحَةِ
عِزِّ الْحُضُورِ وَالْخُطَابِ مَنْزِلَةً بَعْدَ الْمَسَافَةِ وَلَفْظُ ذَلِكَ صَالِحٌ لِلإِشَارَةِ إِلَى كُلِّ غَائِبٍ
عَيْنًا كَانَ أَوْ مَعْنَى وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْمَعْنَى الْحَاضِرُ الْمُتَقَدِّمُ بِلَفْظِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى
غَيْرُ مُذَكَّرٍ بِالْحِسِّ فَكَانَهُ بَعِيدٌ -

অনুবাদ : অথবা মুসনাদ ইলাইহকে ব্যবহার করা করা হয় নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য। যেমন- **الَّذِى يَذْكُرُ إِلَهَتَكُمْ** -এই সে? যে তোমাদের প্রভুর সমালোচনা করে। অথবা দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের সম্মান বুঝানোর জন্য। যেমন- আলিফ-লাম-মীম। ঐ পবিত্র গ্রন্থ (এভাবে বলা হয়েছে) এর মর্যাদার দূরত্ব এবং সুমহান স্থানকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ে ধরে। অথবা দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য। যেমন বলা হয়, ঐ নিকট ব্যক্তি এ কাজ করেছে। এভাবে বলা হয়েছে তার উপস্থিতি এবং সম্বোধনের সম্মানের ময়দানের দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ে ধরে। **ذَلِكَ** শব্দটি যে কোনো ধরনের অনুপস্থিতি বস্তু অথবা বিষয়ের প্রতি ইশারা দানের উপযুক্ত। অনেক সময় ইতঃপূর্বে আলোচিত স্বরণে আছে, এমন বিষয়ের প্রতি **ذَلِكَ** দ্বারা ইশারা করা হয়। কেননা, অর্থ বা বিষয় পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত না হওয়াতে তা দূরবর্তী বলেই গণ্য হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ تَحْقِيرهَ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করার আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. **تَعْظِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْقُرْبِ** মুসনাদ ইলাইহকে তুচ্ছতা জ্ঞান করার জন্য কখনো নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, আমরা আমাদের ব্যবহারেও সাধারণ এবং তুচ্ছ বুঝানোর জন্য নিকটবর্তী ইসমে ইশারা ব্যবহার করে থাকি। যেমন- বলে থাকি এটা সহজ বিষয়, এইতো সাধারণ ইত্যাদি। যে জিনিস সহজ লভ্য সেটা মানুষের কাছে ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান হয় না। অতএব, নিকটবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা যখন কোনো বস্তুকে ইঙ্গিত করা হবে তখন সে বস্তুটি কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। এর উদাহরণ- **أَهَذَا الَّذِى يَذْكُرُ إِلَهَتَكُمْ**

অভিশপ্ত আবু জাহল রাসূল ﷺ -কে তাজিল্লির সুরে বলেছিল : “এই কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের প্রভু-প্রতিমাদের সমালোচনা করে।”

قَوْلُهُ أَوْ تَعْظِيمِهِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় অর্থাৎ দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা একথা বুঝানো হয় যে, যার প্রতি ইশারা করা হয়েছে তা এমন মর্যাদাসম্পন্ন এবং আধীমুশশান যে, তার মর্যাদার কারণে সে এত দূরত্বে অবস্থান করেছে যে, তাকে কাছে পাওয়া যায় না। যেমন- **أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** (কুরআন)। এটি খুব কাছে হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদাগতভাবে এত উঁচুতে অবস্থান করেছে যে, তার কাছে পৌছা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এর প্রতি **ذَلِكَ** দ্বারা ইশারা করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেন তার মর্যাদার দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের জায়গায় রাখা হয়েছে এবং স্থানগত দূরের জিনিসকে যেমন দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তেমনি এটাকেও দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ تَخْفِيرُهُ بِالْبَعْدِ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অপমান করার জন্য দূরবর্তী ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন- মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিকে কেউ বলল ذَلِكَ اللَّعِينُ فَعَلَ كَذَا অর্থাৎ ঐ অভিশপ্ত লোকটি এমনটি করেছে। এটা তখনই বলা হয় যখন উক্ত ব্যক্তি সম্বোধন করার উপযুক্ত না হয় এবং খুবই নিকৃষ্ট হয়, তার সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে এর দূরত্বকে স্থানের দূরত্বের পর্যায়ে রেখে স্থানের দূরত্বের ক্ষেত্রে যেমন দূরবর্তী ইসমে ইশারা ব্যবহার করা হয় এখানেও তেমনটি করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَفْظُ ذَلِكَ صَالِحُ الْخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, ذَلِكَ শব্দটি দ্বারা প্রত্যেক অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যায়। সেই অনুপস্থিত বিষয়টি কোনো বস্তুও হতে পারে, আবার তা নিরাকার অর্থগত বিষয়ও হতে পারে। কিন্তু অনুপস্থিত বিষয়ের প্রতি ذَلِكَ-এর ইশারাটি মাজাযের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, হাকীকীভাবে ذَلِكَ এমন দূরবর্তী বস্তুর ইঙ্গিতের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা চর্মচক্ষ দ্বারা দেখা যায়। অদৃশ্য কোনো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতের জন্য ذَلِكَ কে ব্যবহার করা যায় না।

قَوْلُهُ وَكَيْفَرًا مَّا يَذْكُرُ الْمَعْنَى : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ذَلِكَ-এর মধ্যে ذَلِكَ-এর ব্যবহার সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, কখনো চলমান কোনো বিষয় যা ذَلِكَ-এর আগে এসেছে, এমন বিষয়ের প্রতি ذَلِكَ দ্বারা ইশারা করা। এখানে বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন জিনিস, যা চোখের সাহায্যে দেখা যায় না। অতএব, এর মধ্যে শব্দও शामिल হবে। কেননা, শব্দকে দেখা যায় না।

এসব বিষয় এবং শব্দের প্রতি ذَلِكَ (إِسْمٌ إِشَارَةٌ بِعَيْنٍ) দ্বারা এ জন্য ইঙ্গিত করা হবে যে, এগুলো অদৃশ্য হওয়ার কারণে যেন দূরে অবস্থান করছে।

অনেক স্থানে এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- ذَلِكَ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ امْتَالَهُم-এর শব্দটি দ্বারা কুরআনের একটি প্রবাদ- যথা ذَلِكَ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনিভাবে শপথ রূপে তুমি বললে بِاللَّهِ الْغَالِبِ এরপর বললে ذَلِكَ قَسَمٌ عَظِيمٌ এখানে দেখা যাচ্ছে ذَلِكَ الْكِتَابُ ও উপরোক্ত দু'টি ব্যবহারের মতো একটি ব্যবহার।

قَوْلُهُ الْمَعْنَى الْحَاضِرُ الْمُتَقَدِّمُ يَلْفِظُ ذَلِكَ : এ বাক্যের مَعْنَى দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে لَفْظ বা শব্দ অর্থাৎ মানবের কথাবার্তা। الْحَاضِرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে عَرَف বা সাধারণ যাকে উপস্থিত মনে করে। যেমন উল্লিখিত উদাহরণে قَسَم بِاللَّهِ قَسَم (بِاللَّهِ الْغَالِبِ আর الْمُتَقَدِّمُ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা ইসমে ইশারার পূর্বে গিয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. নিকটবর্তী ইসমে ইশারাহ দ্বারা কখনো শ্রোতার প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করা হয়। যেমন- وَهَذَا الَّذِي

খ. দূরবর্তী ইসমে ইশারাহ দ্বারা কখনো সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যেমন- ذَلِكَ الْكِتَابُ

গ. দূরবর্তী ইসমে ইশারাহ দ্বারা কখনো তুচ্ছতা প্রকাশ করা হয়। যেমন- ذَلِكَ اللَّعِينُ فَعَلَ كَذَا

ঘ. শব্দ-বাক্য ও কথাবার্তার প্রতি দূরবর্তী ইসমে ইশারাহ ব্যবহার করা হয়।

أَوِ التَّنْبِيهِ أَى تَعْرِيفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ لِلتَّنْبِيهِ عِنْدَ تَعْقِيبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ
 بِأَوْصَافٍ أَى عِنْدَ إِبْرَادِ الْأَوْصَافِ عَلَى عَقَبِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ يُقَالُ عَقِبَهُ فَلَانَّ إِذَا جَاءَ عَلَى
 عَقِبِهِ ثُمَّ تَعَدَّيْهِ بِالْبَاءِ إِلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي وَتَقُولُ عَقَّبْتَهُ بِالشَّيْءِ إِذَا جَعَلْتَ الشَّيْءَ
 عَلَى عَقِبِهِ وَبِهَذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيلَ إِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جَعْلِ اسْمِ الْإِشَارَةِ بِعَقَبِ أَوْصَافٍ
 عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّنْبِيهِ أَى لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ جَدِيرٌ بِمَا يَرُدُّ بَعْدَهُ أَى
 بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ مِنْ أَجْلِهَا مُتَعَلِّقٌ بِجَدِيرٍ أَى حَقِيقٌ بِذَلِكَ لِأَجْلِ الْأَوْصَافِ الَّتِي ذُكِرَتْ
 بَعْدَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ نَحْوُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَى قَوْلِهِ أُولَئِكَ عَلَى
 هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَقَّبَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَوْصَافٍ
 مُّتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ وَأَقَامَةَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ
 تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِمْ أَحَقُّأُ بِمَا يَرُدُّ بَعْدَ أُولَئِكَ وَهُوَ كَوْنُهُمْ عَلَى الْهُدَى
 عَاجِلًا وَالْفَوْزُ بِالْفَلَاحِ أُجَلًا مِنْ أَجْلِ اتِّصَافِهِمْ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ -

অনুবাদ : অথবা মুসনাদ ইলাহিকে ইসমে ইশারার সাহায্যে নির্দিষ্ট দ্বারা সতর্ক করা হয় যখন ইঙ্গিতকৃত বস্তুর পরে কিছু গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ইঙ্গিতকৃত বস্তুর পর বিভিন্ন গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। **عَقِبَهُ فَلَانَّ** বলা হয় যখন অমুক ব্যক্তি তার পরে আসে। এরপর তাকে দ্বিতীয় মাফউলের দিকে **بِ** দ্বারা মুতা'আদী কল্পে। তুমি বললে **عَقَّبْتَهُ بِالشَّيْءِ** অর্থ যখন তুমি জিনিসকে তারপরে আনবে। সুতরাং এর দ্বারা এ ব্যাপারে কতিপয় লোকদের যখন ইসমে ইশারাহ (তথা মুশারুন ইলাইহ)-কে গুণসমূহের পরে আনা হয় এর ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেল। **عَلَى أَنَّهُ** মুতা'আল্লিক হবে **تَنْبِيْهِ**-এর সাথে। অর্থাৎ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দানের জন্য যে, মুশারুন ইলাইহ তারপর অর্থাৎ ইসমে ইশারার পর উল্লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে উপযুক্ত সেই গুণগুলোর কারণে, যা উল্লেখ করা হয়েছে মুশারুন ইলাইহের পর। যেমন (অর্থ) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে তারাই তাদের প্রভুর প্রদর্শিত হিদায়েতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। মুশারুন ইলাইহ তথা **مُتَقِينَ**-এর পরে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, নামাজ কায়েম করা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় এনেছেন। অতঃপর মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করেছেন, এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, মুশারুন ইলাইহ **أُولَئِكَ**-এর পর যা আসছে তার ব্যাপারে তা অধিক উপযুক্ত। তা হচ্ছে ইহজগতে তাদের সফলকাম হওয়া এবং পরজগতে প্রভূত কল্যাণের মাধ্যমে কামিয়াব হওয়া। আর এটা তাদের উল্লিখিত গুণাবলিতে অভিযুক্ত হওয়ার কারণেই।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ফোলে **أَوِ التَّنْبِيْهِ الخ** : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে ইসমে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় শ্রোতাকে এ কথা অবগত করানোর জন্য যে, মুশারুন ইলাইহের পর যে সকল গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে তার কারণেই ইসমে ইশারার পরবর্তী সব বিষয়ের হুকুম তাকে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ মুশারুন ইলাইহ উক্ত হুকুম পাওয়ার উপযুক্ত উল্লিখিত গুণাবলির

কারণেই হয়েছে, অন্য কারণে নয়। যেমন : **أُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ** : আয়াতের দু'স্থানে **أُولَئِكَ** হলো ইসমে ইশারা। তার মুশাররুন ইলাইহ হচ্ছে **مُتَّقِينَ**। মুশাররুন ইলাইহের পর অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস, নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ইত্যাদি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ইসমে ইশারার পর দু'টি বক্তব্য রয়েছে- ১. পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার হিদায়েত, ২. আখিরাতে সফলতা। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইসমে ইশারার সাহায্যে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, **مُتَّقِينَ** তথা আল্লাহভীরুদের সফলতা এবং হিদায়েতপ্রাপ্তি উল্লিখিত গুণাবলির কারণে হবে, যা মুশাররুন ইলাইহের পর এবং ইসমে ইশারার আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ عِنْدَ تَعْقِيبِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِأَوْصَانٍ : এই ইবারতের ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ বলেন **عَقَّبَ** ফে'লটির কখনো একটি মাফউল হয়, আবার কখনো দু'টি। যখন দ্বিতীয় মাফউলের প্রয়োজন হয় তখন দ্বিতীয় মাফউলটি **تَعْدِيَةً**-এর পর আসে। **عَقَّبَهُ** অর্থ অমুক তার পরে এসেছে। আর **عَقَّبَتْهُ** **بِالشَّيْءِ**-এর অর্থ হচ্ছে তুমি তার পরে জিনিসটি আনলে। অভিধানের উক্ত ব্যবহার অনুসারে **تَعْقِيبُ الْمَشَارِ إِلَيْهِ بِأَوْصَانٍ**-এর অর্থ হচ্ছে মুশাররুন ইলাইহের পর গুণাবলিকে আনা। তাইতো তিনি এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন **عِنْدَ إِيرَادِ الْأَوْصَانِ عَلَى عَقْبِ الْمَشَارِ إِلَيْهِ**

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কতিপয় লোক মনে করেন, **عَلَى** যার উপর আসে তা আগে হয় প্রথম মাফউল থেকে। সে মতে আয়াতে গুণাবলি আগে আসবে, এরপর মুশাররুন ইলাইহ আসবে। তাদের এ মতটি সঠিক নয়। কেননা, একেতো তা অভিধানের বর্ণনার বিপরীত, দ্বিতীয়ত আয়াতের বর্ণনার সাথেও মিলে না। কারণ, আয়াতের মধ্যে মুশাররুন ইলাইহ (**مُتَّقِينَ**) আগে এসেছে, তারপর গুণাবলি (অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস করা, নামাজ কায়েম ইত্যাদি) পরে এসেছে।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো ইসমে ইশারার পূর্বে এমন মুশাররুন ইলাইহ গত হয় যার কতিপয় গুণাবলি ইসমে ইশারার পূর্বে এবং মুশাররুন ইলাইহের পর উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর ইসমে ইশারাকে উল্লেখ করত এ ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে, ইসমে ইশারার পরবর্তী বিষয়গুলো ঐসব গুণাবলির কারণে প্রযোজ্য, যার উল্লেখ ইসমে ইশারার পূর্বে হয়েছে। যেমন- **أُولَئِكَ عَلَى هُدًى**। **الَّذِينَ** মুশাররুন-এর গুণাবলি **أُولَئِكَ** হচ্ছে ইসমে ইশারা, তার মুশাররুন ইলাইহ হচ্ছে **مُتَّقِينَ**। **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** থেকে শুরু হয়েছে। ইসমে ইশারার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে দু'টি- ১. হিদায়েতের উপর থাকা ও ২. আখিরাতে সফলতা। সুতরাং ইসমে ইশারা দ্বারা এ ইঙ্গিত প্রদান করা হচ্ছে যে, মুত্তাকীগণ হিদায়েত ও আখিরাতে সফলতা লাভে উপযুক্ত, তাদের ঈমান, নামাজ কায়েম ও যাকাত প্রদান ইত্যাদি গুণাবলির কারণে।

وَبِالْأَمِّ أَيْ تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْأَمِّ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَعْنَاهُ أَيْ إِلَى حِصَّةٍ مِنَ الْحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةً يُقَالُ عَهَدْتُ فَلَانًا إِذَا أَدْرَكْتَهُ أَوْ لَقِيتَهُ وَذَلِكَ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً نَحْوُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى أَيْ لَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبْتَ امْرَأَةً عِمْرَانَ كَالَّتِي أَيْ كَالْأُنْثَى الَّتِي وَهَبْتَ تِلْكَ الْأُنْثَى لَهَا أَيْ لِامْرَأَةِ عِمْرَانَ فَالْأُنْثَى إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ ذِكْرَهُ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَالذَّكَرُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا سَبَقَ ذِكْرَهُ كِنَايَةً فِي قَوْلِهِ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَإِنْ لَفْظَ مَا وَإِنْ كَانَ يَعْمُ الذَّكَوْرَ وَالْإِنَاثَ لَكِنَّ التَّحْرِيرَ وَهُوَ أَنْ يُعْتِقَ الْوَلَدَ لِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِنَّمَا كَانَ لِلذَّكَوْرِ دُونَ الْإِنَاثِ وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ وَقَدْ يُسْتَعْنَى عَنْ ذِكْرِهِ لِتَقَدُّمِ عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِهِ نَحْوُ خَرَجَ الْأَمِيرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ إِلَّا أَمِيرٌ وَاحِدٌ -

অনুবাদ : এবং মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় আলিফ লাম দ্বারা পরিচিত জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। অর্থাৎ হাকীকতের একটি অংশ যা বিবরণদাতা এবং শ্রোতার মধ্যে পরিচিত, একটি হোক অথবা একাধিক হোক, তার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য, عَهَدْتُ فَلَانًا বলা হয়- যখন তুমি তাকে পেলে এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করলে। এটা (পরিচিত হওয়া) তার উল্লেখ ইতঃপূর্বে স্পষ্ট অথবা পরোক্ষভাবে হওয়ার কারণে। যেমন- (কাজ্জিত) পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয় অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রী যে পুত্র সন্তান কামনা করেছিল তা তাকে প্রদত্ত মেয়ে সন্তানের মতো নয়। তার জন্য অর্থাৎ ইমরানের স্ত্রীর জন্য। মেয়ে সন্তান বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন বিশেষ্যের দিকে যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে স্পষ্টত গেছে আল্লাহ তা'আলার বাণী رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى (হে প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি)-এর মধ্যে। কিন্তু এটা মুসনাদ ইলাইহ নয়। পুত্র সন্তান বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এমন বিষয়ের দিকে যার উল্লেখ ইতঃপূর্বে প্রচ্ছন্নভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (হে প্রভু! আমি আপনার জন্য আমার পেটে যা আছে তার মান্নত করলাম)-এর মধ্যে مَا শব্দটি যদি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যবহার হয় তদুপরি তাহরীর অর্থাৎ সন্তানকে বায়তুল মোকাদ্দাসের খিদমতের জন্য নিয়োগ করা এটা তো কেবল পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, মেয়েদের জন্য নয়। এটা মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। অবশ্য কখনো তা পূর্বে (মুসনাদ ইলাইহের) উল্লেখের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না, শ্রোতার এ ব্যাপারে পূর্ব জ্ঞান থাকার কারণে। যেমন আমির বের হয়েছেন এটা বলা সহীহ যখন শহরে একজন মাত্র আমির থাকেন।

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ۖ اর্থاً ৷ হে আল্লাহ! আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে তা আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য সোপর্দ করলাম। তিনি পুত্র সন্তান কামনা করে এই প্রার্থনা করলেন; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এর বিপরীত, ফলে তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। কন্যা সন্তান দেখে হতাশ হয়ে তিনি বললেন, رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ۖ اর্থاً ৷ হে আল্লাহ! আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে সন্তান দান করার মান্নত করেছিলাম; অথচ তুমি তো আমাকে কন্যা সন্তান দিলে! এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْذَكَرُ الْاُنْثَى ۖ اর্থاً ৷ তোমার কাক্ষিকৃত পুত্র সন্তান এ মেয়েটির মতো নয়। আয়াতের اَلْذَكَرُ الْاُنْثَى ۖ এবং اَلْاُنْثَى ۖ উভয় ইসমের 'আলিফ লাম'টি عَهْدٌ خَارِجِي ৷-এর 'আলিফ লাম' দ্বারা এমন নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার আলোচনা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্টভাবে গেছে وَضَعْتُهَا اُنْثَى ৷-এর মধ্যে। তবে তারকীবের মধ্যে এটি

মুসনাদ ইলাইহ নয়। অথচ আলোচনা চলছে মুসনাদ ইলাইহ সংক্রান্ত। আয়াতের **الذِّكْرُ** দ্বারা এমন একটি নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যার আলোচনা ইতঃপূর্বে প্রচ্ছন্নভাবে গেছে। আর সেই আয়াতটি হচ্ছে **إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي** আয়াতের **مَا** শব্দটি যদিও ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই বুঝায়, কিন্তু যেহেতু একে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতে নিযুক্ত করা হবে তাই এর দ্বারা ছেলেই উদ্দেশ্য। অতএব, **مَا**-এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছেলে। যখন **مَا** দ্বারা ছেলে উদ্দেশ্য, কাজেই **الذِّكْرُ**-এর পূর্বে এর আলোচনাও **مَا**-এর মধ্যে গেছে; যদিও তা প্রচ্ছন্নভাবে। **الذِّكْرُ** শব্দের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। সুতরাং এটি মুসনাদ ইলাইহকে (আলিফ ও লাম নির্দিষ্ট ইসমের প্রতি ইঙ্গিতবাচক) নির্দিষ্ট করার উদাহরণ হলো।

عَلِمِي-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। **ع**-এর তৃতীয় প্রকার **عَهْدٌ خَارِجِيٌّ** : **قَوْلُهُ وَقَدْ يُسْتَفْنَى عَنْ ذِكْرِهِ** মুসান্নিফ (র.) বলেন- কখনো আলিফ লামের বিশেষ্যটির পূর্বোল্লেখ প্রয়োজন হয় না, শ্রোতার জ্ঞান এ বিষয়ে থাকার কারণে। যেমন কেউ বলল **خَرَجَ الْأَمِيرُ** আমির বের হয়ে গেছেন। যদিও আমিরের উল্লেখ পূর্ব আলোচনায় যায়নি; তবু এটিকে ব্যবহার করা সঠিক হয়েছে। কেননা, শ্রোতা জানে যে, শহরে একজন মাত্র আমিরই রয়েছেন। অতএব, লাম দ্বারা সুনির্দিষ্ট বা পরিচিত ইসমের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহ কখনো নির্দিষ্ট হয় 'আলিফ লাম' দ্বারা। 'আলিফ-লাম' প্রথমত দু' প্রকার।

১. **الِفَ لَامَ حَقِيقَتِي** ২. **الِفَ لَامَ عَهْدِ خَارِجِي**

الِفَ لَامَ عَهْدِ خَارِجِي যে শব্দে ব্যবহৃত হয় সে শব্দটি নির্দিষ্ট হয় এভাবে যে, সেই আলিফ লাম দ্বারা বক্তা ও শ্রোতার মাঝে পরিচিত কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইঙ্গিত করা হয়। সে ইঙ্গিতকৃত বস্তু বা ব্যক্তি একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সবই হতে পারে। যেমন- **وَلَيْسَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَى**

أَوْ لِلْإِشَارَةِ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ وَمَفْهُومِ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ إِعْتِبَارٍ لِمَا صَدَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَفْرَادِ كَقَوْلِكَ الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ يَأْتِي الْمَعْرَفُ بِلَامِ الْحَقِيقَةِ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ بِإِعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهِ فِي الذَّهْنِ لِمُطَابَقَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ الْحَقِيقَةِ يَغْنَى بِطُلُقِ الْمَعْرَفِ بِلَامِ الْحَقِيقَةِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْمُتَّحِدَةِ فِي الذَّهْنِ عَلَى فَرْدٍ مَوْجُودٍ مِنَ الْحَقِيقَةِ بِإِعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَعْهُودًا فِي الذَّهْنِ وَجُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ مُطَابِقًا إِيَّاهَا كَمَا يَطْلُقُ الْكُلِّيُّ الطَّبْعِيُّ عَلَى جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَّاتِهِ وَ ذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَّ لَيْسَ الْقَصْدُ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودِ وَلَا مِنْ حَيْثُ وَجُودُهَا فِي ضَمْنِ جَمِيعِ الْأَفْرَادِ بَلْ فِي بَعْضِهَا كَقَوْلِكَ أَذْخَلَ السُّوقَ حَيْثُ لَا عَهْدَ فِي الْخَارِجِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَآخِافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ -

অনুবাদ : অথবা হাকীকতের প্রতি ও একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ('আলিফ লাম' দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে আনা হয়) এবং এতে ফَرْد সমূহ প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- তুমি বললে الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ (পুরুষ মহিলা থেকে উত্তম)। কখনো হাকীকতের লাম মুতাকাল্লিমের মনে নির্দিষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে হাকীকতের অধীন যে কোনো একটি ফَرْد-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর তা এ হিসেবে যে, এককটি হাকীকতের মোতাবেক হয়েছে। অর্থাৎ হাকীকতের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ যা মনোগতভাবে সকলের জন্য তাকে মনে মনে হাকীকতের অধীন বাস্তবের একটি ফَرْد-এর বা একটি جُزْئِيٍّ-এর জন্য প্রয়োগ করা এই ভিত্তিতে যে, এটি হাকীকতের মোতাবেক। যেমনটি كُلِّيُّ طَبْعِي তার অনেক অংশের মধ্য থেকে একটি অংশের উপর প্রয়োগ হয়, আর এটা তখনই হয় যখন এমন নিদর্শন থাকে যে, এখানে মৌলিক হাকীকত উদ্দেশ্য নয়; বরং এটি অস্তিত্বশীল হয়েছে এর মাধ্যমে সমস্ত সদস্যের (فَرْد)-এর সাহায্যে নয়; বরং কোনো একটির সাহায্যে। যেমন- তুমি বললে أَذْخَلَ السُّوقَ (তুমি বাজারে যাও) যখন বাজার বাহ্যিকভাবে সুনির্দিষ্ট না হবে; এর উদাহরণ আল্লাহ তা'আলার বাণী أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ (অর্থ-) আমি আশঙ্কা করি "তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ لِلْإِشَارَةِ الْخ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয় হাকীকত তথা একটি বিশেষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য। দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَفْرَادُ হাড়া শুধুমাত্র হাকীকত। মুসান্নিফ (র.) এখানে হাকীকতের ব্যাখ্যায় مَفْهُوم শব্দটি এনেছেন, এর দ্বারা তিনি উপরোক্ত বক্তব্যকেই শক্তিশালী করেছেন কারণ, حَقِيقَةُ-এর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতে أَفْرَادُ-এর মাধ্যমে হাকীকতের অস্তিত্বের বিষয়টি রয়েছে।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, كُلِّيُّ দ্বারা যদি الْخَارِجِ (বাস্তবে অস্তিত্বশীল) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে একে হাকীকত বলা হয়। আর যদি বাস্তবে অস্তিত্ব উদ্দেশ্য না হয়; বরং মানসিক বিষয় হয় তাহলে একে مَفْهُوم বলা হয়। এখানে যেহেতু হাকীকত দ্বারা বাস্তবের অস্তিত্ব উদ্দেশ্য নয়, তাই মুসান্নিফ-এর ব্যাখ্যায় مَفْهُوم শব্দটি এনেছেন। মুসান্নিফ (র.) আরো বলেন, হাকীকতটি أَفْرَادُ-এর উপর প্রয়োগ হয়, এ হিসেবে এখানে হাকীকত উদ্দেশ্য নয়। এর উদাহরণ رَجُلٌ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ পুরুষ জাতি নারী জাতি থেকে উত্তম। এখানে إِمْرَأَةٌ এবং رَجُلٌ দ্বারা নারী ও পুরুষের হাকীকত উদ্দেশ্য, সকল পুরুষ বা নির্দিষ্ট একজন পুরুষ উদ্দেশ্য নয়। এ জাতীয় আরো উদাহরণ হচ্ছে-

الذِّينَارُ خَيْرٌ مِنَ الدِّرْهِمِ. الْكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ. الْإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ

قَوْلُهُ وَقَدْ يَأْتِي الْمَعْرُوفُ بِلَامٍ الْخ : মূল লেখকের বক্তব্যের উপর একটি আপত্তি কেউ কেউ করে থাকেন। তারা বলেন, তিনি পূর্বোক্ত দু' প্রকার (عَهْدٌ خَارِجِيٌّ وَحَقِيقِيٌّ) লামের বর্ণনায় তিনি যথাক্রমে وَقَدْ يَأْتِي ও وَقَدْ يَنْبَغُ ব্যবহার করেছেন। তার বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন বৈষম্যের কারণ কি? প্রথমত এর জবাব হলো, মূল লেখক তার বর্ণনার মধ্যে নতুনত্ব আনার জন্য এরূপ করেছেন। দ্বিতীয়ত এবং মূল কারণ হচ্ছে শেষোক্ত দু'প্রকার (لَا مَاسْتِغْرَاقِيٍّ وَ لَا عَهْدٌ ذَهْنِيٌّ) হাকীকতের লামেরই প্রকার এবং এর অন্তর্ভুক্ত। সে দিকেই ইঙ্গিত করার জন্য এরূপ ব্যবহার করেছেন, যাতে পাঠক বুঝতে পারে এটি হাকীকতেরই প্রকার। কেননা, لِإِسْفَارَةٍ ইত্যাদি ব্যবহার করলে এ দু'টিকে স্বতন্ত্র প্রকার বলেই মনে হতো।

তিনি বলেন, হাকীকতের লাম কখনো তার فَرْدٌ সমূহের মধ্য থেকে অনির্দিষ্ট فَرْদ-এর উপর প্রয়োগ হয়, তখন সেই فَرْদ টি মুতাকাল্লিমের মনে নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যদি فَرْদ অনির্দিষ্ট হয় তাহলে মুতাকাল্লিমের মনে সেটা নির্দিষ্ট হবে কি করে? কেননা, মূল লেখক তার ইবারত الذَّهْنُ فِي الْعَهْدِ بِأَعْتِبَارِ عَهْدِيَّتِهِ فِي الذَّهْنِ বলেছেন।

এর উত্তর হচ্ছে—عَهْدٌ ذَهْنِيٌّ দ্বারা যে فَرْদ টির প্রতি ইঙ্গিত করা হবে বাস্তবিকপক্ষে সে فَرْদ টি অনির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত নয়। কিন্তু এটি হাকীকতের একটি فَرْদ এবং তা হাকীকতের মোতাবেক, এ হিসেবে এটি যখন মনের মধ্যে অবস্থান করে এবং জানা হয় তখন এটি মনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাই একে সুনির্দিষ্ট বলা হয়েছে।

মোটকথা, মনের মধ্যে এর অবস্থান ও স্থিতির কারণে عَهْدٌ ذَهْنِيٌّ বলা হয়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, عَهْد অর্থ—পাওয়া। এটা মনের মধ্যে পাওয়া যায় এবং থাকে, এ কারণে একে عَهْدٌ ذَهْنِيٌّ বলা হয়েছে।

كُلِّيٌّ طَبْعِيٌّ : قَوْلُهُ كَمَا يُطْلَقُ الْكُلِّيُّ الطَّبْعِيُّ عَلَى جُزْئِيٍّ : মুসান্নিফ বলেন, এটি কুল্লি টবেঈ-এর মতো। কুল্লি টবেঈ যেমন তার অনেক جُزْئِيٍّ থেকে একটি جُزْئِيٍّ-এর উপর প্রয়োগ হয়। এর উদাহরণ হলো إِنْسَانٌ একটি كُلِّيٌّ طَبْعِيٌّ, তার অনেকগুলো جُزْئِيٍّ রয়েছে। এটি যায়েদ, আমর, খালিদ ইত্যাদির উপর আলাদাভাবে প্রয়োগ হয় এবং প্রত্যেকটি جُزْئِيٍّ-এর মধ্যে পাওয়া যায়। এমনভাবে হাকীকতও তার কোনো একটি فَرْদ-এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং প্রয়োগ হয়। এই فَرْদ টি সে হাকীকতের মোতাবেক হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, হাকীকতের লাম দ্বারা একটি فَرْদ তখনই উদ্দেশ্য করা হয় যখন এ দলিল থাকে যে, এর দ্বারা হাকীকত উদ্দেশ্য নয় অর্থাৎ أَفْرَادٌ ছাড়া মৌলিক হাকীকত উদ্দেশ্য নয়, যেমন জিনসের লামের মধ্যে হয়ে থাকে। যেমন—أَدْخَلَ السُّوقَ অর্থাৎ তুমি বাজারে প্রবেশ করো। এটি عَهْدٌ خَارِجِيٌّ-এর উদাহরণ হবে, যখন মুতাকাল্লিম এবং শ্রোতার মধ্যে বাজার দ্বারা কোনো বাজার তাদের মাঝে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, যার আলোচনা পূর্বে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত হয়েছে, অথবা শ্রোতা জানে। السُّوق-এর মধ্যে বর্তমান লামটি মৌলিক হাকীকতের লাম (যা কোনো فَرْদ-এর মাধ্যমে অস্তিত্বশীল হয়েছে) নয়। কেননা, কোনো বিষয়ের حَقِيقَتٌ ও مَا هِيَ-এর মধ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। এ ছাড়া إِسْتِغْرَاقِيٍّ-এর লামও নয়। কারণ, তখনতো উদ্দেশ্য হবে যত বাজার আছে সবগুলোতে প্রবেশ করো। আর এটা যে কোনো মানুষের জন্য অসম্ভব। অতএব এখানে এই প্রমাণ রয়েছে যে, এটি মৌলিক হাকীকতের লাম নয়। আবার إِسْتِغْرَاقِيٍّ উদ্দেশ্য করা সম্ভব নয়। لَاعَهْدٌ فِي عَهْدٍ خَارِجِيٍّ যে হবে না তার কথাও ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে। এটিকে মূল লেখক তার ইবারতের মধ্যে عَهْدٌ فِي الْخَارِجِ বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। অতএব, এটি عَهْدٌ ذَهْنِيٍّ-এর লাম। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কুরআনের আয়াতে هَيَّرْتُ إِيضًا كُفًّا (আ.)-এর উক্তি; তিনি বলেছিলেন, أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ আয়াতে-এর লাম হচ্ছে عَهْدٌ ذَهْنِيٍّ-এর লাম। কেননা, এটি মূল হাকীকতের লাম নয়। কেননা, তা ভক্ষণ করতে সক্ষম নয়; বরং হাকীকতের أَفْرَادٌ দ্বারা তা সম্ভব। أَفْرَادٌ দ্বারা সব أَفْرَادٌ উদ্দেশ্য নয়। কারণ একজন মানুষকে সব বাঘ মিলে খাবে এটাও অসম্ভব। এখানে এর দ্বারা মুতাকাল্লিম এবং শ্রোতার মাঝের পরিচিত এবং নির্দিষ্ট বাঘের কথাও বলা হয়নি। অতএব, এটা عَهْدٌ خَارِجِيٍّও নয়। সুতরাং যখন الذَّنْبُ-এর আলিফ লাম এ তিন প্রকারের কোনো প্রকারই হলো না, সুতরাং এটি আলিফ-লাম আহদে যাহনী হবে।

সান্ন-সংক্ষেপ : মুসনাদ ইলাইহকে কখনো নির্দিষ্ট করা হয় আলিফ লামের দ্বারা। এই নির্দিষ্টকরণের দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইশারা করা হয়। এ ধরনের আলিফ-লামকে حَقِيقِيٌّ لَا مَاسْتِغْرَاقِيٍّ বলা হয়। তিন প্রকার। الف الْف. ১. الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ الْأَمْرَاءِ : যেমন—الف الْف দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত বা একটি সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন—الف الْف দ্বারা কখনো হাকীকতের একটি فَرْদ-এর প্রতি মনে মনে নির্দিষ্ট করত ইঙ্গিত করা হয়। সেহেতু فرد টি হাকীকতেরই অংশ এবং হাকীকতের মোতাবেক, তাই حَقِيقَتٌ لَا مَাসْتِغْرَاقِيٍّ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এটা দ্বারা একটি বিশেষ فَرْদ তখনই উদ্দেশ্য করা হয়, যখন এর দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত উদ্দেশ্য করা যায় না। এটা كُلِّيٌّ طَبْعِيٍّ-এর মতো। যেমন—তুমি কাউকে নির্দিষ্ট কোনো বাজার উদ্দেশ্য না করে বললে أَدْخَلَ السُّوقَ (তুমি বাজারে প্রবেশ করো) কুরআনে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন—أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذَّنْبُ হাকীকতে লামের এ দ্বিতীয় প্রকারকে عَهْدٌ ذَهْنِيٍّ বলা হয়।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَ كَالْتَكْوِينِ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, মূল লেখক এটিকে অর্থগতভাবে অনির্দিষ্টের মতো বললেন; কিন্তু অনির্দিষ্ট বললেন না কেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, অনির্দিষ্ট এবং كَالْتَكْوِينِ দ্বারা যে বিশেষ্য গঠন হয়েছে তাদের মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে নাকিরাহ যে কোনো অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে বলা হয় এবং এ অনির্দিষ্টতার জন্যই এর সৃষ্টি। পক্ষান্তরে عَهْدٌ ذُنُفِي-এর লাম হাকীকতের জন্য সৃষ্ট এবং তা মনের মধ্যে বিদ্যমান ও জ্ঞাত আছে। তবে এর দ্বারা কোনো একটি অনির্দিষ্ট অংশ বুঝানোর বিষয়টি তো তখনই হয়ে

থাকে, যখন কোনো প্রমাণ থাকে। অর্থাৎ (প্রমাণ থাকা অবস্থায়) উভয়টি একই। কেননা, উভয়ে একটি অনির্দিষ্ট অর্থ বুঝিয়ে থাকে। তবে সত্তাগতভাবে উভয়ে এক নয়। কেননা, **عَهْدٌ ذِهْنِي**-এর লাম হলো হাকীকতের লাম এবং মনের মধ্যে অবগত। অথচ নাকিরার অর্থ যে কোনো অনির্দিষ্ট বিশেষ্য। মোটকথা, উভয়ের মাঝে সামান্য পার্থক্য থাকার কারণেই মুসান্নিফ (র.) একে **كَاتِبُكَ** বলেছেন, সরাসরি **نِكَرَةٌ** বলেননি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ প্রকার অর্থগতভাবে **نِكَرَةٌ** হওয়ার কারণে কখনো কখনো এর সাথে **نِكَرَةٌ**-এর মতো আচরণ করা হয়। যেমন এর সিফাত জুমলা দ্বারা আনা হয়, আর জুমলা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের হুকুমে। যেমন- নিম্নোক্ত কবিতার চরণে এর সিফাত জুমলা হয়েছে-
وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللَّيْنِمْ يَسْبُنِي

উক্ত কবিতার চরণে আলিফ-লামযুক্ত **عَهْدٌ ذِهْنِي** হচ্ছে **اللَّيْنِمْ** শব্দটি, যা তারকীবের মধ্যে মাওসুফ হয়েছে। এর সিফাত হয়েছে **يَسْبُنِي** যা (**فَاعِلٌ** ও **مَفْعُولٌ** মিলে) একটি জুমলা (বাক্য), এখানে জুমলা (যা অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের হুকুম রাখে) সিফাত হওয়াতে তার মাওসুফটিও অনির্দিষ্ট বলেই গণ্য হচ্ছে। অন্যথায় সিফাত এবং তার মাওসুফের মধ্যে 'তপা' হচ্ছে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, **اللَّيْنِمْ**-এর লামটি হাকীকত হয়নি। (বরং **عَهْدٌ ذِهْنِي** হয়েছে, এর দলিল হচ্ছে **أَمَرٌ** ফে'লটি)। আবার এটি **اسْتِغْرَافِي**ও হয়নি কারণ সব নিকৃষ্ট লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কবি যেহেতু তার মহত্ত্ব এবং ধৈর্যের বর্ণনা দিতে চান, তাই এটি **عَهْدٌ خَارِجِي**ও হবে না। অতএব যখন অন্য তিন প্রকারের লাম হওয়ার সম্ভাবনা রইল না, তাই এটি **عَهْدٌ ذِهْنِي**-ই হবে। পুরো পঙ্ক্তিটি এই-

وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللَّيْنِمْ يَسْبُنِي * فَمَضَّيْتُ نَمَّهُ قُلْتُ لَا يَغْنِينِي

কবিতার চরণটির অর্থ- আর যখন আমি এমন নিকৃষ্ট ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করি যে আমাকে গালি দেয়, আমি তখন তাকে পাশ কাটিয়ে যাই এবং বলি সে তো আমাকে বলেনি।

সার-সংক্ষেপ :

عَهْدٌ ذِهْنِي দ্বারা যে ইসম **مَعْرِفَةٌ** হয় তা অর্থগতভাবে **نِكَرَةٌ**-এর মতো, যদি শাব্দিকভাবে তাতে **مَعْرِفَةٌ**-এর বিধি-বিধান প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, এটি অর্থগতভাবে **نِكَرَةٌ**-এর মতো হলেও **نِكَرَةٌ**-এর সাথে তার পার্থক্য রয়েছে। **نِكَرَةٌ** হাকীকতের অধীন যে কোনো অনির্দিষ্ট **فَرْدٌ**-কে বুঝায়। আর **مَعْرِفٌ بِلَامٍ حَقِيقَتٌ** দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, তবে করীনার কারণে হাকীকতের কোনো একটি **فَرْদٌ**-এর সাহায্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, অর্থগতভাবে হওয়ার কারণে কখনো শব্দগতভাবে তার **نِكَرَةٌ**-এর আচরণ করা হয়। যেমন এর সিফাত **جُمْلَةٌ**-এর সাহায্যে আনা হয়। যেমন-
وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللَّيْنِمْ يَسْبُنِي

وَقَدْ يُفِيدُ الْمَعْرِفُ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا إِلَى الْحَقِيقَةِ الْإِسْتِغْرَاقَ نَحْوُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ أَشِيرَ بِاللَّامِ إِلَى الْحَقِيقَةِ لَكِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا الْمَاهِيَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَلاَ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهَا فِي ضَمْنِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ بَلْ فِي ضَمْنِ الْجَمِيعِ بِدَلِيلِ صَحَّةِ الْإِسْتِثْنَاءِ الَّذِي شَرْطُهُ دُخُولُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ فَاللَّامُ الَّتِي لَتَعْرِيفِ الْعَهْدِ الدَّهْنِي أَوْ الْإِسْتِغْرَاقِ هِيَ لَامُ الْحَقِيقَةِ حُمِلَتْ عَلَى مَا ذَكَّرْنَا بِحَسَبِ الْمَقَامِ وَالْقَرِينَةِ وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ يَأْتِي وَقَدْ يُفِيدُ عَائِدٌ إِلَى الْمَعْرِفِ بِاللَّامِ الْمُشَارِ بِهَا إِلَى الْحَقِيقَةِ وَلَا بُدَّ فِي لَامِ الْحَقِيقَةِ مِنْ أَنْ يُقْصَدْ بِهَا الْإِشَارَةُ إِلَى الْمَاهِيَةِ بِاعْتِبَارِ حُضُورِهَا فِي الدَّهْنِ لِيَتَمَيَّزَ عَنْ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ التَّكَرَّاتِ مِثْلُ الرَّجْعِيِّ وَرُجْعِي وَإِذَا أُعْتَبِرَ الْحُضُورُ فِي الدَّهْنِ فَوَجْهُ إِمْتِيَازِهِ عَنْ تَعْرِيفِ الْعَهْدِ أَنَّ لَامَ الْعَهْدِ إِشَارَةٌ إِلَى حِصَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ حَقِيقَةٍ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ جَمَاعَةً وَلَامُ الْحَقِيقَةِ إِشَارَةٌ إِلَى نَفْسِ الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْأَفْرَادِ فَلْيَتَأَمَّلْ -

অনুবাদ : আর কখনো হাকীকতের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য ইসতিগরাক (সামগ্রিকতা)-এর অর্থ প্রদান করে। যেমন- (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (এর-الْإِنْسَانَ) লাম দ্বারা হাকীকতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা তাত্ত্বিক হাকীকত উদ্দেশ্য করা হয়নি এবং হাকীকতের অস্তিত্ব কোনো একটি فرد-এর মাঝে রয়েছে এটিও ইচ্ছা করা হয়নি; বরং সব أفراد-এর মাধ্যমে এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর দলিল হচ্ছে ঐ ইসতেহনা (এ ক্ষেত্রে) বিশুদ্ধ হয় যাতে মুসতাছনাটা মুসতাছনা মিনহুর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত রয়েছে, যদি মুসতাছনা উল্লেখ না করা হয়। সুতরাং যে লামটি عَهْدُ ذَهْنِي এবং ইসতিগরাকের অর্থ দেয় সেটিই লামে হাকীকত। আমরা যা উল্লেখ করলাম তার অর্থে নেওয়া হয়েছে অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং করীনার ভিত্তিতে। এ কারণেই আমরা বলেছি قَدْ يَأْتِي এবং وَقَدْ يُفِيدُ-এর সর্বনাম এমন লামের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ফিরেছে যার মুশারফন ইলাইহ হচ্ছে হাকীকত। হাকীকতের লামের মধ্যে মাহিয়াতের প্রতি ইশারা করা জরুরি তা অন্তরে বিদ্যমান থাকার কারণে, যাতে তা أَجْنَاسُ تَكَرَّاتٍ থেকে পৃথক হয়ে যায়। যেমন- الرَّجْعِيُّ ও رُجْعِي। আর যখন এতে অন্তরে বিদ্যমান হওয়ার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা হলো এমতাবস্থায় এর সাথে عَهْدُ ذَهْنِي দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্যের পার্থক্য হচ্ছে এভাবে যে, عَهْدُ ذَهْنِي-এর লাম ইঙ্গিত করে হাকীকতের একটি নির্দিষ্ট অংশের প্রতি, চাই সেটি একবচন অথবা দ্বিবচন কিংবা বহুবচন (যাই হোক না কেন?) আর হাকীকতের লাম ইঙ্গিত করে তাত্ত্বিক হাকীকতের প্রতি, এতে أفراد-এর প্রতি দৃষ্টি থাকে না। অতএব, আপনি ভেবে দেখুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَدْ يُفِيدُ الْمَعْرِفُ الخ : মূল লেখক বলেন, হাকীকতের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য কখনো ইসতিগরাক তব্ সামগ্রিকতার অর্থ প্রদান করে।

মুখতাসারুল মা আনি - ৩৫

এখন মূল প্রশ্নটিতে আসা যাক, প্রশ্নটি হচ্ছে হাকীকতের লাম যা ইসমে জিনসের মধ্যে আসে এটা হয়তো তাত্ত্বিক হাকীকত এবং মাহিয়াত বুঝানো উদ্দেশ্য হবে, যাতে মনে কোনো কিছু বিদ্যমান হওয়া বা নিশ্চিত হওয়ার অর্থ থাকবে না। অথবা এমন মাহিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করবে, যা মনে বিদ্যমান এবং নির্দিষ্ট থাকবে।

প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন সৃষ্টি হবে যে, আলিফ-লামযুক্ত নির্দিষ্ট **إِسْمُ جِنْسٍ** যেমন— **الذَّكَرُ وَالرُّجْعَى** এবং আলিফ-লামযুক্ত অনির্দিষ্ট **جِنْسٍ**-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। কেননা, উভয়টাই এমন হাকীকতের অর্থ দেয় যা মনে বিদ্যমান ও নির্দিষ্ট থাকে না। আবার দু'টির মধ্যে পার্থক্য না থাকার কথাও অস্বীকার করা যায় না। কেননা, আলিফ-লামযুক্ত (নির্দিষ্ট) এবং আলিফ-লামযুক্ত (অনির্দিষ্ট) উভয়ের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে।

আর যদি বলেন, দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য, তাহলেও সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। কেননা, তখন হাকীকতের লাম এবং **عَهْدٌ** **جِنْسٍ**-এর লামের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। কেননা, উভয়ের মধ্যে অন্তরে উপস্থিতি থাকে এবং নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আমাদের মতে হাকীকতের লামের অর্থ দ্বিতীয়টি। অর্থাৎ হাকীকতের লাম যা **جِنْسٍ**-এর মধ্যে এসেছে তা দ্বারা অন্তরে বিদ্যমান আছে, এই ভিত্তিতে মাহিয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে হাকীকতের লাম এবং **عَهْدٌ خَارِجِي**-এর লামের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য না থাকাকে আমরা স্বীকার করি না। কেননা, **لَمْ يَحَقِيقَتْ حَاضِرَهُ مُعَيَّنَةٌ فِي الدِّهْنِ** টি **مُشَارٌ إِلَيْهِ**-এর **لَمْ يَحَقِيقَتْ** হয়ে থাকে। আর **عَهْدٌ خَارِجِي** **لَمْ يَحَقِيقَتْ** **عَهْدٌ خَارِجِي**-এর **لَمْ يَحَقِيقَتْ** হয়ে থাকে। আর **فَرَدٌ** হয়ে থাকে। আর **حَقِيقَتْ** **إِسْمُ جِنْسٍ** এবং **مُعَرَّفٌ يَلَامُ حَقِيقَتْ** হলে উদ্দেশ্য হল **حَقِيقَتْ** **إِسْمُ جِنْسٍ** এবং **مُعَرَّفٌ يَلَامُ حَقِيقَتْ**-এর মধ্যে লাম দ্বারা **مَاهِيَّت**-এর দিকে **حَاضِرٌ**-এর মাঝেও পার্থক্য হয়ে যাবে। তা এ ভাবে যে, **مُعَرَّفٌ يَلَامُ حَقِيقَتْ**-এর মধ্যে লাম দ্বারা **مَاهِيَّت**-এর দিকে **إِسْمُ جِنْسٍ** দ্বারা **مَاهِيَّت**-এর দিকে ইঙ্গিত হয় বটে, কিন্তু **حُضُورٌ فِي الدِّهْنِ** এবং **تَعَيَّنَ فِي الدِّهْنِ**-এর কোনো লক্ষ্য হয় না। এ জবাবটিকেই সুস্পষ্ট করার জন্য লাম দ্বারা বলেন যে, লামে হাকীকতের মধ্যে **حُضُورُ الْمَاهِيَّتِ فِي الدِّهْنِ** হিসেবে মাহিয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। যাতে করে এটা **إِسْمُ جِنْسٍ** থেকে পৃথক হয়ে যায়, যেমন **الرُّجْعَى** এবং **رَجْعَى** আর যখন **حُضُورٌ فِي الدِّهْنِ**-এর **إِعْتِبَارٌ** করা হবে তখন **عَهْدٌ** সংজ্ঞা থেকে এভাবে হবে যে, **عَهْدٌ** দ্বারা **حَقِيقَتْ**-এর নির্দিষ্ট অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হবে, চাই তা একদিন দু'দিন বা দুয়ের অধিক হোক না কেন। আর **حَقِيقَتْ** দ্বারা কোনো **أَفْرَادٌ**-এর কোনো সংখ্যা নির্বিশেষে **نَفْسُ الْحَقِيقَتْ**-এর দিকে ইঙ্গিত করা হবে। ব্যাপারটি বুঝে নেওয়া উচিত।

সার-সংক্ষেপ :

ক. **إِسْتِفْرَاقِي** কখনো **إِلَى لَمْ** হয়ে থাকে। ইসতিগরাকের অর্থ হচ্ছে আলিফ-লাম দ্বারা জিনসের অধীন সমস্ত **رَدٌ**-কে এক সাথে উদ্দেশ্য করা। যেমন— **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ** এ আয়াতের **الْإِنْسَانَ**-এর আলিফ-লাম দ্বারা মানুষের সব সদস্য উদ্দেশ্য। এর দলিল হলো, এরপর উল্লিখিত ইসতিহনা **(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا)**। এখানে যদি আলিফ-লাম ইসতিগরাকের জন্য না হয়, তাহলে আয়াতের ইসতিহনা শুদ্ধ হবে না।

খ. **إِسْمُ جِنْسٍ** এবং **لَمْ يَحَقِيقَتْ**-এর মাঝে পার্থক্য এই যে, **لَمْ يَحَقِيقَتْ**-এর মাঝে **مَاهِيَّت**-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়, কিন্তু **إِسْمُ جِنْسٍ**-এর মাঝে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে না।

গ. **لَمْ يَحَقِيقَتْ** এবং **عَهْدٌ خَارِجِي**-এর পার্থক্য হলো— **لَمْ يَحَقِيقَتْ**-এর মধ্যে ইঙ্গিত করা হয় হাকীকতের কোনো সুনির্দিষ্ট **فَرَدٌ**-এর দিকে, আর **عَهْدٌ خَارِجِي**-এর মাঝে ইঙ্গিত করা হয় হাকীকতের দিকে।

وَهُوَ أَيْ الْإِسْتِغْرَاقُ ضَرْبَانِ حَقِيقَتِي وَهُوَ أَنْ يُرَادَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ بِحَسَبِ اللَّغَةِ نَحْوُ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَيْ عَالِمِ كُلِّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ وَعَرَفْتِي وَهُوَ أَنْ يُرَادَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ بِحَسَبِ مُتَفَاهِمِ الْعَرَفِ نَحْوُ جَمْعِ الْأَمِيرِ الصَّاعَةِ أَيْ صَاعَةً بَلَدِهِ أَوْ أَطْرَافِ مَمْلَكَتِهِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ عُرْفًا لَصَاعَةِ الدُّنْيَا قِيلَ الْمِثَالُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِ الْمَازِنِيِّ وَالْأَوَّلُ فَالْأَمُّ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ عِنْدَ غَيْرِهِ مَوْصُولٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْخِلَافَ إِنَّمَا هُوَ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ بِمَعْنَى الْحُدُوثِ دُونَ غَيْرِهِ نَحْوُ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا هَذِهِ الصِّلَةُ فَعَلٌ فِي صُورَةِ الْإِسْمِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْحُدُوثِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْمُرَادُ تَقْسِيمُ مُطْلَقِ الْإِسْتِغْرَاقِ سِوَاءٍ كَانَ بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمَوْصُولُ أَيْضًا مِمَّا يَأْتِي لِلْإِسْتِغْرَاقِ نَحْوُ أَكْرَمَ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ إِلَّا زَيْدًا وَاضْرِبِ الْقَائِمِينَ إِلَّا عَمْرًا -

অনুবাদ : আর তা অর্থাৎ ইসতিগরাক দু' প্রকার হাকীকী, আর তা হচ্ছে শব্দ অভিধানগতভাবে যতগুলো **فَرْد** কে शामिल করে সবগুলোর ইচ্ছা করা, যেমন- তিনি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে জানেন এবং উরফী (বাস্তবতার নিরিখে) আর তা হচ্ছে সাধারণ লোকের জ্ঞানানুসারে শব্দগুলো যেসব **فَرْد**-কে शामिल করে তার ইচ্ছা করা। যেমন আমীর স্বর্ণকারদের একত্রিত করেছেন, অর্থাৎ তার শহরের অথবা রাজ্যের স্বর্ণকারদের। কেননা, এটাই সাধারণ লোকদের ধারণা ও বিশ্বাস, গোটা পৃথিবীর স্বর্ণকার নয়। কেউ কেউ বলেন, উদাহরণটি মাযানীর মাযহাবানুসারে সঠিক। অন্য মতে ইসমে ফায়েলের আলিফ লাম তো ইসমে মাওসূলের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ মতেও সমস্যা রয়েছে। কেননা, মতবিরোধ হলো ঐ ইসমে ফায়েলের ব্যাপারে, যা ক্ষণস্থায়ী অর্থ প্রদান করে, সব ইসমে ফায়েলের ব্যাপারে নয়। যেমন- বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, জ্ঞানী ও মূর্খ। কেননা, তারা বলে, এসব সিলাহ ইসমের আকৃতিতে ফে'ল, তাই এতে ক্ষণস্থায়ী অর্থ আবশ্যিক। যদি (উপরোক্ত মত) মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে উদ্দেশ্য হবে সাধারণ ইসতিগরাকের প্রকারভেদ, চাই সেটা নির্দিষ্টকরণের অক্ষর দ্বারা হোক অথবা অন্যভাবে। ইসমে মাওসূলও ইসতিগরাক-এর জন্য আসে, যেমন- যারা তোমার কাছে আগমন করে তাদের সবাইকে সম্মান করো যায়েদ ব্যতীত এবং আমরকে ছাড়া সব দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে প্রহার করো।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْإِسْتِغْرَاقُ : মূল লেখক বলেন, ইসতিগরাক (ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতা) সাধারণভাবে দু' প্রকার। এক. **إِسْتِغْرَاقٌ حَقِيقِيٌّ** (প্রকৃত) **عَرَفِيٌّ** (প্রচলন ও প্রসিদ্ধির নিরিখে)। বলা হয় শব্দের দ্বারা এমন সব **أَفْرَادٌ** (সদস্যদের) ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য করা, যাদেরকে শব্দ আভিধানিকভাবে এবং মূল ব্যবহার অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বলা হচ্ছে- তিনি **عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ** তিনি সব অদৃশ্য এবং দৃশ্যজগৎ সম্পর্কে জানেন। এখানে **الْغَيْبِ** এবং **الشَّهَادَةِ**-এর মধ্যে প্রকৃত সামগ্রিকতাকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যত অদৃশ্য এবং দৃশ্য বস্তু রয়েছে, তিনি সবই জানেন, শব্দ তার আভিধানিক অর্থে যতটুকুকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এখানে এর সবটুকুই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। **إِسْتِغْرَاقٌ عَرَفِيٌّ** বলা হয় শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ যে অর্থ বুঝে তাই উদ্দেশ্য করা। আভিধানিকভাবে শব্দ যত অর্থ ও বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে তা উদ্দেশ্য না করা। যেমন কেউ বলল, **جَمَعَ الْأَمِيرُ الصَّاعَةَ** অর্থাৎ শাসনকর্তা সব স্বর্ণকারদের একত্রিত করেছেন, এখানে **الصَّاعَةَ** (স্বর্ণকার) দ্বারা পৃথিবীর তামাম স্বর্ণকার উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ মানুষ এ অর্থ বুঝেও না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরের সব স্বর্ণকারকে অথবা শাসনকর্তা দেশের অভ্যন্তরে যত স্বর্ণকার আছে সবাইকে একত্রিত করেছেন। যদিও **الصَّاعَةَ** শব্দটি আভিধানিকভাবে পৃথিবীর সকল স্বর্ণকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কেউ কেউ বলেন, ইমাম মাযানীর মাযহাবানুসারে **الصَّاعَةَ** ইসতিগরাক-এর উদাহরণ হবে। অন্য সব নাহবিদদের মতানুসারে এটি ইসতিগরাকের উদাহরণ হতে পারে না। কেননা, ইমাম মাযানী মনে করেন, ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের উপর যত লাম আসে তা নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক লাম। অন্য দিকে সকলের মতে ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের উপর যে লাম আসে তা ইসমে মাওসূলের লাম। **الصَّاعَةَ** বহুবচন, এর একবচন হলো **صَانِعٌ** (إِسْمٌ فَاعِلٌ) জমহুরের মতে যেহেতু এটি ইসমে মাওসূল-এর লাম তাই এটি **إِسْتِغْرَاقٌ**-এর অর্থ দেবে না। আর ইমাম মাযানীর মতানুসারে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম হওয়াতে **إِسْتِغْرَاقٌ**-এর অর্থ দেবে। অতএব, এটি **إِسْتِغْرَاقٌ**-এর উদাহরণও হবে।

قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْخِلَافَ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) কতিপয় লোকের উক্ত ব্যাখ্যার উপর আপত্তি তোলেন, তিনি বলেন, মাযানী এবং জমহুরের মাঝে মতবিরোধ সবক্ষেত্রে নয়; বরং বিশেষ ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল যখন **حُدُوثٌ** (ক্ষণস্থায়ী)-এর ধারণা করে এমতাবস্থায় যদি উক্ত ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের উপর আলিফ-লাম আসে তখন ইমাম মাযানীর মতে উক্ত আলিফ-লাম নির্দিষ্টজ্ঞাপক। আর জমহুরের মতে তা ইসমে মাওসূল। পক্ষান্তরে ইসমে ফায়েল ও মাফউলের অর্থ যদি স্থায়ী ও দৃঢ়তাজ্ঞাপক হয়, যেমন- **مُؤْمِنٌ** (বিশ্বাসী), **كَافِرٌ** (অবিশ্বাসী), **عَالِمٌ** (জ্ঞানী) ও **جَاهِلٌ** (মূর্খ) ইত্যাদি। এমতাবস্থায় উভয় মাযহাব মতে তা নির্দিষ্টজ্ঞাপক লাম হবে। **الصَّاعَةَ** যেহেতু দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাই এর নির্দিষ্টজ্ঞাপক লাম হওয়াতে কোনো মতবিরোধ রইল না। অতএব, উভয় মতেই তা **إِسْتِغْرَاقٌ**-এর লাম হতে পারে।

قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ قَالُوا هَذِهِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ জমহুরের পক্ষে দলিল বর্ণনা করেছেন, জমহুর বলেন ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউল যদি **حُدُوثٌ** (কাল নির্ভর ক্রিয়ার) অর্থ প্রদান করে তাহলে লাম ইসমে মাওসূলের অর্থে হবে। নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক হবে না। কেননা, উক্ত ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউল যা লামের তথা ইসমে মাওসূলের সিলাহ হচ্ছে, বাহ্যিকভাবে বিশেষ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি ফে'লের অর্থে হয়েছে। ইসমে ফায়েল এ ক্ষেত্রে **فِعْلٌ مَعْرُوفٌ**-এর এবং ইসমে মাফউল **فِعْلٌ مَجْهُولٌ**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এটা সকলেরই জানা আছে যে, নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক লাম ফে'লের উপর আসে না। তা শুধুমাত্র ইসমের সাথে খাস। অতএব, এ জাতীয় ইসমে ফায়েল এবং মাফউলের লাম ইসমে মাওসূলের জন্যই হবে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম হবে না। আমাদের আলোচ্য শব্দ **الصَّاعَةَ** যেহেতু স্থায়িত্বের অর্থ প্রদান করে তাই এটি নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম এবং এখানে **إِسْتِغْرَاقٌ**-এর অর্থ প্রদান করে। অতএব, **الصَّاعَةَ** যেভাবে ইমাম মাযানীর মতে ইসতিগরাকের অর্থ প্রদান করেছে, তেমনি জমহুরের মতেও তা ইসতিগরাকেরই উদাহরণ। তাই কতিপয় লোকের দাবি যে, তা কেবল মাযানীর মতে ইসতিগরাকের লাম, এ কথা প্রমাণিত হলো না।

قَوْلُهُ وَلَوْ سَلِمَ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ কতিপয় লোকের আপত্তির জবাব প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, ইমাম মাযানী এবং জমহুরের মাঝে সাধারণ ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউলের মাঝেই মতবিরোধ অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে এ মতবিরোধ রয়েছে। মাযানীর মতে, ইসমে ফায়েলের এবং মাফউলের শুরুতে আসা লাম হলো নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনের জন্য। আর জমহুরের মতে, তা ইসমে মাওসূলের লাম, তবু এতে ইসতিগরাক-এর অর্থ পাওয়া সম্ভব। আর এটা এভাবে যে, তখন আমাদের ইসতিগরাকের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সাধারণ ইসতিরাকের প্রকার, সেটা লাম দ্বারা যেমন হতে পারে, অন্যভাবেও হতে পারে, তেমনি এটা ইসমে মাওসূলও হতে পারে, যেমন- أَكْرَمَ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ إِلَّا-এর-إِذَا-এটি প্রকৃত ইসতিগরাকের উদাহরণ-إِلَّا-এর-إِسْتِغْنَاءُ দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তির কাছে যত লোক আসবে যায়েদকে ছাড়া সবাইকে সম্মান করবে। এখানে-الَّذِينَ দ্বারা সবাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ-إِسْتِغْفَارُ حَقِيقَتِي-ই উদ্দেশ্য। ইসমে মাওসূলের মাঝে-إِسْتِغْفَارُ عُرْفِي-এর উদাহরণ হচ্ছে-إِلَّا عَمَرًا-এটা-إِسْتِغْفَارُ-এর উদাহরণ, এর প্রমাণ হচ্ছে এখানে-إِسْتِغْنَاءُ হয়েছে। ইসতিহানা প্রমাণ করে যে, তার-مُسْتَتْنَى مِنْهُ ব্যাপক এবং তাতে ইসতিগরাকের অর্থ বিদ্যমান। তবে-حَقِيقَتِي-এর উদাহরণ নয়; বরং-عُرْفِي-এর উদাহরণ। কেননা, সারা পৃথিবীর সব মানুষকে প্রহার করা সম্ভব নয়, তার আদেশও কেউ দেবে না। অতএব, বুঝা গেল বিশেষ স্থানের কিছু দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে প্রহার করার নির্দেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর সবাইকে নয়। আর এটাই হচ্ছে-إِسْتِغْفَارُ عُرْفِي।

সার-সংক্ষেপ :

ইসতিগরাক দু' প্রকার। ক. إِسْتِغْفَارُ عُرْفِي। খ. إِسْتِغْفَارُ حَقِيقَتِي।

إِسْتِغْفَارُ عُرْفِي বলা হয় এমন ইসতিগরাককে যার শব্দের চাহিদানুপাতে সমস্ত فَرْد শামিল হয়। যেমন-عَالِمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থ- সব দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

إِسْتِغْفَارُ حَقِيقَتِي : বলা হয় এমন ইসতিগরাককে, যার মধ্যে প্রচলিত ধারণানুযায়ী শব্দ দ্বারা أَفْرَادٌ উদ্দেশ্য অর্থাৎ শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ যেকোন অর্থ বুঝে থাকে ততটুকু উদ্দেশ্য করা। যেমন-جَمَعَ الْأَمِيرُ الصَّاعَةَ শাসনকর্তা শহরের বা দেশের সব স্বর্ণকারদের একত্রিত করেছেন। শব্দের চাহিদানুযায়ী পৃথিবীর সব স্বর্ণকার এখানে উদ্দেশ্য নয়। জমহুরের মতে স্থায়িত্বের অর্থ প্রদানকারী ইসমে ফায়েলের প্রথমে যে لَامٌ আসে তা ইসমে মাওসূলের لَامٌ নয়। ইমাম মাযানীর মতানুযায়ী যে কোনো ইসমে ফায়েলের لَامٌ নির্দিষ্টজ্ঞাপক। অতএব, সবার মতে لَامٌ الصَّاعَةِ-এর لَامٌ হচ্ছে নির্দিষ্টবাচক তথা ইসতিগরাকের لَامٌ।

وَاسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ سَوَاءٌ كَانَ بِحَرْفِ التَّعْرِيفِ أَوْ غَيْرِهِ أَشْمَلٌ مِنْ إِسْتِغْرَاقِ الْمُثْنَى
وَالْمَجْمُوعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ وَالْمُثْنَى يَتَنَاوَلُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَالْجَمْعُ
يَتَنَاوَلُ كُلَّ جَمَاعَةٍ بِدَلِيلِ صَحَّةٍ لَا رِجَالَ فِي الدَّارِ إِذَا كَانَ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ دُونَ
لَا رَجُلَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِذَا كَانَ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ وَهَذَا فِي التَّكْرَةِ الْمَنْفِيَةِ مُسَلَّمٌ وَأَمَّا
فِي الْمَعْرِفِ بِاللَّامِ فَلَا بَلَّ الْجَمْعُ الْمَعْرَفُ بِاللَّامِ الْإِسْتِغْرَاقُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ
عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْأَصُولِ وَالتَّحْوِيلِ عَلَيْهِ الْإِسْتِقْرَاءُ وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيْمَةُ التَّفْسِيرِ
وَقَدْ أَشْبَعَنَا الْكَلَامُ فِي هَذَا الْمَقَامِ فِي الشَّرْحِ فَلْيُطَالِعْ ثَمَّ -

অনুবাদ : আর একবচনের ইসতিগরাক, চাই তা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক হরফের মাধ্যমে হোক বা অন্যভাবে, আধিক্যজ্ঞাপক দ্বিবচন এবং বহুবচনের ইসতিগরাক থেকে। কেননা, এটি (একবচনের ইসতিগরাক) প্রত্যেকটি ফُرْد-কে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিবচন প্রত্যেক দ্বিবচনকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং বহুবচন প্রত্যেক দল এবং বহুজনকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর দলিল الدَّارِ فِي الرِّجَالِ বলাটা শুদ্ধ, যখন ঘরে একজন অথবা দু'জন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে لَا رَجُلَ বলা যাবে না। কেননা, যখন ঘরে একজন অথবা দু'জন থাকবে তখন الدَّارِ فِي الرِّجَالِ বাক্যটি বলা শুদ্ধ হবে না। এ নিয়ম অনির্দিষ্ট না-বাচক বাক্যের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য, তবে লাম দ্বারা নির্দিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রে এ বিধান নয়; বরং ইসতিগরাকের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বহুবচনও প্রত্যেকটি ফُرْد-কে সামিল করে। এটি অধিকাংশ মূলনীতিশাস্ত্রবিদ এবং নাহবিদগণের মতানুসারে। সাধারণ ব্যবহারও বিষয়টিকে সমর্থন করে। এর প্রতিই ইস্তিত করেছেন তাফসীর বিশারদগণ। এ প্রসঙ্গে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি ব্যাখ্যাগ্রন্থে (মুতাওয়ালা) সুতরাং বিষয়টি সেখানে দেখে নেওয়া উচিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَاسْتِغْرَاقُ الْمُفْرَدِ الخ : ইসমে জিনস একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন তিনভাবেই ব্যবহার হতে পারে। এ তিন প্রকারের মধ্যে যদি ইসতিগরাকের অর্থ প্রদানকারী কোনো অক্ষর আসে (যথা- تَكْرَةً-এর উপর إِسْتِغْرَاقُ বা لَا مِثْلَ نَفْيِ বা لَا مِثْلَ إِسْتِغْرَاقِ) তাহলে উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে মূল লেখকের দাবি মতে একবচন সবচেয়ে বেশি ব্যাপক হবে এবং সবচেয়ে বেশি ফُرْد-কে অন্তর্ভুক্ত করবে। তুলনামূলকভাবে দ্বিবচন এবং বহুবচনের মধ্যে এই ব্যাপকতা কম হবে। কেননা, একবচনের ইসতিগরাক হলে সব সদস্য বহুবচন, দ্বিবচন এবং একবচন সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোনো সদস্য তার থেকে বাদ পড়বে না। পক্ষান্তরে দ্বিবচনের ইসতিগরাকে একবচন বাদ পড়বে, বহুবচনের ইসতিগরাকে এক এবং দ্বিবচন বের হয়ে যাবে অর্থাৎ দ্বিবচন দুই থেকে শুরু করে উপরের সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বহুবচন তিন থেকে শুরু করে তার চেয়ে বেশি সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন- الدَّارِ فِي الرِّجَالِ (ঘরে অনেক পুরুষ নেই) যখন ঘরে একজন অথবা দু'জন পুরুষ থাকবে তখনও বাক্যটির অর্থ ঠিকই থাকবে। কারণ, বাক্যটিতে দুয়ের অধিক লোক নেই এ কথা বলা হয়েছে। দু' বা দুয়ের কম লোক থাকার কথা বা না থাকার কথা কিছুই বলা হয়নি। এমনিভাবে الدَّارِ فِي الرِّجَالِ (ঘরে দু'জন পুরুষ নেই) ঘরে একজন পুরুষ থাকলেও বাক্যটি সঠিক হবে। পক্ষান্তরে ঘরে একজন অথবা দু'জন থাকা অবস্থায় لَا رَجُلَ বলা সঠিক হবে না; বরং বাক্যটি তখনই বলা সঠিক হবে, যখন ঘরে একজনও না থাকে।

قَوْلُهُ وَهَذَا فِي التَّكْرِةِ الْمُنْفِيَةِ الْح: এ বাক্যটি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হলো, একবচনের ইসতিগরাক দ্বিবাচন-বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে বেশি ব্যাপক এবং কার্যকর হওয়া এ কথা তো تَكْرِةٌ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য)-এর উপর না-বাচক অক্ষর আসলে যথার্থ হয়। অর্থাৎ এমতাবস্থায় যে ইসতিগরাক হয় তা দ্বিবাচন এবং বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে বেশি ব্যাপক; কিন্তু যদি নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লামের দ্বারা ইসতিগরাক করা হয় তখন এ অর্থ পাওয়া যায় না, এ কথা আমরা সমর্থন করি না। আমরা দেখতে পাই বহুবচনের উপর যখন ইসতিগরাকের লাম আসে, যেমন- اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ইত্যাদির মধ্যে প্রত্যেকটি فَرَدٌ (সদস্য)-ই অন্তর্ভুক্ত। উসূলশাস্ত্রবিদ এবং নাহবিদগণের মতামত এরূপই। তা ছাড়া প্রচলিত ব্যবহারও উক্ত বিষয়কে সমর্থন করে, কুরআনের আয়াত اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, এর দ্বারা মুসলমানগণের সব সদস্যই উদ্দেশ্য। এমনিভাবে وَاللّٰهُ يَعْزِبُ الْمُعَسِّنِينَ-এর সব মুহসিন এবং وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ দ্বারাও সমস্ত কিছুই নামই উদ্দেশ্য। অতএব, ইসতিগরাকের ব্যাপকতার ক্ষেত্রে একবচন এবং বহুবচন সমানই হয়ে গেল। তাই মূল লেখকের দাবি একবচনের ইসতিগরাক বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে ব্যাপক সঠিক রইল কোথায়?

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, বহুবচনের উপর নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক লাম আসলে তার বহুবচন বাতিল হয়ে যায়। তখন তা শাব্দিকভাবে বহুবচন থাকলেও অর্থগতভাবে একবচন হয়ে যায়। মূল লেখক একবচন দ্বারা অর্থগত একবচনই বুঝিয়েছেন, সেটা শাব্দিকভাবে যেরূপই হোক না কেন, সুতরাং লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বহুবচন যেহেতু অর্থগতভাবে একবচন হয়ে যায় তাই এটিকে নিয়ে আপত্তি তোলা যথার্থ হবে না। মুসান্নিফ (র.) সে বহুবচনের তুলনায় একবচনের ইসতিগরাককে ব্যাপক বলেছেন, যে বহুবচনের অর্থে কোনো পরিবর্তন হয়নি; বরং বহুবচন রূপে বহাল রয়েছে।

এর আরেকটি উত্তর হচ্ছে, মূল লেখকের বক্তব্য অনির্দিষ্ট না-বাচক বাক্যের সাথে খাস, তাইতো তিনি অনির্দিষ্ট বাক্যের দ্বারাই এর উদাহরণ দিয়েছেন। তার উপরে যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক ইসতিগরাকের লামের দ্বারা, তাই এতে তার বক্তব্যের খণ্ডন হচ্ছে না।

সার-সংক্ষেপ :

اِسْتِغْرَاقُ جَمْعٍ ۱. اِسْتِغْرَاقُ ثَنِيَّةٍ ۲. اِسْتِغْرَاقُ مُفْرَدٍ ۳. তিন প্রকার : লেখক বলেন, মুফরাদদের ইসতিগরাক দ্বিবাচন ও বহুবচনের ইসতিগরাকের চেয়ে ব্যাপকতর। এ জন্য যদি কারো ঘরে একজন বা দু'জন লোক থাকে, তারপর সে لَارْجُلٍ فِي بَيْتِي বলে তাহলে তার এ বাক্য শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে; কিন্তু এ অবস্থায় তার لَارْجُلٍ فِي بَيْتِي বলা শুদ্ধ হবে না। উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.)-এর বক্তব্য اَلَيْفَ لَا يُجُزُّ বহুবচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, বহুবচনের সাথে اَلَيْفَ لَا يُجُزُّ হলে তা বিধানগতভাবে একবচনে পরিণত হয়ে যায়। অথবা, লেখকের বক্তব্য تَكْرِةٌ-এর সাথে খাস।

وَلَمَّا كَانَ هُنَا مَظْنَةً إغْتِرَاضٍ وَهُوَ أَنَّ إِفْرَادَ الْإِسْمِ يَدُلُّ عَلَى وَحْدَةٍ مَعْنَاهُ
وَالْإِسْتِغْرَاقُ يَدُلُّ عَلَى تَعَدُّدِهِ وَهُمَا مُتَنَافِيَانِ أَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنَافَى بَيْنَ
الْإِسْتِغْرَاقِ وَإِفْرَادِ الْإِسْمِ لِأَنَّ الْحَرْفَ الدَّالَّ عَلَى الْإِسْتِغْرَاقِ كَحَرْفِ النَّفْيِ وَالتَّعْرِيفِ إِنَّمَا
يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَى عَلَى الْإِسْمِ الْمُنْفَرِدِ حَالٌ كَوْنِهِ مُجَرَّدًا عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى الْوَحْدَةِ
كَمَا أَنَّهُ مُجَرَّدٌ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلَى التَّعَدُّدِ وَإِمْتِنَاعُ وَصْفِهِ بِنَعْتِ الْجَمْعِ لِلْمُعَافَاةِ عَلَى
التَّشَاكُلِ اللَّفْظِيِّ وَلِأَنَّهُ أَى الْمُنْفَرِدُ الدَّاخِلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الْإِسْتِغْرَاقِ بِمَعْنَى كُلِّ فَرْدٍ
لَا مَجْمُوعَ الْإِفْرَادِ وَلِهَذَا إِمْتِنَاعُ وَصْفِهِ بِنَعْتِ الْجَمْعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَإِنْ حَكَاهُ الْأَخْفَشُ
فِي نَحْوِ الدِّينَارِ الصُّفْرِ وَالْدِّرْهِمِ الْبَيْضِ -

অনুবাদ : যখন এখানে একটি আপত্তি রয়েছে, (আপত্তিটি হচ্ছে) বিশেষ্যের একবচন একক অর্থ প্রদান করে। আর ইসতিগরাক বহুত্বের অর্থ প্রদান করে। আর এ বিষয়টি পরস্পর বিরোধী, তাই লেখক এ উক্তি দ্বারা তার উত্তর দেন। তিনি বলেন, ইসতিগরাক এবং বিশেষ্যের একবচন ব্যবহার হওয়ার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, ইসতিগরাকের অর্থ প্রদানকারী অক্ষর তো না-বাচক এবং নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক অক্ষরের মতো, (এগুলো) একবচন বিশেষ্যের উপর তখনই আসে যখন একে একক অর্থ প্রদানের থেকে বিরত রাখা হয়। যেমন- তা একাধিক অর্থ প্রদান থেকে বিরত থাকে। এর বহুবচন সিফাত হয় না, তার শাব্দিক কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য।

তা ছাড়া এটি অর্থাৎ যে একবচনের উপর ইসতিগরাকের অক্ষর আসলে তাতে প্রত্যেকটি فرد-এর অর্থ প্রদান করে সব فرد-এর অর্থ দেয় না। আর এ কারণেই জমহরের মতে বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা যায় না। নাহবিদ আখফাস الصُّفْرُ الدِّينَارُ এবং الدِّرْهُمُ الْبَيْضُ (জাতীয় উদাহরণে বহুবচন সিফাতসহ) বর্ণনা করেছেন (আরবের ব্যবহার থেকে)।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ هُنَا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ স্থানে একটি আপত্তি হতে পারে। আপত্তিটি হলো ইসমে জিন্স একবচনের উপর ইসতিগরাকের লাম সংযুক্ত করা অনুচিত। কারণ, এতে একই শব্দের মধ্যে একক এবং বহু এ দু' বিপরীত অর্থ একত্রিত হয়ে যায়। আর এটা এভাবে হয় যে, ইসমে জিন্স একবচন, একবচন হওয়ার কারণে একক অর্থ প্রদান করে, আবার ইসতিগরাকের অক্ষর এর উপর আসার কারণে তা বহুত্বের অর্থ প্রদান করে। এক এবং বহু এ দু'য়ের মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে, তাই ইসতিগরাকের অক্ষর না আসা বাঞ্ছনীয়।

মূল লেখক এ আপত্তিটির দু'টি জবাব দিয়েছেন, প্রথমটি جَوَابُ إِنكَارٍ অর্থাৎ আমরা এখানে এক এবং বহু এ দু'য়ের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় তা মানতে রাজি নই। কেননা, একবচনের মধ্যে এককের অর্থ দূর করার পর ইসতিগরাকের হরফ যুক্ত করা হয়, অর্থাৎ اِسْمٌ جُنْسٌ একবচনকে প্রথমে এককের অর্থ থেকে খালি করা হয় তারপর ইসতিগরাকের লাম তব সাথে যুক্ত হয়। যেমন আমরা দ্বিবচনের এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রথমে একবচনের একক অর্থ দূর করি, তারপর তাতে দ্বিবচন এবং বহুবচনের চিহ্ন যোগ করি। যেহেতু প্রথমে একবচনের একক অর্থ থেকে একবচনকে খালি করা হয়, এরপর তার মধ্যে ইসতিগরাকের লাম আসে; তাই এতে একক অর্থ এবং ব্যাপকতা একত্রিত হয় না। আর এটি একত্রিত না হলে পরস্পর বিরোধী দু'টি বিষয় একত্রিত হলো না। অতএব, ইসমে জিন্স একবচনের উপর ইসতিগরাকের লাম যুক্ত হওয়া আর কোনো বাধা রইল না।

قَوْلُهُ اِمْتِنَاعٌ وَضْفِهِ بِتَعْتِ الْجَنَعِ এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো, একবচনের উপর ইসতিগরাকের অক্ষর যুক্ত হলে একক অর্থ আর থাকে না, তখন এটি একাধিক অর্থের প্রতি দালালত করে। এমতাবস্থায় তার সিফাত যদি আনা হয় তাহলে সে সিফাতটিও বহুবচন হওয়া জরুরি। কেননা, মাওসূফ এবং তার সিফাতের মধ্যে সমাজস্য জরুরি। সে মতে উদাহরণ এরূপ হওয়া দরকার ছিল الرَّجُلُ الْعَالِمُونَ কিন্তু নাহবিদগণ এ ধরনের ব্যবহারকে অবৈধ বলেছেন।

এর উত্তর হলো : নাহবিদগণ এ ধরনের তারকীবকে অনুমোদন করেননি। তারা বলেন, এতে শব্দের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়, শব্দের কাঠামো ও আকৃতি রক্ষা করার জন্য বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা হয় না। এর ব্যতী হাচ্ছে এই যে, ইসমে জিনস মুফরাদ বা একবচনের উপর ইসতিগরাকের হরফ আসার পরও তার মুফরাদের আকৃতি অপরিবর্তিতই থেকে যায়, তাই যদি এর সিফাত বহুবচন আনা হয়, তাহলে মাওসূফ এবং সিফাতের আকৃতি দু' রকম হয়ে যায়।

অতএব, মাউসূফ এবং সিফাতের আকৃতি একইরূপ রাখার জন্য বহুবচন দ্বারা এর সিফাত আনা হবে না।

এর দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, যে মুফরাদের উপর ইসতিগরাকের লাম এসেছে তা كُلُّ فَرْدٍ-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ তা আলাদাভাবে প্রত্যেক فرد-এর উপর দালালত করবে, একসাথে সকল فرد-কে বুঝাবে না। যখন তা একটি فرد-এর উপর দালালত করবে, তখন অন্য فرد বুঝাবে না। এভাবে সমস্ত فرد-কে বুঝাবে; কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে আর আমরা জানি كُلُّ فَرْدٍ এবং একবচনের দু'টো একই; বরং একবচনের বিপরীত হলো جَمِيعُ فَرْدٍ বা সকল ফরদ। অতএব, একবচন ও এক অর্থ হওয়ার সাথে সাথে ইসতিগরাকের লাম একত্রিত হতে পারে, এতে কোনো বিরোধ নেই। যখন এ কথা প্রমাণিত হলো যে, দু'য়ের মাঝে কোনো বিরোধ নেই, তাই اِجْتِمَاعُ مُتَنَافِئِينَ-এর আপত্তি এর উপর আরোপিত হবে না।

مُسَانِنِيف (র.) বলেন, নাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসতিগরাকের লাম দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য যদিও সব فرد-এর দিক নির্দেশ করে তবু এর সিফাত বহুবচন ব্যবহার হবে না, তবে বিখ্যাত নাহবিদ আখফাশ এমন কিছু আরবি সাহিত্যের উদাহরণ বর্ণনা করেন যাতে দেখা যায়, বহুবচন উক্ত লাম বিশিষ্ট বিশেষ্যের সিফাত হয়েছে। এর জবাব হচ্ছে, এ ব্যবহার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে তা দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যাবে না। এসব উদাহরণ شَاذ-এর অন্তর্ভুক্ত।

সার-সংক্ষেপ :

যখন لام الف দ্বারা استغراق উদ্দেশ্য করা হয় তখন একটি আপত্তি উঠে যে, ইসমের একবচন একক অর্থ প্রদান করে, আবার استغراق বহুত্বের বা বহুজনের অর্থ দেয়। এ দু'টি বিপরীতধর্মী বিষয় একত্রিত হবে কিভাবে? মূল লেখক এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন।

১. ইসতিগরাকের لام الف মুফরাদ ইসমের উপর এমতাবস্থায় যুক্ত হয় যখন সে ইসমকে একক অর্থ প্রদান করার যোগ্যতা থেকে বিমুক্ত করা হয়। অর্থাৎ একই সময়ে একই সাথে কোনো ইসম একক ও ইসতিগরাকের অর্থ প্রদান করে না।

২. যে ইসমের সাথে ইসতিগরাকের আলিফ-লাম যুক্ত হয় সে ইসম একসাথে বহুত্বের অর্থ প্রদান করে না; বরং যে ইসম এক এক করে বহুত্বের বা বহুজনের অর্থ দেয়। এ জন্যই সে সিফাত বহুবচনের সিফাতের মতো হয় না; বরং একবচনের সিফাতের মতো হয়।

وَبِالإِضَافَةِ أَيْ تَعْرِيفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِإِضَافَتِهِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَعَارِفِ لِأَنَّهَا أَيْ
الإِضَافَةُ أَخْصَرُ طَرِيقٍ إِلَى إِحْضَارِهِ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ نَحْوُ هَوَاىَ أَيْ مَهْوَى وَهَذَا أَخْصَرُ
مِنَ الَّذِى أَهْوَاهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالِإِخْتِصَارُ مَطْلُوبٌ لِضَيْقِ الْمَقَامِ وَقُرِطِ السَّامَةِ لِكُونِهِ فِي
السَّجْنِ وَالْحَبِيبُ عَلَى الرَّجِيلِ مَعَ الرُّكْبِ الْيَمَانَيْنِ مُضْعِدٌ أَيْ مُبْعِدٌ ذَاهِبٌ فِي الْأَرْضِ
وَتَمَامُهُ عَ جَنِيبٌ وَجُثْمَانِي بِمَكَّةَ مُوْتَقٌ * الْجَنِيبُ الْمَجْنُوبُ الْمُسْتَتَبِعُ وَالْجُثْمَانُ
الشَّخْصُ وَالْمُوْتَقُ الْمُقَيَّدُ وَلَفْظُ الْبَيْتِ خَبَرٌ وَمَعْنَاهُ تَأْسُفٌ وَتَحَسُّرٌ۔

অনুবাদ : এবং ইয়াফত দ্বারা অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহের প্রতি ইয়াফত করার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। কেননা, (এ ক্ষেত্রে) ইয়াফত মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার মনে পৌঁছে দেওয়ার সংক্ষিপ্ততম পন্থা। যেমন- কবিতার চরণ : (অর্থ) আমার প্রিয়জন (হোয়া) হচ্ছে অহোয়া ইত্যাদির চেয়ে সংক্ষিপ্ততম। আর সংক্ষিপ্তকরণই উদ্দেশ্য স্থানের সীমাবদ্ধতা এবং তীব্র ব্যাকুলতার কারণে, কেননা, সে ছিল কারাগারে আর তার প্রিয়তমা স্ত্রী ইয়ামেনী কাফেলার সাথে দূর দূরান্তের পথে যাত্রার অপেক্ষায়। কবিতার অবশিষ্টাংশ এরূপ- আমার শরীর মক্কায় বন্দী। জনিব শব্দের অর্থ- অনুসারী এবং পিছু নেওয়া ব্যক্তি। জুমান অর্থ- ব্যক্তি। মুত্তক অর্থ- বন্দী, কবিতা শাস্তিকভাবে বর্ণনামূলক বাক্য, তার অর্থ হতাশা এবং বিষাদ (প্রকাশ করা)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَبِالإِضَافَةِ أَيْ تَعْرِيفُ الْخ : এখান থেকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যের সপ্তম এবং সর্বশেষ প্রকারের আলোচনা শুরু হয়েছে। মূল লেখক বলেন, অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট বিশেষ্যের প্রতি ইয়াফত করে নির্দিষ্ট করা হয়। আর এভাবে ইয়াফত তখনই করা হয় যখন মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্ত উপায়ে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয়। কেননা, ইয়াফত (সম্বন্ধ)-এর মাধ্যমে পুরো বাক্যকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।

সামনের কবিতায় ইয়াফতের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে-

هَوَاىَ مَعَ الرُّكْبِ الْيَمَانَيْنِ مُضْعِدٌ * جَنِيبٌ وَجُثْمَانِي بِمَكَّةَ مُوْتَقٌ

কবিতার চরণটির অর্থ : আমার প্রিয়জন ইয়ামেনী কাফেলার সাথে সুদূর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য যাচ্ছে। আর আমি মক্কায় বন্দিত্ব বরণ করছি। উক্ত কবিতায় হোয়া মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ইয়াফত (সম্বন্ধ) করার মাধ্যমে, যদি এখানে ইয়াফত ব্যবহার না করে ইসমে মাওসুল ব্যবহার করা হতো তাহলে বাক্যটি বড় হয়ে যেত। যেমন- **الَّذِى أَهْوَاهُ** অথবা **مِنْ أَهْوَاهُ** অথবা **هَوَاىَ الَّذِى يَمِيلُ إِلَيْهِ قَلْبِي** এ তিনটি ব্যবহারের তুলনায় ইয়াফত সংক্ষিপ্তরূপ। আর সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যেই তাকে ইয়াফতের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া কবিতার ক্ষেত্রটি সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপের জন্য সমীচীন। কেননা, এখানে প্রেমিক কারাগারে অবস্থান করছে, আর তার প্রেমাস্পদ দীর্ঘ সফরে যাত্রা করেছে। এমতাবস্থায় প্রেমিক দুঃখ-ভারাক্রান্ত। অতএব, তার দীর্ঘ বাক্যালাপ করার মতো পরিস্থিতি নেই; বরং সংক্ষিপ্তভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক।

এ স্থানে মূল লেখকের দাবি ইয়াফত হলো **أَخْصَرُ طَرِيقٍ** (সবচেয়ে সংক্ষিপ্ততম উপায়) এ কথার উপর অনেকে আপত্তি তুলেছেন। তারা বলেন, ইয়াফত অন্যান্য নির্দিষ্ট ইসমের তুলনায় কোনোটা থেকে সংক্ষিপ্ত। যেমন ইসমে মাওসুল, আবার কোনোটা থেকে বড়, যেমন, সর্বনাম ও নামবাচক বিশেষ্য। অতএব, তার ক্ষেত্রে 'সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত' এ বিশেষণ কি করে সঠিক হবে?

এর উত্তর হলো, বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে যে গুণের ও বিশেষণের মাধ্যমে শ্রোতার কাছে নির্দিষ্ট করতে চান, সে বিশেষণের মাধ্যমে পরিচিত করার সংক্ষিপ্ততম পদ্ধতি হলো ইয়াফত। সাধারণভাবে মুসনাদ ইলাইহের সত্তাকে পরিচিত করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অবশ্য ইয়াফত নয়। উল্লিখিত কবিতায় কবির উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার কাছে মুসনাদ ইলাইহকে তার প্রিয়জন রূপে পরিচিত এবং চিহ্নিত করবে সেই সাথে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য শেষ করবে। উল্লেখ্য যে, এখানে সর্বনাম, নামবাচক অথবা ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ইত্যাদির মাধ্যমে মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করা যেত, কিন্তু এতে বক্তার উদ্দেশ্যটি অর্জিত হতো না, বরং তার অনুরাগের কথা অব্যক্তই থেকে যেত, এমনভাবে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করে যদি বলত (উদাহরণ স্বরূপ) **حَامِدٌ مَّهْوًى** বাক্যটি সংক্ষিপ্ত থাকত না; বরং এটি মুকতয়ায়ে হালের বিপরীত দীর্ঘ হয়ে যেত। এমনভাবে যদি আলিফ-লাম দ্বারা নির্দিষ্ট করে এভাবে বলা হতো **أَلْفَى الْمَحْبُوبِ إِلَى** তবুও বাক্যটি দীর্ঘ হয়ে যেত। মোটকথা, ইয়াফত হচ্ছে বক্তার উদ্দেশ্য আদায় করে মুসনাদ ইলাইহকে পরিচিত করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, উল্লিখিত কবিতায় কবি আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সাথে সাথে মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। মুসান্নিফ (র.) কবিতায় উল্লিখিত কিছু শব্দের তাহকীক সুবিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে তিনি **هَوَاً**-এর তাহকীক করতে গিয়ে বলেন, এটি এখানে **مهوى**-এর অর্থে, **مهوى** আসলে **مهوى** ছিল, প্রথম **واو** আসল অক্ষর, যা মান্দার মাঝে বিদ্যমান, দ্বিতীয় **واو** হলো ইসমে মাফউলের। প্রথম **يا** লাম কালিমার স্থানে আসল অক্ষর, দ্বিতীয় **يا** উত্তম পুরুষের সর্বনাম, দ্বিতীয় **واو** হলো সাকিন আর প্রথম **يا** হরকতযুক্ত। অতএব, **واو**-কে **يا** দ্বারা পরিবর্তন করত **يا**-কে **يا**-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। আর **يا**-এর কারণে প্রথম **واو**-এর নিচে যের দেওয়া হয়েছে। ফলে **مهوى** হয়েছে। **مُضْعِدٌ** শব্দে অর্থ দূরযাত্রী। **جَنِيبٌ** শব্দটি **مجنوب**-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **مجنوب** বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যাকে আগে রেখে অন্যরা তার পেছনে চলে। এখানে কবির উদ্দেশ্য হলো, তার প্রেমাস্পদ এমন ব্যক্তি, যাকে সামনে রেখে অন্যরা পেছনে চলে। ফলে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই। **جُثْمَانٌ** শব্দের অর্থ- দেহ ও শরীর।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে কখনো নির্দিষ্ট (معرفة) করা হয় নির্দিষ্ট ইসমসমূহের প্রতি ইয়াফত করার মাধ্যমে।

ইয়াফতের মাধ্যমে معرفة করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুতাকাল্লিমের উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ততম উপায়ে প্রকাশ করা।

এর উদাহরণ **هَوَاً مَعَ الرَّكْبِ الْبَيْتَانَيْنِ مُضْعِدٌ** এ পঙ্ক্তির **هَوَاً** শব্দটি ইয়াফতের মাধ্যমে معرفة হয়ে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে।

أَوْ لَتَضْمُنَهَا أَى لَتَضْمُنِ الْإِضَافَةِ تَعْظِيمًا لِّشَانِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْ الْمُضَافِ أَوْ
 غَيْرِهِمَا كَقَوْلِكَ فِى تَعْظِيمِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَبْدِى حَضَرَ تَعْظِيمًا لَكَ بِأَنَّ لَكَ عَبْدًا أَوْ
 فِى تَعْظِيمِ الْمُضَافِ عَبْدُ الْخَلِيفَةِ رَكِبَ تَعْظِيمًا لِلْعَبْدِ بِأَنَّهُ عَبْدٌ لِلْخَلِيفَةِ وَفِى
 تَعْظِيمِ غَيْرِ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِى تَعْظِيمًا لِلْمُتَكَلِّمِ بِأَنَّ
 عَبْدَ السُّلْطَانِ عِنْدَهُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ لِكُنْهٍ غَيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمُضَافُ
 وَغَيْرُ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ لَتَضْمُنَهَا تَحْقِيقًا
 لِلْمُضَافِ نَحْوُ وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ أَوْ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ نَحْوُ ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ أَوْ غَيْرِهِمَا
 نَحْوُ وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيسُ زَيْدٍ أَوْ لِإِغْنَائِهَا عَنْ تَفْصِيلِ مُتَعَدِّ نَحْوُ اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ
 عَلَى كَذَا أَوْ مُتَعَسِّرِ نَحْوُ أَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوا كَذَا وَلِأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ التَّفْصِيلِ مَا نَعِيَ مِثْلُ
 تَقْدِيمِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ نَحْوُ عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُونَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِعْتِبَارَاتِ -

অনুবাদ : অথবা এ কারণে যে, ইয়াফত মুযাফ ইলাইহ অথবা মুযাফ অথবা এ দু'টি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের সম্মান দানের অর্থ বহন করে। যেমন তুমি মুযাফ ইলাইহের সম্মান দানের ক্ষেত্রে বললে **عَبْدِى حَضَرَ** (আমার কৃত দাস উপস্থিত হয়েছে) তোমার সম্মানের বিষয় এটি যে, তোমার একটি দাস আছে। অথবা মুযাফের সম্মান দানের জন্য, যেমন **عَبْدُ الْخَلِيفَةِ رَكِبَ** (খলিফার দাস আরোহণ করেছে) এতে দাসের মর্যাদা প্রমাণিত হয়েছে এ হিসেবে যে, সে খলিফার দাস এবং মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ ছাড়া অন্যের সম্মানের জন্য, যেমন **عَبْدُ السُّلْطَانِ** (বাদশাহের দাস আমার কাছে এসেছে, এখানে) বক্তার মর্যাদা বুঝা যাচ্ছে যে, বাদশাহের দাস তার কাছে (অতএব, সে খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তি)। সে **يَا مُتَكَلِّم** যদিও এখানে মুযাফ ইলাইহ, কিন্তু তা মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ নয় এবং মুসনাদ ইলাইহকে যার প্রতি ইয়াফত করা হয়েছে এমন মুযাফ ইলাইহও নয়। আর লেখকের উক্তি **أَوْ غَيْرِهِمَا** দ্বারা উদ্দেশ্য এটাই, অথবা ইয়াফত (করা হয়) মুযাফের অমর্যাদার অর্থ বহন করার জন্যে। যেমন- **وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ** (রক্তমোক্ষকের ছেলে উপস্থিত) অথবা মুযাফ ইলাইহের (অমর্যাদার অর্থ) যেমন **ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ** (যায়েদের প্রহারকারী উপস্থিত) অথবা এ দু'টির ভিন্ন অন্য কারোর জন্য। যেমন- **وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيسُ زَيْدٍ** (রক্তমোক্ষকের ছেলে যায়েদের সহচর) অথবা অসম্ভব দীর্ঘ ব্যাখ্যা থেকে ইয়াফত অমুক্ষাপেক্ষী করে দেওয়ার কারণে, যেমন- **اتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى كَذَا** (সত্যপন্থি লোকেরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন) অথবা কষ্টসাধ্য দীর্ঘ ব্যাখ্যা থেকে বাঁচার জন্য। যেমন- **أَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوا كَذَا** (শহরের লোকেরা এরাপ করেছে) অথবা ইয়াফত করা হয় বিস্তারিত ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে, যেমন (বিস্তারিত ব্যাখ্যায়) কতককে কতকের আগে উল্লেখ করতে হয়, যেমন- **عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُونَ** (শহরের আলিমগণ উপস্থিত)। ইত্যাদি অন্যান্য কারণে ইয়াফত করা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ لِيَتَضَنَّهَا أَيْ لِيَتَضَنَّهَا : উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে ইয়াফত দ্বারা নির্দিষ্ট করার আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। اَضَافَتْ দ্বারা কখনো মুযাফ ইলাইহ অথবা মুযাফ অথবা দু'টি ভিন্ন অন্য কারো সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উক্ত সম্মান বুঝানোর জন্য মুসনাদ ইলাইহের ইয়াফত দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।

ক. ইয়াফত দ্বারা মুযাফ ইলাইহের সম্মান বুঝানো হয়েছে, এর উদাহরণ হলো عِبْنِي حَضَرَ তথা আমার দাস উপস্থিত হয়েছে, এ উদাহরণে মুযাফ ইলাইহ (يَا مُكَلِّم) অর্থাৎ বক্তার সম্মান বুঝানো হয়েছে। তা এভাবে যে, ইয়াফত প্রমাণ করছে যে, তার একজন ক্রীতদাস আছে। আর যার ক্রীতদাস আছে সে সম্মানিত ব্যক্তি।

খ. ইয়াফত দ্বারা মুযাফের সম্মান বুঝানোর উদাহরণ হলো عَبْدُ الْخَلِيفَةِ رَكِبَ (খলিফার ক্রীতদাস আরোহণ করেছে) এতে মুযাফ-এর সম্মান হয়েছে। কেননা, ইয়াফত দ্বারা জানা গেল যে, সে খলিফার দাস। আর খলিফা বা বাদশাহর দাস হওয়াটা গৌরবের বিষয়।

গ. কখনো ইয়াফত দ্বারা মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ ছাড়া অন্য কারো সম্মান বুঝানো হয়, এর উদাহরণ হলো عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِي এখানে মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে عَبْدُ السُّلْطَانِ এর মুসনাদ হলো عِنْدِي। এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহের মুযাফ বা মুযাফ ইলাইহ কারো সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। এখানে বক্তার সম্মান বুঝানো উদ্দেশ্য, যা এখানে মুসনাদের মুযাফ ইলাইহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ : এ বাক্য দ্বারা একটি সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি হচ্ছে, عَبْدُ السُّلْطَانِ-এর মধ্যে আপনি বলেছেন, মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তথা বক্তার অমর্যাদা বুঝানো হয়েছে; অথচ আমরা দেখছি বক্তার সর্বনামটি এখানে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন,

১. মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ ভিন্ন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ এবং মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ ইলাইহ, সাধারণ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ নয়। উল্লিখিত উদাহরণ ভিন্ন ব্যক্তি তথা বক্তার সর্বনামটি যদিও মুযাফ ইলাইহ হয়েছে; কিন্তু তা মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ ইলাইহ নয়; বরং মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ ইলাইহের ভিন্ন ব্যক্তি। অতএব, মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ-এর থেকে ভিন্ন হওয়ার শর্তটি এখানে পাওয়া গেছে।

২. ইয়াফত দ্বারা কখনো মুযাফ ইলাইহ, মুযাফ এবং এ দু'য়ের ভিন্ন কারো অমর্যাদা বুঝানোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উক্ত অমর্যাদা এবং তুচ্ছতা বুঝানোর জন্য কখনো ইয়াফত দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়। এখানেও মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ এবং এতদ্বিন্ন কারো অমর্যাদা বুঝানো হবে। এ হিসেবে তিনটি পৃথক উদাহরণের মাধ্যমে তিন প্রকার বুঝানো হলো।

ক. ইয়াফত দ্বারা মুযাফের অমর্যাদা ও তুচ্ছতা বুঝানো হয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে وَلَدُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ (রক্তমোক্ষকের ছেলে উপস্থিত) এখানে মুযাফ- وَلَدُ-এর তুচ্ছতা বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, সে রক্তমোক্ষকের ছেলে।

খ. ইয়াফত দ্বারা মুযাফ ইলাইহের অমর্যাদা তুচ্ছতা বুঝানো হয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ যায়েদের প্রহারকারী উপস্থিত। এ উদাহরণে মুযাফ ইলাইহ- زَيْدُ-এর অমর্যাদা বুঝানো হয়েছে। এই বলে যে, সে প্রহৃত হয়েছে।

গ. ইয়াফত দ্বারা মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ ছাড়া ভিন্ন কারো অমর্যাদা ও তুচ্ছতা বুঝানোর উদাহরণ হচ্ছে وَلَدُ الْحَجَّامِ (রক্তমোক্ষকের ছেলে যায়েদের সহচর)। এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ মুযাফ হচ্ছে وَلَدُ এবং তার মুযাফ ইলাইহ হচ্ছে الْحَجَّامُ। এখানে এ দু'জনের কারো অমর্যাদা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে زَيْدُ-এর অমর্যাদা বুঝানো হয়েছে এই বলে যে, তার বন্ধু হচ্ছে রক্তমোক্ষকের ছেলে, তার সাথে সে চলাফেরা করে।

৩. ইয়াফত দ্বারা কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় এ কারণে যে, মুসনাদ ইলাইহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অসম্ভব; কিন্তু ইয়াফত এ অসম্ভব কাজ করা থেকে উদ্ধার করে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করার পথ বাতলে দেয়। যেমন- আপনি বলছেন اَتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى كَذَا সত্যপন্থিরা এ ব্যাপারে একমত পৌছেছে। এখানে ইয়াফতের মাধ্যমে সত্যপন্থি সকলের কথাই বলা হয়েছে। এভাবে না বলে বিস্তারিতভাবে সকলের নাম বলা অসম্ভব ছিল। ইয়াফতের মাধ্যমে কেবল أَهْلُ الْحَقِّ বলে উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে এবং সেই সাথে অসম্ভব কাজ থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে।

৪. ইয়াফত দ্বারা কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় এ জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কষ্টসাধ্য; কিন্তু ইয়াফতের মাধ্যমে বিষয়টি সহজেই বর্ণনা করা যায়, যেমন বলা হয়ে থাকে **أَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوا كَذَا** অর্থাৎ শহরের লোকেরা এমন করেছে। এখানে শহরের সকলের নাম নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলা অসম্ভব নয়; কিন্তু তা যথেষ্ট কষ্টের কাজ। এই কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংক্ষেপে মুসনাদ ইলাইহকে ইয়াফতের সাথে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

৫. ইয়াফত দ্বারা কখনো মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয় এজন্য যে, বিস্তারিতভাবে সকলের নাম নিয়ে বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইয়াফত করা হয়। যেমন—**عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُونَ** (দেশের আলিমগণ উপস্থিত)। এ উদাহরণে দেশের আলিমদের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের নাম নিয়ে বলা সম্ভব ছিল; কিন্তু বলতে গেলে কাউকে আগে এবং কাউকে পরে উল্লেখ করতে হতো। এতে করে কারো মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতএব, কারো নাম আগে বলা এবং কারো নাম পরে বলা থেকে বাঁচার জন্য সংক্ষেপে ইয়াফতের সাথে বলা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ ছাড়া আরো অন্যান্য কারণে ইয়াফত করা হয় এবং এর দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে নির্দিষ্ট করা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

ইয়াফতের মাধ্যমে মুসনাদ ইলাইহকে **معرفة** করার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

১. ইয়াফতের মাধ্যমে মুযাফ ইলাইহের মর্যাদা প্রকাশ পায়। যেমন—**عَبْدِي حَاضِرٌ**
২. ইয়াফতের মাধ্যমে মুযাফের মর্যাদা প্রকাশ পায়। যেমন—**عَبْدُ الْخَلِيفَةِ رَكِيبٌ**
৩. মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ ব্যতীত তৃতীয় কারো সম্মান প্রকাশ পায়। যেমন—**عَبْدُ السُّلْطَانِ عِنْدِي**
৪. ইয়াফতের মাধ্যমে মুযাফের অমর্যাদা প্রকাশ করা হয়। যেমন—**ضَارِبُ الْحَجَّامِ حَاضِرٌ**
৫. ইয়াফতের সাহায্যে মুযাফ ইলাইহের হীনতা প্রকাশ পায়। যেমন—**ضَارِبُ زَيْدٍ حَاضِرٌ**
৬. ইয়াফতের সাহায্যে তৃতীয় কারো হীনতা প্রকাশ করা হয়। যেমন—**وَلَدُ الْحَجَّامِ جَلِيسٌ زَيْدٌ**
৭. কখনো অসম্ভব বিবরণ থেকে বাঁচার জন্য ইয়াফত করা হয়। যেমন—**إِتَّفَقَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى كَذَا**
৮. কখনো কষ্টসাধ্য বিবরণ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ইয়াফত করা হয়। যেমন—**أَهْلُ الْبَلَدِ فَعَلُوا كَذَا**
৯. কখনো বিস্তারিত বর্ণনায় সমস্যা থাকায় ইয়াফত করা হয়। যেমন—**عُلَمَاءُ الْبَلَدِ حَاضِرُونَ**

وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ أَيْ تَنْكِيرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِلْإِفْرَادِ أَيْ لِلْقَصْدِ إِلَى فَرْدٍ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِنْسِ نَحْوُ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى أَوْ النَّوعِيَّةِ أَيْ لِلْقَصْدِ إِلَى نَوْعٍ مِنْهُ نَحْوُ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ أَيْ نَوْعٌ مِنَ الْأَغْطِيَةِ وَهُوَ غِطَاءُ التَّعَامِيْنَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي الْمِفْتَاحِ أَنَّهُ لِلتَّعْظِيمِ أَيْ غِشَاوَةٌ عَظِيمَةٌ أَوْ التَّعْظِيمِ أَوْ التَّحْقِيرِ كَقَوْلِهِ شَغَرَ لَهُ حَاجِبٌ أَيْ مَانِعٌ عَظِيمٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ أَيْ يَعْينُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ أَيْ مَانِعٌ حَقِيرٌ فَكَيْفَ بِالْعَظِيمِ -

অনুবাদ : আর মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় যে কোনো فرد (সদস্য)-কে বুঝানোর জন্য, অর্থাৎ ইসমে জিনস যার উপর প্রয়োগ হয় এমন فرد-এর ইচ্ছা করার জন্য। যেমন-وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى (এবং শহরের প্রান্ত থেকে একটি লোক দৌড়ে আসল)। অথবা প্রকার বুঝানোর জন্য, অর্থাৎ ইসমে জিনসের একটি প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন-وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ (আর তাদের চোখের উপর রয়েছে এক ধরনের পর্দা) অর্থাৎ এক বিশেষ প্রকারের আবরণ। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির ব্যাপারে অন্ধত্ব। মিফতাহ গ্রন্থে বর্ণিত তা অর্থাৎ غِشَاوَةٌ (এর তানবীন) বিশালতা (বুঝানো)-এর জন্য। অর্থাৎ বিরাট আবরণ। অথবা বড় কিংবা সামান্য বুঝানোর জন্য। যেমনটি কবির উক্তি عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ তাকে ক্রটিযুক্ত করতে পারে এমন বিষয়ে তার বিরাট প্রতিবন্ধক রয়েছে; কিন্তু তার করুণাপ্রার্থীদের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকই নেই অর্থাৎ সামান্য বাধাও নেই, তাহলে বড় বাধা কিভাবে থাকবে?

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ الخ : এ ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্ট (نكره) ব্যবহার করার বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১. প্রথম কারণ হচ্ছে, ইসমে জিনসের কোনো একটি অনির্দিষ্ট সদস্যের উপর যখন হুকুম দেওয়ার ইচ্ছা করা হয় তখন মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়, সেই মুসনাদ ইলাইহ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচনও হতে পারে। যদি نكره একবচন হয়, তাহলে ইসমে জিনসের একটি فرد উদ্দেশ্য হবে, দ্বিবচন হলে দু'টি فرد, আর বহুবচন হলে তার একটি দল উদ্দেশ্য হবে।

এর উদাহরণ أَمَّا رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى আয়াতে পুরুষ জাতির অনির্দিষ্ট একজন সদস্যকে رجل বুঝানো হয়েছে। তারকীবের মধ্যে رجل মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। এটি একবচন فرد হওয়াতে এর দ্বারা এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য হবে, দু'জন বা তিনজন উদ্দেশ্য নয়। আয়াতে হযরত মুসা (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। رجل দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ফেরাউনের বংশের এক মু'মিন ব্যক্তি। শহরের প্রান্ত বলে ফেরাউনের শহর বুঝানো হয়েছে। কথিত আছে, সে শহরের নাম ছিল মুনিফ।

২. قَوْلُهُ أَوْ النَّوعِيَّةِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় ইসমে জিনসের কোনো এক প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন-وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ অর্থাৎ আর তাদের চোখের উপর বিশেষ ধরনের পর্দা রয়েছে। এ আয়াতে غِشَاوَةٌ শব্দটি অনির্দিষ্ট। তারকীবের এটি মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। এখানে অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকার বুঝানো যে এক বিশেষ ধরনের আবরণ, সাধারণ কোনো আবরণ নয়। সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলি দেখার ব্যাপারে অন্ধত্ব। তারা সব দেখত এবং শুনত; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সেগুলোকে অন্ধত্বের কারণে অনুধাবন করতে পারত না।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মূল লেখক ইতঃপূর্বে বলেছেন نكره দ্বারা فرد বুঝানো হয়, আবার এখানে বললেন نوع (প্রকার) বুঝানো হয়, এ দু'টি অর্থ এক সাথে نكره-এর মধ্যে কিভাবে একত্রিত হবে?

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, نكره (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) সাধারণভাবে وَحَدَّتْ (একক অর্থের) দিকনির্দেশ করে। وَحَدَّتْ দু'ধরনের- ১. وَحَدَّتْ شَخْصِي ২. وَحَدَّتْ نَوْعِي

অতএব, দু' ধরনের وَحَدَّتْ-এর প্রতি দিক নির্দেশ করে। সে মতে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে দু'টি অর্থের সমাবেশ ঘটতে সমস্যা নেই।

غشاة-এর দ্বারা প্রকার উদ্দেশ্য, এটা আল্লামা যমখশরী (র.)-এর তাফসীর, যা তিনি কাশ্শাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মিফতাহ গ্রন্থে আল্লামা সাক্বাকী (র.) غشاة-এর তানবীনকে تعظيم অর্থাৎ বড়ত্ব প্রকাশের অর্থে বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে তাদের চোখের উপর বড় আবরণ রয়েছে। অনেকের মতে মিফতাহ গ্রন্থের ব্যাখ্যাটি উত্তম। কেননা, আয়াত দ্বারা কুরআনের আয়াত এবং অন্যান্য নির্দেশনাবলি গ্রহণে কাফিরদের দূরত্ব বুঝানো আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কুরআন এ কথা বুঝাতে চায় যে, তারা কুরআনের আয়াত এবং সত্য গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরত্বে অবস্থান করছে, তাদের সত্যগ্রহণ করার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। আর বলা বাহুল্য যে, উক্ত বক্তব্য ও উদ্দেশ্য تعظيم-এর অর্থ গ্রহণ করার সাথেই বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কতিপয় লোক মনে করেন, আল্লামা যমখশরী (র.)-এর বক্তব্য যা লেখক বর্ণনা করেছেন এবং মিফতাহ গ্রন্থের বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। তারা বলেন, বড় পর্দা ও আবরণ হচ্ছে সাধারণ পর্দার এক প্রকার। অতএব, লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের চোখে এক ধরনের পর্দা রয়েছে, যা বিশাল ও অতিকায়।

৩. মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে কখনো অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়, এর দ্বারা সম্মান ও বিশালতা বুঝানোর জন্য। আবার কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে আনা হয় তুচ্ছতা এবং সামান্য বুঝানোর জন্য। একটি কবিতার পঙ্ক্তিতে উভয়টির উদাহরণ পাওয়া যায়।

কবি বলেন-لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِينُهُ * وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ

'তার (আমার প্রিয়জনের) রয়েছে এক বিশেষ প্রতিবন্ধক এসব বিষয়ে, যা তাকে দুষ্ট ও ক্রটিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু তার করুণাপ্রার্থীদের জন্য (তার কাছে যাওয়াতে) কোনো বাধা নেই।' উল্লিখিত পঙ্ক্তির প্রথম লাইনের حَاجِبٌ (প্রতিবন্ধক শব্দটি বড় ও বিশাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার দ্বিতীয় লাইনের حَاجِبٌ শব্দটি সামান্য ও সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উভয় حَاجِبٌ তারকীবের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, অনির্দিষ্ট শব্দ কখনো বিশালতা বুঝায়, আবার কখনো সামান্য অর্থ প্রদান করে। আর উল্লিখিত অর্থদ্বয় আদায়ের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে আনা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহকে কখনো نكره রূপে ব্যবহার করা হয়। نكره বা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার নিম্নোক্ত কারণে হয়ে থাকে

ক. ইসমুল জিনস-এর কোনো একটি فرد বুঝানোর জন্য। যেমন-وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى

খ. ইসমুল জিনস-এর কোনো একটি نوع বুঝানোর জন্য। যেমন-وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

গ. কোনো ইসমের মর্যাদা ও মাহাত্মের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য, আবার কখনো অমর্যাদা ও সামান্য বুঝানোর জন্য-

যেমন-لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ يَشِينُهُ * وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبٌ

أَوِ التَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِمْ وَإِنَّ لَهُ لَإِبِلًا وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا أَوْ التَّقْلِيلِ نَحْوَ رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْثِيرِ أَنَّ التَّعْظِيمَ بِحَسَبِ ارْتِفَاعِ الشَّانِ وَعُلُوِّ الطَّبَقَةِ وَالتَّكْثِيرُ بِاعْتِبَارِ الْكَمِّيَّاتِ وَالْمَقَادِيرِ تَحْقِيقًا كَمَا فِي الْإِبِلِ أَوْ تَقْدِيرًا كَمَا فِي الرِّضْوَانِ وَكَذَا التَّخْفِيرُ وَالتَّقْلِيلُ وَلِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا قَالَ وَقَدْ جَاءَ التَّنْكِيرُ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّكْثِيرِ نَحْوَ وَإِنْ يُكْذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ أَيْ ذَوُو عَدَدٍ كَثِيرٍ هَذَا نَاطِرٌ إِلَى التَّكْثِيرِ أَوْ ذَوَوَايَاتٍ عِظَامٍ هَذَا نَاطِرٌ إِلَى التَّعْظِيمِ وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّخْفِيرِ وَالتَّقْلِيلِ نَحْوُ حَصَلَ لِي مِنْهُ شَيْءٌ أَيْ حَقِيرٌ قَلِيلٌ -

অনুবাদ : অথবা (মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয়) আধিক্য বুঝানোর জন্য। যেমন আরবদের উক্তি وَإِنَّ لَهُ لَإِبِلًا وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا নিশ্চয়ই তার অনেক উট ও মেষপাল রয়েছে। অথবা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য যেমন- رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ আল্লাহ তা'আলার (স্বল্প) সন্তুষ্টিই অনেক বড়। বিশালতা এবং আধিক্য এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে- বিশালতা মর্যাদাগত উচ্চতা এবং উপরের স্তরের দ্বারা হয়, আর আধিক্য সংখ্যাগতভাবে এবং পরিমাণ দ্বারা হয়, এটা বাস্তবিকভাবে হতে পারে, যেমন- উটের উদাহরণের মধ্যে। অথবা মনস্তাত্ত্বিকভাবে, যেমন- সন্তুষ্টির উদাহরণে হয়েছে। ঠিক এমনই হয়েছে সামান্য ও স্বল্পতার মধ্যে। এ দু'য়ের মাঝের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য লেখক বলেন, কখনো অনির্দিষ্ট শব্দ বিশালতা এবং মহত্ত্ব, আধিক্য বুঝানোর জন্য আসে। যেমন- (وَإِنْ يُكْذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ) অর্থাৎ যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে থাকে তবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ ইতঃপূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। (رُسُل) শব্দটি অনির্দিষ্ট এখানে আধিক্যের অর্থ বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ অনেক সংখ্যায়। এটি (তরজমাটি) আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। অথবা “অনেক বড় মু'জিয়া নিদর্শনের অধিকারীদের” এ অর্থ মহত্ত্বের (تعظيم)-এর প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়েছে। আবার কখনো অনির্দিষ্ট বিশেষ্য সামান্য এবং স্বল্প বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- حَصَلَ لِي مِنْهُ شَيْءٌ তার থেকে আমি অল্পই পেয়েছি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوِ التَّكْثِيرِ كَقَوْلِهِمْ : উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ (র.) মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করার আরো কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

১. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আধিক্যের অর্থ বুঝানোর জন্য অনির্দিষ্টরূপে আনা হয়, যেমন- আরবদের উক্তি وَإِنَّ لَهُ লَإِبِلًا وَإِنَّ لَهُ লَغَنَمًا অর্থাৎ তার প্রচুর উট এবং মেষপাল রয়েছে।

এ উদাহরণে لَإِبِلًا ও لَغَنَمًا এ দু'টি বিশেষ্য অনির্দিষ্ট এবং বাক্যে মুসনাদ ইলাইহ (إِنْ-এর ইসম) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দু'টি বিশেষ্য এখানে সংখ্যার আধিক্য বুঝিয়েছে।

২. কখনো মুসনাদ ইলাইহ স্বল্পতার অর্থ বুঝানোর জন্য অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কুরআনের আয়াত رِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সামান্য সন্তুষ্টি অনেক বড়। আয়াতে رِضْوَان শব্দটি অনির্দিষ্ট হয়েছে এবং তা মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। এটি এখানে সামান্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

تَعْظِيم : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো تَعْظِيم-এর উল্লেখ করার পর تَكْثِيرٌ وَتَقْلِيلٌ কেন উল্লেখ করা হলো? কেননা, تعظيم এবং تكثير একই বিষয় ও একার্থক। এমনিভাবে تحقير ও تقليل পরস্পর সমার্থক। অতএব, একটির উল্লেখের দ্বারা অপরটিকে উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে না।

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, প্রশ্নটি ভুল ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মূলত এ বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এ গুলোর মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

মূলত تعظيم এবং تكثير-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমনটি পার্থক্য রয়েছে تحقير এবং تقليل-এর মাঝে। تعظيم হচ্ছে-কিফিয়াত-এর সাথে সম্পর্কিত। تعظيم বা সম্মান ও মর্যাদা দান কারো উঁচু মর্যাদা ও উপরের স্তরে অবস্থানের কারণে হয়। আর تكثير হয়ে থাকে সংখ্যা ও পরিমাণের ক্ষেত্রে। যেমন- শতশত, হাজার হাজার উট ও ঘোড়া। মোটকথা, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করার দ্বারা সংখ্যা ও পরিমাণ বুঝানো হয়। যেমন- উল্লিখিত উদাহরণে ابل ও غنم দ্বারা প্রচুর সংখ্যা বুঝানো হয়েছে এটি কোনো বস্তুর কিফিয়াত-এর সাথে সম্পর্কিত নয়; বরং এটি পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত। তবে গণনা কখনো বাহ্যিকভাবে করা যায় এবং বুঝা যায়। যেমন- উট ও মেসপালের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব। আবার কখনো এ সংখ্যা নির্ধারণ বাহ্যিকভাবে করা সম্ভব হয় না। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এর গণনা হয়ে থাকে। যেমন- رضوان দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সামান্য পরিমাণ সত্ত্বষ্টিই অনেক বড়। কিন্তু সামান্য কতটুকু তা গণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে একটি معنوی বিষয়। বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। আর বাস্তবে অস্তিত্বহীন কোনো বস্তুর গণনা কি করে সম্ভব। অতএব, এর মধ্যে এর افراد-কে মনে মনে ধরে সে মতে কমবেশি পরিমাপ করা যেতে পারে। এমনিভাবে পার্থক্য রয়েছে تقليل এবং تحقير-এর মাঝে। تحقير-এর সম্পর্ক কোনো বস্তুর অবস্থার সাথে, আর تقليل-এর সম্পর্ক সেই বস্তুর পরিমাণের সাথে।

এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য লেখক বলেন, অনির্দিষ্ট বিশেষ্য বিশালতা ও আধিক্য (উভয়)-এর অর্থের জন্য আসে। লেখক এখানে تعظيم ও تكثير শব্দদ্বয়কে আতফ করে লিখেছেন। আতফ দু'টি বিষয়ের বৈপরীত্যের প্রমাণ বহন করে। অতএব, দু'টি ভিন্ন বিষয়, উভয়ের উদাহরণ মূল লেখক কুরআনের একটি আয়াত থেকে পেশ করেছেন। আয়াত وَأَنَّ رُسُلًا يُكَذِّبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ আয়াতের رسل শব্দটি অনির্দিষ্ট এবং মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। رسل-এর তানবীন অনির্দিষ্টতার অর্থ দানের জন্য। সেই সাথে তা আধিক্যের অর্থ হতে পারে। আবার বিশালতা বুঝানোর জন্যও হতে পারে।

আধিক্যের জন্য হলে আয়াতের অর্থ হবে আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। আর মহত্ত্বের জন্য হলে এর অর্থ হবে আপনার পূর্বে বড় বড় রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যাদের কাছে অনেক বিশ্বয়কর মু'জিয়াসমূহ বিদ্যমান ছিল।

মুসান্নিফ تحقير এবং تقليل-এর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য বলেছেন, অনির্দিষ্ট বিশেষ্য কখনো তুচ্ছ ও স্বল্প কিছু বুঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানেও তিনি দু'টিকে আতফের অক্ষরের সাথে বর্ণনা করেছেন, যা উভয়ের ভিন্নতার ইঙ্গিত বহন করে। যেমন- حَصَلَ لِي شَيْءٌ আমার সামান্য কিছু অর্জিত হয়েছে। এ উদাহরণের شَيْءٌ শব্দটি অনির্দিষ্ট। এ তানবীন تحقير (তুচ্ছ) এবং تقليل (স্বল্প) উভয় অর্থে এখানে হতে পারে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহের আধিক্য বুঝানোর জন্য। যেমন-

إِنَّ لَهُ لَإِيْلًا وَإِنَّ لَهُ لَعَنًا

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহের স্বল্পতা বুঝানোর জন্য نكرة ব্যবহার করা হয়। যেমন- وَرِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ

উল্লেখ্য যে, تعظيم ও تحقير এবং تكثير ও تقليل-এর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কারণ, প্রথম দু'টির সমস্ত-কিফিয়াত-এর সাথে, পক্ষান্তরে শেষ দু'টির সম্পর্ক-কিমাত-এর সাথে।

وَمِنْ تَنْكِيرٍ غَيْرِهِ اَىْ غَيْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِاَفْرَادٍ وَالتَّوَعُّبِ نَحْوُ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ اَىْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِ الدَّوَابِّ مِنْ نُطْفَةٍ مُعَيَّنَةٍ هِيَ نُطْفَةُ اَبِيهِ الْمُخْتَصَّةُ بِهِ وَكُلُّ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الدَّوَابِّ مِنْ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْمِيَاهِ وَهُوَ نَوْعُ النُّطْفَةِ الَّتِي تَخْتَصُّ بِذَلِكَ التَّنَوُّعِ مِنَ الدَّوَابِّ وَمِنْ تَنْكِيرٍ غَيْرِهِ لِلتَّعْظِيمِ نَحْوُ فَاَذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اَىْ حَرْبٍ عَظِيمٍ -

অনুবাদ : আর মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য বিশেষ্যকে অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় (মুসনাদ ইলাইহের মতো) কোনো এক فرد (সদস্য) বুঝানোর জন্য অথবা প্রকার বুঝানোর জন্য। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বিচরণশীল প্রত্যেক প্রাণীকে বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ বিচরণশীল প্রাণীর প্রতিটি সদস্যকে নির্দিষ্ট শুক্রকীট তথা তার পিতার শুক্রকীট থেকে জন্ম দিয়েছেন এবং (দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে) বিচরণশীল প্রাণীসমূহের প্রত্যেক প্রকারকে পানির একটি বিশেষ প্রকার থেকে সৃষ্টি করেছেন। সেটি হচ্ছে বীর্ষ। যে বীর্ষটি বিচরণশীল প্রাণীর বিশেষ প্রকারের সাথে খাস, অন্য বিশেষ্যের অনির্দিষ্টকরণ মহত্ব বর্ণনার জন্যও আসে। যেমন- তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দাও। অর্থাৎ বিরাট যুদ্ধের।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمِنْ تَنْكِيرٍ غَيْرِهِ : মুসান্নিফ বলেন, মুসনাদ ইলাইহের মতো অন্যান্য বিশেষ্য, যা বাক্যে মুসনাদ অথবা অন্য মা'মূল হয়েছে, অনির্দিষ্ট فرد এবং প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে লেখক অনির্দিষ্ট সদস্য এবং প্রকার বুঝানোর উদাহরণ পেশ করেছেন, যেমন- وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ অর্থাৎ 'আল্লাহ প্রত্যেক বিচরণশীল প্রাণীকে বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।' আয়াতের دَابَّةٌ এবং مَّاءٌ শব্দ দু'টি অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের একটিও মুসনাদ ইলাইহ নয়। دابة তারকীবের মধ্যে مضاف اليه হিসেবে মাজরুর হয়েছে। আর ماء হয়েছে من (حرف جر)-এর মাজরুর। শব্দ দু'টি ইসমে জিনসের অনির্দিষ্ট সদস্যের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ وَخَذَتْ شَخْصِي-এর জন্য, আবার ইসমে জিনসের কোনো প্রকারের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রথম অর্থানুযায়ী বাক্যের তরজমা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি একটি প্রাণীকে এক বিশেষ পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীকে তার পিতার বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, دابة দ্বারা প্রতিটি প্রাণী অনির্দিষ্টভাবে উদ্দেশ্য হবে। এমনিভাবে পানি দ্বারাও এক পানি উদ্দেশ্য হবে। যদি কেউ এখানে আপত্তি তোলে যে, হযরত আদম, হাওয়া, হযরত ইসা (আ.) এবং মাটি থেকে তৈরি পোকা-মাকড় ইত্যাদিকে তো আল্লাহ তা'আলা বীর্ষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, প্রত্যেক প্রাণীকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করা কিভাবে হলো?

এর উত্তর হলো আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ নিয়মের ঘোষণা দেওয়া। উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম। আর যদি دابة এবং ماء শব্দ দু'টি প্রকারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহলে আয়াতের তরজমা হবে এরূপ- আল্লাহ এক প্রকার বিচরণশীল প্রাণীকে এক প্রকারের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন- মানুষকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

قَوْلُهُ وَمِنْ تَنْكِيرٍ غَيْرِهِ لِلتَّعْظِيمِ : লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য বিশেষ্যকে কখনো অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা হয় বিশালতা বুঝানোর জন্য। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَادْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ এ আয়াতে حرب শব্দটি অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তারকীবের মধ্যে حرب শব্দটি (حرف جر)-এর মাজরুর হয়েছে, মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। এর দ্বারা এখানে عَظِيم (বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধ) উদ্দেশ্য। পুরো বাক্যের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দাও। এ আয়াত সুদের চরম পরিণতির কথা বর্ণনা করছে। সুদের কারবার করা আর আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার সমতুল্য। এ আয়াতে যেহেতু চরম পরিণতির বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তাই এখানে حرب দ্বারা عَظِيم উদ্দেশ্য হবে।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ইসমকে نكرة বা অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা فرد কিংবা نوع বুঝানোর জন্য। যেমন-

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ

খ. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে نكرة রূপে ব্যবহার করা হয় বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। যেমন- فَادْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

وَلِلتَّخْفِيرِ نَحْرُ وَإِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا أَى ظَنًّا حَقِيرًا ضَعِيفًا إِذِ الظَّنُّ مِمَّا يَقْبَلُ الشَّدَّةُ
وَالضُّعْفُ فَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ هَهُنَا لِلتَّوَعُّبَةِ لَا لِلتَّكْيِيدِ وَبِهَذَا الْإِعْتِبَارِ صَحَّ وَقُوعُهُ
بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ مُفَرَّغًا مَعَ إِمْتِنَاعِ مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَضَدُّ
لِلتَّكْيِيدِ لِأَنَّ مَضَدَّ ضَرَبْتُهُ لَا يَخْتَمِلُ غَيْرَ الضَّرْبِ حَتَّى يَصِحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ وَالْمُسْتَثْنَى
مِنْهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّدًا لِيَشْمَلَ الْمُسْتَثْنَى وَغَيْرَهُ وَكَمَا أَنَّ التَّنْكِيرَ الَّذِي فِي
مَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ يُفِيدُ التَّعْظِيمَ فَكَذَلِكَ صَرِيحُ لَفْظِ الْبَعْضِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ
رَفَعَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ أَرَادَ بِبَعْضِهِمْ مُحَمَّدًا ﷺ فَفِي هَذَا الْإِنْبِهَامِ مِنْ تَفْخِيمِ
شَأْنِهِ وَفَضْلِهِ وَإِعْلَاءِ قَدْرِهِ مَا لَا يَخْفَى -

অনুবাদ : এবং তুচ্ছ জ্ঞান করার জন্য। যেমন- আমরা কেবল তুচ্ছ এবং দুর্বল ধারণা করি। কেননা, ধারণা তো এমন যে, এতে প্রবলতা এবং দুর্বলতা উভয়টি বিদ্যমান আছে। ظَنًّا এখানে মাফউলে মুতলাক, প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাকিদের জন্য নয়। এ কারণে এটি ইসতিছনার পরে আসতে পারে যখন মুসতাহনা মিনহু না থাকে। অথচ মাসদার তাকিদের জন্য হওয়ার কারণে مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا বলা বিশুদ্ধ নয়। কেননা, -ضَرَبْتُهُ-এর মাসদারে প্রহার করার অর্থ ছাড়া অন্য অর্থের সম্ভাবনা নেই যে এর ক্ষেত্রে ইসতিছনা বিশুদ্ধ হবে। মুসতাহনা মিনহু ব্যাপক অর্থবোধক হতে হয় যাতে তা মুসতাহনা এবং অন্য ইসমকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যা কতকের অর্থ ধারণ করে তা যেমন বিশালতা ও মহত্বের অর্থ প্রদান করে, তেমনি بعض শব্দটিও একই অর্থ দিয়ে থাকে, যেমন- (ব্যবহৃত হয়েছে) আল্লাহ তা'আলার বাণীতে, তিনি বলেন, তিনি তাদের কতিপয়কে অন্য কতিপয়ের উপর মর্যাদা দান করেছেন। তাদের কতিপয় লোক বলে তিনি মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য করেছেন। এ অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিরাট স্বীকৃতি এবং উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلِلتَّخْفِيرِ نَحْرُ الخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ ব্যতীত অন্য বিশেষ্যের অনির্দিষ্টতা কখনো তুচ্ছতা বুঝানোর আসে, যেমন- কুরআনের আয়াতِ ظَنُّ إِلَّا ظَنًّا আয়াতে ظَنُّ শব্দটি অনির্দিষ্ট। এটি এখানে মাফউলে মুতলাক হওয়াতে মানসূব হয়েছে এবং মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। এর অনির্দিষ্টতা এখানে সামান্য ও তুচ্ছতার অর্থ প্রদান করছে। কেননা, আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা তুচ্ছ এবং দুর্বল ধারণা করছি।

মুসতাহনা মিনহু এখানে ব্যাপকার্থক, আর মুসতাহনা বিশেষ অর্থবোধক। মুসতাহনা মিনহু হলো এমন ধারণা, যাতে দৃঢ়তা ও প্রবলতা রয়েছে, আবার শক্তি ও দুর্বলতাও রয়েছে। লেখক সেই খাস মুসতাহনাকে ব্যাপক মুসতাহনা মিনহুর অন্তর্ভুক্তি থেকে বের করেছেন। অতএব, ইসতিছনা বিশুদ্ধ হয়েছে।

মোটকথা, এ আয়াতে ظُنُّ শব্দটি প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এটি ظُنُّ-এর প্রকার বুঝিয়েছে। ফেলের তাকিদ হয়নি।

قَوْلُهُ وَبِهَذَا الْإِعْتِبَارِ صَحَّ وَقُوعُهُ : এ বাক্যটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো, ۱ مُسْتَفْنَى مُفَرَّغٌ আর مُسْتَفْنَى مُفَرَّغٌ বলা হয় এমন মুসতাহনাকে যার মুসতাহনা মিনহু অনুল্লেখ থাকে। এখানে সে উহা মুসতাহনা মিনহু হচ্ছে ظُنُّ (মাসদার)।

আর মুসতাছনা মিনহুর ব্যাপকতা জরুরি, যাতে মুসতাছনা তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। অতঃপর ইসতিছনার হরফের মাধ্যমে একে বের করা যায়। কিন্তু **ظَن** শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক নয়। কেননা, ধারণা কেবল ধারণাকে শামিল করে, অন্য কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

অতএব, এ ক্ষেত্রে ইসতিছনা বিশুদ্ধ হওয়ার কথা নয়, মুসতাছনা এবং তার মুসতাছনা মিনহু একই বিষয় হওয়াতে **مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا** হওয়া লাযেম আসছে। সুতরাং ইসতিছনা বাতিল বলে গণ্য হবে, যেমন—**إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنِ نَفْسِهِ** বাতিল বলে গণ্য হয়েছে ঠিক একই কারণে।

এ প্রশ্নের জবাবে মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মাসদার তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন অন্য অর্থ তাতে থাকে না। আর তাই তাকিদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আপত্তি সঠিক বলে গণ্য হবে। আর যদি মাসদার তাকিদের সাথে অন্য অর্থ ধারণ করে, তাহলে ইসতিসনা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। উল্লিখিত আয়াতের **ظَن** (**مُسْتَفْنَى**) শুধুমাত্র তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং তা তাকিদের সাথে প্রকারও বুঝায়। আর মাসদারটিকে প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হলে তা মুসতাছনা মিনহু হতে পারবে এবং ইসতিছনাও বিশুদ্ধ হবে। তখন **إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنِ نَفْسِهِ** হওয়ার আপত্তিও আর থাকবে না। তখন উহা মুসতাছনা মিনহু (**ظَن**) ব্যাপকার্থক হবে এবং তার মধ্যে একাধিক **فرد** থাকবে। যেমন— শক্তিশালী এবং মজবুত ধারণা, দুর্বল ও সামান্য ধারণা ইত্যাদি। এরপর ইসতিছনার মাধ্যমে দুর্বল ধারণাকে বের করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এ ধরনের ইসতিছনার মধ্যে আর কোনো সমস্যা রইল না।

এমনিভাবে **مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا**-এর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, যদি মাসদারটি মাফউলে মুতলাকের জন্য হয় তবে এর ইসতিছনা বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি তা **ظَن**-এর মতো প্রকারের অর্থ প্রদান করে, তাহলে তারকীব বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং **إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنِ نَفْسِهِ** লাযেম আসবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব অনির্দিষ্ট বিশেষ্য **بعض** (কতিপয়)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এগুলো যেমন **تعظيم** (সম্মান ও বিশালতা) বুঝায়, ঠিক **بعض** শব্দটিও বাক্যের মধ্যে কখনো **تعظيم**-এর অর্থ প্রদান করে। এর উদাহরণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী **دَرَجَاتٍ** আর আল্লাহ তা'আলা কতক নবীকে অন্যদের উপর বিরাট মর্যাদা দান করেছেন। **بعضهم**-এর দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ উদ্দেশ্য। এখানে **بعض** শব্দটি সম্মান দানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে অস্পষ্ট বর্ণনার দ্বারা রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব, সুমহান মর্যাদা ও সর্বোচ্চস্তরের হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর এটি করা হয়েছে **بعض** শব্দের সাহায্যে।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের বাইরে অন্য ইসমকে কখনো **نكرة** রূপে ব্যবহার করা হয় সেই ইসমের তুচ্ছতা বুঝানোর জন্য, **وَإِنْ ظَنَّا** আয়াতে উল্লিখিত **ظَنَّا** শব্দটি প্রকার বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। **نوع** বা প্রকার বুঝানোর কারণেই এর থেকে **استثناء** করা বৈধ হয়েছে। যদি এটি **تاكيد**-এর জন্য ব্যবহৃত হতো, তাহলে এর থেকে ইসতিসনা করা বৈধ হতো না। যেমন—**مَا ضَرَبْتُهُ إِلَّا ضَرْبًا** বলা বিশুদ্ধ নয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, **بعض** শব্দটি কখনো **تعظيم**-এর অর্থ প্রদান করে, যেমন—**وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ**

وَأَمَّا وَضْفُهُ أَيْ وَضْفُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْوَضْفُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى نَفْسِ التَّابِعِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ أَنْسَبُ هَهُنَا وَ أَوْفَقُ يَقُولُهُ وَأَمَّا بَيَانُهُ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ أَيْ أَمَّا ذِكْرُ النَّعْتِ لَهُ فَلِكُونِهِ أَيْ الْوَضْفِ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى النَّعْتِ عَلَى أَنْ يُرَادَ بِاللَّفْظِ أَحَدُ مَعْنَيْهِ وَيَضْمِيرُهُ مَعْنَاهُ الْآخَرُ عَلَى مَا سَيَجِيءُ فِي الْبَيَانِ مُبَيَّنًا لَهُ أَيْ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ كَاشِفًا عَنْ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ الْجِسْمُ الطَّوِيلُ الْعَرِيضُ الْعَمِيقُ يَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغٍ يَشْغُلُهُ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِمَّا يُوضَعُ الْجِسْمَ وَيَقَعُ تَعَرُّفًا لَهُ وَنَحْوُهُ فِي الْكَشْفِ أَيْ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ فِي كَوْنِ الْوَضْفِ لِلْكَشْفِ وَالْإِبْضَاحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَضْفًا لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ شِعْرٌ أَلَا لَمَعِي الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ * كَانَ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِعَا فَالَا لَمَعِي مَعْنَاهُ الذِّكْرُ الْمُتَوَقَّدُ وَالْوَضْفُ بَعْدَهُ مِمَّا يَكْشِفُ مَعْنَاهُ وَيُوضِّحُهُ لِكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِمَّا مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ إِنَّ فِي الْبَيِّنِ السَّابِقِ أَعْنَى قَوْلَهُ شِعْرٌ إِنَّ الَّذِي جَمَعَ السَّمَاحَةَ وَالنَّجْدَةَ وَالْبِرَّ وَالتَّقَى جَمْعًا أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِاسْمٍ إِنَّ أَوْ بِتَقْدِيرِ أَعْنَى -

অনুবাদ : মুসনাদ ইলাইহের সিফাত ব্যবহার করা (তার একটি অবস্থা) وصف শব্দটি কখনো একটি বিশেষ তাবে'কে বুঝায়, আবার কখনো মাসদারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে এটাই (মাসদারের অর্থে হওয়া) অধিক যুক্তিযুক্ত এবং (পরবর্তীতে) তার উক্তি اِبْدَالُ مِنْهُ-এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের জন্য সিফাত উল্লেখ করা হয়। অ (সুস্পষ্টকারী) হওয়ার কারণে অর্থাৎ (সর্বনাম দ্বারা) উদ্দেশ্য وصف বা মাসদারের অর্থ। তবে এখানে সর্বোত্তম হচ্ছে সিফাতের অর্থে গ্রহণ করা এ হিসেবে যে, শব্দ দ্বারা তার দু' অর্থের একটি অর্থ নেওয়া হবে এবং তার সর্বনাম দ্বারা তার অপর অর্থ গ্রহণ করা, যার আলোচনা ইলমে বদী' এর মধ্যে আসবে- মুসনাদ ইলাইহের বর্ণনাকারী এবং তার অর্থ উদ্ঘাটনকারী। যেমন- তুমি বললে শরীর হচ্ছে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা বিশিষ্ট, যা এমন খালি স্থানের মুখাপেক্ষী, যাকে সে পরিবেষ্টন করবে। এ গুণাবলি শরীরের বর্ণনা দিচ্ছে এবং পরিচয় দানকারী হয়েছে। এমন সিফাত হয়ে থাকে পূর্ববর্তী শব্দকে স্পষ্ট করার জন্য এবং পরিষ্কৃত করার ক্ষেত্রে, যদিও সেটি মুসনাদ ইলাইহের প্রকৃত সিফাত না হয়। কবির কবিতার চরণ : (অনুবাদ) আলোকিত মেধার অধিকারী ব্যক্তি যে তোমার সম্পর্কে না দেখে না শুনে এমন ধারণা করে, যেন সে তোমাকে দেখেছে এবং তোমার সম্পর্কে শুনেছে। اَلَا لَمَعِي শব্দের অর্থ- প্রখর মেধাবী। এর পরবর্তী সিফাতগুলো তার অর্থকে প্রকাশ করছে এবং স্পষ্ট করে তুলেছে। কিন্তু এটি (তারকীবের মধ্যে) মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। কেননা, এটি হয়তো পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিতে যে ان রয়েছে তার খবর। পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিটি হচ্ছে اَلَّذِي جَمَعَ السَّامَةَ وَالْبِرَّ وَالتَّقَى جَمْعًا (অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি যথার্থভাবে দানশীলতা, আভিজাত্য, সততা এবং আল্লাহভীরুতাকে একত্রিত করেছে) অথবা এটি ان-এর ইসমের সিফাত হিসেবে মানসূব হয়েছে। অথবা এটি উহ্য اعنى দ্বারা মানসূব হয়েছে।

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا وَضْفُهُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের تَوَابِع আসা তার আরেকটি অবস্থা, تَوَابِع মোট পাঁচ প্রকার। প্রথমটি হচ্ছে সিফাত বা না'ত। লেখক তাবে'সমূহের মধ্য থেকে সিফাত দ্বারা আলোচনা শুরু করেছেন, যেহেতু তাবে'র আলোচনা সিফাত দ্বারাই শুরু হয়, সাধারণ রীতি অনুসারে। মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট হোক, উভয় অবস্থায় সিফাত মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা হয়।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, الرصف শব্দটির ব্যবহার দু'ধরনের : ১ বিশেষ তাবে' যা তারকীবের মধ্যে সিফাত হয়ে থাকে ২. الرصف তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ সিফাত এবং না'ত (গুণবাচক) হওয়া।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ স্থানে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য করা উত্তম। অর্থাৎ সিফাত এবং না'ত আনা, তাহলে এর তরজমা পরবর্তীতে বর্ণিত অন্যান্য তাবে'-এর তরজমার সাথে মিলবে। কেননা, তিনি পরবর্তীতে بدل প্রসঙ্গে বলেছেন أَمَّا তারপর বয়ান সম্পর্কে বলেছেন أَمَّا بَيَّأْتُ সেগুলো যেমন (বদল আনা, তার বয়ান আনা) মাসদারের অর্থ দিচ্ছে এটাও (সিফাত আনা) ঠিক এমনই অর্থ দিচ্ছে।

قَوْلُهُ فَلْيَكُونِ الْخ : এ বাক্যটি দ্বারা তিনি সিফাত আনার কারণ উল্লেখ করেছেন। তবে মুসান্নিফ (র.) প্রথমে كونه-এর সর্বনাম সম্পর্কে বলেন, সর্বনামটির مرجع হবে وصف তবে তা হবে আভিধানিক অর্থে, পারিভাষিক সিফাত নয়। কারণ, ইতঃপূর্বে وصف শাব্দিক অর্থে অতিবাহিত হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাধারণ ব্যাখ্যা অনুসারে উক্ত مرجع বলা হলেও উত্তম কথা হচ্ছে كونه-এর সর্বনামটি শাব্দিক অর্থের وصف-এর দিকে নয়; বরং পারিভাষিক সিফাতের দিকে। কেননা, মুসনাদ ইলাইহের বিবরণদাতা, অর্থ উদ্ঘাটনকারী ও পরিচয় দানকারী হয় পারিভাষিক সিফাত, আভিধানিক অর্থে وصف তা হয় না।

তবে এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, اما وصف-এর মধ্যে আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা আর সর্বনামের মধ্যে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা কিভাবে বিস্তৃত হতে পারে। কারণ, বিশেষ্য বা مرجع এবং তার সর্বনাম দ্বারা দু'ধরনের উদ্দেশ্য হয়ে যাচ্ছে, যা রীতি বিরুদ্ধ কাজ। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, এটি করা হয়েছে ইলমে বদী'র একটি নিয়মের অনুসরণে, নিয়মটি হলো-صَنَعْتَ اسْتِخْدَام আর এর ব্যাখ্যা হচ্ছে- কোনো শব্দের দু'টি অর্থ থাকবে। শব্দটি উল্লেখ করা হলে তার একটি অর্থ উদ্দেশ্য হবে, আর তার সর্বনাম উল্লেখ করলে অন্য অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। এখানে صَنَعْتَ اسْتِخْدَام মোতাবেক কাজ করা হয়েছে।

মূল লেখক মুসনাদ ইলাইহের সিফাত আনার কারণ সম্পর্কে বলেন, তা মুসনাদ ইলাইহকে স্পষ্ট করে এবং এর অর্থ বর্ণনা করে। যেমন- তুমি বললে قَرَأْتُ يَسْفُلُهُ এ বাক্যে الجسم হলো মুসনাদ ইলাইহ মাওসুফ, তার সিফাত হচ্ছে তিনটি عَمِيقٌ، عَرِيزٌ، طَوِيلٌ এ তিনটি সিফাত শরীরের পরিচয় দান করছে এবং এর বর্ণনা দিচ্ছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, সিফাত যেমনভাবে মুসনাদ ইলাইহের গুণাগুণ বর্ণনা করে তেমনি তা মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য বিশেষ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে। যেমন-كَانَ قَدْ رَأَى وَكَذَلِكَ سَمِعَا * কবিতায় لا لَمَعِي الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ * শব্দের অর্থ প্রচণ্ড দীপ্তির অধিকারী ও প্রখর মেধাবী। এটি মাওসুফ, তার সিফাত হলো الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ এটি তার মাওসুফের অর্থকে স্পষ্ট করছে। মেধাবী এবং প্রখর দীপ্তির অধিকারী ব্যক্তি এমন যে, তোমার সম্পর্কে তার ধারণা তোমাকে দেখা ও তোমার সম্পর্কে শোনার মতো হয়ে যায়।

الشَّمْعِي শব্দটি বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ হয়নি। এতে দু'ধরনের ই'রাবের সম্ভাবনা রয়েছে- ১. তা পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিতে উল্লিখিত إِنْ حَرَزَ مُشَبَّهً بِالْفِعْلِ -এর খবর হিসেবে মারফু' হয়েছে, ২. অথবা পূর্ববর্তী ان-এর اسم-এর সিফাত রূপে মানসূব। কারো মতে এটি اعْنَى উহা ফে'লের মাফউল হিসেবে মানসূব হবে।

পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিতে হচ্ছে إِنْ الَّذِي جَمَعَ السَّاحَةَ وَالنَّجْدَةَ وَالْبَرَّ وَالتَّقَى جَمْعًا মোটকথা হচ্ছে المعنى শব্দটি মারফু' বা মানসূব যাই হোক না কেন, এটি তারকীবে মুসনাদ ইলাইহ হয়নি।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের অবস্থাসমূহের মধ্যে এর تابع ব্যবহার করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইবারতে تابع-এর প্রথম تابع তথা صفت নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

وصف শব্দের দু'টি অর্থ- ১. গুণ বর্ণনা করা (অর্থাৎ مصدرى), ২. বাক্যের মধ্যে صفت (تابع) হওয়া। মূল লেখকের ইবারতে وصف-এর মধ্যে প্রথম অর্থে, আর ফলকونه-এর মধ্যে দ্বিতীয় অর্থে صَنَعْتَ اسْتِخْدَام রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের صفت হয়েছে এর উদাহরণ হচ্ছে أَلَجِسْمُ الطَّوْنُ الْعَرِيزُ الْعَمِيقُ يَخْتَجُّ عَمِيقًا এ বাক্যে الجسم হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ মাওসুফ, এরপর তিনটি صفت আনা হয়েছে। মুসনাদ ইলাইহ নয় এমন শব্দের صفت ব্যবহার করার একটি উদাহরণ মুসান্নিফ (র.) দিয়েছেন, যেমন-كَانَ قَدْ -كَانَ قَدْ * كَبِيتَايَ لَا لَمَعِي الَّذِي يَظُنُّ بِكَ الظَّنَّ * এ কবিতায় لَا لَمَعِي শব্দ মাওসুফরূপে ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু এটি বাক্যে মুসনাদ ইলাইহ হয়নি।

উল্লেখ্য যে, উভয় স্থানে صفت-কে ব্যবহার করা হয়েছে সুস্পষ্ট বিবরণ দানকারী ও অর্থ প্রকাশকারী হিসেবে।

أَوْ لِيَكُونَ الْوَصْفُ مُخَصَّصًا لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَى مُقَلِّلًا إِشْتِرَاكَهُ أَوْ رَافِعًا إِحْتِمَالَهُ وَفِي
عُرْفِ النَّحَاةِ التَّخْصِصُ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْلِيلِ الْإِشْتِرَاكِ فِي النَّكِيرَةِ وَالتَّوَضُّيْحُ عَنْ رَفْعِ
الْإِحْتِمَالِ الْحَاصِلِ فِي الْمَعَارِفِ نَحْوُ زَيْدٍ التَّاجِرُ عِنْدَنَا فَإِنَّ وَصْفَهُ بِالتَّاجِرِ يَرْفَعُ
إِحْتِمَالَ غَيْرِهِ أَوْ لِيَكُونَ الْوَصْفُ مَذْحًا أَوْ ذَمًّا نَحْوُ جَاءَ بَنِي زَيْدٍ الْعَالِمُ أَوْ الْجَاهِلُ حَيْثُ
يَتَعَيَّنُ الْمَوْصُوفُ أَغْنَى زَيْدًا قَبْلَ ذِكْرِهِ أَى ذِكْرِ الْوَصْفِ وَإِلَّا لَكَانَ الْوَصْفُ مُخَصَّصًا أَوْ
لِيَكُونَ تَاكِيدًا نَحْوُ أَمْسٍ الدَّابُّرِ كَانَ يَوْمًا عَظِيمًا فَإِنَّ لَفْظَ أَمْسٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الدُّبُورِ وَقَدْ
يَكُونُ الْوَصْفُ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ وَتَفْسِيرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ
يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ حَيْثُ وَصَفَ دَابَّةً وَطَائِرًا بِمَا هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْجِنْسَيْنِ لِبَيَانِ أَنَّ الْقَصْدَ
مِنْهُمَا إِلَى الْجِنْسِ دُونَ الْفَرْدِ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ أَفَادَ هَذَا الْوَصْفُ زِيَادَةَ التَّعْمِيمِ وَالْإِحَاطَةِ -

অনুবাদ : অথবা সিফাত মুসনাদ ইলাইহের জন্য সীমাবদ্ধকারী হওয়ার কারণে। অর্থাৎ তার অংশীদার কমিয়ে দিবে অথবা ভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা দূরকারী হবে। নাহবিদদের পরিভাষায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের ক্ষেত্রে তাখসীস বলা হয় অংশীদার কমানোকে। আর নির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বহু অর্থের সম্ভাবনাকে দূর করা। যেমন ব্যবসায়ী যায়েদ আমাদের কাছে রয়েছে। এখানে ব্যবসায়ী শব্দটি দ্বারা (সীমাবদ্ধ করা এবং) সিফাত বর্ণনা করাতে অন্য (যায়েদ)-এর সম্ভাবনাকে রহিত করে দিয়েছে। অথবা সিফাত প্রশংসাসূচক অথবা নিন্দাসূচক হওয়ার কারণে। যেমন- আমার কাছে আলিম যায়েদ এসেছে অথবা মূর্খ যায়েদ এসেছে। যখন মাওসূফ এমনিতে সুনির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ যায়েদ তার সিফাত উল্লেখ করার আগ থেকেই পরিচিত। আর যদি এমন না হয় তাহলে তা তাখসীসকারী অথবা তাকিদকারী। যেমন- **أَمْسٍ الدَّابُّرِ كَانَ يَوْمًا عَظِيمًا** অর্থাৎ পেছনের দিন গতকাল ছিল বিশাল বড় দিন। **امس** (গতকাল) শব্দটি অতীতের প্রতি দিকনির্দেশ করছে। কখনো সিফাতের ব্যবহার হয়ে থাকে উদ্দেশ্যের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দানের জন্য- যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী স্থলভাগে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে এবং পাখি যারা তাদের দু'ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায় (আয়াতে আল্লাহ তা'আলা) **دَابَّةٌ** এবং **طَائِرٌ** শব্দদ্বয়ের সিফাত এনেছেন এমন বিষয় দ্বারা যা এ দু'টির সাথেই খাস। (আর এটা করেছেন) এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, এ দু'টি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জিনস, কোনো **فرد** এখানে উদ্দেশ্য নয়। এ ভিত্তিতে এ সিফাতটি অধিক ব্যাপকতার এবং সকল সদস্যকে পরিবেষ্টন করে নেওয়ার অর্থ দেবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ لِيَكُونَ الْوَصْفُ الخ লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে তাখসীস করার জন্য তার সিফাত যুক্ত করা হয়। ইলমে বয়ানের বিশেষজ্ঞদের মতে, অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে তাখসীসের অর্থ হচ্ছে তার অংশীদার কমিয়ে দেওয়া এবং কোনো অর্থকে সংকীর্ণ করে দেওয়া। যেমন- **رَجُلٌ عَالِمٌ عِنْدَنَا** অর্থাৎ আলিম ব্যক্তি আমাদের কাছে। **رجل** শব্দটি আলিম বা আলিম নয়, এমন সকল পুরুষকেই অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু **عالم** বলার সাথে সাথে আলিম নয় এমন ব্যক্তি **جل** থেকে বের হয়ে গেছে। অতএব, **عالم** সিফাতটি পুরুষের অংশীদার কমিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের অংশীদার কমানোকেই তাখসীস বলা হয়।

আর যদি মুসনাদ ইলাইহ নিদিষ্ট হয় তাহলে সিফাত সেই নিদিষ্ট বিশেষ্যের অস্পষ্টতা দূর করে দেয় এবং একই নাম বিশিষ্ট ভিন্ন বিশেষ্য হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করে। যেমন- খালিদ নামক দু'জন ব্যক্তি আছে, এদের একজন আলিম অপর জন ব্যবসায়ী। এমতাবস্থায় যখন তুমি বলবে **خَالِدُ الْعَالِمِ عِنْدَنَا** তখন আলিম সিফাতটি তার ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করল এবং খালিদকে আলিমের সাথে নির্দিষ্ট করে ফেলল।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইলমে বয়ানের বর্ণনা মতে **تَفْصِيلٌ** ১. দু'টি কাজ : ১. **رَفْعُ الْإِخْتِمَالِ** ২. **الِإشْتِرَاكِ** পক্ষান্তরে নাহবিদদের মতে, তাখসীস শুধুমাত্র অনিদিষ্ট বিশেষ্যের মাঝে হতে পারে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অংশীদার কমানোকে তাখসীস বলা হয়। আর নির্দিষ্ট বিশেষ্যের অস্পষ্টতা দূর করাকে **تَوْضِيعٌ** বলা হয়। এটিকে তারা তাখসীস বলেন না। অথবা সিফাত শব্দের প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়, এমননিভাবে শব্দের নিন্দা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছে **جَاءَنِي زَيْدُ الْعَالِمِ** আমার কাছে জ্ঞানী যায়েদ এসেছে। এ উদাহরণে **الْعَالِمِ** শব্দটি সিফাত, যা যায়েদের প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ **جَاءَنِي زَيْدُ الْجَاهِلِ** অর্থাৎ আমার কাছে মূর্খ যায়েদ এসেছে। এ বাক্যে **الْجَاهِلِ** শব্দটি সিফাত হয়েছে, যা যায়েদের নিন্দা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সিফাত প্রশংসা কিংবা নিন্দার অর্থে তখনই ব্যবহৃত হবে যখন বাক্যের মাওসূফের সিফাত সম্পর্কে আগ থেকে জানা থাকে এবং মাওসূফ নির্দিষ্ট থাকে। আর যদি মাওসূফ নির্দিষ্ট না থাকে তাহলে সিফাত তাখসীসের অর্থে হবে প্রশংসাসূচক কিংবা নিন্দাসূচক হবে না।

কখনো মুসনাদ ইলাইহের তাকিদের জন্য সিফাত আনা হয়। এখানে তাকিদ দ্বারা পারিভাষিক তাকিদ উদ্দেশ্য নয় এবং অর্থগত তাকিদ উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাকিদ দ্বারা শাব্দিক তাকিদ উদ্দেশ্য। সিফাত তাকিদের হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ উক্ত সিফাতের অর্থ ধারণ করতে হবে। অন্যথা সিফাত তাকিদের জন্য হবে না। কেননা, মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে উক্ত সিফাতের অর্থ থাকলেই কেবল মুসনাদ ইলাইহের জন্য সিফাত তাকিদকারী হবে। যেমন- **أَمْسِ الدَّائِرُ كَانَ يَوْمًا** এ উদাহরণে **أَمْسِ** হলো মুসনাদ ইলাইহ, **الدَّائِرُ** হলো তার সিফাত **دَائِر** অর্থ- অতীত, আর **أَمْسِ** অর্থও অতীত ও গত। অতএব, **الدَّائِرُ** এখানে **أَمْسِ**-এর তাকিদ হবে। কখনো মুসনাদ ইলাইহের উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য এবং তার ব্যাখ্যা করার জন্য সিফাত আনা হয়, যেমন- **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ** -আয়াতের মধ্যে **فِي الْأَرْضِ** সিফাত হয়েছে **دَابَّة**-এর এবং **يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ** সিফাত হয়েছে **طَائِر**-এর, দু'টি সিফাত তার মাওসূফের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে যে, এখানে **دَابَّة** এবং **طَائِر** দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য। কেননা, এখানে উল্লিখিত শব্দগুলো দ্বারা এমন সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের জিনসের সাথে খাস। অতএব, এখানে জিনস উদ্দেশ্য, **فرد** উদ্দেশ্য নয়। তাই আয়াতের ভরজমা হবে : বিচরণশীল প্রাণীর জিনসের মধ্য হতে এমন বিচরণশীল প্রাণী নেই এবং পাখির জিনসের মধ্য হতে এমন কোনো পাখি নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি; বরং প্রত্যেকের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেহেতু এখানে সিফাত দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য তাই সিফাত এখানে সব সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং জিনসের কোনো সদস্যই বাদ পড়বে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. সিফাত কখনো তার মুসনাদ ইলাইহ মাওসূফকে খাস বা সংকীর্ণ করে। **تَفْصِيلٌ** ১. দু'টি কাজ : ১. **رَفْعُ الْإِخْتِمَالِ** ২. **الِإشْتِرَاكِ** যেমন- **زَيْدُ النَّاجِرِ عِنْدَنَا** যেমন- **رَفْعُ الْإِخْتِمَالِ**

খ. কখনো **صِفَت** ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহের প্রশংসা কিংবা নিন্দা করার জন্য। যেমন-

جَاءَنِي زَيْدُ الْعَالِمِ أَوْ الْجَاهِلِ

গ. কখনো **صِفَت** ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র তাকিদের জন্য। যেমন- **أَمْسِ الدَّائِرُ كَانَ يَوْمًا عَظِيمًا**

ঘ. কখনো সিফাত তার মাওসূফের দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করে। যেমন-

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ

وَأَمَّا تَوَكِيدُهُ أَى تَوَكِيدُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِلتَّقْرِيرِ أَى لِتَقْرِيرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَى تَحْقِيقِ
مَفْهُومِهِ وَمَذْلُولِهِ أَعْنَى جَعْلِهِ مُقَرَّرًا مُحَقَّقًا ثَابِتًا بِحَيْثُ لَا يُظَنُّ بِهِ غَيْرُهُ نَحْوُ جَاءَنِي
زَيْدٌ زَيْدٌ إِذَا ظَنَّ الْمُتَكَلِّمُ غَفْلَةَ السَّامِعِ عَنْ سَمَاعِ لَفْظِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ عَنْ حَمْلِهِ
عَلَى مَعْنَاهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ تَقْرِيرُ الْحُكْمِ نَحْوُ أَنَا عَرَفْتُ أَوْ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ نَحْوُ أَنَا
سَعَيْتُ فِى حَاجَتِكَ وَحَدَى أَوْ لَا غَيْرِى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَاكِيدِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فِى
شَيْءٍ وَتَاكِيدُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ لِتَقْرِيرِ الْحُكْمِ قَطُّ وَسَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا أَوْ دَفِيعَ
تَوَهُمِ التَّجَوُّزِ أَى التَّكَلُّمِ بِالْمَجَازِ نَحْوُ قَطَعَ اللَّصَّ الْأَمِيرُ الْأَمِيرُ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ عَيْنُهُ
لِثَلَا يُتَوَهُمُ أَنَّ إِسْنَادَ الْقَطْعِ إِلَى الْأَمِيرِ مَجَازٌ وَإِنَّمَا الْقَاطِعُ بَعْضُ غُلَمَانِهِ أَوْ لِدَفِيعِ
تَوَهُمِ السَّهْوِ نَحْوُ جَاءَ نِى زَيْدٌ زَيْدٌ لِثَلَا يُتَوَهُمُ أَنَّ الْجَائِيَّ غَيْرُ زَيْدٍ وَإِنَّمَا ذِكْرُ زَيْدٍ
عَلَى سَبِيلِ السَّهْوِ أَوْ لِدَفِيعِ تَوَهُمِ عَدَمِ الشُّمُولِ نَحْوُ جَاءَ نِى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُونَ
لِثَلَا يُتَوَهُمُ أَنَّ بَعْضَهُمْ لَمْ يَجِئْ إِلَّا أَنَّكَ لَمْ تَعْتَدَ بِهِمْ أَوْ إِنَّكَ جَعَلْتَ الْفِعْلَ الْوَاقِعَ مِنْ
الْبَعْضِ كَالْوَاقِعِ مِنَ الْكُلِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ فِى حُكْمٍ شَخْصٍ وَاحِدٍ -

অনুবাদ : আর মুসনাদ ইলাইহকে (তাকিদ দ্বারা) তাকিদযুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে শক্তিশালী করার জন্য। অর্থাৎ তার অর্থ ও ভাব সুনিশ্চিত করার জন্য। অর্থাৎ একে শক্তিশালী, সুনিশ্চিত এবং প্রমাণিত করা যাতে তা দ্বারা অন্যকে ধারণা না করা হয়, যেমন- جَاءَنِي زَيْدٌ (এভাবে বলা হয়) যখন বক্তা শ্রোতাকে মুসনাদ ইলাইহের শব্দটি শোনার ব্যাপারে অথবা তার গ্রহণ করার ব্যাপারে উদাসীন মনে করে। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা বিষয়কে মজবুত করা হয়। যেমন- أَنَا عَرَفْتُ (আমি চিনলাম)। অথবা মুসনাদ ইলাইহকে মজবুত করার জন্য, যেমন আমি একাই তোমার প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা করেছি অথবা আমিই চেষ্টা করেছি, আমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। এ উদাহরণে আপত্তি আছে- কেননা, এটি মোটেও মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ নয়। কারণ, মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ কখনো খবর বা বিষয়কে মজবুত করার জন্য হবে না। এ ব্যাপারে লেখক স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন। অথবা রূপকার্থে ব্যবহৃত হওয়ার ধারণাকে দূর করবে। অর্থাৎ রূপকভাবে বলা, যেমন- আমির চোরের হাত কেটেছেন- তিনি স্বয়ং ও নিজে কেটেছেন ইত্যাদি। (এখানে তাকিদ ব্যবহার করা হয়েছে) যাতে কেউ ধারণা না করে হাতকাটার নিসবত আমিরের দিকে রূপকার্থে হয়েছে, প্রকৃত কর্তনকারী হচ্ছে তার কোনো এক কৃতদাস। অথবা ভুল করার ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য। যেমন- جَاءَنِي زَيْدٌ এ উদাহরণের ব্যাপারে (অর্থাৎ তাকিদ না থাকা অবস্থায়) যেন ধারণা না করা হয় যে, আগমনকারী যাদের ছাড়া অন্য কেউ ভুলে যায়েদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। অথবা সকলেই অন্তর্ভুক্ত নয় এ ধারণা দূর করার জন্য। যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُونَ যাতে এ ধারণা না হয় যে, কতিপয় লোক আসেনি, তবে আপনি তাদের বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন না অথবা আপনি কতিপয় লোক দ্বারা সংঘটিত কাজকে সকলের কাজ সাব্যস্ত করলেন এই ভিত্তিতে যে, তারা সকলে সম্মিলিতভাবে একজন লোকের সমপর্যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَوْكِيدُهُ الخ : এখান থেকে তাবের দ্বিতীয় প্রকার 'তাকিদ'-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো তার তাকিদ ব্যবহার করা। তাকিদ আনা হয় মুসনাদ ইলাইহের অর্থকে সুনিশ্চিত এবং সন্দেহমুক্ত করার জন্য। তিনি বলেন, তাকিদ হলো মুসনাদ ইলাইহকে এমনভাবে মজবুত ও নিশ্চিত প্রমাণিত করা যে, শ্রোতা মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে না পারে। যেমন- কেউ বলল, جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ অর্থাৎ আমার কাছে যায়দই এসেছে। এ বাক্যের দ্বিতীয় যায়দটি তাকিদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের তাকিদযুক্ত বাক্য বলার ক্ষেত্র সাধারণভাবে দু'টি- ১. শ্রোতা সম্পর্কে বক্তা যখন ধারণা করবে যে, সে মুসনাদ ইলাইহের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছে না, ২. যখন বক্তা শ্রোতা সম্পর্কে ধারণা করবে যে, সে মুসনাদ ইলাইহের হাকিকী অর্থ গ্রহণ করছে না।

যেমন কেউ বলল جَاءَ اسْدٌ, বক্তা এ কথা বলে বুঝতে পারল যে, শ্রোতা اسد দ্বারা প্রকৃত সিংহকে বুঝছে না; বরং সে সিংহ দ্বারা কোনো বীর শক্তিশালী মানুষকে বুঝছে; এমতাবস্থায় বক্তা তাকিদের সাথে বলল- جَاءَ اسْدٌ اسْدٌ।

قَوْلُهُ أَعْنِي جَعَلَهُ مُقَرَّرًا : মুসান্নিফ (র.) বলেন, তাকিদের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে বসিয়ে দেওয়া। শুধুমাত্র অস্পষ্টতা দূর করা নয়; যাতে শ্রোতা কোনোভাবেই (মুসনাদ ইলাইহ ব্যতীত) অন্য কিছু ধারণা না করতে পারে।

قَوْلُهُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ تَقْرِيرُ الْحُكْمِ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের التقرير শব্দটিকে অনেকে تقرير حكم বলেন, অনেকে আবার تقرير معكوم عليه বলে থাকেন।

قَوْلُهُ أَنَا عَرَفْتُ -এর উদাহরণ হচ্ছে- حكم-এর ইসনাদ দু'বার হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ইসনাদ প্রথম ইসনাদের তাকিদ হয়েছে।

قَوْلُهُ أَنَا سَعَيْتُ فَنِي حَاجَتِكَ وَخِذْنِي أَوَّلًا غَيْرِي :এর উদাহরণ হচ্ছে- تقرير معكوم عليه-এর উদাহরণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, تقرير معكوم عليه-এর উদাহরণের প্রতি আপত্তি রয়েছে। কেননা, وحدي এবং لا غيري এখানে মুসনাদ ইলাইহকে তাকিদ করেনি। কেননা, وحدي তারকীবের মধ্যে حال হয়েছে, আর لا غيري ওলা মুসনাদ ইলাইহের উপর আতফ হয়েছে। আর حال এবং معطوف কখনোই পারিভাষিক তাকিদ হতে পারে না। আর যদি তাকিদ দ্বারা শাব্দিক তাকিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও এখানে মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ হয়নি। এখানে বরং মুসনাদ ইলাইহ তার যথাস্থানের আগে আসার কারণে তাতে যে তাখসীস হয়েছে উক্ত তাখসীসের তাকিদ হয়েছে। মোটকথা, কতিপয় লোকদের দাবি تقرير معكوم عليه তো সঠিক। কিন্তু তাদের দেওয়া উদাহরণ উক্ত দাবির প্রমাণ নয়।

قَوْلُهُ وَتَأْكِيدُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) কতিপয় লোকদের মতামতকে খণ্ডন করে বলেন, মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ কখনোই হুকুমকে মজবুত করে না। তাদের দেওয়া উদাহরণ أَنَا عَرَفْتُ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনার দ্বারা তার হুকুম শক্তিশালী হয়েছে ইসনাদ দু'বার হওয়ার কারণে। কিন্তু মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ দ্বারা হুকুমের দৃঢ়তা প্রমাণিত হয় না। এর প্রমাণ অচিরেই মূল লেখকের বক্তব্যে আসবে।

মূল লেখক বলেন, কখনো তাকিদ আনা হয় রূপকার্থে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনাকে রহিত করার জন্য। যেমন কেউ বলল, قَطَعَ اللَّصُّ الْأَمِيرُ এটি শাব্দিক তাকিদের উদাহরণ, অর্থগতভাবে তাকিদের উদাহরণ হচ্ছে قَطَعَ اللَّصُّ الْأَمِيرُ-আমির আমির চোরের হাত কেটেছেন, এখানে الامير মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়েছে। যাতে শ্রোতা এ ধারণা না করে যে, হাত আমির কাটেননি; বরং তার কোনো কর্মচারী কেটেছে।

قَوْلُهُ أَوْ لِيُذْفِعَ تَوَهُمَ السَّنْهِ : কখনো ভুলের সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়। অর্থাৎ কখনো শ্রোতা মনে করে মুতাকাল্লিম ভুল করে মুসনাদ ইলাইহ উল্লেখ করেছে, প্রকৃতপক্ষে মুসনাদ ইলাইহ এটা নয়, শ্রোতার এ ধরনের ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে তাকিদের সাথে বর্ণনা করা হয়। যেমন- جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ-আমার কাছে যায়দই এসেছে, এ উদাহরণে দ্বিতীয় যায়দকে উল্লেখ না করা হলে শ্রোতা মনে করত যে, যায়দ প্রকৃত মুসনাদ ইলাইহ নয়। অতএব, যখনই তাকিদের জন্য দ্বিতীয় যায়দকে উল্লেখ করা হলো তখন শ্রোতার এ ধরনের ধারণা থাকবে না; পাল্টে যাবে।

قَوْلُهُ أَوْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الشُّمُولِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহের সাথে তাকিদযুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে সকলে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য। যেমন- جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُونَ অর্থাৎ আমার কাছে গোত্রের সকলেই এসেছে। যদি বলা হতো جَاءَنِي الْقَوْمُ (আমার কাছে গোত্রের লোকেরা এসেছে) তাহলে শ্রোতার মনে এ ধারণা জন্মানোর খুব সম্ভাবনা ছিল যে, গোত্রের সবলোক আসেনি, বেশির ভাগ লোক এসেছে, কিছুলোক আসেনি। বক্তা কিছু লোককে ধর্তব্যের মধ্যে রাখেননি তাই বলে দিয়েছেন গোত্রের লোকেরা এসেছে।

অথবা শ্রোতা গোত্রের সব লোকের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা ও হৃদয়তার কারণে তাদের সকলকে এক দেহের মতো ভেবেছেন। তারপর যখন কতিপয় লোকের আগমন ঘটেছে তিনি সবার প্রতি আগমনের নিসবত করে দিয়েছেন। শ্রোতার এ জাতীয় ধারণাকে দূর করার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে তাকিদের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে جَاءَنِي الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ এ উদাহরণে كلهم এবং اجمعون সবার দ্বারা আগমনের কাজ হওয়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। সুতরাং যখন এদের কোনো একটিকে উল্লেখ করা হবে তখন শ্রোতার মনে কোনোরূপ সন্দেহ থাকবে না।

সার-সংক্ষেপ :

ক. মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ ব্যবহার করা হয় তাকে পরিস্ফুট ও স্পষ্ট করার জন্য। এমন করা হয় যখন মুতাকাল্লিম শ্রোতার অমনোযোগিতা কিংবা ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার মনোভাব লক্ষ্য করে। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَ جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ

খ. কখনো তাকিদ ব্যবহার করা হয় রূপক অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনাকে দূর করার জন্য। যেমন-

قَطَعَ اللَّيْصُ الْأَمِيرُ الْأَمِيرَ

গ. ভুল ধারণা দূর করার জন্য কখনো তাকিদ ব্যবহার করা হয়। যেমন ذَهَبَ خَالِدٌ خَالِدٌ

ঘ. সকলে অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ ধারণাকে দূর করার জন্য তাকিদ ব্যবহার করা হয়। যেমন-

جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ أَوْ أَجْمَعُونَ

وَأَمَّا بَيَانُهُ أَيْ تَعْقِيبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِعَطْفِ الْبَيَانِ فَلِإِيضَاحِهِ بِإِسْمٍ مُخْتَصٍّ بِهِ نَحْوُ قَدِمَ صَدِيقُكَ خَالِدٌ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَوْضَحُ لِحَوَازِ أَنْ يَخْصَلَ الْإِيضَاحُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَقَدْ يَكُونُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمٍ يُخْتَصُّ بِهِ كَقَوْلِهِ ع وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِدَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا * فَإِنَّ الطَّيْرَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِدَاتِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ اسْمًا مُخْتَصًّا بِهَا وَقَدْ يَجِيءُ عَطْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْإِيضَاحِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَشَافِ أَنَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْكَعْبَةِ جِيءَ بِهِ لِلْمَدْحِ لَا لِلْإِيضَاحِ كَمَا يَجِيءُ الصِّفَةُ لِدَلِيلِكَ -

অনুবাদ : আর মুসনাদ ইলাইহের পর আতফে বয়ান যুক্ত করা এমন নামবাচক বিশেষ্য দ্বারা, যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস। (এটা করা হয়) তাকে স্পষ্ট করার জন্য। যেমন- তোমার বন্ধু খালিদ এসেছে। দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ আতফে বয়ান মাতবু'-এর চেয়ে) স্পষ্টতর হওয়া আবশ্যিক নয়। কেননা, উভয়টির সম্মিলনে স্পষ্ট হওয়া সম্ভব। কখনো আতফে বয়ান হয় এমন বিশেষ্য দ্বারা যার সাথে মুসনাদ ইলাইহ খাস নয়। যেমন কবির উক্তি : ঐ সত্তার কসম, যিনি নিরাপত্তা দানকারী আশ্রয়প্রার্থী পাখিদেরকে যাদেরকে স্পর্শ করে। এখানে طير শব্দটি عَائِدَات-এর আতফে বয়ান; অথচ طير (পাখি) এমন বিশেষ্য নয়, যা তার সাথে খাস। কখনো আতফে বয়ান ব্যবহৃত হয় স্পষ্টকরণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষিত ঘর কা'বাকে মানুষের অবস্থানের স্থান করেছেন। তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকার (আল্লামা যমখশরী) বলেন, الْبَيْتُ الْحَرَامُ (সংরক্ষিত ঘর) কা'বা শব্দের আতফে বয়ান। এটিকে আনা হয়েছে প্রশংসার উদ্দেশ্যে, স্পষ্টকরণের জন্য নয়। যেমন প্রশংসার জন্য সিফাত ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا بَيَانُهُ : উল্লিখিত ইবারতে লেখক মুসনাদ ইলাইহের অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশ্যে আরেকটি তাব'এর উল্লেখ করেছেন। এ প্রকারটির নাম হলো عَطْفُ الْبَيَانِ। মুসনাদ ইলাইহের জন্য তখনই আতফে বয়ান আনা হয়, যখন উদ্দেশ্য হয় মুসনাদ ইলাইহকে এমন বিশেষ্য দ্বারা পরিচিত করা, যে বিশেষ্য মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস, যেমন- قَدِمَ صَدِيقُكَ خَالِدٌ এ উদাহরণে صَدِيقُكَ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ। একে خَالِد দ্বারা শ্রোতার সামনে পরিচিত করা হয়েছে। خَالِد হলো এমন বিশেষ্য, যা মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস। কেননা, খালিদ বন্ধুর নাম। আর ব্যক্তির নাম তার সাথে খাস হয়। খালিদ শ্রোতার বন্ধুকে পরিচিত এবং স্পষ্ট করে তুলেছে। কেননা, শ্রোতাকে যখন বলা হলো তোমার বন্ধু এসেছে তখন তার একাধিক বন্ধু থাকার কারণে তার মনে সন্দেহের উদ্ভেক হবে যে, কোন বন্ধু আসল! কিন্তু যখন আতফে বয়ানরূপে খালিদের নাম বলা হলো তখন সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং কোন্ বন্ধু আসল, তা তার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَوْضَحُ : এ বাক্য দ্বারা মূলত মূল লেখকের বক্তব্যের উপর আপত্তি তোলা হচ্ছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, লেখকের বর্ণনার আলোকে মনে হয় আতফে বয়ান মুসনাদ ইলাইহের চেয়ে স্পষ্টতর হবে। কেননা, তিনি বলেছেন, আতফে বয়ান اِيضَاح (স্পষ্ট করা)-এর জন্য আসে। আর মুসনাদ ইলাইহকে তখনই স্পষ্ট করা যাবে, যখন আতফে বয়ান মুসনাদ ইলাইহের চেয়ে স্পষ্টতর হবে এবং মুসনাদ ইলাইহ কম পরিচিত হবে। অথচ আতফে বয়ানের জন্য অধিক পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি উভয়ের সম্মিলনে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলেও চলবে। যেমন খালিদ

নামে অনেক ব্যক্তি আছে। তাদের মধ্যে একজনের ডাক নাম আবু আব্দুল্লাহ। আবু আব্দুল্লাহ অনেকের ডাক নাম আছে; কিন্তু তাদের একজনের নাম খালিদ। এমতাবস্থায় যদি বলা হয় قَدِمَ خَالِدٌ (খালিদ এসেছে।) তাহলে অস্পষ্টতা থাকবে যে, কোন খালিদ আসল। আবার যদি বলা হয় قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ তাহলেও অস্পষ্টতা থাকবে যে, কোন আবু আব্দুল্লাহ আসল। এ পরিস্থিতিতে যদি বক্তা বলে قَدِمَ خَالِدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ তথা আবু আব্দুল্লাহ খালিদ আগমন করেছে। তাহলে এসব অস্পষ্টতা দূর হবে এবং শ্রোতা বুঝতে পারবে যে, সে খালিদ এসেছে যার ডাক নাম আবু আব্দুল্লাহ।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ عَطْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمٍ يَخْتَصُّ بِهِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের বক্তব্যের উপর আরেকটি আপত্তি করেছেন। আপত্তি হচ্ছে- লেখক বলেছেন, আত্বে বয়ান তার এমন বিশেষ্য হবে, যা متبوع (পূর্ববর্তী ইসম)-এর সাথে খাস। কিন্তু তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা, কখনো আত্বে বয়ান এমন বিশেষ্য হয় না যা তার পূর্ববর্তী ইসমের সাথে খাস। যেমন- কবি বলেন, وَالْمُؤْمِنُ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرِ يَنْسَعُهَا এ কবিতার মধ্যে الطير (পাখি) আত্বে বয়ান হয়েছে الْعَائِذَاتِ থেকে। অথচ الطير শব্দটি عَائِذَاتِ-এর সাথে খাস নয়। কেননা, পাখিরা আশ্রয় চায়, আবার অনেক পাখি আশ্রয় চায় না। সুতরাং পাখি মাত্রই আশ্রয়প্রার্থী নয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উক্ত কবিতায় الْعَائِذَاتِ শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ হয়নি; বরং الْمُؤْمِنِ-এর মাফউলে বিহী। এ কবিতাংশ দ্বারা শুধুমাত্র এটা দেখানো উদ্দেশ্য যে, আত্বে বয়ান তার متبوع-এর সাথে খাস হওয়া জরুরি নয়। যেমনটি বলেছেন মূল লেখক।

পুরো শেষেরটি এ রকম- وَالْمُؤْمِنُ الْعَائِذَاتِ الطَّيْرِ يَنْسَعُهَا * رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الْغَيْلِ وَالسَّنْدِ শব্দটি عَائِذَاتِ-এর বহুবচন, অর্থ- আশ্রয় প্রার্থী। এখানে উদ্দেশ্য পাখিদের সেসব দল যারা হারাম শরীফে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নেয়। কারণ, হারাম শরীফে সব ধরনের শিকার নিষিদ্ধ। الطير তারকীবে আত্বে বয়ান হয়েছে। الْغَيْلِ এবং السَّنْدِ দু'টি স্থানের নাম, যেগুলো হারাম শরীফের দু'পার্শ্বে অবস্থিত। পঙ্ক্তিটির অর্থ- নিরাপত্তা দানকারী প্রভুর কসম, যিনি হারাম শরীফে আশ্রয়গ্রহণকারী পাখিদের স্থান (আশ্রয়) দিয়েছেন।

(পাখিগুলো আক্রান্ত হবে তো দূরের কথা) গাইল ও সানাদের মধ্যবর্তী এলাকায় চলমান মক্কার অভিযাত্রীরা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِيءُ عَطْفُ الْبَيَانِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের উপর তৃতীয় আপত্তিটি করছেন। তার আপত্তিটি হচ্ছে, লেখকের ইবারত দ্বারা অনুমিত হয় যে, আত্বে বয়ান শুধুমাত্র অস্পষ্টতা দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, আত্বে বয়ান কখনো অস্পষ্টতা দূরীকরণ ছাড়া অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ এ আয়াতে الْبَيْتِ الْحَرَامِ-এর আত্বে বয়ান। কিন্তু তা কা'বার অস্পষ্টতা দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কেননা, কা'বা তো এমনতিতেই সকলের কাছে সুপরিচিত ও চিরচেনা। তাফসীরে কাশ্শাফ গ্রন্থের লেখক আল্লামা যমখশরী বলেন, এখানে আত্বে বয়ান অস্পষ্টতা দূর করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সিফাত কখনো তার মাওসুফের প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মূল লেখকের বক্তব্যের উপর মুসান্নিফ (র.)-এর এ তিনটি আপত্তির জবাবে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেছেন, মূল লেখকের বক্তব্য সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল লেখক যা বর্ণনা করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। যদি কখনো এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় সেটা সাধারণ ব্যবহারের ব্যতিক্রম। অতএব, ব্যতিক্রম বা বিরল ব্যবহার লেখকের বক্তব্যের বিপক্ষে দলিল হবে না।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের সাথে আত্বে বয়ান যুক্ত করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে তার সাথে খাস ইসমের দ্বারা সুস্পষ্ট এবং পরিচিত করার জন্য। যেমন- قَدِمَ صَدِيقُكَ خَالِدٌ অর্থাৎ তোমার বন্ধু খালেদ এসেছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখকের ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় ইসমটি স্পষ্টতর হওয়া এবং আত্বে বয়ান তার মাতব্ব'-এর সাথে খাস হওয়া জরুরি। কিন্তু বাস্তবে এরূপ হওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং এরূপ না হওয়া সত্ত্বেও আত্বে বয়ান হতে পারবে।

মূল লেখকের ইবারত দ্বারা এটাও মনে হয় যে, দ্বিতীয় ইসম বা আত্বে বয়ান তার متبوع-কে শুধুমাত্র স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কখনো আত্বে বয়ান তার متبوع-এর প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যেমন- جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

وَأَمَّا الْإِبْدَالُ مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ أَوْ مِنْ إِضَافَةِ الْبَيَانِ أَيْ لِلزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ التَّقْرِيرُ وَهَذَا مِنْ عَادَةِ إِفْتِنَانِ صَاحِبِ الْمِفْتَاحِ حَيْثُ قَالَ فِي التَّأَكِيدِ لِلتَّقْرِيرِ وَهَهُنَا لِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ وَمَعَ هَذَا لَا يَخْلُو عَنْ نُكْتَةٍ لَطِيفَةٍ وَهِيَ الْإِيْمَاءُ إِلَى أَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْبَدْلِ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا بِالنِّسْبَةِ وَالتَّقْرِيرُ زِيَادَةٌ تَحْصُلُ تَبَعًا وَضَمْنًا بِخِلَافِ التَّأَكِيدِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ نَفْسُ التَّقْرِيرِ وَالتَّحْقِيقِ نَحْوُ جَاءَ أَحْوَكُ زَيْدٌ فِي بَدْلِ الْكَلِّ وَيَحْصُلُ التَّقْرِيرُ بِالتَّكْرِيرِ وَجَاءَ نَبِيُّ الْقَوْمِ أَكْثَرُهُمْ فِي بَدْلِ الْبَعْضِ وَسَلِبَ عَمَرُو ثَوْبَهُ فِي بَدْلِ الْإِشْتِمَالِ -

অনুবাদ : কখনো মুসনাদ ইলাইহের বদল ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় অতিরিক্ত সুদৃঢ় করার জন্য। এখানে মাসদারের সম্বন্ধ হয়েছে মাফউলের দিকে। অথবা এটি ইয়াফাতে বয়ানিয়া, অর্থাৎ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য, আর সেটা হচ্ছে অর্থকে মজবুত এবং সুস্পষ্ট করা। এটা মিফতাহ গ্রন্থের লেখকের স্বভাবসুলভ বৈচিত্র্য ইবারতের একটি। কেননা, তিনি তাকিদের মধ্যে বলেছেন لِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ আর এখানে التَّقْرِيرِ এ ছাড়াও এখানে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার রয়েছে। সেটা হচ্ছে বদলের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য হলো এ কথার ইঙ্গিত করা যে, বদল নিসবতের মধ্যে মুখ্য হয়ে থাকে। আর অর্থের দৃঢ়তা অর্জিত হয় অনুগামী হওয়া এবং পরোক্ষভাবে। কিন্তু তাকিদ তার বিপরীত। কেননা, তাকিদের মধ্যে মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দৃঢ়তা এবং নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা। যেমন, তোমার ভাই যায়েদ এসেছে। এটি বদলুল কুলের উদাহরণ। আর অর্থের দৃঢ়তা তাকরারের কারণে হয়েছে। جَاءَ نَبِيُّ الْقَوْمِ أَكْثَرُهُمْ আমার কাছে গোত্রের অধিকাংশ লোক এসেছে। এটি الْبَعْضِ-এর উদাহরণ। سَلِبَ عَمَرُو ثَوْبَهُ-এর উদাহরণ। “আমর তথা তার কাপড় ছিনতাই হয়েছে।” এটি الْإِشْتِمَالِ-এর উদাহরণ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْإِبْدَالُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো এর বদল ব্যবহার করা। বদল হচ্ছে তাব'-এর চতুর্থ প্রকার। বাক্যের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে مُبْدَلٌ مِنْهُ (এবং অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইসম) بدل হচ্ছে তার তাব', বদল ব্যবহার করার কারণ সম্পর্কে লেখক বলেন, فَلِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ অর্থাৎ বদল তার আগের শব্দ (মুসনাদ ইলাইহ)-এর অর্থকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করে।

لِزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ এ যুক্ত শব্দটির ব্যাখ্যায় মুসান্নিফ (র.) বলেন, زيادة শব্দটি মাসদার, এখানে মুযাফ হয়েছে তার ফায়েলের দিকে (যদি زيادة লামিম হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। অথবা তার মাফউলের দিকে মুযাফ হয়েছে। তখন زيادة মুতাআদীরাপে ব্যবহৃত হবে। মুসান্নিফ (র.) শুধুমাত্র দ্বিতীয়টির কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত ইয়াফত ইয়াফতে লামিয়া হবে। আর যদি زيادة শব্দটি এখানে حَاصِلُ الْمَصْدَرِ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে তা التقرير-এর দিকে ইয়াফত হবে বয়ানিয়া হিসেবে। অর্থাৎ বদল আনা হয় অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য আর তা হচ্ছে تقرير।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : কেউ কেউ বলেন, زيادة শব্দটিকে إِضَافَةٌ إِلَى الْمَفْعُولِ বা মাফউলের দিকে সম্বন্ধ হয়েছে- এ কথা বলা ঠিক নয়, কেননা تقرير সাধারণভাবে কোনো শব্দকে দু'বার ব্যবহার করার দ্বারা পাওয়া যায়। তার زيادة-এর জন্য এরপর আরেকটি শব্দ উল্লেখ করা চাই। কিন্তু উল্লিখিত উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ দু'বার উল্লেখ করা হয়নি। আর এটাতো পূর্বেই বলা হয়েছে যে, تقرير হওয়ার জন্য দু'বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অতএব, এখানে তাকরীর হয়নি আর তাকরীর না হলে বদল তাকরীরকে বৃদ্ধি করবে কিভাবে?

এর উত্তর হচ্ছে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাকরীরকে বৃদ্ধি করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়; বরং লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বদল মুসনাদ ইলাইহের অর্থকে দৃঢ় করে। তবে এ তাকরীর বদলের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয়। বদলের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিসবতের মধ্যে তা উদ্দিষ্ট হয়। তার মুবদাল মিনহু উদ্দেশ্য হয় না।

মুসনাদ ইলাইহের তাকরীর ও দৃঢ়তা এখানে উদ্দেশ্যের চেয়ে অতিরিক্ত বিষয়। তাই এখানে এভাবে **زِيَادَةُ التَّفْرِيرِ** হয়েছে।
قَوْلُهُ وَهَذَا مِنْ عَادَةٍ : এ ইবারত দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে লেখক তাকিদের অধ্যায়ে বললেন, তাকিদ আনা হয় **(لِلتَّفْرِيرِ)** অর্থের দৃঢ়তার জন্য। আর বদলের আলোচনায় বললেন **لِزِيَادَةِ التَّفْرِيرِ** তার এ দু' বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য কি?

এর উত্তরে বলা হয়েছে, এটি মিফতাহ গ্রন্থের লেখক আল্লামা সাক্বাকীর বর্ণনার ধারা মতে হয়েছে। যেহেতু তালখীসের লেখক তার অনুকরণ করেছেন তাই তিনিও এভাবেই বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সাক্বাকী (র.) এভাবে কেন বর্ণনা করলেন এ প্রশ্ন রয়েছে। এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লামা সাক্বাকী (র.)-এর অভ্যাস হলো ইবারতের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা। তিনি বাক্যের মধ্যে নতুনত্ব ও অভিনব কৌশল ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি বাস্তবে তাই করে থাকেন। এ কারণে তিনি তাকিদের মধ্যে **لِلتَّفْرِيرِ** আর বদলের মধ্যে **لِزِيَادَةِ التَّفْرِيرِ** বললেন। তা ছাড়া এ নতুনত্ব ছাড়াও আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি **زِيَادَةُ** শব্দটি বৃদ্ধি করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, বদলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিসবতের ক্ষেত্রে মুখ্য হওয়া। আর অর্থের দৃঢ়তা বদলের মধ্যে অতিরিক্ত বিষয় যা প্রাসঙ্গিকভাবে এবং অনুগামী হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু তাকিদ তার বিপরীত, তাকিদের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের দৃঢ়তা এবং নিশ্চয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ পার্থক্যের প্রতি দিকনির্দেশ করার জন্য বদলের মধ্যে **زِيَادَةُ** শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১. মোট চার প্রকার : **يَذُلُّ الْكُلَّ** যার সত্তা আর মুবদাল মিনহুর সত্তা সম্পূর্ণ এক। যেমন-**جَاءَنِي أَخُوكَ زَيْدٌ** এ উদাহরণে বদল (যায়েদ) এবং তার মুবদাল মিনহু (তোমার ভাই) একই ব্যক্তি। এতে মুসনাদ ইলাইহ দু'বার ব্যবহার হওয়াতে অর্থের দৃঢ়তা হয়েছে।

২. **يَذُلُّ الْبَعْضُ** যার সত্তা মুবদাল মিনহুর সত্তার কতক অংশ। যেমন-**جَاءَنِي الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ** এ উদাহরণে **أَكْثَرُهُمْ** হলো **يَذُلُّ الْبَعْضُ** যা তার মুবদাল মিনহুর তথা **الْقَوْمِ**-এর একাংশ মাত্র।

৩. **يَذُلُّ الْإِشْتِمَالُ** যা মুবদাল মিনহুর সাথে সম্পর্কিত হয়। আর মুবদাল মিনহু তার বদলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যেমন **سَلِبَ زَيْدٌ ثَوْبَهُ** এ উদাহরণে **ثَوْبَهُ** বদল হয়েছে, যা তার মুবদাল মিনহু-এর সম্পর্কিত বিষয়।

৪. **يَذُلُّ الْغَلَطُ** যা ভুলের পর বলা হয়। যেমন-**جَاءَ زَيْدٌ حِمَارًا** এ উদাহরণে **حِمَارًا** কথটি ভুলে যায়েদ বলার পর বলা হয়েছে। **يَذُلُّ الْغَلَطُ** যেহেতু লেখার ও সাহিত্যমান সম্পন্ন বাক্যে পাওয়া যায় না; বরং তা কেবলই সাধারণ মানুষের মৌখিক কথায় ব্যবহৃত হয় তাই লেখক এটিকে তার আলোচনায় পরিহার করেছেন।

সার-সংক্ষেপ :

মুসনাদ ইলাইহের **يَذُلُّ** ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে খুব ভালোভাবে সুস্পষ্ট করার জন্য। **يَذُلُّ** মোট চার প্রকার মূল লেখক তিন প্রকার বদলের উদাহরণ দিয়েছেন-

১. **يَذُلُّ الْكُلَّ**-এর উদাহরণ-**جَاءَ نِي أَخُوكَ زَيْدٌ**
২. **يَذُلُّ الْبَعْضُ**-এর উদাহরণ-**جَاءَ نِي الْقَوْمُ أَكْثَرُهُمْ**
৩. **يَذُلُّ الْإِشْتِمَالُ**-এর উদাহরণ-**سَلِبَ عَمْرُو ثَوْبَهُ**
৪. **يَذُلُّ الْغَلَطُ**-এর উদাহরণ-**رَأَيْتُ زَيْدًا حِمَارًا**

وَيَا نَ التَّقْرِيرِ فِيهِمَا أَنَّ الْمَتَّبِعَ يَشْتَمِلُ عَلَى التَّابِعِ إِجْمَالًا حَتَّى كَانَهُ مَذْكُورًا
أَمَّا فِي الْبَعْضِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْإِشْتِمَالِ فَلِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ يَشْتَمِلَ الْمُبْدَلُ مِنْهُ عَلَى
النَّبْذِ لَا كَاشْتِمَالِ الظَّرْفِ عَلَى الْمَطْرُوفِ بَلْ مِنْ حَيْثُ يَكُونُ مُشْعِرًا بِهِ إِجْمَالًا
مُتَقَاضِيًا لَهُ بِوَجْهِ مَا بِحَيْثُ تَبَقَّى النَّفْسُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ مُتَشَوِّقَةً إِلَى ذِكْرِهِ
مُنْتَظَرَةً لَهُ وَإِلَاجُمْلَةٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَتَّبِعُ فِيهِ بِحَيْثُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ التَّابِعُ نَحْوُ
أَعْجَبَنِي زَيْدٌ إِذَا أَعْجَبَكَ عِلْمُهُ بِخِلَافِ ضَرَبْتَ زَيْدًا إِذَا ضَرَبْتَ حِمَارَهُ وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ
نَحْوَ جَاءَ بَنِي زَيْدٍ أَخُوهُ بَدَلُ غَلَطٍ لَا بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ النُّحَاةِ ثُمَّ بَدَلُ
الْبَعْضِ وَالْإِشْتِمَالِ بَلْ بَدَلُ الْكُلِّ أَيْضًا لَا يَخْلُو عَنْ إِنْضَاجٍ وَتَفْسِيرٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِبَدَلِ
الْغَلَطِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ -

অনুবাদ : এ দু'টির মধ্যে অর্থের দৃঢ়তা (পাওয়া যাওয়ার)-এর বর্ণনা এরূপ যে, মাতবু' তার তাব'কে মৌলিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। অতএব, যেন তাকে (মাতবু'-এর মাধ্যমে) উল্লেখ করা হলো। এ বিষয়টি **بَدَلُ** -এর মাঝে স্পষ্টই। আর **الْإِشْتِمَالِ** **بَدَلُ**-এর মধ্যে এর অর্থ মুবদাল মিনহু অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তবে এটি কোনো পাত্র তার পাত্রস্থ বস্তুকে যেমন ধারণ করে এরূপ নয়; বরং এটি এমন যে, মুবদাল মিনহু এর প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী এবং এর অস্তিত্বকে চায় এমনভাবে যে, যখনই মুবদাল মিনহু উল্লেখ করা হয়, মন তখন এর উল্লেখের প্রতি উদ্দীপ্ত এবং তার অপেক্ষায় থাকে। মোটকথা, মাতবু'টি এরূপ হওয়া আবশ্যিক যে, মাতবু' বলে যেন তাব' উদ্দেশ্য করা যায়। যেমন-**أَعْجَبَنِي زَيْدٌ إِذَا أَعْجَبَكَ عِلْمُهُ** অর্থাৎ আমাকে যায়েদ মুগ্ধ করেছে (এ কথা বলবে) যখন তার জ্ঞান-গরিমা তোমাকে মুগ্ধ করেছে। এর বিপরীত হলো তুমি যায়েদের গাধাকে মেরে বললে, আমি যায়েদকে মেরেছি (কেননা, গাধাকে মেরে গাধার মালিককে মারা বুঝানো হয় না) এ কারণে তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছে **جَاءَ بَنِي زَيْدٍ أَخُوهُ** এ জাতীয় উদাহরণ বদলুল গলত হবে, বদলুল ইশতিমাল হবে না। যেমনটি কতিপয় নাহবিদগণ মনে করে থাকেন। তারপর **بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ**, **بَدَلُ الْبَعْضِ** এমনকি **بَدَلُ الْكُلِّ** কোনোটাই (মুবদাল মিনহুর) ব্যাখ্যা দান করা এবং তাকে সুস্পষ্ট করার কাজ থেকে মুক্ত নয়। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই তার মাতবু'কে সুস্পষ্ট করে থাকে) তিনি বদলুল গলত-এর আলোচনা করেননি। কেননা, তা শুদ্ধ-সাবলীল বাক্যাবলিতে আসে না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيَا نَ التَّقْرِيرِ فِيهِمَا : ইতঃপূর্বে বদলের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে যে, বদলের মধ্যে তার মুবদাল মিনহুর অর্থকে দৃঢ় করার বিষয়টি নিহিত আছে। **تقرير** সাধারণভাবে শব্দকে দু'বার ব্যবহার করার দ্বারা অর্জিত হয়। **بَدَلُ** -এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তাতে মুবদাল মিনহু এবং বদল যেহেতু সত্তাগতভাবে এক, তাই শব্দগত ভিন্নতা সত্ত্বেও অর্থগতভাবে দু'বার উল্লেখ হয়ে যায়। আর এভাবে এতে **تقرير** (দৃঢ়তা) পাওয়া যায়। **بَدَلُ الْبَعْضِ** এবং **بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ** -এর মধ্যে কিভাবে অর্থকে মজবুত এবং শক্তিশালী করা হয় এর আলোচনা চলমান ইবারতের মধ্যে করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) বলেন, **بَدَلُ** বাক্যের মধ্যে **مَتَّبِعٌ** হয়, আর **بَدَل** হয় তার **تَابِعٌ** আর নিয়মানুসারে **مَتَّبِعٌ** তার **تَابِعٌ**-কে সীমিত অর্থে নিজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত রাখে। **بَدَلُ الْبَعْضِ** -এর মধ্যে বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ, **بَدَلُ الْبَعْضِ** -এর মধ্যে মুবদাল মিনহু হয় সমগ্র, আর বদল হয় তার **جزء** (অংশ বিশেষ)। আর একটি পূর্ণাঙ্গ বস্তু তার অংশ বিশেষকে স্বাভাবিকভাবেই शामिल করে।

যেমন- **جَانِبِي الْقَوْمِ أَكْثَرُهُمْ** অর্থাৎ আমার কাছে গোত্রের অধিকাংশ লোক এসেছে। এ উদাহরণে **القَوْم** হলো মুবদাল মিনহু এবং **كُل**, আর **أَكْثَر** হলো বদল এবং উক্ত সমষ্টির একটি অংশ। অতএব, **بَدَلُ الْبَعْضِ** তার মুবদাল মিনহুর মধ্যে উল্লেখ থাকবে। আর বদল যখন মুবদাল মিনহুর মধ্যে উল্লেখ হয় তারপর আবার বদল উল্লেখ করা হলে দু'বার উল্লেখ করা হলো, আর দু'বার উল্লেখের দ্বারা অর্থ শক্তিশালী এবং দৃঢ় হয়। সুতরাং **بَدَلُ الْبَعْضِ**-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের **تقرير** পাওয়া যাচ্ছে।

بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের **تقرير**-এর আলোচনা :

বদলুল ইশতিমালের মধ্যে অন্য বদলের মতো মাতবু' তার তাব'কে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এ অন্তর্ভুক্তকরণ অন্য বদলের মতো নয়। তিনি বলেন, পাত্র যেমন তার মধ্যে অবস্থিত দ্রব্যাদিকে সংরক্ষণ করে তেমনিভাবে মাতবু' বদলুল ইশতিমালকে অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং এভাবে যে, মুবদাল মিনহু বাক্যের মধ্যে উল্লেখ করার পর উক্ত মুবদাল মিনহু তার বদলের সংবাদ দেয় এবং এর প্রতি শ্রোতা আগ্রহী ও আকাজক্ষী থাকে। তাই মুবদাল মিনহু উল্লেখ করার সময় বদলের আকাজক্ষা এবং অপেক্ষা দেখা যায়। পুরো কথাটি সংক্ষেপ করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে মুবদাল মিনহু উল্লেখের দ্বারা বদল উদ্দেশ্য করা যায় এবং মুবদাল মিনহুর স্থানে তাব'কে ব্যবহার করা যায়। এর অর্থ হচ্ছে মাতবু', উল্লেখ করত এর দ্বারা তাব'কে উদ্দেশ্য করা। এতে ফে'লের নিসবত হবে মাতবু'র দিকে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ফে'লের নিসবত তাব'র দিকে করা হয়েছে। যেমন- **أَعَجَبَنِي زَيْدٌ** (যায়েদ আমাকে মুগ্ধ করেছে) **زَيْد** হলো মাতবু'। এটি এখানে এমন একটি সিফাতকে চাচ্ছে যা মূলত মুগ্ধ করার কারণ। কেননা যায়েদ সত্তাগতভাবে মুগ্ধ করার কারণ নয়। অতঃপর বক্তা বলল : **عِلْمُهُ** (তার জ্ঞান), এ কথা শোনার দ্বারা শ্রোতার মন থেকে অপেক্ষার পালা শেষ হলো এবং তার আগ্রহের বিষয় পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে যদি কেউ যায়েদের গাধাকে প্রহার করে আর বদলুল ইশতিমাল হিসেবে বলে **ضَرَبْتُ زَيْدًا حِمَارَهُ** তাহলে এটি বদলুল ইশতিমাল হবে না; বরং এটি **بَدَلُ الْغَلَطِ** হবে। কেননা, এখানে **ضَرَبْتُ زَيْدًا** মাতবু' তার তাব' গাধার প্রহার করার সংবাদ দেয় না এবং যায়েদের প্রহৃত হওয়ার সংবাদ শুনলে তার গাধার প্রহৃত হওয়ার সংবাদের অপেক্ষায় কেউ থাকে না। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম **جَانِبِي زَيْدٍ أَخُوهُ** জাতীয় উদাহরণকে বদলুল গলত বলেন, বদলুল ইশতিমাল বলেন না। অবশ্য আল্লামা ইবনে হাজেবের মতে, এটি বদলুল ইশতিমাল।

সকলের মতে, এটি বদলুল গলত হওয়ার কারণ হলো, উদাহরণের মধ্যে যায়েদকে উল্লেখ করার দ্বারা তার ভাইয়ের সংবাদ দেওয়া হয় না এবং যায়েদের কথা বললে তার ভাইয়ের সংবাদের অপেক্ষায় কেউ থাকে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُ الْبَعْضِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মূল লেখকের উপর আপত্তি তুলে বলেন, তিন ধরনের বদল দ্বারাই তার মাতবু'কে সুস্পষ্ট এবং সন্দেহমুক্ত করা হয়। অতএব, মূল লেখকের ইবারত এরূপ হওয়ার দরকার ছিল- **إِنَّمَا الْإِبْدَالُ مِنْهُ لِيَزِيدَ التَّغْيِيرَ وَالْإِبْطَاحَ** অর্থাৎ তিনি **تقرير** উল্লেখ করলেও **إيضاح** শব্দটি উল্লেখ করেননি।

এর জবাব হচ্ছে লেখক তার ইবারতে **تقرير** শব্দটি উল্লেখ করেছেন, আর **تقرير** অর্থগতভাবে **إيضاح**-কে আবশ্যিক করে। তাছাড়া **إيضاح** এখানে উদ্দেশ্যও নয়, তাই **تقرير** (উদ্দেশ্য)-কে শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ :

মূল লেখক কর্তৃক উল্লিখিত তিন প্রকার **بدل**-এর মধ্যে **متبوع** কে সুস্পষ্ট করার বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। **بَدَلُ الْكُلِّ**-এর মাঝে **مُبَدَّلٌ مِنْهُ** এবং **بدل**-এর অর্থ একই। এখানে **بدل** যে সত্তাকে বুঝায় **مِنْهُ** সেই একই সত্তাকে বুঝায়, তাই এখানে **مُبَدَّلٌ مِنْهُ** উল্লেখ করার পর **بدل**-কে উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে একই সত্তা দু'বার উল্লেখ করা। আর এটা জানা কথা যে, কোনো সত্তাকে দু'বার উল্লেখ করার দ্বারা সে বিষয়টি সুস্পষ্ট ও পরিস্ফুট হয়।

بَدَلُ الْبَعْضِ-এর মাঝে **مُبَدَّلٌ مِنْهُ** তার **بدل**-এর **كُل** বা পূর্ণসত্তা হয় আর **بَدَلُ الْبَعْضِ** হয় তার অংশবিশেষ। সেহেতু **كُل**-এর উল্লেখের দ্বারা তার **بعض**-এর উল্লেখ হয়ে যায়, তাই এর মধ্যেও মুসনাদ ইলাইহকে যেন দু'বার উল্লেখ করা হলো।

بَدَلُ الْإِشْتِمَالِ-এর মধ্যে **مُبَدَّلٌ مِنْهُ** বলার সাথে সাথে **بدل**-এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, ফলে **مُبَدَّلٌ مِنْهُ**-এর উল্লেখটাই **بدل**-এর প্রতি ইঙ্গিতকারী হয়। এভাবে বিবেচনা করলে দু'বারই উল্লেখ করা হলো। প্রথমবার পরোক্ষভাবে দ্বিতীয়বার প্রত্যক্ষভাবে।

وَأَمَّا الْعَظْفُ أَى جَعَلَ الشَّيْءَ مَعْظُوفًا عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلْتَفْصِيلُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
مَعَ اخْتِصَارٍ نَحْوُ جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَعَمَرُو فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا لِلْفَاعِلِ بِأَنَّهُ زَيْدٌ وَعَمَرُو مِنْ
غَيْرِ دَلَالَةٍ عَلَى تَفْصِيلِ الْفِعْلِ بِأَنَّ الْمَجِئِينَ كَانَا مَعًا أَوْ مُتَرَتِّبِينَ مَعَ مُهْلَةٍ أَوْ بِلَا
مُهْلَةٍ وَاخْتِرَزَ بِقَوْلِهِ مَعَ اخْتِصَارٍ عَنْ نَحْوِ جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَجَاءَ نَبِيٌّ عَمَرُو فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا
لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَظْفِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بَلْ مِنْ عَظْفِ الْجُمْلَةِ وَمَا يُقَالُ مِنْ
أَنَّهُ اخْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ جَاءَ نَبِيٌّ عَمَرُو مِنْ غَيْرِ عَظْفٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِذْ لَيْسَ
فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَفْصِيلِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِضْرَابًا عَنِ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ
نَصَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ -

অনুবাদ : তারপর হলো আত্ফ করা। অর্থাৎ কোনো জিনিসকে মুসনাদ ইলাইহের উপর আত্ফ করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করার জন্য। যেমন- **جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَعَمَرُو** অর্থাৎ আমার কাছে যায়েদ এবং আমর এসেছে। এখানে আগমন করার ফায়েলটির বিশ্লেষণ করা হয়েছে (হরফ আত্ফের মাধ্যমে) অর্থাৎ ফায়েল হচ্ছে যায়েদ এবং আমর। এতে ফে'লের ব্যাখ্যার কোনো ইঙ্গিত নেই অর্থাৎ তাদের দু'জনের আগমন একই সাথে হয়েছে নাকি একের পর এক হয়েছে, (দ্বিতীয় জনের আগমন) বিলম্বে না অবিলম্বে। মুসান্নিফ (র.)-এর শব্দ **مَعَ اخْتِصَارٍ**-এর দ্বারা **جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَعَمَرُو** জাতীয় উদাহরণ সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়েছেন। কেননা, এগুলোতে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা থাকলেও এতে মুসনাদ ইলাইহকে অপর মুসনাদ ইলাইহের উপর আত্ফ করা হয়নি; বরং পুরো বাক্যকে আত্ফ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন যে, **مَعَ اخْتِصَارٍ** দ্বারা **جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ** তথা দু'টি আত্ফবিহীন বাক্যের একের পর অপরের সংযুক্তিকে বাদ দেওয়া হয়েছে এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। কেননা, এ জাতীয় বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা নেই; বরং এ সম্ভাবনা আছে যে, দ্বিতীয় বাক্যটি দ্বারা প্রথম বাক্য থেকে সরে আসা হয়েছে। শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী দালাইলুল ই'জাজ গ্রন্থে বিষয়টিকে স্পষ্টত এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْعَظْفُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের তাবে' সম্পর্কিত আরেকটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহের উপর অন্য কোনো ইসমকে আত্ফ করা। আত্ফ করা হয় কয়েকটি কারণে, তন্মধ্যে মুসনাদ ইলাইহকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা বা বিশদভাবে বর্ণনা করা প্রধান কারণ। যেমন- **جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَعَمَرُو** অর্থাৎ আমার নিকট যায়েদ এবং আমর এসেছে। এখানে যায়েদ মুসনাদ ইলাইহের উপর আমরকে আত্ফ করা হয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, যায়েদের সাথে আমরও মুসনাদ ইলাইহ। এ উদাহরণে মুসনাদ তথা ফে'লের কোনো ব্যাখ্যা আসেনি অর্থাৎ তাদের ফে'ল (আগমন) কিভাবে হয়েছে- একের পর এক ধারাবাহিকভাবে না ধারাবাহিকতা ছাড়া। একের পর এক আসলে সামান্য ব্যবধানে নাকি বিলম্বে। এর কোনো কিছুই বর্ণনা করা হয়নি।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, **مَعَ اخْتِصَارٍ**-এর দ্বারা **جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ وَعَمَرُو** জাতীয় উদাহরণগুলো উল্লিখিত আত্ফের আওতা থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ, যদিও এ জাতীয় উদাহরণ-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহের ব্যাখ্যা হয়েছে,

কিন্তু এখানেও مَعَ اِخْتِصَارٍ-এর قيد থাকবে অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে মুসনাদের ব্যাখ্যা করবে, মূল লেখক كذلك দ্বারা مع জাতীয় জা'ইনী زيد وعمرُو بَعْدَهُ يَوْمٌ أَوْ سَنَةٌ দ্বারা قيد এ প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ উদাহরণ বের হয়ে যায়। কারণ, যদিও এ উদাহরণে মুসনাদের ব্যাখ্যা হয়েছে। কিন্তু بَعْدَهُ يَوْمٌ أَوْ سَنَةٌ ও بَعْدَهُ يَوْمٌ ইত্যাদি শব্দ যোগ করার কারণে উক্ত ব্যাখ্যা সংক্ষেপে হয়নি; বরং লম্বা হয়ে গেছে, তাই এটা تَفْصِيلٌ مُسْنَدٌ থেকে বহির্ভূত। اختصار -এর সাথে تَفْصِيلٌ مُسْنَدٌ-এর উদাহরণ হলো جَاءَنِى زَيْدٌ فَعَمَّرُوا أَوْ ثُمَّ عَمَرُوا أَوْ جَاءَنِى الْقَوْمُ حَتَّى فاء, ثُمَّ, فَاء যথাক্রমে এ উদাহরণগুলোর মধ্যে তিনটি حَزَنٌ عَظْفٌ এবং প্রত্যেকটি মুসনাদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সমার্থক অর্থাৎ প্রতিটি حَزَنٌ عَظْفٌ এ কথা বুঝায় যে, প্রথমত مَغْطُوفٌ عَلَيْهِ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং

মুসনাদটি দ্বিতীয়ত معطون দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে তিনটি হরফে আত্ফের মধ্যে সামান্য অর্থগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- معطون সাধারণভাবে معطون-এর কাজ তার مَعْطُون عَلَيْهِ-এর কাজের অব্যবহিত পরে সংঘটিত হওয়া বুঝায়। আর ثم দ্বারা সে ইসমকে আত্ফ করা হয় যে ইসম তার مَعْطُون عَلَيْهِ-এর বেশ পরে মুসনাদকে সংঘটিত করে। আর حتى-এর مَا قَبْلُ তথা مَعْطُون عَلَيْهِ এবং حتى-এর مَا بَعْدُ তথা معطون-এর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণীবিন্যাস হয়। সেই শ্রেণীবিন্যাস দু' ধরনের হতে পারে- ১. حتى-এর مَا قَبْلُ বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর حتى-এর مَا بَعْدُ সে তুলনায় اضعف বা কম গুরুত্বপূর্ণ। ২. حتى-এর مَا قَبْلُ টা اضعف বা কম গুরুত্বপূর্ণ। আর حتى-এর مَا بَعْدُ সে তুলনায় اقوى বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- جَاءَ نَبِيُّ الْقَوْمِ حَتَّى خَالِدٍ এ উদাহরণে যদি খালিদ গোত্রের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয় তাহলে তা দ্বিতীয় প্রকার, আর যদি খালিদ গোত্রের নিম্নশ্রেণীর লোক হয় তাহলে প্রথম প্রকার বলে গণ্য হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এখানে حتى-এর مَا قَبْلُ এবং مَا بَعْدُ-এর মাঝে বাহ্যিক কোনো বিন্যাস বা ধারাবাহিকতা নেই। অর্থাৎ حتى-এর مَا قَبْلُ আগে এবং مَا بَعْدُ পরে মুসনাদকে সংঘটিত করেছে এমন কোনো বিন্যাস্তকরণ হবে না। যেমন উল্লিখিত উদাহরণ তথা جَاءَ نَبِيُّ الْقَوْمِ حَتَّى خَالِدٍ-এর মধ্যে قوم আগে এসেছে আর خالد পরে এসেছে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাস্তবে এর উল্টোও হতে পারে। তাই حتى যুক্ত ইবারত দ্বারা বাহ্যিক কোনো স্তর বিন্যাস হবে না।

যেমন উল্লিখিত উদাহরণ তথা جَاءَ نَبِيُّ الْقَوْمِ حَتَّى خَالِدٍ-এর মধ্যে قوم আগে এসেছে আর خالد পরে এসেছে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাস্তবে এর উল্টোও হতে পারে। তাই حتى যুক্ত ইবারত দ্বারা বাহ্যিক কোনো স্তর বিন্যাস হবে না।

সার-সংক্ষেপ :

আত্ফ কখনো মুসনাদ ইলাইহের মতো মুসনাদের تفصيل করে। আত্ফ দ্বারা জানা যায় যে, মুসনাদ তার মুসনাদ ইলাইহ দ্বারা কখন সংঘটিত হয়েছে। প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি সাথে সাথেই নাকি বিলম্বে? আরো জানা যায় যে, প্রথমটি আগে, দ্বিতীয়টি পরে অথবা প্রথমটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর দ্বিতীয়টি কম গুরুত্ব অথবা তার উল্টো ইত্যাদি।

বি. দ্র. فاء-এর মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ হচ্ছে ترتیب (বিন্যাস্তকরণ) ও تعقيب (অবিলম্বে হওয়া)। حتی-এর মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ হচ্ছে মর্যাদাগত বিন্যাস্তকরণ। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে عطف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ-এর ক্ষেত্রে যা ঘটেছে সাধারণভাবে مَعْطُوف-এর ক্ষেত্রে তাই ঘটা। অতএব, উপরোক্ত তিনটি হরফের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেল।

أَوْ رَدَّ السَّامِعَ عَنِ الْخَطِإِ فِي الْحُكْمِ إِلَى الصَّوَابِ نَحْوُ جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ لَا عَمْرُو لِمَنْ
إِعْتَقَدَ أَنْ عَمْرُو جَاءَكَ دُونَ زَيْدٍ أَوْ أَنَّهُمَا جَاءَكَ جَمِيعًا وَلَكِنْ أَيْضًا لِلرَّدِّ إِلَى الصَّوَابِ
إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِنَفْسِي الشَّرَكَةِ حَتَّى أَنْ نَحْوَمَا جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو إِنَّمَا يُقَالُ لِمَنْ
إِعْتَقَدَ أَنْ زَيْدًا جَاءَكَ دُونَ عَمْرُو لَا لِمَنْ إِعْتَقَدَ أَنَّهُمَا جَاءَكَ جَمِيعًا وَفِي كَلَامِ النَّحَاةِ
مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُقَالُ لِمَنْ إِعْتَقَدَ انْتِفَاءً الْمَجْنِيِّ عَنْهُمَا جَمِيعًا -

অনুবাদ : অথবা শ্রোতাকে হুকুমের ব্যাপারে ভ্রান্তি থেকে (উদ্ধার করে) সঠিক বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করার জন্য (আত্ম করা হয়)। যেমন— (মুতাকাল্লিম বলল) جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ لَا عَمْرُو (আমার কাছে যায়েদ এসেছে আমার নয়) এমন ব্যক্তিকে যে ধারণা করেছে তোমার (মুতাকাল্লিম)-এর কাছে আমার এসেছে; কিন্তু যায়েদ আসেনি। অথবা (সে ধারণা করছে) তোমার কাছে তারা উভয়ে এসেছে। (হরফে আত্ম) لَكِنْ সঠিক বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করার জন্য। তবে তা কোনো বিষয়ের অংশীদার কমানোর অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তাই زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو জাতীয় উদাহরণ কেবল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা যাবে, যে ধারণা করে তোমার কাছে শুধু আমার এসেছে, যায়েদ নয়। ঐ ব্যক্তিকে বলা যাবে না, যে ধারণা করে তারা উভয়ে তোমার কাছে এসেছে। নাহবিদগণের বক্তব্যে যা পাওয়া যায় তাতে ধারণা হয় (لَكِنْ)-এর উপরোক্ত উদাহরণটি) বলা যাবে ঐ ব্যক্তিকে যে উভয়ের না আসারও ধারণা করে।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ رَدَّ السَّامِعَ الخ : উপরোক্ত ইবারতে মূল লেখক আত্মফের ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তা হচ্ছে হরফে আত্ম যদি لا হয়, তাহলে তার কি অর্থ? তিনি বলেন, কখনো আত্ম করা শ্রোতার ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্যে। আর এটা তখনই হয় যখন আত্ম করা হয় لا দ্বারা। যেমন— جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ لَا عَمْرُو মুতাকাল্লিম তার শ্রোতাকে বলল, আমার কাছে যায়েদ এসেছে আমার নয়। মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ জাতীয় উদাহরণ শ্রোতার দু'ধরনের ভুল নিরসনের জন্য আসে— ১. শ্রোতা ধারণা করছে শুধু আমার এসেছে। ২. শ্রোতা ধারণা করছে যায়েদ এবং আমার উভয় এসেছে। যদি প্রথম ধারণার বিপরীতে উল্লিখিত উদাহরণটি বলা হয়, তাহলে তাকে পরিভাষায় قَضَرَ قَلْبٌ বলা হয়। قَلْب শব্দের অর্থ হলো— বিপরীত। যেহেতু এর মাধ্যমে শ্রোতার ধারণার বিপরীত বিষয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাই তাকে قَضَرَ قَلْبٌ বলা হয়। আর যদি শ্রোতার দ্বিতীয় ধারণার বিপরীতে উদাহরণটি পেশ করা হয়, তাহলে তাকে قَضَرَ أَفْرَادٌ বলা হয়। أَفْرَاد শব্দের অর্থ হলো— এক বা একক। শ্রোতার ধারণা মতে কাজটি সংঘটিত হয়েছিল একাধিক লোকের দ্বারা; অথচ বাস্তবে তা ঘটেছে একজন দ্বারা। যেহেতু বক্তা একাধিক ব্যক্তির ধারণাকে বাতিল করে একজনের ব্যাপারে হুকুমকে সাবিত করেছে, তাই একে أَفْرَاد বলা হয়। উভয় অবস্থায় মুতাকাল্লিম শ্রোতার ভুল ধারণার অবসান ঘটিয়ে সঠিক ধারণা দান করছে, তাই رَدَّ السَّامِعَ إِلَى الصَّوَابِ-এর বিষয়টি এখানে পাওয়া গেল।

মুসান্নিফ (র.) এরপর হরফে আত্ম لَكِنْ-এর কথা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, لا-এর মতো لَكِنْও رَدَّ السَّامِعَ إِلَى الصَّوَابِ অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এ দু'টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য হলো لا-এর মধ্যে قَضَرَ قَلْبٌ এবং لَكِنْ-এর মধ্যে قَضَرَ أَفْرَادٌ উভয়টি সম্ভব। আর তার ধারণাকে খণ্ডন করার জন্য এমতাবস্থায় لَكِنْ দ্বারা আত্ম করা যাবে না।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, নাহবিদদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা لَكِنْ-কে قَضَرَ أَفْرَاد-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন— جَاءَ نَبِيٌّ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو তারা বলেন, শ্রোতা যখন উভয়ের না আসার ধারণা করবে তখন ঐ উদাহরণটি পেশ করা যাবে। অতএব, এটি তো قَضَرَ أَفْرَاد হচ্ছে।

মোটকথা, না-বাচকের উদাহরণের মধ্যে বালাগাতবিশারদদের মতে لَكِنْ ব্যবহার হবে قَضَرَ قَلْب-এর জন্য আর নাহবিদগণের ভাষায় সেটাই قَضَرَ أَفْرَاد হবে, তাহলে লَكِنْ হ্যাঁ-বাচক বাক্যের قَضَرَ قَلْب এবং قَضَرَ أَفْرَاد কোনোটার জন্যই হবে না।

أَوْ صَرَفَ الْحُكْمَ عَنِ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ إِلَى مَحْكُومٍ عَلَيْهِ آخَرَ نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ
عَمَرُوا مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمَرُوا فَإِنَّ بَلْ لِلْأَضْرَابِ عَنِ الْمَتَّبِعِ وَصَرَفَ الْحُكْمَ إِلَى
التَّابِعِ وَمَعْنَى الْأَضْرَابِ أَنْ يُجْعَلَ الْمَتَّبِعُ فِي حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ لَا أَنْ
يُنْفَى عَنْهُ الْحُكْمُ قَطْعًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَمَعْنَى صَرَفَ الْحُكْمَ فِي الْمَثْبُتِ ظَاهِرٌ
وَكَذَا فِي الْمَنْفَى إِنْ جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى نَفَى الْحُكْمِ عَنِ التَّابِعِ وَالْمَتَّبِعُ فِي حُكْمِ
الْمَسْكُوتِ عَنْهُ أَوْ مُتَحَقِّقُ الْحُكْمِ لَهُ حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمَرُوا أَنْ
عَمَرُوا لَمْ يَجِئْ وَعَدَمُ مَجِئِ زَيْدٍ وَمَجِئُهُ عَلَى الْإِحْتِمَالِ أَوْ مَجِئُهُ مُحَقَّقٌ كَمَا هُوَ
مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ بِمَعْنَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ لِلتَّابِعِ حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى مَا جَاءَنِي
زَيْدٌ بَلْ عَمَرُوا أَنْ عَمَرُوا جَاءَ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ فَفِيهِ إِشْكَالٌ۔

অনুবাদ : অথবা একটি মَحْكُوم عَلَيْهِ থেকে হুকুমকে আরেকটি মَحْكُوم عَلَيْهِ-এর দিকে স্থানান্তরিত করা। যেমন- আমার কাছে যায়েদ এসেছে; বরং আমার এসেছে। অথবা আমার কাছে যায়েদ আসেনি; বরং আমার এসেছে। কেননা, بَل শব্দটি মাতবু' থেকে বিমুখ করা এবং হুকুমকে তাবের প্রতি স্থানান্তরিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাতবু' থেকে বিমুখ করার অর্থ হচ্ছে মাতবু'র ব্যাপারে কোনো বিবরণ থাকবে না। এমন নয় যে, তা থেকে হুকুম নিশ্চিতভাবে না-বাচক করা হবে, এতে অনেকের মতবিরোধ রয়েছে। হ্যাঁ-বাচক বাক্যে হুকুমকে স্থানান্তর করার বিষয়টি তো প্রকাশ্য। এমনভাবে না-বাচক বাক্যেও, যদি আমরা একে এই অর্থে গ্রহণ করি যে, তাবের থেকে হুকুম না-বাচক হবে আর মাতবু'-এর ব্যাপারে বিবরণ থাকবে না, অথবা হুকুম তার জন্য প্রমাণিত হবে। ফলে مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ-এর অর্থ হবে, নিশ্চয়ই আমার আসেনি আর যায়েদের আসা এবং না আসা উভয়ের সম্ভাবনা আছে। অথবা যায়েদ এসেছে নিশ্চিত, এটা নাহবিদ মুবাররাদের মাযহাব মতে। আর আমরা যদি না-বাচক বাক্যে بَل-কে ব্যবহার করি এভাবে যে, তা দ্বারা তাদের জন্য হুকুম সাবিত হয়। ফলে مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ-এর অর্থ হবে- আমার এসেছে নিশ্চিত। এটা জমহুরের মাযহাব মতে, কিন্তু এতে ঘোরতর আপত্তি আছে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ صَرَفَ الْحُكْمَ الْخ : উল্লিখিত ইবারতে আত্ফের অক্ষর بَل-এর আলোচনা শুরু হয়েছে। বَل দ্বারা আত্ফ করা হয় এক মুসনাদ ইলাইহ থেকে হুকুমকে অন্য মুসনাদ ইলাইহের দিকে স্থানান্তরিত করার জন্য। যেমন- جَاءَنِي زَيْدٌ بَل-এর অর্থ হবে, আমার কাছে যায়েদ এসেছে; বরং আমার এসেছে। এ বাক্যের মধ্যে جاء-এর ফায়েল হিসেবে মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে যায়েদ, এর উপর بَل দ্বারা আত্ফ করা হয়েছে আমরা, এর ফলে আসার হুকুম যা যায়েদের উপর ছিল তা এখন আমাদের দিকে চলে গেছে।

এমনভাবে না-বাচক বাক্যের উদাহরণে جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمَرُوا অর্থাৎ আমার কাছে যায়েদ আসেনি; বরং আমার।

মুসান্নিফ (র.) আত্ফ দ্বারা হুকুম স্থানান্তর করার কারণ সম্পর্কে বলেন, بَل-এর কাজ হলো মাতবু'-কে পাশ কাটিয়ে তাবের প্রতি হুকুমকে স্থানান্তর করা। اِضْرَاب-এর অর্থ হলো, মাতবু'-এর ব্যাপারে হুকুম হ্যাঁ-বাচক বাক্যে না-বাচক করা এবং না-বাচক বাক্যে হ্যাঁ-বাচক করা নয়; বরং মাতবু'-এর ব্যাপারে বাক্যে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে না। এটা জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত।

এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারী আল্লামা ইবনে হাজেব বলেন, মাতবু' থেকে اِضْرَابُ (পাশ কাটানো)-এর অর্থ হচ্ছে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে মাতবু' থেকে নিশ্চিতভাবে হুকুমকে নফী করা হবে। তবে যদি বাক্যে بَل-এর পূর্বে ۷ শব্দটি থাকে, তাহলে সকলের মতেই মাতবু' থেকে হুকুম না-বাচক হবে। যেমন-جَاءَنِي زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرُو এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, আমার কাছে যায়েদ আসেনি; বরং আমার এসেছে।

قَوْلُهُ وَمَعْنَى صَرَفِ الْحُكْمِ فِي الْمُنْبَتِ ظَاهِرٌ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি বাক্যের মধ্যে আতফের অক্ষর بَل দ্বারা আতফ করা হয়, তাহলে হ্যাঁ-বাচক বাক্যে হুকুম স্থানান্তরের বিষয়টি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ জমহরের মতে মাতবু' এবং মা'তুফ আলাইহের ব্যাপারে বাক্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে না এবং আল্লামা ইবনে হাজেবের মতে, মাতবু'র ব্যাপারে হুকুমটি না-বাচক হয়ে যাবে। যেমন-جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرُو এ বাক্যে আগমনের হুকুমটি আমার সাথে হবে। আর মাতবু' যায়েদের ব্যাপারে জমহরের মত হলো যে, আসা এবং না আসা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনে হাজেব বলেন, মাতবু' বা যায়েদ নিশ্চিতভাবে আসেনি; বরং শুধুমাত্র আমার এসেছে। আর যদি না-বাচক বাক্যে بَل দ্বারা আতফ করা হয়, তাহলে صَرَفَ حُكْم-এর ব্যাপারে মতবিরোধ বিদ্যমান।

এ অবস্থায় ইমাম মুবাররাদ এবং আল্লামা ইবনে হাজেবের মতে صَرَفَ حُكْم-এর অর্থ হচ্ছে তাবে' এবং মা'তুফ থেকে নিশ্চিতভাবে হুকুমকে না-বাচক করা হবে। আর মাতবু'-এর ব্যাপারে মুবাররাদের মত হলো তার সুস্পষ্ট বিবরণ বাক্যে থাকবে না। আর ইবনে হাজেবের মতে হুকুম মাতবু'-এর ব্যাপারে প্রমাণিত হবে এবং হ্যাঁ-বাচক হবে। সুতরাং مَا جَاءَنِي زَيْدٌ-এর অর্থ হচ্ছে আমার নিশ্চিতভাবে আসেনি। এখানে না আসার হুকুমকে আমার প্রতি স্থানান্তর করা হয়েছে। মাতবু' তথা যায়েদের ব্যাপারে মুবাররাদের মত হচ্ছে তার আসা এবং না আসা উভয়ের সম্ভাবনা আছে। আর ইবনে হাজেবের মতে যায়েদ অবশ্যই এসেছে।

আমাদের মুসান্নিফের ইবারত :

عَدَمُ مَجِيئِ زَيْدٍ وَمَجِيئُهُ عَلَى الْإِحْتِمَالِ أَوْ مَجِيئُهُ مُحَقَّقٌ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْمُبَرِّدِ -

এ ইবারতের বিন্যাসে কিছুটা ঝামেলা রয়েছে। কেননা, এ ইবারতের اَوْ مَجِيئُهُ مُحَقَّقٌ-এর আগ পর্যন্ত মুবাররাদের মায়হাব মতে اَوْ مَجِيئُهُ مُحَقَّقٌ হচ্ছে আল্লামা ইবনে হাজেবের মতামত অনুসারে।

অতএব, বাক্যের বিন্যাস এমন হওয়া দরকার ছিল اَوْ مَجِيئُهُ مُحَقَّقٌ أَوْ مَجِيئُهُ الْمُبَرِّدُ অর্থাৎ তাবে'-এর জন্য হুকুম সাবিত হবে আর না-বাচক বাক্যে জমহরের মতে হুকুম স্থানান্তরের অর্থ হচ্ছে মা'তুফ এবং তাবে'-এর জন্য হুকুম সাবিত হবে আর মাতবু'-এর ব্যাপারে বাক্যে কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ থাকবে না। তাদের মতে مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرُو-এর অর্থ- আমার অবশ্যই এসেছে আর যায়েদের আসা আর না আসা উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

قَوْلُهُ فَنِيهِ إِشْكَالٌ : মুসান্নিফ বলেন, জমহরের মায়হাবের উপর আপত্তি রয়েছে। আপত্তিটি হচ্ছে- না-বাচক বাক্যে হুকুমও না-বাচক হয়ে থাকে হ্যাঁ-বাচক হয় না। অতএব, بَل দ্বারা যদি হুকুম স্থানান্তর করা হয়, তাহলে না-বাচক হুকুম স্থানান্তর করবে। অথচ জমহর বলেন, না-বাচক বাক্যে তাবে'-এর জন্য হ্যাঁ-বাচক হুকুম হবে যদিও এখানে তার মাতবু'তে না-বাচক হুকুম রয়েছে। তাদের মতে এখানে হুকুম স্থানান্তর বা صَرَفَ حُكْم পাওয়া গেল না; বরং এখানে মাতবু'-এর হুকুমের বিপরীত হুকুম স্থানান্তর করা হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে মাতবু'-এর হুকুম না-বাচক রয়েছে, অথচ স্থানান্তর করা হচ্ছে এর বিপরীত হ্যাঁ-বাচক হুকুম। তাদের এখানের বক্তব্য صَرَفَ حُكْم-এর সংজ্ঞার সাথে মিলছে না।

এর উত্তরে জমহরের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে تَغْيِيرُ حُكْم দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হুকুমের পরিবর্তন) আর এখানে তা বিদ্যমান। এর ব্যাখ্যা এই যে, মাতবু'-এর ব্যাপারে আগমনের না-বাচকের নিসবত ছিল। অতঃপর بَل দ্বারা এই হুকুমকে পরিবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ তাবে'-এর মধ্যে তাকে হ্যাঁ-বাচক করা হয়েছে এবং আগমনের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমার এসেছে। অন্যদিকে প্রথম মুসনাদ ইলাইহ ও মাতবু'-এর ব্যাপারে হুকুমের সুস্পষ্ট বিবরণ নেই।

মোটকথা, জমহরের মতে হুকুম না-বাচক থেকে হ্যাঁ-বাচকে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এতটুকু দ্বারাই بَل-এর অর্থ পাওয়া গেছে- যা اِضْرَابُ-এর জন্য যথেষ্ট।

أَوْ لِّلشَّكِّ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ أَوْ التَّشْكِينِ لِّلسَّامِعِ أَىٰ إِنْقَاعِهِ فِي الشَّكِّ نَحْوُ جَاءَ نِي
 زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ أَوْ لِإِبْهَامِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوْ
 لِّلتَّخْيِيرِ أَوْ لِإِبَاحَةِ نَحْوِ لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْإِبَاحَةِ
 يَجُوزُ الْجَمْعُ بِخِلَافِ التَّخْيِيرِ -

অনুবাদ : অথবা (মুসনাদ ইলাইহের উপর আতফ করা হয়) বক্তার সন্দেহের কারণে অথবা শ্রোতাকে সন্দেহে আপত্তিত করার জন্য। যেমন আমার কাছে যায়েদ অথবা আমার এসেছে। অথবা, (আতফ করা হয়) অস্পষ্ট করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা হিদায়েতের উপর নতুবা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে, অথবা এখতিয়ার দান কিংবা বৈধতা দানের জন্য। যেমন বাড়িতে যায়েদ অথবা আমার প্রবেশ করুক, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে বৈধতার ক্ষেত্রে উভয়ের একত্রে কাজ করা সম্ভব, কিন্তু এখতিয়ার দানের ক্ষেত্রে তা নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

او : উল্লিখিত ইবারতে আত্ফের অক্ষর او সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। او দ্বারা বিভিন্ন অর্থে আত্ফ হয়ে থাকে। মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহের উপর او দ্বারা আত্ফ করা হয়-

১. বক্তা বা বর্ণনাকারীর সন্দেহ এবং দ্বিধা থাকার কারণে।

২. বক্তা তার শ্রোতাকে সন্দেহে ও দ্বিধায় ফেলার জন্য (উভয় প্রকারের উদাহরণ) যেমন- جَاءَنِي زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ (আমার কাছে যায়েদ অথবা আমার এসেছে) এ উদাহরণটি উভয় প্রকারের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কেননা, বক্তা যদি সত্যিকারভাবে না জানে, তাদের মধ্যে কে এসেছে, তাহলে এটি প্রথম প্রকার। আর যদি বক্তা সুনিশ্চিতভাবে জানে আগমনকারীকে, কিন্তু সে তার শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেছে, আমার কাছে যায়েদ অথবা আমার এসেছে, তাহলে এটি দ্বিতীয় প্রকার।

৩. মুসান্নিফ বলেন, বিষয়টিকে অস্পষ্ট এবং শ্রোতার থেকে আসল বিষয়টিকে গোপন রাখার জন্যও او দ্বারা আত্ফ করা হয়। যেমন- إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى الخ আয়াতে انا এবং اياكم এ দু'য়ের মাঝে او এনে ইবহাম সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. কখনো او দ্বারা মুসনাদ ইলাইহকে এখতিয়ার দান অথবা হুকুমের বৈধতা দান করা হয়। যেমন- لِيَدْخُلِ الدَّارَ زَيْدٌ - যেমন- অর্থাৎ ঘরের মধ্যে যায়েদ অথবা আমার যেন প্রবেশ করে। উদাহরণে এখতিয়ার দান অথবা বৈধতা দান উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করা দু'জনের যে কোনো একজনের দ্বারা হবে। তদ্রূপ উভয়ের জন্য প্রবেশ করার অনুমতি আছে।

تخيير এবং اباحت-এর মাঝে পার্থক্য : اباحت-এর মধ্যে বাহ্যিক লক্ষণের ভিত্তিকে মা'তুফ এবং মা'তুফ 'আলাইহ একটি হওয়া সম্ভব, কিন্তু تخيير-এর মধ্যে তা সম্ভব নয়।

وَأَمَّا الْفَضْلُ أَيْ تَغْيِيبُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِضَمِيرِ الْفَضْلِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَقْتَرِنُ بِهِ أَوَّلًا وَلِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى عِبَارَةٌ عَنْهُ وَفِي اللَّفْظِ مُطَابِقٌ لَهُ فَلِتَخْصِيصِهِ أَيْ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمُسْنَدِ يَعْنِي لِقْصَرِ الْمُسْنَدِ عَلَى الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ أَنَّ الْقِيَامَ مَقْصُورٌ عَلَى زَيْدٍ لَا يَتَجَاوَزُ إِلَى عَمْرٍو فَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ فَلِتَخْصِيصِهِ بِالْمُسْنَدِ مِثْلُهَا فِي قَوْلِهِمْ خَصَّصْتُ فَلَانًا بِالذِّكْرِ إِذَا ذَكَرْتَهُ دُونَ غَيْرِهِ كَأَنَّكَ جَعَلْتَهُ مِنْ بَيْنِ الْأَشْخَاصِ مُخْتَصًّا بِالذِّكْرِ أَيْ مُتَفَرِّدًا بِهِ وَالْمَعْنَى هَهُنَا جَعَلَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ مَا يَصِحُّ اتِّصَافُهُ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ مُخْتَصًّا بِأَن يَثْبُتَ لَهُ الْمُسْنَدُ كَمَا يُقَالُ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ مَعْنَاهُ نَخْصُكَ بِالْعِبَادَةِ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ -

অনুবাদ : আর ফসল- (মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা) অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের পর ফসল (পার্থক্য সৃষ্টিকারী)-এর সর্বনাম ব্যবহার করা, এটিকে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। কেননা, এটি এর সাথে প্রথমে যুক্ত হয়। তা ছাড়া এটা অর্থগতভাবে মুসনাদ ইলাইহকে বুঝায় এবং শাব্দিকভাবে তার মতো। মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের সাথে খাস করার জন্য। অর্থাৎ মুসনাদকে মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ করার জন্য। কেননা, আমাদের উক্তি زَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ-এর অর্থ হচ্ছে দণ্ডায়মান হওয়া যায়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আমার পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হবে না। মূল লেখকের শব্দ فَلِتَخْصِيصِهِ بِالْمُسْنَدِ-এর টি ব.এ. এর অর্থ হচ্ছে-এর মতো। (এটা তখনই ব্যবহার করা হয়) যখন তুমি শুধু এটাকেই উল্লেখ করবে। যেন তুমি এটিকে অনেক জনের মাঝ থেকে উল্লেখের জন্য নির্দিষ্ট করলে, অর্থাৎ পৃথক করলে। এখানে তাখসীসের অর্থ হচ্ছে- যে সকল বিষয় মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে তার মধ্য থেকে মুসনাদকে এর সাথে সাবিত করার জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমন- إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে তোমাকে ইবাদতের সাথে খাস করলাম এবং তুমি ছাড়া অন্যের ইবাদত করবো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْفَضْلُ أَيْ تَغْيِيبُ الْخ: মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো মুসনাদ ইলাইহের পর মুবতাদা ও খবরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টিকারী সর্বনাম ব্যবহার করা।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ أَحْوَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ: এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো : مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ মুবতাদা এবং খবরের মাঝে অবস্থান করার কারণে উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং উভয়ের সাথে সম্পর্ক একই ধরনের। অতএব, ضَمِيرِ فَضْل-কে কেন মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হলো; কিন্তু মুসনাদের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হলো না?

এর তিনটি উত্তর ইবারতে দেওয়া হয়েছে প্রথম উত্তরটি হচ্ছে, ضَمِيرِ فَضْل উভয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও প্রথম সম্পর্ক হয় তার মুসনাদ ইলাইহের সাথে, তারপর মুসনাদের সাথে। কারণ, বাক্যের মধ্যে প্রথমে মুসনাদ ইলাইহ আসে এরপর মুসনাদ আসে। অতএব, একে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করাই সমীচীন।

এর দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে- **صَبِيرٌ فَضْلٌ** অর্থগতভাবে মুসনাদ ইলাইহের দিকে রুজু হয়ে থাকে। আমরা দেখি, **زَيْدٌ هُوَ**-এর মধ্যে **هُوَ** দ্বারা যায়েদ উদ্দেশ্য, এর দ্বারা মুসনাদ উদ্দেশ্য হয় না। অতএব, এটিকে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করাই উচিত।

তৃতীয় উত্তর হচ্ছে- **صَبِيرٌ فَضْلٌ** বচনের দিক থেকে মুসনাদ ইলাইহের অনুগামী হয়, মুসনাদের অনুগামী হয় না। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন যা হবে সর্বনামটি তাই হয়ে থাকে। সুতরাং এর সম্পর্ক মুসনাদ ইলাইহের সাথেই বেশি। এ কারণেই একে মুসনাদ ইলাইহের অবস্থার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

صَبِيرٌ فَضْلٌ ব্যবহারের কারণ :

লেখক বলেন, **صَبِيرٌ فَضْلٌ** ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে- মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের সাথে খাস করা। অর্থাৎ মুসনাদটি যে শুধুমাত্র উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, অন্য কারো দ্বারা সংঘটিত হয়নি এ কথা বুঝানো। যেমন- **زَيْدٌ هُوَ الْفَائِزُ**-এর অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র যায়েদ দাঁড়িয়েছে, অন্য কেউ দাঁড়ায়নি।

قَوْلُهُ فَاَنْبَاءُ فَيَ قَوْلِهِ فَلْيَتَخَصَّصْ بِالنَّسْنِدِ الْخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) **بَاء** শব্দটি দ্বারা কি অর্থ এখানে উদ্দেশ্য তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, **فَلْيَتَخَصَّصْ بِالنَّسْنِدِ** এখানে **بَاء** শব্দটি **مَقْصُور**-এর উপর দাখিল হয়েছে। অর্থাৎ মুসনাদটি সীমাবদ্ধ হবে। যেমন- **خُصِّصَتْ قُلَاتًا بِالذِّكْرِ**-এর মধ্যে **بَاء** দাখিল হয়েছে **مَقْصُور**-এর উপর। এর অর্থ হবে- আমি অমুকেরই আলোচনা করেছি। এর অর্থ হচ্ছে যে, বক্তা যেন বলল, বিভিন্ন মানুষদের মধ্য হতে অমুককে আলোচনার জন্য নির্ধারণ করেছি। অর্থাৎ তাকে এককভাবে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অতএব, এখানে মুসনাদটি মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে যেসব ব্যক্তি মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে তাদের মধ্য থেকে উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদ দ্বারা খাস করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসনাদটি কেবল এ মুসনাদ ইলাইহ করেছে, অন্য কেউ করেনি। যেমন- **إِيَّاكَ نَعْبُدُ**-এর অনুবাদ হচ্ছে- আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করি না।

وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ أَى تَقْدِيمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلْيَكُنْ ذِكْرُهُ أَهَمَّ وَلَا يَكْفَى فِي التَّقْدِيمِ مُجَرَّدُ ذِكْرِ الْإِهْتِمَامِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيَّنَ أَنَّ الْإِهْتِمَامَ مِنْ أَى جِهَةٍ وَيَأْتِي سَبَبٌ فَلِذَا فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ إِمَّا لِأَنَّهُ أَى تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْأَصْلُ لِأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ فَقَصَدُوا أَنْ يَكُونُوا فِي الذِّكْرِ أَيْضًا مُقَدِّمًا وَلَا مُقْتَضَى لِلْعُدُولِ عَنْهُ أَى عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ إِذْ لَوْ كَانَ أَمْرٌ يَقْتَضَى الْعُدُولَ عَنْهُ فَلَا يُقَدِّمُ كَمَا فِي الْفَاعِلِ فَإِنَّ مَرْتَبَةَ الْعَامِلِ التَّقَدُّمُ عَلَى الْمَعْمُولِ -

অনুবাদ : (মুসনাদ ইলাহির অবস্থাসমূহের একটি হলো) মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে ব্যবহার। কেননা, তাকে উল্লেখ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুসান্নিফ (র.) বলেন, অগ্রগামী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; বরং কোন দিক থেকে এবং কি কারণে গুরুত্বপূর্ণ এটা উল্লেখ করা জরুরি। এ কারণে তার জবানীতে তিনি (তালখীসের লেখক)-এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১. কেননা, মুসনাদ ইলাইহকে আগে উল্লেখ করাই নিয়ম। কারণ, তার ব্যাপারেই হুকুমের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। হুকুমের পূর্বে তার অস্তিত্ব অবশ্যজারী। এ কারণে তারা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাকে অগ্রগামী করার ইচ্ছা করেছেন। আর এ নীতির থেকে সরে আসার কোনো দলিল যদি না থাকে। কেননা, যদি এমন কোনো দলিল থাকে তখন তা আগে আসে না। যেমন ফায়েল (মুসনাদ ইলাইহ হওয়া সত্ত্বেও ফে'লের পরে আসে) কেননা, আমেলের স্তর মা'মূলের উপরে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَقْدِيمُهُ الخ : মুসনাদ ইলাইহের আরেকটি অবস্থা হলো এটি মুসনাদের আগে উল্লিখিত হবে। এর কারণ হচ্ছে, এর উল্লেখ মুসনাদের তুলনায় গুরুত্ববহ, আর মুসনাদ তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, মুসনাদ ইলাইহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এতটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; বরং এর কারণও উল্লেখ জরুরি যে, কি কারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রে আসার উপযুক্ত হলো। সে মতে মূল লেখক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

এক. মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনাই নিয়ম ও সাধারণ নীতি। কেননা, এটি বাক্যের **مَحْكُومٌ عَلَيْهِ** (যার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়)। আর যার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয় তার অস্তিত্ব বর্ণনার আগে হওয়া আবশ্যিক। এ কারণে তারা আলোচনাতেও আগে রাখার ইচ্ছা করেছেন।

লেখক বলেন, উক্ত নীতি অনুসারে তাকে আগে তখনই রাখা হবে যখন এ নীতি থেকে সরে আসার কোনো দলিল না থাকে। কেননা, যদি কোনো বিষয় উক্ত নীতি থেকে সরে আসার দাবি জানায় অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ পরে আসুক এটা চায়, তাহলে তাকে পরেই আনা হবে, আগে আনা হবে না। যেমন যদি মুসনাদ ইলাইহ ফায়েল হয় তাহলে তাকে আগে আনা হবে না; বরং তাকে ফে'লের পরে আনা হবে।

ফে'লের ক্ষেত্রে মুসনাদ ইলাইহ (ফায়েল)-কে পরে আনার দলিল হচ্ছে ফায়েল ফে'লের মা'মূল আর ফে'ল তার আমেল। মর্যাদাগতভাবে আমেল আগে আসে, আর মা'মূল পরে আসে। এ হিসেবে ফে'লকে প্রথমে আর ফায়েলকে পরে আনা হয়।

তা ছাড়া তারকীবগতভাবে কখনই ফায়েল ফে'লের আগে আসতে পারে না। ফায়েল ফায়েল হওয়ার জন্য শর্ত হলো ফে'লের পরে আসবে। অন্যথায় তা ফায়েল হতে পারবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমেল অর্থগতভাবে ইল্লত হয় আর মা'মূল হয় তার **معلول**। ইল্লত তার **معلول**-এর থেকে সব সময় আগে আসে। এ কারণে আমেল মর্যাদাগতভাবে আগে আসে, আর মা'মূল পরে আসে।

وَأَمَّا لِتَمْكِنَ الْخَبْرَ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ لَأَنَّ فِي الْمُبْتَدَأِ تَشْوِيقًا إِلَيْهِ أَيْ إِلَى الْخَبْرِ
كَقَوْلِهِ شَعْرٌ وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ يَعْنِي تَحِيرَتِ الْخَلَائِقِ
فِي مَعَادِ الْجِسْمَانِي وَالنُّشُورِ الَّذِي لَيْسَ بِنَفْسَانِي بِدَلِيلٍ مَا قَبْلَهُ شَعْرٌ بَانَ أَمْرُ الْإِلَهِ
وَاخْتَلَفَ * النَّاسَ فِدَاعٍ إِلَى ضَلَالٍ وَهَادٍ يَعْنِي بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِالْمَعَادِ وَيَعْضُهُمْ لَا يَقُولُ بِهِ وَآمَّا
لِتَعْجِيلِ الْمُسْرَةِ أَوْ الْمَسَاءَةِ لِلتَّفَاوُلِ عِلَّةٌ لِتَعْجِيلِ الْمُسْرَةِ أَوْ التَّطْيِيرِ عِلَّةٌ لِتَعْجِيلِ
الْمَسَاءَةِ نَحْوُ سَعْدٍ فِي دَارِكَ لِتَعْجِيلِ الْمُسْرَةِ وَالسَّقَّاحُ فِي دَارِ صَدِيقِكَ لِتَعْجِيلِ الْمَسَاءَةِ
وَأَمَّا لِإِيْهِامٍ أَنَّهُ أَيْ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ لَا يَزُولُ عَنِ الْخَاطِرِ لِكُونِهِ مَطْلُوبًا أَوْ أَنَّهُ يُسْتَلَذُّ بِهِ لِكُونِهِ
مَحْبُوبًا وَآمَّا لِنَحْوِ ذَلِكَ مِثْلُ إِظْهَارِ تَعْظِيمِهِ أَوْ تَخْفِيرِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ -

অনুবাদ : অথবা খবরকে শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করার জন্য। কেননা, (কখনো) মুবতাদা-এর মধ্যে
খবরের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপক বিষয় থাকে, কবির কবিতার চরণ : وَالَّذِي حَارَتِ الْبَرِيَّةُ فِيهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمَادٍ
অর্থাৎ যার ব্যাপারে সৃষ্টিকূল দ্বিধাগ্রস্ত তা হচ্ছে এমন প্রাণী যার সৃষ্টি জড়পদার্থ থেকে।
অর্থাৎ সব মানুষ সৃষ্টিকূলের দৈহিক পুনরুত্থানের ব্যাপারে চিন্তিত ও সংশয়গ্রস্ত, রুহানী পুনরুত্থানের ব্যাপারে
(দ্বিধাগ্রস্ত) নয়। এর পূর্বের পঙ্ক্তিতে এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে। পূর্ব পঙ্ক্তি হচ্ছে- بَانَ أَمْرُ الْإِلَهِ وَاخْتَلَفَ * النَّاسَ فِدَاعٍ إِلَى ضَلَالٍ وَهَادٍ
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ মতবিরোধে
লিপ্ত, কেউ ভ্রষ্টতার পথে আহ্বান করছে আর কেউ সত্যপথে (অর্থাৎ কেউ শারীরিক পুনরুত্থান বিশ্বাস করছেন,
আর অনেকে করছে অবিশ্বাস) অথবা সুসংবাদ প্রথমে বা দুঃসংবাদ প্রথমে দেওয়ার জন্য। শুভ লক্ষণের জন্য-
এটি لِتَعْجِيلِ الْمُسْرَةِ-এর ইল্লত। অথবা কুলক্ষণ প্রকাশের জন্য। এটি لِتَعْجِيلِ الْمَسَاءَةِ-এর ইল্লত। যেমন-
سَعْدٌ فِي دَارِكَ (সৌভাগ্য তোমার বাড়িতে) সুসংবাদ প্রথমে দেওয়ার উদাহরণ। الْأَسَقَّاحُ فِي دَارِ صَدِيقِكَ (খুশী
তোমার বন্ধুর বাড়িতে) দুঃসংবাদ প্রথমে দেওয়ার জন্য।

অথবা এ ধারণা সৃষ্টি করার জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহ অন্তর থেকে বিম্বৃত হয় না। কেননা, তা কাক্ষিত।
অথবা তা দ্বারা তৃপ্তিবোধ করার জন্য, তা অতি প্রিয় হওয়ার কারণে, অথবা এ জাতীয় অন্য উদ্দেশ্যে। যেমন-
তার সম্মান অথবা অমর্যাদা প্রকাশের জন্য এবং এ ধরনের অন্য উদ্দেশ্যে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মূল লেখক উল্লিখিত ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে ব্যবহার করার আরো কিছু
যুক্তি পেশ করেছেন। সেগুলোর উপস্থিতিতে মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে আনা হয়।

২. لِتَمْكِنَ الْخَبْرَ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ তথা খবর (মুসনাদ)-কে শ্রোতার মনে বদ্ধমূল করার জন্য। অর্থাৎ বক্তা যদি
শ্রোতার মনে খবরটিকে সুদৃঢ় করতে চায় তাহলে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে উল্লেখ করা সমীচীন। কেননা, যখন মুসনাদ
ইলাইহকে প্রথমে উল্লেখ করা হয় তখন শ্রোতার মনে খবরটি শোনার আগ্রহ জন্মে। আর আগ্রহও আশক্তির পর কোনো
বিষয় শ্রুত হলে তা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সুন্দরভাবে অবস্থান করে। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে,
মুসনাদ ইলাইহ (মুবতাদা)-এর দ্বারা খবরের আগ্রহ তখনই হবে যখন মুসনাদে ইলাইহের সাথে এমন সিফাত বা صَلَة
থাকবে যা খবরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। যেমন বিখ্যাত কবি আবুল 'আলা মু'আররী তার কবিতায় বলেন-

وَالَّذِي حَارَتِ الْبِرَّةُ فِيهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَكٌ مِنْ جَمَادٍ .

কবিতার চরণের অর্থ : যার ব্যাপারে জগৎবাসী দ্বিধাগ্রস্ত এবং চিন্তিত, তা হচ্ছে এমন এক প্রাণী যার সৃষ্টি জড়পদার্থ থেকে। কবিতার সারমর্ম হচ্ছে, মানুষের মৃত্যুর পর তার হাড়-মাংস মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরুত্থিত হতে পারে কিনা- এ ব্যাপারে জগৎবাসী দ্বিধাগ্রস্ত এবং চিন্তিত। একদল বলেছে, তাদের দৈহিক পুনরুত্থান হবে, অন্যদল বলেছে হবে না।

قَوْلُهُ بِدَلِيلٍ مَا قَبْلَهُ : অর্থাৎ حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَكٌ দ্বারা যে, মানুষ উদ্দেশ্য এবং তাদের দৈহিক ও আত্মিক পুনরুত্থান হবে এর দলিল রয়েছে উক্ত কবিতার পূর্ববর্তী পঙ্ক্তিতে। সেই পঙ্ক্তিতে হলো-

بَانَ أَمْرُ الْإِلَهِ وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِدَاجٍ إِلَى ضَلَالٍ وَهَادٍ

ভাবার্থ- বিভিন্ন প্রমাণ ও আয়াতের মাধ্যমে পুনরুত্থানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু কতিপয় লোক এ মতের বিরোধী রয়েছে। কেউ বলে, পুনরুত্থান হবে (তারা হিদায়েতের উপর)। আর কেউ বলে, পুনরুত্থান হবে না। তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَكٌ সম্পর্কে অনেকে বলেন, এর দ্বারা হযরত মুসা (আ)-এর লাঠি থেকে সৃষ্ট সাপ অথবা পাথর থেকে জন্ম নেওয়া ছামূদ জাতির উটনীকে বুঝানো হয়েছে। মূলত তাদের উক্ত ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী পঙ্ক্তির ভুল প্রমাণ করে। উল্লিখিত উদাহরণে الذی (اسم موصول) এবং তার صلة মিলে যুবতাদা হয়েছে। এটি শুনে শ্রোতার মনে অগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে একথা জানার জন্য যে, মানুষ কার ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত। এরপর যখন 'খবর' বলা হলো তখন শ্রোতার মনে তা বদ্ধমূল হয়ে যায়।

৩. قَوْلُهُ وَإِمَّا لِنَعْجِيلِ الْمُسْرَةِ أَوْ الْمَسَاءَةِ الْخ. মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয় যাতে শ্রোতাকে দ্রুত সুসংবাদ দেওয়া যায় এবং শ্রোতা এর দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন- سَعْدٌ فِي دَارِكَ, এখানে سعد শব্দটি যদিও একজনের নাম; কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য বা সৌভাগ্যবান। অতএব, এ বাক্যটি শোনামাত্র শ্রোতা বুঝবে, তার ঘরে সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে। এ কথার দ্বারা শ্রোতার মনে দ্রুত আনন্দ সঞ্চারিত হবে। সুতরাং এখানে শ্রোতার মনে খুশির সংবাদ পৌছানোর উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে ব্যবহার করা জরুরি।

৪. قَوْلُهُ لِنَعْجِيلِ الْمَسَاءَةِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয় শ্রোতাকে দ্রুত বিষণ্ণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। যেমন- কেউ বলল سَعْدٌ فِي دَارِ صَدِيقِكَ, আরবিতে السَّعَادُ বলা হয় খুনীকে। শ্রোতার খুনী শব্দটি শোনা মাত্র তার মন খারাপ হয়ে যাবে এবং এর দ্বারা সে কুলক্ষণ ধরে নিবে। অতএব, এখানে মুসনাদ ইলাইহকে আগে ব্যবহার করা শ্রোতার মনকে বিষণ্ণ করে দেওয়ার কারণ হবে।

৫. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয় এ কথা জানানোর জন্য যে, এটি আমার এত প্রিয় যে, আমার মন থেকে কখনো বিস্মৃত হয় না। (বরং যখনই কথা বলি, তার দ্বারাই কথা শুরু করি।) অথবা এর স্মরণ দ্বারা তৃপ্তিবোধ হয় এ কথা জানানোর জন্য। যেমন- الْعَجِيبُ جَاءَنِي, অর্থাৎ আমার প্রিয়জন আমার কাছে এসেছে।

قَوْلُهُ وَإِمَّا لِنَعْجِيلِ : লেখক বলেন, আরো অন্যান্য উদ্দেশ্যে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয়। যথা- কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা হয়। অথবা কারো প্রতি তাজিল্য প্রদর্শনের জন্য তাকে আগে উল্লেখ করা হয়। অথবা এ জাতীয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আগে আনা হয়।

সার-সংক্ষেপ :

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে مقدم করা হয় খবরকে শ্রোতার মনে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। যেমন- وَالَّذِي حَارَتِ الْبِرَّةُ فِيهِ * حَيَوَانٌ مُسْتَحْدَكٌ مِنْ جَمَادٍ এ কবিতায় বর্ণিত মানুষের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টি মানুষের মৃত্যুর পর শারীরিক পুনরুত্থান হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে।

কখনো মুসনাদ ইলাইহকে مقدم করা শুভ/অশুভ সংবাদ দ্রুত প্রদানের জন্য, যাতে শ্রোতা সংবাদ শুভ/অশুভ লক্ষণ যাচাই করতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ যেমন- سَعْدٌ فِي دَارِكَ দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন- السَّعَادُ فِي دَارِ صَدِيقِكَ

অথবা, মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করা হয় এ কথার ইঙ্গিত প্রদানের জন্য যে, তা কখনো মুতাকাল্লিমের অন্তর থেকে বিদূরিত হয় না। অথবা, মুসনাদ ইলাইহ উচ্চারণ করত স্বাদ গ্রহণের জন্য। আরো বিভিন্ন কারণে মুসনাদ ইলাইহ مقدم করা হয়।

قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ وَقَدْ يُقَدَّمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ لِيُفْنِدَ التَّقْدِيمُ تَخْصِيصَهُ بِالْخَبَرِ
الْفِعْلِيِّ أَيْ قَصْرُ الْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ عَلَيْهِ إِنْ وَلِيَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفُ النَّفْيِ أَيْ وَقَعَ بَعْدَهَا
بِلَا فَضْلِ نَحْوِ مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا أَيْ لَمْ أَقُلْهُ مَعَ أَنَّهُ مَقُولُ لِيُغَيِّرُنِي فَالتَّقْدِيمُ يُفْنِدُ نَفْيَ
الْفِعْلِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ وَثُبُوتَهُ لِغَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَفَى عَنْهُ مِنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ
وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتُهُ لِجَمِيعٍ مِنْ سِوَاكَ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَتَوَهَّمُ
الْمُخَاطَبَ إِشْتِرَاكَكَ مَعَهُ أَوْ إِنْفِرَادَكَ بِهِ دُونَهُ -

অনুবাদ : শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী বলেন, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা হয়, যাতে এ প্রথমোল্লেখ তার ক্রিয়াবাচক খবরের সাথে খাস হওয়া প্রমাণ করে। অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক খবরটি তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে যদি মুসনাদ ইলাইহটি না-বাচক অক্ষরের সাথে মিলে আসে। অর্থাৎ তার অব্যবহিত পরে আসে। যেমন- هَذَا أَنَا قُلْتُ هَذَا অর্থাৎ আমি এটি বলিনি, তবে এটি অন্যের উক্তি। (এখানে) মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামীতা কাজটিকে তার থেকে না-বাচক করত অন্যের জন্য ব্যাপক অথবা অব্যাপক যেভাবে নেতিবাচক করা হয়েছে সেভাবেই প্রমাণিত করার অর্থ দিচ্ছে। তবে এর দ্বারা অন্য সকলের জন্য কাজটি প্রমাণিত করে, এটি অত্যাৱশ্যকীয় নয়। কেননা, নির্দিষ্ট করা হয়েছে তো ঐসব ব্যক্তির হিসেবে যাদের সাথে শ্রোতা তোমাকে (উক্ত কাজে) অংশীদার মনে করে অথবা তোমাকে স্বতন্ত্র মনে করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَقَدْ يُقَدَّمُ : বিখ্যাত নাহবিদ ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ আল্লামা আবদুল কাহির জুরজানী বলেন, قَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الخ : আল্লামা জুরজানীর বক্তব্যের সারকথা হলো এই যে, কখনো মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয়, যাতে এতে তার ক্রিয়াবাচক ফেলের সাথে খাস এ কথা বুঝানো যায়। অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে যে, খবরটি মুবতাদার সাথেই খাস। তবে উক্ত মুসনাদ ইলাইহ তাখসীসের অর্থ প্রদানের জন্য দু'টি শর্ত-

১. মুসনাদ ইলাইহের খবর ক্রিয়াবাচক হওয়া, ২. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচক অক্ষরের পরে আসবে, উক্ত মুসনাদ ইলাইহ এবং না-বাচক অক্ষরের মাঝে কোনো দূরত্ব সৃষ্টিকারী কোনো শব্দ থাকবে অথবা থাকবে না।

উল্লেখ্য যে, حَبَّرَ فِعْلِي -এর সাথে মুসনাদ ইলাইহকে খাস করার অর্থ একে মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রমাণ করা নয়; বরং যেহেতু শুরুতে না-বাচক অক্ষর থাকবে তাই ক্রিয়াবাচক খবর-এর نَفَى -এর সাথে তাকে খাস করা হবে।

قَوْلُهُ أَيْ وَقَعَ بَعْدَهَا بِلَا فَضْلٍ : মুসান্নিফের এ কয়েদের দ্বারা বুঝা যায়, যদি মুসনাদ ইলাইহ এবং না-বাচক অক্ষরের মাঝে পৃথককারী শব্দ থাকে তাহলে তা তাখসীসের অর্থ দিবে না, অথচ আমরা দেখি যদি ফেলের মা'মূল দ্বারা পৃথক করা হয় তবুও তাখসীসের অর্থ প্রদান করে। যেমন- مَا فِي الدَّارِ أَنَا ضَرَبْتُ আমিই যায়েদকে প্রহার করিনি এবং جَلَسْتُ অর্থাৎ আমিই ঘরে বসিনি।

এর উত্তর হচ্ছে- এখানে بِلَا فَضْل -এর শব্দটি এমনিতেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েদ রূপে নয়। আর وَلَى (মিলিত হয়ে আসা)-এর দু'টি হাকীকত রয়েছে- ১. আভিধানিক, ২. পারিভাষিক, পারিভাষিক অর্থে তাতে কোনো فَاصِل থাকতে পারবে না। তাই এতে بِلَا فَضْل -এর কয়েদ লাগানো হয়েছে। তবে وَلَى যদি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তাতে দূরত্ব সৃষ্টিকারী আসতে পারে, এখানে بِلَا فَضْل -এর কয়েদটি মুসান্নিফ وَلَى -এর পারিভাষিক হাকীকতের ভিত্তিতে নিয়েছেন, কিন্তু এখানে وَلَى -এর আভিধানিক হাকীকত হওয়াটাই অধিক সমীচীন। অতএব, দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে না-বাচক-এর অক্ষরের পরে আসা। উভয় শর্ত পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ তাখসীসের অর্থ দিবে। অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক খবরটি তার

মুসনাদ ইলাইহের মাঝেই সীমাবদ্ধ হবে, যেমন **مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا** এ বাক্যে **مَا** শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ, যা না-বাচক অক্ষর **مَا**-এর পরে এসেছে। মুসনাদ ইলাইহের খবর **قُلْتُ هَذَا** ফে'ল। অতএব, এ বাক্যের **قُلْتُ هَذَا** মুসনাদ ইলাইহের মাঝে সীমাবদ্ধ। এখানে মুসনাদ তথা কথা না বলা তাখসীস হয়েছে। **مَا** মুবতাদার উপর।

অতএব, **مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا**-এর অর্থ- আমি বলিনি এ কথা, যদিও আমি ছাড়া অন্যরা বলেছে। এখানে খবরটি সীমাবদ্ধ হওয়া এবং মুসনাদ ইলাইহের সাথে হওয়ার অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনার দ্বারা ফে'লটি বক্তা থেকে না-বাচক হয়ে যাবে এবং বক্তা ছাড়া অন্য সকলের জন্য..... এভাবেই প্রমাণিত হবে। যদি বক্তা থেকে বিশেষভাবে না-বাচক হয়, তাহলে অন্যের জন্য বিশেষভাবে হ্যাঁ-বাচক হবে। যদি বক্তা থেকে ব্যাপকভাবে না-বাচক হয়, তাহলে অন্যের জন্য ব্যাপকভাবে হ্যাঁ-বাচক হবে। উল্লিখিত উদাহরণে বক্তা থেকে বিশেষভাবে কাজটি না-বাচক হয়েছে। বক্তা বলেছে আমি এটা বলিনি। অতএব, অন্যের জন্য এভাবেই হ্যাঁ-বাচক হবে। আর যদি বক্তা থেকে কোনো কাজ ব্যাপকভাবে না-বাচক হয়, যেমন- বক্তা বলে **مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا** “আমি কাউকে দেখিনি” এ উদাহরণে বক্তা থেকে ব্যাপকভাবে দেখাকে নফী করা হয়েছে। অতএব, অন্যের জন্য ব্যাপকভাবে দেখাকে প্রমাণিত করা হবে। অর্থাৎ তাহলে অন্যরা সব মানুষকে দেখেছে।

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ثُبُوتُهُ لِجَمِيعِ الْخ এ বাক্যটি দ্বারা শ্রোতাদের একটি সন্দেহের অপনোদন করা হচ্ছে। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বক্তা থেকে যে বিষয়টি না-বাচক করা হয়েছে, অন্য সবার জন্য সেই বিষয়কে সাবিত করা হবে। তাহলে কি বক্তা ছাড়া পৃথিবীর সকলের জন্য তা সাবিত হবে। অথচ এটা তো অসম্ভব- কেননা পৃথিবীর সকলেই উক্ত কাজটি করবে এটা সম্ভব নয়। এই সন্দেহের অপনোদনের উদ্দেশ্যে মুসান্নিফ বলেন, অন্যের জন্য সাবিত করার দ্বারা পৃথিবীর সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরি নয়। কেননা, তাখসীস দু'প্রকার- ১. **قَصْرُ حَقِيقَتِي** এখানে তাখসীসের দু'প্রকারের যে কোনো একভাবে **قَصْر** বা তাখসীস গ্রহণ করলে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য কাজটি সাবিত হয় না।

প্রথম প্রকার **قَصْرُ حَقِيقَتِي** বলা হয় কোনো বিষয়কে অন্য আরেকটি বিষয়ের সাথে হাকীকীভাবে এমনভাবে সীমাবদ্ধ এবং খাস করা যে, প্রথমোক্ত বিষয়টি দ্বিতীয় বিষয় ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। যেমন- **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** এ কালিমাতে মাবুদ এবং ইলাহকে আল্লাহর সাথে খাস এবং আল্লাহ তা'আলার উপর সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। তা আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

قَصْرُ إِضَافَتِي বলা হয় কোনো বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের তুলনায় খাস করা এবং প্রথমোক্ত বিষয়টিকে দ্বিতীয় বিষয়ের সাথে খাস করা। যেমন- **لَا شُعَاعَ إِلَّا حَسَنٌ** অর্থ- হাসানই বীর, এ বাক্যের অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হাসানই বীর; বরং এর অর্থ হচ্ছে শ্রোতা হাসান এবং তার বন্ধু সাঈদ উভয়কে বীর মনে করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বীর শুধুমাত্র হাসান, সাঈদ নয়। অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এখানে **لَا شُعَاعَ إِلَّا حَسَنٌ** বলা হয়েছে। অতএব, বাক্যের অর্থ হবে, হাসানই বীর, সাঈদ নয়। অর্থাৎ দু'জনকে একত্রে বীর মনে করা সঠিক নয় আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানীর বক্তব্যে **قَصْرُ إِضَافَتِي**-এর কথা বলা হয়েছে, **قَصْرُ حَقِيقَتِي**-এর কথা বলা হয়নি। তার উদাহরণ- **مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا**-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ক্রিয়াবাচক শব্দটি মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ হবে। অন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির তুলনায়- হাকীকীভাবে নয়। যখন বক্তার শ্রোতা মনে করেন উক্ত কাজটি করার ক্ষেত্রে মুসনাদ ইলাইহের সাথে অন্য কেউ শরিক আছেন অথবা তিনি ধারণা করেন যে, মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কাজটি করেছে।

অন্য কাউকে উক্ত কাজে শরিক মনে করলে যে **قَصْر** হবে, তাকে **قَصْرُ إِفْرَادٍ** বলা হয়।

আর মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া ভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে মুসনাদটি সম্পাদন করার ধারণা করা হলে যে **قَصْر** হয়, তাকে **قَصْرُ قَلْبٍ** বলে। অতএব, অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের তুলনায়- **قَصْر** করা হলে মুসনাদ ইলাইহ থেকে কাজ নেতিবাচক করা হলে পৃথিবীর অন্যসব মানুষের জন্য কাজ ইতিবাচক হয়ে যায়। যেমন বক্তা এখানে বলল, আমি এটা বলিনি এর দ্বারা বক্তা ছাড়া পৃথিবীর সবাই বলেছে, এটা আবশ্যিক হবে না।

সার-সংক্ষেপ : শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী (র.) বলেন, যদি মুসনাদ ইলাইহের সাথে **حَرْفُ نَفْيٍ** যুক্ত হয় এবং মুসনাদ ইলাইহে আগে উল্লিখিত হয়, তাহলে তারপরবর্তী **فِعْل** টি তার সাথে খাস হয়ে যায়। যেমন **مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا** -

এখানে **مَا**-কে অগ্রবর্তী করার দ্বারা না-বলাকে মুতাকাল্লিমের সাথে খাস করা হয়েছে এবং অন্যের জন্য বলাকে সাবিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মুতাকাল্লিম থেকে হুকুমকে যেভাবে নফী করা হয় সেভাবেই হুকুমকে অন্যের জন্য সাবিত করা হয়। তবে মুতাকাল্লিম থেকে নফী করে অন্য সকলের জন্য সাবিত করা হবে বিষয়টি এমন নয়; বরং শ্রোতার ধারণা অনুযায়ী অন্যের জন্য সাবিত করা হবে।

وَلِهَذَا أَيْ وَلَإِنَّ التَّقْدِيمَ يُفِيدُ التَّخْصِصَ وَنَفَى الْحُكْمِ عَنِ الْمَذْكُورِ مَعَ ثُبُوتِهِ لِلغَيْرِ لَمْ يَصِحَّ مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا وَلَا غَيْرِي لِأَنَّ مَفْهُومَ مَا أَنَا قُلْتُ ثُبُوتُ قَائِلِيَّةِ هَذَا الْقَوْلِ لِغَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ وَمَنْطُوقٌ لَا غَيْرِي نَفِيهَا عَنْهُ وَهُمَا مُتَنَاقِضَانِ وَلَا مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ غَيْرَ الْمُتَكَلِّمِ قَدْ رَأَى كُلَّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ لِأَنَّهُ قَدْ نَفَى عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الرُّؤْيَةَ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فِي الْمَفْعُولِ فَيَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فِي الْمَفْعُولِ لِيَتَحَقَّقَ تَخْصِصُ الْمُتَكَلِّمِ بِهَذَا النَّفْيِ وَلَا مَا أَنَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ غَيْرَكَ قَدْ ضَرَبَ كُلَّ أَحَدٍ سِوَى زَيْدٍ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرٌ عَامٌّ وَكُلُّ مَا نَفَيْتَهُ عَنِ الْمَذْكُورِ عَلَى وَجْهِ الْحَصْرِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ لِغَيْرِهِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْحَصْرِ إِنْ عَامًّا فَعَامٌّ وَإِنْ خَاصًّا فَخَاصٌّ وَفِي هَذَا الْمَقَامِ مَبَاحِثُ نَفِيسَةٌ وَشَحْنَا بِهَا فِي الشَّرْحِ -

অনুবাদ : আর এ কারণেই অর্থাৎ (মুসনাদ ইলাইহকে) প্রথমে উল্লেখ তাখসীস এবং উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ থেকে হুকুমকে না-বাচক করে অন্যের জন্য তা প্রমাণিত করার অর্থ প্রদান করে, مَا أَنَا قُلْتُ هَذَا وَلَا غَيْرِي, বাক্যটি বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, مَا أَنَا قُلْتُ-এর অর্থ হচ্ছে এ কথার উক্তিকারী বক্তা ছাড়া অন্য কাউকে সাব্যস্ত করা। তার لَا غَيْرِي-এর ভাষা তাকে না-বাচক করেছে। আর দু'টো পরস্পর বিরোধী বিষয় এবং مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যটির চাহিদা হচ্ছে বক্তা ছাড়া এমন মানুষ রয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষকে দেখেছে। কেননা, বক্তা থেকে মাফউলকে ব্যাপকভাবে দেখা না-বাচক করা হয়েছে। অতএব, অন্যের জন্য ব্যাপকভাবে মাফউলকে দেখা প্রমাণিত হবে। যাতে বক্তাকে উক্ত না-বাচক বাক্যের সাথে খাস করা যায় এবং مَا أَنَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا বাক্যটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যের দাবি হচ্ছে তুমি ছাড়া অন্য এক ব্যক্তি যারইদ ছাড়া সব মানুষকে মেরেছে, এখানে মুসতাহনা মিনহু উহ্য, যা ব্যাপক অর্থবোধক। আর আপনি উল্লিখিত বিশেষ্য থেকে যা সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে না-বাচক করবেন তা অন্যের জন্য সাবিত হবে। সীমাবদ্ধতার অর্থের পূর্ণতার জন্য। এটা যদি ব্যাপক হয় তাহলে ব্যাপকভাবে যদি সংকীর্ণ অর্থ হয়, তাহলে সংকীর্ণভাবে এ স্থানে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে, সে আলোচনা দ্বারা ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সাজিয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَقَدْ يُقَدَّمُ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানীর ইবারত **وَقَدْ يُقَدَّمُ** : **الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ يُفِيدُ تَخْصِصَهُ** -এর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, মুসনাদ ইলাইহকে আপন স্থানের আগে আনার দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়, তা উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ তথা বক্তা থেকে এবং বাক্যের হুকুমকে না-বাচক করত অন্যের জন্য তা প্রমাণ করে। আর এ কারণে **وَلَا غَيْرِي** বাক্যটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ **هَذَا** এ বাক্যের মধ্যে হুকুম তথা **الْقَوْلِ** (না বলা)-এর সাথে মুসনাদ ইলাইহকে খাস করা এবং উক্ত হুকুমকে মুসনাদ ইলাইহের উপর সীমাবদ্ধ করার কারণে উক্ত কথার মুতাকাল্লিম অন্য কেউ প্রমাণিত হবে। কেননা, কথা থেকে তা না-বাচক হওয়ার সাথে সাথে তা অন্যের জন্য প্রমাণিত হবে। কিন্তু এরপর যদি **لَا غَيْرِي** বলা হয় তাহলে এর দ্বারা বক্তা ছাড়া অন্য কেউ মুতাকাল্লিম হবে এটা না-বাচক হয়ে যাবে। যা ইতঃপূর্বে তাখসীসের সাথে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা, **لَا**

غَيْرِي-এর অর্থ হচ্ছে আমি ছাড়া অন্য এটা বলেনি।

অতএব, বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দু'টি বাক্য একত্রিত হয়ে গেল। لَا غَيْرِي-এর পূর্বের অংশ অন্যের জন্য হুকুমকে প্রমাণ করে আর لَا غَيْرِي তা নফী করে। আর পরস্পর বিরোধী দু' বিষয় একত্রিত হওয়ার কারণে বাক্যাটির কোনো অর্থ রইল না এবং পুরো বাক্যই অনর্থক বলে প্রমাণিত হলো। অতএব, বাক্যটি অবিশুদ্ধ ও বাতিল হয়ে গেল, লেখক বলেন- مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا বাক্যটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যের তাখসীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, বক্তা ছাড়া একজন ব্যক্তি এমন রয়েছেন যিনি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে দেখেছেন। অথচ যে কোনো মানুষের জন্য এটা অসম্ভব যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে দেখবে।

বাক্যটি থেকে এমন অর্থ নেওয়ার কারণ হচ্ছে, বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ (বক্তা) থেকে মাফউলের ব্যাপারে হুকুম না-বাচক হয়েছে ব্যাপকভাবে। অর্থাৎ বক্তা বলেছে, আমি কাউকে দেখিনি। এ কারণে ব্যাপকতা এবং সংকীর্ণতার নিয়মের ভিত্তিতে বক্তা ছাড়া অন্যের জন্য হুকুমটি মাফউলের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি পৃথিবীর সব মানুষকে দেখেছে। আর এটা করা হবে বক্তাকে না-বাচকের দ্বারা যে তাখসীস করা হয়েছে তার অর্থের পূর্ণতার জন্য। কেননা, আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, তাখসীসের অর্থ হচ্ছে বক্তা (মুসনাদ ইলাইহ) থেকে যা নেতিবাচক হয়েছে হুবহু তাই অন্যের জন্য ইতিবাচক হবে।

লেখক বলেন, مَا أَنَا ضَرَيْتُ إِلَّا زَيْدًا এ বাক্যটিও বিশুদ্ধ নয়। কারণ, এ বাক্যের দাবি হচ্ছে বক্তা ছাড়া অন্য ব্যক্তি যাকে ছাড়া পৃথিবীর সবাইকে মেরেছে, অথচ এমনটা অসম্ভব।

এমন অর্থ করার কারণ হচ্ছে বাক্যের মুসনাদ মিনহু উহ্য আছে- যা ব্যাপকতার অর্থ বহন করে। উহ্য শব্দসহ বাক্যটি এক্লপ- مَا أَنَا ضَرَيْتُ أَحَدًا إِلَّا زَيْدًا অর্থ- আমি যাকে ছাড়া অন্য কাউকে মারিনি। অতএব, বক্তা ছাড়া অন্যের জন্য কথাটি হ্যাঁ-বাচক আকারে এভাবে হবে- অন্য ব্যক্তি যাকে ছাড়া সবাইকে মেরেছে।

মোটকথা, পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে মুসনাদ ইলাইহ থেকে যা ব্যাপকভাবে নেতিবাচক হয় মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্যের জন্য তা ব্যাপকভাবে ইতিবাচক হয়। আর এখানে তাই হয়েছে। কিন্তু ইতিবাচকের অর্থটি অসম্ভব হওয়ার কারণে নেতিবাচক বাক্যটি বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, নেতিবাচক বাক্যটিই সেই অসম্ভব অর্থকে ধারণ করছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, এ অধ্যায়ে মূল্যবান কতিপয় বিষয় রয়েছে, যার আলোচনা আমি ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুতাওয়াল দেওয়া হয়েছে। সংক্ষিপ্ত এই কিতাবে স্থানাভাবে তা করা যায়নি, যাদের আগ্রহ রয়েছে তারা মুতাওয়াল দেখতে পারেন।

সার-সংক্ষেপ :

যেহেতু মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা উল্লিখিত ইসম থেকে হুকুমকে নফী করে এবং অন্যের জন্য হুকুম সাবিত করে, তাই এ উদাহরণ- لَا غَيْرِي فَكُنْتُ هَذَا وَلَا غَيْرِي শুদ্ধ হবে না। কারণ, এ বাক্যটিতে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। مَا أَنَا فَكُنْتُ দ্বারা মুতাকাল্লিম ছাড়া অন্যের হুকুম সাবিত হয় আর لَا غَيْرِي দ্বারা অন্যদের থেকে হুকুম নফী হয়।

তদ্রূপ مَا أَنَا رَأَيْتُ أَحَدًا ও শুদ্ধ নয়। কেননা, এ বাক্যের বিপরীতক্রমে যা প্রমাণিত হয় তা অসম্ভব বিষয়। অর্থাৎ আমি ব্যতীত অন্যরা পৃথিবীর সকলকে দেখেছে।

তদ্রূপ مَا أَنَا ضَرَيْتُ إِلَّا زَيْدًا বাক্যটি শুদ্ধ নয়। কারণ, এর দ্বারাও অসম্ভব বিষয় আবশ্যক হয়। কারণ, শেষোক্ত

وَأَلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفُ النَّفْيِ بَأَنَّ لَا يَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَرْفُ النَّفْيِ أَوْ يَكُونُ حَرْفُ النَّفْيِ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَقَدْ يَأْتِي التَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِصِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ انْفِرَادَ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمَذْكُورِ بِهِ أَيْ بِالْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ أَوْ زَعَمَ مُشَارَكَتَهُ أَيْ مُشَارَكَةَ الْغَيْرِ فِيهِ أَيْ فِي الْخَبَرِ الْفِعْلِيِّ نَحْوُ أَنَا سَعَيْتُ فِي حَاجَتِكَ لِمَنْ زَعَمَ انْفِرَادَ الْغَيْرِ بِالسَّغْيِ فَيَكُونُ قَصْرَ قَلْبٍ أَوْ زَعَمَ مُشَارَكَتَهُ لَكَ فِي السَّغْيِ فَيَكُونُ قَصْرَ انْفِرَادٍ وَيُؤَكِّدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ انْفِرَادًا لِغَيْرِ بِنَحْوِ لَا غَيْرِي مِثْلُ لَا زَيْدٌ وَلَا عَمْرُو لِمَنْ سِوَايَ لِأَنَّهُ الدَّالُّ صَرِيحًا عَلَى إِزَالَةِ شُبْهَةِ أَنَّ الْفِعْلَ صَدَرَ عَنِ الْغَيْرِ وَيُؤَكِّدُ عَلَى الثَّانِي أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ الْمُشَارَكَةَ بِنَحْوِ وَحْدِي مِثْلُ مُتَفَرِّدًا أَوْ مُتَوَحِّدًا أَوْ غَيْرَ مُشَارِكٍ لِأَنَّهُ الدَّالُّ صَرِيحًا عَلَى إِزَالَةِ شُبْهَةِ إِشْتِرَاكِ الْغَيْرِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّكْيِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ لِدَفْعِ شُبْهَةِ خَالَجَتْ قَلْبَ السَّامِعِ -

অনুবাদ : অন্যথায় অর্থাৎ যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচক অক্ষরের সাথে মিলিত না হয়- এভাবে যে, বাক্যে কোনো না-বাচক অক্ষরই নেই, অথবা তা আছে; কিন্তু মুসনাদ ইলাইহের পরে হয়, তখন মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তীতা তাখসীসের জন্য হয়, এমন ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করার জন্য যে, উল্লিখিত (মুসনাদ ইলাইহ ভিন্ন) অন্য ব্যক্তি একাকী কাজটি করেছে বলে ধারণা করে। অথবা তার সাথে অন্যকে অংশীদার বলে ধারণা করে। যেমন- **أَنَا سَعَيْتُ فِي حَاجَتِكَ** অর্থাৎ আমিই তোমার প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা করেছি (এমন ব্যক্তিকে বলল) যে ধারণা করছে অন্য কেউ একা চেষ্টা করেছে- **عِطَا قَصْرَ قَلْبٍ**-এর ক্ষেত্রে। অথবা সে ধারণা করছে চেষ্টার ব্যাপারে অন্য তোমার সাথে অংশীদার। তাহলে **عِطَا قَصْرَ انْفِرَادٍ** হবে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ যে অন্যের একাকী কাজটি করার ধারণা করছে তার ধারণা খণ্ডন করার অবস্থায় তাকিদ আনা হবে **لَا غَيْرِي** জাতীয় শব্দ দ্বারা, যেমন **لَا زَيْدٌ** - **لَا عَمْرُو** ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সুস্পষ্টভাবে এ সন্দেহ দূরকারী যে, কাজটি অন্য কারো থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ অংশিদারিত্বের ধারণাকারীর সন্দেহ খণ্ডনকালে **وَحْدِي** জাতীয় শব্দ দ্বারা তাকিদ আনা হবে, যেমন **مُتَفَرِّدًا**, **مُتَوَحِّدًا** ও **غَيْرَ مُشَارِكٍ** ইত্যাদি। কেননা, এগুলো সুস্পষ্টভাবে কাজে অন্যের অংশীদারিত্বের সন্দেহ অপনোদন করে, আর তাকিদ আনা হয় ঐ দ্বিধা দূর করার জন্য যা শ্রোতার মনে বাসা বাঁধে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلِ الْخ : মূল লেখক বলেন, যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের অক্ষরের সাথে না মিলে আসে তখন তা কখনো তাখসীস করার অর্থ- আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত না হওয়ার দু'টি অবস্থা-

১. বাক্যের মধ্যে না-বাচক হরফ থাকবে না।

২. বাক্যের মধ্যে না-বাচক হরফ থাকলেও তা মুসনাদ ইলাইহের পর আসবে।

এ দু' অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ হয়তো তাখসীসের কাজ করবে। এ তাখসীস দ্বারা হয়তো উদ্দেশ্য হবে এমন ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করা যে মনে করছে ক্রিয়াবাচক মুসনাদ (খবরটি) উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ (বক্তা) করেনি; বরং অন্য কেউ করেছে।

অথবা, তাখসীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এমন ব্যক্তির ধারণা খণ্ডন করা, যে ধারণা করে উক্ত কাজটি মুসনাদ ইলাইহ একা করেনি; বরং এতে মুসনাদ ইলাইহের সাথে অন্যরা শরিক ছিল। যেমন- **أَنَا سَعَيْتُ فَنِي حَاجَتِكَ** অর্থাৎ আমিই তোমার প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে শ্রোতা যদি ধারণা করে থাকে কাজটি মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য কেউ করেছে, তাহলে এটি **فَضَرَ قَلْبُ** হবে, আর যদি বাক্যের শ্রোতার ধারণা থাকে কাজটি উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ এবং অন্যরা সম্মিলিতভাবে করেছে, তাহলে এটি **فَضَرَ أَفْرَادُ** হবে।

যদি উক্ত বাক্যটিকে তাকিদযুক্ত করার ইচ্ছা করা হয়, তাহলে প্রথম অবস্থায় **لَا غَيْرَ** এবং এর মতো অর্থবোধক শব্দ যথা **لَا زَيْدٌ وَلَا عَمْرُو** ও **لَا مِنْ سِوَايَ** ইত্যাদি দ্বারা তাকিদ করা হবে। কেননা, এ জাতীয় শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, কাজটি শুধুমাত্র মুসনাদ ইলাইহ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কারো থেকে প্রকাশ পায়নি।

দ্বিতীয় অবস্থায় **وَحْدِي** এবং এর মতো অর্থবোধক শব্দ যথা **مُتَوَحِّدًا** ও **غَيْرُ مُشَارِكٍ** ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তাকিদ করা হবে। এ শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, কাজটি করার ব্যাপারে মুসনাদ ইলাইহের সাথে আর কোনো অংশীদার নেই; বরং উক্ত কাজের একমাত্র কর্তা হলো উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহ (বক্তা) অন্য কেউ নয়।

সার-সংক্ষেপ :

যদি অগ্রবর্তী মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে যুক্ত না হয় চাই সে বাক্যে তারপরে না-বাচকের হরফ থাকুক অথবা বাক্যটি হ্যাঁ-বাচক উভয় অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ **مقدم** করার দ্বারা **فَضَرَ قَلْبُ** অথবা **فَضَرَ أَفْرَادُ** হবে।

উভয় প্রকারের উদাহরণ হলো- **أَنَا سَعَيْتُ فَنِي حَاجَتِكَ** এ বাক্যটি শ্রোতার ধারণানুযায়ী উভয় **فَضَرَ**-এর উপমা হতে পারে।

فَضَرَ قَلْبُ হলে এর তাকিদ সামনের শব্দগুলো দ্বারা করা যাবে। যেমন- **لَا زَيْدٌ وَلَا عَمْرُو** ইত্যাদি।

فَضَرَ أَفْرَادُ-এর তাকিদের শব্দগুলো হচ্ছে- **وَحْدِي** -এর **مُتَوَحِّدًا** ও **مُتَفَرِّدًا** ইত্যাদি।

وَقَدْ يَأْتِي لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ وَتَقْرِيرِهِ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ دُونَ التَّخْصِصِ نَحْوُ هُوَ
يُعْطَى الْجَزِيلَ قَصْدًا إِلَى تَحْقِيقِ أَنَّهُ يَفْعَلُ إِعْطَاءَ الْجَزِيلِ وَسِرْدُ عَلَيْكَ تَحْقِيقُ
مَعْنَى التَّقْوَى وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا فَقَدْ يَأْتِي التَّقْدِيمُ لِلتَّخْصِصِ وَقَدْ يَأْتِي
لِلتَّقْوَى فَالْأَوَّلُ نَحْوُ أَنْتَ مَا سَعَيْتَ حَاجَتِي قَصْدًا إِلَى تَخْصِصِهِ بِعَدَمِ السَّغْيِ
وَالثَّانِي نَحْوُ أَنْتَ لَا تَكْذِبُ وَهُوَ لِتَقْوِيَةِ الْحُكْمِ الْمَنْفِيِّ وَتَقْرِيرِهِ فَإِنَّهُ أَشَدُّ لِنَفْيِ
الْكَذِبِ مِنْ لَا تَكْذِبُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكَرُّرِ الْإِسْنَادِ الْمَفْقُودِ فِي لَا تَكْذِبُ وَاقْتَصَرَ
الْمُصَنِّفُ عَلَى مِثَالِ التَّقْوَى لِيُفَرِّعَ عَلَيْهِ التَّفَرُّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَاكِيدِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ
كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا مِنْ لَا تَكْذِبُ أَنْتَ يَعْزِي أَنَّهُ أَشَدُّ لِنَفْيِ الْكَذِبِ مِنْ لَا تَكْذِبُ
أَنْتَ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَاكِيدًا لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ أَنْتَ أَوْ لِأَنَّ لَا تَكْذِبُ أَنْتَ لِتَاكِيدِ الْمَحْكُومِ
عَلَيْهِ بِأَنَّهُ هُوَ ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ تَحْقِيقًا وَلَيْسَ الْإِسْنَادُ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ السَّنْهِ
وَالْتَجَوُّزِ أَوْ النَّسْيَانِ لَا لِتَاكِيدِ الْحُكْمِ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْإِسْنَادِ وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنَ التَّقْدِيمِ
لِلتَّخْصِصِ تَارَةً وَالتَّقْوَى أُخْرَى إِنْ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُعَرَّبٍ -

অনুবাদ : কখনো মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ্য হুকুমকে শক্তিশালী করা এবং শ্রোতার মনে তাকে সুদৃঢ় করার জন্য হয়ে থাকে- তাখসীসের জন্য নয়। যেমন- هُوَ يُعْطَى الْجَزِيلَ (সেই অনেক দান করে) এ কথার ইচ্ছা করত যে, সে নিশ্চিতভাবে প্রচুর দান করার কাজটি করে। تقوى-এর অর্থের বিশ্লেষণ অচিরেই আসবে। এমনিভাবে যখন ক্রিয়াটি নেতিবাচক হয়। সুতরাং (নেতিবাচক অবস্থায়) মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ্য তাখসীসের জন্য কখনো হয়, আবার কখনো সুদৃঢ় করার জন্য হয়। প্রথম প্রকার (এর উদাহরণ) যেমন তুমিই আমার অভাব মোচনে চেষ্টা করনি। এটা তাকে চেষ্টা না করার সাথে খাস করার উদ্দেশ্যে (বলা হয়েছে)। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে أَنْتَ لَا تَكْذِبُ (তুমি মিথ্যা বলনি) এটা (উল্লিখিত) নেতিবাচক হুকুমকে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে (বলা হয়েছে)। কেননা, এটা أَنْتَ لَا تَكْذِبُ-এর তুলনায় প্রচণ্ডভাবে মিথ্যাকে না-বাচক করেছে। কেননা, এতে ইসনাদ-এর তাকরার হয়েছে যা নেই أَنْتَ لَا تَكْذِبُ-এর মধ্যে। মূল লেখক নেতিবাচক ফে'লের মধ্যে শুধুমাত্র تقوى-এর উদাহরণ দিয়েছেন, যাতে এর আলোকে এর মাঝে এবং মুসনাদ ইলাইহের তাকিদের মাঝে পার্থক্য আলোচিত হতে পারে। যেমনটি তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তার বাক্য এমনি أَنْتَ لَا تَكْذِبُ থেকেও। অর্থাৎ তা أَنْتَ لَا تَكْডِبُ মিথ্যাকে না-বাচক করার ক্ষেত্রে أَنْتَ لَا تَكْডِبُ থেকে অধিক কঠোর। অথচ এর মধ্যেও তাকিদ রয়েছে। কেননা أَنْتَ لَا تَكْডِبُ শব্দটি অথবা أَنْتَ لَا تَكْডِبُ মুসনাদ ইলাইহের তাকিদের জন্য, এভাবে তা নিশ্চিতভাবে মধ্যম পুরুষের সর্বনাম, তার প্রতি ভুলক্রমে, রূপকভাবে কিংবা অজ্ঞাতভাবে নিসবত করা হয়নি। হুকুমের তাকিদের জন্য নয় ইসনাদের তাকরার না থাকার কারণে। এই যে উল্লেখ করা হলো তাকদীম (মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা) কখনো তাখসীসের জন্য কখনো শক্তিশালী করার জন্য, যদি ফে'লটি মা'রুফ হয়।

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَدْ يَأْتِي لِتَقْوِيَةِ الْخ : মূল লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ যদি না-বাচকের হরফের সাথে না মিলে আসে, তখন তার ফে'লের আগে আসা- কখনো যেমন তাখসীসের জন্য হয় তেমনি কখনো শ্রোতার মনের মধ্যে হুকুমকে সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী করার জন্য হয়ে থাকে, তাখসীসের জন্য হয় না। যেমন- يُعْطَى الْجَزِيلُ তথা সে খুব দানশীল, এ উদাহরণের মধ্যে অধিক দানের হুকুমটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আর এটা এভাবে যে, প্রথমত هو মুবতাদা বলার সাথে সাথে একটি খবরের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতঃপর যখন يعطى বলা হলো তখন এর নিসবত মুবতাদা (هو)-এর দিকে হয়েছে এবং এর দ্বারা اعطاء (কাজটি) মুবতাদার জন্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। অতঃপর يعطى ফে'লটির মাধ্যে একটি সর্বনাম রয়েছে যার مرجع হচ্ছে মুবতাদা, ফে'ল তার সর্বনামের প্রতি মুসনাদ হয়েছে। অতএব, يعطى-এর নিসবত দু'বার হয়েছে মুবতাদার দিকে এবং اعطاء-এর কাজটি মুবতাদার জন্য দু'বার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যেন বাক্যটি এমন হলো يُعْطَى زَيْدُ الْجَزِيلِ يُعْطَى زَيْدُ الْجَزِيلِ। দু'বার ইসনাদ হওয়া এবং হুকুম দু'বার হওয়ার দ্বারা বাক্যের মধ্যে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয় এবং হুকুমটি সুদৃঢ় হয়। সুতরাং هو يعطى الْجَزِيلُ বাক্যটির মধ্যে হুকুমটি শক্তিশালী হয়েছে।

মূল লেখক বলেন, এমনভাবে যখন ফে'ল না-বাচক হয় অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে প্রথমে আনা হয়, এরপর নফীর অক্ষর আসে ফে'লের উপর, তখন মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ কখনো তাখসীস-এর অর্থ প্রদান করে, আবার কখনো হুকুমকে সুদৃঢ় করার অর্থ প্রদান করে।

তাখসীসের উদাহরণ হচ্ছে اَنْتَ مَا سَعَيْتَ فِي حَاجَتِي অর্থাৎ তুমিই আমার অভাব পূরণ করনি। এ উদাহরণে- عَدَم سَعَى দ্বারা মুসনাদ ইলাইহ খাস করা হয়েছে এবং মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য থেকে হুকুমটিকে প্রমাণ করা হয়েছে। অতএব, এ উদাহরণটিতে مَا اَنَا قُلْتُ هَذَا-এর মতো তাখসীস হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে- اَنْتَ لَا تَكْذِبُ তুমি মিথ্যা বলনি, এ উদাহরণটিতে হুকুম শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় হয়েছে। কেননা, এতে মিথ্যাকে لَا تَكْذِبُ এবং اَنْتَ لَا تَكْذِبُ-এর তুলনায় চরমভাবে না-বাচক করা হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে اَنْتَ لَا تَكْذِبُ-এর মধ্যে ইসনাদ দু'বার হয়েছে। প্রথমবার সরাসরি لَا تَكْذِبُ-এর নিসবত হয়েছে انت (মুবতাদা)-এর দিকে, এরপর لَا تَكْذِبُ-এর সর্বনামের দিকে যার مرجع মূলত মুবতাদা। আমরা ইতঃপূর্বে বলে এসেছি যে, ইসনাদের তাকরার দ্বারা হুকুম শক্তিশালী হয়। আর তাই এখানে হুকুম শক্তিশালী হয়েছে। পক্ষান্তরে لَا تَكْذِبُ-এর মধ্যে ইসনাদের তাকরার হয়নি।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুসান্নিফ (র.) হুকুম শক্তিশালী হওয়ার কারণ নির্ধারণ করেছেন ইসনাদের তাকরারকে। সে মতে যেসব স্থানে ইসনাদের তাকবার দ্বারা তাখসীস হয়েছে, সেখানে তো হুকুমও শক্তিশালী হয়েছে, অতএব মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক এ দু'টির আলাদা দু'টি উদাহরণ দেওয়ার কি দরকার ছিল?

এর উত্তর হচ্ছে- কোনো বিষয় স্বতন্ত্রভাবে উদ্দেশ্য হওয়া এবং এমনিতে অর্জিত হওয়া এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। তাখসীসের মধ্যে হুকুম শক্তিশালী হয় বটে; কিন্তু তা মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নয়; বরং উদ্দেশ্যহীনভাবে হাসিল হয়। যেহেতু মূল লেখক মূল উদ্দেশ্য হিসেবে দু'প্রকার করেছেন এ হিসেবে দু'টি আলাদা প্রকার হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى مِثَالٍ : এ বাক্যের দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে যখন ফে'ল না-বাচক হয় তখন মুসনাদ ইলাইহের প্রথমোল্লেখ। তাখসীস এবং হুকুমকে শক্তিশালী করা উভয় অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু লেখক تَقْوَى حُكْم (হুকুম শক্তিশালী করা)-এর উদাহরণ দিলেন, কিন্তু তাখসীসের উদাহরণ দিলেন ন কেন? এর উত্তর হচ্ছে- ইতঃপূর্বে তাখসীস এবং হুকুম শক্তিশালী করা উভয়ের উদাহরণ আলোচনায় গত হয়েছে। এ কারণে এর উদাহরণ উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু লেখক হুকুম শক্তিশালী করার উদাহরণটিকে মুসনাদ ইলাইহের

তাকিদের সাথে এর পার্থক্য উল্লেখ করার জন্য এনেছেন। এ কারণে তিনি বলেছেন **أَنْتَ تَكْذِبُ**-এর মধ্যে না-বাচক হওয়ার অর্থ **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ** থেকে অনেক বেশি। যদিও **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ**-এর মধ্যে **أَنْتَ** দ্বারা মুসনাদ ইলাইহের তাকিদ আনা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ**-এর মধ্যে **أَنْتَ** হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ ও ফায়েলের তাকিদ। মূলত মুসনাদ ইলাইহ হচ্ছে **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ**-এর মধ্যে সর্বনাম লুক্কায়িত আছে। এ তাকিদের উদ্দেশ্য হচ্ছে **كُذِبَ**-এর নিসবত মধ্যম পুরুষের সর্বনামের প্রতি ভুলক্রমে, অজ্ঞাতসারে এবং রূপকভাবে হয়নি; এ কথা প্রমাণ করা। এ উদাহরণে **أَنْتَ** শব্দটি হুকুমের তাকিদের জন্য নয়। হুকুমের তাকিদ হওয়ার জন্য ইসনাদের তাকরার হতে হয়। এখানে তো ইসনাদের বা হুকুমের তাকরার হয়নি। অতএব, **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ**-এর মধ্যে হুকুমের তাকিদ হয়নি; বরং এতে **مَعْكُومٌ عَلَيْهِ**-এর তাকিদ হয়েছে। আর হুকুমের তাকিদ **مَعْكُومٌ عَلَيْهِ** (যার ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হয়)-এর তাকিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিকতর শক্তিশালী। হুকুমের তাকিদ হলে এতে ইসনাদের তাকরার হয় আর ইসনাদের তাকরার হলে হুকুম শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে যার ব্যাপারে হুকুম দেওয়া হয়, তার মধ্যে ইসনাদের তাকরার হয় না এবং এতে ইসনাদ একটি থাকে। **مَعْكُومٌ عَلَيْهِ**-এর তাকরার উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা এর রূপকার্থ হওয়া, ভুল হওয়া এবং অজ্ঞাতভাবে বলা- এসব সন্দেহ দূরীভূত হয়।

মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের বক্তব্য : **وَقَدْ يَأْتِي لِلتَّخْصِصِ وَقَدْ يَأْتِي لِقَوَّةٍ** এমন অবস্থার সাথে খাস যখন ফে'লের নির্দিষ্টজ্ঞাপক উপরোক্ত হুকুম হবে না। অতএব, বুঝা গেল যে, উক্ত বিধান সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়।

সার-সংক্ষেপ :

ক. কখনো মুসনাদ ইলাইহকে **مُقَدَّم** করা হয় শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য। এ ক্ষেত্রে তাখসীস-এর কোনো অর্থ পাওয়া যাবে না। যেমন- **مَرُّ يَعْطَى الْجَزِيلَ**

খ. যদি মুসনাদ ইলাইহকে **مُقَدَّم** করা হয় তারপর না-বাচকের হরফ যুক্ত ফে'ল আসে (**فِعْلٌ مَنْفِي** আসে) তাহলে এই অপ্রবর্তীতা কখনো তাখসীসের অর্থ প্রদান করে অপর কখনো হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। তাখসীসের উদাহরণ- ১. **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ** হুকুম শক্তিশালী করার উদাহরণ- ২. **أَنْتَ لَا تَكْذِبُ**

وَأَنَّ بُنِيَ الْفِعْلُ عَلَى مُنْكَرٍ أَفَادَ التَّقْدِيمُ تَخْصِيصَ الْجِنْسِ أَوْ الْوَاحِدِ بِهِ أَيْ
بِالْفِعْلِ نَحْوَ رَجُلٍ جَاءَ نَيْ أَيْ لَا إِمْرَأَةً فَيَكُونُ تَخْصِيصَ جِنْسٍ أَوْ لَا رَجُلًا فَيَكُونُ
تَخْصِيصَ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ حَامِلُ الْمَعْنَيْنِ الْجِنْسِيَّةِ وَالْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ
أَعْنَى الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ مُفْرَدًا أَوْ الْإِثْنَيْنِ إِنْ كَانَ مُثْنَى أَوْ الزَّائِدِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ جَمْعًا
فَاصْلُ النَّكِرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَنْ يَكُونَ لِرَّوَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ فَقَدْ يُقْصَدُ بِهِ الْجِنْسُ فَقَطْ وَقَدْ
يُقْصَدُ بِهِ الْوَاحِدُ فَقَطْ وَالَّذِي يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخِ فِي دَلَائِلِ الْأَعْجَازِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ
الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ فِي أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ قَدْ يَكُونُ لِلتَّخْصِيصِ وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّقْوَى -

অনুবাদ : আর যদি ফে'লের ভিত্তি অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক বিশেষ্যের উপর হয়, তাহলে (মুসনাদ ইলাইহের) প্রথমে আসা ফে'ল এর দ্বারা তাখসীসুল জিনস অথবা তাখসীসে ওয়াহিদ-এর অর্থ দিবে, যেমন- আমার কাছে পুরুষ এসেছে অর্থাৎ মহিলা নয়- তাহলে এটা তাখসীসে জিনস হবে। অথবা দু'জন পুরুষ নয়, তাহলে তাখসীসে ওয়াহিদ। আর এটা এ কারণে যে, ইসমে জিনস এ দু'টি অর্থ ধারণ করে- জিনসের এবং নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্থাৎ তা একক হলে এককের, দ্বিবাচনের হলে দ্বিবাচনের, অথবা এর চেয়ে বেশি যদি বহুবাচন হয়, অনির্দিষ্ট এককের মূলার্থ জিনসের এককের জন্য। তাই কখনো এর দ্বারা জিনসের ইচ্ছা করা হয়। কখনো এর দ্বারা এককের অর্থ করা হয়। শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর বক্তব্যে যে ইঙ্গিত বহন করে তা হচ্ছে ফে'লের ভিত্তি নির্দিষ্টজ্ঞাপক এবং অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক হওয়াতে কোনো পার্থক্য নেই। এগুলো কখনো তাখসীসের জন্য হবে আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَإِنَّ بُنِيَ الْفِعْلُ الخ : ইতঃপূর্বে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী করার আলোচনাতে এ কথা বলা হয়েছে যে, যদি মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্টজ্ঞাপক হয় ইসমে যাহির হোক অথবা সর্বনাম এবং মুসনাদ ইলাইহ না-বাচক অক্ষরের সাথে মিলিত না হয়। অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে হয়তো কোনো না-বাচক হরফ নেই অথবা থাকলেও তা মুসনাদ ইলাইহ থেকে বিচ্ছিন্ন, এসব অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ আপন স্থান থেকে আগে আসার দ্বারা কখনো তাখসীসের অর্থ অর্জিত হয়, আবার কখনো হুকুম শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য হয়। পূর্বের উদাহরণ দ্বারা এসব সুস্পষ্ট হয়েছে। যদি মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্টজ্ঞাপক হয়- চাই না-বাচকের অক্ষর মিলিত হয়ে আসুক অথবা মিলিত না হয়ে আসুক, উভয়াবস্থায় মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ দেবে। তাখসীস দু' প্রকার : ১. তাখসীসে জিনস, ২. তাখসীসে ওয়াহিদ। তাখসীসে জিনসের অর্থ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহকে জিনসের সাথে খাস করবে। ফলে অন্য জিনসের প্রকার এ থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন- رَجُلٌ جَاءَ نَيْ অর্থাৎ আমার কাছে পুরুষ এসেছে মহিলা আসেনি। এখানে মুসনাদ ইলাইহ পুরুষ জাতির সাথে খাস। এমতাবস্থায় একজন, দু'জন অথবা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক এটা উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। তাখসীসে ওয়াহিদ বলা হয়, মুসনাদ ইলাইহকে সংখ্যার সাথে খাস করা, যেমন- رَجُلٌ جَاءَ نَيْ অর্থাৎ আমার কাছে একজন মাত্র পুরুষ এসেছে অর্থাৎ দুই বা দুই-এর অধিক আসেনি। এখানে আগমন করার কাজটি একজন ব্যক্তির নামে খাস করা হয়েছে- এখানে আগমনকারী পুরুষ নাকি মহিলা এ বলা উদ্দেশ্য নয়।

ইসমে জিনস দ্বারা দু' ধরনের তাখসীস উদ্দেশ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, ইসমে জিনসের মধ্যে দু'টি অর্থ রয়েছে- ১. জিনস বা ব্যক্তিগত সত্তা, ২. নির্দিষ্ট সংখ্যা সুতরাং ইসমে জিনস যদি একবচন হয়, তাহলে তাতে জিনস এবং এককের অর্থ বিদ্যমান থাকে। যদি দ্বিবচন হয়, তাহলে তাতে দুই এবং জিনসের অর্থ থাকে। যদি ইসমে জিনস বহুবচন হয়, তাহলে তাতে দুই-এর অধিক এবং জিনসের অর্থ থাকে। যেহেতু ইসমে জিনসটা জিনস (জাতি) এবং সংখ্যা উভয়ের অর্থের সম্ভাবনাপূর্ণ এমতাবস্থায় যদি ইসমে জিনস দ্বারা জিনস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সংখ্যার অর্থ বাদ পড়বে। যেমন- একবচনের উদাহরণ **رَجُلٌ جَاءَنِي لَا امْرَأَتَيْنِ** (দ্বিবচনের উদাহরণ) তাখসীসে জিনস উদ্দেশ্য তখনই হবে, যখন শ্রোতা ধারণা করবে (উদাহরণ স্বরূপ-) মহিলা এসেছে পুরুষ আসেনি অথবা যখন ধারণা করবে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে এসেছে। শ্রোতার প্রথম ধারণার সময় এটি **قَصَرَ قَلْبٌ** হবে আর শ্রোতার দ্বিতীয় ধারণার সময় এটি **قَصَرَ اَفْرَادٌ** হবে।

আর যদি বক্তা সংখ্যার তাখসীস করার ইচ্ছা করে তাহলে তাখসীসের দ্বারা সেই সংখ্যা না-বাচক হবে যা তাখসীসকৃত সংখ্যার বিপরীত। যেমন- একবচনের মধ্যে **رَجُلٌ جَاءَنِي لَا اِثْنَانِ وَلَا جَمَاعَةً** দ্বিবচনের উদাহরণের ক্ষেত্রে **رَجُلَانِ جَاءَنِي لَا** এভাবে বাক্য তখনই বলা হবে যখন শ্রোতার ধারণা বক্তার ধারণার বিপরীত হবে। এখানেও শ্রোতার ধারণানুসারে এটা **قَصَرَ قَلْبٌ** এবং **قَصَرَ اَفْرَادٌ** উভয়টাই হতে পারে।

قَوْلُهُ فَاصْلُ التَّكْرَةِ الْمَفْرُودَةِ اَنْ يَكُونَ لَوَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) তার পূর্বের দাবি ইসমে জিনস জিনস (জাতি) এবং সংখ্যা উভয়ের অর্থ ধারণ করে এর পক্ষে দলিল দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, **نِكْرَةٌ مَفْرُودَةٌ** বা একক অনির্দিষ্ট শব্দ যাকে ইসমে জিনস বলা হয়- এর মূলার্থ হচ্ছে তা জিনসের এককে ব্যবহার হয় এবং এতে জিনসের অর্থ লক্ষণীয় হয়। মোটকথা, ইসমে জিনস অনির্দিষ্ট একবচন হলে তা একক অর্থ এবং জাতি উভয়টি বুঝায়। কখনো এ দু অর্থ থেকে যে-কোনো একটি অর্থ যেমন জিনস উদ্দেশ্য করা হয় অন্যটির উদ্দেশ্য করা হয় না। আবার কখনো একবচনের অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়; কিন্তু জিনসের উদ্দেশ্য করা হয় না।

قَوْلُهُ وَالَّذِي يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الشَّيْخِ الْخ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ মূল লেখকের উপর আপত্তি করেছেন। মূল লেখক বলে, শায়খের মতামত তুলে ধরেছেন তার মাযহাব হিসেবে। এক পর্যায়ে এসে তিনি বলেন, যদি ফে'লের ভিত্তি অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহের উপর হয় তাহলে তা কেবল তাখসীসের অর্থ প্রদান করে হুকুমের শক্তিশালী হওয়ার অর্থ প্রদান করে না। অথচ এটা শায়খের মাযহাব মতে সঠিক নয়। কেননা, শায়খের লিখিত দালাইলুল ই'জায় গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ফে'লের ভিত্তি মুসনাদ ইলাইহের উপর হলে তা কখনো তাখসীসের অর্থ প্রদান করে আবার কখনো হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে মুসনাদ ইলাইহের নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট উভয় অবস্থায় এতে কোনো পার্থক্য নেই।

অতএব, মূল লেখক এ আলোচনায় শায়খের মাযহাব সঠিকভাবে বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

সার-সংক্ষেপ :

যদি মুসনাদ ইলাইহ **نِكْرَةٌ** হয় এবং এর পরবর্তী ফে'লের ভিত্তি উক্ত **نِكْرَةٌ**-এর উপর হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা তাখসীস পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, তাখসীস দু' প্রকার- ১. **تَخْصِيصُ الْفَرْدِ** ২. **تَخْصِيصُ الْوَاحِدِ** **اِمْرَأَةٍ** বলে **رَجُلٌ جَاءَنِي** বলা হয় যাতে এক জিনসকে অন্য জিনসে থেকে খাস করা। যেমন- **تَخْصِيصُ الْوَاحِدِ** থেকে খাস করা।

تَخْصِيصُ الْفَرْدِ বলা হয়, কোনো সংখ্যাকে খাস করা। যেমন- **رَجُلٌ جَاءَنِي**-এর দ্বারা উদ্দেশ্য মাত্র একজন লোক এসেছে, একাধিক লোক আসেনি।

মুসনাদ ইলাইহ **نِكْرَةٌ** যদি **مُقَدَّمٌ** হয়, তাহলে উভয় প্রকারের তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়। শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মতে **مَعْرُفَةٌ** এবং **نِكْرَةٌ** মুসনাদ ইলাইহের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের **تَفْذِيْمٌ** তাখসীস ও হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে।

وَوَافَقَهُ أَيْ عَبْدَ الْقَاهِرِ السَّكَائِكِيِّ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ يُفِيدُ التَّخْصِصَ
 لَكِنْ خَالَفَهُ فِي شَرَائِطٍ وَتَفَاصِيلَ فَإِنَّ مَذْهَبَ الشَّيْخِ أَنَّهُ إِنْ وَلِيَ حَرْفَ النَّفْيِ فَهُوَ
 لِلتَّخْصِصِ قَطْعًا وَلَا فَقَدْ يَكُونُ لِلتَّخْصِصِ وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّقْوِي مُضْمَرًا كَانَ أَوْ
 مُظْهَرًا مُعَرَّفًا أَوْ مُنْكَرًا مُثْبَتًا كَانَ الْفِعْلُ أَوْ مَنْفِيًّا وَمَذْهَبُ السَّكَائِكِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ
 نَكِرَةً فَهُوَ لِلتَّخْصِصِ إِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً فَإِنْ كَانَ مُظْهَرًا فَلَيْسَ
 إِلَّا لِلتَّقْوِي وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا فَقَدْ يَكُونُ لِلتَّقْوِي وَقَدْ يَكُونُ لِلتَّخْصِصِ مِنْ غَيْرِ
 تَفْرِيقَةٍ بَيْنَ مَا يَلِي حَرْفَ النَّفْيِ وَغَيْرِهِ وَالْيَ هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ التَّقْدِيمَ يُفِيدُ
 الْإِخْتِصَاصَ إِنْ جَازَ تَقْدِيرُ كَوْنِهِ أَيْ كَوْنِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ
 مَعْنَى فَقَطْ لَا لَفْظًا نَحْوُ أَنَا قُمْتُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ أَنَّ أَصْلَهُ قُمْتُ أَنَا فَيَكُونُ أَنَا
 فَاعِلًا مَعْنَى تَاكِيدًا لَفْظًا وَقَدَّرَ عَطْفٌ عَلَى جَازٍ يَعْنِي أَنَّ إِفَادَةَ التَّخْصِصِ مَشْرُوطَةٌ
 بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا جَوَازُ التَّقْدِيرِ وَالْآخَرُ أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ أَيْ يُقَدَّرَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا -

অনুবাদ : সাক্বাকী (র.) শায়খ আব্দুল কাহিরের সাথে ঐকমত্য করেছেন এ ব্যাপারে অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ প্রদান করে। তবে তিনি (সাক্বাকী) তাঁর সাথে শর্তসমূহ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেন। শায়খের মতানুসারে যদি মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত হয়ে আসে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে তাখসীসের জন্য। অন্যথায় কখনো এটা তাখসীসের জন্য হয়, আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য হয়। সেটা সর্বনাম হোক অথবা ইসমে যাহির, নির্দিষ্ট হোক অথবা অনির্দিষ্ট (এমতাবস্থায়) ফে'ল হ্যা-বাচক হোক অথবা না-বাচক। আর সাক্বাকীর মাযহাব হচ্ছে, যদি তা (অগ্রবর্তী বিশেষ্যটি) অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তাখসীসের জন্য হবে। আর যদি নির্দিষ্ট ইসমে যাহির হয়, তাহলে শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য। আর যদি সর্বনাম হয় তাহলে কখনো তাখসীসের জন্য, কখনো হুকুম শক্তিশালী করার জন্য- না-বাচক হরফ মিলিত হওয়া বা না হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন (সামনের) এ উক্তি দ্বারা, তবে তিনি বলেছেন, মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়া তাখসীসের অর্থ দেয়, যদি এটা স্বরে নেওয়া হয় যে, মুসনাদ ইলাইহ প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্বর্তী ছিল, এ হিসেবে যে, তা অর্থগতভাবে ফায়েল ছিল শাব্দিকভাবে নয়। যেমন- **أَنَا قُمْتُ** এ বাক্যটির ক্ষেত্রে এ কথা মেনে নেওয়া সম্ভব যে, এটি **قُمْتُ أَنَا** ছিল। অতএব, **أَنَا** এখানে অর্থগতভাবে ফায়েল শাব্দিক তাকিদ হিসেবে। **قَدَّرَ** এটি আত্মফ হয়েছে **جَازَ**-এর উপর। অর্থাৎ তাখসীসের অর্থ বুঝানো দু'টি শর্তের উপর নির্ভরশীল। এর একটি হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাদ্বর্তী ছিল এটা উহ্য মানা সম্ভব হওয়া এবং অপরটি হলো উহ্য মেনে নেওয়া যে, এটি আসলেই পশ্চাদ্বর্তী ছিল।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَرَأَيْتُهُ أَيْ عَبْدَ الْخ: উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখকের বক্তব্য হচ্ছে- আল্লামা সাক্কাকী মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে শায়খের সাথে একমত। তবে তাদের মধ্যে শর্তসমূহ এবং বিস্তারিত বিশ্লেষণে পরস্পর মতবিরোধ রয়েছে।

শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মতানুসারে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করার মোট নয়টি অবস্থা রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এরূপ- মুসনাদ ইলাইহ (সাধারণভাবে) তিন প্রকার : ১. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট। ২. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্য বিশেষ্য (সর্বনাম নয়)। ৩. মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট এবং সর্বনাম। এ প্রত্যেকটি মুসনাদ ইলাইহের তিন অবস্থা। ক. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত হয়ে আসবে। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ পরপরেই আসবে। খ. বাক্যের মধ্যে না-বাচকের হরফ থাকবেই না। গ. বাক্যে না-বাচকের হরফ থাকবে, তবে তা মুসনাদ ইলাইহের পরে, আগে নয়। এ তিন প্রকারকে পূর্বের তিন প্রকারের মাঝে গুণন করলে (৩ × ৩ = ৯) নয় প্রকার হয়। অর্থাৎ

ক. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট হলে তিন প্রকার।

খ. নির্দিষ্ট প্রকাশ্য বিশেষ্য হলে তিন প্রকার এবং

গ. নির্দিষ্ট হয়ে সর্বনাম হলে তিন প্রকার।

ক এর তিন প্রকারের ব্যাখ্যা এরূপ যে,

১. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত এবং অনির্দিষ্ট।

২. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত এবং নির্দিষ্ট প্রকাশ্য বিশেষ্য।

৩. মুসনাদ ইলাইহ না-বাচকের হরফের সাথে মিলিত এবং সর্বনাম। তিন অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা শুধুমাত্র তাখসীসের অর্থ দিবে। এ ছাড়া বাকি ছয় প্রকার- (বাক্যের মধ্যে না-বাচকের হরফ নেই তিন প্রকার। না-বাচকের হরফ আছে তবে তা মুসনাদ ইলাইহের পরে এর তিন প্রকার)-এর মধ্যে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা কখনো তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়, কখনো এর দ্বারা হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে আল্লামা সাক্কাকীর মতানুসারে মুসনাদ ইলাইহ যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রবর্তী হওয়ার দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যাবে, তবে শর্ত হচ্ছে তাখসীস করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকতে হবে। যদি মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট এবং প্রকাশ্য বিশেষ্য হয়, তাহলে তার অগ্রগামী হওয়ার দ্বারা শুধুমাত্র হুকুম শক্তিশালী হবে (তাখসীস নয়), এতে না-বাচকের হরফ থাকুক বা না থাকুক, যদি থাকে তাহলে আগে আসুক বা না আসুক, সর্ব অবস্থায় একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি মুসনাদ ইলাইহ সুনির্দিষ্ট সর্বনাম হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা কখনো তাখসীস আবার কখনো হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। না-বাচকের হরফ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের আগে আসুক অথবা পরে আসুক- কিংবা বাক্যে না-বাচকের হরফ নাই থাকুক। এক কথায় আল্লামা সাক্কাকী তাখসীস ও হুকুম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে না-বাচকের হরফকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। অথচ শায়খ একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী এবং সাক্কাকীর মতামত বিশ্লেষণ করার পর দেখা যাচ্ছে মাত্র তিন অবস্থায় শায়খ এবং সাক্কাকীর মাঝে মতৈক্য রয়েছে। অবশিষ্ট ছয় অবস্থায় তাদের মাঝে মতানৈক্য।

যে তিনটি প্রকারে তাদের মাঝে মতৈক্য- সেগুলো হচ্ছে-

১. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট এবং না-বাচকের হরফের পরে এসেছে। এ অবস্থায় উভয়ের মতে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা শুধুমাত্র তাখসীসের অর্থ প্রদান করে।

২. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট ও সর্বনাম এবং না-বাচকের হরফ তার পরে আসে।

৩. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট সর্বনাম এবং বাক্যের মধ্যে কোনো না-বাচক হরফ না থাকে। এ (শেষ) দু' অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা উভয়ের মতে তাখসীস এবং হুকুমকে শক্তিশালী করার অর্থ প্রদান করে। এ ছাড়া অবশিষ্ট ছয় প্রকারের হুকুমের ক্ষেত্রে পরস্পরে মতবিরোধ বিদ্যমান।

উপরোক্ত নয় প্রকারের মধ্যে তিন প্রকারে সাক্ষাকী (র.) এবং শায়খ জুরজানী (র.)-এর মতৈক্য পাওয়া যায়। বাকি ছয় প্রকারের হুকুমে তাদের মাঝে মতবিরোধ। প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা সাক্ষাকী (র.)-এর মতে তাখসীসের অর্থ প্রদানের জন্য দু'টি শর্ত পাওয়া যেতে হবে- ১. মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাদ্বর্তী করা সম্ভব হওয়া। ২. পশ্চাদ্বর্তী করার বিষয়টি পাওয়া যাওয়া।

وَالْأَيُّ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطَانِ فَلَا يُفِيدُ التَّقْدِيمُ إِلَّا تَقْوَى الْحُكْمِ سَوَاءً جَازَ تَقْدِيرُ التَّأْخِيرِ
 كَمَا مَرَّ فِي أَنَا قُمْتُ أَوْ لَمْ يَقْدَرْ أَوْ لَمْ يَجْزْ تَقْدِيرُ التَّأْخِيرِ أَصْلًا نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ
 أَنْ يَقْدَرَ أَنْ أَصْلَهُ قَامَ زَيْدٌ فَقَدِمَ لِمَا سَنَذْكُرُهُ وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى هَذَا الْكَلَامِ أَنْ لَا يَكُونَ نَحْوُ
 رَجُلٌ جَاءَنِي مُفِيدًا لِلتَّخْصِصِ لِأَنَّهُ إِذَا أُخِرَ فَهُوَ فَاعِلٌ لَفْظًا لَا مَعْنَى اسْتِثْنَاهُ السَّكَائِي
 وَأَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ بِأَنْ جَعَلَهُ فِي الْأَصْلِ مُؤَخَّرًا عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنَى لَا لَفْظًا بِأَنْ يَكُونَ
 بَدَلًا مِنَ الضَّمِيرِ الَّذِي هُوَ فَاعِلٌ لَفْظًا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْنَى السَّكَائِي الْمُنْكَرَ بِجَعْلِهِ مِنْ
 بَابٍ وَاسْرُؤُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبْدَالِ مِنَ الضَّمِيرِ يَعْنِي قَدَرُ أَنْ أَصَلَ رَجُلٌ
 جَاءَنِي رَجُلٌ عَلَى أَنْ رَجُلًا لَيْسَ بِفَاعِلٍ بَلْ هُوَ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي جَاءَنِي كَمَا ذَكَرَ فِي
 قَوْلِهِ تَعَالَى وَاسْرُؤُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْ الْوَاقِعَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بَدَلٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ
 مِنْ هَذَا الْبَابِ لِئَلَّا يَنْتَفِي التَّخْصِصُ إِذْ لَا سَبَبَ لَهُ أَيُّ التَّخْصِصِ سِوَاهُ أَيُّ سِوَى تَقْدِيرِ
 كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا فِي الْأَصْلِ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ مَعْنَى وَلَوْلَا أَنَّهُ مُخَصَّصٌ لِمَا صَحَّ وَقُوعُهُ مُبْتَدَأٌ -

অনুবাদ : অন্যথায় অর্থাৎ যদি দু'টি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করবে। চাই তার পশ্চাতে থাকা বৈধ ছিল, কিন্তু উহ্য মানা হয়নি, যেমন أَنَا قُمْتُ-এর মধ্যে অথবা মূলত পশ্চাতে ছিল, কিন্তু এটা উহ্য মানা বৈধই নয়, যেমন زَيْدٌ কেননা, এতে এটা উহ্য মানা বৈধই নয় যে, এর মূল قَامَ ছিল, এরপর একে অগ্রবর্তী করা হয়েছে, এর কারণ অচিরেই আমরা আলোচনা করবো।

যেহেতু উপরোক্ত আলোচনার দাবি মতে رَجُلٌ جَاءَنِي তাখসীসের অর্থ দিচ্ছে না। কেননা, যদি এটা (رَجُلٌ)-কে পশ্চাদ্বর্তী করা হয়, তাহলে এটি শাদিকভাবে ফায়েল হবে, অর্থগতভাবে নয়। (এ কারণে) সাক্কাকী (র.) এটাকে পৃথক করেছেন এবং উপরোক্ত হুকুম থেকে বের করেছেন। এভাবে যে, তিনি মূলে একে পশ্চাদ্বর্তী করেছেন অর্থগত ফায়েলরূপে- শাদিকভাবে নয়, অর্থাৎ এটা সর্বনাম (শাদিক ফায়েল) থেকে বদল হয়েছে। এটাই তার (সামনের) উক্তির ভাবার্থ, সাক্কাকী نَكْرَةً পৃথক করেছেন- একে وَاسْرُؤُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا জাতীয় গণ্য করে, অর্থাৎ সর্বনাম থেকে বদল হয়েছে দাবি করে। অর্থাৎ رَجُلٌ جَاءَنِي-এর মূল رَجُلٌ মনে করা হবে এ হিসেবে যে, رَجُلٌ ফায়েল নয়; বরং جَاءَنِي-এর সর্বনাম থেকে বদল হয়েছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاسْرُؤُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا-এর মধ্যে যে وَآوُ হাচ্ছে ফায়েলটির প্রকৃত ফায়েল, الَّذِينَ الَّذِينَ-এর বদল (رَجُلٌ جَاءَنِي) একে তিনি وَاسْرُؤُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাতে এটি তাখসীসশূন্য না হয়। কেননা, এতে তাখসীসের অন্য কোনো সবব নেই, অর্থাৎ মূলে অর্থগত ফায়েলরূপে পশ্চাদ্বর্তী ছিল- এটা ছাড়া (তাখসীসের সবব নেই)। আর যদি এতে তাখসীস না হয়, তাহলে এটা মুবতাদা হতে পারত না, (অথচ মুবতাদা হয়েছে, সুতরাং তাখসীসও হয়েছে)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْأَيُّ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ النِّجْوَى : ইতপূর্বে তাখসীসের জন্য আল্লামা সাক্কাকী যে দু'টি শর্তারোপ করেছেন সেটা না পাওয়া গেলে কি সমস্যা হয় সে সম্পর্কে এ ইবারতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মূল লেখক বলেন, যদি শর্ত দু'টি না পাওয়া যায় তাহলে অগ্রবর্তী করার নিয়ম দ্বারা শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করা যাবে- তাখসীস করা যাবে না। যেমন প্রথম শর্ত পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত পাওয়া গেল না। অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাতে ছিল এটা বলা তো সম্ভব, যেমন **أَنَا قُتْتُ**-এর উদাহরণে বলা সম্ভব যে, এটা **أَنَا** ছিল। কিন্তু এ উদাহরণে আমরা মানছি না যে, এটি মূলে পশ্চাতেই ছিল।

তাহলে এখানে প্রথম শর্ত (পশ্চাতে উল্লিখিত হওয়া বৈধ) পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত (মূলে পশ্চাতে ছিল, এরপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে) পাওয়া গেল না। অথবা প্রথম শর্তই পাওয়া গেল না, অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ (মুবতাদা) ফে'লের পশ্চাতে থাকাই অবৈধ। যেমন- **زَيْدٌ قَامَ**-এর মধ্যে **زَيْدٌ** অর্থগত ফায়েলরূপে পশ্চাতে ছিল, এটা বলা বৈধ নয়। কেননা, যদি বলা হয় **زَيْدٌ قَامَ** মূলে **قَامَ** ছিল, তাহলে **زَيْدٌ** তারকীব **قَامَ**-এর শাব্দিক ফায়েল হচ্ছে, অর্থগত ফায়েল নয়। এমতাবস্থায় যদি বলা হয় যে, **زَيْدٌ** (শাব্দিক ফায়েল)-কে অগ্রবর্তী করা হয়েছে, তাহলে বলতে হয় শাব্দিক ফায়েলকে ফে'লের অগ্রবর্তী করা হয়েছে, আর শাব্দিক ফায়েলকে ফে'লের আগে আনা কোনো ক্রমেই বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضًى هَذَا الْكَلَامِ : এ বাক্য দ্বারা সাক্ষাকীর মাযহাবের ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে। সাক্ষাকী (র.) বলেছেন, দু'টি শর্ত একত্রে না পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহের অগ্রগামিতা শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করবে- তাখসীসের অর্থ দিবে না, সে মতে **رَجُلٌ جَاءَنِي** তাখসীসের অর্থ দিতে পারে না। কারণ, এতে প্রথম শর্তটি পাওয়া যায়নি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এরূপ যে, **رَجُلٌ جَاءَنِي**-এর ব্যাপারে যদি বলা হয় এটি **رَجُلٌ** ছিল, তাহলে **جَاءَ** তারকীব **رَجُلٌ**-এর শাব্দিক ফায়েল হচ্ছে। আর শাব্দিক ফায়েলকে ফে'লের আগে আনা অবৈধ। অতএব, **رَجُلٌ جَاءَنِي** মূলে **رَجُلٌ** ছিল না। দ্বিতীয়ত তাঁর মতে, অর্থগত ফায়েল তথা (বদল ও তাকিদ ইত্যাদি)-কে আগে আনার দ্বারাও তাখসীসের অর্থ পাওয়া যায়। এ বাক্যে **رَجُلٌ** যেহেতু অর্থগত ফায়েলরূপে অগ্রগামী হচ্ছে না, সেহেতু **رَجُلٌ** তাখসীসের অর্থ প্রদান করছে না। তাখসীসের অর্থ না দিলে একে মুবতাদা বানানো সহীহ হবে না।

সাক্ষাকীর পক্ষে এ আপত্তিকর জবাবে মুসান্নিফ বলেন, এ উদাহরণটি উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম। যদিও উপরের বর্ণিত নিয়মানুসারে এতে তাখসীস হতে পারে না; বরং শুধুমাত্র হুকুম শক্তিশালী হয়। তিনি বলেন, এ উদাহরণে **رَجُلٌ** মূলে ফে'ল (**جَاءَ**)-এর পরেই ছিল এবং অর্থগত ফায়েল রূপেই, এভাবে যে, **جَاءَ**-এর মধ্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা **جَاءَ**-এর শাব্দিক ফায়েল। আর **رَجُلٌ** সে সর্বনাম থেকে বদল হয়েছে। বদল অর্থগত ফায়েল। অতএব, **رَجُلٌ** বাক্যটিতে অর্থগত ফায়েল, আর অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তীতা তাখসীস সৃষ্টি করে। সুতরাং **رَجُلٌ**-কে মুবতাদা বানানো বিসৃদ্ধ হবে। এ ব্যাপারে মূল লেখকের বক্তব্য হলো- অনিদিষ্ট মুসনাদ ইলাইহকে সাক্ষাকী ইসতিছনা (ব্যতিক্রম) করেছেন এবং এ উদাহরণকে **أَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا**-এর সমগোত্রীয় বলেছেন। **أَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا**-এর তারকীব হচ্ছে **أَسْرَوْا**-এর সর্বনাম **وَأَوْ** হচ্ছে শাব্দিক ফায়েল, **وَأَوْ** হচ্ছে তার **رَجُلٌ** হতে বদল **رَجُلٌ** ও এমনই, অর্থাৎ **جَاءَ**-এর সর্বনাম ফায়েল এবং **رَجُلٌ** হচ্ছে তার বদল।

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাক্ষাকী (র.)-এর **رَجُلٌ جَاءَنِي**-কে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা এবং একে **أَسْرَوْا النَّجْوَى**-এর সমগোত্রীয় বলার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, **رَجُلٌ جَاءَنِي** জাতীয় উদাহরণকে **أَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا**-এর সমগোত্রীয় বলার কারণ হচ্ছে- এর মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি করা। কেননা, এখানে অর্থগত ফায়েল বলা এবং তাকে অগ্রবর্তী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া ছাড়া তাখসীস করার অন্য কোনো সুযোগ নেই। তাখসীস সৃষ্টি করার দরকার হচ্ছে এ জন্য যে, **رَجُلٌ**-কে মুসনাদ ইলাইহ এবং মুবতাদা যাতে বলা যায়। কারণ, তাখসীস হয়নি এমন (**نَكْرَةٌ**) অনিদিষ্ট বিশেষ্যকে মুবতাদা বানানো শুদ্ধ নয়।

সার-সংক্ষেপ :

আল্লামা সাক্ষাকী (র.)-এর যদি তাখসীস করার উভয় শর্ত না পাওয়া যায়, তাহলে **تَقْدِيمُ مُسْنَدِ الْيَبِ** শুধুমাত্র হুকুমকে শক্তিশালী করবে। যেমন- **زَيْدٌ قَامَ** এ বাক্য দ্বারা তাখসীসের অর্থ পাওয়া যাবে না, এর দ্বারা হুকুম শক্তিশালী হবে মাত্র।

رَجُلٌ جَاءَ-এর মধ্যে সাক্ষাকী (র.) কর্তৃক উল্লিখিত শর্ত পাওয়া যায় না। তবুও তার মধ্যে কিভাবে তাখসীস হলো?

এর জবাবে তিনি বলেন, এ জাতীয় **أَسْرَوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا**-এর মতো অর্থাৎ **رَجُلٌ جَاءَ**-এর জবাবে তিনি বলেন, এ জাতীয় **رَجُلٌ** মূলে **جَاءَنِي** ছিল, তবে **رَجُلٌ** এখানে **مَرْفُوعٌ** হয়েছে ফায়েলের **يَدٌ** হিসেবে ফায়েল হিসেবে নয়।

بِخِلَافِ الْمَعْرِفِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَقُوْعُهُ مُبْتَدَأٌ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ التَّخْصِيصِ فَلِزِمِ
اِرْتِكَابُ هَذَا الْوَجْهِ النِّبَعِيدِ فِي الْمُنْكَرِ دُونَ الْمَعْرِفِ فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزِمُهُ اِبْرَازُ الضَّمِيرِ
فِي مِثْلِ جَاءَنِي رَجُلَانِ وَجَاءَنِي رَجُلٌ وَالْاِسْتِعْمَالُ بِخِلَافِهِ قُلْنَا لَيْسَ مُرَادُهُ اَنَّ الْمَرْفُوعَ
فِي قَوْلِنَا جَاءَ نِي رَجُلٌ بَدَلٌ لَا فَاعِلٌ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقُولُ بِهِ عَاقِلٌ فَضَلًّا عَنْ فَاضِلٍ بَلِ
الْمُرَادُ اَنَّ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا رَجُلًا جَاءَنِي يُقَدَّرُ اَنَّ الْاَصْلَ جَاءَنِي رَجُلٌ عَلَى اَنَّ رَجُلًا بَدَلٌ لَا
فَاعِلٌ فَفِي مِثْلِ قَوْلِنَا رَجُلًا جَاءُونِي يُقَدَّرُ اَنَّ الْاَصْلَ جَاءُونِي رَجُلًا فَلْيَتَأَمَّلْ -

অনুবাদ : নির্দিষ্ট বিশেষ্য বা **مَعْرِفَة** তার বিপরীত, তাতে তাখসীসের বিষয়টি গ্রহণ করা ছাড়াও এটি মুবতাদা হতে পারে। অতএব, এ দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে, নির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে নয়। যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, এ মতানুসারে **جَاءَ نِي رَجُلَانِ** এবং **جَاءَ نِي رَجُلٌ**-এর মধ্যেও সর্বনামকে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা জরুরি, অথচ সাধারণ ব্যবহাররীতি এর বিপরীত। উত্তরে আমরা বলি, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, **جَاءَنِي**-এর পেশ বিশিষ্ট বিশেষ্যটি বদল হয়েছে, ফায়েল নয়, এ কথা তো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বলবে না। তবে সাক্ষাকীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি কী করে বলবেন; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের **جَاءَنِي رَجُلٌ** জাতীয় উক্তি যে, এর মূল **جَاءَنِي رَجُلٌ** ছিল এটা ধরে নেওয়া হবে। এ হিসেবে যে, **رَجُلٌ** তারকীবে বদল হবে-শাদ্বিক ফায়েল হবে না। সে মতে **رَجُلًا جَاءُونِي** জাতীয় আমাদের উক্তি এর মূল **رَجُلًا جَاءَ نِي** ছিল ধরে নেওয়া হবে। সুতরাং আপনি ভেবে দেখুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَعْرِفِ الخ : মূল লেখক বলেন, নির্দিষ্ট বিশেষ্য বা **مَعْرِفَة** তার বিপরীত। অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে তাখসীসের জন্য যে দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে তার প্রয়োজন নেই। কেননা, এতে কোনো ধরনের তাখসীস ছাড়াই এটা মুবতাদা হতেই পারে।

قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزِمُهُ اِبْرَازُ الضَّمِيرِ : এ ইবারত দ্বারা আল্লামা সাক্ষাকীর মতের উপর একটি আপত্তি করা হচ্ছে। আপত্তিটি হচ্ছে, সাক্ষাকীর মতানুসারে **رَجُلًا جَاءَنِي**-এর মূল হচ্ছে **جَاءَنِي رَجُلٌ**-এর সর্বনামটি ফায়েল, **رَجُلٌ** উক্ত ফায়েল থেকে বদল হয়েছে। তার এ মতের ফলশ্রুতিতে আবশ্যিক হয় যে, অনির্দিষ্ট (ফায়েল) যদি দ্বিবিচন এবং বহুবিচন হয়, তাহলে এর ফেলের মধ্যেও (দ্বিবিচন ও বহুবিচনের) রূপান্তর হওয়া উচিত। যেমন- **جَاءَ نِي رَجُلَانِ** ও **جَاءَ نِي رَجُلٌ** কিন্তু সাধারণ ব্যবহার তো আমরা এরূপ দেখি না। সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে- **جَاءَنِي رَجُلَانِ** ও **جَاءَنِي رَجُلٌ**।

এ আপত্তির জবাবে মুসান্নিফ বলেন, সাক্ষাকী (র.)-এর উদ্দেশ্য এরূপ নয়, যা (আপত্তি আকারে) বর্ণনা করা হলো। তার উদ্দেশ্য এই নয় যে **جَاءَنِي رَجُلٌ**-এর মধ্যে **مَرْفُوعٌ** (পেশ বিশিষ্ট) অনির্দিষ্ট বিশেষ্য আসলেই বদল- ফায়েল নয়। **جَاءَنِي رَجُلٌ**-এর পেশ বিশিষ্ট শব্দটি ফায়েল নয়, এ কথা তো সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও বলে না। তাহলে সাক্ষাকীর মতো মহাজ্ঞানী ব্যক্তি কি করে এ কথা বলতে পারেন? বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে **جَاءَنِي رَجُلٌ**-এর মধ্যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে খাস করার জন্য এটা মনে করা হয়েছে যে, মূলে **جَاءَنِي رَجُلٌ** ছিল। এর মধ্যে **رَجُلٌ** বদল হয়েছে, আর **جَاءَ**-এর সর্বনাম ফায়েল হয়েছে।

আর এটা একটি প্রয়োজন পূরণের জন্য অসম্ভব বিষয়কে যেমন কখনো সম্ভব ধরে নেওয়া হয় ঠিক তেমনি। কেননা, যদি এমন মনে না করা হতো তাহলে **رَجُلٌ**-কে মুবতাদা বানানো শুদ্ধ হতো না। এরূপ ধরে নিয়ে **تَفْدِيْمٌ مَا حَقَّهُ التَّأْخِيْرُ**-এর নিয়মানুসারে এটিকে তাখসীস করা হয়েছে। অতঃপর তাকে মুবতাদা বানানো হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, **رَجُلٌ** শব্দটি শাব্দিক ফায়েল না বানিয়ে বদল বানানো হলো কেন?

এর উত্তর অবশ্য পাঠকগণ ইতঃপূর্বে পেয়েছেন যে, শাব্দিক ফায়েলকে তার ফে'লের অগ্রবর্তী করা বৈধ নয়। শুধুমাত্র অর্থগত ফায়েলের ক্ষেত্রেই তা করা যায়।

মোটকথা, **رَجُلٌ جَاءَنِي**-এর মধ্যে এটা মনে করা হয়েছে যে, এর মূল **جَاءَنِي رَجُلٌ** ছিল। **رَجُلٌ** তারকীবে বদল হয়েছে, ফায়েল নয়। ঠিক একই ধরনের তারকীব হবে **رَجُلَانِ جَاءَنِي** এবং **رَجَالٌ جَاءُوْنِي**-এর মধ্যেও।

এর দ্বারা এটা আবশ্যিক হয় না যে, যেসব অবস্থায় অনির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহ শাব্দিকভাবে তারকীবে পরে এসেছে, সেগুলোতেও অনির্দিষ্ট বিশেষ্যগুলো বদল হয়েছে, ফায়েল হয়নি। কেননা, এসব ক্ষেত্রে ফায়েল হয়েছে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যসমূহই। আর নিয়মানুসারে ফায়েল যদি প্রকাশ্য বিশেষ্য হয়, তাহলে ফে'ল সব সময় একবচন হবে।

সার-সংক্ষেপ :

লেখক বলেন যে, **رَجُلٌ جَاءَنِي**-এর ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এটি মূলে **جَاءَنِي رَجُلٌ** ছিল এরূপ ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ) মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রে করার প্রয়োজন নেই। কারণ, **نِكَرَةٌ**-এর ক্ষেত্রে এরূপ না করা হলে তাখসীসের অর্থ পাওয়া যেত না এবং **نِكَرَةٌ** মুবতাদা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করত না। পক্ষান্তরে **مَعْرِفَةٌ** এমনই মুবতাদা হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ফায়েল **إِسْمٌ ظَاهِرٌ** হলে ফে'ল সবসময় একবচন হয়। এ নীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ বাক্য **جَاءَنِي رَجَالٌ** হবে **جَاءُوْنِي رَجَالٌ** হবে না।

ثُمَّ قَالَ السَّكَاكِيُّ وَشَرْطُهُ أَى وَشَرْطُ جَعْلِ الْمُنْكَرِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَاعْتِبَارِ التَّقْدِيمِ
وَالْتَاخِيرِ فِيهِ أَنْ لَا يَمْنَعَ مِنَ التَّخْصِصِ مَانِعٌ كَقَوْلِكَ رَجُلٌ جَاءَنِي عَلَى مَا مَرَّ أَنْ
مَعْنَاهُ رَجُلٌ جَاءَنِي لَا امْرَأَةً أَوْ لَا رَجُلَانِ دُونَ قَوْلِهِمْ شَرُّ أَهْرَ ذَا نَابٍ فَإِنَّ فِيهِ مَانِعًا مِنَ
التَّخْصِصِ أَمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ بَعْنَى تَخْصِصِ الْجِنْسِ فَلَا مِتْنَاعَ أَنْ يُرَادَ الْمُهَرُّ
شَرُّ لَا خَيْرٌ لِأَنَّ الْمُهَرَّ لَا يَكُونُ إِلَّا شَرًّا وَ أَمَّا عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي بَعْنَى تَخْصِصِ
الْوَاحِدِ فَلْيُنَبِّهْ عَنْ مَطَانٍ اسْتِعْمَالِهِ أَى لِنُبُوِّ تَخْصِصِ الْوَاحِدِ عَنْ مَوَاضِعِ اسْتِعْمَالِ
هَذَا الْكَلَامِ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ أَنَّ الْمُهَرَّ شَرٌّ لَا شَرَّانِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَإِذَا قَدْ صَرَّحَ الْأَيْمَةُ
بِتَخْصِصِهِ حَيْثُ تَأَوَّلُوهُ بِمَا أَهْرَ ذَا نَابٍ إِلَّا شَرٌّ فَالْوَجْهَ أَى وَجْهَ الْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِمْ
بِتَخْصِصِهِ وَبَيْنَ قَوْلِنَا بِالْمَانِعِ مِنَ التَّخْصِصِ تَفْطِيعُ شَانَ الشَّرِّ بِتَنْكِيرِهِ أَى جَعْلُ
التَّنْكِيرِ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّهْوِيلِ لِيَكُونَ الْمَعْنَى شَرٌّ عَظِيمٌ فَطِيعٌ أَهْرَ ذَا نَابٍ لَا شَرٌّ
حَقِيرٌ فَيَكُونُ تَخْصِصًا نَوْعِيًّا وَالْمَانِعُ إِنَّمَا كَانَ مِنْ تَخْصِصِ الْجِنْسِ أَوْ الْوَاحِدِ -

অনুবাদ : অতঃপর সাক্বাকী বলেন : এবং তার শর্ত অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে এ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণের এবং অগ্রবর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী করার শর্ত হচ্ছে তাখসীসের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। যেমন- رَجُلٌ جَاءَنِي ইতঃপূর্বে আলোচনা গত হয়েছে যে, এর অর্থ একজন পুরুষ এসেছে- একজন মহিলা কিংবা দু'জন পুরুষ আসেনি। তবে তাদের উক্তি نَابٍ أَهْرَ ذَا শর্ত নয়। কেননা, এতে তাখসীসের প্রতিবন্ধক রয়েছে। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ তাখসীসে জিনসের ক্ষেত্রে কুকুরকে সন্ত্রস্তকারী কেবল অনিষ্ট, কল্যাণকর কিছু নয়। এটা ইচ্ছা করা অসম্ভব হওয়ার কারণে। কেননা, সন্ত্রস্তকারী কেবল অমঙ্গলই হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ তাখসীসে ওয়াহিদ-এর ক্ষেত্রে তা এ বাক্যের ব্যবহারের থেকে অনেক দূরবর্তী হওয়ার কারণে, কেননা, (এ বাক্য দ্বারা) এটা উদ্দেশ্য করা হয় না যে, সন্ত্রস্তকারী শুধুমাত্র একটি অনিষ্ট, দু'টি অনিষ্ট নয়। বিষয়টি স্পষ্ট; কিন্তু যখন নাহুর ইমামগণ-এর তাখসীসের বিষয়টি জোরালো ভাবে বলেছেন তখন তারা এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন مَآ أَهْرَ ذَا نَابٍ إِلَّا شَرٌّ দ্বারা। এমতাবস্থায় উভয় মত তথা তাদের তাখসীসের মত এবং আমাদের মত তাখসীস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক আছে। এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় করার পথ হচ্ছে এই যে, অনির্দিষ্টতার অবস্থাকে বড় বিশাল ও মারাত্মক ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা, যাতে অর্থ হয় যে, বিরাট ও ভয়াবহ অনিষ্ট কুকুরকে সন্ত্রস্ত করেছে সাধারণ অনিষ্ট নয়, তাহলে এটি বিশেষ প্রকারগত তাখসীস হলো। আর (তাখসীসের ব্যাপারে) যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা ছিল তাখসীসে জিনস এবং ওয়াহিদের ব্যাপারে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ السَّكَاكِيُّ : ইতঃপূর্বে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যকে তাখসীস করার জন্য দু'টি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আরেকটি শর্ত যোগ করা হচ্ছে। সেই শর্তটি হচ্ছে, তাখসীস করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধক না থাকা। অতএব, আগের দু'টি শর্তের সাথে এ শর্তটি যুক্ত হয়ে মোট তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে তাখসীস হবে। ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা

হয়েছে যে, তাখসীস দু'প্রকার। তাখসীসে জিনস ও তাখসীসে ওয়াহিদ। যেমন- رَجُلٌ جَائِسٌ দ্বারা যদি رَجُلٌ جَائِسٌ لَا উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি তাখসীসে জিনস। আর যদি এর দ্বারা رَجُلَانِ وَ رَجَائٍ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি তাখসীসে ওয়াহিদ (একবচনকে খাস করা) হবে। সাধারণভাবে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মধ্যে এ দু'ধরনের তাখসীস পাওয়া যায়। তবে তাখসীসের জন্য শর্ত হচ্ছে তাখসীসের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকবে না। যেহেতু شَرُّ أَهْرَ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসের বাধা আছে, তাই এতে তাখসীস হবে না। কেননা, এতে যদি তাখসীসে জিনস উদ্দেশ্য করা হয়, তাহলে বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ شَرُّ أَهْرَ ذَا نَابٍ لَّا خَيْرَ অর্থাৎ কুকুরকে অনিষ্ট জাতীয় বিষয় সম্ভব করেছে কল্যাণকর কিছু নয়। এ অনুবাদের সারকথা হচ্ছে এই যে, কুকুরকে সাধারণভাবে দু'টি বিষয় সম্ভব করেছে- ১. অনিষ্ট জাতীয়, ২. কল্যাণকর বিষয়। অতঃপর বক্তা এখানে কল্যাণকর বিষয়কে নেতিবাচক করত শুধুমাত্র কল্যাণকর বিষয়কে প্রমাণিত করেছেন। অথচ কুকুরকে যেউ যেউ করায় অকল্যাণ, কল্যাণকর বিষয় কুকুরকে যেউ যেউ করায় না। অতএব, কল্যাণকে না-বাচক করত অকল্যাণকে প্রমাণ করা যাচ্ছে না, যাতে এটা তাখসীসে জিনস হতে পারে।

আর যদি এর দ্বারা তাখসীসে ওয়াহিদ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ شَرُّ أَهْرَ ذَا نَابٍ لَّا شَرَّانِ অর্থাৎ একটি অনিষ্ট কুকুরকে যেউ যেউ করিয়েছে, দু'টি অনিষ্ট নয়। এ অর্থটি আরবদের ব্যবহারের সাথে সমাজস্যপূর্ণ নয়। আরবরা এ বাক্য দ্বারা এ অর্থ গ্রহণ করে না যে, একটি অনিষ্ট কুকুরকে যেউ যেউ করিয়েছে, একাধিক নয়। যেহেতু এ ব্যাখ্যা আরবদের ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত নয়। তাই এ বাক্য দ্বারা তাখসীসে ওয়াহিদও উদ্দেশ্য হবে না। মোট কথা, অর্থগত জটিলতার কারণে এ বাক্য দ্বারা তাখসীসে জিনস এবং তাখসীসে ওয়াহিদ কোনোটাই উদ্দেশ্য করা যাচ্ছে না।

عَنْهُ : قَوْلُهُ إِذْ قَدْ صَرَحَ الْأَنَّهُ بِتَخْصِيصِهِ : এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, আল্লামা সাক্বাকীর ব্যাখ্যানুসারে মনে হচ্ছে شَرُّ أَهْرَ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে কোনো ধরনের তাখসীস হয়নি; অথচ নাহবিদ সকলেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এতে অবশ্যই তাখসীস হয়েছে। তারা বলেন, এটি مَا أَهْرَ ذَا نَابٍ إِلَّا-এর অর্থে, আর এটা সকলেরই জানা যে, مَا এবং إِلَّا দ্বারা বাক্য গঠন করলে এতে তাখসীস সৃষ্টি হয়। অতএব, সাক্বাকী এবং নাহবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেল।

এর উত্তর হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাদের মতের মধ্যে অমিল নেই। কেননা, আল্লামা সাক্বাকী তাখসীসে জিনস এবং তাখসীসে ওয়াহিদকে নেতিবাচক করেন, পক্ষান্তরে নাহবিদগণ তাখসীসে নাওয়াই تَخْصِيصٌ نَوْعِي প্রমাণ করেন। নাহবিদগণ বলেন, شَرُّ শব্দটির তানবীন এবং অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার বিশালতা ও ভয়াবহতা প্রমাণ করে। বড়, বিশাল ও ভয়াবহ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকারগত তাখসীস হয়। অতএব, বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে এরূপ- شَرُّ عَظِيمٍ أَهْرَ ذَا نَابٍ

সার-সংক্ষেপ :

এ ইবারতে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করার মাধ্যমে যে তাখসীস করা হয়, সে তাখসীস করার তৃতীয় শর্তটি এখানে বর্ণনা হচ্ছে। শর্তটি হলো, তাখসীস করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা। যেমন- شَرُّ أَهْرَ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসের প্রতিবন্ধক বিষয় রয়েছে। এ উদাহরণের মধ্যে তাখসীসে জিনস কিংবা তাখসীসে ফরদ কোনোটাই উদ্দেশ্য করা যায় না। যেহেতু شَرُّ أَهْرَ ড়া নَابٍ-এর মধ্যে তাখসীস হওয়ার ব্যাপারে নাহবিদগণ ঐকমত্য, তাই লেখক বলেন, এতে شَرُّ عَظِيمٍ أَهْرَ ড়া নَابٍ উদ্দেশ্য হবে না। সূতরাং এ বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হবে না।

وَفِيهِ أَى فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ السَّكَّاكِيُّ نَظَرًا إِذِ الْفَاعِلُ اللَّفْظِيُّ وَالْمَعْنَوِيُّ كَالْتَّائِيدِ
وَالْبَدَلِ سَوَاءٌ فِى إِمْتِنَاعِ التَّقْدِيمِ مَا بَقِيَ عَلَى حَالِهِمَا أَى مَا دَامَ الْفَاعِلُ فَاعِلًا وَالتَّابِعُ
تَابِعًا بَلْ إِمْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ أَوْلَى فَتَجَوِزُ تَقْدِيمُ الْمَعْنَوِيِّ دُونَ اللَّفْظِيِّ تَحَكُّمٌ
وَكَذَا تَجَوِزُ الْفَسْخِ فِى التَّابِعِ دُونَ الْفَاعِلِ تَحَكُّمٌ لِأَنَّ إِمْتِنَاعَ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ إِنَّمَا هُوَ
عِنْدَ كَوْنِهِ فَاعِلًا وَلَا فَلَا إِمْتِنَاعَ فِى أَنْ يُقَالَ فِى نَحْوِ زَيْدٌ قَامَ أَنَّهُ كَانَ فِى الْأَصْلِ قَامَ
زَيْدٌ فَقَدْ زَيْدٌ وَجُعِلَ مُبْتَدَأً كَمَا يُقَالُ فِى نَحْوِ جَرْدٌ قَطِيفَةٌ أَنْ جَرْدًا كَانَ فِى الْأَصْلِ
صِفَةً فَقَدْ جُعِلَ مُضَافًا وَإِمْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ حَالٌ كَوْنِهِ تَابِعًا مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ
التَّحَاةُ إِلَّا فِى الْعَطْفِ فِى ضَرُورَةِ الشَّعْرِ فَمَنْعُ هَذَا مُكَابَرَةٌ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ فِى حَالِهِ تَقْدِيمِ
الْفَاعِلِ لِيُجْعَلَ مُبْتَدَأً يَلْزَمُ خُلُوعُ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ وَهُوَ مُحَالٌ بِخِلَافِ الْخُلُوعِ عَنِ
التَّابِعِ فَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا إِعْتِبَارٌ مَحْضٌ -

অনুবাদ : এবং এতে অর্থাৎ সাক্ষাকীর মাযহাবে আপত্তি রয়েছে। কেননা, শাদিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েল (যেমন তাকিদ ও বদল) উভয়ে স্বীয় অবস্থায় থাকাকালে অর্থাৎ ফায়েল যতক্ষণ ফায়েল থাকে এবং তাবে' যতক্ষণ তাবে' থাকে (উভয়ে) অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ হওয়াতে সমান। বরং তাবে' অগ্রবর্তী হওয়াতে অবৈধতার মাত্রা বেশি, সুতরাং অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়াকে বৈধ বলা এবং শাদিক ফায়েলকে অবৈধ বলা এক ধরনের গৌড়ামি। এমনিভাবে তাবে'-এর রূপান্তরকে বৈধ বলা এবং ফায়েলের ক্ষেত্রে অবৈধ বলা ও গৌড়ামি। কেননা, ফায়েল অগ্রবর্তী হওয়ার অবৈধতা তো ফায়েল থাকাকালে, অন্যথায় زَيْدٌ قَامَ বলতে তো কোনো বাধা নেই। এ হিসেবে যে, তা (زَيْدٌ) পূর্বে قَامَ ছিল। অতঃপর زَيْدٌ-কে অগ্রবর্তী করে মুবতাদা বানানো হয়েছে, যেমনটি বলা হয়েছে جَرْدٌ قَطِيفَةٌ-এর মধ্যে যে, جَرْدٌ আসলে সিফাত ছিল, অতঃপর তাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে এবং মুযাফ বানানো হয়েছে। আর তাবে' যতক্ষণ তাবে' থাকে- এর অগ্রবর্তী করার অবৈধতার ব্যাপারে নাহবিদগণের ঐক্য রয়েছে। তবে কবিতার ছন্দমিলের স্বার্থে আত্মফের ক্ষেত্রটি ভিন্ন (এতে অগ্রবর্তী কর) বৈধ। অতএব, একে প্রমাণ ছাড়া অস্বীকার করা গৌড়ামি। আবার এ কথা বলা যে, ফায়েলকে অগ্রবর্তী করত মুবাদাতা বানাতে ফে'ল ফায়েলবিহীন হওয়া আবশ্যিক হয়, অথচ এটা সম্ভব। কিন্তু তাবে'-এর বিষয়টি এমন নয়। এ কথাও ভ্রান্তিকর; বরং এটা মানসিক ব্যাপার।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيهِ أَى فِيمَا : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক আল্লামা সাক্ষাকীর মাযহাবের উপর বেশ কয়েকটি আপত্তি তুলেছেন।

এক. অর্থগত ফায়েলকে অগ্রবর্তী করে এর দ্বারা তাখসীস করা বৈধ, শাদিক ফায়েলকে অগ্রবর্তী করে তাখসীস করা অবৈধ। এক কথায় অগ্রগামী করত তাখসীস করার ক্ষেত্রে শাদিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে- সাক্ষাকী (র.)-এর এই বক্তব্য আপত্তিমুক্ত নয়।

দুই. তার মাযহাব হচ্ছে رَجُلٌ جَائِسٌ-এর মধ্যে رَجُلٌ পশ্চাদ্বর্তী ছিল, তাকে অগ্রবর্তী করতঃ তাখসীস সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে তাখসীস করার অন্য কোনো উপায় নেই। এ বক্তব্যও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়।

তিন. شَرَّ أَهْرَ ذَا نَابٍ-এর মধ্যে তাখসীসে জিনস হওয়া অসম্ভব। এটাও প্রশ্নমুক্ত নয়।

চার. ফায়েলকে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব, কিন্তু তাবে'কে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তার সর্বশেষ এ কথাটিও সঠিক নয়।

উপরোক্ত ইবারতে বিষয়গুলো খণ্ডন করে তার বক্তব্য পেশ করেন। প্রথমত অর্থগত ফায়েল এবং শাদিক ফায়েল যতক্ষণ উভয়ে আপন অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ ফায়েল ফায়েল থাকা অবস্থায় এবং তাবে' তাবে' থাকা অবস্থায় এদের অগ্রবর্তী করা যাবে না। এমতাবস্থায় অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে উভয়ে সমান। যেমন-زَيْدٌ-এর زَيْدٌ-কে যদি পশ্চাদ্বর্তী করা হয় এবং বলা হয় زَيْدٌ তাহলে زَيْدٌ হবে ফায়েল। আর زَيْدٌ যতক্ষণ শাদিক ফায়েল থাকবে তাকে অগ্রবর্তী করা যাবে না। এমনিভাবে অর্থগত ফায়েল তথা তাকিদ ও বদল যতক্ষণ তাবে' থাকবে তাকে অগ্রবর্তী করা নিষিদ্ধ। তাকিদে উদাহরণ أَنَا فُتْتُ-এর মধ্যে যখন أَنَا পশ্চাদ্বর্তী করে فُتْتُ বলা হবে, তখন أَنَا তারকীবে صَمِيرٌ مَرْفُوعٌ-এর তাকিদ হবে।

বদলের উদাহরণ رَجُلٌ جَائِسٌ-এর মধ্যে رَجُلٌ যখন পশ্চাদ্বর্তী হবে তখন সর্বনাম থেকে বদল হবে। তাকিদ এবং বদল হচ্ছে তাবে', আর তাবে' হচ্ছে অর্থগত ফায়েল। আর অর্থগত ফায়েলকে স্ব-অবস্থায় বহাল থাকা অবস্থায় অগ্রবর্তী করা শাদিক ফায়েলের মতোই নিষিদ্ধ। মুসান্নিফ বলেন, বরং অর্থগত ফায়েল অগ্রবর্তী করা বেশি খারাপ, অর্থাৎ শাদিক ফায়েলকে অগ্রবর্তী করলে যতটা সমস্যা সৃষ্টি হয় অর্থগত ফায়েলকে অগ্রবর্তী করলে এর চেয়ে বেশি সমস্যা হয়। সমস্যাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. যদি তাবে'-কে ফে'লের অগ্রবর্তী করা হয় তাহলে দুদিক থেকে সমস্যা-

ক. তাবে' তার মাতবু' (শাদিক ফায়েল)-এর পূর্বে ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ তাবে'-কে তার মাতবু'-এর আগে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

খ. তাবে'-কে এমন বিষয়ের অগ্রবর্তী করা হচ্ছে, যার উপর তার মাতবু'কে অগ্রবর্তী করাও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ফে'লের অগ্রবর্তী করা হচ্ছে। ফে'লের পূর্বে তার ফায়েলের অগ্রবর্তী করা অবৈধ, এমতাবস্থায় ফায়েলের তাবে' যথা তাকিদ ও বদল ফে'লের আগে করা হচ্ছে, পক্ষান্তরে যদি শাদিক ফায়েলকে অগ্রবর্তী করা হয়, তাহলে একটি সমস্যা হয়। তা হচ্ছে ফায়েল তার আমেল- ফে'লের আগে আসছে। আর ফায়েল মা'মূল তার আমেলের অগ্রবর্তী হওয়া অবৈধ।

২. তাবে', যতক্ষণ তাবে' থাকে তাকে তার মাতবু'র অগ্রবর্তী করা সকলের ঐকমত্যে অবৈধ। অন্যদিকে কৃফাবাসী কতিপয় আলেমের মতে শাদিক ফায়েলকে তার ফে'লের অগ্রবর্তী করা বৈধ। অর্থাৎ ফায়েলের অগ্রগামিতার নিষিদ্ধতা সর্বসম্মত নয়।

৩. ফায়েলকে যদি কর্তা হওয়ার অর্থ থেকে খালি করে অগ্রবর্তী করা হয়, তাহলে সর্বনাম তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তবে যদি অগ্রবর্তী করা হয় তাহলে তার কোনো স্থলাভিষিক্ত থাকে না। সারকথা হচ্ছে- মোট তিন কারণে অর্থগত ফায়েল তথা তাকিদ ও বদলকে অগ্রবর্তী করা শাদিক ফায়েলের চেয়ে বেশি সমস্যাপূর্ণ। যখন উভয় ফায়েলকে অগ্রগামী করা অবৈধ; বরং অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়া বেশি সমস্যাপূর্ণ। এমতাবস্থায় সাক্বাকী (র.)-এর শুধুমাত্র অর্থগত ফায়েলের অগ্রগামিতাকে বৈধতা দেওয়া এবং শাদিক ফায়েলের অগ্রগামিতাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা এক পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত।

قَوْلُهُ وَكَذَا تَجَوَّزُ الْفَسْخُ এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাক্বাকী (র.)-এর একটি উত্তরকে খণ্ডন করছেন।

সাক্বাকী বলেন, শাদিক ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর যখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান, এমতাবস্থায় দু'টির দু'ধরনের হুকুম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে তিনি বলেন, তাবে'-এর মধ্যে তাবে'-এর অর্থকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, কিন্তু ফায়েলের মধ্যে ফায়েলকে তার অর্থ থেকে ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ফায়েল ফায়েল থাকা অবস্থায় ফে'লের আগে আসতে পারে না, কিন্তু তাবে'-এর বিষয়টি এমন নয়।

সাক্বাকী (র.)-এর এ উত্তরটি খণ্ডন করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শাদ্বিক ফায়েলের মধ্যে পরিবর্তনকে বৈধ না বলা আর তাবে'-এর মধ্যে পরিবর্তনকে বৈধ বলাও একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত এবং প্রমাণ ছাড়া একটি বিষয়ের উপর হুকুম লাগানো। কেননা, সাধারণ রীতি অনুসারে উভয়ের মাঝে পরিবর্তন করা বৈধ। যেমন তাবে'-এর মধ্যে তেমনি শব্দগত ফায়েলের মধ্যে। কেননা, ফায়েলের অগ্রবর্তীতা তখনই নিষিদ্ধ, যখন তা ফায়েল থাকে। অন্যথায় যদি বলা হয় زَنْدٌ قَامَ-এর মধ্যে ফায়েল মূলে পশ্চাদ্বর্তী ছিল এবং ইবারত زَنْدٌ قَامَ ছিল অতঃপর যায়েদের থেকে ফায়েলের অর্থকে বিচ্ছিন্ন করে মুবতাদা বানানো হয়েছে আর قَامَ-এর সর্বনামকে বানানো হয়েছে قَامَ-এর ফায়েল, তাহলে এ প্রক্রিয়াকে কেউ অবৈধ বলবে না। যেমনটি جَرَدٌ قَطِيفَةٌ-এর মধ্যে হয়েছে। মূলে এটি ছিল قَطِيفَةٌ جَرَدٌ (মাওসূফ এবং সিফাত) এতে جَرَدٌ হচ্ছে সিফাত। অতঃপর তা থেকে তাবে'-এর অর্থকে পৃথক করে তাকে অগ্রগামী করা হয়েছে এবং قَطِيفَةٌ-এর মুযাফ বানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَامْتِنَاعُ تَقْدِيمِ التَّابِعِ: ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) সাক্বাকীর আরেকটি জবাবকে খণ্ডন করেছেন।

সাক্বাকী বলেন, আপনারা যে বললেন, শাদ্বিক ফায়েলের মধ্যে অগ্রবর্তী হওয়া অবৈধ এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যেও আমার এ উক্তিটি সঠিক নয়; বরং একপেশে আমি তা মনে করি না। কারণ, তাবে'-কে স্বীয়রূপে বহাল রেখে তার মাতবু'-এর আগে আনা বৈধ। যেমন-رَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ এ বাক্যটিতে رَحْمَةُ اللَّهِ হলো মা'তূফ; এর মা'তূফ আলাইহ হচ্ছে السَّلَامُ এখানে মা'তূফ তার মা'তূফ আলাইহের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এ উদাহরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাবে'-কে স্বীয় অবস্থায় রেখে মাতবু'-এর অগ্রবর্তী করা যায়। পক্ষান্তরে শব্দগত ফায়েলকে কখনো স্বীয় অবস্থায় বহাল রেখে তার ফে'ল (আমল)-এর অগ্রবর্তী করা যায় না। অতএব, আমার সিদ্ধান্তটিই সঠিক। মুসান্নিফ তার প্রতি উত্তরে বলেন, তাবে'-তাবে' থাকা অবস্থায় তাকে তার মাতবু'-এর অগ্রবর্তী করা যায় না। এ কথায় সকল নাজর ইমামগণ একমত, তবে সাক্বাকী যে কবিতা দিয়ে সর্বসম্মত রীতিকে ভাঙ্গার চেষ্টা করেছেন, এর জবাব হচ্ছে এটি কবিতার ছন্দ মিলের জন্য করা হয়েছে। অতএব, তাবে' স্বীয় অবস্থায় বহাল, তাকে অগ্রবর্তী করা যায় না, এ কথা অস্বীকার করা একঘেয়েমির শামিল। মোটকথা, শব্দগত ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েল উভয়কে অগ্রবর্তী করা অনুচিত এবং সমান বিধি বহির্ভূত।

قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بَأَنَّ نِيَّ حَالَةٍ: এ বাক্য দ্বারা মুসান্নিফ সাক্বাকীর পক্ষ থেকে করা আরেকটি আপত্তির জবাব দিয়েছেন। সাক্বাকী বলেন, আমাদের বর্ণিত শব্দগত ও অর্থগত ফায়েল সম্পর্কিত বক্তব্য যে, শব্দগত ফায়েলের অগ্রগামীতা অবৈধ এবং অর্থগত ফায়েলের ক্ষেত্রে বৈধ একে আপনারদের একপেশে বলা ঠিক হয়নি। কারণ, এ দু'টির মাঝে স্পষ্টত ব্যবধান রয়েছে।

পার্থক্য হচ্ছে, শব্দগত ফায়েলকে তার অর্থ থেকে পৃথক করে অগ্রবর্তী করা হলে ফে'ল তার ফায়েল থেকে খালি হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। অথচ ফায়েলবিহীন ফে'ল হওয়া অসম্ভব। পক্ষান্তরে তাবে'-কে তার স্বীয় অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে মাতবু' তাবে'বিহীন হয়ে যায়। আর মাতবু' তাবে'বিহীন হলেও কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না। অতএব, উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান, তাই দু'টি বিষয়ের হুকুম দু'রকম হবে। সুতরাং অর্থগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়াকে বৈধ বলা এবং শব্দগত ফায়েলের অগ্রবর্তী হওয়াকে অবৈধ বলা প্রমাণ ছাড়া কথা হলো না এবং একপেশে সিদ্ধান্তও হলো না।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, শব্দগত ফায়েলকে অগ্রবর্তী করলে ফে'ল ফায়েলবিহীন হওয়া আবশ্যক হয়, এটা একটা মানসিক সিদ্ধান্ত, প্রকৃতপক্ষে এমন হয় না। কেননা, যখন ফায়েলকে ফে'লের আগে আনা হয়, তখন ফে'লের মধ্যে অবস্থিত সর্বনাম তার ফায়েল হয়। যখন সর্বনাম ফায়েল হয়ে যাচ্ছে তখন তো ফে'ল ফায়েলবিহীন হলো না। আর যখন বিষয়টি এমনই তখন তো শব্দগত ফায়েল এবং অর্থগত ফায়েলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রইল না। এমতাবস্থায় তাবে'-এর মধ্যে রূপান্তর করা শব্দগত ফায়েলের মতোই অবৈধ হবে। সুতরাং শব্দগত ফায়েলের যে হুকুম তাবে'-এরও সেই হুকুম। অতএব, একটার মধ্যে রূপান্তর বৈধ বলা আর অপরটার মধ্যে রূপান্তর অবৈধ বলা অনুচিত এবং একদেশপূর্ণ সিদ্ধান্ত। অথচ এ কাজটিই করেছেন সাক্বাকী (র.)।

ثُمَّ لَأَنْسَلِمُ أَنْتِفَاءَ التَّخْصِصِ فِي نَحْوِ رَجُلٍ جَاءَنِي لَوْلَا تَقْدِيرُ التَّقْدِيمِ لِحُصُولِهِ
 أَى التَّخْصِصِ بِغَيْرِهِ أَى بِغَيْرِ تَقْدِيرِ التَّقْدِيمِ كَمَا ذَكَرَهُ السَّكَاكِيُّ مِنَ التَّهْوِيلِ
 وَغَيْرِهِ كَالْتَحْقِيرِ وَالتَّنْكِيرِ وَالتَّقْلِيلِ وَالسَّكَاكِيُّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَن لَّا سَبَبَ
 لِلتَّخْصِصِ سِوَاهُ لَكِنْ لَزِمَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْإِفْتَحَاحِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا يَرْتَكِبُ ذَلِكَ
 الْوَجْهَ الْبَعِيدُ فِي الْمُنْكَرِ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ لَأَنْسَلِمُ إِمْتِنَاعَ أَنْ يَرَادَ الْمُهَرَّ شَرٌّ لَّا
 خَيْرٌ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَاهِرِ قَدَّمَ شَرٌّ لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي أَهَرَّ ذَا نَابٍ مِنْ جِنْسِ
 الشَّرِّ لَّا مِنْ جِنْسِ الْخَيْرِ -

অনুবাদ : অতঃপর আমরা رَجُلٌ جَاءَنِي জাতীয় উদাহরণের ক্ষেত্রে উহা ইবারত মেনে না নিলে তাখসীস হয় না, এ দাবি সমর্থন করি না। কেননা, উহা না মেনে নিলেও এখানে তাখসীস হতে পারে। যেমন সাক্কাকী (র.) নিজেই বলেছেন বিরাট তুচ্ছ সামান্য ইত্যাদি গুণের সাহায্যে তাখসীস হতে পারে। সাক্কাকী (এ ব্যাপারে) যদিও প্রকাশ্যে বলেননি, এটি ছাড়া তাখসীসের অন্য কোনো পন্থা নেই, তবুও এ (বিষয়)টি তার মিফতাহ গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। তিনি সেখানে বলেন, নিশ্চয়ই এ জাতীয় দূর্বর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে এতে অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের মাঝে মুবতাদা (বানানোর)-এর শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে। এরপর আমরা এ কথাও মানতে প্রস্তুত নই যে, خَيْرٌ হুবে শَرٌّ শুধুমাত্র হুবে না। আর এটা (মেনে নেওয়া) কি করে সম্ভব? অথচ শায়খ আব্দুল কাহির বলেছেন, شَرٌّ-কে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কেননা, বাক্যের অর্থ হচ্ছে অনিষ্ট জাতীয় বিষয় কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, কল্যাণ জাতীয় কিছু নয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

خَوَّلَهُ ثُمَّ لَأَنْسَلِمُ أَنْتِفَاءَ الْخ : এ ইবারত পূর্বের ইবারতের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইতঃপূর্বে আল্লামা সাক্কাকী (র.)-এর উপর যে আপত্তি করা হয়েছিল এর সাথে এখানে আরো কয়েকটি আপত্তি করা হচ্ছে।

লেখক বলেন, رَجُلٌ جَاءَنِي-এর মধ্যে رَجُلٌ-কে পশ্চাদ্বর্তী করত অগ্রবর্তী করা ছাড়া তাখসীস করার আর কোনো পথ নেই। সাক্কাকীর এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। কেননা, এ জাতীয় উদাহরণে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবেও তাখসীস হতে পারে। যদি বলা হয় رَجُلٌ-এর তানবীন বিশালতা, ভয়াবহতা ও মহত্ত্ব কিংবা তুচ্ছ, নগণ্য ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে, তাহলে এর দ্বারা تَخْصِصٌ نَوْعِي হুবে।

সাক্কাকী তার নিজ কিতাব 'মিফতাহ' এ شَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ-এর ক্ষেত্রে এরূপ তাখসীসের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ তিনি شَرٌّ (رَجُلٌ جَاءَنِي)-এর মধ্যেও হতে পারে।

অতএব, তার لَهُ سَبَبٌ لَا কথটি বলা ঠিক হয়নি, কেননা তার এ কথার অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে এ উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ পশ্চাদ্বর্তী ছিল, অতঃপর তাকে অগ্রবর্তী করত তাখসীস করা হয়েছে এতে। এ ছাড়া তাখসীসের অন্য কোনো উপায় নেই।

وَأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَن لَّا سَبَبَ لِلتَّخْصِصِ : এ বাক্য দ্বারা সাক্কাকী (র.)-এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নটি হচ্ছে, সাক্কাকী (র.) তাঁর কিতাবের কোথাও বলেননি **إِذَا لَاسِبَ لَهُ سَوَاهُ**। এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি এ উক্তি করা কি সঠিক হবে যে, তিনি এ কথা বলেছেন।

এর উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, সাক্কাকী (র.) যদিও তাঁর কিতাবে হুবহু এ বাক্যটি বলেননি, কিন্তু তাঁর ইবারত থেকে এ ধরনের অর্থ অনুধাবিত হয়। তাঁর ইবারত হচ্ছে—

অর্থ অনির্দিষ্ট মুসনাদ ইলাইহ (মুবতাদা)-এর মধ্যে এই দূরবর্তী প্রক্রিয়া (পশ্চাদ্বর্তী করত তাকে অগ্রবর্তী করা)-এর অবলম্বন এ জন্যই করা হয়েছে যে, এটা না করলে এর মুবতাদা হওয়ার শর্ত পাওয়া যেত না। অর্থাৎ তাখসীস হতো না, যে তাখসীসের সাহায্যে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য মুবতাদা হয়। অতএব, বলা যায় যে, সাক্কাকী যেন বলেছেন—**إِذَا لَاسِبَ لَهُ سَوَاهُ**।

মোটকথা, সাক্কাকীর এ ব্যক্তব্যের সাথে আরমা একমত নই, কেননা আমরা দেখছি যে, অনির্দিষ্ট বিশেষ্যর মধ্যে এ পদ্ধতি ছাড়াও তাখসীস হতে পারে।

সাক্কাকীর উপর উক্ত আপত্তির জবাবে অনেকে বলেন, সাক্কাকীর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ তাখসীস অর্থাৎ তাখসীসে জিনস এবং ওয়াহিদ। সব ধরনের তাখসীসকে তিনি না-বাচক করেননি। অতএব, তার উপর আপত্তি রইল না।

هُمَّ لَا تُسَلِّمُ امْتِنَاعَ أَنْ يُرَادَ الْمُهَرَّرُ : ইবারত দ্বারা লেখক সাক্কাকীর উপর আরেকটি আপত্তি তুলেছেন। আপত্তিটি হচ্ছে সাক্কাকী (র.) বলেছিলেন **شَرَاهُ** এর মধ্যে তাখসীসে জিনস এবং তাখসীসে ওয়াহিদ হয়নি। লেখক বলেন, তার এ দাবিটি সঠিক নয় এবং তার দাবির সাথে আমরা একমত নই। আমাদের মত হচ্ছে শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানীর মতো। শায়খ বলেন **شَرَاهُ** এর মধ্যে তাখসীসে জিনস হয়েছে, কেননা, তাঁর মতে বাক্যটির ব্যাখ্যা এরূপ **شَرَاهُ** অর্থ অনিষ্ট জাতীয় বিষয় কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করিয়েছে, কল্যাণসহ কিছু নয়। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখে থাকি, কুকুর যখন তার মনিব অথবা মনিবের প্রিয়জনকে দেখে তখনও ঘেউ ঘেউ করে, তার এই ঘেউ ঘেউ করার কারণ মোটেও অনিষ্ট জাতীয় কিছু নয়। পক্ষান্তরে কুকুর চোর-ডাকাত অথবা অন্য শত্রুকে দেখলেও ঘেউ ঘেউ করে। এর কারণ অবশ্যই অমঙ্গল। অতএব, কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করায় অনিষ্ট এবং ভালো উভয়টি। এ হিসেবে অনিষ্টকে প্রমাণ করে কল্যাণকে না-বাচক করা নিয়ম মোতাবেক সঠিক। একটি প্রমাণ করা, আরেকটি না-বাচক করার দ্বারা তাখসীসে জিনস হয়, এখানেও তাই হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত উদাহরণে তাখসীসে জিনস হয়, এখানেও তাই হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত উদাহরণে তাখসীসে জিনস হওয়া সম্ভব। তাই সাক্কাকী কর্তৃক এর জিনসের তাখসীসকে না-বাচক করা ঠিক হয়নি।

ثُمَّ قَالَ السَّكَاكِيُّ وَيَقْرُبُ مِنْ قَبِيلٍ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ فِي التَّقْوَى لِيَتَضَمَّنَهُ أَيْ لِيَتَضَمَّنَ قَائِمَ الضَّمِيرِ مِثْلَ قَامَ فِيهِ يَحْصُلُ لِلْحُكْمِ التَّقْوَى وَشَبَّهَهُ أَيْ شَبَّهَ السَّكَاكِيُّ مِثْلَ قَائِمِ الْمُتَضَمِّنِ لِلضَّمِيرِ بِالْخَالِي عَنْهُ أَيْ عَنِ الضَّمِيرِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ تَغْيِيرِهِ فِي التَّكْلِيمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ نَحْوُ أَنَا قَائِمٌ وَأَنْتَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ كَمَا لَا يَتَغَيَّرُ الْخَالِي عَنِ الضَّمِيرِ نَحْوُ أَنَا رَجُلٌ وَهُوَ رَجُلٌ وَبِهَذَا الْإِعْتِبَارِ قَالَ يَقْرُبُ وَلَمْ يَقُلْ نَظِيرُهُ وَفِي بَعْضِ التَّسَجُّجِ وَشَبَّهَهُ بِلَفْظِ الْأِسْمِ مَجْرُورًا عَظْفٌ عَلَى تَضَمُّنِهِ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَهُ يَقْرُبُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ التَّقْوَى وَلَيْسَ مِثْلُ التَّقْوَى فِي زَيْدٍ قَامَ فَالْأَوَّلُ لِيَتَضَمَّنَهُ الضَّمِيرُ وَالثَّانِي لِشَبَّهَهُ بِالْخَالِي عَنِ الضَّمِيرِ وَلِهَذَا أَيْ وَلِشَبَّهَهُ بِالْخَالِي عَنِ الضَّمِيرِ لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ أَيْ مِثْلَ قَائِمٍ مَعَ الضَّمِيرِ وَكَذَا مَعَ فَاعِلِهِ الظَّاهِرِ أَيْضًا جُمْلَةً وَلَا عَوْمِلَ قَائِمٌ مَعَ الضَّمِيرِ مَعَامَلَتَهَا أَيْ مُعَامَلَةَ الْجُمْلَةِ فِي الْبِنَاءِ فِي مِثْلِ رَجُلٍ قَائِمٌ وَرَجُلًا قَائِمًا وَرَجُلٌ قَائِمٌ -

অনুবাদ : অতঃপর সাক্বাকী (র.) বলেন, হুকুমকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে قَامَ হচ্ছে زَيْدٌ قَائِمٌ এর কাছাকাছি। কেননা, قَامَ একটি সর্বনামকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন قَائِمٌ করে থাকে। এতে হুকুমের মাঝে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়। আর তিনি সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত قَائِمٌ-কে তুলনা করেছেন সর্বনামহীন ইসমের-এর সাথে, এ হিসেবে যে, তা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম পুরুষ কোনো ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হয় না। যেমন- أَنْتَ هُوَ رَجُلٌ ও أَنْتَ رَجُلٌ, أَنَا رَجُلٌ -এর মতো, যেমন- أَنَا قَائِمٌ এবং هُوَ قَائِمٌ এটা সর্বনামযুক্ত বিশেষ্যের মতো, যেমন- أَنَا قَائِمٌ এ হিসেবেই তিনি বলেছেন “কাছাকাছি”। এর মতো বলেননি। কোনো কোনো সংস্করণে شَبَّهَهُ (ফে'ল নয়) বিশেষ্য রূপে রয়েছে। যা যের যুক্ত হয়েছে تَضَمَّنَهُ-এর উপর আত্ম হওয়ার কারণে, অর্থাৎ يَقْرُبُ শব্দটি এ বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করে যে, এতে এক ধরনের হুকুম শক্তিশালী করার অর্থ রয়েছে। কিন্তু এটা زَيْدٌ قَامَ-এর মতো শক্তিশালী নয়। প্রথমত সর্বনামকে শামিল রাখার কারণে, আর দ্বিতীয়ত সর্বনামহীনের সাথে সামাজ্যসম্পূর্ণ হওয়াতে। আর এ কারণে অর্থাৎ সর্বনামহীন শব্দের সাথে সামাজ্যসম্পূর্ণ হওয়াতে এতে হুকুম দেওয়া হবে না যে, তা সর্বনামযুক্ত قَائِمٌ-এর মতো এবং এটি তার ফায়েলসহ পূর্ণবাক্য এটাও বলা হবে না। সর্বনামযুক্ত قَائِمٌ-এর আচরণবিধি মাবনী হওয়ার বিবেচনায় পূর্ণবাক্যের মতো হবে না। যেমন رَجُلٌ قَائِمٌ ও رَجُلًا قَائِمًا, رَجُلٌ قَائِمٌ

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

زَيْدٌ : লেখক বলেন, আল্লামা সাক্বাকী (র.) বলেছেন, হুকুম শক্তিশালী করার ব্যাপারে قَامَ হচ্ছে قَائِمٌ এর কাছাকাছি। কাছাকাছি হওয়ার অর্থ হচ্ছে قَامَ-এর মধ্যে নিশ্চিতভাবেই হুকুম শক্তিশালী হয়েছে; কিন্তু زَيْدٌ قَامَ-এর মধ্যে হুকুম শক্তিশালী না হওয়ার একটি দিক রয়েছে, তবে শক্তিশালী হওয়ারও দিক রয়েছে। যেহেতু উভয়ের মধ্যে ঠিক একই ধরনের হুকুম নয়, তাই একটি অপরটির মতো নয়। বিস্তারিত ব্যখ্যা- আমরা দেখি قَامَ-এর

মধ্যে ইসনাদের তাকরার হচ্ছে, এতে দণ্ডায়মান হওয়ার নিসবত প্রথমে **مُرُو**-এর দিকে করা হয়েছে, অতঃপর দণ্ডায়মান হওয়ার নিসবত **فَام**-এর মধ্যে অবস্থিত সর্বনামের দিকে হয়েছে। ইসনাদের তাকরার দ্বারা হুকুম শক্তিশালী হয়। সুতরাং **مُرُو** **فَام**-এর মধ্যে হুকুম শক্তিশালী হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত; কারণ এতে ইসনাদের তাকরার নিশ্চিতভাবে হয়েছে।

مُرُو **فَام**-এর মধ্যে ইসনাদের তাকরার নিশ্চিত নয়। এর কারণ হচ্ছে **فَام** যদি ও **فَام**-এর মতো সর্বনাম কে অন্তর্ভুক্ত করে, তদুপরি এটি সর্বনামবিহীন সাধারণ বিশেষ্যের সাথেও সম্পর্ক রাখে। সাধারণ বিশেষ্য (الاسم الجامد) যেমনটি বক্তার অবস্থানভেদে বিভিন্ন রকম হয় না। যেমন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে **أَنَا رَجُلٌ** মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে **أَنْتَ رَجُلٌ** ও নাম পুরুষের বেলায় **هُوَ رَجُلٌ** তেমনি **فَام**-এর বেলায় বক্তার অবস্থান ভেদে কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে **أَنَا** মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে **أَنْتَ** এবং নাম পুরুষের ক্ষেত্রে **هُوَ** **فَام** তিনটি উদাহরণের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণ বিশেষ্যের মতো **فَام** তিনটি অবস্থায় একই রকম হচ্ছে।

অতএব, এতে সর্বনাম অভ্যন্তরে আছে, বিধায় ইসনাদ দু'বার হয়েছে যেমন বলা যায়, তেমনি সাধারণ বিশেষ্যের মতো এতে ইসনাদ একবার হয়েছে এটাও বলা যায়।

এক কথায় **مُرُو** **فَام**-এর মধ্যে এক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসনাদে তাকরার হয়েছে, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ইসনাদে তাকবার হয়নি। অতএব, এ ব্যাপারে আমরা বলবো, এটি হুকুমকে শক্তিশালী করে, তবে এর বিপরীত বিষয়ের অর্থ এতে রয়েছে। আর এ কারণে মূল লেখক একে **يَقْرُبُ** দ্বারা ব্যক্ত করেছেন এবং **نَظِيرٌ** বা মতো বলেননি।

মুসান্নিফ বলেন, **سَبَّهَ** এটি ফে'লরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ সাক্ষ্যাকী এটিকে ইসমে জামিদের সাথে উপমা দিয়েছেন, কোনো সংস্করণে শব্দটি মাসদাররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন **بَاء**-এর উপর সাকিন হবে। মাসদার হলে এটি **تَضَنَّنِي**-এর মা'তুফ হিসেবে যের যুক্ত হবে।

তখন বাক্যের অর্থ হবে **مُرُو** **فَام** হুকুম শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে **مُرُو** **فَام**-এর মতো, এটি সর্বনামকে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে। তবে নিশ্চিতভাবে হুকুম শক্তিশালী করে না সর্বনামযুক্ত ইসমে জামিদের সাথে সম্পর্ক রাখার ভিত্তিতে ইসমে যমীরের সাথে সাদৃশ্যের কারণে। এতে সর্বনাম নেই বলে গণ্য হবে। সর্বনাম না থাকলে ইসনাদের তাকরার হবে না। আর ইসনাদের তাকরার না হলে হুকুম শক্তিশালী হবে না।

লেখক বলেন, **فَام** জাতীয় শব্দ সর্বনামহীন সাধারণ বিশেষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে নাহবিদগণ এটিকে **جُمْلَةٌ** বা পূর্ণ বাক্য হওয়ার অনুমোদন দেন না। অদ্রপ **فَام** **أَبُو** বাক্য হবে না। একই কারণে এটি জুমলার মতো মা'বনীর আওতায় পড়বে না। আমরা দেখি, পেশের অবস্থায় এটি **فَام** **نِي رَجُلٌ** হচ্ছে। যবরের অবস্থায় **فَام** **رَأَيْتَ رَجُلًا** এবং **مَرَرْتُ بِرَجُلٍ** **فَام**।

وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ أَيْ وَمِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الَّذِي يُرَى تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمُسْنَدِ كَاللَّازِمِ لَفْظُ مِثْلٍ وَغَيْرِ إِذَا اسْتَعْمِلَ عَلَى سَبِيلِ الْكِنَايَةِ فِي مِثْلِ نَحْوِ مِثْلِكَ لَا يَبْخُلُ وَغَيْرِكَ لَا يَجُودُ بِمَعْنَى أَنْتَ لَا تَبْخُلُ وَأَنْتَ تَجُودُ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ تَعْرِيضٍ لِغَيْرِ الْمَخَاطَبِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمِثْلِ وَالْغَيْرِ إِنْسَانٌ آخَرُ مُمَائِلٌ لِلْمَخَاطَبِ أَوْ غَيْرُ مُمَائِلٍ بَلِ الْمُرَادُ نَفَى الْبَخْلِ عَنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَى الْبَخْلَ عَمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى مُمَائِلٍ لَزِمَ نَفْيُهُ عَنْهُ وَاثْبَاتُ الْجُودِ لَهُ بِنَفْيِهِ عَنْ غَيْرِهِ مَعَ اقْتِضَائِهِ مَحَلًّا يَقُومُ بِهِ وَاتِّمَامًا يُرَى التَّقْدِيمُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ كَاللَّازِمِ لِكُونِهِ أَيْ لِكُونِ التَّقْدِيمِ أَعَوْنَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِمَا أَيْ بِهِذَيْنِ التَّرْكِيبَيْنِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُمَا اثْبَاتُ الْحُكْمِ بِطَرِيقِ الْكِنَايَةِ الَّتِي هِيَ أَبْلَغُ وَالتَّقْدِيمُ لِإِقَادَةِ التَّقْوَى أَعَوْنَ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ كَاللَّازِمِ أَنَّهُ قَدْ يُقَدَّمُ وَقَدْ لَا يُقَدَّمُ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنْ يَجُوزَ التَّأَخِيرُ لَكِنْ لَمْ يَرِدِ إِلَّا اسْتِعْمَالُ الْإِعْجَازِ .

অনুবাদ : যে সকল স্থানে মুসনাদ ইলাইহকে মুসনাদের আগে উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয় সেগুলো হচ্ছে— **مِثْلُكَ لَا يَبْخُلُ** এবং **غَيْرُ** শব্দদ্বয়। যখন উভয়টিকে ইঙ্গিতবহ রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন— **مِثْلُكَ لَا يَبْخُلُ** অর্থঃ তোমার মতো লোক কৃপণতা করতে পারে না, তুমি ভিন্ন অন্য কেউ বদান্যতা করে না। এর অর্থ হচ্ছে তুমি মোটেও কৃপণতা করো না এবং তুমিই কেবল দান করো। এটা শ্রোতা ছাড়া অন্য কারো প্রতি ইঙ্গিত না দিয়ে যখন বলা হয়। অর্থঃ এমন ইচ্ছা করা যে, **مِثْلُ** অথবা **غَيْرُ** দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ইচ্ছা করা, সে শ্রোতার সমকক্ষ হোক অথবা সমকক্ষ না হোক। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার কৃপণতাকে অস্বীকার করা ইঙ্গিতের সাহায্যে। কেননা, যখন তার মতো গুণের অধিকারী ব্যক্তি থেকে অন্য কোনো সমকক্ষ ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত ছাড়া অস্বীকার করা হবে তখন এর দ্বারা তার থেকে কৃপণতা অস্বীকার হওয়া আবশ্যিক হবে। আর দানশীলতা তার জন্য আবশ্যিক হবে অন্য থেকে তা নেতিবাচক হওয়ার কারণে। কেননা, দানশীলতা এমন একটি স্থানকে চায় যা তার বাস্তবায়ন করবে। এসব অবস্থায় অগ্রগামিতাকে আবশ্যিকের মতো মনে হয়। কেননা, অগ্রগামিতা এ দু'য়ের অর্থ বুঝানোর জন্য সহায়ক। কেননা, এদের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হুকুমকে ইঙ্গিতের সাথে প্রমাণ করা, যা স্পষ্ট বক্তব্যের তুলনায় বেশি বালাগাতপূর্ণ, আর হুকুমকে শক্তিশালী করার জন্য এ ধরনের অগ্রবর্তিতা অধিক সহায়ক। তিনি এখানে আবশ্যিকের মতো বলেছেন, এর অর্থ নয় যে, কখনো কখনো অগ্রগামী হয় আবার কখনো হয় না। আর এর অর্থ হচ্ছে যুক্তির আলোকে এটিকে পশ্চাদ্বর্তী করা বেধ হওয়া উচিত, কিন্তু ব্যবহার কেবলমাত্র অগ্রবর্তীরূপে। বিষয়টি তিনি দালাইলুল ই'জায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ : মূল লেখক বলেন, কখনো মুসনাদের আগে মুসনাদ ইলাইহকে অগ্রবর্তী করা আবশ্যিক হয় না, তবে আবশ্যিকের মতো হয়, যেমন— **مِثْلُ** ও **غَيْرُ** শব্দদ্বয় যদি মুসনাদ ইলাইহ হয় এবং এগুলোকে ইঙ্গিতার্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহকে আগে উল্লেখ করাই রীতি; যদিও তা আবশ্যিক নয়।

এখানে মূল লেখক আবশ্যিক বলেননি, বরং এটা আবশ্যিকের মতো বলেছেন। এর কারণ হচ্ছে, নিয়ম-রীতি হিসেবে এখানে অগ্রবর্তী করা আবশ্যিক নয়; কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে অগ্রবর্তী হিসেবে। ব্যবহারের কারণে এর পশ্চাদ্বর্তী হওয়ার বিষয়টি

মোটকথা, যেহেতু কিনারার মধ্যে দলিলসহ অর্থ প্রমাণিত হয়, তাই তা স্পষ্ট বাক্যের চেয়ে বেশি কার্যকর। মুসান্নিফ বলেন, **الزَّمَّ** (আবশ্যকের মতো)-এর অর্থ এ নয় যে, কখনো এগুলো অগ্রবর্তী হয়, আবার কখনো পশ্চাদ্বর্তী হয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অগ্রবর্তী করার নিয়ম এখানে না থাকলেও ব্যবহারগতভাবে আবশ্যিক। মুসান্নিফ (র.) বলেন, শায়খ আব্দুল কাহির জুরজানী (র.) তার দালাইলুল ই'জায় গ্রন্থে এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

قِيلَ وَقَدْ يَقْدَمُ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ الْمَسُورُ بِكُلِّ عَلَى الْمُسْنَدِ الْمَقْرُونِ بِحَرْفِ النَّفْيِ
لَأَنَّهُ أَيْ التَّقْدِيمُ دَالٌّ عَلَى الْعُمُومِ أَيْ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ نَحْوُ كُلِّ إِنْسَانٍ لَمْ
يَقُمْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْإِنْسَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُخِرَ نَحْوُ لَمْ
يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يُفِيدُهُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَالتَّقْدِيمُ
يُفِيدُ عُمُومَ السَّلْبِ وَشُمُولَ النَّفْيِ وَالتَّأْخِيرُ لَا يُفِيدُ إِلَّا سَلْبَ الْعُمُومِ وَنَفْيَ الشُّمُولِ
وَذَلِكَ أَيْ كَوْنُ التَّقْدِيمِ مُفِيدًا لِلْعُمُومِ دُونَ التَّأْخِيرِ لِثَلَاثٍ يَلْزَمُ تَرْجِيحُ التَّأْكِيدِ وَهُوَ أَنْ
يَكُونَ لَفْظُ كُلِّ لِيَقْرَأَ الْمَعْنَى الْحَاصِلَ قَبْلَهُ عَلَى التَّأْسِيسِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِإِفَادَةِ
مَعْنَى جَدِيدٍ مَعَ أَنَّ التَّأْسِيسَ رَاجِحٌ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ خَيْرٌ مِنَ الْإِعَادَةِ -

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন যে, كُلُّ শব্দযুক্ত মুসনাদ ইলাইহকে এমন মুসনাদের আগে আনা হয়, যা না-বাচকের হরফযুক্ত। কেননা, অগ্রবর্তিতা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমকে নফী করার অর্থ দেয়। যেমন- يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ (প্রত্যেক মানুষ দাঁড়ায়নি) এ বাক্যটি মানব সমাজের প্রত্যেকটি فرد থেকে দণ্ডায়মান হওয়াকে নফী করেছে। এর ব্যতিক্রম অর্থ হবে যদি كُلِّ-কে পশ্চাদ্বর্তী করা হয়। যেমন- لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ (সব মানুষ দাঁড়ায়নি) এ বাক্যটি মানবকুলের সমষ্টি থেকে দাঁড়ানোকে না-বাচক করার অর্থ দিয়েছে। অতএব, (كُلِّ)-এর অগ্রগামিতার নফীটি ব্যাপক এবং সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ প্রদান করে। আর পশ্চাদ্বর্তিতা শুধুমাত্র ব্যাপকতাকে নফী করে এবং সকলে শামিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। আর এটা অর্থাৎ অগ্রগামিতা ব্যাপকতার অর্থ দেয়, কিন্তু পশ্চাদ্বর্তিতা দেয় না, যাতে তাকিদ এবং অর্থাৎ كُلِّ শব্দটি তার আগে বাক্যের অর্থকে শক্তিশালী করার জন্য হওয়াকে প্রাধান্য দিতে হয় তাসীসের উপর। تَأْسِيسٌ হচ্ছে শব্দটি একটি নতুন অর্থ দিবে, যা আগের অর্থের চেয়ে ভিন্ন। তা ছাড়া তাসীস হচ্ছে অগ্রগণ্য। কেননা, নতুন অর্থ পুরাতন অর্থের পুনরাবৃত্তি থেকে উত্তম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قِيلَ وَقَدْ يَقْدَمُ : এ ইবারতে বর্ণিত কয়েকটি পরিভাষা প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার। মানতিক শাস্ত্রবিদগণের মতে سُوْر শব্দটি -أَفْرَادٌ-এর সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী। যেমন- كُلِّ (সবাই) بَعْضُ (কতিপয়) ইত্যাদি। আর যে শব্দের সাথে এসব سُوْر সম্পৃক্ত হয়, তাকে مُسَوْر বলা হয়।

أَفْرَادٌ-এর অর্থ সকলের থেকে কোনো কাজকে নফী করা হয়। عُمُومُ السَّلْبِ-এর অর্থ হচ্ছে عُمُومُ-এর মধ্য থেকে প্রত্যেক সদস্য থেকে কোনো কাজকে নফী করা। এক কথায় عُمُومُ-এর মধ্যে প্রত্যেকটি সদস্য نَفَى হয় না। পক্ষান্তরে سَلْبُ عُمُومُ-এর মধ্যে প্রত্যেকটি সদস্য থেকে কাজকে নফী করা হয়।

تَأْكِيد বলা হয় কোনো শব্দকে এমন অর্থে গ্রহণ করা, যে অর্থ ইতঃপূর্বে অর্জিত হয়েছে।

আর تَأْسِيس বলা হয় কোনো শব্দ নতুন অর্থে গ্রহণ করা।

লেখক বলেন, ইবনুল মালিক সহ আরো কতিপয় লোকের মতে, দু'টি শর্ত পাওয়া গেলে মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা ওয়াজিব। ১. মুসনাদ ইলাইহের উপর যদি سُوْر হিসেবে كُلِّ শব্দটি প্রবেশ করে। ২. মুসনাদে যদি نَفَى থাকে, কোনো একটি শর্ত না পাওয়া গেলে এরূপভাবে আগে আনা হবে না।

আল্লামা দুসুকীর মতে, আরেকটি শর্ত হলো মুসনাদ ইলাইহ এমন হতে হবে যে, তাকে যদি পরে আনা হয় তাহলে এটি তারকীবে ফায়েল হবে। মোটকথা, এ তিনটি শর্ত যদি পাওয়া যায় এবং বক্তার উদ্দেশ্য যদি হয় নেতিবাচক, যা সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক হবে ও সবাইকে শামিল করবে, এমতাবস্থায় মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা আবশ্যিক হবে। কেননা, যদি তাকে পরে আনা হয়, তাহলে বক্তার উদ্দেশ্য সাধন হবে না। উদাহরণস্বরূপ বক্তা যদি নেতিবাচক কথাকে ব্যাপক করতে চায় তাহলে মুসনাদ ইলাইহকে আগে এনে এভাবে বলবে **كُلُّ إِنْسَانٍ لَّمْ يَقُمْ** কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি। এ বাক্যটি সমস্ত মানুষ থেকে দাঁড়ানোকে নফী করে। অতএব, দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপকভাবে নফী হলো। যদি উদ্দেশ্য আদায় করতে বক্তা মুসনাদ ইলাইহকে পরে আনে তাহলে উক্ত উদ্দেশ্য আদায় হবে না। যেমন, সে বলল **كُلُّ إِنْسَانٍ لَّمْ يَقُمْ** সব লোক দাঁড়ায়নি। এ বাক্যটি ব্যাপকতাকে নফী করেছে এবং দাঁড়ানোর মধ্যে সবার শামিল হওয়াকে নফী করেছে।

অতএব, যদি মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা হয়, তাহলে তার নফী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে বসে যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে এটি সকলের বেলায় নফী কেন হবে? এমনিভাবে পরে আনা হলে তার নফী ব্যাপকতার ব্যাপারে হবে। তখন অর্থ হবে এই যে, সবাই আসেনি (কেউ হয়তো এসেছে, আবার কেউ হয়ত আসেনি)-এর উত্তর এই যে, যদি উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও অগ্রবর্তীকে নেতিবাচকের ব্যাপকতার অর্থে এবং পশ্চাদ্বর্তীকে ব্যাপকতা না-বাচক অর্থে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে **تَأْكِيد**-এর উপর **تَأْسِيس** অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যিক হচ্ছে। অথচ সর্বসম্মত মতে **تَأْسِيس** হচ্ছে তাকিদের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

وَيَبَانَ لُزُومُ التَّأَكُّيدِ عَلَى التَّأْسِيسِ أَمَّا فِي صُورَةِ التَّقْدِيمِ فَلَا نَقَوْلَنَا
 إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوجِبَةً مُهِمَّةً أَمَّا الْإِنْجَابُ فَلِأَنَّهُ حُكِمَ فِيهَا بِثُبُوتِ عَدَمِ الْقِيَامِ
 لِلْإِنْسَانِ لَا يَنْفِي الْقِيَامَ عَنْهُ لِأَنَّ حَرْفَ السَّلْبِ وَقَعَ جُزْأً مِنَ الْمَحْمُولِ وَأَمَّا الْإِهْمَالُ
 فَلِأَنَّهُ لَمْ يُذَكَّرْ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى كَمِيَّةِ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى مَا
 صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ مُوجِبَةً مُهِمَّةً يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ نَفْيُ
 الْقِيَامِ عَنِ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لِأَنَّ الْمَوْجِبَةَ الْمُهْمَلَةَ الْمَعْدُولَةَ الْمَحْمُولَ فِي
 قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ نَحْوُ لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْإِنْسَانِ بِمَعْنَى أَنَّهُمَا
 مُتَلَازِمَتَانِ فِي الصِّدْقِ لِأَنَّهُ قَدْ حُكِمَ فِي الْمُهْمَلَةِ بِنَفْيِ الْقِيَامِ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ
 أَعْمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَمِيعَ الْأَفْرَادِ أَوْ بَعْضَهَا وَأَيَّامًا كَانَ يَصْدُقُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِ وَكُلَّمَا
 صَدَقَ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنِ الْبَعْضِ صَدَقَ نَفْيُهُ عَمَّا صَدَقَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ فِي الْجُمْلَةِ -

অনুবাদ : তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দান আবশ্যিক হওয়ার ব্যাখ্যা। অগ্রবর্তী করার অবস্থায় আমাদের
 উক্তি لَمْ يَقُمْ مُوجِبَةً مُهِمَّةً ইচ্ছা مُوجِبَةً হওয়ার কারণ হচ্ছে এতে দণ্ডায়মান না হাওয়াকে মানুষের
 জন্য প্রমাণ করা হয়েছে। তার থেকে দণ্ডায়মান হওয়া না-বাচক করা হয়নি। কেননা, না-বাচকের অক্ষর এখানে
 খবরের অংশ হয়েছে। আর مُهْمَلَةً-এর কারণ হচ্ছে এ বাক্যে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যা সদস্য সমূহের
 সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে। সেই সাথে এতে হুকুম করা হচ্ছে এমন বিষয়ে যাকে মানুষ বলা চলে। অতএব তার
 অর্থ সকল থেকে দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ না-বাচক হওয়াই বাঞ্ছনীয়, প্রত্যেকটি সদস্য থেকে নয়, কেননা مُوجِبَةً
لَمْ يَقُمْ سَالِبَةِ جُزْئِيَّةٍ-এর হুকুমে। যেমন مُهْمَلَةَ مَعْدُولَةَ الْمَحْمُولِ তার মুসনাদ ইলাইহের অস্তিত্ব থাকা অবস্থায়
لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْإِنْسَانِ এ হিসেবে যে, প্রয়োগের দিক থেকে উভয়েই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কেননা, মুহমালার মধ্যে এ
 সকল সদস্য থেকে দাঁড়ানো না-বাচক হয়েছে, যাদের উপর 'মানুষ' কথাটি প্রয়োগ হয়- এখানে মানুষ কথাটি
 ব্যাপক- সব মানুষ হতে পারে আবার কতিপয় মানুষও হতে পারে, যাই উদ্দেশ্য হোক না কেন এতে কতিপয়
 লোকের থেকে নিশ্চিতভাবে দাঁড়ানো না-বাচক হচ্ছে। আর যখন কতিপয় লোক থেকে দাঁড়ানো না বাচক হলো-
 তাহলে মোটের উপর দাঁড়ানো না-বাচক হলো এসব সদস্যের ব্যাপারে, যাদের মানুষ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَيَبَانَ لُزُومُ التَّأَكُّيدِ : ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, যদি মুসনাদ ইলাইহের সাথে كُل শব্দটি যুক্ত হয় এবং তার
 মুসনাদ না-বাচকের অক্ষরের সাথে মিলিত হয়ে আসে, তাহলে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তিতা সকলের ক্ষেত্রে নেতিবাচক হুকুম
 প্রদান করে। এ অবস্থায় যদি সকলের ক্ষেত্রে না-বাচক প্রমাণ না হয়, তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া
 হবে। অর্থাৎ তখন كُل শব্দটি তাকিদের জন্য হবে তাসীসের জন্য হবে না। এর বিশদ বর্ণনা হচ্ছে এই যে, كُل শব্দটি ছাড়া
مُوجِبَةً مُهِمَّةً مَعْدُولَةَ الْمَحْمُولِ-বাক্যটি হচ্ছে- لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ বাক্যটি হচ্ছে-

موجب হওয়ার কারণ হচ্ছে, এতে انسان (মুসনাদ ইলাইহ) সম্পর্কে عَدَمٌ قِيَامٌ (দণ্ডায়মান না হওয়া) প্রমাণ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, انسان থেকে দাঁড়ানোকে নফী করা হয়নি। এখানে না দাঁড়ানো সাবিত করা হয়েছে। বলার কারণ হচ্ছে لم (না-বাচক হরফ) এখানে মুসনাদ খবর-এর অংশ বিশেষ। আর যখন না-বাচক হরফ মুসনাদ অথবা মুসনাদ ইলাইহের অংশ হয়ে বসে তখন সেই বাক্যকে مَعْدُولَةٌ বলা হয়, যদি তা মুসনাদ (খবর)-এর অংশ হয় তাহলে তাকে مَعْدُولَةُ الْمَوْضُوعِ বলা হয়, আর যদি তা মুবতাদার অংশ হয় তাহলে একে مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولِ বলা হয়। আর নিয়মানুসারে مَعْدُولَةُ الْمَوْضُوعِ অথবা مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولِ বাক্যসমূহ مَوْجِبَةٌ হয়ে থাকে, তবে যদি নিসবত না-বাচক করার জন্য আরেকটি না-বাচক হরফ আনা হয় তাহলে তা سَالِبَةٌ হতে পারে। অতঃপর বাক্যটিকে مَهْمَلَةٌ বলার কারণ হচ্ছে এতে কোনো سُرٌ বিদ্যমান নেই। যেসব বাক্যের মধ্যে سُرٌ যথা كل ও بعض ইত্যাদি শব্দ নেই সেসব বাক্যকে مَهْمَلَةٌ বলা হয়। سُرٌ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, سُرٌ বলা হয় এমন শব্দকে, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের مَهْمَلَةٌ-এর পরিমাণ ও সংখ্যার ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করে। সে মতে مَهْمَلَةٌ إِنْشَانٌ لَمْ يَقُمْ হচ্ছে যেহেতু এতে سُرٌ নেই। মোটকথা مَهْمَلَةٌ إِنْشَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর মধ্যে مَوْجِبَةٌ, مَهْمَلَةٌ ও مَعْدُولَةُ الْمَحْمُولِ সবগুলো বিষয় পাওয়া গেল। অতএব, বাক্যের অর্থ হবে সব মানুষ দাঁড়ায়নি। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি মানুষ দাঁড়ায়নি। কাজেই এ বাক্য দ্বারা সকলের দণ্ডায়মান না হওয়া প্রমাণিত হলো প্রত্যেকের নয়।

فَهِيَ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ نَفَى الْحُكْمِ عَنِ الْجُمْلَةِ لِأَنَّ صِدْقَ
السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ الْمَوْجُودِ الْمَوْضُوعِ أَمَّا يَنْفِي الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ أَوْ يَنْفِيهِ عَنِ
الْبَعْضِ مَعَ ثُبُوتِهِ لِبَعْضٍ وَأَيَّامًا كَانَ يَلْزِمُهَا نَفَى الْحُكْمِ عَنِ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ دُونَ كُلِّ
فَرْدٍ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَنْفِيًا عَنِ الْبَعْضِ ثَابِتًا لِبَعْضٍ الْآخِرِ وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ
بِدُونِ كُلِّ مَعْنَاهُ نَفَى الْقِيَامِ عَنِ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ كُلِّ
أَيْضًا مَعْنَاهُ كَذَلِكَ كَانَ كُلُّ لِتَاكِيدِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَفَى الْحُكْمِ
عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لِيَكُونَ كُلُّ لِتَاسِيسٍ مَعْنَى آخَرَ تَرْجِيحًا لِلتَّاسِيسِ عَلَى التَّكْيِيدِ -

অনুবাদ : এটা -সালিবে জুজ্জিযে (মুজ্জিবে মূহম্মে) এর অর্থে, যা সকলের থেকে হুকুম নফী করা আবশ্যক করে। সালিবে জুজ্জিযে যার প্রয়োগ প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অথবা কতককে নফী করা হবে, অবশিষ্ট কতকের জন্য হুকুম প্রমাণ করা হবে। সারকথা হচ্ছে, কতিপয় লোক থেকে হুকুম নফী করা হচ্ছে, প্রত্যেক সদস্য থেকে নয়। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কতকের জন্য নফী হবে আর কতকের জন্য প্রমাণিত হবে। অতএব, إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ বাক্যটি كل ছাড়া এর অর্থ 'সকলের দণ্ডায়মান না হওয়া' প্রমাণ হলো, প্রত্যেকের থেকে নয়। যদি كل যুক্ত হওয়ার পরও অর্থ তেমনি থাকে, তাহলে كل প্রথম অর্থের তাকিদের জন্য হলো।

অতএব, এর অর্থ প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করা ওয়াজিব, যাতে كل তাসীসের জন্য হয়- তাকিদেের জন্য নয়। তাসীসকে তাকিদেের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

উল্লিখিত ইবারতে মুসান্নিফ মুহম্মে -এর যে তরজমা করেছিলেন তার দলিল পেশ করছেন। তিনি বলেন, -مُوجِبَةٌ مُهْمَلَةٌ مَعْدُولَةُ الشَّعْوَلِ -এর মুসনাদ ইলাইহ وجودی বা অস্তিত্বশীল হলে তা সালিবে জুজ্জিযে -এর হুকুমে হয়। অর্থাৎ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ বাক্যটি الْإِنْسَانُ -এর হুকুমে হয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে -لَمْ يَقُمْ بَعْضُ الْإِنْسَانِ -এর হুকুমে হয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে একটি পাওয়া গেলে অপরটিও পাওয়া যায়, একটির অস্তিত্ব অপরটির অস্তিত্বকে আবশ্যক করে। এর কারণ হচ্ছে إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ -এর মধ্যে দণ্ডায়মান না হওয়া মানুষের সদস্যদের মধ্য হতে হয়েছে, এটা সব সদস্য থেকেও হতে পারে আবার কতিপয় সদস্যদের থেকেও হতে পারে। এ উভয় সম্ভাবনার মধ্য থেকে যে কোনো একটি হোক না কেন এটা নিশ্চিত যে, কতিপয় লোক দাঁড়ায়নি। অতএব, -مُهْمَلَةٌ -এর দ্বারা কতিপয় লোকের দণ্ডায়মান না হওয়া প্রমাণিত হলো। এর ফলে সবাই দাঁড়ায়নি এটাও প্রমাণিত হলো। কারণ, কতিপয় বাদ পড়লে সকলের দ্বারা তো কাজ হলো না।

উক্ত বর্ণনানুসারে -مُهْمَلَةٌ মিলে যাচ্ছে -سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ -এর সাথে। কারণ, -سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ ও সবাব দ্বারা সংশ্লিষ্ট হুকুম না হওয়াকে প্রমাণ করে। প্রত্যেক থেকে না-বাচক করে না।

এর ব্যখ্যা হচ্ছে এই যে, -سَالِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ -এর প্রয়োগ দু'ভাবে হতে পারে-

১. প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করা অবস্থায়। কেননা, প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী করা হলে কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী করা হলো। আর কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী হওয়াকে **سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ** বলা হয়।

২. কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী করা হবে। আর কতিপয় সদস্যের জন্য হুকুম সাবিত হবে। এতেও কতিপয় সদস্য থেকে হুকুম নফী হওয়ার দ্বারা **سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ** পাওয়া গেল। (এটা দ্বিতীয় প্রয়োগ)

উভয় অবস্থায় **سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ** পাওয়া গেল যার দ্বারা এটা প্রমাণ হলো যে, মুবতাদার সদস্যদের সকল থেকে হুকুম নফী হবে- প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক হবে না। ইতঃপূর্বে **مَهْلَةٌ**-এর আলোচনায় এ বক্তব্যই প্রমাণিত হয়েছিল। অতএব, **سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ** এবং **مَهْلَةٌ** পরস্পরকে লাযেম করে। মোটকথা হচ্ছে, **إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ**-এর অর্থ সকলে দাঁড়ায়নি আর এটা প্রত্যেক সদস্যের না দাঁড়ানোর অর্থ দেয় না।

এখন যদি **كُلُّ** যুক্ত হওয়ার পর সেই অর্থই থাকে, তাহলে **كُلُّ** পূর্বের অর্থের তাকিদে জন্য হলো, তাসীসের জন্য হলো না। অতএব, **كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ**-এর অর্থ হবে প্রত্যেকটি মানুষ দাঁড়ায়নি। এ অর্থ না করে যদি বলা হয় সবাই দাঁড়ায়নি, তাহলে **كُلُّ** তাকিদে জন্য হলো। সুতরাং তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য না দেওয়ার জন্য **كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ**-এর অর্থ হবে কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি।

وَأَمَّا فِي صُورَةِ التَّأْخِيرِ فَلِإِنَّ قَوْلَنَا لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ سَالِبَةٌ مُهِمَلَةٌ لَأَسُورَ فِيهَا وَالسَّالِبَةُ الْمُهِمَلَةُ فِي قُوَّةِ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلنَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ نَحْوُ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُهِمَلَةَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ بَيْنَهُ بِقَوْلِهِ لَوُرُودَ مَوْضُوعِهَا إِلَى مَوْضُوعِ الْمُهِمَلَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ حَالَ كَوْنِهِ نَكْرَةً غَيْرَ مُصَدَّرَةٍ بِلَفْظِ كُلِّ فَإِنَّهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْحُكْمِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ وَإِذَا كَانَ لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ بِدُونِ كُلِّ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْقِيَامِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَلَوْ كَانَ بَعْدَ دُخُولِ كُلِّ أَيْضًا كَذَلِكَ كَانَ كُلُّ لِتَأْكِيدِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نَفْيِ الْقِيَامِ عَنْ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ لِيَكُونَ كُلُّ لِتَأْسِيسِ مَعْنَى آخَرٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَةَ كُلِّ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يُفِيدُ إِلَّا أَحَدَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَعِنْدَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا يَثْبُتُ الْآخَرُ ضَرُورَةً فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِدُونِ كُلِّ لِسَلْبِ الْعُمُومِ وَنَفْيِ الشُّمُولِ وَالتَّأْخِيرِ لِعُمُومِ السَّلْبِ وَشُمُولِ النَّفْيِ فَبَعْدَ دُخُولِ كُلِّ يَجِبُ أَنْ يَعْكَسَ هَذَا لِيَكُونَ كُلُّ لِلتَأْسِيسِ الرَّاجِحِ لَا لِلتَّأْكِيدِ الْمَرْجُوحِ -

অনুবাদ : আর পরে আনার অবস্থায় আমাদের উক্তি سُرُورُ هَـ هَـ سَالِبَةٌ مُهِمَلَةٌ এতে কোনো سُرُورُ নেই, আর নিয়মানুসারে سَالِبَةٌ مُهِمَلَةٌ هَـ-এর অর্থে যা প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুমকে নফী করে। যেমন-لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ যখন এটি তাদের কাছে প্রচলিত ধারণানুযায়ী مُهِمَلَةٌ হেছে جُزْئِيَّة-এর হুকুমের বিপরীত, তাই তিনি তার বক্তব্যে সেটা বর্ণনা করছেন মুহম্মালের মুসনাদ ইলাইহি তা না-বাচকের অধীনে আসার কারণে, এমতাবস্থায় যে, তা অনির্দিষ্ট হুকুমকে না-বাচক করে। অতএব, যখন كُلِّ ছাড়া لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর অর্থ প্রত্যেকটি সদস্য থেকে দণ্ডায়মান হওয়াকে নফী করা, তখন كُلِّ প্রবেশের পর যদি এই অর্থ বহাল থাকে, তাহলে كُلِّ প্রথম অর্থকে তাকিদ করল। অতএব সকল থেকে নফী করা অর্থ গ্রহণ করা ওয়াজিব, যাতে كُلِّ আরেকটি নতুন অর্থকে সৃষ্টি করে। কেননা, এস্থানে كُلِّ দু'টি অর্থের যে কোনো একটির সম্ভাবনা রাখে। একটি না-বাচক হলে অবশ্যম্ভাবীভাবে আরেকটি প্রমাণিত হবে। সারকথা হেছে, كُلِّ ছাড়া মুসনাদ ইলাইহি আগে আসা সমষ্টিতে নফী করা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তকরণকে না-বাচক করা। আর পরে আসার দ্বারা প্রত্যেক সদস্য হুকুমের ব্যাপারে নফী হয় এবং নফী সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। كُلِّ সংযুক্ত হওয়ার পর এর উল্টো হওয়া উচিত, যাতে كُلِّ অপ্রাধিকারপ্রাপ্ত তাসীসের জন্য হয়, অপ্রাধান্য তাকিদের জন্য না হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

কُلِّ فِي الصُّورَةِ الِ: মুসান্নিফ (র.) বলেন, যদি মুসনাদ ইলাইহি পরে আসে এবং মুসনাদ ইলাইহের উপর كُلِّ শব্দটি আসে আর মুসনাদ হরফে নফীর সাথে যুক্ত হয়, তাহলে মুসনাদ ইলাইহের পরে আসা সমষ্টির জন্য নফী হয়। অন্যথায় তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কারণ, كُلِّ ছাড়া মুসনাদ ইলাইহ যদি পরে আসে যেমন-سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ হেছে لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ আর লেখকের মতানুসারে سَالِبَةٌ مُهِمَلَةٌ এটি তাহলে لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর হুকুমে এর প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী হয় সে মতে سَالِبَةٌ مُهِমَلَةٌ-এর মধ্যেও প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম নফী হবে। অতএব, এর অর্থ হেছে لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِقَائِمٍ

মুসান্নিফ (র.) বলেন, سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ হেছে سَالِبَةٌ مُهِمَلَةٌ-এর হুকুমে লেখকের এ মতটি জমহুর উলামাদের মতের বিপরীত, জমহুরের মতে سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ হেছে سَالِبَةٌ مُهِمَلَةٌ-এর হুকুমে। কেননা, مُهِمَلَةٌ হেছে جُزْئِيَّة-এর হুকুমে।

লেখকের বক্তব্য জমহুরের বক্তব্যের বিপরীত হওয়াতে লেখক আত্মপক্ষ সমর্থন করে জবাব দিচ্ছেন যে, আমার বক্তব্য *سَالِبَةٌ مُّهِمَّةٌ* হচ্ছে *سَالِبَةٌ جُزْنِيَّةٌ*-এর হুকুমে। এটা তখনই যখন বাক্যের মুসনাদ ইলাইহ নফীর পরে আসবে, তা অনির্দিষ্ট এবং তার সাথে *كُل* শব্দটি যুক্ত না করে যেমন- *لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ* জমহুরের মতে *سَالِبَةٌ مُّهِمَّةٌ* হচ্ছে *سَالِبَةٌ كُليَّةٌ*-এর হুকুমে, তার প্রয়োগ উক্ত অবস্থা ছাড়া অন্য তিন অবস্থায় হয়ে থাকে। যেমন- ১. মুসনাদ ইলাইহ নির্দিষ্ট, ২. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট, তবে তার পূর্বে হরফে নফী নেই। ৩. মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট এবং হরফে নফীর পরেও এসেছে; কিন্তু মুসনাদ ইলাইহের সাথে *كُل* শব্দটি যুক্ত। যেমন- (প্রথম প্রকারের উদাহরণ) *الْإِنْسَانُ لَمْ يَقُمْ* দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ *لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ* তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ *كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ* এ তিন অবস্থায় *سَالِبَةٌ جُزْنِيَّةٌ* অবশ্যই *سَالِبَةٌ مُّهِمَّةٌ*-এর হুকুমে হবে।

তবে যখন মুসনাদ ইলাইহ অনির্দিষ্ট ও নফীর পরে আসবে এবং তাতে *كُل* প্রবেশ করবে না, তখন তা *سَالِبَةٌ كُليَّةٌ*-এর হুকুমে হবে। যেমন- *لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ* এটির অর্থ হবে, প্রত্যেক সদস্য থেকে দণ্ডায়মান নফী হওয়া। অতএব *لَمْ يَقُمْ* অর্থ *كُل* ছাড়া প্রত্যেক সদস্য থেকে বিষয় নফী করা, এখন *كُل* এতে প্রবেশ করার পরও যদি সেই পূর্বের অর্থ বহাল থাকে এবং অর্থ হয় প্রত্যেক মানুষ দাঁড়ায়নি, তাহলে *كُل* এখানে তাকিদের জন্য হয়ে যাচ্ছে এবং তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যিক হচ্ছে। অথচ তাসীসকে তাকিদের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আর এ জন্যই আমরা বলবো, *كُل* প্রবেশ করার পর *لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ*-এর অর্থ হবে সবার থেকে দণ্ডায়মান হওয়াকে না-বাচক করা। এ ছাড়া এখানে অন্য অর্থ গ্রহণ করার সুযোগ নেই, হয় সবার থেকে নফী করবে অথবা প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী করবে, এখানে *كُل*-এর দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যখন তাকিদের কারণে দু'টির একটি (প্রত্যেক সদস্য থেকে নফী এর অর্থ) বাদ পড়ল, তখন অপরটি অবশ্যই প্রমাণিত হবে। আর অপর অর্থ হচ্ছে সমষ্টিকে না-বাচক করা।

অতএব, এটা প্রমাণিত হলো যে, মুসনাদ ইলাইহ পরে আসলে আর এর সাথে *كُل* যুক্ত করলে মুসনাদ ইলাইহের অর্থ হবে, সব মানুষ থেকে হুকুম নফী করা, প্রত্যেক মানুষ থেকে হুকুম নফী করা নয়।

শেষ কথা হচ্ছে- মুসনাদ ইলাইহ আগে আসার অবস্থায় *كُل* ব্যতীত অর্থ হচ্ছে ব্যাপকতাকে নফী করা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তিতে নফী করাকে আর পরে আসলে তার অর্থ প্রত্যেকের ক্ষেত্রে নফী করা এবং না-বাচকতা সকলের জন্য ব্যাপক হওয়া- অতএব, *كُل* অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এতে অর্থের পরিবর্তন জরুরি যাকে *كُل* তাসীসের জন্য হয় তাকিদের জন্য না হয়- যাতে তাসীস তাকিদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বিশেষ নোট : লেখক তার ইবারতে মুসনাদ ইলাইহের আগে আসা ও পরে আসার অবস্থায় *كُل* ব্যতীত কী অর্থ- হয় এবং *كُل* সহ কী অর্থ হয়, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু এসব আলোচনার শেষ কথা বলেননি এবং মূল বিষয়টির সিদ্ধান্ত দেননি। মূলত বিষয় ছিল যদি মুসনাদ ইলাইহের সাথে *كُل* যুক্ত হয় এবং মুসনাদের সাথে নফীর হরফ থাকে উদাহরণ স্বরূপ *لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ* এ অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা ওয়াজিব, কারণ যদি আগে না আনা হয় তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যিক হচ্ছে। কেননা, *كُل* ছাড়া *لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ*-এর অর্থ সব মানুষ দাঁড়ায়নি। এখন যদি *كُل* যুক্ত করে আগে না এনে পরে আনা হয়, আর বলা হয় *لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ* তাহলে এটাও ব্যাপকতাকে নফী করবে এবং পূর্ববর্তী বাক্য (*لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ*) যে অর্থ দিয়েছে অনুরূপ অর্থ দিবে। তাহলে *كُل* শব্দটি প্রথম অর্থের তাকিদ করল, তাসীসের জন্য হলো না। পক্ষান্তরে যদি *كُل* শব্দটি যুক্ত করে তাকে আগে আনা হয় এবং বলা হয় *لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ* তাহলে অর্থ হবে : প্রত্যেকটি লোক দাঁড়ায়নি অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিকে নফী করবে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে *كُل* অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আগে আনা হলে মুসনাদ ইলাইহ তাসীসের অর্থ দেয়, কিন্তু পরে আনা হলে তাকিদের অর্থ দেয়। যেহেতু *كُل*-এর অন্তর্ভুক্তির পর আগে আসা তাসীসের অর্থ দেয়, তাই তাসীসকে তাকিদের উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহকে আগে আনা ওয়াজিব।

সারাংশ : আরবি ভাষাসাহিত্যের রীতি অনুসারে কোনো একটি নতুন শব্দ দ্বারা নতুন অর্থ গ্রহণ করা জরুরি, পূর্বের অর্থের পুনরাবৃত্তি না করে। উল্লিখিত ইবারতের প্রথম অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহ (*كُل* সহ) আগে না আনলে অর্থের পুনরাবৃত্তি হয়। তাই অর্থের পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য আগে আনা ওয়াজিব। দ্বিতীয় অবস্থায় বা পশ্চাদ্বর্তী করার অবস্থায়ও *كُل* ছাড়া বাক্যের অর্থ *كُل* সহ বাক্যের অর্থের বিপরীত করতে হয়, অন্যথায় তাকিদ তাসীসের উপর প্রাধান্য লাভ করে। অথচ এটা করা ঠিক নয়।

وَفِيهِ نَظَرٌ لَّانَ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَغْنَى الْمُوجِبَةُ الْمُهِمَّةُ الْمَعْدُولَةُ
 الْمَحْمُولُ نَحْوُ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ وَعَنْ كُلِّ فَرْدٍ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ يَغْنَى السَّالِبَةُ الْمُهِمَّةُ
 نَحْوُ لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ إِنَّمَا أَفَادَهُ الْإِسْنَادُ إِلَى مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ كُلُّ وَهُوَ لَفْظُ إِنْسَانٍ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ
 الْإِسْنَادُ الْمُفِيدُ لِهَذَا الْمَعْنَى بِالْإِسْنَادِ إِلَيْهَا أَيْ إِلَى كُلِّ لَّانَ إِنْسَانًا صَارَ مُضَافًا إِلَيْهِ فَلَمْ
 يَبْقَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ فَتَكُونُ أَيْ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ الْإِسْنَادُ إِلَى كُلِّ آيَضًا مُفِيدًا لِلْمَعْنَى
 الْحَاصِلِ مِنَ الْإِسْنَادِ إِلَى الْإِنْسَانِ تَكُونُ كُلُّ تَأْسِيسًا لَا تَأْكِيدًا لَّانَ التَّائِيدَ لَفْظٌ يُفِيدُ
 تَقْوِيَةً مَا يُفِيدُهُ لَفْظٌ آخَرُ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَّانَ هَذَا الْمَعْنَى حِينَئِذٍ إِنَّمَا أَفَادَهُ الْإِسْنَادُ إِلَى
 لَفْظِ كُلِّ لَاشَيْءٍ آخَرُ حَتَّى تَكُونَ كُلُّ تَأْكِيدًا لَهُ وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ
 الْكَلَامُ بَعْدَ كُلِّ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ كَانَ كُلُّ لِلتَّائِيدِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا
 الْمَنْعَ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى تَقْدِيرٍ أَنْ يُرَادَ التَّائِيدُ الْإِضْطِلَاجِيُّ أَمَّا لَوْ أُريدَ بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ كُلُّ
 لِإِفَادَةِ مَعْنَى كَانَ حَاصِلًا بِذَوْنِهِ فَإِنْدِفَاعُ الْمَنْعِ ظَاهِرٌ -

অনুবাদ : এতে আপত্তি আছে। কেননা, প্রথম অবস্থায় তথা مُوجِبَةُ مُهِمَّةٍ مَعْدُولَةٍ الْمَحْمُولِ-এর অবস্থায় যেমন-إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ-এর মধ্যে না-বাচক করা হচ্ছে সকলকে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় তথা سَالِبَةُ مُهِمَّةٍ-এর অবস্থায় যেমন-لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর মধ্যে না-বাচক করা হচ্ছে প্রতিটি সদস্যকে। আর এই অর্থ দিচ্ছে সেই ইসনাদ, যা করা হয়েছে كُلِّ-এর মুযাফ ইলাইহের প্রতি। আর তা হচ্ছে, انسان শব্দটি। আর সেই ইসনাদ كُلِّ-এর প্রতি ইসনাদের মাধ্যমে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কেননা, انسان এখানে মুযাফ ইলাইহ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তা আর মুসনাদ ইলাইহ থাকছে না। সুতরাং كُلِّ-এর দিকে ইসনাদ করার মাধ্যমে সেই অর্থই পাওয়া যাচ্ছে, যা انسان-এর দিকে ইসনাদের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। অতএব, كُلِّ (এভাবে) তাসীসের জন্য হলো। তাকিদের জন্য নয়; কেননা, তাকিদ বলা হয় কোনো শব্দ দ্বারা ঐ অর্থ প্রদান করা যে অর্থ শব্দ দ্বারা অর্জিত হয়েছে। আর এখানে তা হয়নি। কেননা, তখন এ অর্থ كُلِّ-এর দিকে ইসনাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। এ অর্থ অন্য কোনো শব্দ প্রদান করেনি যে, كُلِّ তার তাকিদ হবে।

সারকথা হচ্ছে, আমরা এ কথা মানতে রাজি নই যে, كُلِّ শব্দের সংযুক্তির পর যদি বাক্যের অর্থ তাই হয় যা كُلِّ-এর সংযুক্তির পূর্বে ছিল, তাহলে كُلِّ তাকিদের জন্য হলো। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত আপত্তি তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তাকিদ দ্বারা পারিভাষিক তাকিদ উদ্দেশ্য হয়। আর যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়- كُلِّ এমনই একটি অর্থ প্রদান করে, যা كُلِّ ব্যতীত অর্জিত হয়েছে তাহলে স্পষ্টত আপত্তির নিরসন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ الخ : উল্লিখিত ইবারতে মূল লেখক ইবনুল মালিক প্রমুখের পুরো বক্তব্যের উপর তিনটি আপত্তি তুলেছেন। অর্থাৎ মূল লেখক ইবনুল মালিক প্রমুখের দাবিকে তো সত্য বলে মেনে নিয়েছেন; কিন্তু তাদের বক্তব্যের মধ্যে তিনটি অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন।

তার প্রথম প্রশ্নটি অগ্রবর্তী এবং পশ্চাদ্বর্তী উভয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তিটি পশ্চাদ্বর্তী করার অবস্থায়। প্রথম আপত্তিটি হচ্ছে— অগ্রবর্তী করার অবস্থায় كُل-এর অন্তর্ভুক্তির পূর্বে لَمْ يَكُنْ-এর অর্থ “সব মানুষ দাঁড়ায়নি”, এখন كُل প্রবেশের পর যদি অর্থ لَمْ يَكُنْ كُلِّ إِنْسَانٍ সব মানুষ দাঁড়ায়নি হয়, তাহলে كُل তাকিদের জন্য হলো।

এমনিভাবে لَمْ يَكُنْ كُلِّ إِنْسَانٍ-এর অর্থ হচ্ছে কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি। এখন كُل শব্দটি প্রবেশের পর إِنْسَانٍ-এর অর্থ যদি কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি হয়, তাহলে এটা আপনাদের মতে তাকিদ; কিন্তু আমরা দেখছি যে, كُل প্রবেশের আগে যে ইসনাদ হয়েছে كُل প্রবেশের পর নতুনভাবে ইসনাদ হয়েছে এবং উভয় অবস্থায় মুসনাদ ইলাইহেরও পরিবর্তন হয়েছে। كُل থাকা অবস্থায় كُل হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ, আর كُل না থাকা অবস্থায় كُل-এর মুযাফ ইলাইহ হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ। كُل আসার দ্বারা আগের ইসনাদটি বাতিল হয়ে গেছে। অতএব, كُل আসার পর যদি পূর্ববর্তী অর্থ বাকি, থাকে তবুও তো তা তাকিদ হচ্ছে না। কেননা, এ অর্থটি ভিন্ন ইসনাদ দ্বারা পাওয়া গেছে; বরং এটি তাসীস হচ্ছে। কেননা, পরিভাষায় তাকিদের সংজ্ঞা হচ্ছে, তাকিদ ঐ শব্দকে বলা হয়, যা এমন অর্থ প্রদান করে যে অর্থটি ইতঃপূর্বে আরেকটি শব্দ প্রদান করেছিল। অর্থাৎ দু'টি শব্দ একটি অর্থ প্রদান করলে এবং সবই একই ইসনাদের মধ্যে হলে দ্বিতীয় শব্দটি তাকিদ হবে; কিন্তু এখানে তা হয়নি। কেননা, যখন كُل-এর ইসনাদ করা হয়েছে তখন উল্লিখিত অর্থটি كُل-ই প্রকাশ করেছে, অন্য কেউ নয়। অতএব, এখানে তাকিদ হয়নি।

মোটকথা, কোনো বাক্যে كُل প্রবেশ করার আগে যে অর্থ ছিল তা যদি كُل প্রবেশ করার পরও বহাল থাকে, তবে তা তাকিদ হবে এটা আমরা মেনে নিতে পারি না।

বাক্যে كُل আসার আগের অর্থ এবং كُل অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরের অর্থ একই ধরনের হলেও তা তাকিদ নয়; বরং তাসীস হবে। এ আপত্তির জবাবে মুসান্নিফ বলেন, আপত্তিটি যথার্থ। তবে যদি উপরোক্ত তাকিদকে পারিভাষিক তাকিদ না ধরে আমরা যদি আভিধানিক তাকিদ উদ্দেশ্য করি, তাহলে এ আপত্তিটি থাকছে না। তখন তাকিদের অর্থ হবে كُل শব্দটি এমন অর্থ প্রদান করছে, যা كُل ছাড়া অন্যভাবে অর্জিত হয়েছিল। এভাবে ব্যাখ্যা করলে উল্লিখিত আপত্তিটি আর থাকে না। কেননা, এ অর্থে এখানে كُل তাকিদের জন্য হয়েছে এবং এটাও বলা যথার্থ যে, كُل অন্তর্ভুক্ত করার পর كُل-এর আগের অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

وَجَيْنِذٍ يُتَوَجَّهُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَئِنَّ الصُّورَةَ الثَّانِيَةَ يَغْنِي السَّالِبَةَ الْمُهِمَّةَ نَحْوُ
لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ إِذَا أَفَادَتِ النَّفْيَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ فَقَدْ أَفَادَتِ النَّفْيَ عَنِ الْجُمْلَةِ فَإِذَا حُمِلَتْ كُلُّ عَلَى
الثَّانِي أَى عَلَى إِفَادَةِ النَّفْيِ عَنِ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ حَتَّى يَكُونَ مَعْنَى لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ نَفْيَ الْقِيَامِ
عَنِ الْجُمْلَةِ لَا عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لَا تَكُونُ كُلُّ تَاسِيْسًا بَلْ تَاكِيدًا لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ حَاصِلًا بِذَوْنِهِ
وَجَيْنِذٍ فَلَوْ جَعَلْنَا لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعُمُومِ السَّلْبِ مِثْلُ لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ لَمْ يَلْزَمْ تَرْجِيحُ
التَّائِيدِ عَلَى التَّاسِيْسِ إِذْ لَا تَاسِيْسَ أَصْلًا بَلْ إِنَّمَا يَلْزَمْ تَرْجِيحُ أَحَدِ التَّائِيدَيْنِ عَلَى الْآخَرِ -

অনুবাদ : আর তখন প্রশ্ন দিক পরিবর্তন করবে সেই দিকে যার প্রতি লেখক তার বক্তব্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন আর দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ সَالِبَةُ مُهِمَّةٍ যেমন لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ যখন দণ্ডায়মান হওয়াকে প্রত্যেক সদস্য থেকে না-বাচক করার অর্থ প্রদান করে তখন স্বাভাবিকভাবে সবার থেকে না-বাচক করার অর্থ প্রদান করল আর যখন كُل-কে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ সবার বা সমষ্টি থেকে না-বাচক করা হবে তখন لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ-এর অর্থ হবে সকল থেকে দণ্ডায়মান হওয়া নেতিবাচক করা প্রত্যেক সদস্য থেকে নয়। এমতবস্থায় كُل তাসীসের জন্য হবে না; বরং তাকিদের জন্য। কেননা, এ অর্থ كُل ছাড়া হাসিল হয়েছিল। আর তখন যদি আমরা لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ-কে প্রত্যেক সদস্য থেকে না-বাচক করার অর্থে গ্রহণ করি لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর মতো, তাহলে তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি আবশ্যিক হয় না, কেননা, এখানে তো তাসীস নেই; বরং দু'তাকিদের মধ্য থেকে একটি তাকিদকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যিক হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَجَيْنِذٍ يُتَوَجَّهُ النِّح : উল্লিখিত ইবরাতে লেখক দ্বিতীয় আপত্তিটি উত্থাপন করেছেন। এ আপত্তিটি অবশ্য শুধুমাত্র দ্বিতীয় অবস্থার সাথে খাস। আপত্তিটি হচ্ছে ইবনুল মালিক এবং অন্যান্যদের মতে মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাদ্বর্তী করা হলে كُل শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে যেহেতু বাক্যটি প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করেছে, অতএব, كُل শব্দটি আসার পর সমষ্টিগতভাবে না-বাচক করবে। অন্যথায় তাকিদকে তাসীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যিক হবে।

আমরা বলি, এ বক্তব্য সঠিক নয়, আমাদের মতে كُل সংযুক্ত হওয়ার অবস্থায় সমষ্টিকে না-বাচক অথবা প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করুক-যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন كُل তাকিদের জন্য হবে। আর দু' তাকিদের মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যিক হবে। এমতবস্থায় كُل শব্দটি তাসীসের জন্য হবে না।

এ ব্যাখ্যা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা سَالِبَةُ مُهِمَّةٍ-এর মধ্যে যেমন لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ এতে كُل সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে আপনাদের কথা মোতাবেক এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেকটি সদস্য থেকে হুকুমকে না-বাচক করা। আর কোনো বাক্যের মধ্যে যদি প্রত্যেকটি সদস্য না-বাচক হয়, তাহলে অবশ্যই এর দ্বারা সমষ্টি না-বাচক হবে। কেননা, সমষ্টির না-বাচক অথবা সবাইকে না করা দু'ভাবে হতে পারে- ১. কেউই যদি না করে, ২. কতিপয় লোক যদি না করে।

نَفْيٌ عَنِ جُمْلَةِ الْأَفْرَادِ সব সদস্যকে না-বাচক করা হচ্ছে ব্যাপক। আর নিয়মানুসারে খাস (বিশেষ প্রকার) আম (ব্যাপকতা)-কে লায়িম করে। অতএব, প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করার প্রকার সকলকে না-বাচক করার প্রকারকে আবশ্যিক করবে। অর্থাৎ যেখানে প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হবে সেখানে অবশ্যই সব সদস্য না-বাচক হবে। অতএব, كُل সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর মধ্যে উভয় অর্থ তথা প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হওয়া ও সব সদস্য না-বাচক হওয়া বিদ্যমান। এরপর যখন كُل-কে সংযুক্ত করে পূর্বের অর্থ দু'টির একটি অর্থ গ্রহণ করা হবে, সেটাই তাকিদ হবে। অতএব, ইবনুল মালিক প্রমুখের মতানুসারে এখানে যদি (كُل সংযুক্ত হওয়ার পর) সবাইকে না-বাচক করার অর্থ গ্রহণ করা হয়- তাহলেও তো তাসীস হচ্ছে না; বরং তাকিদই হচ্ছে। কেননা, এ অর্থ كُل সংযুক্ত হওয়া ছাড়া পাওয়া গিয়াছিল। আবার যদি لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ-এর অর্থ প্রত্যেক সদস্য দাঁড়ায়নি বলি তাহলেও তাকিদ হচ্ছে, তাসীস হচ্ছে না। অতএব, এখন যে অর্থকেই গ্রহণ করা হবে সেই তাকিদ হবে এবং এটাকে অপর অর্থের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেহেতু দু'টোই তাকিদ, তাই একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে এক তাকিদকে অপর তাকিদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যিক হলো।

وَمَا يُقَالُ إِنَّ دَلَالَهٖ لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ عَلَى النَّفْيِ عَنِ الْجُمْلَةِ بِطَرِيقِ الْإِلْتِزَامِ وَ دَلَالَهٖ لَمْ يَقُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ فَلَا يَكُونُ تَاكِيدًا فَفِيهِ نَظَرٌ إِذَا لَوْ اشْتَرَطَ فِي التَّكْيِيدِ إِتْحَادَ الدَّلَالَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ لِنَفْيِ الْحُكْمِ عَنِ الْجُمْلَةِ تَاكِيدًا لِأَنَّ دَلَالَهٖ إِنْسَانٌ لَمْ يَقُمْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِطَرِيقِ الْإِلْتِزَامِ وَلِأَنَّ التَّكْرَرَ الْمَنْفِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ كَانَ قَوْلُنَا لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ سَالِبَةً كَلْبَةً لَا مُهْمَلَةً كَمَا ذَكَرَهُ هَذَا الْقَائِلُ لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَّ فِيهَا أَنَّ الْحُكْمَ مَسْلُوبٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ وَالْبَيَانُ لِأَبْدَلِهِ مِنْ مُبَيِّنٍ فَلَا مَحَالَةَ هَهُنَا شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا عَلَى كَمِّيَّةٍ أَفْرَادِ الْمَوْضُوعِ وَلَا نَعْنِي بِالسُّورِ سَوَى هَذَا وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ سَمَّاها مُهْمَلَةً بِإِعْتِبَارِ عَدَمِ السُّورِ -

অনুবাদ : কেউ কেউ বলেন, لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর অর্থ সবার থেকে হুকুম না-বাচক করা হচ্ছে দালালতে ইলতিযামী আর لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর অর্থ সবার থেকে হুকুম না-বাচক করা হচ্ছে দালালতে মুতাবেকী, তাহলে তো তাকিদ হলো না। কিন্তু এ উত্তরেও আপত্তি আছে। যদি তাকিদের মধ্যে দু'দালালতের একই ধরনের হওয়াকে শর্ত বলা হয়, তাহলে (অগ্রবর্তী করার অবস্থায়) كُلُّ إِنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ সকল থেকে হুকুমকে না-বাচক করার অর্থ প্রদানকালে তাকিদ হচ্ছে না। কেননা, এ অর্থের প্রতি لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর দালালত ইলতেযামীভাবে ছিল। তা ছাড়া অনির্দিষ্ট নেতিবাচক বিশেষ্য যখন ব্যাপক হয় যেমন আমাদের উক্তি لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ হচ্ছে سَالِبَةً كَلْبَةً হবে মেহলে হবে না। যেমন এ বক্তা দাবি করেছেন। কেননা, এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুকুমটি প্রত্যেকটি সদস্য থেকে না-বাচক করা হয়েছে প্রত্যেকটি বর্ণনার একটি বর্ণনাকারী থাকে। নিশ্চিতভাবে এখানেও এমন একটি বিষয় রয়েছে, যা মুসনাদ ইলাইহের সদস্যসমূহের সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করছে। আর আমরা سور দ্বারা এটা ছাড়া অন্য কিছু বুঝছি না, তখন سور না থাকার কারণে তিনি মেহলে বলেছেন, এ আপত্তি রহিত হয়ে যাবে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمَا يُقَالُ إِنَّ دَلَالَهٖ : উপরোক্ত ইবারতে প্রথমত লেখকের আপত্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রশ্নটি ছিল- পশ্চাদ্বর্তী করার অবস্থায় كل শব্দের অর্থ الْجُمْلَةِ (সকল থেকে না-বাচক) করা হলে তাসীস হবে এটা আমরা মানি না। আমরা বলি, এ অর্থ করা হলেও তাকিদই হবে। ইতঃপূর্বে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ইবনুল মালিক তার উপর আরোপিত প্রশ্নের জবাবে যা বলেন তা হচ্ছে, পশ্চাদ্বর্তী অবস্থায় كل যুক্ত না করলে لَمْ يَقُمْ إِنْسَانٌ-এর অর্থ কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি, অর্থাৎ শব্দের দালালতে মুতাবেকী হয়েছে। এর থেকে সবাই দাঁড়ায়নি অর্থটি লাতীমীভাবে পাওয়া যায় যা দালালতে মুতাবেকী নয়। কারণ, প্রত্যেকটি লোক কোনো কাজ না করলে সবাই করেনি-কথাটিও সত্য হয়। এরপর كل যুক্ত করলে দালালতে মুতাবেকী হয় “সবাই দাঁড়ায়নি”, যা كل ছাড়া দালালতে ইলাতিযামী ছিল।

অতএব, كل সহ বাক্যের অর্থ সবাই দাঁড়ায়নি বললে (দু'দালালত এক না হওয়াতে) তাকিদ হচ্ছে না। কেননা, তাকিদ তো তখনই হয়- যখন পূর্বের অর্থের দালালত পরের অর্থের দালালতের সাথে মিলে যায়; অথচ এখানে দু'দালালত মিলছে না।

মুসান্নিফ (র.) ইবনুল মালিক প্রমুখের জবাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তাদের জবাব সঠিক নয় এবং তা আপত্তির উর্ধ্বে নয়। তাদের দাবি মতে তাকিদের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য দু'দালালতের একই ধরনের হওয়া নিয়মানুসারে আবশ্যিক নয়। কেননা, তাকিদের জন্য দু'দালালতের এক হওয়া আবশ্যিক বলা হলে মুসনাদ ইলাইহ অগ্রবর্তী হলে **كُلُّ** দ্বারা পূর্বের অর্থের তাকিদ হয় না। কেননা, **كُلُّ** **إِنْسَانٌ لَّمْ يَكُنْ**-এর অর্থ সকল থেকে হুকুম না-বাচক করা দালালত ইলতিযামী হিসেবে, আর **كُلُّ** **إِنْسَانٌ لَّمْ يَكُنْ**-এর অর্থ- সকল থেকে হুকুম না-বাচক করা দালালত মুতাবেকী। দু'দালালতের একই রকম হওয়া শর্ত বলা হলে **كُلُّ** আসার পরও পূর্বের অর্থের তাকিদ হচ্ছে না। এটা তাদের বর্তমান কথা মতো সিদ্ধান্ত। অথচ ইতঃপূর্বে তারা এটাকে তাকিদ বলে এসেছেন। অতএব, এটা প্রমাণিত হলো যে, তাকিদের জন্য দু'দালালতের এক হওয়া আবশ্যিক নয়।

নোট : দালালত (الدلالة) শব্দটি ইলমুল মানাতিকের একটি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ- পথ প্রদর্শন করা।

পরিভাষায় : দালালত বলা হয় কোনো জিনিস এমন হওয়া যে, তা জানার দ্বারা অন্য অজানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। দালালত প্রথমত দু'প্রকার। যথা- ১. **لَفْظِيَّة** ২. **غَيْر لَفْظِيَّة** এদের প্রত্যেকটি আবার তিন প্রকার : ১. **وَضْعِيَّة** ২. **لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة** ৩. **طَبْعِيَّة** অতএব, মোট প্রকার হচ্ছে $২ \times ৩ = ৬$ টি। যথা- ১. **وَضْعِيَّة** ২. **لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة** ৩. **غَيْر لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة** ৪. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫. **غَيْر لَفْظِيَّة طَبْعِيَّة** ৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ২৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৩৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৪৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৫৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৬৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৭৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৮৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯১. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯২. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৩. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৪. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৫. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৬. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৭. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৮. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ৯৯. **لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة** ১০০. **غَيْر لَفْظِيَّة عَقْلِيَّة**

এ ছয় প্রকারের মধ্যে **وَضْعِيَّة** সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা তিন প্রকার : ক. **مُطَابِقِي** খ. **تَضَمُّنِي** গ. **إِنْتِزَامِي**।

এ তিন প্রকার আমাদের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে এগুলোর সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হলো।

ক. **مُطَابِقِي** বলা হয় এমন শাব্দিক দালালতকে যাতে শব্দ তার পরিপূর্ণ **لَهُ** **مَوْضِعٌ** (যার জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে)-এর প্রতি দিকনির্দেশ করে। যেমন- **انسان** দ্বারা **حَيَوَانٌ نَاطِقٌ**-এর প্রতি ইঙ্গিত করা। এখানে **نَاطِقٌ** **حَيَوَانٌ** বা মানুষের দালালত মুতাবেকী।

খ. **تَضَمُّنِي** এমন শাব্দিক দালালতকে বলা হয়, যাতে শব্দ তার অংশবিশেষের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন- **انسان** (মানুষ) বলে শুধুমাত্র **حَيَوَان** অথবা **ناطق** বুঝানো।

গ. **إِنْتِزَامِي** এমন শাব্দিক দালালতকে বলা হয়, যাতে শব্দ তার **لَهُ** **مَوْضِعٌ**-এর লায়িম (সংশ্লিষ্ট বস্তু)-এর প্রতি দিকনির্দেশ করে। যেমন- **انسان** (মানুষ) বলে তার জ্ঞানসম্পন্ন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা।

আমাদের আলোচিত বিষয় **كُلُّ** **إِنْسَانٌ لَّمْ يَكُنْ**-এর মুতাবেকী দালালত হচ্ছে কোনো মানুষ দাঁড়ায়নি। আর এর ইলতিযামী দালালত হচ্ছে সব মানুষ দাঁড়ায়নি। কেননা, কোনো মানুষ না দাঁড়ানো সব মানুষ না দাঁড়ানোকে লায়িম বা আবশ্যিক করে। কোনো মানুষ না দাঁড়ালে সব মানুষের না দাঁড়ানো প্রমাণ হবে।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ التَّكْرَرُ الْمُنْفِيَّةُ إِذَا عَمَّتْ : এ ইবারত দ্বারা লেখক ইবনুল মালিক প্রমুখ এর উপর তৃতীয় আরেকটি আপত্তি করেছেন। আপত্তিটি হচ্ছে ইবনুল মালিক প্রমুখ **كُلُّ** **إِنْسَانٌ لَّمْ يَكُنْ**-কে **مَهْمَلَةٌ** বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে **سَالِبَةٌ كَلْبِيَّة** কারণ, এ বাক্যে মুসনাদ ইলাইহের প্রত্যেকটি সদস্য থেকে হুকুমকে না-বাচক করা হয়েছে। কেননা, বাক্যটিতে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য না-বাচকের হরফের অধীনে এসেছে। আর নিয়মানুসারে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য না-বাচকের পরে আসলে তা ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করে। ব্যাপকতার ভিত্তিতে মুসনাদ ইলাইহের প্রতিটি সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক হয়ে গেছে। কেননা, না-বাচকের অধীনে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য আসলে তা প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক করে।

আর এ ধরনের অর্থ প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই বাক্যের মধ্যে বর্ণনাকারী তথা ইঙ্গিত দানকারী রয়েছে। সেই বর্ণনাকারী এবং ইঙ্গিত প্রদানকারী হচ্ছে “অনির্দিষ্ট বিশেষ্য না-বাচকের অধীনে আসা” যেহেতু **سور**-এর উদ্দেশ্য এটাই (একটি পরিমাণের বিবরণ দেওয়া)। অতএব, এ বাক্যে **سور** আছে। সুতরাং **سور**-এর অবস্থান প্রমাণ হওয়ার পর এ কথা বলা যাবে না যে, বাক্যের মধ্যে **سور** নেই এবং **سور** না থাকার কারণে আমরা একে **مَهْمَلَةٌ** বলেছি।

وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ إِنْ كَانَتْ كَلِمَةٌ كُلٌّ دَاخِلَةٌ فِي حَيْزِ النَّفْيِ بِأَنْ أُخْرِتَ عَنْ أَدَاتِهِ سَوَاءٌ
كَانَتْ مَعْمُولَةً لِأَدَاةِ النَّفْيِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا نَحْوُ يَشْعُرُ مَا كُلٌّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ
يَذَرُكُهُ * تَجْرِي الرِّيحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ أَوْ غَيْرِ فِعْلٍ نَحْوُ قَوْلِكَ مَا كُلٌّ مُتَمَنَّى الْمَرْءِ
حَاصِلًا أَوْ مَعْمُولَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ الظَّاهِرِ أَنَّهُ عَظْفٌ عَلَى دَاخِلَةٍ وَلَيْسَ بِسَدِيدٍ لِأَنَّ الدُّخُولَ
فِي حَيْزِ النَّفْيِ شَامِلٌ لِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ عَظَفْتَهَا عَلَى أُخْرِتَ بِمَعْنَى أَوْ جُعِلَتْ مَعْمُولَةً لِأَنَّ
التَّأْخِيرَ عَنْ أَدَاةِ النَّفْيِ أَيْضًا شَامِلٌ لِذَلِكَ اَللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُخَصَّصَ التَّأْخِيرُ بِمَا إِذَا لَمْ تَدْخُلِ
الْأَدَاةُ عَلَى فِعْلٍ عَامِلٍ فِي كُلِّ عَلَى مَا يُشْعُرُ بِهِ الْمِثَالُ وَالْمَعْمُولُ أَعْمٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا
أَوْ مَفْعُولًا وَتَاكِيدًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ نَحْوُ مَا جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فِي تَاكِيدِ الْفَاعِلِ وَمَا جَاءَنِي
كُلُّ الْقَوْمِ فِي الْفَاعِلِ وَقَدْ مِثَالُ التَّأْكِيدِ عَلَى الْفَاعِلِ لِأَنَّ كَلًّا أَصْلٌ فِيهِ أَوْ لَمْ أَخُذْ كُلَّ
الدَّرَاهِمِ فِي الْمَفْعُولِ الْمُتَأَخَّرِ أَوْ كُلَّ الدَّرَاهِمِ لَمْ أَخُذْ فِي الْمَفْعُولِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَذَا لَمْ أَخُذْ
الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا أَوْ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا لَمْ أَخُذْ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّورِ تَوَجَّهَ النَّفْيُ إِلَى الشُّمُولِ خَاصَّةً
لَا إِلَى أَصْلِ الْفِعْلِ وَأَفَادَ الْكَلَامُ ثُبُوتَ الْفِعْلِ أَوْ الْوَصْفِ لِبَعْضٍ مِمَّا أُضِيفَ إِلَيْهِ كُلٌّ إِنْ
كَانَتْ كُلٌّ فِي الْمَعْنَى فَاعِلًا لِلْفِعْلِ أَوْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ فِي الْكَلَامِ أَوْ أَفَادَ تَعْلُقَهُ أَيْ تَعْلَقَ
الْفِعْلُ أَوْ الْوَصْفُ بِهِ أَيْ بِبَعْضٍ إِنْ كَانَتْ كُلٌّ فِي الْمَعْنَى مَفْعُولًا لِلْفِعْلِ أَوْ الْوَصْفِ وَ ذَلِكَ
بِذَلِيلِ الْخُطَابِ وَشَهَادَةِ الذُّوقِ وَالْإِسْتِعْمَالِ وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ أَكْثَرُ لَا كُفْيٌ بِذَلِيلِ قَوْلِهِ
تَعَالَى وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْنِمْ وَلَا نُطِيعُ كُلَّ حُلَافٍ مِّهْنِينَ -

অনুবাদ : আর আল্লামা আব্দুল কাহির জুরজানী বলেন, যদি كل শব্দটি না-বাচকের হরফের অধীন হয়, অর্থাৎ না-বাচকের হরফের পরে চাই সেটা তার মা'মূল হোক অথবা না হোক। চাই খবর ফে'ল হোক অথবা না হোক। যেমন- (কবিতা) অর্থাৎ মানুষ যা আশা করে সব সে পায় না। যেমন বায়ু নৌযানের ইচ্ছা (প্রয়োজন)-এর বিপরীতে প্রবাহিত হয়। অথবা খবরটি ফে'ল হবে না, যেমন তুমি বললে, মানুষের সব আশা অর্জিত হয় না।

অথবা নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হবে। বাহ্যত (মনে হয়) এটি دَاخِلَةٌ-এর উপর আত্মফ হয়েছে; কিন্তু এটি সঠিক নয়। কেননা, না-বাচকের অধীনে হওয়া, এটাকে শামিল করে। এমনভাবে যদি আপনি এটাকে আত্মফ করতে চান أُخْرِتَ-এর উপর। অর্থাৎ অথবা তাকে মা'মূল বানানো হবে। (এ আত্মফটি ও সহীহ নয়।) কেননা, না-বাচকের অক্ষরের অধীন হওয়া এ প্রকারকেও শামিল করে, হে আল্লাহ! (তুমি সাহায্য করো) তবে পশ্চাদ্বর্তী (بِأَنْ أُخْرِتَ عَنْ أَدَاتِهِ)-কে যদি খাস করা হয় “না-বাচকের হরফসমূহ ফে'লের উপর আসেনি” এর সাথে, যার প্রতি উদাহরণগুলো দিক নির্দেশ করছে। (ফায়েলের) মা'মূল ব্যাপক। ফায়েল, মাফউল অথবা তাকিদ ইত্যাদি مَا جَاءَنِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ এটি ফায়েলের তাকিদের উদাহরণ

তাকিদের উদাহরণ ফে'লের উদাহরণের আগে আনা হয়েছে, কেননা (كل) এ ব্যাপারে তাকিদ মূলার্থ। অথবা كَلَّ الدَّرَاهِمَ এটি মাফউল পশ্চাদ্বর্তী করার উদাহরণ। অথবা كَلَّ الدَّرَاهِمَ نَمَّ أَخْذُ এটা মাফউল অগ্রবর্তী করার উদাহরণ। এমনভাবে كَلَّهَا الدَّرَاهِمَ كَلَّهَا অথবা كَلَّ الدَّرَاهِمَ كَلَّهَا এ সকল অবস্থায় না-বাচক হবে শুধুমাত্র সবাইকে শামিল করার বিষয়ে, নেতিবাচকতা মূল ফোয়েলের সাথে সম্পর্কিত হবে না। ফে'ল অথবা সিফাতের সীগাসমূহ كل-এর মুযাফ ইলাইহের কতক অংশ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে এ কথা বাক্য বুঝাবে যদি كل অর্থগতভাবে বাক্যের মধ্যে উল্লিখিত ফে'ল অথবা সিফাতের ফায়েল হয়। অথবা ফে'ল বা সিফাত কারো সাথে সম্পর্কিত এ কথা বুঝাবে যদি كل অর্থগতভাবে বাক্যে ফে'ল অথবা সিফাতের মাফউল হয়। এসব প্রচলিত কথ্যপোকথন, সুরূচির সাক্ষ্য এবং ব্যবহাররীতির ভিত্তিতে বলা হলো।

তবে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, এসব নিয়ম অধিকাংশ সময় প্রযোজ্য হয়, সব সময় প্রয়োগ হয় না (সব সময় প্রযোজ্য না হওয়া)-এর দলিল মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- “আল্লাহ তা'আলা কোনো অহঙ্কারী বিদর্পী বান্দাকে পছন্দ করেন না।” “আল্লাহ তা'আলা কোনো পাপাচারী কাফিরকে পছন্দ করেন না।” “আপনি অধিক শপথকারী নিকৃষ্ট ব্যক্তির আনুগত্য করবেন না।”

ব্যাক্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْخ: শায়েখ আব্দুল কাহির জুরজানী (র.) বলেন, ১. كل শব্দটি যদি না-বাচকের অধীনে আসে অর্থাৎ كل শব্দটি যদি না-বাচকের হরফের পরে আসে। চাই এটি না-বাচকের হরফের মা'মূল হোক অথবা মা'মূল না হোক (كل-এর) খবর ফে'ল হোক আথবা ফে'ল না হোক।

অথবা, ২. كل নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হোক। এসব অবস্থায় না-বাচকের হরফ দ্বারা মূল ফে'ল (কাজ)টি নেতিবাচক হবে না; বরং না-বাচকের সম্পর্ক হবে কাজটিতে সকলকে অন্তর্ভুক্ত না করার ব্যাপারে। অর্থাৎ এ সকল অবস্থায় সবাই করেনি, এটা প্রমাণ হবে এবং كل-এর মুযাফ ইলাইহ কতিপয় লোক করেছে, এটাও প্রমাণ হবে। অর্থাৎ ফে'ল অথবা সিফাতের সীগাহর বাস্তবায়ন কতিপয় লোকের সাথে হয়েছে।

খবর যদি ফে'ল হয় এর উদাহরণ হচ্ছে- مَا كُلُّ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ يَذَرِكُهُ * تَجْرِي الرِّيحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ -

এ কবিতায় يَذَرِكُ ফে'লটি হচ্ছে ما-এর খবর, যা ফে'ল হয়েছে।

অথবা, খবরটি ফে'ল হবে না। যেমন- مَا كُلُّ مُتَمَنَّى الْمَرْءِ حَاصِلًا এ বাক্যে حَاصِلًا শব্দটি ما-এর খবর হয়েছে। এটি ফে'ল নয়; বরং ইসম।

কবিতাটির অর্থ : মানুষ যা আশা করে তার সবই সে পায় না। যেমন বায়ু সব সময় নৌযানের অনুকূলে প্রবাহিত হয় না- কখনো প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। উভয় উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সদস্যকে না-বাচক করা হয়নি; বরং সমষ্টিকে না বাচক করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মূল ফে'ল কিংবা সিফাত না-বাচক হয়নি; বরং ফে'ল এবং সিফাত কতিপয় সদস্য দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ مَعْمُولَةٌ لِنَفْعِلِ الْمَنَفِيِّ : এ বাক্যের مَعْمُولَةٌ শব্দটি معطوف, এর مَعْمُولٌ عَلَيْهِ হচ্ছে داخلة, এমতে বাক্যের অর্থ হবে كل শব্দটি না-বাচকের হরফের অধীন হবে অথবা নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হবে।

উভয় (مَعْمُولٌ وَمَعْمُولٌ عَلَيْهِ)-এর মধ্যে সবাইকে না-বাচক করা হবে, মূল ফে'ল নফী হবে না। কিন্তু এভাবে আত্ম করা হলে অর্থগত জটিলতা সৃষ্টি হবে। কেননা, معطوف নেতিবাচক ফে'লের পরে আসলেও তো এটা معطوف عليه না-বাচকের হরফের পরেই আসল।

অথচ নিয়মানুসারে মা'তূফ এবং মা'তূফ আলাইহের মাঝে বৈপরীত্য থাকতে হয়; কিন্তু এখানে সেই বৈপরীত্য পাওয়া যাচ্ছে না, তাই داخلة-এর উপর مَعْمُولَةٌ-এর আত্ম সঠিক নয়।

আর যদি বলা হয় এটা (مَعْمُولَةٌ) আত্ম হয়েছে اخرت-এর উপর; তাহলেও অর্থগত জটিলতা শেষ হচ্ছে না। কেননা, তখন ইবারতের অনুবাদ হবে এরূপ যে, كل শব্দটি না-বাচকের অধীনে আসে অর্থাৎ না-বাচকের হরফের পরে আনা হয় অথবা নেতিবাচক ফে'লের পরে আনা হয় (তাহলে....)

এ আত্ফ সঠিক না হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানেও মা'তুফটি মা'তুফ আলাইহের মাঝে এসে গেছে। মা'তুফের মধ্যে মা'তুফ আলাইহের বৈরী কোনো কথা বলা হয়নি। কারণ, না-বাচকের হরফের পরে হওয়া নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হওয়াকে তার মাঝে शामिल করে।

এমতাবস্থায়, معمر-এর মা'তুফ আলাইহ নির্ধারণ করাই মুশকিল হয়ে গেছে।

মুসান্নিফ আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নিয়ে একটি জবাব দিচ্ছেন। জবাবটির সারকথা এই যে, প্রথমে বর্ণিত كل-এর না-বাচকের হরফের পরে আসা কথটি ব্যাপক নয়; বরং এটি খাস। كل শব্দটি নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল হবে- এ প্রকারটি এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ প্রকারটিকে معمر-এর কয়েদ দ্বারা সাবিত করা হয়েছে। এভাবে বলা হলে মা'তুফ এবং মা'তুফ আলাইহের মাঝে বৈরীতা প্রমাণ হয় এবং মা'তুফ আলাইহ মা'তুফকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতএব, আত্ফ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আর কোনো জটিলতা রইল না।

قَوْلُهُ وَالنَّعْمُ أَعْمٌ : লেখক বলেন, معمر শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ফায়েল, মাফউল, তাকিদ ও হাল ইত্যাদি সব কিছুই বুঝানো হয়েছে।

এগুলো আবার পশ্চাদ্বর্তী হতে পারে এবং অগ্রবর্তী রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

এরপর এখানে প্রত্যেক প্রকারের মা'মূলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

১. যদি كل শব্দটি ফায়েলের তাকিদ হয়, যেমন- مَا جَاءَ نَبِيَّ الْقَوْمِ كُلِّهِمْ (আমার কাছে গোত্রের সকলে আসেনি)।

২. كل শব্দটি যদি তারকীবী ফায়েল হয়, যেমন- مَا جَاءَنِي كُلُّ الْقَوْمِ (আমার কাছে গোত্রের সকলে আসেনি)।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, লেখক ফায়েলের উদাহরণটি আগে না এনে ফায়েলের তাকিদের উদাহরণটি আগে আনলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে মুসান্নিফ (র.) বলেন, كل শব্দটি তাকিদের অর্থে ব্যবহার হওয়াটা আসল, তাই كل-কে তার আসল অর্থে ব্যবহার করার জন্য তাকিদের উদাহরণটি আগে আনা হয়েছে।

৩. كل শব্দটি যদি মাফউল এবং অগ্রবর্তী হয়, যেমন- كُلُّ الدَّرَاهِمِ لَمْ أَخْذْ (আমি সব টাকা নেইনি)।

৪. كل শব্দটি যদি পশ্চাদ্বর্তী মাফউল হয়, যেমন- لَمْ أَخْذْ كُلُّ الدَّرَاهِمِ (আমি সব টাকা নেইনি)।

৫. كل শব্দটি যদি মাফউলের তাকিদ এবং পশ্চাদ্বর্তী হয়। যেমন- لَمْ أَخْذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا

৬. كل শব্দটি যদি মাফউলের তাকিদ হয় এবং ফে'লের আগে আসে, যেমন- الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا لَمْ أَخْذْ এসব অবস্থায় না-বাচক হবে। সকলের সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিষয়টি ফে'ল অথবা সিফাতের সীগাহ নয়। অর্থাৎ মূল ফে'লটি নেতিবাচক হবে না।

ফে'ল এবং সিফাতের সীগাহ كل-এর মুযাফ ইলাইহের কারো কারো জন্য সাবিত হবে। এ হুকুম তখনই যখন كل শব্দটি উল্লিখিত ফে'লের অথবা সিফাতের ফায়েল হবে। আর যদি كل শব্দটি ফে'ল অথবা সিফাতের মাফউল হয়, তাহলে ফে'ল এবং সিফাত كل-এর মুযাফ ইলাইহের কারো কারো সাথে সম্পর্কিত হবে সকলের সাথে সম্পর্কিত হবে না।

যেমন- لَمْ أَخْذْ كُلُّ الدَّرَاهِمِ-এর অর্থ হচ্ছে আমি সব টাকা নেইনি, এখানে নেওয়ার কাজটি নেতিবাচক হয়নি বরং এখানে নেতিবাচক হয়েছে সব টাকা নেওয়ার বিষয়টি এবং কিছু টাকা নেওয়া প্রমাণিত হয়েছে এভাবে যে, বাক্যের লায়িমী অর্থ হচ্ছে কিছু দিরহাম নেইনি, বাকিগুলো নিয়েছি।

মুসান্নিফ বলেন, كل সংক্রান্ত এ আলোচনার দলিল হচ্ছে প্রচলিত ও ব্যবহারিক ভাষা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকগণের রুচি। তারা তাদের ব্যবহার ও ভাষায় كل-কে এ অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ আরো বলেন, উল্লিখিত বিষয়টি অধিকাংশ ব্যবহাররীতি অনুসারে বলা হয়েছে। এটা কোনো সামগ্রিক নিয়ম নয় যে, এর ব্যতিক্রম হবে না।

পবিত্র কুরআনে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই, যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ وَلَا تَطْعُ كُلُّ حَلَابٍ مَّيِّينَ, (আপনি কোনো অধিক শপথকারী নিকৃষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না), وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী পাপাচারীকে পছন্দ করেন না)।

এ বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, না-বাচকের অধীন হওয়া সত্ত্বেও আসল ফে'ল নেতিবাচক হয়েছে, সমষ্টির না-বাচক হয়নি। কেননা, বাক্যের অর্থ মোটেও এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সব অহংকারীকে পছন্দ করেন না, তবে কিছু অহংকারীকে পছন্দ করেন। মোটকথা, কুরআনের আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, উপরের বর্ণিত নিয়মগুলো সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

وَالْأَيُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً فِي حَيْزِ النَّفْيِ بِأَنْ قُدِّمَتْ عَلَى النَّفْيِ لَفْظًا وَلَمْ تَقَعْ
مَعْمُولَةً لِلْفِعْلِ الْمَنْفِي عَمَّ النَّفْيُ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّا أُضِيفَ إِلَيْهِ كُلٌّ وَأَفَادَ نَفْيَ أَصْلِ
الْفِعْلِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ائْتِنِي
وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ بِالرَّفْعِ فَأَعْلَلُ قُصِرَتْ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ
ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَعْنَى لَمْ يَقَعْ وَاحِدٌ مِنَ الْقُصْرِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى
شُمُولِ النَّفْيِ وَعُمُومِهِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ جَوَابَ أَمْ إِمَّا بِتَغْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ
بِنَفْيِهِمَا جَمِيعًا تَخْطِئَةً لِلْمُسْتَفْهِمِ لَا بِنَفْيِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ عَارِفٌ بِأَنَّ الْكَائِنَ
أَحَدُهُمَا وَالثَّانِي مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ
بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ كَانَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الثُّبُوتَ لِلْبَعْضِ إِنَّمَا يُنَافِي النَّفْيَ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ لَا النَّفْيَ
عَنِ الْمَجْمُوعِ -

অনুবাদ : অন্যথায় অর্থাৎ যদি كل শব্দটি না-বাচকের অধীন না হয়; (বরং) তাকে শাব্দিকভাবে না-বাচকের হরফের আগে আনা হয় এবং তা নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল না হয়, তাহলে নফী প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য হবে (কেউই হ্যাঁ-বাচক হবে না) كل-এর মুযাফ ইলাইহের ক্ষেত্রে এবং এ জাতীয় বাক্য প্রত্যেক সদস্য থেকে মূল ফে'লের নেতিবাচক হওয়ার অর্থ প্রদান করে। যেমন মহানবী ﷺ-এর উক্তি : (যা তিনি করেছিলেন) যখন যুল ইয়াদাইন নামক সাহাবী (একদা নামাজান্তে) তাকে বলেছিলেন, নামাজ কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল الصَّلَاةُ শব্দটি قُصِرَتْ-এর ফায়েল, হে আল্লাহর রাসূল! নাকি আপনি (নামাজের রাকআত) ভুলে গেছেন। এর কোনোটাই নয়। এটা রাসূল ﷺ-এর উক্তি। তার এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, সংক্ষিপ্ত কিংবা ভুল কোনোটাই হয়নি- এখানে না-বাচক ব্যাপকার্থে দু'কারণে এবং ام দ্বারা প্রশ্নের জবাব দু'টি বিষয়ের কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করে অন্যথায় উভয়টিকে না-বাচক করে প্রশ্নকারীর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। এতে সমষ্টির না-বাচক হয় না। কেননা, সে তো জানে একটি বিষয় ঘটেছে অবশ্যই। দ্বিতীয় (দলিল হচ্ছে) বর্ণিত আছে যে, যখন মহানবী ﷺ বললেন, কোনোটাই হয়নি, তখন যুল ইয়াদাইন তাকে বললেন, কোনো একটা তো অবশ্যই হয়েছে। আর এটা স্বীকৃত যে, কতকের জন্য কোনো বিষয় প্রমাণ করা প্রত্যেকের থেকে না-বাচক করার বিপরীত। এটা সমষ্টির নেতিবাচকের বিপরীত নয়।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْأَيُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الخ : লেখক বলেন, যদি كل শব্দটি না-বাচকের হরফের অধীন না হয় অর্থাৎ না-বাচকের হরফ থেকে অগ্রবর্তী হয় শাব্দিকভাবে এবং নেতিবাচক ফে'লের মা'মূল না হয়। এমতাবস্থায় না-বাচক হবে كل-এর মুযাফ ইলাইহ (অর্থাৎ যার দিকে তাকে সম্বন্ধ করা হয়েছে)-এর প্রতিটি সদস্য এবং বাক্যের কাজটি সম্পূর্ণভাবে নেতিবাচক হবে অর্থাৎ কারো ক্ষেত্রেই কাজটি সংঘটিত হবে না। এর উদাহরণ হচ্ছে রাসূলের উক্তি যা তিনি যুল ইয়াদাইনের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ (কোনোটাই হয়নি)।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একদা রাসূল ﷺ জোহর অথবা আসরের নামাজ পড়ান। নামাজ চার রাকআতের জায়গায় দু'রাকআত পড়ানো হয়, নামাজান্তে সাহাবীদের অনেকেই নিচুপ ছিলেন- এ ব্যাপারে কেউ কোনো মন্তব্য করছিলেন না,

এমতাবস্থায় সাহাবী যুল ইয়াদাইন দাঁড়িয়ে মহানবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ -কে লক্ষ্য করে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল? নাকি আপনি ভুলক্রমে চার রাকআতের স্থানে দু'রাকআত পড়িয়েছেন?” এখানে: الصَّلَاةُ তারকীব বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসান্নিফ বলেন, قَصُرَتِ الصَّلَاةُ -এর ফায়েল অথবা (فعل مجهول) -এর নায়েবে ফায়েল হিসেবে।

এরপর যুল ইয়াদাইন-এর কথার জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ (কোনোটাই হয়নি) নামাজ সংক্ষিপ্ত হয়নি এবং আমি ভুলেও যায়নি। এর উত্তরে যুল ইয়াদাইন বললেন, بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ كَانَ “কোনো একটা অবশ্যই হয়েছে” এরপর রাসূল ﷺ উপস্থিত লোকদের দিকে তাকালেন তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা.)ও ছিলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন-حَقٌّ مَا يَقُولُهُ ذَوَايَدَيْنِ (যুল ইয়াদাইন যা বলছে তা কি সত্যিই) তারা দু'জন বললেন, হ্যাঁ ঠিক। এরপর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে বাকি দু'রাকআত যোগ করে নামাজ শেষ করলেন।

উল্লিখিত হাদীসে كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ -এর মধ্যে كل শব্দটি না-বাচকের অধীন নয় এবং তা বাক্যের প্রতিটি সদস্যকে না-বাচক করেছে। বাক্যে দু'টি বিষয় রয়েছে যথা- قَصْرٌ ও نِسْيَانٌ উভয়টিকে كل না-বাচক করেছে। এর দু'টি দলিল মুসান্নিফ দিয়েছেন।

১. রাসূল ﷺ-এর এ কথাটি ام দ্বারা প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, ام দ্বারা প্রশ্ন করা হলে দু'ধরনের উত্তর দেওয়া যায়। হয়তো সুনির্দিষ্ট একটি উত্তর বলা হয় অথবা প্রশ্নকারীর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য উভয়টি না-বাচক করা হয়। দু'টিকে একত্র করে না-বাচক করা যায় না। যেমন কেউ প্রশ্ন করল زَيْدٌ قَانِمٌ أَمْ عَمْرُو -এর উত্তরে বলা হবে যায়েদ দণ্ডায়মান / আমার দণ্ডায়মান অথবা বলা হবে কেউই দাঁড়ায়নি। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে- না দু'জন দণ্ডায়মান নয়। কেননা, প্রশ্নকারী এ কথা আগ থেকেই জানে যে, দু'জন দণ্ডায়মান নয়।

আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সাহাবী যুল ইয়াদাইন প্রশ্ন করেছেন ام দ্বারা। অতএব, প্রশ্নের জবাব হয়তো যে কোনো একটি নির্দিষ্ট করে যে নামাজ ভুল হয়েছে / নামাজ সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, অথবা উত্তর হবে কোনোটাই নয়, সুতরাং كُلُّ ذَلِكَ -এর অর্থ কোনোটাই নয়, প্রত্যেক সদস্য না-বাচক করে।

অতএব, كل এখানে প্রত্যেক সদস্য না-বাচক করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, রাসূল ﷺ যখন সাহাবী যুল ইয়াদাইনের ام দ্বারা প্রশ্নের জবাবে كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ বললেন, তখন যুল ইয়াদাইন প্রতি উত্তরে বললেন, بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ كَانَ এ বাক্যটি হচ্ছে مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ নিয়মানুসারে এটি سَالِبَةٌ سَالِبَةٌ -এর নقيض এটি سَالِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ -এর নقيض নয়। যেহেতু যুল ইয়াদাইন রাসূল ﷺ -এর বিপরীত (نقيض) কথা বলেছেন এবং তার বাক্যটি হচ্ছে مُوجِبَةٌ جُزْئِيَّةٌ সুতরাং রাসূল ﷺ -এর বাক্য كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ হচ্ছে سَالِبَةٌ كَلْبِيَّةٌ (যা প্রত্যেক সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক করে) অতএব, রাসূলের উক্তিটি দ্বারা প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হবে।

নোট : যুল ইয়াদাইন হচ্ছে হযরত ইরবায় ইবনে আমর অথবা খিরবাক ইবনে আমেরের উপাধি। এ উপাধির কারণ হচ্ছে তার হাত দু'টি অস্বাভাবিক লম্বা ছিল এবং দু'হাতই কাজে সমান পারদর্শী ছিল, ডান হাতের মতো বাম হাতে সমান শক্তি ছিল।

স্মরণ্য : নামাজের মধ্যে কথা বলা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ নামাজ পূর্ণ করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ভুল সংক্রান্ত কথা নামাজের জন্য ক্ষতিকর নয়, বর্তমান যুগের আহলে হাদীসগণ এটার উপর আমল করে থাকে। আমাদের মতে, একটা সময় পর্যন্ত নামাজের মধ্যে কথা বলা বেধ ছিল, এরপর সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

وَعَلَيْهِ اَيُّ عُمْرٍ النَّفْيِ عَنْ كُلِّ فَرْدٍ قَوْلُهُ اَيُّ قَوْلٍ اَبَى النَّجْمِ شَعْرٌ قَدْ اَصْبَحَتْ اَمَّ
 الْخَبَارِ تَدْعِي * عَلَى ذَنْبًا كُلَّهُ لَمْ اَصْنَعْ يَرْفَعُ كُلَّهُ عَلَى مَعْنَى لَمْ اَصْنَعْ شَيْئًا مِمَّا
 تَدْعِيهِ عَلَى مِنَ الذُّنُوبِ وَلِافَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى عَدَلَ عَنِ النَّصَبِ الْمُسْتَغْنَى عَنِ الْاِضْمَارِ
 اِلَى الرَّفْعِ الْمُفْتَقِرِ اِلَيْهِ اَيُّ لَمْ اَصْنَعُ -

অনুবাদ : আর এ অর্থেই অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য না-বাচক হওয়ার অর্থে কবি আবুন নাজমের কবিতা (অর্থাৎ উম্মুল খিয়ার আমার ব্যাপারে এমন সব অপরাধ-গুনাহের দাবি করছে যার কোনোটাই আমি করিনি।) كل পেশ সহকারে পঠিত হবে এ অর্থে যে, আমি করিনি আমার উপর যেসব গুনাহ করার দাবি করছে। আর এ অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি (যবর দিয়ে পড়া) যা সর্বনামের মুখাপেক্ষী নয় থেকে পেশের (দিয়ে পড়ার) দিকে যা তার প্রতি মুখাপেক্ষী ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ لَمْ اَصْنَعُ।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْخ : লেখক এখানে كل না-বাচকের অধীন না হলে যে, প্রত্যেক সদস্যকে না-বাচক করে তার আরেকটি প্রমাণ পেশ করছেন বিখ্যাত কবি আবুন নাজমের একটি কবিতাংশ দ্বারা।

আবুন নাজমের কবিতা- قَدْ اَصْبَحَتْ اَمَّ الْخَبَارِ تَدْعِي * عَلَى ذَنْبًا كُلَّهُ لَمْ اَصْنَعْ

অর্থাৎ ‘আমার স্ত্রী উম্মুল খিয়ার আমার ব্যাপারে এমন সব অপরাধ ও গুনাহ করার দাবি করছে যার কোনোটাই আমি করিনি।’ মুসান্নিফ من الذُّنُوب-এর দ্বারা ব্যখ্যা করত ইঙ্গিত প্রদান করছেন ذَنْبًا অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যদিও হ্যাঁ-বাচক বাক্যে এসেছে, তবুও তা স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে এখানে ব্যাপকার্থে হবে। কেননা, এখানে কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করা। আর সম্পূর্ণ প্রমাণ করা সম্ভব হবে না যদি তার থেকে সব দোষ খণ্ডন না করা যায়। অতএব, এখানে প্রত্যেকটি সদস্যকে না-বাচক করা হয়েছে।

ذَنْبًا ইসমে জিনস এটি কমবেশি উভয়ের উপর দালালত করে। এখানে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে “বেশি”-এর অর্থ প্রদান করছে।

قَوْلُهُ كُلَّهُ لَمْ اَصْنَعْ : এর তারকীব প্রসঙ্গে মুসান্নিফ বলেন, كل মূলত মাফউল ছিল। তাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। এরপর এর نصب-কে বাদ দিয়ে رفع আনা হয়েছে। এখন كل হলো মুবতাদা তার খবর হচ্ছে لَمْ اَصْنَعْ এ অবস্থায় اصنع-এর মধ্যে সর্বনাম ধরে নিতে হবে যাতে মুবতাদার সাথে সর্বনামটির সম্পর্কে তৈরি হয়। কেননা, নিয়মানুসারে খবর বাক্য বা জুমলা হলে তার থেকে একটি সর্বনাম মুবতাদার দিকে ফিরতে হয়। আর তাতে উহ্য ইবারত হবে لَمْ اَصْنَعُ। কিন্তু এর মধ্যে পড়া হলে এ ধরনের সর্বনাম ধরে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু লেখক رفع সহকারে পড়ার তারকীব কেন গ্রহণ করলেন। এর উত্তর হচ্ছে, প্রত্যেকটি সদস্য থেকে হুকুম না-বাচক করার জন্য তিনি পেশের তারকীব গ্রহণ করেছেন। কেননা, মুবতাদা পড়া হলে বাক্যের অনুবাদ হবে- (كُلُّ ذَنْبٍ) (কল্ ডান্ব) কোনো অপরাধ আমি করিনি। আর এ অর্থ প্রমাণ করাই কবির উদ্দেশ্য। আর যদি نصب পড়া হয়, তাহলে কবিতার অর্থ হবে সব অপরাধ আমি করিনি (বরং কিছু অপরাধ আমি করেছি)। এ অবস্থায় তার উপর আরোপিত প্রত্যেকটি অপরাধের অবসান হচ্ছে না, আর এটা কবির উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করা। অতএব, كل-কে পেশ সহকারে পড়া এবং তাকে মুবতাদা বানানো অত্যাবশ্যকীয়।

وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ أَى تَأْخِيرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِإِقْتِضَاءِ الْمَقَامِ تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ وَسَيَجِئُ بَيَانُهُ هَذَا الَّذِى ذُكِرَ مِنَ الْحَذْفِ وَالذِّكْرِ وَالْإِضْمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ كُلُّهُ مُفْتَضًى الظَّاهِرِ مِنَ الْحَالِ وَقَدْ يُخْرَجُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ أَى عَلَى خِلَافِ مُفْتَضًى الظَّاهِرِ لِإِقْتِضَاءِ الْحَالِ إِيَّاهُ فَيُوضَعُ الْمُضْمَرُ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ كَقَوْلِهِمْ نِعَمَ رَجُلًا زَيْدٌ مَكَانَ نِعَمَ الرَّجُلِ فَإِنَّ مُفْتَضًى الظَّاهِرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ الْإِظْهَارُ دُونَ الْإِضْمَارِ لِعَدَمِ تَقْدِيمِ ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ قَرْنَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَهَذَا الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى مُتَعَقِّلٍ مَعْنُودٍ فِي الذِّهْنِ وَالتَّزَمَ تَفْسِيرُهُ بِنَكْرَةٍ لِيُعْلَمَ جِنْسُ الْمُتَعَقِّلِ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا مِنْ وَضْعِ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهَرِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَى قَوْلٍ مَنْ يَجْعَلُ الْمَخْصُوصَ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَأَمَّا مَنْ يَجْعَلُهُ مُبْتَدَأً وَنِعَمَ رَجُلًا خَبَرَهُ فَيَحْتَمِلُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْمَخْصُوصِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا وَيَكُونُ التَّزَامُ إِفْرَادِ الضَّمِيرِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ نِعْمًا وَنِعْمُوا مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْبَابِ لِكُونِهِ مِنَ الْأَفْعَالِ الْجَامِدَةِ -

অনুবাদ : আর তাকে অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাৎবর্তী করা এ কারণে যে, স্থান-কাল-পাত্র মুসনাদের অগ্রগামীতা চায়। এর আলোচনা অচিরেই আসবে। আর এখানে যা উল্লেখ করা হলো উহ্য হওয়া, উল্লেখ হওয়া, ও সর্বনাম ব্যবহার ইত্যাদি প্রত্যেকটিই মুকতাযায়ে হালের প্রকাশ্য অবস্থা অনুপাতে। কখনো বাক্যকে ব্যবহার করা হয় এর বিপরীতে। অর্থাৎ প্রকাশ্য চাহিদার বিপরীতে, হাল তাকেই চাওয়ার কারণে, তখন প্রকাশ্য বিশেষ্যকে সর্বনামের স্থানে রাখা হয়। যেমন তাদের বাক্য نِعَمَ رَجُلًا زَيْدٌ-এর স্থানে প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদা হচ্ছে বাহ্যিক বিশেষ্য ব্যবহার করা, সর্বনাম নয়। কেননা, মুসনাদ ইলাইহের আলোচনা ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়নি এবং এমন লক্ষণও অনুপস্থিত যা মুসনাদ ইলাইহের দিকে নির্দেশ করে আর এ সর্বনামটি অন্তরে অবস্থিত একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, এরপর এর ব্যাখ্যাটি আবশ্যকের পর্যায়ে, যাতে যুক্তিগ্রাহ্য এবং মনে অবস্থিত বিষয় অবহিত হওয়া যায়। তবে এটি “বাহ্যিক বিশেষ্যের স্থানে সর্বনাম ব্যবহার” হবে (এ ব্যাপারে বর্ণিত) একটি মতানুসারে অর্থাৎ তাদের মতানুসারে যারা মাখসূসকে উহ্য মুবতাদার খবর মনে করেন। আর যারা মাখসূসকে মুবতাদা আর نِعَمَ رَجُلًا-কে তার খবর ধরেন সেখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সর্বনামটি মাখসূসের দিকে ফিরেছে, যা মর্যাদাগতভাবে অগ্রবর্তী। আর সর্বনামকে সব সময় একক হিসেবে ব্যবহার করা এবং نِعْمًا نِعْمُوا না বলা শুধুমাত্র এ অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য। কেননা, এটি অপরিবর্তনীয় ফে'লসমূহের একটি।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ النِّح : মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাৎবর্তী করা মুসনাদ ইলাইহের একটি অবস্থা। কখন এবং কোথায় মুসনাদ ইলাইহকে পশ্চাৎবর্তী করা হবে? এর উত্তরে লেখকের খুবই সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর হচ্ছে যেখানে মুসনাদকে অগ্রগামী করা প্রয়োজন। অতএব, إِخْوَالُ الْمُسْنَدِ-এর মধ্যে এর বিশদ আলোচনা আসবে।

লেখক বলেন, উল্লিখিত মুসনাদ ইলাইহের সবগুলো অবস্থা যেমন তাকে উল্লেখ করা, উহা রাখা, তার সর্বনাম ব্যবহার করা, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টরূপে ব্যবহার করা ইত্যাদির আলোচনা হয়েছে স্থান-কাল পাত্রের বাহ্যিক অবস্থানুসারে। কখনো প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীতে ব্যবহার করা হয় যা মুকতায়্যে হাল অনুসারে অবশ্য ঠিকই হয়। যেমন- **نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ** ব্যবহার করা **نِعْمَ الرَّجُلُ**-এর স্থলে।

نِعْمَ الرَّجُلُ-এর মধ্যে ফায়েল হলো **الرجل** (প্রকাশ্য বিশেষ্য) পক্ষান্তরে **نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ**-এর মধ্যে ফায়েল হলো সর্বনাম **هو** **نِعْم**-এর মাঝে উহা আছে। উল্লেখ্য যে, এ সর্বনামের ইসমটি ইতঃপূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। সর্বনামের ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে প্রথমত কোনো প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা, এরপর সে স্থানে সর্বনামকে ব্যবহার করা। প্রথমেই সর্বনাম ব্যবহার সাধারণ নিয়মবহির্ভূত। অতএব, প্রথমেই সর্বনাম ব্যবহার করা সাধারণ নিয়মের পরিপন্থি। তা ছাড়া ফায়েলটি সর্বনামের মাধ্যমে অস্পষ্ট হয়েছে, তারপর তার ব্যাখ্যা দ্বারা সে অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে **تفسير بعد** **الابهام**-এর নিয়মানুসারে। কিন্তু যেহেতু এটি নাহর নিয়মের অধীনেই করা হয়েছে এবং এভাবেই ব্যবহার করার নিয়ম, তাই এটি স্থান-কাল-পাত্র অনুসারেই হলো।

উল্লেখ্য যে, স্থান-কাল-পাত্র-এর অনুযায়ী হওয়া এবং স্থান-কাল-পাত্রের প্রকাশ্য অবস্থানুযায়ী হওয়ার মাঝে পার্থক্য কিতাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, **نِعْم**-এর সর্বনামের **مرجع** এমন বিষয় যা মনের মাধ্যে অবস্থিত, যুক্তিসম্মত, কিন্তু অস্তিত্বের প্রশ্নে অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার কারণ হচ্ছে, এর **مرجع** পুরুষও হতে পারে আবার নারীও, একটি হতে পারে আবার একাধিকও। এর পর যখন **رجلا** তাকিদ আনা হলো তখন সর্বনামটির জিনস (যাত) জানা গেল এবং এরপর যখন মাখসূসকে উল্লেখ করা হলো তখন এর সত্তাও সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, সেই পুরুষটি হচ্ছে যায়েদ।

মুসান্নিফ বলেন, উল্লিখিত বিশ্লেষণ **نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ**-এর একটি তারকীব অনুসারে সঠিক। এর ভিন্ন আরেকটি তারকীব এমন যে, এতে **اسم ظاهر**-এর স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি। সে তারকীব অনুসারে বিশ্লেষণ : **نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ** এ বাক্যে **زيد** (**مَخْصُوصٌ بِالنَّمِذِ**) হচ্ছে উহা মুবতাদার খবর। উহা ইবারত হবে **نِعْمَ رَجُلًا هُوَ زَيْدٌ** এখানে ফায়েল হবে **نِعْم** স্থিত উহা সর্বনাম। দ্বিতীয় তারকীব হচ্ছে **زيد** (যা মাখসূস হয়েছে) মুবতাদা, আর **نِعْمَ رَجُلًا** হচ্ছে অগ্রবর্তী খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে **جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ** হয়েছে।

এ তারকীব অনুসারে উল্লিখিত প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনাম ব্যবহার করার উদাহরণ এটি হতে পারে না।

কারণ, **زيد** যা বাক্যের মুবতাদা, তা শাদিকভাবে পশ্চাদ্বর্তী হলেও মুবতাদা হওয়ার কারণে মর্যাদাগতভাবে অগ্রবর্তী। আর অগ্রবর্তী হলে সর্বনাম প্রথমেই ব্যবহার হচ্ছে না; বরং এর **مرجع** প্রথমে এসে গেছে, আগে **مرجع** যাওয়ার পর সর্বনাম ব্যবহার করাই হলো যাহির বা প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদা আর যাহিরের চাহিদা মোতাবেক বাক্যটি যখন ব্যবহার হলো, তখন বাক্যটি প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনামকে রাখার প্রকারের মধ্যে গণ্য হলো না।

قَوْلُهُ وَيَكُونُ التَّيْزَامُ أَفْرَادًا : এ বাক্য দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে যে, **نِعْم**-এর সর্বনাম যেহেতু মাখসূস-এর দিকে ফিরেছে, অতএব মাখসূসের বচনভেদে **نِعْم**-এর মধ্যে পরিবর্তন করা আবশ্যিক এবং এভাবে বলা উচিত **الزَّيْدَانِ نِعْمًا** ও **رَجُلَيْنِ الزَّيْدَانِ** তাহলে সর্বনাম এবং তার **مرجع**-এর মধ্যে **تطابق** হতো। অথচ --এমন তো করা হয় না; বরং **نِعْم** সব সময় একবচনই থাকে।

এর উত্তরে মুসান্নিফ বলেন, **أَفْعَالٌ جَامِدَةٌ**-এর অন্তর্ভুক্ত। অনেকে তো একে বিশেষ্যরূপে গণ্য করেছেন। যেহেতু (**فعل جامد**)-এর জন্য মুফরাদ হওয়া আবশ্যিক, তাই সব সময় **مفرد** রূপে ব্যবহার হয়। আর এটাই তার বৈশিষ্ট্য।

وَقَوْلُهُمْ هُوَ أَوْ هِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ مَكَانَ الشَّانِ أَوْ الْقِصَّةِ فَإِلْضَامٌ فِيهِ أَيْضًا خِلَافٌ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ لِعَدَمِ التَّقَدُّمِ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْتِغْمَالَ عَلَى أَنَّ ضَمِيرَ الشَّانِ إِنَّمَا يُؤْنَتُ إِذَا كَانَ فِي الْكَلَامِ مُؤْنَتٌ غَيْرُ فَضْلَةٍ نَحْوِ هِيَ هِنْدٌ مَلِيحَةٌ فَقَوْلُهُ هِيَ زَيْدٌ عَالِمٌ مُجَرَّدٌ قِيَاسٍ -

অনুবাদ : আর তার উক্তি **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** এটি **شَانَ** এবং **قِصَّة**-এর স্থলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে সর্বনাম ব্যবহার করাও প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদার বিপরীত, এর পূর্বে আলোচনা না অতিবাহিত হওয়ার কারণে। জেনে রাখুন-**شَانَ**-এর সর্বনামে স্ত্রীলিঙ্গ হয় যখন বাক্যে প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ থাকে, এটাই প্রচলিত ব্যবহার। যেমন-**هِيَ** **هِنْدٌ** তার উক্তি **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** হচ্ছে যুক্তির আলোকে উদাহরণ (এর বাস্তব ব্যবহার এরূপ নয়)।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ضَمِيرٌ ও **ضَمِيرِ شَانَ** বাক্য প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত হয়, এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে-**قَوْلُهُ** **وَقَوْلُهُمْ هُوَ** **الْقِصَّةِ**। এটিও প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থলে সর্বনামকে ব্যবহার করার উদাহরণ। যেমন-**شَانَ**-এর স্থলে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** বলা এবং **قِصَّة**-এর স্থানে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** বলা, যেহেতু **شَانَ**-এর স্থানে সর্বনামটি ব্যবহার হয়, তাই তাকে **ضَمِيرِ شَانَ** বলা হয়। আর **هِيَ** যেহেতু **قِصَّة**-এর স্থানে ব্যবহার হয়, তাই তাকে **ضَمِيرِ قِصَّة** বলা হয়।

কে-**ضَمِيرِ شَانَ** **وَضَمِيرِ قِصَّة** “প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদার বিপরীত” বলার কারণ হচ্ছে এই সর্বনামগুলো সাধারণ রীতির বিপরীতে ব্যবহার হয়েছে। সর্বনাম ব্যবহার করার রীতি হচ্ছে, প্রথমে কোনো ইসমে যাহির ব্যবহার করার পর উক্ত বিশেষ্যের সর্বনাম ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এখানে তা করা হয়নি, এখানে প্রথমেই সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে সে রীতির বিপরীতে হওয়াতে প্রকাশ্য অবস্থার চাহিদার বিপরীত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ**-এর তারকীব হচ্ছে **هو** মুবতাদা, **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** জুমলা হয়ে সে মুবতাদার খবর। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মুবতাদার খবর জুমলা হলে সে খবরের সাথে মুবতাদার একটি সংযোগকারী থাকা অত্যাবশ্যকীয়, যাতে খবরটি মুবতাদার সাথে যুক্ত থাকে, অথচ এখানে এমন কোনো সংযোগকারী নেই, এমতাবস্থায় **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** কে-এর খবর বলা কতটা সমীচীন হবে? এর উত্তর হচ্ছে, যে বাক্য **ضَمِيرِ شَانَ**-এর ব্যাখ্যা করে, যেমন এখানে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** হচ্ছে **هو**-এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা আর যেটা তাফসীর সেটা মুবতাদার হুকুমে, মুবতাদা (**هو**)-এর একবচন হওয়ার কারণে তার তাফসীর জুমলাটিও **مفرد**-এর হুকুমে হয়ে যাবে। আর **مفرد** কোনো সংযোগকারীর মুখাপেক্ষী হয় না। অতএব, এ বাক্যটিও সংযোগকারীর মুখাপেক্ষী হবে না।

এখানে থেকে মুসান্নিফ লেখকের উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে, মূল লেখকের উক্তি **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আরবদের থেকে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ**-এর ব্যবহার যেমন বর্ণিত এমনিভাবে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ**-এর ব্যবহারও বর্ণিত, আরবরা এ দু'ভাবেই এটা ব্যবহার করে থাকেন। অথচ আরবদের সাধারণ ব্যবহার এরূপ নয়। আরবরা **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** এমন ব্যবহার কখনোই করেন না। এর কারণ হচ্ছে, অর্থগতভাবে **ضَمِيرِ شَانَ** এবং **ضَمِيرِ قِصَّة** যদিও একই ধরনের; কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একটি পরিভাষা তৈরি করেছেন যে, বাক্যটি যে সর্বনামের তাফসীর হবে সেই বাক্যটিতে যদি হাকীকী (প্রকৃত) স্ত্রীলিঙ্গ থাকে, তাহলে সে সর্বনামটি অবশ্যই স্ত্রীলিঙ্গবাচক সর্বনাম হবে। যেমন-**هِيَ** **هِنْدٌ** **مَلِيحَةٌ** এ সর্বনামটিকে তারা **ضَمِيرِ قِصَّة** বলেন। আর যদি সেটিতে প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম না থাকে, তাহলে সর্বনামটিকে পুংলিঙ্গ আনতে হবে, তাকে তারা **ضَمِيرِ شَانَ** বলেন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ**-এর মধ্যে কোনো প্রকৃত স্ত্রীলিঙ্গ নেই, তাই তার সর্বনামটি পুংলিঙ্গের হবে এবং **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ**-ই ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** ব্যবহার করা মোটেও সমীচীন হবে না। এ জন্যই আরবরা এ জাতীয় বাক্যে **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** ব্যবহার করেন না। সুতরাং যখন আরবদের ব্যবহার **هِيَ** **زَيْদٌ** **عَالِمٌ** নেই, তাই এরূপ বর্ণিত হওয়ারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই মূল লেখকের **قَوْلُهُ** বলে আরবদের ব্যবহার উদ্ধৃত করা কি সঠিক?

এর জবাব হচ্ছে মূল লেখক যুক্তির আলোকে এ কথা বলেছেন যে, **هِيَ** **زَيْدٌ** **عَالِمٌ** এটা আরবদের ব্যবহার, তিনি আরবদের ব্যবহারকে যথার্থ অনুসন্ধান করে এ কথা বলেননি; বরং তিনি **هِيَ** **هِنْدٌ** **مَلِيحَةٌ**-এর উপর কিয়াস করে বলেছেন। তার কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে উভয় সর্বনাম **قِصَّة**-এর প্রতি ফিরেছে।

ثُمَّ عَلَّلَ وَضَعَ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهِرِ فِي الْبَابَيْنِ بِقَوْلِهِ لِيَتِمَّ كُنَّ مَا يَعْقِبُهُ أَيْ يَعْقِبُ ذَلِكَ الضَّمِيرَ أَيْ يَجِيءُ عَلَى عَقِبِهِ فِي ذَهْنِ السَّامِعِ لِأَنَّهُ أَيْ السَّامِعُ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ أَيْ مِنَ الضَّمِيرِ مَعْنَى اِنْتَظَرَهُ أَيْ اِنْتَظَرَ السَّامِعُ مَا يَعْقِبُ الضَّمِيرَ لِيَفْهَمْ مِنْهُ مَعْنَى فَيَتِمَّ كُنَّ بَعْدَ وَرُودِهِ فَضَلَ تَمَكَّنَ لِأَنَّ الْمَحْضُولَ بَعْدَ الطَّلَبِ أَعَزُّ مِنَ الْمِنْسَاقِ بِلَا تَعَبٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَحْسُنُ فِي بَابٍ نَعَمْ لِأَنَّ السَّامِعَ مَا لَمْ يَسْمَعْ الْمُفْسِّرَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهِ ضَمِيرًا فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الشُّوقُ وَالْإِنْتَظَارُ -

অনুবাদ : অতঃপর তিনি সর্বনামকে দু'টি অধ্যায়ে প্রকাশ্য বিশেষ্যর স্থানে ব্যবহার করার কারণ আলোচনা করেছেন, তার এ বক্তব্যের সাহায্যে, যাতে তার পরবর্তী কথা অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নেয়। অর্থাৎ সেই সর্বনামের পরে তথা তার পরে এসে শ্রোতার মনে স্থান করবে। কেননা, শ্রোতা যখন এর অর্থাৎ সর্বনাম থেকে কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ শ্রোতা সর্বনামের পরে কি আসে তার অপেক্ষা করবে, যাতে তার অর্থ অনুধাবন করতে পারে। সুতরাং এর পরে তার মনে এটি বিশেষ স্থান করে নিবে। কেননা, তত্ত্ব-তালাশের পর অর্জিত বিষয় এমনিতে বিনাশ্রমে অর্জিত বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় হয়। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, نعم-এর অধ্যায়ে এ উত্তর উত্তম হবে না। কেননা, (نعم)-এর অধ্যায়ে) শ্রোতা যে পর্যন্ত ব্যাখ্যাকারী শব্দটি না শুনবে সে জানতেই পারবে না যে, এখানে একটি সর্বনাম ছিল। অতএব, এতে আগ্রহ ও অপেক্ষা পাওয়া যায় না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

أَفْعَالٌ مَذْحٌ وَذَمٌّ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, মূল লেখক (أَفْعَالٌ مَذْحٌ وَذَمٌّ)-এর অধ্যায়ে সর্বনামকে প্রকাশ্য বিশেষ্যর স্থানে রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন তার একটি মাত্র বাক্য দ্বারা। তার সে বাক্যটি হচ্ছে لِيَتِمَّ كُنَّ مَا يَعْقِبُهُ অর্থাৎ সর্বনামকে প্রকাশ্য বিশেষ্যর স্থানে ব্যবহার করা হয়, যাতে সর্বনামের পরে আসা বিষয়টি শ্রোতার মনে ভালোভাবে বসে যায় এবং সুদৃঢ় স্থান করে নেয়। কেননা, শ্রোতা যখন প্রথমেই সর্বনামটি শুনবে এবং তার مرجع খুঁজে পাবে না, তখন সে কোনো অর্থ অনুধাবন করতে পারবে না এবং সর্বনাম তার কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে, ফলে সে এর পরবর্তী বাক্যের অপেক্ষায় থাকবে এবং তার সর্বনামটির অর্থ বুঝার জন্য এক ধরনের উৎসুক ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আর আগ্রহ ও অপেক্ষার পর যা অর্জিত হয় তা এমনিতে বিনা শ্রমে যা অর্জিত হয়, তার চেয়ে বেশি প্রিয় এবং হৃদয়ে স্থান লাভ করে। কেননা, এতে একেতো জ্ঞানার্জনের স্বাদ, সেই সাথে অপেক্ষার কষ্ট দূর হওয়ার আরাম, উভয় হাসিল হচ্ছে। আর যা বিনা শ্রমে অর্জিত হয় তাতে যদিও জ্ঞানার্জন হয়; কিন্তু অপেক্ষার কষ্ট দূর হওয়ার আরাম তাতে নেই। আর এটাতো দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, কষ্ট লাঘব হওয়ার আরাম উত্তম বলে গণ্য হয় এমন আরাম থেকে যা বিনা শ্রমে অর্জিত হয়।

ثُمَّ عَلَّلَ : মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের এ কারণটি نعم তথা نعم-এর বেলায় যথার্থ বলে গণ্য হয় না, কেননা نعم সহ অন্যান্য নিন্দা ও প্রশংসাসূচক বাক্যে ব্যাখ্যাকারী শব্দটি শোনার আগে শ্রোতা এর মধ্যে অবস্থিত সর্বনামটি সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। কেননা, ব্যাখ্যাকারী শব্দটির সঙ্গে এ সম্ভাবনা যেমন থাকে যে, এতে সর্বনাম আছে, আবার এ সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে যে, এতে এর ফায়েল প্রকাশ্য বিশেষ্যই হবে। আর এ কারণে শ্রোতার কাছে বিশেষ কোনো আগ্রহ ও অপেক্ষা এখানে সৃষ্টি হবে না। আর আগ্রহ ও অপেক্ষা না থাকলে এর পরের বাক্যটি মনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে স্থান লাভ করবে না। অতএব, نعم-এর ক্ষেত্রে উল্লিখিত কারণটি প্রযোজ্য হলো না।

এর উত্তরে এটা বলা যেতে পারে যে, মূল লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ অবস্থা যখন শ্রোতার জানা থাকবে যে, نعم মধ্যে সর্বনাম লুক্কায়িত আছে, অতএব, এর পরে যখন কাজের বাকি অংশ প্রকাশ করা হবে, তখন শ্রোতার কাছে বিষয়টি পাকাপোক্তভাবে স্থান করে নিবে। শ্রোতার পূর্ব থেকে জ্ঞান লাভ করার জন্য তাফসীর-এর উল্লেখ জরুরি নয়; বরং অন্য কোনো লক্ষণের মাধ্যমে তা জানতে সক্ষম হতে পারে। মোটকথা, যখন শ্রোতার এটা জানা থাকবে যে, نعم-এর মধ্যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার পূর্বে কোনো مرجع যায়নি, তখন সেই সর্বনামের পর আগত বিষয়ের প্রতি তার বিশেষ উৎসুক তৈরি হবে, আর এ অপেক্ষা ও আগ্রহের পর বাক্যটি বলা হলে তার মনে তা বিশেষ স্থান করে নিবে।

وَقَدْ يُعَكِّسُ وَضْعَ الْمُضْمَرِ مَوْضِعَ الْمُظْهِرِ أَيْ يُوَضِّعُ الْمُظْهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ فَإِنْ كَانَ الْمُظْهِرُ الَّذِي وَضَعَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ اسْمُ إِشَارَةٍ فَلِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِتَمْيِيزِهِ أَيْ تَمْيِيزِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِحُكْمٍ بَدِيعٍ كَقَوْلِهِ شَعْرٌ كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ هُوَ وَصَفُ عَاقِلٍ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى كَامِلِ الْعَقْلِ مُتَنَاهٍ فِيهِ أَغْيَتْ أَيْ أَغْيَتْهُ وَأَعْجَزَتْهُ أَوْ أَغْيَتْ عَلَيْهِ وَصَعِبَتْ مَذَاهِبُهُ * أَيْ طُرُقُ مَعَاشِهِ وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَقَّاهُ مَرْزُوقًا ، هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النَّخْرِيرَ أَيْ الْمُتَقِنَ مِنْ نَحَرَ الْأُمُورِ عِلْمًا أَتَقَنَهَا زَنْدِيقًا كَافِرًا نَافِيًا لِلصَّانِعِ الْعَدْلِ الْحَكِيمِ فَقَوْلُهُ هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى حُكْمٍ سَابِقٍ غَيْرِ مُحْسُوسٍ وَهُوَ كَوْنُ الْعَاقِلِ مُحَرُّومًا وَالْجَاهِلِ مَرْزُوقًا فَكَانَ الْقِيَاسُ فِيهِ الْإِضْمَارُ فَعُدِلَ إِلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِتَمْيِيزِهِ لِيُرَى السَّامِعِينَ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ الْمُتَمَيِّزَ الْمُتَعَيَّنَ هُوَ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ الْعَجِيبُ وَهُوَ جَعَلَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً وَالْعَالِمَ النَّخْرِيرَ زَنْدِيقًا فَالْحُكْمُ الْبَدِيعُ هُوَ الَّذِي أُثْبِتَ لِلْمُسْنَدِ إِلَيْهِ الْمَعْبَرُ عَنْهُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ -

অনুবাদ : কখনো প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনাম রাখার বিপরীত করা হয় অর্থাৎ সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে রাখা হয়। যদি সর্বনামের স্থানে ব্যবহারের বিশেষ্যটি ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য (اسْمُ إِشَارَةٍ) হয় (এটা করা হয়) মুসনাদ ইলাইহকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মুসনাদ ইলাইহটি একটি বিচিত্র হুকুমের সাথে খাস হওয়ার কারণে, যেমন তার কবিতা : অর্থাৎ বহু মহাজ্ঞানী রয়েছে, দ্বিতীয় একটি শব্দটি প্রথম عَاقِل-এর সিফাত। অর্থ পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বুদ্ধিমান। তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে অথবা তার জন্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে জীবিকা, আর অনেক গণমূর্খ লোক প্রচুর পরিমাণে রিজিক (জীবিকা) প্রাপ্ত এ ব্যাপারটা জ্ঞানী লোকদের চিন্তিত করেছে, আর সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদের নাস্তিকে পরিণত করেছে। বিষয়টি হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তির বঞ্চিত হওয়া এবং মূর্খের প্রচুর জীবিকা লাভ করা। এখানে সর্বনাম ব্যবহারই ছিল যথা নিয়ম। এ থেকে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যের দিকে তিনি গেছেন বিষয়টিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিচিত ও পৃথক করার জন্য, যাতে শ্রোতাদের দেখানো যায় যে, এটা এমন একটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির বিষয় যার ব্যাপারে রয়েছে একটি আশ্চর্যপূর্ণ হুকুম। আর তা হচ্ছে জ্ঞানীদের চিন্তা এবং সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদের নাস্তিকে পরিণত হওয়া। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হুকুম যা মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রমাণ করা হয়েছে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যের মাধ্যমে ব্যক্ত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَخَّكَ بَلَعَنَ، مُفْتَضَى الظَّاهِرِ (প্রকাশ্য চাহিদা)-এর বিপরীত আরেকটি অবস্থা হচ্ছে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যের ব্যবহার। আমরা জানি, প্রকাশ্য বিশেষ্য বা ইসমে যাহির কয়েক প্রকার যথা- নামবাচক বিশেষ্য, ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য, নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য ইত্যাদি।

এর মধ্য থেকে ইসমে ইশারা (ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য)-কে সর্বনামের স্থানে ব্যবহার করা হয়। এটা করা হয় মুসনাদ ইলাইহকে অন্যান্য বিশেষ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও আলাদা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্যে, আলাদা করার ব্যাপারে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়- এ জন্য যে, মুসনাদ ইলাইহ কোনো চমকপ্রদ আশ্চর্য হুকুমের সাথে খাস হওয়া এবং উক্ত হুকুম মুসনাদ ইলাইহের সাথে যুক্ত হয়।

যেমন কবি আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক রাওয়ান্দী-এর কবিতা-

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ * وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَقَّاهُ مَرْزُوقًا
هَذَا الَّذِي تَرَكَ الْأَوْهَامَ حَائِرَةً * وَصَبَرَ الْعَالِمَ التَّيَحَّرِيْرَ زَنْدِيْقًا .

কবিতার শাব্দিক বিশ্লেষণ :

দ্বিতীয় عَاقِلٍ হচ্ছে প্রথম عَاقِلٍ-এর সিফাত, অর্থ- পূর্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। এমনিভাবে جَاهِلٍ جَاهِلٍ-এর দ্বিতীয় جَاهِلٍ শব্দটি প্রথম جَاهِلٍ-এর সিফাত। এর অর্থ- গণ্ডমূর্থ।

أَعْيَتْ ফে'লটি لَا زَمَ উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। মুসান্নিফ مُتَعَدِّي-এর প্রতি أَغْيَتْ (মাফউলসহ)-এর মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন তার সমার্থক হচ্ছে اعجز অর্থ- অক্ষম করে দেওয়া। لَا زَمَ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন أَغْيَتْ-এর মাধ্যমে لَا زَمَ-এর অর্থ হচ্ছে কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে যাওয়া। مَرْزُوق শব্দের অর্থ- রিযিকপ্রাপ্ত। শব্দটি إِسْم-এর সীগাহ। أَوْهَام শব্দটি هَام-এর বহুবচন। অর্থ- জ্ঞান, এখানে জ্ঞানী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

نَحْرِيْر-এর অর্থ- অভিজ্ঞ, বিদ্বৎ আলিম। مَذَاهِبُ শব্দটি مَذْهَب-এর বহুবচন। এর অর্থ-গন্তব্য, যে স্থানে যাওয়া হয়, তরিকা, মত পথ ও রীতি ইত্যাদি। এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জীবিকা উপার্জনের পথ ও পেশা। পুরো কবিতার অর্থ- অনেক জ্ঞানী মহাজ্ঞানীর জীবিকা উপার্জনের পথ নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা তাদের ধর্মীয় অনুশাসন তাদের বিরত রেখেছে। আর অনেক অকাট্য মূর্থ লোককে তুমি পাবে যে, প্রচুর জীবিকার অধিকারী জ্ঞানীলোকের বঞ্চিত হওয়া এবং মূর্থ লোকের নিয়ামতপ্রাপ্ত হওয়া এমন বিষয় যা বড় বড় জ্ঞানী মহাজ্ঞানীদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে এবং সুবিজ্ঞ আলিমদের অনেককে নাস্তিক মুরতাদে পরিণত করেছে।

অর্থাৎ রিযিকের তারতম্যের কারণে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার ইনসাফ ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগবে। এ প্রশ্ন হয়তো কাউকে নাস্তিকে পরিণত করবে।

কবিতার هَذَا হচ্ছে মুসনাদ ইলাইহ, তার মুসনাদ হচ্ছে الْأَوْهَام এখানে هَذَا-এর দ্বারা তিনি পূর্ববর্তী কথা আলিম বঞ্চনা এবং মূর্থলোক রিযিকপ্রাপ্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অতএব, এখানে নিয়মের অনুসরণ করত সর্বনাম ব্যবহার করা হয়নি; বরং নিয়মের বিপরীতে প্রকাশ্য বিশেষ্য (هَذَا)-কে ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লিখিত হুকুমটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত জ্ঞান। এর জন্য সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা হয় না। কারণ, ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সারকথা হচ্ছে, এখানে সর্বনাম ব্যবহার করা ছিল নিয়মের অনুসরণ এবং যাহির অনুসারে কাজ করা, কিন্তু তা না করে নিয়মের এবং যাহিরের বিপরীতে প্রকাশ্য বিশেষ্য (ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মুসনাদ ইলাইহ অপরাপর বিশেষ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে যায় এবং যাতে শ্রোতাদের এ কথা বুঝানো যায় যে, এ বিষয় (জ্ঞানী লোকের বঞ্চনা এবং মূর্থদের অটেল জীবিকা) অপরাপর বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আলাদা বিষয়। আর এটা ই তো এমন বিষয় যার মধ্যে একটি বিশেষ চমকপ্রদ হুকুম (জ্ঞানীদের চিন্তিত এবং সুবিজ্ঞ আলিমদের নাস্তিকে পরিণত হওয়া) প্রমাণ করা হয়েছে।

সুতরাং এ বিশেষ চমকপ্রদ হুকুমটি এমন মুসনাদ ইলাইহের জন্য প্রমাণ করা হলো যাকে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

أَوِ التَّهَكُّمِ عَطْفٌ عَلَى كَمَالِ الْعِنَايَةِ بِالسَّمِيعِ كَمَا إِذَا كَانَ السَّمِيعُ فَأَقْدَ الْبَصْرِ أَوْ لَا يَكُونُ ثُمَّ مُشَارٌ إِلَيْهِ أَصْلًا أَوْ النَّدَاءُ عَلَى كَمَالِ بِلَادَتِهِ أَيْ بِلَادَةِ السَّمِيعِ بِأَنَّهُ لَا يَذْرُكُ غَيْرَ الْمَحْسُوسِ أَوْ عَلَى كَمَالِ فَطَانَتِهِ بِأَنَّهُ غَيْرَ الْمَحْسُوسِ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْسُوسِ أَوْ إِدْعَاءٍ كَمَالِ ظُهُورِهِ أَيْ ظُهُورِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَيْ وَعَلَى وَضْعِ اسْمِ الْإِشَارَةِ مَوْضِعِ الْمُضْمِرِ لِإِدْعَاءٍ كَمَالِ الظُّهُورِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ أَيْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ شِعْرُ تَعَالَتْ أَيْ أَظْهَرَتِ الْعِلَّةَ وَالْمَرَضَ كَيْ أَشْجَى أَيْ أَحْزَنَ مِنْ شَجَى بِالْكَسْرِ صَارَ حَزِينًا لَا مِنْ شَجَى بِالْعِظَمِ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى نَشَبَ فِي حَلْقِهِ وَمَا بِكَ عِلَّةٌ * تُرِيدِينَ قَتْلِي قَدْ ظَفَرْتُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَتْلِي كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يَقُولَ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحْسُوسٍ فَعَدْلُكَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى أَنْ قَتَلَهُ قَدْ ظَهَرَ ظُهُورَ الْمَحْسُوسِ -

অনুবাদ : অথবা শ্রোতাকে বিদ্রূপ করার জন্য এটি কমাল'এনায়্যে-এর উপর আত্মফ হয়েছে। যেমন শ্রোতা দৃষ্টিহীন হলে অথবা যেখানে মোটেও কোনো মুশারুন্ ইলাইহ না থাকলে অথবা তার পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্য যে, সে অনিদ্ৰিয় কোনো বিষয় অনুধাবন করতে পারে না অথবা তার পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রতি ইঙ্গিত দানের জন্য যে, তার অনিদ্ৰিয় বিষয়গুলো ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের মতো অথবা তার অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের পূর্ণ বিকাশমান দাবি করত। এটি অর্থাৎ পূর্ণ বিকাশমান হওয়ার দাবি করত ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যকে সর্বনামের স্থানে রাখা এ অধ্যায়ের অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহের অধ্যায়ের বাইরে থেকেও হয়ে থাকে। কবিতা (অর্থ) তুমি অসুস্থতার ভান করেছ যাতে আমার কষ্ট হয়। أَشْجَى অর্থ- কষ্ট ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া এটা شَجَى (بَابُ سَمِعَ) যেরযুক্ত অর্থ- সে দুঃখিত হলো। এটা شَجَى بِالْعِظَمِ (بَابُ ضَرَبَ) যবরযুক্ত নয়, যার অর্থ গলায় হাড় বা কাটা আটকে যাওয়া, অথচ তোমার রোগ নেই। তুমি আমায় হত্যা করতে চেয়েছ। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে হত্যা করতে সফল হয়েছ। যাহিরী অবস্থার দাবি হচ্ছে بِهِ বলা (بِذَلِكَ-এর স্থানে) কেননা, এটা তো ইন্দ্রিয়লব্ধ নয় সুতরাং তিনি ঐ পথে গেলেন এ কথার ইঙ্গিত করার জন্য যে, তা ইন্দ্রিয়ানুভূত হওয়ার মতো বিকশিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوِ التَّهَكُّمِ : উল্লিখিত ইবারতে প্রকাশ্য বিশেষ্যের স্থানে সর্বনামকে ব্যবহার করার আরো কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্য থেকে একটি কারণ التَّهَكُّمِ অর্থ শ্রোতার প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করার জন্য। মুসান্নিফ বলেন, التَّهَكُّمِ শব্দটি كَمَالِ الْعِنَايَةِ-এর উপর আত্মফ হয়েছে। যেমনটি ইসমে ইশারা ব্যবহার করার কারণ তেমনি تَهَكُّمٌ بِالسَّمِيعِ ও ইসমে ইশারা ব্যবহার করার কারণ। মোটকথা, শ্রোতার প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য প্রকাশ্য বিশেষ্য আনা হয়, যেমন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি শ্রোতা হলে তাকে বিদ্রূপ করার জন্য বললে هَذَا ضَرْبُكَ (এ তোমাকে মেরেছে) এটা তখন বলবে, যখন অন্ধ ব্যক্তি বলবে আমাকে কে মেরেছে। তুমি বললে هَذَا ضَرْبُكَ এখানে প্রশ্নের মধ্যে যেহেতু مَرْجِعٌ আছে তাই যাহিরী অবস্থার দাবি মতে এখানে শুধুমাত্র زَيْدٌ বলে দিলেই যথেষ্ট হতো; কিন্তু দৃষ্টিহীন শ্রোতার সাথে ঠাট্টা করার জন্য যাহিরী অবস্থার বিপরীতে সর্বনামের স্থানে ইঙ্গিতবাচক শব্দ দ্বারা বলল هَذَا زَيْدٌ।

অথবা শ্রোতা দৃষ্টিহীন নয়; বরং চক্ষুধারী, কিন্তু সেখানে মুশাররুন ইলাইহ অনুপস্থিত, এমন সময় **مَنْ ضَرَبَنِي**-এর উত্তরে বলা হলো **هَذَا ضَرَبَكَ** মুশাররুন ইলাইহ অনুপস্থিত এ হিসেবে যাহিরী অবস্থার চাহিদা হলো ইঙ্গিতসূচক বাক্য বা শব্দ না ব্যবহার করে সর্বনাম ব্যবহার করা এবং বলা **هُوَ زَيْدٌ** কিন্তু শ্রোতাকে বিদ্রূপ করার জন্য বক্তা বলল **هَذَا ضَرَبَكَ** ।

قَوْلُهُ أَوِ الْبَدَاءِ عَلَى كَمَالٍ بِلَادِيهِ : অথবা শ্রোতার নির্বুদ্ধিতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ইঙ্গিতসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেন শ্রোতা এতটা নির্বোধ যে, সে অনিন্দ্রিয় বিষয় অনুভব করতে পারে না, যেমন কেউ বলল **الْبَلَدُ مِنْ عَالِمٍ الْبَلَدُ** (শহরের আলিম কে?) এর উত্তরে বলা হলো **ذَلِكَ زَيْدٌ** (ঐ য়ায়েদ) অথচ এখানে **مَرْجِعٌ** উল্লেখ থাকার কারণে সর্বনাম ব্যবহার করে বলা দরকার ছিল **هُوَ زَيْدٌ** । কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা পরিহার করে ইঙ্গিতবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, শ্রোতা এতটা মেধাহীন যে, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে সে বুঝতে পারে না ।

قَوْلُهُ أَوْ عَلَى كَمَالٍ فِطَانِهِ : অথবা কখনো শ্রোতার উজ্জ্বল মেধার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ইঙ্গিতবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় যাতে এ কথা বুঝানো যায় যে, শ্রোতা এতটা মেধাবী যে, তার কাছে ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়ের মতো যেমন কোনো মাসআলা বর্ণনা প্রসঙ্গে শিক্ষক বলেন **هَذَا عِنْدَ فُلَانٍ ظَاهِرٌ** (এটা অমুকের কাছে স্পষ্ট), এখানে **مَرْجِعٌ** উল্লেখ থাকার কারণে বলা উচিত যে, **هُوَ عِنْدَ وَلَانٍ ظَاهِرٌ** কিন্তু শ্রোতার উজ্জ্বল মেধার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, তার কাছে ইন্দ্রিয় ছাড়া বুঝা যায় না এমন বিষয়ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতো তাই ইঙ্গিতসূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে ।

قَوْلُهُ أَوْ إِدْعَاءِ كَمَالٍ ظُهُورِهِ : কখনো মুসনাদ ইলাইহ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হাতের নাগালে, এ কথা বুঝানোর জন্য মুসনাদ ইলাইহকে ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় । এক কথায়, বক্তা ইসমে ইশারা ব্যবহার করার মাধ্যমে এক কথার দাবি করেন যে, মুসনাদ ইলাইহ যদিও প্রকাশ্য নয়; কিন্তু আমার কাছে তা চোখের দেখার মতো । যেমন কোনো ব্যক্তি তার বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য শ্রোতাকে বলল, **هَذِهِ ظَاهِرَةٌ** এটাতো সুস্পষ্ট । এখানে **هِيَ ظَاهِرَةٌ** বলা সমীচীন ছিল; কিন্তু তা না করে প্রকাশ্য হওয়ার দাবি করে ইঙ্গিতসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন **هَذِهِ ظَاهِرَةٌ** মূল লেখক বলেন, পরিপূর্ণ স্পষ্ট হওয়ার দাবি করত ইসমে ইশারাকে সর্বনামের স্থানে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যের বেলায় হতে পারে । যেমন নিম্নলিখিত কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি-

تَعَالَيْتَ كَيْ أَشْجَى وَمَا بِكَ عِلَّةٌ * تُرِيدُنِي قَتَلِي قَدْ ظَفِرْتَ بِذَلِكَ

শাব্দিক বিশ্লেষণ : **تَعَالَيْتَ** হচ্ছে **(بَابُ تَفَاعُلٍ)**-এর ফে'ল । এর অর্থ হচ্ছে- রোগ ব্যাধির ভান করা । **أَشْجَى** উত্তম পুরুষের একবচন, এটি **بَابُ سَمْعٍ** থেকে নির্গত, এর অর্থ- চিন্তিত এবং দুঃখিত হওয়া, এটি **بَابُ ضَرْبٍ** থেকে নির্গত নয়, **بَابُ ضَرْبٍ** থেকে হলে এর অর্থ হচ্ছে গলায় হাড় আটকে যাওয়া । **عِلَّةٌ**-এর বহুবচন **عِلَلٌ** অর্থ- রোগ ব্যাধি, কার্যকারণ ইত্যাদি । কবিতার অর্থ- আমাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তুমি রোগের ভান ধরেছ; অথচ তোমার মধ্যে কোনো রোগ নেই । তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং তোমার এ উদ্দেশ্য সফলকাম হয়েছে । এখানে প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত হুকুম আনা হয়েছে । কেননা **مُقْتَضَى الظَّاهِرِ** হচ্ছে **قَدْ ظَفِرْتَ بِهِ** ব্যবহার করা, তা না করে এখানে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত এ দাবি করত এবং এটা বর্ণনার জন্য যে, এ হত্যাটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মতো দৃশ্যমান হয়ে গেছে । তিনি ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য **ذَلِكَ** ব্যবহার করেছেন । **بِهِ**-এর স্থানে **ذَلِكَ** এখানে যের প্রদানকারী অব্যয় দ্বারা যেরযুক্ত হয়েছে, বিধায় এটি মুসনাদ ইলাইহ নয় ।

وَأَنَّ كَانَ الْمُظْهَرُ الَّذِي وَضِعَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ اسْمِ الْإِشَارَةِ فَلِزِيَادَةِ التَّمَكُّنِ أَيْ جَعَلَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مُتَمَكِّنًا عِنْدَ السَّامِعِ نَحْوُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ أَيْ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ وَيُقَصَّدُ فِي الْحَوَائِجِ مَنْ صَمَدَ إِلَيْهِ إِذَا قَصَدَ وَلَمْ يَقُلْ هُوَ الصَّمَدُ لِزِيَادَةِ التَّمَكُّنِ وَنَظِيرُهُ أَيْ نَظِيرُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ فِي وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِزِيَادَةِ التَّمَكُّنِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَبِالْحَقِّ أَيْ بِالْحِكْمَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْإِنْزَالِ أَنْزَلْنَاهُ أَيْ الْقُرْآنَ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ وَبِهِ نَزَلَ أَوْ إِدْخَالَ الرُّوْعِ عَطْفٌ عَلَى زِيَادَةِ التَّمَكُّنِ فِي ضَمِيرِ السَّامِعِ وَتَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ وَهَذَا كَالْتَّكْيِدِ لِإِدْخَالِ الرُّوْعِ أَوْ تَقْوِيَةِ دَاعِي الْمَامُورِ وَمِثَالُهُمَا أَيْ مِثَالُ التَّقْوِيَةِ وَإِدْخَالِ الرُّوْعِ مَعَ التَّرْبِيَةِ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُرُكَ بِكَذَا مَكَانَ أَنَا أُمُرُكَ -

অনুবাদ : যদি সর্বনামের স্থলে ব্যবহৃত প্রকাশ্য বিশেষ্যটি ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্যের চেয়ে ভিন্ন কোনো বিশেষ্য হয়, তাহলে তা ব্যবহৃত হবে মুসনাদ ইলাইহকে শ্রোতার অন্তরে খুব বেশি সুদৃঢ় করার জন্য। যেমন- **قُلْ هُوَ اللَّهُ** বলা হয় এমন সত্ত্বাকে, যার প্রতি যাবতীয় প্রয়োজনে অন্যরা মুখাপেক্ষী হয় এবং তাকে কামনা করা হয়। এটি **صَمَدٌ** অর্থ- সে ইচ্ছা করল, থেকে নির্গত এখানে **هُوَ الصَّمَدُ** বলেননি, শ্রোতার অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে বসানোর জন্য। তার উপমা অর্থাৎ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ**-কে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে শ্রোতার অন্তরে বসানোর জন্য ব্যবহার করার উপমা অর্থাৎ মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কুরআন অবতীর্ণ করার প্রয়োজনীয় হিকমতের সাথে আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি এবং হিকমতসহ তা অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে তিনি **بِهِ** না বলে **بِالْحَقِّ** বলেছেন।

অথবা শ্রোতার অন্তরে ভীতি প্রবেশ করানোর জন্য। এটি **زِيَادَةُ التَّمَكُّنِ**-এর উপর আত্মক হয়েছে। আর বড়ত্বকে বৃদ্ধি করার জন্য। **تَرْبِيَةِ الْمَهَابَةِ** হচ্ছে এর জন্য তাকিদের মতো, অথবা নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির আহ্বানকারী (নির্দেশদাতা)-কে শক্তিশালী করার জন্য। উভয়টির অর্থাৎ শক্তিশালী করার এবং বড়ত্ব প্রমাণের সাথে ভীতি সৃষ্টি করার উদাহরণ হচ্ছে খলিফাগণের উক্তি **أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُرُكَ** তথা আমীরুল মু'মিনীন তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এটা **أَنَا أُمُرُكَ** তথা আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি এর স্থানে বলা হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَنَّ كَانَ : লেখক বলেন, সর্বনামের স্থানে ইঙ্গিতবাচক বিশেষ্য ছাড়া অন্যান্য বিশেষ্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- নামবাচক বিশেষ্য সর্বনামের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

আর এমনটি করা হয় কয়েকটি কারণে। যেমন- ১. শ্রোতার মনে মুসনাদ ইলাইহকে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ** সাধারণরীতি অনুসারে এখানে **هُوَ الصَّمَدُ** বলা উচিত, কেননা **أَنَّ**-এর **مَرْجِعُ**-এর পূর্বে বাক্যে গিয়েছে, কিন্তু শ্রোতার মনে আল্লাহ তা'আলা নাম সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্য **قُلْ هُوَ اللَّهُ** বলা হয়েছে। লেখক বলেন, মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য স্থানেও এরূপ করা হয় অর্থাৎ সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য

বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে **وَيَالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ** অর্থাৎ আমি পবিত্র কুরআনকে হিকমত তথা প্রজ্ঞাসহ অবতীর্ণ করেছি আর তা হিকমতের সাথেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় **حَقِّ** শব্দটি **مُقْتَضًى** -এর বিপরীত ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা, ইতঃপূর্বে **حَقِّ** শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পরে সর্বনামের সাথে **وَبِهِ** বলার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সাধারণরীতির বিপরীতে শ্রোতার মনে বিষয়টি সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বিশেষ্যের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে।

قَوْلُهُ أَوْ إِدْخَالِ الرَّوْعِ فِي ضَمِيرِ السَّامِعِ : লেখক বলেন, কখনো শ্রোতার অন্তরে ত্রাস ও ভীতি সৃষ্টি করা এবং বক্তার নিজ শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে ব্যবহার করা হয়।

আবার কখনো নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি এর আহ্বানকারী তথা নির্দেশদাতাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে রাখা হয়। উক্ত উভয় প্রকারের উদাহরণ হচ্ছে আমীরুল মু'মিনীন স্বয়ং বললেন **أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرٍ** আমীরুল মু'মিনীন তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন অথচ এখানে যাহিরী অবস্থার দাবি মতে **أَنَا أَمْرٌ** বলা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি, উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই।

وَعَلَيْهِ اَى عَلَى وَضِعِ الْمُظْهِرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِتَقْوِيَةِ دَاعِيِ الْمَأْمُورِ مِنْ غَيْرِهِ اَى
 مِنْ غَيْرِ بَابِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ عَلَى لِمَا فِى
 لَفْظِ اللّٰهِ مِنْ تَقْوِيَةِ الدَّاعِيِ اِلَى التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى ذَاتِ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَاتِ
 كَامِلَةٍ مِنَ الْقُدْرَةِ وَغَيْرِهَا اَوْ اِلِسْتِعْطَافِ اَى طَلَبِ الْعَطْفِ وَالرَّحْمَةِ كَقَوْلِهِ شَعَّرَ اِلٰهِي
 عَبْدُكَ الْعَاصِي اَتَاكَ * مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ، لَمْ يَقُلْ اَنَا الْعَاصِي لِمَا فِى لَفْظِ
 عَبْدِكَ مِنَ التَّخَضُّعِ وَاسْتِحْقَاقِ الرَّحْمَةِ وَتَرْقُبِ الشَّفَقَةِ -

অনুবাদ : আর এ অর্থে নির্দেশদাতাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা হয় মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য অধ্যায়েও যেমন- যখন আপনি চূড়ান্ত মনস্থির করেন তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন। এখানে তিনি আমার উপর বলেননি। কেননা, আল্লাহ শব্দটির মধ্যে তাওয়াক্কুলের আহ্বানকারীকে শক্তিশালী করার বিষয়টি রয়েছে। কেননা, এটা দালালত করে পরিপূর্ণ গুণাবলি তথা সর্বময় ক্ষমতা ইত্যাদির অধিকারী সত্তার উপর। অথবা দয়া অনুকম্পা প্রার্থনার উদ্দেশ্য, যেমন তার কবিতা : হে আমার প্রভু! তোমার অপরাধী বান্দা তোমার দরবারে এসেছে অপরাধ স্বীকার করে। আর সে তোমাকে ডাকছে। এখানে اَنَا الْعَاصِي (আমি অপরাধী) বলেননি। কেননা, عَبْد (দাস) শব্দের মধ্যে এ ধরনের বিনয় অনুগ্রহের উপযুক্ত এবং মমতার প্রত্যাশা রয়েছে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لَقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ اَى عَلَى وَضِعِ الخ : লেখক বলেন, নির্দেশদাতাকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কখনো মুসনাদ ইলাইহ ছাড়াও হয়। যেমন- اِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এ আয়াতে উত্তম পুরুষের সর্বনামের স্থলে (اللّٰهُ) প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু এখানে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন। তাই সর্বনাম ব্যবহার করা হচ্ছে সাধারণ রীতি এবং যাহিরী অবস্থার দাবি।

কিন্তু তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও ভরসা করার দাবি আল্লাহ শব্দটির মধ্যে বেশি। কেননা, এ শব্দটি এমন সত্তাকে বুঝায়, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও সবজাঙ্গা ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী যা সর্বনামের মধ্যে অনুপস্থিত।

مَجْرُورٌ -এর حَرْفُ جَرٍّ-এর শব্দটি এখানে মুসনাদ ইলাইহ নয়; বরং এটি

কখনো দয়া, অনুগ্রহ ও রহমত চাওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্যকে ব্যবহার করা হয়, যেমন এ কবিতায়- اِلٰهِي عَبْدُكَ الْعَاصِي اَتَاكَ * مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَقَدْ دَعَاكَ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু তোমার অপরাধী বান্দা অপরাধ স্বীকার করে তোমার কাছে আসছে, আর সে তোমাকে ডাকছে।

কবি নিজে আল্লাহর দরবারে অনুগ্রহ চেয়ে এ কবিতা বলছে, সাধারণ রীতি এবং যাহিরী অবস্থার দাবি অনুসারে এখানে اَنَا الْعَاصِي (সর্বনাম সহকারে) বলা উচিত ছিল, কিন্তু عَبْد শব্দটির মধ্যে বিনয়, অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ততা ও দয়ার কাঙ্গাল ইত্যাদি বিষয় রয়েছে, যা اَنَا-এর মধ্যে নেই।

قَالَ السَّكَائِيُّ هَذَا أَعْنَى نَقْلِ الْكَلَامِ مِنَ الْحِكَايَةِ إِلَى الْغَيْبَةِ غَيْرُ مُحْتَصٍّ بِالمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَلَا التَّنْقُلُ مُطْلَقًا بِهَذَا الْقَدْرِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الْحِكَايَةِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَلَا يَخْلُو الْعِبَارَةُ عَنْ تَسَامُحٍ بَلْ كُلُّ مِنَ التَّكَلُّمِ وَالْخِطَابِ وَالْغَيْبَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ أَوْ غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ كُلُّ مِنْهَا وَارِدًا فِي الْكَلَامِ أَوْ كَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ إِبْرَادُهُ يُنْقَلُ إِلَى الْآخِرِ فَيَصِيرُ الْأَقْسَامُ سِتَّةً حَاصِلَةً مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْإِثْنَيْنِ وَلَفْظُ مُطْلَقًا لَيْسَ فِي عِبَارَةِ السَّكَائِيِّ لِكَيْتِه مُرَادُهُ بِحَسَبِ مَا عَلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِ فِي الْإِلْتِفَاتِ وَبِالنَّظَرِ إِلَى الْأَمْثِلَةِ وَيُسَمَّى هَذَا التَّنْقُلُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَعَانِي الْإِتْفَاتُ مَا خُوِّدَا مِنَ الْإِتْفَاتِ الْإِنْسَانِ مِنْ يَمِينِهِ إِلَى شِمَالِهِ وَيَالْعَكْسِ كَقَوْلِهِ أَيْ قَوْلُ إِمْرٍ الْقَيْسِ ع تَطَاوُلُ لَيْلِكَ خُطَابٌ لِنَفْسِهِ الْإِتْفَاتُ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ لَيْلِي بِالْأَتْمِدِ * يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَضَمَّ الْمِيمِ إِسْمُ مَوْضِعٍ -

অনুবাদ : আল্লামা সাক্কাকী (র.) বলেন, এটি অর্থাৎ বাক্যকে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর করা মুসনাদ ইলাইহের সাথেই খাস নয়। এমনিভাবে রূপান্তরও এতটুকু অর্থাৎ উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের দিকে রূপান্তর-এর সাথেও খাস নয়। এবারত সামান্য ভুল থেকে মুক্ত নয় বরং উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম পুরুষ থেকে সাধারণভাবে চাই মুসনাদ ইলাইহ হোক অথবা অন্য কিছু হোক, বাক্যে এমনটি হোক অথবা যাহিরী অবস্থার দাবি এরূপ হোক, রূপান্তর করা হবে অপর দিকে, ফলে এখন তিনকে দু'য়ের মাঝে গুণ করে ছয় প্রকার পাওয়া গেল। সাক্কাকীর ইবারতে مُطْلَقًا শব্দটি নেই। তবে ইলতিফাতের ক্ষেত্রে তার নীতি (অনুসারে) এবং উদাহরণ অনুসারে এটা তার মায়হাবের অন্তর্ভুক্ত (বলা যায়) এ জাতীয় রূপান্তর ইলমুল মা'আনী বিশারদদের কাছে ইলতিফাত বলে অবিহিত, মানুষের ডান থেকে বামে এবং বাম থেকে ডানে চোখ ঘুরানো থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। যেমন তার অর্থাৎ কবিগুরু ইমরাউল কায়েসের কবিতা : তোমার রাত দীর্ঘ হয়েছে। নিজেকে সন্তোষন করা হয়েছে। এটি ইলতিফাত, কারণ যাহিরী অবস্থার দাবি হচ্ছে لَيْلِكَ-এর স্থানে لَيْلِي হওয়া আছমুদ নামক স্থানে لَا تَمُرْ শব্দটি هَمَزَة যবর মিম পেশ (সহকারে পড়া হবে) একটি স্থানের নাম।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ قَالَ السَّكَائِيُّ الخ : ইতিপূর্বে সর্বনামের স্থানে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করার দু'টি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। একটি হচ্ছে أَنَا أَمْرُكَ-এর স্থানে أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَمْرِكَ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে أَنَا الْعَاصِي-এর স্থানে عَبْدُكَ الْعَاصِي বলা। উভয় উদাহরণে উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা সাধারণ নীতি ছিল। তা পরিহার করত বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বিশেষ্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলত নাম পুরুষের মধ্যে গণ্য।

আল্লামা সাক্কাকী বলেন, বাক্যকে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর করা মুসনাদ ইলাইহের সাথেই খাস নয়; বরং মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর হয়। মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে এরূপ রূপান্তরের উপমা আমরা পূর্বের উদাহরণগুলোতে দেখেছি। অন্য ক্ষেত্রে রূপান্তরের একটি উদাহরণও পবিত্র কুরআনুল কারীমের আয়াত থেকে দেওয়া হয়েছে, فَإِنَّا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ এ উদাহরণে আল্লাহ শব্দটি মুসনাদ ইলাইহ হয়নি।

সাক্কাকী আরো বলেন, রূপান্তরের বিশেষ্যটি কেবল এতটুকু অর্থাৎ উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মুসান্নিফ বলেন, মূল লেখকের ইবারতে সামান্য ভুল রয়েছে। ভুলটি হচ্ছে سَلَبَ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ কোনো বিষয়কে নিজ সত্তা থেকে না-বাচক করা অবশ্যক হয়।

লেখক বলেন **لَا النَّفْلُ بِهَذَا الْفَذْرِ** যার অর্থ হচ্ছে- বাক্যকে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর এতটুকু অর্থাৎ উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর এর সাথে খাস নয়। সুতরাং উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তরকে তার নিজ সত্তা থেকে না-বাচক করা হচ্ছে। এটাকে পরিভাষায় **سَلَبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ** বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, **لَا النَّفْلُ** দ্বারা বিশেষ **نَفْل** উদ্দেশ্য করার কারণে এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। **لَا النَّفْلُ**-এর **نَفْل** শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, এতে উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষে রূপান্তর যেমন রয়েছে, তেমনি এতে অন্যান্য রূপান্তরও রয়েছে। এ উত্তরানুসারে এখন বাক্যের অর্থ এরূপ হবে।

সাধারণ রূপান্তর এই প্রকার (উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষ)-এর সাথে খাস নয়, আর এতে করে **سَلَبُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ** আবশ্যক হলো না। সারকথা হচ্ছে- উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং নাম বা তৃতীয় পুরুষ-এর মধ্য থেকে একটিকে অন্য পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায়, এগুলো মুসনাদ ইলাইহের ক্ষেত্রেও হতে পারে, আবার মুসনাদ ইলাইহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও হতে পারে। যাই হোক মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে অথবা মুসনাদ ইলাইহের বাইরে হোক এর কোনো একটি প্রথমে বাক্যে একভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হওয়া অথবা প্রথমেই প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীতে উপস্থাপন করার নামই হলো ইলতিফাত। মুসান্নিফ বলেন, বাক্য ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে- ১. উত্তম পুরুষ (**مُتَكَلِّم**) ২. মধ্যম পুরুষ (**مُخَاطَب**) ৩. নাম বা তৃতীয় পুরুষ (**غَائِب**) এ তিনটি প্রকারের প্রত্যেকটি অন্য দু'প্রকারে রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব, তিনকে দু' দ্বারা গুণ করার দ্বারা দু' প্রকার বের হয়। নিম্নে প্রকারগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ, ২. উত্তম পুরুষ থেকে নাম পুরুষ, ৩. মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ, ৪. মধ্যম পুরুষ থেকে নাম পুরুষ, ৫. নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ, ৬. নাম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ।

قَوْلُهُ وَلَنْظَرُ مُطْلَقٌ لَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْخ : মুসান্নিফ বলেন, **مُطْلَقًا** যদিও সাক্ষাকীর ইবারতে নেই, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইলতিফাতের ব্যাপারে সাক্ষাকীর মায়হাব এবং তার লিখিত উদাহরণ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, **مُطْلَقًا**-এর **قِيْد** টি তার নিকট ধর্তব্য। কেননা, সাক্ষাকী মুসনাদ ইলাইহ এবং মুসনাদ উভয়ের উদাহরণ পেশ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় এই রূপান্তর মুসনাদ ইলাইহের সাথে খাস নয়; বরং **مُطْلَق**।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাক্ষাকীর মতে প্রথমে ব্যবহৃত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার পরিবর্তন হবে, এটা শর্ত নয়; বরং আগে একবার ব্যবহৃত না হয়ে প্রথমেই প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত ব্যবহার হলে ইলতিফাত হবে।

উল্লিখিত ছয় প্রকার যেহেতু মুসনাদ ইলাইহের এবং মুসনাদ ইলাইহ ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়, অতএব (৬ × ২) ছয়কে দু'দিয়ে গুণন করলে বারো প্রকার হবে। তা ছাড়া (প্রসিদ্ধ মতানুসারে) দ্বিতীয় প্রয়োগ দ্বারা ইলতিফাত হবে। অর্থাৎ বক্তব্যের সূচনা এক ধারাতে হবে, অতঃপর বাক্যের শেষ পর্যন্ত অভিন্ন ধারা বজায় না রেখে **مُفْتَضِّلٌ ظَاهِرٌ**-এর বিপরীত অন্য ধারা প্রয়োগ হলেই ইলতিফাত হবে। অন্য মতে, প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত প্রথম প্রয়োগেই ইলতিফাত হতে পারে। এ দু'প্রকারকে বারো দ্বারা গুণন করলে (১২ × ২ = ২৪) মোট চব্বিশ প্রকারে বিন্যস্ত হবে।

মূল লেখক বলেন, ইলমুল মা'আনী বিশারদগণের মতানুসারে বাক্যের এ ধরনের রূপান্তরকে **الْيَفَات** বলা হয়।

পরিভাষায় ইলতিফাত বলা হয় : **الْيَفَات** অর্থ বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যে বক্তব্যের সর্বনামগত ধারা পরিবর্তন করা, এ অর্থটি নেওয়া হয়েছে মানুষের ডানে-বায়ে অথবা বায়ে-ডানে তাকানো থেকে, সেখানে যেমন ডান থেকে বামে ফিরলে ইলতিফাত হয় এখানেও তেমনি এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থা ধারণ করলে ইতিফাত হয়।

সাক্ষাকীর মতানুসারে ইলতিফাতের উদাহরণ হচ্ছে কবিগুরু ইমরাউল কায়েসের এই কবিতা **تَطَاوُلَ لَيْلِكَ يَا لَيْلِكَ** (আছমুদ নামক স্থানে তোমার রাত সুদীর্ঘ হয়েছে) কবি তার কবিতায় নিজেকে সম্বোধন করেছেন। অতএব, বাহ্যিক অবস্থার দাবি মতে এখানে **لَيْلِي** (উত্তম পুরুষের সাথে) ব্যবহার হওয়ার দরকার ছিল, তা না করে **مُفْتَضِّلٌ ظَاهِرٌ**-এর বিপরীত কবি নিজেকে মধ্যম পুরুষের স্থানে রেখে সম্বোধন করেছেন ইলতিফাত হিসেবে। পুরো কবিতাটিই হলো-

تَطَاوُلَ لَيْلِكَ يَا لَيْلِكَ * وَتَامَ الْخَلَى وَلَمْ تَرْقُدْ + وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ * كَلْبَلَةً ذِي الْعَائِرِ الْأَرْمَدِ
وَذَلِكَ مِنْ نَبَأِ جَانِي * وَخَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ

এ কবিতা কবি ইমরাউল কায়েস আছমুদ নামক স্থানে তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকগাথারূপে রচনা করেছিলেন।

পুরো কবিতার অর্থ : হে আমার মন! তোমার রাত্রি আছমুদ নামক স্থানে সুদীর্ঘ হয়েছে, যে ব্যক্তি দুঃখ-বেদনহীন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ তুমি ওইলে না। তুমি রাত কাটিয়ে দিলে, আর রাত সেও অতিবাহিত হলো তবে রাত পার হলো (এতটা কষ্ট ও যাতনার সাথে) যেমন চোখের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রাত অতিবাহিত হয়। এ রাত জাগা ও কষ্ট-যাতনা এ সংবাদের কারণে যা আমার কাছে এসেছে। আমাকে আবুল আসওয়াদের মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْإِلْتِفَاتَ هُوَ التَّغْيِيرُ عَنْ مَعْنَى بِطَرِيقٍ مِنَ الطَّرِيقِ الثَّلَاثَةِ أَيْ
التَّكْلُمُ وَالْخِطَابُ وَالْغَيْبَةُ بَعْدَ التَّغْيِيرِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِآخَرٍ أَيْ بِطَرِيقٍ آخَرَ
مِنَ الطَّرِيقِ الثَّلَاثَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ التَّغْيِيرُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ مَا تَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ
وَيَتَرَقَّبُهُ السَّامِعُ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ لِيُخْرَجَ مِثْلُ قَوْلِنَا أَنَا زَيْدٌ وَأَنْتَ عَمْرُو وَعَنْ
اللُّذُونِ صَبَحُوا الصَّبَاحَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَاهِدِنَا وَأَنْعَمْتَ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ
إِنَّمَا هُوَ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْبَاقِيَ جَارٍ عَلَى أَسْلُوبِهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ فِي مِثْلِ يَأْيُهَا الَّذِينَ
أَمْنُوا إِلْتِفَاتًا وَالْقِيَّاسُ أَمْنْتُمْ فَقَدْ سَهَا عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ كُتُبُ التَّحْوِ -

অনুবাদ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে ইলতিফাত বলা হয় তিন পদ্ধতি যথা উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষ
এর কোনো এক পদ্ধতিতে বাক্য উপস্থাপন করা এই অর্থটিকেই অন্য পদ্ধতিতে ব্যক্ত করার পর। এই
শর্তসাপেক্ষে যে, দ্বিতীয় উক্ত তিন পদ্ধতির প্রয়োগটি ظَاهِرُ مُقْتَضَى এবং শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হবে। এ
কয়েদটি যুক্ত করা আবশ্যিক যাতে আমাদের উক্তি أَنَا زَيْدٌ وَأَنْتَ عَمْرُو এবং

কবিতা : أَنَعَمْتَ. اهْدِنَا. إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এবং কুরআনের আয়াত نَحْنُ اللَّذُونَ صَبَحُوا الصَّبَاحَ থেকে বের হয়ে যায়। কেননা, ইলতিফাত হয়েছে শুধুমাত্র إِيَّاكَ نَعْبُدُ-এর মধ্যে এরপর অবশিষ্ট বাক্যগুলো সে
(অভিন্ন) ধারাতেই চলেছে, আর যারা মনে করেন الَّذِينَ أَمْنُوا-এ ইলতিফাত হয়েছে, কেননা, যুক্তি
অনুসারে أَمْنْتُمْ হওয়া দরকার তারা ব্যাকরণশাস্ত্রের কিতাবসমূহের সাক্ষ্য মতে সুস্পষ্ট ভুল করেছেন।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْإِلْتِفَاتَ الخ : ইলতিফাতের সংজ্ঞাতে দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। এর একটি হচ্ছে মিসফতাহ
গ্রন্থের কালজয়ী লেখক আল্লামা আবু ইউসুফ ইয়া'কুব সাক্কাকী। আর অপর মতটি হচ্ছে অধিকাংশ বা (জমহুর) বালাগাত
বিশারদগণের। মূল লেখক الْمَشْهُورُ বলে জমহুরের বর্ণিত সংজ্ঞাটি উপস্থাপন করছেন।

তাদের সংজ্ঞাটি হচ্ছে বাক্যের সূচনাতে- উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও নাম (তৃতীয়) পুরুষ-এর যে কোনো একটি দ্বারা
কথা উপস্থাপন করত প্রকাশ্য অবস্থার দাবি এবং শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত ভিন্নভাবে ও ধারাতে কথাকে প্রকাশ করা।
অতএব, এ দু'টি সংজ্ঞাতে স্পষ্টত বিরোধ হয়ে গেল। সাক্কাকী (র.)-এর সংজ্ঞানুসারে প্রথমে এভাবে কথা উপস্থাপন করা
জরুরি নয়; বরং একটি মাত্র প্রয়োগ দ্বারা ইলতিফাত হতে পারে। পক্ষান্তরে জমহুরের মতে সূচনাতে একভাবে কথা
উপস্থাপন করা এবং এরপর ভিন্ন ধারাতে উপস্থাপন হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি কোনো বাক্যতে প্রথমেই ভিন্ন ধারায় বাক্য
ব্যবহার হয়, তাহলে সাক্কাকীর মতে এটি ইলতিফাত; কিন্তু জমহুরের মতে এটা ইলতিফাত নয়।

قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ : মুসান্নিফ বলেন, বাক্যের দ্বিতীয় প্রয়োগটি বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীত হওয়া
আবশ্যিক। আর এ কয়েদটির কারণে অনেক বাক্য ইলতিফাতের আওতার বাইরে চলে যাবে, যেমন- أَنَا زَيْدٌ-এর মধ্যে
উত্তম পুরুষ (أَنَا) থেকে (زَيْدٌ) তৃতীয় পুরুষের দিকে এবং أَنْتَ عَمْرُو-এর মধ্যে মধ্যম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ
(عَمْرُو) এ দিকে কথাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, এরপরেও তা ইলতিফাত নয়। কেননা, বাক্যদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রয়োগটি এমন যা
প্রকাশ্য অবস্থার দাবি মোতাবেক হয়েছে এবং শ্রোতাও এমনটি আশা করছিল। কেননা, নিয়ম হচ্ছে এই যে, যদি মুবতাদা
সর্বনাম হয়, তাহলে তার খবর প্রকাশ্য বিশেষ্য আনা হবে। অতএব, বক্তা যখন أَنَا অথবা أَنْتَ বলল, তখন শ্রোতা ধারণা
করবে যে, এরপর প্রকাশ্য বিশেষ্যই আনা হচ্ছে। অতএব, উত্তম পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষের সর্বনামের পর প্রকাশ্য বিশেষ্য
আনাই বাহ্যিক অবস্থার দাবি- এটা কিছুতেই বাহ্যিক অবস্থার দাবির এবং শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কিছু নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উদাহরণ দু'টিতে শর্ত (বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীত) না পাওয়া যাওয়াতে এখানে ইলতিফাত হয়নি। এমনভাবে উল্লিখিত কয়েকটির কারণে نَحْنُ اللَّذَوْنُ صَبَحُوا الصَّبَاحَ কবিতাটিতে ইলতিফাত হয়নি, যদিও দেখা যাচ্ছে উত্তম পুরুষ প্রথমে নিজেদের نَحْنُ সর্বনাম দ্বারা ব্যক্ত করেছে, এরপর وَاللَّذَوْنُ তৃতীয় পুরুষ দ্বারা নিজেদের উপস্থাপন করেছে। এর কারণ হচ্ছে نَحْنُ (উত্তম পুরুষের) পর নাম পুরুষ আসাটাই হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থার দাবি এবং শ্রোতার আশাও এরূপই। অতএব, ইলতিফাতের শর্ত না পাওয়া যাওয়াতে ইলতিফাত হয়নি। কবিতার অর্থ- আমরা তারাই যারা يَوْمَ النَّخِيلِ-এ আক্রমণ করত প্রভাত করেছে। মুসান্নিফ বলেন, এ কয়েকটির কারণে اِنْعَمْتَ اِيَّاكَ تَعْبُدُ . اِهْدِنَا . اِنْعَمْتَ (তৃতীয় পুরুষ) থেকে اِيَّاكَ تَعْبُدُ (মধ্যম পুরুষ)-এর রূপান্তরের মধ্যে অবশ্যই ইলতিফাত হয়েছে, কিন্তু اِيَّاكَ تَسْتَعِينُ . اِهْدِنَا . اِنْعَمْتَ যেহেতু তাদের পূর্ববর্তী প্রয়োগ اِيَّاكَ-এর অনুরূপ হয়েছে, তাই এতে নিঃসন্দেহে ইলতিফাত হয়নি।

মুসান্নিফ বলেন, কতিপয় লোক মনে করেন উল্লিখিত আয়াত এবং এর অনুরূপ সকল আয়াতে ইলতিফাত হয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে اَلَّذِينَ এখানে مُنَادَى (যাকে ডাকা হয়) হওয়ার কারণে মধ্যম পুরুষের মধ্যে গণ্য। এরপর ফে'লটি নাম পুরুষের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ যুক্তি অনুসারে اِنْعَمْتَ হওয়া সমীচীন ছিল। অতএব, বাক্যের সর্বনামগত ধারা পরিবর্তন হয়েছে এবং তা বাহ্যিক অবস্থার দাবির বিপরীত হয়েছে, তাই নিঃসন্দেহে এটা ইলতিফাত। তাদের যুক্তির জবাবে মুসান্নিফ বলেন, তাদের দাবি ও দলিল ব্যাকরণশাস্ত্রের কিতাবাদির বক্তব্য অনুসারে ভুল এবং অগ্রহণযোগ্য। কিতাবের বক্তব্য হচ্ছে মাউসূল اِسْمُ تَامٍ (পূর্ণাঙ্গ বিশেষ্য) নয়। এটা তার صَلَة সহকারে পূর্ণাঙ্গ হয়। অতএব, যদি ইসমে মাউসূল মুনাদা হয়, তাহলে তা পূর্ণ হওয়ার আগে উত্তম পুরুষ হবে না; বরং তৃতীয় পুরুষের স্থানে হবে, পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর তা মধ্যম পুরুষের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং اَلَّذِينَ اِيَّاكَ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ مُنَادَى এ কারণে পুরোটাই হচ্ছে মধ্যম পুরুষ। এরপর اِذَا قُتِبْتُمْ (শেষ হওয়ার পর) আবারও মধ্যম পুরুষ। অতএব, ইলতিফাত হলো না।

তবে اَلَّذِينَ-এর পূর্বে اِنْعَمْتَ-এর পূর্বে مُنَادَى যেহেতু পূর্ণাঙ্গ নয়, তাই উহা তৃতীয় পুরুষের মধ্যে গণ্য, اَلَّذِينَ যেহেতু তৃতীয় পুরুষের মধ্যে গণ্য। অতএব, তার পরের শব্দ (ক্রিয়া) اِنْعَمْتَ সে মতে তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, আর اِنْعَمْتَ যেহেতু তার পূর্ববর্তী শব্দের অবলম্বনে তৃতীয় পুরুষরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটা ইলতিফাতের মধ্যে গণ্য হবে না।

وَهَذَا أَيْ الْإِلْتِفَاتُ بِتَفْسِيرِ الْجُمْهُورِ أَخَصُّ مِنْهُ بِتَفْسِيرِ السَّكَائِنِ لِأَنَّ النُّقْلَ عِنْدَهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَبَّرَ عَنْ مَعْنَى بِطَرِيقٍ مِنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ بِطَرِيقٍ أُخْرَى أَوْ يَكُونَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنْ يُعْبَّرَ عَنْهُ بِطَرِيقٍ مِنْهَا فَتُرِكَ وَعُدِلَ عَنْهَا إِلَى طَرِيقٍ أُخْرَى فَيَتَحَقَّقُ الْإِلْتِفَاتُ عِنْدَهُ بِتَغْيِيرٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ الْإِلْتِفَاتِ عِنْدَهُمُ الْإِلْتِفَاتُ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ كَمَا فِي تَطَاوُلِ لَيْلِكَ مِثَالُ الْإِلْتِفَاتِ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْخِطَابِ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَرْجَعُ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمُرَادَ مَالَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ لَكِنْ لَمَّا عَبَّرَ عَنْهُمْ بِطَرِيقِ التَّكَلُّمِ كَانَ مُقْتَضَى ظَاهِرِ السُّوقِ إِجْرَاءً بَاقِيَ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَعُدِلَ عَنْهُ إِلَى طَرِيقِ الْخِطَابِ فَيَكُونُ الْإِلْتِفَاتُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ وَمِثَالُ الْإِلْتِفَاتِ مِنَ التَّكَلُّمِ إِلَى الْغَيْبَةِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ لَنَا -

অনুবাদ : আর এটা অর্থাৎ এ ইলতিফাত জমহুর বালাগাত বিশারদগণের ব্যাখ্যানুসারে সাক্ষাকীর সংজ্ঞা থেকে বেশি খাস, অর্থাৎ সন্ধীর্ণ। কেননা, সাক্ষাকীর মতে, রূপান্তরের বিষয়টি ব্যাপক, তার মতে কোনো বাক্যে একটি বিষয় তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতির সাহায্যে বর্ণনা করার পর ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে বর্ণনা করা (ইলতিফাত)। অথবা কোনো বিষয় প্রকাশ্য অবস্থার দাবি মতে একভাবে বর্ণনা করা উচিত। সেটা বাদ দিয়ে অন্য পদ্ধতিতে বর্ণনা করাও ইলতিফাত। অতএব, জমহুরের মতে যা ইলতিফাত তা সাক্ষাকীর মতেও ইলতিফাত, কিন্তু তার বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ সাক্ষাকীর মতে যা ইলতিফাত-এর সব জমহুরের মতে ইলতিফাত নয়। (মোটকথা, জমহুরের মতে ইলতিফাতের জন্য সূচনাতে এক ধরনের উপস্থাপন করে পরে ভিন্ন ধারায় উপস্থাপন করা, আর সাক্ষাকী মতে একবার উপস্থাপনেই ইলতিফাত হওয়া সম্ভব।)

উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে রূপান্তরে যে ইলতিফাত হয় তার উদাহরণ হচ্ছে وَمَالِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন কেন আমি তার ইবাদত করবো না, অথচ তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে। এখানে প্রকাশ্য অবস্থার দাবি অনুসারে وَإِلَيْهِ أَرْجَعُ হওয়া উচিত ছিল (এর পরিবর্তে এখানে تُرْجَعُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, এখানে উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষের দিকে ইলতিফাত হলো) এ ব্যাপারে সঠিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, বাক্যটি মূলত এমন ছিল لَا تَعْبُدُونَ (কেননা, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ঈমানের দাওয়াতে পৌঁছানো; কিন্তু এভাবে বললে তাদের মাঝে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলে নিজেই সন্দেহ করে বলা হয়েছে) কিন্তু যখন উত্তম পুরুষের পরিবর্তন করা হলো, তখন প্রকাশ্য অবস্থার দাবি অনুসারে বাক্যের অবশিষ্টাংশ একই ধারাতে বর্ণনা হওয়া উচিত ছিল। অতঃপর সেই ধারা থেকে মধ্যম পুরুষের ধারার দিকে যাওয়া। অতএব, এটি উভয় (সাক্ষাকীর ও জমহুর)-এর মাযহাব অনুসারে ইলতিফাত হবে। আর উত্তম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষের ইলতিফাত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি সুতরাং আপনার প্রভুর জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সূচনাতে নিজেকে উত্তম পুরুষ রূপে (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ) উপস্থাপন করেছেন, এরপর আবার মধ্যম পুরুষরূপে (لِرَبِّكَ) নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

وَمِثَالُ الْإِنْفَاتِ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ قَوْلُ الشَّاعِرِ شَعْرٌ طَحَا بِكَ قَلْبٌ أَى ذَهَبَ بِكَ
 فِى الْحِسَانِ طُرُوبٌ وَمَعْنَى طُرُوبٌ فِى الْحِسَانِ أَنَّ لَهُ طَرِبًا فِى طَلَبِ الْحِسَانِ وَنَشَاطًا فِى
 مُرَاوَدَتِهَا بُعِيدَ الشَّبَابِ تَصْغِيرٌ بَعْدَ الْقُرْبِ أَى حِينَ وَلَّى الشَّبَابُ وَكَادَ يَنْصَرِمُ عَصَرَ ظَرْفٍ
 مُضَافٌ إِلَى الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ أَغْنَى قَوْلُهُ حَانَ أَى قَرُبَ مَشِيبٌ يُكَلِّفُنِى لَيْلَى فِىهِ إِنْفَاتٌ
 مِنَ الْخِطَابِ فِى بِكَ إِلَى التَّكَلُّمِ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ يُكَلِّفُكَ وَقَاعِلُ يُكَلِّفُنِى ضَمِيرٌ لِلْقَلْبِ
 وَلَيْلَى مَفْعُولُهُ الثَّانِى وَالْمَعْنَى يُطَالِبُنِى الْقَلْبُ بِوَضَلٍ لَيْلَى وَرُوى تُكَلِّفُنِى بِالنَّاءِ
 الْفُوقَانِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَى لَيْلَى وَالْمَفْعُولُ الثَّانِى مَحْذُوفٌ أَى شَدَائِدُ فِرَاقِهَا أَوْ عَلَى
 أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَلْبِ فَيَكُونُ إِنْفَاتًا آخَرَ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ وَقَدْ شَطَّ أَى بَعُدَ وَلَيْهَا أَى
 قُرْبُهَا وَعَادَتْ عَوَادٍ بَيْنَنَا وَخُطُوبٌ قَالَ الْمَرْزُوقِى عَادَتْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَتٌ مِنَ الْمَعَادَةِ
 كَأَنَّ الصَّوَارِفَ وَالْخُطُوبَ صَارَتْ تُعَادِيهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَادَ يَعُودُ أَى عَادَتْ عَوَادٍ
 وَعَوَائِقُ كَانَتْ تَحُولُ بَيْنَنَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلُ -

অনুবাদ : মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের দিকে ইলতিফাতের উদাহরণ হচ্ছে, কবির কবিতা طَحَا بِكَ
 فِى الْحِسَانِ طُرُوبٌ অর্থাৎ হে আমার আত্মা! তোমাকে সুন্দরী নারীর আসক্তকারী হৃদয় ধ্বংস করে দিচ্ছে।
 طَحَا بِكَ অর্থ- নিয়ে যাওয়া, ধ্বংস করা ইত্যাদি। فِى الْحِسَانِ অর্থ হচ্ছে- সুন্দরী নারীদের খোঁজে আসক্ত
 এবং নারীদের বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ, যৌবন শেষ হওয়ার কিছুকাল পরে। بُعِيدَ শব্দটি بَعْدَ-এর
 নিকট দূর বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যখন যৌবন পিঠ দেখাল এবং বৃদ্ধ হতে লাগল এমন
 সময় (عَصَرَ) এটি যরফ, ক্রিয়াবাচক বাক্যের প্রতি মুযাফ হয়েছে অর্থাৎ (বাক্যটি হচ্ছে) তার বাক্য حَانَ অর্থ-
 নিকটবর্তী হলো বার্ষিক্যে, সেই অন্তর আমাকে লায়লার ব্যাপারে কষ্ট দিচ্ছে। এতে মধ্যম পুরুষ (بِكَ) থেকে
 উত্তম পুরুষ (يُكَلِّفُنِى)-এর প্রতি ইলতিফাত হয়েছে। বাহ্যিক বা প্রকাশ্য অবস্থার দাবি হচ্ছে
 يُكَلِّفُنِى-এর ফায়েল হচ্ছে সর্বনাম, যা অন্তরের জন্য লَيْلَى হচ্ছে দ্বিতীয় মাফউল। অর্থ অন্তর আমাকে লায়লার
 মিলনে উদ্বুদ্ধ করছে। অন্য বর্ণনায় تُكَلِّفُنِى রয়েছে (আলামতে মুযারে -ع-এর সাথে) তখন এটি লায়লার মুসনাদ
 হবে (এবং লায়লা তার ফায়েল) তখন দ্বিতীয় মাফউল উহা থাকবে (তা হচ্ছে) شَدَائِدُ فِرَاقِهَا (তার বিরহের ব্যথা
 ও কষ্ট)। অথবা تُكَلِّفُنِى-এর (ইসনাদও) সম্বোধন হবে অন্তরের দিকে তখন আরেকটি ইলতিফাত হচ্ছে তৃতীয়
 পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষের দিকে। (কেমনা ইতঃপূর্বে قَلْب (অন্তর) নাম পুরুষ ছিল এখন তা মধ্যম পুরুষ পড়া
 হচ্ছে) অথচ তার নৈকট্য দূরবর্তী আর আমাদের মাঝে বিপদাপদ এবং প্রতিবন্ধক ফিরে এসেছে।
 অভিধানশাস্ত্রের ইমাম মারযুকী বলেন, عَادَتْ ফে'লটি مَعَادَةٌ-এর مُعَادَةٌ থেকে নির্গত হতে পারে, (যার অর্থ
 শত্রুতা পোষণ করা) যেন প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদাপদ তার সাথে শত্রুতা পোষণ করছে, আবার (عَادَتْ) ফে'লটি
 (بَابُ نَصْرٍ) থেকেও হওয়া সম্ভব। তখন অর্থ হবে আমাদের মাঝে বিপদাপদ ও প্রতিবন্ধকার দেয়াল
 ফিরে এসেছে, যেমন এটি পূর্বে ছিল।

وَمِثَالُ الْإِنْتِفَاتِ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرْنَكُمْ بِهِمْ وَأَلْقَيْتُمْ بِكُمْ وَمِثَالُ الْإِنْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفْنَاهُ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ سَأَلَهُ أَيْ سَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ السَّحَابَ وَأَجْرَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ وَمِثَالُ الْإِنْتِفَاتِ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخِطَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ إِيَّاهُ وَوَجْهَهُ أَيْ وَجْهَهُ حُسْنِ الْإِنْتِفَاتِ أَنَّ الْكَلَامَ إِذَا نُقِلَ مِنْ أَسْلُوبٍ إِلَى أُسْلُوبٍ كَانَ ذَلِكَ الْكَلَامَ أَحْسَنَ تَظْرِئَةً أَيْ تَجْدِيدًا أَوْ إِحْدَاثًا مِنْ طَرِيقِ الثُّبُوتِ لِنَشَاطِ السَّامِعِ وَكَانَ أَكْثَرُ إِنْقِطَاعًا لِلِإِضْغَاءِ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى ذَلِكَ الْكَلَامِ لِأَنَّ لِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةً وَهَذَا وَجْهٌ حُسْنِ الْإِنْتِفَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ -

অনুবাদ : মধ্যম পুরুষ থেকে নাম তৃতীয় পুরুষের ইলতিফাতের উদাহরণ হচ্ছে- মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী (তিনি ঐ সত্তা হُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرْنَكُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ যিনি তোমাদের স্থলে ও জলে পরিভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌযানে অবস্থান কর আর নৌযান উত্তম বায়ুপ্রবাহে তাদের নিয়ে ভেসে চলে) সাধারণ নীতি অনুসারে (ও প্রকাশ্য অবস্থার দাবি মতে) بِكُمْ হওয়া দরকার ছিল (কেননা, বাক্যের সূচনাতে بِكُمْ ছিল), আর নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের ইলতিফাত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفْنَاهُ (আল্লাহ তা'আলা সেই সত্তা, যিনি বাতাস প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তা মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অনন্তর আমরা তাকে এক মৃত নগরীতে উপনীত করলাম।) (এখানে وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ এই সূচনাংশে নাম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে, এরপর উত্তম পুরুষের দিকে রূপান্তরিত হয়েছে।) প্রকাশ্য অবস্থার দাবিতে اللَّهُ سَأَلَهُ হওয়া দরকার ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে মেঘমালাকে হাঁকিয়ে এবং ভাসিয়ে মৃত নগরীর দিকে নিয়ে গেছেন। নাম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষের দিকে ইলতিফাত হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ (তিনি প্রতিদান দিনের মালিক; আমরা তোমারই ইবাদত করি।) আয়াতের يَوْمَ الدِّينِ অংশে আল্লাহ তা'আলা নাম পুরুষ কিন্তু إِيَّاكَ نَعْبُدُ অংশে মধ্যম পুরুষ) এখানে বাহ্যিক অবস্থার দাবি মতে إِيَّاهُ হবে। ইলতিফাতের সৌন্দর্যের দিক হচ্ছে বাক্যকে যখন এক রীতি বা ধারা থেকে অন্য রীতিতে রূপান্তরিত করা হয়, তখন সে বাক্যটিতে বৈচিত্র্য এবং নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। এটা করা হয় শ্রোতার মনসংযোগের জন্য, আর তা শ্রোতার বাক্যটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অধিক সতর্ককারী। কেননা, প্রত্যেক নতুনত্বে ভিন্ন স্বাদ রয়েছে। আর উপরোক্ত কারণটি হচ্ছে ইলতিফাতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এ ছাড়া স্থানগত ও পূর্বপরের ভিত্তিতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলিও রয়েছে।

وَقَدْ يُخْتَصُّ مَوَاقِعُهُ بِلَطَائِفٍ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الْعَامِ كَمَا فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ عَنْ قَلْبٍ حَاضِرٍ يَجِدُ ذَلِكَ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ مُحَرِّكَاً لِلْإِقْبَالِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِيقِ بِالْحَمْدِ وَكُلَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِ صِفَةٌ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْعِظَامِ قَوَّى ذَلِكَ الْمُحَرِّكَ أَنْ يُوَلِّ الْأَمْرُ إِلَى خَاتِمَتِهَا أَيْ خَاتِمَةِ تِلْكَ الصِّفَاتِ يَغْنِي مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ الْمُفِيدَةُ أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ مَالِكُ الْأَمْرِ كُلِّهِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ لِأَنَّهُ أُضِيفَ مَالِكُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ عَلَى طَرِيقِ الْإِتْسَاعِ وَالْمَعْنَى عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ مَالِكُ فِي يَوْمِ الدِّينِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ دَلَالَةٌ عَلَى التَّعْنِيْمِ فَجِنْتِذِ بُوْجِبُ ذَلِكَ الْمُحَرِّكَ لِتَنَاهِيهِ فِي الْقُوَّةِ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ أَيْ إِقْبَالَ الْعَبْدِ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِيقِ بِالْحَمْدِ وَالْخِطَابَ بِتَخْصِيصِهِ بِغَايَةِ الْخُضُوعِ وَالْإِسْتِعَانَةِ فِي الْمِهْمَاتِ قَالِبَاءُ فِي بِتَخْصِيصِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْخِطَابِ يُقَالُ خَاطَبْتَهُ بِالْدَّعَاءِ إِذَا دَعَوْتَ لَهُ مُوَاجَهَةً وَغَايَةُ الْخُضُوعِ هُوَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَعُمُومُ الْمِهْمَاتِ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَذْفِ مَفْعُولٍ نَسْتَعِينُ وَالتَّخْصِيصُ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ فَالْلَطِيفَةُ الْمُخْتَصُّ بِهَا مَوْقِعٌ هَذَا الْإِنْتِفَاتِ هِيَ أَنَّ فِيهِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخَذَ فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قِرَاءَتُهُ عَلَى وَجْهِ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ الْمُحَرِّكَ الْمَذْكُورَ -

অনুবাদ : উক্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি ছাড়া ইলতিফাতের ক্ষেত্রেগুলো অন্যান্য অনেক চমৎকার বিষয়াবলির সাথে যুক্ত হয়। যেমনটি হয়েছে সূরা তুল ফাতেহাতে। বান্দা যখন যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র উপযুক্তকে (মহান আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলির কথা) স্মরণ করে প্রশংসা করে এবং الحمد বলে তখন সে বান্দা তার অন্তরে সেই পরম সত্তার যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত রবের অভিমুখী হওয়ার একটি অনুপ্রেরণা বোধ করে, এরপর যখন সেসব গুণাবলির তথ্য رَّبِّ الْعَالَمِينَ তথা জগতের প্রতিপালক, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তথা পরমদাতা দয়ালু। তার উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন (তার অন্তরে) সে অনুপ্রেরণা আরো জোরদার গতিময় হয়। এমনকি তা সেসব গুণাবলির পরিশিষ্ট তথ্য مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে, যা এই অর্থ করে যে, আসলেই তিনি প্রশংসার উপযুক্ত। প্রতিদান দিবসেও সব বিষয়ের মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি। (সব বিষয় বা ظَرْفِ তার মুযাফ ইলাইহের হবে) কারণ, مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে طرف-এর ক্ষেত্রের উদারতার ভিত্তিতে। (يَوْمَ الدِّينِ)-এর অর্থ কালের ও সময়ের হবে। অর্থাৎ مَالِكِ يَوْمَ الدِّিনِ তথা তিনি প্রতিদান দিবসের অধিপতি হবে। এর মাফউল ব্যাপকতার অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে উহ্য আছে। সেই অনুপ্রেরণা এতটা শক্তিশালী হয় যে, তা তার রবের প্রতি তার অভিমুখী হওয়াকে ওয়াজিব করে অর্থাৎ বান্দা যেন তার প্রতিপালকের চূড়ান্ত সান্নিধ্যে চলে যায় এবং তা ওয়াজিব করে চরম বিনয় এবং আনুগতপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে, বিশেষভাবে সম্বোধন করাকে (অর্থাৎ বান্দা যখন এই পৃথিবী এবং পরকালে সব বিষয়ে তার রবের মুখাপেক্ষী জীবন-মৃত্যু ও হাশর-নাশরসহ সকল কঠিন সময়ে তার কাছেই সাহায্য চায় এবং বন্দেগি নিবেদন করে) بِتَخْصِيصِهِ-এর خطَابِ টি বা, এর সাথে متعلق হবে, (এভাবে ব্যবহার হয়) বলা হয় خَاطَبْتَهُ بِالْدَّعَاءِ তথা যখন তুমি তাকে মুখোমুখি ডেকে ছ।

ইবাদতের অর্থ হচ্ছে চূড়ান্ত বিনয়। সবগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ অর্থটি نَسْتَعِينُ-এর মাফউল উহ্য রাখার দ্বারা পাওয়া গেছে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও তাঁর ইবাদতের অর্থটি মাফউল (إِيَّائِي)-কে অগ্রবর্তী করার দ্বারা হাসিল হয়েছে। এখানে যে (নাম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষের দিকে) ইলতিফাত হয়েছে তার চমৎকার সৌন্দর্যটি হচ্ছে বান্দা যখন (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত শুরু করবে, তখন তার তিলাওয়াত এমন হওয়া আবশ্যক যার দ্বারা তার অন্তরে সেই বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করে।

وَلَمَّا انْجَرَّ الْكَلَامُ إِلَى خِلَافِ مُفْتَضَى الظَّاهِرِ أَوْرَدَ عِدَّةَ أَقْسَامٍ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَقَالَ وَمِنْ خِلَافِ الْمُفْتَضَى أَيْ مُفْتَضَى الظَّاهِرِ تَلَقَّى الْمُخَاطَبُ إِضَافَةَ الْمَضَدِّ إِلَى الْمَفْعُولِ أَيْ تَلَقَّى الْمُتَكَلِّمُ الْمُخَاطَبَ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ الْمُخَاطَبُ وَالْبَاءُ فِي بَغَيْرٍ لِلتَّعْدِيدِ وَفِي يَحْمِلُ كَلَامِهِ لِلْسَّبَبِيَّةِ أَيْ إِنَّمَا تَلَقَّاهُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ بِسَبَبِ أَنَّهُ حَمَلَ كَلَامَهُ أَيْ الْكَلَامَ الصَّادِرَ عَنِ الْمُخَاطَبِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ أَيْ مُرَادِ الْمُخَاطَبِ وَإِنَّمَا حَمَلَ كَلَامَهُ عَلَى خِلَافِ مُرَادِهِ تَنْبِيْهَا لِلْمُخَاطَبِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْأَوَّلَى بِالنَّقْصِ وَالْإِرَادَةِ كَقَوْلِ الْقَبْعَثَرِيِّ لِلْحَجَّاجِ وَقَدْ قَالَ الْحَجَّاجُ لَهُ أَيْ لِلْقَبْعَثَرِيِّ حَالُ كَوْنِ الْحَجَّاجِ مُتَوَعِّدًا إِيَّاهُ لِأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَذْهِمِ يَعْنِي الْقَيْدَ هَذَا مَقُولُ قَوْلِ الْحَجَّاجِ مِثْلُ الْأَمِيرِ يُحْمَلُ عَلَى الْأَذْهِمِ وَالْأَشْهَبِ هَذَا مَقُولُ قَوْلِ الْقَبْعَثَرِيِّ فَأَبْرَزَ وَعَيْنُ الْحَجَّاجِ فِي مَغْرَضِ الْوَعْدِ وَتَلَقَّاهُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُ بِأَنَّ حَمَلَ الْأَذْهِمِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْفَرَسِ الْأَذْهِمِ أَيْ الَّذِي غَلَبَ سَوَادُهُ حَتَّى ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَضَمَّ إِلَيْهِ الْأَشْهَبُ أَيْ الَّذِي غَلَبَ بَيَاضُهُ وَمُرَادُ الْحَجَّاجِ إِنَّمَا هُوَ الْقَيْدُ فَتَنَّبَهُ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْفَرَسِ الْأَذْهِمِ هُوَ الْأَوَّلَى بِأَنَّ يَقْصُدَهُ الْأَمِيرُ أَيْ مَنْ كَانَ مِثْلُ الْأَمِيرِ فِي السُّلْطَانِ أَيْ الْغَلْبَةِ وَسَطَّةِ الْيَدِ أَيْ الْكَرَمِ وَالْمَالِ وَالنِّعْمَةِ فَجَدِيرٌ بِأَنْ يَصْفِدَ أَيْ يُعْطَى مِنْ أَصْفَدِهِ لَا أَنْ يَصْفِدَ أَيْ يَقْبِذَهُ مِنْ صَفْدِهِ -

অনুবাদ : প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত বিষয়াদির আলোচনা যখন এসেই গেছে, তখন লেখক এর কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করেছেন, যদিও সেগুলো মুসনাদ ইলাইহের প্রকার নয়; সুতরাং তিনি বলেছেন, প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত এর একটি প্রকার হচ্ছে শ্রোতার সামনে উপস্থাপনা করা (تَلَقَّى الْمُخَاطَبُ) এতে মাসদারের সম্বন্ধ করা হয়েছে মাফউলের দিকে অর্থাৎ বক্তা শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করা এমন বিষয় যার বিপরীত কিছুই সে অপেক্ষা করছিল। -بَغَيْرِ-এর -بَاء- হচ্ছে লায়িমকে মুতা'আদী করার, -يَحْمِلُ كَلَامِهِ-এর -بَاء- হচ্ছে সবরের জন্য। অর্থাৎ তার অপেক্ষা আশার বিপরীত কথা তার সামনে উপস্থাপন করেছে, তার কথা অর্থাৎ শ্রোতার পক্ষ থেকে যে কথা প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীতে শ্রোতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করার কারণে, আর কথাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীতে গ্রহণ করেছে, শ্রোতাকে এ ব্যাপারে সচেতন করার জন্যে যে, এই বিপরীত বিষয়টি ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য করার জন্য অধিক উপযোগী। যেমনটি কাবা'ছারীর কথা যা সে হাজ্জাজকে বলেছিল, হাজ্জাজ তার অর্থাৎ কাবা'ছারীর উপর চোখ রাঙ্গিয়ে তাকে বলেছিল, তোমাকে আমি অবশ্যই জেলে শেকলে চড়াবো (অর্থাৎ শেকলে বেঁধে শাস্তি দিবো)। أَذْهِم শব্দটির অর্থ লোহার শেকল (এর উত্তরে কাবা'ছারী বলল) আপনার মতো মহৎ হৃদয় বাদশাহ أَذْهِم এবং أَشْهَب যে কোনো ঘোড়ায় চড়াতে সক্ষম এটি কাবা'ছারীর উক্তি, অতএব, তিনি হাজ্জাজের ধমকটিকে অঙ্গীকাররূপে প্রকাশ করলেন এবং সে যা আশা করছিল তার বিপরীত উপস্থাপন করলেন। তিনি তার বাক্যের أَذْهِম শব্দটিকে কালো ঘোড়ার অর্থে গ্রহণ করলেন (أَذْهِم বলা হয়) যার মধ্যে কালো জুড়ে রয়েছে ফলে শুভ্রতা হয়নি এবং এর সাথে সাদা ঘোড়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (أَشْهَب বলা হয়) যার পুরো

শরীর সাদা জুড়ে আছে। হাজ্জাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে শেকল, ফলে সে সচকিত হলো যে, **أَذْهَمَ** শব্দটি ঘোড়ার অর্থে গ্রহণ করাটা অধিক উপযুক্ত যে, বাদশাহ এটার ইচ্ছা করুক, অর্থাৎ যিনি ক্ষমতা প্রতিপত্তি তথা দানশীলতা, বিস্ত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত, সে দান করবে সেটাই তো স্বাভাবিক বন্দী করবে না, **يُضْفِدُ** (بَابُ اِفْعَالٍ) থেকে দান করা। আর **يُضْفِدُ** (بَابُ صَرَبٍ) থেকে বন্দী করা।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَلَئِنْ نَجَرْنَا كَلَامَ الْغ : মুসান্নিফ (র.) বলেন, যেসব স্থানে মুসনাদ ইলাইহ হওয়া ব্যতীত বাক্যটি প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত ব্যবহৃত হয়, তার একটি স্থান হচ্ছে শ্রোতার কথাকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীতার্থে গ্রহণ করে সে যেরূপ বাক্য আশা করছিল তার বিপরীত বাক্য তার সামনে উপস্থাপন করা, শ্রোতাকে এ বিষয় বুঝানোর জন্য যে, তুমি তোমার বাক্যের যে অর্থ গ্রহণ করেছ সেটা তোমার শানের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমার জন্য এ অর্থ গ্রহণ করা সমীচীন, যে অর্থ তোমার বাক্য থেকে আমি নিয়েছি এর উদাহরণ হচ্ছে বিখ্যাত আরববাসী কাবা'ছারী এবং তৎকালীন ইরাকের দৌর্দও প্রতাপশালী শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মাঝে চিত্তাকর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নিম্নে তাদের কথোপকথন হুবহু উঠানো হলো।

মৌলিক আরবি সাহিত্য গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় সহচরদের নিয়ে কাবা'ছারী এক আঙুরের বাগানে বাক্য চর্চা ও মদপানে ব্যস্ত ছিল। ইতোমধ্যে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে আলোচনা উঠল। কাবা'ছারী তখন এক গুচ্ছ আঙুর হাতে নিয়ে বলে উঠলেন **قَطَعَ اللَّهُ عُنُقَهُ وَسَفَانِي دَمَهُ** অর্থাৎ আল্লাহ যদি এর ঘাড় মটকে দেন এবং এর রক্তে আমার গলা ভিজিয়ে দেন, তাহলে আমার প্রাণ জুড়ায়।

উপস্থিত এদের কোনো এক ব্যক্তি তা হাজ্জাজের কানে দিল। হাজ্জাজ তাকে ধরে এনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নাকি এ কথা বলেছ **قَطَعَ اللَّهُ عُنُقَهُ وَسَفَانِي دَمَهُ** কাবা'ছারী কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন,

نَعَمْ وَقَدْ قَصَدْتُ الْعِنَبَ الَّذِي كَانَ بِيَدِي

অর্থাৎ জি, বলেছি, তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল আমার হাতে ধরা আঙুর গুচ্ছ এবং তার থেকে তৈরি লাল শরাব।

হাজ্জাজ সবই বুঝলেন, তাই তিনি ধমক দিয়ে বললেন, তোমাকে আমি অবশ্যই শেকলে চড়াবো, **لَا حِمْلَ لَكَ عَلَيَّ** তার বাক্যে **أَذْهَمَ** শব্দটিকে তিনি শেকল জেলখানা বুঝিয়েছেন। এর জবাবে হাজ্জাজের কথার বিপরীতার্থ নিয়ে কবি বললেন, **أَشْهَبُ (সাদা) وَكَالُو (কালো) أَذْهَمَ** তথা আপনার মতো মহানুভব শাসক **أَذْهَمَ** (কালো) ও **أَشْهَبُ** (সাদা) যে কোনো ঘোড়ায় চড়াতে পারেন।

হাজ্জাজ এমন উত্তর মোটেও আশা করেননি, তাই তিনি পরক্ষণেই ধমক দিয়ে বললেন- **قَصَدْتُ الْحَدِيدَ** ব্যাটা মূর্খ আমি **حَدِيد** (লোহার শেকল) বুঝাতে চেয়েছি। এবারও কাবা'ছারী কৃতিত্বের সাথে তার কথাকে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, **أَنْ يَكُونَ الْحَدِيدَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَلِيدًا** অর্থাৎ জি, **بَلِيد** (বোকা) না হয়ে **حَدِيد** (চালাক) হওয়াই উত্তম।

এটা শুনে হাজ্জাজ তার কর্মচারীদের বললেন, তাকে উঠিয়ে নাও। অতঃপর তাকে উঠাল।

কাবা'ছারী বললেন, **سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ** অর্থাৎ সেই মহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি আমার জন্য একে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, অথচ আমরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না। এটা শুনে হাজ্জাজ বললেন, একে নিচে রেখে দাও। তখন বলে উঠলেন **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** অর্থাৎ মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নিবো।

কাবা'ছারীর এরূপ বাক চাতুর্যে হাজ্জাজের রাগ পড়ে গেল এবং তিনি তাকে উপটোকন দিয়ে বিদায় করলেন।

মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যে অর্থে কথা বলছিলেন প্রকাশ্য অবস্থার দাবি তাই ছিল, সে অর্থেই তার কথাকে গ্রহণ করা এবং সেভাবে জবাব দেওয়া, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে কাবা'ছারী তার বাক চাতুর্য ও উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা সেটাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে **اُسْلُوبُ الْعَكِيمِ** বলা হয়।

أَوِ السَّائِلِ عَطْفٌ عَلَى الْمُخَاطَبِ أَيْ تَلَقَّى السَّائِلِ بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّبُ بِتَنْزِيلِ سُؤَالِهِ
 مَنَزِلَةً غَيْرِهِ أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ السُّؤَالِ تَنْبِيْهَا لِّلَسَّائِلِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرُ الْأَوَّلَى
 بِحَالِهِ أَوِ الْمُهِمُّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
 سَأَلُوا عَنْ سَبَبِ اخْتِلَافِ الْقَمَرِ فِي زِيَادَةِ النُّورِ وَنُقْصَانِهِ فَأُجِيبُوا بِبَيَانِ الْغَرَضِ مِنْ
 هَذَا الْاِخْتِلَافِ وَهُوَ أَنَّ الْأَهْلَةَ بِحَسَبِ ذَلِكَ الْاِخْتِلَافِ مَعَالِمٌ يُوقَّتُ بِهَا النَّاسُ أُمُورَهُمْ مِنَ
 الْمَزَارِعِ وَالْمَتَاجِرِ وَمَحَالِّ الدِّيُونِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَعَالِمٌ الْحَجِّ يُعْرَفُ بِهَا وَقْتُهِ وَ
 ذَلِكَ لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَى وَالْآلِيْقُ بِحَالِهِمْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَسْأَلُوا عَنْ السَّبَبِ
 لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمَنْ يَطْلَعُونَ بِسُهُولَةٍ عَلَى دَقَائِقِ عِلْمِ الْهَيْئَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ لَهُمْ بِمِ غَرَضٌ
 وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ سَأَلُوا عَنْ بَيَانِ مَا يُنْفِقُونَ فَأُجِيبُوا بِبَيَانِ الْمَصَارِفِ
 تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْمُهِمُّ هُوَ السُّؤَالُ عَنْهَا لِأَنَّ النِّفْقَةَ لَا يَعْتَدُ بِهَا إِلَّا أَنْ تَقَعَ مَوْقِعَهَا -

অনুবাদ : অথবা প্রশ্নকারীর সামনে উপস্থাপন করা السَّائِلِ এটি আতফ হয়েছে এর উপর, অর্থাৎ প্রশ্নকারী যা চাচ্ছে তার বিপরীত বিষয় তার সামনে উপস্থাপন করা। তার প্রশ্নটিকে অন্য প্রশ্নের স্থানে রেখে প্রশ্নকারীকে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, সে ভিন্ন বিষয়টি তাদের অবস্থানুসারে (প্রশ্নের জন্য) অধিক উপযোগী অথবা তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী- তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে চাঁদের (উদয়স্তের কারণ) সম্পর্কে। আপনি বলুন, এটি মানুষের জন্য বিভিন্ন সময় এবং হজের সময় নির্ধারণের মাধ্যম। তারা চাঁদের আলো চাঁদের পরিবর্তন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের এ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জবাব দেওয়া হয়েছে। আর তা হচ্ছে চাঁদ এ পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেকগুলো নিদর্শন যার সাহায্যে লোকেরা তাদের বিভিন্ন বিষয়ের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ তাদের চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঋণ ইত্যাদি আদায়ের সময় রোজার সময় ইত্যাদি এমন কি হজের জন্য নিদর্শন, এর দ্বারা হজের সময় জানা যায়, আর এ জবাব দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, তাদের অবস্থানুসারে অধিক উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে তারা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে আর এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না, কেননা, তারা ঐ পর্যায়ের ছিলেন না যারা সহজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আয়ত্ত করতে পারে এবং এর সাথে তাদের কোনো মৌলিক উদ্দেশ্য ও সম্পর্কিত নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার আরেকটি বাণীতে (আমরা দেখতে পাচ্ছি) “তারা (সাহাবীগণ) আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করে? আপনি বলুন- যা কিছু অর্থ সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা তোমার পিতা-মাতার জন্য, নিকটাত্মীর জন্য, এতিম, মিসকিন (অসহায়) ও মুসাফিরের জন্য।” তারা প্রশ্ন করেছিলেন কি (এবং কি পরিমাণে) ব্যয় করবেন, কিন্তু তাদের জবাব দেওয়া হলো দানের ক্ষেত্র সম্পর্কে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা, দান গ্রহণযোগ্য হবে না যে পর্যন্ত না, তা যথাস্থানে হয়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَوْ السَّائِلِ عَطْفٌ الْخ : মুসনাদ ইলাইহের বাইরে বাহ্যিক-প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যের বিপরীত জবাব দিয়ে এ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, তোমার প্রশ্ন এ সম্পর্কে হওয়াটাই সমীচীন ছিল।

ইতঃপূর্বে শ্রোতাকে তার আশার বিপরীত জবাব দান সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে।

এ দু'টি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে— প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যের বিপরীত এর মধ্যে প্রশ্ন থাকা আবশ্যিক যেমন আমরা এর দু'টি উদাহরণের মধ্যে দেখলাম, পক্ষান্তরে শ্রোতার উদ্দেশ্যের বিপরীত-এর মধ্যে প্রশ্ন থাকা আবশ্যিক নয়।

تَلَقَّى السَّائِلُ بِغَيْرِ مَا يَتَرَقَّبُهُ : এর সারকথা হচ্ছে— প্রশ্নকারী যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রশ্ন করেছে। উত্তর প্রদানকারী তার প্রশ্ন ভিন্ন অন্য প্রশ্নকে তার প্রশ্নের স্থানে রেখে ভিন্ন প্রশ্নটির উত্তর দিবে, তার প্রশ্নের উত্তর দিবে না। উত্তর প্রদানকারী প্রশ্নকারীকে বুঝাবে যে, আপনার প্রশ্ন এটা হওয়া সমীচীন হয়নি; বরং প্রশ্ন সেটাই হওয়া উচিত ছিল যার উত্তর আমি দিলাম। যেমন কুরআনের আয়াত (প্রশ্ন) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِج (জবাব) قُلْ مِمَّا مَرَّاقِبْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَقِّ তারা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করছেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাঁদের ব্যাপারটি এমন কেন? এটা খুব সরু হয়ে উদ্ভিত হয়, এরপর ক্রমশ বাড়তে থাকে এক পর্যায়ে তা পূর্ণ শশী পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয়। এরপর আবার হ্রাস পেতে থাকে এবং প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে, তাদের প্রশ্নটি ছিল চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাজাগতিক কারণ সম্পর্কে। কিন্তু এ জাতীয় প্রশ্ন দীন ও শরিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তা জানা বা না জানাতে শরিয়তের কোনো কিছু আসে যায় না। শরিয়তের সাথে চাঁদের পরিক্রমা ও হ্রাস-বৃদ্ধির যে সম্পর্ক, তা হচ্ছে এর দ্বারা সময়ের জ্ঞান লাভ হয়, আর বিভিন্ন সময়ে শরিয়তের যেসব হুকুম, যথা—হজের সময়, রোজার মাস, ঈদসহ অন্যান্য বিষয়।

তাই তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে; বরং এ সম্পর্কে তাদের কি প্রশ্ন হওয়া উচিত এবং তার উত্তর কি তা বর্ণনা করা হয়েছে। قُلْ مِمَّا مَرَّاقِبْتُ لِلنَّاسِ বলা হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন, বেচাকেনা, চাষাবাদ, ঋণদান ও গ্রহণের সময় নির্ধারণে বিশেষ উপকারিতা রয়েছে, এমনি ইবাদতের সময় নির্ধারণ, বিশেষভাবে হজের তারিখ নির্ধারণের মাধ্যম হচ্ছে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধিগত পরিবর্তন।

সারকথা হচ্ছে, এখানে চাঁদের মহাজাগতিক হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ সংক্রান্ত প্রশ্নকে চাঁদের কল্যাণ ও উপকারিতা প্রশ্নের স্থানে রাখা হয়েছে এবং সে মতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। কেননা, প্রশ্নকারীদের জন্য এটা প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

قَوْلُهُ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ الْخ : এটিই হচ্ছে تَلَقَّى السَّائِلُ بِغَيْرِ مَا يَتَطَلَّبُ এর দ্বিতীয় উদাহরণ, এতে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের বিপরীত উত্তর দেওয়া হয়েছে শ্রোতাকে এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, তোমার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং আমার দেওয়া জবাবটি তোমার জানা বেশি প্রয়োজন।

সাহাবীগণের প্রশ্ন ছিল তারা কি কি পরিমাণে খরচ করবেন, কিন্তু তাদের সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আল্লাহ তা'আলা কাদের জন্য খরচ করা হবে তা বর্ণনা করলেন, এটা তাদের প্রশ্ন এবং প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত। অতএব, তাদের বলা হলো যাই তোমরা খরচ করো এবং সেটা যে পরিমাণই হোক না কেন তা তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম মিসকিন-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য খরচ করো। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামকে সে খবরের বস্তু এবং পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং খরচের ক্ষেত্রেই হলো আসল গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সঠিক স্থানে অল্প ব্যয়ে পুণ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে অক্ষেত্রের অবস্থানে বহু দানেও পুণ্য লাভ হয় না। তাই তোমাদের খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাই ছিল বেশি জরুরি। তাদের কৃত প্রশ্নের পরিবর্তে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অতএব, এটিও اسْلُوبُ الْحَكِيمِ হয়েছে।

وَمِنْهُ أَنَّى وَمِنْ خِلَافٍ مُّقْتَضَى الظَّاهِرِ التَّغْيِيرُ عَنِ الْمَعْنَى الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ
الْمَاضِي تَنْبِيْهَا عَلَى تَحَقُّقِ وَقُوعِهِ نَحْوُ وَيَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بِمَعْنَى يَضَعُ وَمِثْلُهُ التَّغْيِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ اسْمِ
الْفَاعِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ مَكَانَ يَقَعُ وَنَحْوُهُ التَّغْيِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ
بِلَفْظِ اسْمِ الْمَفْعُولِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ مَكَانَ يُجْمَعُ وَهَهُنَا
بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْ اسْمِي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْإِسْتِقْبَالِ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ ذَلِكَ بِحَسَبِ أَصْلِ الْوَضْعِ فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا وَاقِعًا فِي مَوْقِعِهِ وَارِدًا عَلَى حَسَبِ
مُقْتَضَى الظَّاهِرِ وَالْجَوَابُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ فِيمَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ وَقُوعُ الْوَصْفِ وَقَدْ
اسْتَعْمِلَ هَهُنَا فِيمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مَجَازًا تَنْبِيْهَا عَلَى تَحَقُّقِ وَقُوعِهِ -

অনুবাদ : প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার আরেক ক্ষেত্র হচ্ছে ভবিষ্যৎকালের অর্থকে অতীতকালের শব্দে প্রকাশ করা। এ কথার صِبْغَةُ الْمَاضِي-এর স্থানে صِبْغَةُ الْمُسْتَقْبِلِ ভবিষ্যতের বিষয়টি (অতীতের ঘটে যাওয়া বিষয়টির মতো) সুনিশ্চিতভাবে ঘটবে এটার প্রতি করা। যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ فَصَوْعٌ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ যেদিন শিক্কাই ফুঁক দেওয়া হবে, পৃথিবী এবং আকাশের সকলেই সংজ্ঞাহীনভাবে পড়বে। صَعَقَ (অতীতকালবাচক ক্রিয়া) يَضَعُ (ভবিষ্যৎকালবাচক ক্রিয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত (এটা প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত এটা করা নিশ্চয় তার অর্থ নেওয়ার জন্য) এবং এর মতো প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত ভবিষ্যৎকালের অর্থকে اسْمِ فَاعِلٍ-এর সাহায্যে প্রকাশ করা। যেমন- মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী وَأَنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ আর প্রতিদান (দিবস) ঘটবেই। وَاقِعٌ শব্দটি يَقَعُ (মضارع)-এর স্থানে হয়েছে এবং এর মতো প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত হচ্ছে ভবিষ্যৎকালের অর্থ ইসমে মাফউল-এর সাহায্যে প্রকাশ করা। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী “যেদিন সমস্ত লোকদের একত্রিক করা হবে।” এখানে يَجْمَعُ (اسم مفعول) مَجْمُوعٌ-কে (মضارع)-এর স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কিছু আলোচনা রয়েছে। (মুসান্নিফ (র.) আপত্তি আকারে বলেছেন যে) ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউল উভয়েই ভবিষ্যৎকালের অর্থ ব্যবহৃত হয়, যদিও উৎপত্তিগতভাবে এতে ভবিষ্যতের অর্থ নেই (যদি এদেরকে ভবিষ্যতের অর্থ ব্যবহার করা হয়) তাহলে তো এ দু'টি যথা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রকাশ্য অবস্থার দাবি অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে, এদের (ইসমে ফায়েল এবং ইসমে মাফউল) প্রত্যেকটি নিশ্চয়তার অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমানকালের অর্থ প্রদানে হাকীকত। এখানে এমন অনিশ্চয়তার অর্থে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। নিশ্চয়তার অর্থের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্য।

সারকথা হচ্ছে- ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউলের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, বর্তমান ও অতীতের অর্থ দেওয়া, তবে রূপকভাবে ভবিষ্যতের অর্থ প্রদান করে। এটা জেনে রাখা দরকার, রূপকার্থ সবসময় প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত হয়ে থাকে। সে মতে এখানে ইসমে ফায়েল ও ইসমে মাফউল ভবিষ্যতের অর্থ ধারণ করতে মাজায বা রূপকার্থে হয়েছে। আর রূপকার্থে হওয়াটাই প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত অর্থ এবং ইসমদ্বয় এখানে প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত রূপক ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمِنْهُ أَى وَمِنْ خِلَافٍ مُّقْتَضَى الظَّاهِرِ الْقَلْبُ وَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُ أَجْزَاءِ الْكَلَامِ مَكَانَ
 الْآخِرِ وَالْآخِرُ مَكَانَهُ نَحْوُ عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ مَكَانَ عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى
 النَّاقَةِ أَى أَظْهَرْتُهُ عَلَيْهَا لِتَشْرَبَ وَقَبْلَهُ أَى الْقَلْبُ السَّكَائِي مُطْلَقًا وَقَالَ إِنَّهُ مِمَّا
 يُؤْرِثُ الْكَلَامَ مَلَا حَةً وَرَدَّهُ غَيْرُهُ أَى غَيْرُ السَّكَائِي مُطْلَقًا لِأَنَّهُ عَكْسُ الْمَطْلُوبِ
 وَنَقِیْضُ الْمَقْصُودِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إِنْ تَضَمَّنَ إِعْتِبَارًا لَطِیْفًا غَيْرَ الْمَلَا حَةِ الَّتِیْ أَوْرَثَتْهَا
 نَفْسُ الْقَلْبِ قَبْلَ كَقَوْلِهِ شَغَرٌ وَمَهْمَةً أَى مَفَا زَةً مُغْبَرَةً أَى مُتَلَوْنَةً بِالْغَبَرَةِ أَرْجَاؤُهُ *
 أَطْرَافُهُ وَنَوَاحِيهِ جَمْعُ الرَّجَا مَقْصُورًا كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سَمَاؤُهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَى
 لَوْنُهَا أَى لَوْنُ السَّمَاءِ فَالْمِضْرَاعُ الْآخِرُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ وَالْمَعْنَى كَأَنَّ لَوْنَ سَمَائِهِ
 لِعَبَرَتِهَا لَوْنُ أَرْضِهِ وَالْإِعْتِبَارُ اللَّطِیْفُ هُوَ الْمُبَالَغَةُ فِی وَضْفِ لَوْنِ السَّمَاءِ بِالْغَبَرَةِ
 حَتَّى كَأَنَّهُ صَارَ بِحِثِّ يَشْبَهُ بِهِ لَوْنُ الْأَرْضِ فِی ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ فِيهِ -

অনুবাদ : প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত হওয়ার আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে (قلب) বলা হয় বাক্যের
 একটা অংশকে অন্য অংশের স্থানে এবং অন্যটিকে তার স্থানে রাখা। যেমন- উটনীর সামনে আমি গামলা পেশ
 করেছি-এর স্থানে উটনীকে গামলার সামনে রেখেছি বলা, অর্থাৎ গামলাটিকে প্রকাশ করেছি- যাতে পান করে।
 সাক্ষ্যকী এটিকে সাধারণভাবে (কোনো কয়েদ ছাড়াই) গ্রহণ করেছেন। আর তিনি বলেছেন যে, তার বাক্যের
 মধ্যে এক ধরনের চমক সৃষ্টি করে। অন্যরা এটিকে সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা, উদ্দেশ্যের
 বিপরীত এবং মাকসাদের বৈরী। তবে সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, যদি এতে কলবের সৃষ্টি করা চমক ছাড়া অন্য
 কোনো বিশেষ তাৎপর্য থাকে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন- রুবা ইবনে আজাজের কবিতা অনেক মরুভূমি
 রয়েছে যার চতুর্পার্শ্বে ধুলো মিশ্রিত। -এর অর্থ হলো- চতুর্পার্শ্বে এবং প্রান্ত ও প্রান্তর, এটি (ইসমে
 মাকসূর) যেন তার ভূমির রক্ত আকাশের রঙের মতো, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ তার আকাশের রঙ,
 দ্বিতীয় লাইনটিতে কলব হয়েছে, মূল অর্থ হচ্ছে, যেন তার আকাশের ধুলোর কারণে ভূমি (মাটির)-এর রঙের
 মতো। এখানে বিশেষ তাৎপর্যটি হচ্ছে, ধুলোর কারণে তার আকাশের রঙের আতিশয্য বুঝানো। এমনকি যেন
 সেটি হয়ে গেছে এমন যে, এর দ্বারা মাটির রঙের তুলনা করা হয় আতিশয্যের ব্যাপারে, অথচ ধুলোর রঙের
 ব্যাপারে মাটিই হচ্ছে মূল (ও মুশাব্বাহ বিহী)।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَى : মূল লেখক বলেন, বাহ্যিক-প্রকাশ্য অবস্থার দাবির বিপরীত বাক্য ব্যবহার করার
 আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে (স্থানান্তর)। قلب বলা হয় বাক্যের একটি অংশকে অন্য অংশে অন্যটিকে প্রথমটির স্থানে
 ব্যবহার করা। শুধুমাত্র এতটুকু পরিবর্তনকে قلب বলা হয় না; বরং প্রথম অংশটিকে দ্বিতীয় অংশের স্থানে রাখা হবে, তখন
 এর দ্বারা দ্বিতীয় অংশের হুকুম প্রমাণ হবে। আবার যখন দ্বিতীয় অংশকে প্রথম অংশের স্থানে রাখা হবে- তখন এর দ্বারা
 প্রথম অংশের হুকুম প্রমাণিত হবে। যেমন- عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى النَّاقَةِ এ উদাহরণের (উপস্থাপন)-এর মধ্যে

উভয়ে (حَوْضٌ وَنَافَةٌ) শামিল, তবে حوض-এর উপর حرف جر (এলী) না থাকাতে এটি معروض (পেশকৃত) আর حرف (পেশকৃত) হাউজ গামলাটি পান করার জন্য উটনীর সামনে রেখেছি।

যদি এতে قلب করা হয়, তাহলে বলা হবে عَرَضْتُ النَّافَةَ عَلَى الْحَوْضِ পরিবর্তিত উদাহরণে পেশকৃত হবে نَافَةٌ উটনী, যা পূর্বের উদাহরণে ছিল حوض-এর জন্য। এর অনুবাদ হচ্ছে, আমি উটনীকে পানির সামনে পেশ করেছি।

মোটকথা, عَرَضْتُ النَّافَةَ عَلَى الْحَوْضِ-এর মধ্যে قلب হয়েছে যা পূর্বে النَّافَةَ عَلَى الْحَوْضِ-এর দলিল হচ্ছে مَعْرُوضٌ عَلَيْهِ যার সামনে পেশ করা হয় সেটা অনুভূতিশীল এবং ইচ্ছার অধিকারী হওয়া।

জরুরি যে, তা معروض (পেশকৃত)-এর প্রতি ধাবিত হবে অথবা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। আর এটা তো সকলেরই জানা যে, حوض এবং نَافَةٌ-এর মধ্যে نَافَةٌ হচ্ছে অনুভূতিশীল প্রাণী। অতএব, মূলে نَافَةٌ হবে مَعْرُوضٌ عَلَيْهِ (যার সামনে পেশ করা হয়) এবং حوض হবে معروض যা পাওয়া গেছে النَافَةَ-এর মধ্যে এবং এটি عَرَضْتُ الْحَوْضَ عَلَى (عَرَضْتُ النَّافَةَ عَلَى الْحَوْضِ) হচ্ছে প্রকাশ্য অবস্থার অনুযায়ী। সুতরাং এর قلب পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত বাক্য عَرَضْتُ النَّافَةَ عَلَى الْحَوْضِ হবে প্রকাশ্য অবস্থার বিপরীত।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, আল্লামা সাক্বাকী (র.)-এর নিকট সাধারণভাবে (শর্তহীন) قلب বৈধ, এতে বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকা জরুরি নয়, তাৎপর্য থাকলে যেমন সহীহ হবে তেমনি না থাকলেও সহীহ হবে। সাক্বাকী (র.) বলেন, যেহেতু قلب দ্বারা বাক্যের মধ্যে এক ধরনের চমক ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয় তাই এটি গ্রহণযোগ্য এবং বৈধ, সাক্বাকী (র.) ছাড়া অন্য বালাগাত বিশারদগণের মতে قلب সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। চাই এতে চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কোনো তাৎপর্য নিহিত থাকুক অথবা নাই থাকুক; তাহলে তাদের দলিল হচ্ছে, এটি উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তো নয়ই; বরং বিরোধপূর্ণ এবং বাক্যের মাকসাদ পূরণে এটি বাধা স্বরূপ। আল্লামা মুহাম্মদ আবুল মা'আলী জালালুদ্দীন (তালখীসুল মিফতাহের মূল লেখক)-এর মতে قلب-এর মধ্যে যদি চমক সৃষ্টি করা ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিহিত থাকে, তাহলে قلب গ্রহণযোগ্য ও বৈধ হবে, শুধুমাত্র চমক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে قلب করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ তাৎপর্যবহ قلب-এর একটি উদাহরণ তিনি রুবা ইবনুল আজাজের একটি কবিতার পঙ্ক্তি দ্বারা দেখিয়েছেন।

পঙ্ক্তি— وَمَهْمَا مُغْبِرَةٌ أَرْجَاءُ * كَانَ لَوْنُ أَرْضِهِ سَمَاءُ

শাব্দিক বিশ্লেষণ :

او এখানে رُب-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مَهْمَا বলা হয় এমন বন জঙ্গলকে, যাতে গ্রাম এবং পানি নেই। এক কথায় মরুভূমির জঙ্গল, مُغْبِرَةٌ ধুলো মিশ্রিত, رَجَاءُ শব্দ رَجَاءُ (ইসমে মাকসূর)-এর বহুবচন, এর অর্থ হচ্ছে চতুষ্পার্শ্ব এবং আশপাশের এলাকা سَمَاءُ-এর মধ্যে মুযাফ উহ্য আছে, উহ্য মুযাফসহ ইবারত হচ্ছে— لَوْنُ سَمَاءُ

কবিতার মর্মার্থ : অনেক বনভূমি এমন রয়েছে, যার চতুষ্পার্শ্ব ধুলো মিশ্রিত, যেন তার ভূমির রঙ আকাশের রঙে পরিণত হয়েছে।

এ পঙ্ক্তির দ্বিতীয় লাইনে قلب হয়েছে, কেননা, মূলত আকাশ ধুলোমলিন হয়ে ভূমির রঙের সাথে মিশে যায় এবং একাকার হয়ে যায়। অর্থাৎ আকাশের রঙ হচ্ছে مُشَبَّه আর ভূমির রঙ হচ্ছে بِهِ مُشَبَّه-এর মধ্যে তুলনীয় বিষয় হচ্ছে ধুলো মলিনতা, অথচ কবিতার قلب করে দেখিয়েছেন ভূমির রঙ হচ্ছে مُشَبَّه আর আকাশের রঙ হচ্ছে بِهِ مُشَبَّه তিনি ভূমির রঙকে আকাশের রঙের সাথে তুলনা করেছেন, এখানে বিশেষ তাৎপর্যটি হচ্ছে আকাশের রঙের মধ্যে আতিশয্য তৈরি করা অর্থাৎ আকাশ এতটা ধুলোমলিন এবং এতে ধুলো এত বেশি যে, এর সাথে ভূমির তুলনা চলে। অথচ প্রকৃত ধুলোমলিন হচ্ছে ভূমি এবং ভূমি থেকেই ধুলোর সৃষ্টি হয়। ধুলোর রঙের তুলনা করা হলে সেটা স্বাভাবিকভাবে মাটির সাথেই করা হয়ে থাকে।

وَالَا أَىٰ وَإِنْ لَّمْ يَتَضَمَّنْ اِغْتِبَارًا لَطِيفًا رَّدَ لِأَنَّهُ عُدُولٌ عَنْ مُفْتَضَى الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ
نُكْتَةٍ يُغْتَدُّ بِهَا كَقَوْلِهِ شَعْرٌ فَلَمَّا أَنْ جَرَى سِمْنٌ عَلَيْهَا * كَمَا طَيَّنْتَ الْفَذْنَ أَى الْقَصْرِ
السِّيَاعَا أَى الطَّيْنِ الْمَخْلُوطِ بِالتَّبَنِ وَالْمَعْنَى كَمَا طَيَّنْتَ الْفَذْنَ بِالسِّيَاعِ يُقَالُ طَيَّنْتُ
السَّطْحَ وَالْبَيْتَ وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِى وَصْفِ النَّاقَةِ بِالسِّمَنِ
مَا لَا يَتَضَمَّنُ قَوْلُنَا كَمَا طَيَّنْتَ الْفَذْنَ بِالسِّيَاعِ لِإِيْهَامِهِ أَنْ السِّيَاعَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعَظْمِ
وَالْكَثَرَةِ إِلَى أَنْ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَصْلِ وَالْفَذْنُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ كَالسِّيَاعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَذَنِ -

অনুবাদ : অন্যথায় অর্থাৎ যদি কল্ব বিশেষ কোনো তাৎপর্য বহন না করে তাহলে প্রত্যাখ্যান করা হবে। কেননা, এটা হচ্ছে বাহ্যিক অবস্থার দাবি থেকে বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছাড়া সরে পড়া। যেমন- আমার ইবনে সালিম ছা'লাবীর উক্তি “যখন উটনী স্থলদেহ হয়ে গেল যেমনটি তুমি লেপনকে প্রাসাদ দ্বারা প্রলেপ দিয়েছ” সীয়া বলা হয় এমন লেপনকে যাতে কাদার সাথে ভূমি মিশ্রিত করা হয়। অর্থ হচ্ছে- যেমন তুমি প্রাসাদকে লেপন দ্বারা প্রলেপ দিয়েছ। বলা হয় আমি ঘর এবং ছাদ লেপেছি। কেউ বলতে পারে, এটি তো উটনী স্থলতার ক্ষেত্রে আতিশয্য বুঝিয়েছে। যে আতিশয্যটি নেই আমি প্রাসাদকে লেপন গাদ দ্বারা প্রলেপ দিয়েছি এর মধ্যে। কেননা, কাল্ব এ ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, লেপন ছাড়া মোটা এবং পরিমাণে বেশি এর দিক থেকে এমন স্তরে পৌছেছে যে, তা মূলে পরিণত হয়েছে। আর প্রাসাদ তার তুলনায় লেপন যেমনটি প্রাসাদের তুলনায়।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَالَا أَىٰ وَإِنْ لَّمْ يَتَضَمَّنْ الخ : মূল লেখক বলেন, যদি قلب-এর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ থাকে তাহলে সেটি অগ্রহণযোগ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, এমতাবস্থায় কোনো তাৎপর্য ছাড়া বাহ্যিক অবস্থার দাবি থেকে সরে আসা আবশ্যিক হয়, অথচ বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া বাহ্যিক অবস্থার দাবি থেকে সরে আসা অবৈধ ও অগ্রহণযোগ্য। এর উদাহরণ আমার ইবনে সালিম ছা'লাবীর কবিতার একটি পঙ্ক্তি- فَلَمَّا أَنْ جَرَى سِمْنٌ عَلَيْهَا * كَمَا طَيَّنْتَ الْفَذْنَ السِّيَاعَا -

শাব্দিক বিশ্লেষণ : ১। অতিরিক্ত جرى এখানে প্রকাশ পাওয়ার অর্থে সمن (সিন-এর নিচে যের, মিম-এর উপর যবর) অর্থ- স্থলদেহ طين অর্থ- প্রলেপ দেওয়া فذن অর্থ- প্রাসাদ, ঘর, سِيَا ع অর্থ- ছানা বিশেষ, কাদা ও ভূমি মিশ্রিত বস্তু, যার দ্বারা ঘর ইত্যাদি প্রলেপ দেওয়া হয়। কবি উটনীর স্থলতা বুঝাতে বলছেন, যখন উটনীর স্থলতা প্রকাশ হলে এমন যে, তুমি প্রাসাদকে ছানা-লেপন দ্বারা প্রলেপ দিলে। কবি উটনিকে প্রাসাদের সাথে তুলনা করছেন, স্থলতা ও মোটা হওয়ার দিক থেকে, প্রাসাদের দেয়াল প্রলেপ দিলে যেমন মোটা হয় তেমনি উটনীটি স্থল মোটা।

কবিতার দ্বিতীয় লাইনে قلب হয়েছে। কেননা, কবি طَيَّنْتَ الْفَذْنَ السِّيَاعَا -এর স্থানে طَيَّنْتَ الْفَذْنَ السِّيَاعَا বলেছেন, প্রাসাদকে লেপন ছানা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়। যেমন বলা হয়- طَيَّنْتَ السَّطْحَ وَالْبَيْتَ মোটকথা হলো, যেহেতু এই قلب-এর মধ্যে কোনো বিশেষ তাৎপর্য নিহিত নেই এটি প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, কেউ হয়তো বলতে পারে যে, এতে পূর্ববর্তী কবিতার মতো مبالغه বা আতিশয্য রয়েছে। যার ভিত্তিতে কবিতাটিতেও قلب গ্রহণযোগ্য। কবি উটনীর স্থলতার আতিশয্য বুঝানোর জন্য এই কলবটি করেছেন। অর্থাৎ যেমনটি লেপন তার স্থলতা এবং আধিক্যে এত বড় হয়ে গেছে যে, তা আসলের (প্রাসাদের) মতো হয়ে গেছে এবং প্রাসাদ হয়েছে লেপনের মতো। এমনিভাবে উটনী স্থলতা হয়ে গেছে, মূল আসল উটনী হয়ে গেছে স্থলতার স্থানে। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে قلب করার দ্বারা এই আতিশয্য বুঝানো সম্ভব। সাধারণভাবে طَيَّنْتَ الْفَذْنَ السِّيَاعَا বলার দ্বারা আতিশয্য পাওয়া যায় না। এভাবে বললে অবশ্য قلب -এর একটি বিশেষ তাৎপর্য পাওয়া যায়, যার দ্বারা قلب বিস্কৃত বলে প্রমাণিত হয়।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .